গল্প সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

তারাপদ রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরী

ভূমিকা

অনেক রকম লেখা, অনেক মেজাজের। কিছু ভেবে চিন্তে লেখা, কিছু নির্ভাবনায় লেখা। মূলত হাস্যরস এবং/অথবা স্মৃতিবেদনা নির্ভর এই সব কাহিনী।

গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পাশাপাশি গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি দীর্ঘকাল, প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে রচিত সে জায়গায় এই খণ্ডের গল্পগুলি গত কয়েক বছরের রচনা। অভিজ্ঞতার তিক্ততা যদি কোনো কোনো গল্প স্পর্শ করে থাকে তবে সেটা কালদোষে হয়েছে।

এইচ-এ ৫৫
সেক্টর তিন
সল্টলেক
কলিকাতা-৭০০ ০৯৭

বিনীত—
তারাপদ রায়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত তারাপদ রায়ের অন্যান্য গ্রন্থ

চাড়াবাড়ি পোড়াবাড়ি

পটললাল ও মিস জুলেখা

ঘুষ

মান্ধাতা

গল্পসমগ্র (১ম খণ্ড)

রস ও রমণী

জলভাত

বাংলাদেশেব হৃদয় হতে

পটললাল ও মিস্ জুলেখা

ভূমিকা

বহুবিবাহ এখন আর রীতিসম্মত নয়। সমাজে এমন অনেক পুরুষ, এমনকি মহিলাও আছেন যাঁরা জীবনে বেশ কয়েকবার বিয়ে কবেছেন। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকা আইনসিদ্ধ নয়। এখন বিয়ের পরে প্রতিটি বিয়ের আগেই পূর্ববর্তী বিয়ের আইনত বিচ্ছেদ না করে নতুন বিয়ে আইনের চোখে অসিদ্ধ।

তবে হলিউডের এক অভিনেত্রীর কথা শোনা যায়, তাঁর এতবার বিয়ে হয়েছে ও বিয়ে ভেঙেছে যে তার হিসেব মিলছে না, দেখা যাচ্ছে যে তিনি যতবার বিয়ে করেছেন তার চেয়ে একবার বেশি ডিভোর্স করে বসে আছেন।

পটললাল ও মিস্ জুলেখার এই রসরহস্য কাহিনীও বহুবিবাহ জড়িত। তবে কোনও পরিচিত বা অপরিচিত স্ত্রী বা পুরুষ কাউকেই আহত করা এই কাল্পনিক গল্পের উদ্দেশ্য নয়। কয়েকটি চরিত্র বেছে নিয়েছি। নেহাতই রচনার প্রয়োজনে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও চরিত্রই কোনও জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ছায়াবলম্বনে গঠিত নয়।

[এক] নকুল শুকুল ওরফে ডাঃ সহদেব শুক

আজ কয়েকদিন হল ভয়াবহ গরম পড়েছে। কলকাতায় এত গরম বহুকাল পড়েনি। বৈশাখের শেষদিকে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। পুরো জ্যৈষ্ঠমাসটা খা-খা গনগন করে জ্বলছে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে বৃষ্টি নামতে এবার আষাঢ় মাস এসে যাবে।

এই গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে মর্মান্তিক লোডশেডিং। তবে লোডশেডিংয়ে ডাক্তার সহদেব শুকের খুব অসুবিধে হয় না। তাঁর নিজের ভাল ইনভারটার আছে। রাতে ঘুমের মধ্যে যদি লোডশেডিং হয়ে যায় পাখা ঠিক মতই ঘুরতে থাকে, সহদেব টেরও পান না।

কিন্তু পাখা ঘুরলেই তো হল না, পাখার বাতাসে এই গরমে আর সেই স্বস্তি নেই। শেষরাতের দিকে পাখার বাতাস পর্যন্ত গরম হয়ে যায়।

সারা শরীর ঘামে ভেজা। বিছানায় চাদর প্যাচ প্যাচ করছে। ঘুম থেকে উঠে পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ান সহদেব। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু আরাম লাগে। তারপর বাথরুম-টাথরুম সাঙ্গ করে শর্টস আর রঙিন গেঞ্জি পরে তিনি ময়দানের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন।

কড়েয়া রোডের এই বাড়িতে সহদেব একাই থাকেন, বাড়ির লোকেরা মেদিনীপুরের ভবগ্রামে দেশের বাড়িতে। এতে সুবিধেই হয়। ডাক্তার সহদেব শুক একজন প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই শুধু নন, কৃতবিদ্য গোয়েন্দা। তবে খুন, ডাকাতি, মারামারির

গোয়েন্দাগিরি মোটেই পছন্দ নয় সহদেববাবুর। রক্ত দেখলে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে। তিনি জাল-জোচ্চুরি, অপহরণ, কিডন্যাপিং ইত্যাদির তদন্তে পারদর্শী।

কড়েয়া রোড থেকে ময়দান কাছে নয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত যাতায়াতে প্রায় চার মাইল হয়ে যায়। বেকবাগান দিয়ে বেরিয়ে জগদীশচন্দ্র বসু রোড ধরে থিয়েটার রোড বরাবর হেঁটে যান সহদেব। এটাই তাঁর সারাদিনের ব্যায়াম, মর্নিং ওয়াক।

আজ একটু আগেই উঠে পড়েছেন সহদেববাবু। সারারাত তাঁর ভাল করে ঘুম হয়নি। গতকাল বিকেলেই একটা নতুন কেস এসেছে হাতে, খুবই জটিল আর রহস্যময় কেস, বাংলা থিয়েটারের উদীয়মানা ক্যাবারে নর্তকী মিস জুলেখার স্বামী পটললাল পালকে কে বা কারা পরশুদিন রাতে চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে পটললালকে সত্যিই অপহরণ করা হয়েছে না তিনি নিজেই পালিয়েছেন, সে বিষয়ে ডাক্তার সহদেবের মনে বেশ খটকা আছে।

এই খটকাই এই অন্তর্ধান কাহিনীর চারপাশে একটা রহস্যের বেড়াজাল ছড়িয়েছে। আর তাই ভাবতে ভাবতে রাতের ঘুম চটে গিয়েছিল সহদেববাবুর।

ডাক্তার সহদেব শুকের পূর্বনাম নকুল শুকুল।

নকুল নামটি তেমন অপ্রচলিত কিছু নয়। আমাদের আশপাশে নকুল নামের লোক অনেক সময়েই দেখা যায়। ভবানীপুরের পাড়ায় একসময় একই রাস্তায় দুই নকুল ছিল, যার জন্যে একজনকে বলা হত অহিনকুল আর অন্যজনকে বলা হত মহীনকুল।

সেইরকম শুকুল পদবিটিও তেমন অচেনা কিছু নয়। শুকুল পদবীধারী লোকের সংখ্যা কিছু কম নয়।

কিন্তু দুইয়ে মিলে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। 'নকুল শুকুল' নামটি হয়ত অনুপ্রাসের জন্যেই হাস্যকর মনে হয়।

ব্যাপারটা সহদেববাবু টের পেয়েছিলেন কলকাতায় ডাক্তারি করতে এসে। তারপরে যখন শখের গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করলেন, স্পষ্টই অনুভব করলেন এই নকুল শুকুল নামে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে দুয়েকটা প্রাচীন কথা বলতে হয়। সহদেববাবুর বাবা জগন্নাথ শুকুল তাঁদের ভবগ্রামের শখের যাত্রাদলের সভাপতি ছিলেন। নিজে পালাকার ছিলেন, অর্থাৎ যাত্রার নাটক লিখতেন, তাছাড়া নিজে অভিনয়ও করতেন। পরিষ্কারভাবে বলা উচিত জগন্নাথবাবু যাত্রাপাগল ছিলেন।

বহু খেটে তিনি একটা যাত্রাপালা লিখেছিলেন, মহাভারতের কাহিনী নিয়ে। সেই কাহিনীর নাম ছিল, 'আমি কৌরব, আমিই পাণ্ডব'; আজকালকার দিনে ঐরকম একটা পালা লিখলে তিনি খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই পেতেন, অনায়াসেই পেতেন।

গ্রাম্য যাত্রাকার জগন্নাথবাবুর সেরকম সৌভাগ্য অবশ্য হয়নি কিন্তু মহাভারত নিয়ে পালা লিখে মহাভারতের কাহিনীতে তাঁর হৃদয় ও মন নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

ঐ 'আমি কৌরব, আমিই পাণ্ডব' নামক তাঁর স্বরচিত পালায় তিনি পাণ্ডুরাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কেমন অভিনয় করতেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই কিন্তু আসল কথা হল তিনি নিজের বাস্তব জীবনেও পাণ্ডুরাজা বনে গেলেন।

পরপর চারটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল জগন্নাথবাবুর স্ত্রীর গর্ভে। তাদের নামকরণ হল যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং নকুল।

প্রথমে তিনটি সন্তান জন্মানো পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে কুন্তী বলে ডাকতেন, চতুর্থ সন্তান নকুল জন্মানোর পর তিনি সেই স্ত্রীকে মাদ্রী বলে ডাকা শুরু করলেন। মধ্যে একবার জগন্নাথবাবুর মাথায় এমন বুদ্ধিও ঢুকে গিয়েছিল যে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করবেন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম দেবেন 'মাদ্রী', এমন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়নি। প্রথমা স্ত্রী, মানে সহদেববাবুর মাকে তিনি অসম্ভব ভয় পেতেন, অপরিসীম নির্যাতনের ভয়ে তিনি পরেরবার বিয়ে করতে এগোননি, এগোতে সাহস পাননি। ফলে বাধ্য হয়েই একই স্ত্রীকে প্রথমে কুন্তী এবং পরে মাদ্রী বলে সম্বোধন করতেন।

কিন্তু এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার ঘটল।

জগন্নাথবাবু পঞ্চম পুত্র জন্মানোর আগেই একদিন মধ্যরাতে 'আমি কৌরব, আমিই পাণ্ডব' যাত্রাপালায় তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেহরক্ষা করলেন। মাদ্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর নিজের বুকে দুবার করাঘাত করার কথা ছিল, তিনি নিজেই এই নির্দেশ রচনা করেছিলেন তাঁর পালায়।

কিন্তু সেদিন উত্তেজনাবশত তিনি ছাব্বিশবার বুকে করাঘাত করেছিলেন, এবং সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। ঐ সময়ে তাঁর স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা না থাকায় সহদেবের আর জন্মগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

পরিণত বয়েসে নকুল শুকুল যখন যথাক্রমে ডাক্তারি ও গোয়েন্দাগিরি শুরু করলেন, তিনি ভেবে দেখলেন যে নাম বদলানো অবশ্যই জরুরি। এ কথাটাও তাঁর মাথায় এল যে তাঁরা পাঁচ পাণ্ডব না হয়ে চার পাণ্ডব হয়েছেন, পঞ্চম পাণ্ডব যার হওয়ার কথা ছিল সে হল সহদেব, তাঁর যমজ ভ্রাতা হয়ে যার জন্মানো উচিত ছিল। যমজ মানে একই লোক প্রায় বলা যায়, সুতরাং যে নকুল সেই সহদেব হতে পারে।

এইরকম জটিল চিন্তার পরিণতি দাঁড়ালো যে নকুল ভাবতে লাগলেন আমার নামও তো সহদেব হতে পারত, আমি কেন সহদেব হব না। সহদেব নামটা ভালই, তাছাড়া নকুল শুকুলের অন্ত্যমিল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এই সময়ে চারদিকে আদালতে এফিডেভিট করে নাম-পদবি বদলানোর ধুম চলছে। খবরের কাগজের পাতায় সারি সারি নাম পদবি বদলের বিজ্ঞপ্তি। ব্যারাকপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট করে ভ্যাবল চোংদার শ্রীযুক্ত উত্তম কুমার হয়েছেন। আলিপুর আদালতে হলফনামা করা হয়েছে যে, 'আমি শ্যামগুল হক আজ হইতে নজরুল ইসলাম হইলাম।'

কেউ কেউ নিজের নামই শুধু নয়, বাবার নাম পর্যন্ত পালটিয়ে দিয়েছে, দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, 'আমি খগারাম চট্টরাজ পিতা নগারাম চট্টরাজ সাকিন বাসুদেবপুর, ডাকঘর বাসুদেবপুর ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এফিডেভিডটবলে খগেন চট্টোপাধ্যায় পিতা নগেন চট্টোপাধ্যায় হইয়াছি।'

বাবার নাম বদলানোর অবশ্য প্রয়োজন পড়েনি নকুল শুকুলের। তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে মাত্র পঁচিশ টাকা খরচ করে শেয়ালদা কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করে এলেন।

ব্যাপারটা আদালতের আঙিনায় রীতিমত জলভাতের মত হয়ে গেছে। আগেই টাইপ করা আছে স্ট্যাম্প পেপারে, শুধু শূন্যস্থানে বর্তমান নাম এবং আকাঙ্ক্ষিত নাম, সেইসঙ্গে ঠিকানা ইত্যাদি বসিয়ে দিলেই হল। তারপর হাকিমের সামনে একজন উকিল সনাক্ত করবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কাজটা সারা হয়ে গেল। রাতারাতির চেয়েও তাড়াতাড়ি নকুল শুকুল সহদেব শুকুল হয়ে গেলেন।

কথায় বলে মানুষের লোভের শেষ নেই। সহদেব শুকুলে পরিণত হয়েও নকুলবাবুর মনে সুখ নেই। এবার নাম নয়, পদবি বদলের দিকে ঝোঁক পড়ল তার। পৈতৃক শুকুল পদবিটা বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন পদবি নিতে হবে। অবশেষে তিনি নিজেই অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন শুকুল পদবিটা ছেঁটে শুক করলেই বেশ মডার্ন হয়ে যাবে।

নকুল শুকুল থেকে সহদেব শুক হতে আরেকটা এফিডেভিট লাগল। প্রথমেই তাঁর মাথায় ব্যাপারটা খেললে একটা এফিডেভিটেই ঝামেলা মিটত। আরেকবার শেয়ালদা আদালতে পঁচিশ টাকা এবং দু-ঘণ্টা সময় ব্যয় করে সহদেব শুকের আবির্ভাব হল।

গোয়েন্দাপ্রবর ডাক্তার সহদেব শুকের এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় পূর্ব বৃত্তান্তের পর এবার আজকের সকালের ঘটনায় ফেরা যাক।

ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে কড়েয়া রোডের দিকে ফিরছিলেন সহদেব। একটু অন্যমনস্কই ছিলেন তিনি। থাকারই কথা। মাথার মধ্যে ঘুরছে মিস জুলেখার স্বামী পটললাল পালের রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ, সেই সঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় সরোজিনী মঞ্চে 'যৌবনের লীলা' নাটকে মিস জুলেখার উদ্দাম, মোহময়ী নৃত্যের চমক-ঠমকগুলি, দৈহিক মোচড়গুলি ছেঁড়া ছেঁড়া ছবির মত চোখের সামনে এখনও ভাসছে।

অনিদ্রা, গরম, রহস্য ও উত্তেজনা চারে মিলে একটু ঘোরের মধ্যে আছেন সহদেববাবু। অনেক নেশা করলে কোনও কোনও সময়ে পরেরদিন সকালেও এরকম ঘোর থাকে। তবে ময়দানে খোলা হাওয়ায় হেঁটে এখন একটু ভাল লাগছে।

থিয়েটার রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ে এক ডাবওয়ালা বসে। এই সাতসকালেই তার ব্যবসা শুরু হয়ে যায়। ময়দান ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রত্যাগত ভ্রমণকারীরা কেউ কেউ এখানটায় দাঁড়িয়ে সুনির্মল কচি নারিকেলবারি পান করেন।

ডাবওয়ালাকে চেনেন সহদেববাবু। মাঝেমধ্যে একটা ডাব এর কাছ থেকে কিনে খান। আজকেও একটা খেলে ভাল হত, ডাবওয়ালার কাছে গিয়ে সহদেববাবু দাঁড়ালেন। লোকটা তখন ডাবের কাঁদি গুছিয়ে সাজাচ্ছে।

সহদেববাবু দেখলেন, এ লোকটা পুরনো ডাবওয়ালা নয়। সে লোকটা লুঙ্গি পরত, সঙ্গে রঙিন ফতুয়া। বোধহয় দেশে গেছে। তার অবর্তমানে নতুন লোকটা এখন হয়ত কিছুদিন ব্যবসাটা চালাবে।

এই নতুন লোকটা মোটেই ডাবওয়ালা টাইপের ষণ্ডা চেহারার নয়। রোগা, পরনে কালো ফুলপ্যান্ট, লাল স্পোর্টস গেঞ্জি। হাতে ঘড়িও রয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ স্টাইলিস গোঁফ, ব্যাকব্রাশ চুল। দেখে রাস্তার ফেরিওয়ালা বলে ভাবা কঠিন।

লোকটির কাছে গিয়ে একটা ডাব চাইলেন সহদেববাবু। ডাবের কাঁদির পাশে রাখা একটা চটের থলের মধ্যে লোকটা হাত ঢুকিয়ে কি খুঁজলো, তারপর বলল, 'ডাবকাটার কাটারি দেখছি নেই।'

সহদেববাবু পুরনো লোক, সমস্যাটা জানেন। ডাব বিক্রি হয়ে গেলে বিকেলে ফেরার সময় আগের লোকটা ওপাশের ষোলতলা বাড়িটার কেয়ারটেকারের কাছে দা জমা রেখে যেত। পরেরদিন সকালে সতেরতলার চিলেকোঠায় যেখানে ঐ কেয়ারটেকার থাকে সেখানে গিয়ে দা-টা ফেরত নিয়ে আসত। এর বিনিময়ে কেয়ারটেকারবাবু দৈনিক একটা ডাব বিনামূল্যে পান করতেন।

সহদেববাবু এই ব্যাপারটা নতুন লোকটিকে বললেন। লোকটি বলল, 'ও তাই বলুন। ডাবওয়ালা তো একথা আমাকে কিছু বলেনি।' তারপর, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে কাটারিটা নিয়ে আসছি', এই বলে লোকটা ষোলতলা বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যাওয়ার পর সহদেববাবুর খেয়াল হল পুরনো ডাবওয়ালাটা দেহাতি হিন্দিতে কথা বলত, আর এই লোকটা পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে।

এক হিসেবে খুশিই হলেন সহদেববাবু, তাহলে বাঙালী যুবকেরা এখন রাস্তায় ডাবের ব্যাপারির ব্যবসাও করছে। কিছু না করার চেয়ে, চুরি জোচ্চুরি করার চেয়ে এ কাজ ঢের ঢের ভাল। হাজার হলেও স্বাধীন ব্যবসা তো।

লোকটিকে মনে মনে প্রশংসা করলেন সহদেববাবু। কিন্তু লোকটি যে কাটারি আনতে গেল, সেই যে গেল আর তো ফেরে না।

এদিকে রাস্তায় ঐ বহুতল বাড়িটার সামনে কিসের যেন রীতিমত সোরগোল শুরু হয়েছে। চিৎকার হই-হল্লা ক্রমশই বাড়ছে।

ডাবের লোকটি নিশ্চয় ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। সহদেববাবু এবার একটু বিরক্ত হলেন, এই জন্যেই বাঙালীর ব্যবসা হয় না। ডাব বেচা বন্ধ করে রাস্তায় হট্টগোলে লিপ্ত হলে কচু ব্যবসা হবে।

রাগ করে, ডাব না খেয়েই সহদেববাবু বাড়ির পথ ধরলেন।

পথে যেতে যেতেই শুনলেন একটা ডাকাত মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ঐ ষোলতলা ফ্ল্যাট বাড়িটায় ঢুকেছিল, লিফটে করে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। আজকাল খুব সকালের দিকে এধরনের ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে এরকম রাহাজানি প্রায়ই হচ্ছে।

সুখের কথা, লিফটটা ছাড়তে না ছাড়তেই লোডশেডিং হয়ে ডাকাতটা লিফটের মধ্যে আটকিয়ে যায়।

রাস্তা থেকেই ডাকাতটাকে দেখা যাচ্ছে। একতলার, মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটু উঁচুতে লিফটের মধ্যে কোলাপসিবল গেটের ফাঁকে লোকটার গলা অবধি দেখা যাচ্ছে। পরনে কালো প্যান্ট, লাল গেঞ্জি, হাতে কাটারি।

জানা গেল, পুলিসে ফোন করা হয়েছে, এখনই পুলিস আসছে।

কিন্তু সহদেববাবুর কেমন মনে হল, এ তো সেই রাস্তার ডাবওয়ালাটা। লাল স্পোর্টস গেঞ্জি, কালো ফুলপ্যান্ট, হাতে কাটারি। নিশ্চয় লোকটা কাটারি নিয়ে নেমে আসছিল সেই সময় আটকিয়ে গেছে। ওঠার সময় আটকায়নি, তখন কাটারি কোথায় পাবে।

এখনই পুলিস এসে যাবে। লোকটাকে ধরে নিয়ে যাবে। সারাদিন ধরে ফুটপাথে ডাবের কাঁদি পড়ে থাকবে। লোকটা কবে ছাড়া পাবে কে জানে। এক এই বাড়ির কেয়ারটেকার ওকে রক্ষা করতে পারে।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে সহদেববাবুর মনে হল এ ব্যাপারে তাঁরও একটু দায়িত্ব আছে। তাঁর জন্যেই লোকটি কাটারি আনতে গিয়েছিল। গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে সহদেববাবুর ভালই সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পুলিসেরা সখের গোয়েন্দাদের মোটেই পছন্দ করে না। দুয়েকবার সহদেববাবু সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

আজকে গোলমালের মধ্যে মাথা গলালে পুলিস হয়ত তাঁকেও জড়াবে। তাঁর যে গোয়েন্দা দপ্তরে সরাসরি যোগাযোগ আছে, সেখানে যে তাঁর বেশ খাতির, তাঁর পক্ষে সব পুলিসকে সেটা জানানো সম্ভব নয়। তাছাড়া পটললাল পালের অন্তর্ধান রহস্যের অবিলম্বে সমাধান করতে হবে। সেই সূত্রে মিস্ জুলেখার সঙ্গে আজ বিকাল বেলাতেই আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সুতরাং আপাতত পুলিস এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই।

[দুই] মিস্ জুলেখা ওরফে শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্য

মিস্ জুলেখার নাম শুনে যদি কেউ ধরে নেন যে তিনি কোনও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণী তবে তিনি খুব ভুল করবেন।

প্রথমেই সেই ভ্রান্তি নিরসন করা দরকার।

ডাক্তার সহদেব শুকের মত মিস্ জুলেখারও একটি পূর্বনাম আছে। অবশ্য তিনি আদালতে এফিডেভিট করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নাম বদল করেননি। নাম বদলিয়েছেন নেহাতই পেশার দায়ে।

মিস্ জুলেখার আগের নাম ছিল শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্য।

রীতিমত ভটচাজ বামুন বংশের মেয়ে, গঙ্গাতীরের প্রসিদ্ধ পরিবারের। তিনি কিশোরী বা তরুণী এমনকি যুবতীও প্রায় নন। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে তাঁর, তিন পুত্রকন্যার জননী।

ক্লাস টেনে পড়ার সময় টেস্ট পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে গলির মোড়ের শ্রীহনুমান ব্যায়ামাগারের বালিকা শাখার ব্যায়াম শিক্ষক নারায়ণ ত্রিবেদীর সঙ্গে কুমারী লেখা ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর সামনে মালাবদল করেন এবং সিঁথিতে সিঁদুর আরোপ করে শ্রীমতী লেখা ত্রিবেদীতে পরিণত হন।

এরপর চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তিনটি পুত্রকন্যা তাঁর জন্মায়। কিন্তু ব্যায়ামবীর নারায়ণ ত্রিবেদী এর মধ্যেই সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন শেষরাতে লোটাকম্বল সম্বল করে একটা খবরের কাগজের ঠোঙায় রান্নাঘরের পেছনের ছাইগাদা থেকে কয়েক মুঠো ছাই নিয়ে পথে বেরিয়ে সেগুলো সারা শরীরে মেখে নিমতলা শ্মশানঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গার ধার ঘেঁষে রেলের লাইন বাঁচিয়ে আস্তানা গাড়েন। যে কোনও কারণেই হোক, সংসার ত্যাগের পর তিনি প্রায় এক বছর মৌনী অবস্থায় থাকেন। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় মৌনীবাবা বলে।

অনেক খোঁজখবর করে শ্রীমতী লেখা তিন ছেলেমেয়ের হাত ধরে নিমতলায় মৌনীবাবার কাছে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু মৌনীবাবা তখন কথা বলেন না, তদুপরি লেখাদেবীর রাগারাগি, কান্নাকাটি, শাপশাপান্ত সব কিছু উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট কলকেতে গাঁজা সেবন করে যান।

এদিকে, লেখাদেবীকে বেওয়ারিশ ভেবে মৌনীবাবার শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অন্তত তিনজন তাঁকে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

লেখাদেবীর গত্যন্তর ছিল না।

আর সেই থেকেই তাঁর পতন কিংবা অভ্যুত্থানের শুরু। ক্রমশ চিৎপুরের যাত্রাদলে সাইড পার্ট, নায়িকার সখির ভূমিকায় নৃত্যগীতাদি ও ছলাকলা—লেখাদেবী ধীরে ধীরে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে প্রমোদ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন।

এর পরে অবশ্য লেখা থেকে জুলেখা হতে বহু বছর লেগেছে। পার্কস্ট্রিটের বার হয়ে উত্তর কলকাতার প্রগতিশীল সামাজিক নাটকের মঞ্চে প্রায় উদোম হয়ে পৌঁছুতে বেশ পরিশ্রম হয়েছে।

তাছাড়া এর মধ্যে বহুবার স্বামীবদল করতে হয়েছে তাঁকে নিজের পেশারই স্বার্থে। তবে পুত্রকন্যা আর জন্মায়নি।

কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে, শ্রীমতী লেখা ওরফে মিস্ জুলেখা যখনই যে স্বামীর ঘর করেছেন, খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন, সতীত্বের সঙ্গে করেছেন।

ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের বাড়ির মেয়ে, আসলে সতীসাধ্বী হওয়া তাঁর রক্তে রয়েছে।

পটললাল পালের সঙ্গে তাঁর শেষ বিবাহ। এই মাত্র কয়েকমাস আগে। পূর্ববর্তী পতিদেবতা হরিলাল আগরওয়ালা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এর কিছুদিন আগেই। হরিলাল আগরওয়ালার প্রায় আশি বছর বয়েস হয়েছিল, তাঁর নিজের ঘর সংসার জমজমাট ছিল, শুধু মোহের বশে ধর্মান্তরিত হয়ে মিস্ জুলেখার পাণিগ্রহণ করেন।

তবে সে অন্য কথা।

প্রসঙ্গটা উঠল এই কারণে যে পটললাল পাল ছিলেন আগরওয়ালা সাহেবের টাউট। তিনিই আগরওয়ালা সাহেবকে জুলেখার কাছে নিয়ে আসেন এবং তাঁর বিবাহের সবরকম বন্দোবস্ত করেন।

পটললালের বয়স যদিও মিস্ জুলেখার থেকে অন্তত আট-দশ বছর কম হবে তবু আগরওয়ালার মৃত্যুর পর জুলেখা স্থির করলেন, আর বুড়োহাবরা নয়, কখন দুম করে মরে যায়। কিছু ঠিক নেই, তার চেয়ে পটললাল পালের মত চনমনে যুবকই স্বামী হিসেবে ভাল।

পটললালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে পুনর্বার হিন্দু হয়ে মিস্ জুলেখার মনে সম্প্রতি খুব ধর্মভাব দেখা দিয়েছে। এতকাল যা করেননি, এই বিয়ের পর থেকে তিনি শাঁখা সিঁদুর পড়তে লাগলেন। মঙ্গলবারে জয়মঙ্গল ব্রত পালন করে সারাদিন উপোস করতে লাগলেন, তাতে অবশ্য ভালই হল, কিছুটা অতিরিক্ত মেদ ঝরল, এ বয়েসে সেটা দরকার।

শুধু শাঁখা-সিঁদুর বা উপোস দেয়া নয়, প্রতি লক্ষ্মীবারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে মিস্ জুলেখা লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে লাগলেন। ফুল, চন্দন, প্রসাদ

সব কিছু দিয়ে লক্ষ্মী ঠাকরুনের পুজো হতে লাগল। খাটের পিছনে এক চিলতে জায়গায় একটা বার্নিশ করা কাঠের সিংহাসনে লক্ষ্মীর ফটো বসিয়ে প্রতিদিন সকালে ধূপধুনো, শঙ্খ রবে বন্দনা শুরু হল। সন্ধ্যারতিটা অবশ্য সম্ভব হত না, পেশার তাগিদে তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত, মঞ্চে বা বারে।

শাঁখা নিয়ে একটু অসুবিধে হয়েছিল। হাতে শাঁখা পরে ক্যাবারে নাচ একটু বেমানান। কিন্তু দেখা গেল উত্তর কলকাতার এ জাতীয় নাটকের দর্শকেরা এ সব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না, তাঁরা শাঁখা দেখতে আসেননি, তাঁরা নাটকও দেখতে আসেননি, তাঁরা মিস্ জুলেখাকে, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে এসেছেন দাম দিয়ে টিকিট কেটে। শাঁখা নিয়ে তাঁরা মোটেই বিচলিত নন, একেবারে মাথা ঘামালেন না।

সিঁথির সিঁদুর নিয়ে অবশ্য কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ মিস্ জুলেখা একটা সোনালি রঙের পরচুলা পরে নাচেন, তাতেই সিঁদুর সমেত মাথার চুল ঢাকা পড়ে যায়।

তবে আসল অসুবিধে হয়েছিল মিস্ জুলেখার কোমরের মাদুলি নিয়ে।

প্রথম বিয়ের মতই পটললাল পালের সঙ্গে এই সর্বশেষ বিয়েও কালীবাড়িতে মালাবদল করে হয়েছিল। তবে এবারে কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে নয়।

বারবার বিয়ে করার ব্যাপারটা মিস্ জুলেখার আর ভাল লাগছিল না। কালীবাড়ির দরজাতেই এক ত্রিকালসিদ্ধ সাধুবাবার আবির্ভাব হয়েছে। দীর্ঘ একহাজার আট বছর হিমালয়ের গুহায় কাটিয়ে আজ কয়েকদিন হল কালীঘাটে ফিরে এসেছেন। সাধুবাবাকে ঘিরে বেশ ভিড়।

কালীমন্দিরে মালাবদল করে বিয়েতে জুলেখা বেশ অভিজ্ঞা, তিনি তাড়াতাড়ি পটললালের সঙ্গে বিয়েটা সাঙ্গ করে সাধুবাবার কাছে ফিরে এলেন।

মহিলা বলে ভিড় ঠেলে এগোতে কোনও অসুবিধে হল না মিস্ জুলেখার। তাছাড়া বড়দিন বা ইংরেজি নববর্ষে এর চেয়ে অনেক বেশি গাদাগাদি মাতালের ভিড়ে পানশালায় তাঁকে নাচতে হয়, ভিড় ঠেলতে তিনি ভালই জানেন।

সাধুবাবার পাশেই তাঁর এক চেলা দাঁড়িয়ে, মধ্যবয়সী, সাধারণ চেহারা, সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরা। সাধুবাবার মত তাঁরও কপালে একটা বিরাট সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে। তবে সাধুবাবার মত তাঁর চেলার মাথাভর্তি জটা নেই কিংবা গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, বিশাল দাড়িগোঁফও নেই।

সে যা হোক এই চেলাঠাকুরকেই মিস্ জুলেখা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, সাধুবাবা কি সত্যিসত্যিই এক হাজার আট বছর হিমালয়ের গুহায় ছিলেন?'

চেলাঠাকুর বললেন, 'সে আমি বলতে পারব না। আমার দুই ছেলে পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পক্ষে যুদ্ধ করে ক্লাইভের তোপের মুখে প্রাণ দেয়। সেই থেকে আমি বিবাগী হয়ে হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। সেখানেই সাধুবাবার সঙ্গে দেখা। কিন্তু সে তো মাত্র দুশো বছর আগের কথা। হাজার বছরের কথা তো বলতে পারব না।'

হাজার বছর না হোক, দুশো বছর শুনেই সাধুবাবা সম্পর্কে জুলেখার মনে ভারি শ্রদ্ধার ভাব এল। সাধুবাবার রক্তাভ চোখসহ মুখটাও কেমন মায়াবি, যেন গতজন্মের চেনা।

মিস্ জুলেখা একেবারে সামনে গিয়ে সাধুবাবার দুই পা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস ভরে ডুকরিয়ে উঠলেন, 'বাবা, আমি আর পারছি না, আমি আর বিয়ে করতে পারছি না।'

সাধুবাবা এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। মিস্ জুলেখার কণ্ঠস্বর শুনে চমকিয়ে চোখ খুলে একবার মিস্ জুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওগো, বাবা নয়। বাবা নয়। আমি তোমার বাবা নই।' এই বলে চোঁচা দৌড় লাগালেন কালীঘাট রোডের দিকে, সমবেত ভক্তদের তোয়াক্কা না করে ভিড়ের মধ্যে সে এক সাঙ্ঘাতিক দৌড়।

আগেই মুখটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল, তারপরে কণ্ঠস্বর, অবশেষে এই পলায়নী দৌড় এ সবই মিস্ জুলেখা, না ঠিক মিস্ জুলেখা নয়, সেই প্রাক্তনী শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্য (ত্রিবেদী) মহোদয়ার খুবই চেনা।

মুহূর্তে মিস্ জুলেখা চিনতে পারলেন, এ তাঁর সেই প্রথম স্বামী শ্রীযুক্ত নারায়ণ ত্রিবেদী।

সেই নারায়ণ ত্রিবেদী যে আগেও যখন কোনওরকম বিপদে পড়ত এই রকম লাফ দিয়ে দৌড়ে পালাত।

তা পালাক, পালিয়ে যাক। তাতে এখন আর মিস্ জুলেখার দুঃখ বা আফসোস্ নেই। নারায়ণ ত্রিবেদীর প্রতি আর সামান্য কোনও টানও নেই জুলেখার মনে, শুধু একটু স্মৃতি বেদনা আছে। আর তাছাড়া এখন নারায়ণ যদি জানতে পারে যে লেখা নৃত্যগীত নিপুণা হয়েছে, ভাল আয় করছে, স্বচ্ছল হয়েছে, সে যেরকম চরিত্রের লোক হয়ত এসে এই এতদিন পরে ভাগ চাইবে।

কিন্তু, হায়রে অদৃষ্টের পরিহাস।

জীবনের একাদশতম বিয়ে করতে এসে সেই প্রথম স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যার সঙ্গে এখনও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি।

সাধুবাবার এই আকস্মিক পলায়নে চেলাঠাকুরও কেমন বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন, এখন একটু সামলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সাধুবাবার এরকম প্রায়ই হয়। ভগবান ডাকলে আর বসে থাকতে পারেন না। এভাবে দৌড়ে তাঁর কাছে চলে যান।' এই বলে চেলাঠাকুর সাধুবাবার পলায়ন পথের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন।

তারপর পুরনো কথার খেই ধরে তিনি মিস্ জুলেখাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি বলছিলেন যেন, বিয়ে করতে পারছি না। আর বিয়ে করতে পারছি না। ব্যাপারটা কি?'

এতদিন পরে নারায়ণ ত্রিবেদীকে, তাঁর প্রথম ভালবাসা, প্রথম স্বামীকে দেখে মিস্ জুলেখার মনের সাগরের তটে একের পর এক তিক্ত-মধুর স্মৃতির ঢেউ এসে আছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি একটু ঘোরের মধ্যেই ছিলেন। নারায়ণ ত্রিবেদী লোকটা সুবিধের নয়, কিন্তু সে তো তার তিন সন্তানের জনক। চেলাঠাকুরের প্রশ্নে মিস্ জুলেখার সম্বিৎ ফিরে এলো, তিনি চেলাঠাকুরকে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, ঠিকই বলেছিলাম, অনেকবার বিয়ে করা হয়ে গেল আমার। আর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না।'

চেলাঠাকুর বুদ্ধিমান লোক, পলাশির যুদ্ধে দুই ছেলেকে হারিয়ে তাঁর ক্ষণিক বুদ্ধিভ্রংশ

হয়েছিল, কিন্তু সেটা অনেকদিন কেটে গেছে। এতদিন পরে এখন তাঁর রীতিমত চনমনে বুদ্ধি।

আজ সাধুবাবা পালিয়েছেন। রোজগারের আশা কম। চেলাঠাকুর মিস্ জুলেখার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন, এই একজন মক্কেল পাওয়া গেছে, এর কাছে কিছু আশা করা যেতে পারে। দু-চার গণ্ডা যা হয়, তাই লাভ। না হলে আজ উপোস দিতে হবে।

তাই তাড়াতাড়ি চেলাঠাকুর মিস্ জুলেখাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কতবার বিয়ে করেছেন?'

মিস্ জুলেখা সলজ্জ কণ্ঠে জানালেন, 'তা প্রায় দশ-এগারোবার হবে।'

চেলাঠাকুর তাই শুনে বললেন, 'মাত্র দশ-এগারো বার! এ তো কলিতীর্থ কালীঘাট, এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকে পনেরো বিশবার করে বিয়ে করেছে। হামেশাই লোকে, মেয়ে লোকে বছরে দু-তিনবার করে বিয়ে করে। এমনকি একই মাসে একই মেয়েছেলেকে দুবার বিয়ে করতে দেখেছি।'

ভূমিকা শেষ করে চেলাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জুলেখাকে জানালেন, 'একটা অব্যর্থ বিবাহনিবারণী মাদুলি আমার কাছে আছে। এক মেমসাহেব নেবেন বলে কাশী থেকে আনিয়েছিলাম। তা সেই মেমসাহেব তো এলেন না। আপনি যদি নেন তো আপনার জন্যে নিয়ে আসি। সোয়া একান্ন টাকা, মানে একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা দাম পড়বে।'

মিস্ জুলেখা ভাবলেন যে কত পয়সাই তো নয়ছয় হয়, না হয় আরও সোয়া একান্ন টাকা গেল। দেখাই যাক না বিয়ে ভাঙাটা বন্ধ হয় কি না। তাছাড়া পটললালকে তাঁর খুবই পছন্দ।

মিস্ জুলেখার সম্মতি পেয়ে চেলাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা বেলোয়ারি দোকানে গিয়ে পেতলের রঙ করা একটা টিনের মাদুলি পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে আর দু'মিটার লাল ফিতে একটাকা দিয়ে কিনে ফেললেন। তারপর মন্দিরের উঠোন থেকে একটা পরিত্যক্ত শালপাতার ঠোঙা তুলে তার থেকে একটু পাতা ছিঁড়ে মাদুলির মধ্যে ঢুকিয়ে মিস্ জুলেখার কাছে ফিরে গেলেন। মিস্ জুলেখা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ খুলে পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা এক টাকার নোট আর একটা আধুলি খুঁজে বার করলেন।

সোয়া একান্ন টাকা থেকে পঁচিশ পয়সা বেশিই হয়ে গেল, এতে মাদুলির প্রভাবের কোনও হেরফের হবে কিনা জুলেখার এই প্রশ্নে চেলাঠাকুর বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক ধ্বক এই মাদুলির, পঁচিশ পয়সার তারতম্যে এর কি হবে?'

একথা শুনে জুলেখা চেলাঠাকুরের হাতে সাড়ে একান্ন টাকাই ধরে দিলেন। চেলাঠাকুরও খুশি হলেন, তাঁর মোট দেড় টাকা খরচ হয়েছিল, এতে পঞ্চাশ টাকা পুরো লাভ হল। বিয়ের পুরুতের সঙ্গে বিয়ের খরচ-খরচা নিয়ে বেশ একটা বচসা লেগেছিল পটললালের। মন্দিরের বারান্দাতেই আটকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এতক্ষণে গম্ভীরমুখে ফিরে এসে বললেন, 'পুরুতব্যাটা বলছে, ধর্মান্তরিতার পুনর্বিবাহ দশ-পনেরো টাকায় হবে না। একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সার কমে এ বিয়ে সিদ্ধ হবে না। তা সিদ্ধ হোক অসিদ্ধ হোক আমি সোয়া একান্ন টাকা দিচ্ছি না।'

পটললাল অতিশয় ছিঁচকে ব্যক্তি। তাঁর স্বভাবের এই দিকটা মিস্ জুলেখা জানেন। তিনি দেখলেন আবার সোয়া একান্নর ধাক্কায় পড়েছেন। কি আর করা যাবে, খুচরো টাকা

আর ছিল না, পটললালকে একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বিয়ে নিয়ে কিপটেমি কোরো না। যাও পুরুত ঠাকুরকে সোয়া একান্ন টাকা দিয়ে এসো।'

জুলেখা জানেন ফেরত আটচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা পটললাল তাঁকে কখনোই দেবেন না। তা হোক, পটললালের তো হাত খরচা লাগে। আগরওয়ালা মরে যাওয়ার পর এখন সে আর পয়সা পাবে কোথায়?

পটললালকে দেখে চেলাঠাকুর একটু গুম মেরে গিয়েছিলেন। লোকটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ের সোয়া একান্ন টাকার ওপরে আবার যদি মাদুলির সোয়া একান্ন টাকা টের পেতো, তা হলে হয়ত এ টাকাটা কেড়েই নিত।

এখন পটললাল মন্দিরের বারান্দার দিকে চলে যেতে হাতের মুঠো খুলে লাল ফিতে সমেত মাদুলিটা বের করে জুলেখার হাতে দিয়ে চেলাঠাকুর বললেন, 'মাদুলিটা অতি জাগ্রত। কখনও কাছ ছাড়া করবেন না। এই লাল ফিতেটা দিয়ে বেঁধে কোমরে ধারণ করবেন।

ইতিমধ্যে পটললাল ফিরে এসেছেন, তাঁকে দেখেই চেলাঠাকুর হাওয়া হয়ে গেলেন।

মিস্ জুলেখা এবং পটললাল মন্দিরের বাইরে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা চেনা ঠেকে চলে গেলেন বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপন করতে।

সেখানে পৌঁছেই বাথরুমে গিয়ে জুলেখা কোমরে লাল ফিতে লাগানো সেই মাদুলিটা বেঁধে ফেললেন। পটললালের মতিগতিতে তাঁর বিশ্বাস নেই, এই ঠেকে পটললালের চেনা অনেক মেয়ে আসে। তাদের কারও সঙ্গে ঝুলে পড়লেই বিপদ।

বয়সের দোষে মিস্ জুলেখার শরীরে একটু বেশি চর্বি জমেছে। নর্তকীদের শরীরের কোনও কোনও অংশে মাংসচর্বি একটু বেশি থাকলে দর্শকেরা পছন্দই করে।

কিন্তু মিস্ জুলেখার একটা ছোট নেয়াপাতি ভুঁড়িও হয়েছে। ফলে ঠিক সরাসরি কোমরের ওপরে লাল ফিতেয় বাঁধা মাদুলিটা রইল না। নাইয়ের একটু নিচে নেমে গেল, ফুল্ল কোমরবতী রমণীরা নাইয়ের নিচে যেখানে শাড়ি নামিয়ে পরেন সেই জায়গায় মাদুলিসহ ফিতেটার অবস্থান হল।

আগেই বলেছি সোনালি উইগ্ পরে সিঁদুরসহ মাথার চুল ঢেকে এবং হাতে শাঁখা রেখেও মিস্ জুলেখার তথাকথিত ক্যাবারে নৃত্যের কোনও অসুবিধে হয়নি, কিন্তু কোমরে মাদুলিটা বাধার সৃষ্টি করল। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বিশদ করে বলা উচিত।

কোমরে মাদুলি বাঁধার পর প্রথম সন্ধ্যায় মঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে মেকআপম্যান ঐ মাদুলিটি দেখতে পায় এবং আপত্তি জানায় যে মাদুলিটা রাখা যাবে না। খুলে ফেলতে হবে।

বলা বাহুল্য এতে সতীসাধ্বী মিস্ জুলেখা খুবই আপত্তি জানান। বস্ত্র উন্মোচনে তাঁর মোটেই আপত্তি নেই, কিন্তু মাদুলিটি রাখতে হবে।

খবর পেয়ে পরিচালক ও প্রযোজক আসেন। এঁরা দুজনে যমজ ভাই। পারিবারিক পুরনো রেড়ির তেলের ব্যবসা এঁদের। আজকাল রেড়ির তেলের চাহিদা নেই, ব্যবসা পড়ে গেছে। তাই এঁরা অবশেষে থিয়েটারের ব্যবসায় এসেছেন।

দুই ভাই এসে অনেকক্ষণ ধরে মিস্ জুলেখার চারপাশে ঘুরে ঘুরে মাদুলিটা দেখলেন। তারপর মিস্ জুলেখা আপত্তি করছেন না দেখে সাহস সঞ্চয় করে হাত দিয়ে মাদুলিটা

যাচাই করতে লাগলেন।

ওঁদের মুখচোখ এবং নৈতিক চরিত্রের মানের কথা ভেবে মিস্ জুলেখা শঙ্কিত বোধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন এই প্রস্তাবে যে ঐ লালফিতের সঙ্গে দুটো শোলার কদম ফুল ঝুলিয়ে মাদুলিটা ঢেকে দেওয়া হবে।

তদবধি কোমরের লালফিতেয় নাভির ঠিক নিচে দুটো শোলার কদম ফুল নৃত্য দৃশ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে কদমদুটো লাগানোর সময় বৃদ্ধ মেকআপম্যান দিল মহম্মদ বড় বেশি সময় নেয়। কোনও কোনও দিন প্রযোজক ও পরিচালক কদমফুল লাগানোর সময় ফুল দুটো দিল মহম্মদ ঠিকমতো লাগাচ্ছে কি না তা দেখার জন্যে উপস্থিত থাকেন। সঙ্গে অনেক সময় তাদের সাঙ্গপাঙ্গও থাকে। মিস্ জুলেখার নাচের চেয়ে তাঁর সাজগোজ করার, শোলার কদম ফুল ঝোলানোর ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠ মহলে এখন অনেক বেশি জনপ্রিয়।

[তিন] আবার ডাঃ শুক

আবার এসেছে গন্ধমাদন
চারদিক মাতে সৌরভে।
কৌ-কৌ-কৌ কাক ও কুকুর
বাড়ি ভরে যায় কৌরবে॥

শুধু গোয়েন্দাগিরি বা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই নয়। শ্রীযুক্ত নকুল শুকুল ওরফে সহদেব শুক একজন শৌখিন সঙ্গীতকার।

অদ্যাবধি তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে যেগুলি তাঁর নিজের পছন্দ হয়েছে সেগুলিতে নিজেই সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন।

এই গানগুলি কেমন সে বিষয়ে আমার মত সঙ্গীত-মূর্খ ব্যক্তির কোনও অভিমত না দেয়াই ভাল। তবে বেলেঘাটার 'দি নিউ ডেমোক্রেটিক মিউজিক ক্যাসেট কোম্পানি' এই পুজোতেই তাঁর একটা গানের সঙ্কলন প্রকাশ করবে, তার জন্যে সহদেববাবুব নগদ সাত হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

তবে তাতে দুঃখ নেই। মিস্ জুলেখার স্বামীকে খুঁজে বার করতে পারলে কিছু আসান হবে।

মিস্ জুলেখাকে সহদেববাবু কেসটা হাতে নেয়ার পরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার কি প্রাপ্য?'

মিস্ জুলেখা ভ্রূভঙ্গিসহ শরীর নাচিয়ে বলেছিলেন, 'আমার দু মাসের নাচ।'

তা, সহদেববাবু খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, মিস্ জুলেখার প্রতি মাসের নাচের আয় পাঁচ হাজার টাকা। সুতরাং দুমাসে দশ হাজার টাকা, সে কিছু কম নয়। গানের ক্যাসেটের পয়সা জুগিয়েও হাতে কিছু থাকবে।

কিন্তু সহদেববাবুর কলমে এবার গান মোটেই আসছে না।

সেদিন কর্পোরেশনের একটা ময়লা ভর্তি লরি চাকা খুলে কড়েয়ারোডের মোড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। বীভৎস গন্ধে সারা পাড়া বাহাত্তর ঘণ্টা আচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে

ময়লাগুলো একাএকাই কি করে ঝোড়ো হাওয়ায়, বৃষ্টির জলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে গন্ধ কমতে লাগল, তবে লরিটা, এখনও হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। পতনের দিন সন্ধ্যা হতে না হতেই লোডশেডিং যেই হল, কারা যেন কোথা থেকে এসে ভাঙা এবং ভাল চাকাগুলো সব ঝটাঝট খুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে লরিটা কচ্ছপের মত পড়ে আছে।

সেই লরিটাকেই স্মরণ করে হয়ত এই 'আবার এসেছে গন্ধমাদন' গানটির সূচনা তবে এই গানটিতে কৌরব শব্দটি যুগ্ম ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম কৌরব মানে হলো কাকের কৌ কৌ, কুকুরের কৌ কৌ এই সব রব, ময়লা ফেলার লরি ভেঙে পড়ায় কাক ও কুকুরের আনন্দ ধ্বনি।

আর দ্বিতীয় কৌরব হলো; পাণ্ডব কৌরবের কৌরব। মহাভারত বিশারদ পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবে পাণ্ডব কৌরবের ব্যাপারটা সহদেববাবুর মজ্জাগত।

সহদেববাবু জানেন তিনি একাই দুই পাণ্ডব, নকুল এবং সহদেব এবং কৌরবেরা তাঁর পরম শত্রু, যাকে বলে জ্ঞাতি শত্রু।

'বাড়ি ভরে যায় কৌরবে', এই পংক্তিটা লেখার পর থেকেই কেমন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন সহদেব। কৌরবে মানে শত্রুতে যদি বাড়ি ভরে যায়, তা হলে তো সর্বনাশ।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসব শৌখিন চিন্তার অবকাশ নেই সহদেব ডাক্তারের। বাইরের চেম্বারে অন্তত দশজন রোগী অপেক্ষা করছে। দশজনই ইঁদুরের কামড়ের রোগী।

সম্প্রতি কলকাতায় ইঁদুর খুব বেড়ে গেছে, শহরতলীতে আরও। বিভিন্ন ইঁদুর মারার ওষুধে তাদের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, বরং বৃদ্ধি হচ্ছে, ইঁদুর মারার ওষুধ খেয়ে খেয়ে তারা ক্রমশ বেশি দুর্দান্ত, বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে। মানুষদের তারা আর আজকাল একেবারেই ভয় পায় না।

কলকাতায় ডাক্তারি করতে এসে বুদ্ধিমান সহদেববাবু একথা অনুধাবন করেছিলেন যে এখানে সব বিষয়ের ডাক্তার হয়ে ব্যবসা বা পসার জমাতে দেরি হবে, একেবারে নাও হতে পারে। তার চেয়ে কোনও একটা জরুরি বিষয়ের ডাক্তার হলে তাড়াতাড়ি পসার জমবে, খ্যাতি ও অর্থ হবে।

যে সময় সহদেববাবু এই সব ভাবছিলেন সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা পরপর দুটি ইঁদুর, একটি নেংটি ইঁদুর এবং একটি ছুঁচো যথাক্রমে তাঁর বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল এবং ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়িয়ে দেয়।

বাধ্য হয়ে তিনি পরদিন সকালে বাড়ির কাছেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে যান। সেখানে ইমারজেন্সি আউটডোরে দেখেন প্রায় সবাই ইঁদুরের কামড়ের রোগী।

এরপর বাড়ি ফিরে এসে ইঁদুর ও ইঁদুরের কামড়, ইঁদুরের কামড়ে বিষ আছে কিনা, তার প্রতিক্রিয়া কি হয়, প্রতিষেধকই বা কি, এই সব বিষয়ে বিভিন্ন চিকিৎসাগ্রন্থ সংগ্রহ করে গভীর পড়াশোনা করেন।

তারপর দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন, বাড়ির সামনেও সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেন, তাতে বড় বড় হরফে লেখা,

ইঁদুরের দংশনের অব্যর্থ উপশম
মাত্র তিন ডোজে উপকার

বিফলে মূল্য ফেরত
ডাঃ সহদেব শুক
কড়েয়া রোড, কলিকাতা

এই বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ডের দুপাশে দুটি হিংস্র ইঁদুরের ছবি আঁকা, সেগুলো প্রায় কুমীরের মত বড় এবং খরদন্তী।

ইঁদুরের দংশনের চিকিৎসায় সহদেববাবুর বেশ হাতযশ হয়েছে।

আজকের দশজন রোগীকেই তিনি যত্ন করে দেখলেন ও ওষুধ দিলেন। কিন্তু শুধু ওষুধ দিলে তো কাজ হয় না, ওষুধ খাওয়ার সময় একটা গোপন মন্ত্রও মনে মনে বলতে হয়।

বলা বাহুল্য সেই গোপন মন্ত্রটিও ডাঃ সহদেব শুকেরই রচনা। একটু গোলমেলে ছন্দের এই মন্ত্রটি হল,

"শুক বলে,
ইঁদুর কি জিনিস!
শুক বলে,
ইঁদুরের দাঁতে বিষ।
শুক বলে,
ভয় না পাবিস।
শুক বলে,
অহর্নিশ, অহর্নিশ,
অহর্নিশ!"

অহর্নিশ মানে দিন ও রাত্রি, মানে চব্বিশ ঘণ্টা। এইটুকু বুঝলেই মন্ত্রের মর্মার্থ ধরা যায়।

'ইঁদুরের বিষে ভয় নেই। ডাক্তার সহদেব শুক বলছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।'

তিন ডোজ ওষুধ আর তার সঙ্গে স্বরচিত এই মন্ত্র, বিনিময়ে রোগী প্রতি বত্রিশ টাকা। সকালবেলাতেই তিনশো বিশ টাকা আয় হয়ে গেল।

ইঁদুর দংশনের চিকিৎসা করে ভাগ্য ফিরে গেছে সহদেববাবুর। তাছাড়া এই ইঁদুর দংশনের চিকিৎসার সূত্রেই তাঁর শখের গোয়েন্দাগিরিতে প্রবেশ। পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তরের ডাকসাইটে উপপ্রধান সাহেবকে খোদ লালবাজারে দপ্তরের মধ্যে একটা ছুঁচো কামড়িয়ে দেয়। সেই চিকিৎসার সূত্রে ডাঃ সহদেব শুককে তলব করা হয়েছিল পুলিস দপ্তরে। সেখানে দংশিত উপপ্রধান সাহেবের ক্ষতস্থান দেখে ডাক্তার সহদেব শুক বলেন, আসল ছুঁচো নয়, কোনও নকল প্লাস্টিকের ইঁদুরের মারাত্মক কেমিক্যাল লাগানো নকল বিষদাঁতের কামড়।

সবাই সহদেববাবুর বিশ্লেষণ হৃদয়ঙ্গম করার আগে উপপ্রধান সাহেব বিষক্রিয়ায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেলেন, তাঁর নাক মুখ দিয়ে সাদা ফেনার মত গ্যাঁজলা বেরোতে লাগল। তাঁকে তখনই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে তাঁর প্রাণরক্ষা করা হয়।

এদিকে দপ্তরেরই একপাশে স্প্রিং লাগানো প্লাস্টিকের ইঁদুরটি বড় কাঠের আলমারির নিচে পাওয়া যায়। তখনই অনেকের খেয়াল হয় যে উপপ্রধান সাহেব আজ সকালবেলাতেই প্লাস্টিক কিং মোহন মেহতাকে বহুক্ষণ জেরা করেছেন কালো টাকার ব্যাপারে। সঙ্গে সঙ্গে মোহন মেহতার বাড়িতে ও অফিসে সার্চ করা হল, কয়েক হাজার বিষাক্ত প্লাস্টিকের ইঁদুর বেরোল এই দুই জায়গা থেকে এবং এর পর থেকে সবাই জেনে গেল যে কলকাতায় সব ইঁদুর কামড়ের কেসই আসল ইঁদুরের কামড় নয়, অনেকগুলিই প্লাস্টিকের নকল বিষাক্ত ইঁদুরের কাজ।

সে যা হোক এর পর থেকে গোয়েন্দা দপ্তর ছোটবড়, নানারকম গোলমেলে কেসে সহদেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে লাগলেন। এবং সেই সূত্রেই মিস্ জুলেখা তাঁকে গতকাল যোগাযোগ করেন। পুলিস দপ্তর স্বামী চুরির, বিশেষত মিস্ জুলেখার স্বামী চুরির, পটললাল পালের মত স্বামী চুরির কেস সহজে হাতে নিতে চায়নি, তাঁরাই ডাক্তার সহদেব শুককে অনুরোধ করে কেসটা নিতে।

কেসটা গতকালই নিয়েছেন সহদেববাবু। বিকেলবেলাতেই থিয়েটার হলে যাওয়ার পথে মিস্ জুলেখা সহদেববাবুর চেম্বারে এসেছিলেন।

সহদেববাবু ধরে নিয়েছিলেন এটাও কোনও ইঁদুরের কামড়ের কেস। তাই সরাসরি মিস্ জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায় কামড়েছে?'

মিস্ জুলেখা বলেন, 'কামড়ায় টামড়ায়নি। চুরি গেছে।'

ঠিক এই সময়েই পুলিসের ফোন আসে। তাঁরা কেসটির কথা উল্লেখ করে জানান যে মিস্ জুলেখাকে তাঁরাই পাঠিয়েছেন।

তখন মিস্ জুলেখার হাতে মোটেই সময় ছিল না। নাটকের সময় হয়ে গেছে। তিনি ডাঃ সহদেব শুককে অনুরোধ করলেন তিনি যদি এই সন্ধ্যায় সরোজিনী মঞ্চে একবার আসেন, তাহলে সহদেববাবুর 'যৌবনের লীলা' নাটকটি তৎসহ উপরি পাওনা মিস্ জুলেখার নাচও দেখা হয়, আর সেই সঙ্গে ইন্টারভ্যালের সময় পটললাল পালের চুরি যাওয়ার কাহিনীও শুনতে পারেন। থিয়েটারের গেটে গিয়ে তিনি যেন দারোয়ানকে মিস্ জুলেখার কথা বলেন, তা হলে দারোয়ান তাঁকে সরাসরি গ্রীনরুমে নিয়ে যাবে, সেখানেই উইংসের আড়ালে একটা চেয়ারে বসে নাটকটা দেখতে পারবেন।

তাই হল, মিস্ জুলেখা চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে একটু সাজগোজ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে সহদেববাবু সরোজিনী মঞ্চে পৌছালেন, সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান তাঁকে গ্রীনরুমে নিয়ে গেল।

সেখানে বেশ ভিড়। প্রযোজক-পরিচালক সমেত আরও বেশ কয়েকজন মিস্ জুলেখার মেক-আপ করা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং মেক-আপ-ম্যান দিল মহম্মদকে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন। একটু পরেই মিস্ জুলেখার নাচের সিন।

শরীরে তরঙ্গ তুলে, চোখ নাচিয়ে মিস্ জুলেখা সহদেববাবুকে স্বাগত জানালেন। তারপর পরীর মত হাল্কা নীল রঙের ওড়না উড়িয়ে এক লাফে গিয়ে পড়লেন স্টেজের ঠিক মাঝখানে এবং মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন সেই নীল ওড়না, তারপর সেকি তাথৈ তাথৈ নৃত্য, এই ভারি শরীরে এমন কসরত করা যে সম্ভব চোখে না দেখলে

বিশ্বাস করা কঠিন।

দর্শকবৃন্দ চেয়ারের হাতলে চাঁটি মেরে 'আহা, আহা, মার হাব্বা, মার হাব্বা, মর গিয়া, জান লে লিয়া' বলে চেঁচাতে লাগল। মঞ্চ জুড়ে সে কি দাপাদাপি মিস্ জুলেখার, দৌড়ে, লাফিয়ে, ঘুরপাক খেয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে, উপুর হয়ে বসে নীল আলো, লাল আলো, বেগুনি আলোয় নাচ করতে লাগলেন মিস্ জুলেখা। শেষের দিকে একদম উদ্দাম হয়ে গেলেন, এতক্ষণ কোমরের দোলায় কদম ফুল দুটো বাত্যাতাড়িত বৃক্ষশাখায় ফলের মত আন্দোলিত হচ্ছিল, এবার সে দুটো মঞ্চের ওপর খসে পড়ে গেল।

দর্শকরা অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ পয়সা ছুঁড়তে লাগল, শিস্ দিতে লাগল। কদম ফুল দুটি মঞ্চের ওপর থেকে মিস্ জুলেখা পদাঘাতে হলের দিকে বল কিক্ করার মত করে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কদম ফুল কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে হলের ভেতরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ড্রপসিন নেমে এল সেই মুহূর্তে।

বদন মণ্ডলে, সুডৌল বাহুতে এবং শরীরে সর্বত্র স্বেদবিন্দু, উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, নাক ফুলে ফুলে উঠছে, মিস্ জুলেখা উইংস দিয়ে বেরনোর পথে সহদেববাবুর বাহু আকর্ষণ করে পাশের একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করলেন।

সহদেববাবুর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, তিনি জীবনে এমন অবস্থার সম্মুখীন এর আগে কখনও হননি।

কিন্তু তেমন গুরুতর কিছু ঘটল না। মিস্ জুলেখা একটু দম নিয়ে তারপর চোখেমুখে একটা মোহময়ী ভাব এনে মদির দৃষ্টি মেলে সহদেববাবুকে বললেন, 'নাচ কেমন দেখলেন?'

তারপর সহদেববাবুর থতমত খাওয়ার অবস্থা দেখে বললেন, 'আসলে জানেন এই নাটকের স্টোরিটা খুব প্যাথেটিক, নাচটা হল একটা কলেজে পড়া ভদ্রঘরের মেয়ের, সে এম এ পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না, সেই টাকা যোগাড় করার জন্যে হোটেলে নাচছে।'

ইতিমধ্যে মিস্ জুলেখার নির্দেশানুসারে দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক এসেছে, সত্যিই কোল্ড, বেশ ঠাণ্ডা।

সেই ঠাণ্ডা পানীয় স্ট্র দিয়ে ঢকঢক করে খেতে খেতে মিস্ জুলেখা বললেন, 'আমার পরের নাচ আধঘণ্টা পরে। সে নাচটাও খুব দুঃখের। মেয়েটা পরীক্ষা ভালই দিয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার খাতা যে লোকটা দেখছে সে লোকটা শালা এক নম্বরের লম্পট। সে বলেছে আমাকে ড্যান্স দেখাতে হবে না হলে আমি তোমাকে পাস করাব না। বাধ্য হয়ে মনের দুঃখে মেয়েটা ড্যান্স করছে।'

এতক্ষণ সহদেববাবু কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'তাই নাকি?'

মিস্ জুলেখা বললেন, 'যাক এসব কথা। এবার পটলের ব্যাপারটা বলি।'

মিস্ জুলেখার কাছ থেকে যতটুকু জানা গেল তা হল এই রকম।

পটল অর্থাৎ পটললাল পালকে মিস্ জুলেখা অনেকদিন ধরেই চেনেন। তাঁর পূর্বতন স্বামী আগরওয়ালার সঙ্গে পরিচয় ও ধর্মান্তরিত করে বিয়ে দেওয়া দুটোতেই পটললালের মুখ্য ভূমিকা ছিল, সে ছিল আগরওয়ালার গোপন কাজের সহায়ক।

যদিও পটললাল বয়েসে অনেক ছোট, আগরওয়ালার মৃত্যুর পর পটলকেই বিয়ে করেন মিস্ জুলেখা। কিন্তু তখন তিনি জানতেন না যে পটললাল কপর্দকশূন্য।

তা হোক, পটললালকে তিনি ছাড়তে চান না। বিয়ে করে করে তিনি হন্দ হয়ে গেছেন। পটললালের খরচ খরচা সবই তিনি চালাবেন। কালীঘাটের মা কালীর কাছে প্রার্থনা করে মাদুলি নিয়ে এসেছেন যাতে তাঁকে এরপরে আর বিয়ে করতে না হয়।

এই পর্যন্ত বলে মিস্ জুলেখা কোমরের মাদুলিটা হাত দিয়ে দেখালেন, সহদেববাবু বললেন, 'থাক, থাক।'

এবার মিস্ জুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'পটল, আমার পটললাল চুরি হয়ে গেল।'

সহদেববাবু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'চুরি হয়ে গেল? চুরি হয়ে গেল মানে কি? একটা সদ্য মানুষ, আস্ত মানুষ চুরি হয়ে যায় কি করে?'

চোখের জল, স্টেজ থেকে কুড়িয়ে আনা সেই নীল ওড়নাটা দিয়ে মুছে মিস্ জুলেখা বললেন, 'তাই তো হল, শয়তানী রেশমকুমারীর কাজ ওটা।'

ব্যাপারটা প্রথমে না বুঝলেও ধীরে ধীরে সহদেববাবু মিস্ জুলেখার কাছ থেকে জানতে পারলেন রেশমকুমারী হল যাত্রার নায়িকা। মিস্ জুলেখা যেমন মোটেই মিস্ নন, তেমনিই শ্রীমতী রেশমকুমারী কুমারী নন, তিনি পটললালের প্রথমা স্ত্রী।

একেবারে সেই পরশুরামের ভূষণ্ডির মাঠের কাহিনী। যখন পটললাল ও রেশমকুমারী একত্রে থাকতেন, দৈনিক অলস, অকর্মণ্য পটললালকে রেশমকুমারী জুতো পেটা করতেন। পটললালের বুকে, পিঠে হাই হিলের লাঞ্ছনা চিহ্ন মিস্ জুলেখা অনেক দেখেছেন। পটললাল যখন এসে কেঁদে পড়তেন, অনেক নারকেল তেল, মলম সে সব ক্ষতস্থানে মিস্ জুলেখা লাগিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আজ দু-আড়াই বছর পটললাল-রেশমকুমারীর ছাড়াছাড়ি। রেশমকুমারীর সোনার নাকছাবি চুরি করে সেই যে পটললাল পালিয়ে ছিলেন তারপর রেশমকুমারী তাঁর আর খোঁজখবর নেননি।

এখন এতদিন পরে মিস্ জুলেখা পটললালকে মালা বদল করে কালী সাক্ষী রেখে জীবনসঙ্গী করার পর আবার পটললালের ওপরে রেশমকুমারীর দৃষ্টি পড়েছে।

কিন্তু মিস্ জুলেখাই বা তাঁর দাবি ছাড়বেন কেন? রীতিমত সোয়া একান্ন টাকার ধর্মবিয়ে। পটললালের ওপর তাঁর অধিকারই বা কম কি?

এই নিয়ে রেশমকুমারীর সঙ্গে মিস্ জুলেখার অনেক বচসা, চিৎকার-চেঁচামেচি, হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে পটললালের মনোভাব এতদিন কিছুই বুঝতে পারেননি মিস্ জুলেখা।

[চার] পটললাল পাল

পটললাল পালের চরিত্র বর্ণনার খুব বেশি প্রয়োজন নেই।

গতদিনের মিস্ জুলেখার ঘটনাটা বললেই বেশ কিছুটা বোঝা যাবে।

সাধারণত নাচের পর মঞ্চ থেকে দর্শকদের ছুঁড়ে দেওয়া খুচরো টাকাপয়সা মিস্ জুলেখা কুড়োন না। বৃদ্ধ প্রম্পটার ড্রপসিন পড়ার পর সেগুলো কুড়িয়ে কিছু নিয়ে নেয়, কিছু মিস্ জুলেখাকে দেয়।

কিন্তু দুদিন আগের সন্ধ্যায় এক মাতাল দর্শক নাচের দৃশ্যে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

সে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে প্রথমে খুচরো পয়সা, তারপরে দু-টাকা নোট, তারপরে আরও বড় নোট এবং অবশেষে দুটো একশ টাকার নোট মঞ্চে ছুঁড়ে দেয়।

একশ টাকার নোট দুটো ফেলে আসেননি মিস্ জুলেখা। ড্রপসিন পড়ার পর ঐ নোটদুটো নিজেই কুড়িয়ে আনেন এবং তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখেন।

রাতে আর খেয়াল ছিল না। শোয়ার ঘরের টেবিলের ওপরে ভ্যানিটি ব্যাগটা ফেলে রেখে ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়েছিলেন। বিছানার অন্য প্রান্তে পটললাল আগে থেকেই নিদ্রামগ্ন ছিলেন।

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে মিস্ জুলেখা দেখলেন পটললাল বাড়িতে নেই। বীণাপানি নামে তাঁর কাজের লোককে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'জামাইবাবু একটু আগে বেরিয়েছে।'

পটললালের যে কিঞ্চিৎ হাতটানের স্বভাব আছে সেটা বহুকাল ধরেই মিস্ জুলেখার বিলক্ষণ জানা। চট করে তাঁর মনে পড়ে গেল গতকাল রাতের সেই দুটো একশ টাকার নোটের কথা।

যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। একশ টাকার নোট দুটো ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে উধাও, সেই সঙ্গে পটললালও উধাও হয়েছেন।

সাধারণত, এ রকম ক্ষেত্রে দুয়েকদিন বাদে পটললাল ফিরে আসেন। কিন্তু এদিন বিকেলেই পটললাল ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল পটললালের পাঞ্জাবির কলার চেপে বলশালিনী মিস্ জুলেখা তাঁর সবকয়টি পকেট সার্চ করলেন।

বুক পকেট থেকে বেরোল সেকরার দোকানের একটা রসিদ, "শ্রীলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস, প্রোঃ হারাধন রায়"। রসিদটা পটললাল পালেরই নামে, লেখা আছে লাল পাথর বসানো নাকছাবি বাবদ অগ্রিম দুশ টাকা।

রসিদটা দেখামাত্র মিস্ জুলেখার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নাকছাবির অগ্রিম রসিদ দেখেই বুঝতে পারলেন এটা সেই শয়তানী রেশমকুমারীর জন্যে বায়না দেওয়া হয়েছে। একদা রেশমকুমারীর নাকছাবি চুরি করে পটললাল পালিয়েছিলেন। এখন সেই নাকছাবি উপহার দিয়েই আবার ঘনিষ্ঠতা শুরু হচ্ছে।

রেশমকুমারীর মত কথায় কথায় জুতো চলে না মিস্ জুলেখার। তবে হাত ভালই চলে। গোটা কয়েক থাবড়া মেরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শোবার ঘরের পাশে বক্সরুমে পটললালকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন। থাকুক এই গরমে একটা রাত এই অন্ধকূপে বন্দী। এতে যদি বিশ্বাসঘাতকের কিছু শিক্ষা হয়।

পটললালকে বক্সরুমে আটকিয়ে রেখে মিস্ জুলেখা নাচতে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন রাত দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ। পটললালের অধঃপতনে মর্মাহত হয়ে আজ বহুদিন পরে তিঁনি এক বোতল দিশি মদ টেনেছেন। আজ দিল মহম্মদ বা অন্য কাউকে তাঁর কোমরের মাদুলি নিয়ে গোছগাছ করতে বাধা দেননি।

মিস্ জুলেখা বাড়ি ফিরলেন রীতিমত স্খলিত চরণে। প্রায় টলতে টলতে। তখনও বক্সরুমের বাইরের শেকলটা আটকানো।

ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুয়ে মিস্ জুলেখা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু

কিছুক্ষণ পরে বক্সরুমের মধ্যে নানারকম খুটখাট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন পটললাল বন্ধ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। জানলাহীন বন্ধ ঘরে এই গুমোটে হয়ত পটললালের দম আটকিয়ে আসছে।

পটললালের ওপর এতক্ষণে একটু মায়া হল মিস্ জুলেখার। তিনি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বক্সরুমের দরজাটার শিকলটা খুলে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। ঘরের মধ্যে থেকে চকিতে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি কিন্তু মোটেই পটললাল নন। সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা এক দশাসই মহিলা বেরলেন ঘর থেকে। কিঞ্চিৎ মত্ত হলেও শ্রীমতী জুলেখার জ্ঞান বেশ টনটনে থাকে, তিনি তাড়াতাড়ি দরজার পাশে দেয়ালে আলোর সুইচটা জ্বালিয়ে দিলেন।

আলো জ্বলতে মিস্ জুলেখা দেখতে পেলেন যে মহিলাটি আর কেউ নন যাত্রাসুন্দরী রেশমকুমারী। মুহূর্তের মধ্যে একটি সবল বাহুর চড়ে মেঝের ওপরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন মিস্ জুলেখা। পড়ার মুহূর্তে দেখলেন রেশমকুমারীর পিছু পিছু প্রথমে পটললাল এবং তাঁর পিছে কাজের মেয়ে বীণাপানি বেরল।

মনে হল বাইরে বারান্দায় আরও দুয়েকজন লোক রয়েছে। রেশমকুমারী পটললালের হাত ধরে দৌড়ে গেলেন। সিঁড়িতে বেশ কয়েক জোড়া ছুটে যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন মিস্ জুলেখা। তাঁর মুখেচোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে বীণাপানির পনের মিনিট লাগল। জ্ঞান ফিরে এলে বীণাপানির মুখে শুনলেন যে রাত আটটা নাগাদ কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক নিয়ে রেশমকুমারী এসে বীণাপানিকে ভয় দেখিয়ে জেনে নেন পটললাল কোথায়। তারপর বীণাপানিকে নিয়ে তিনি ঐ বন্ধ ঘরে ঢুকে যান এবং পটললালকে বলেন, 'আজ জুলেখাকে শিক্ষা দেব' আর বীণাপানিকে বলেন, 'একদম চুপ করে থাক্।'

মিস্ জুলেখা থাকেন মৌলালির কাছে একটা পুরনো গলিতে। জায়গাটা কড়েয়া রোড থেকে তেমন দূরে নয়। এক ট্রামেই যাওয়া যায়।

আজ মিস্ জুলেখার শো নেই। আজ তাঁর নাটকের অফ ডে। এ সব দিনে অনেক সময় তিনি সন্ধ্যার দিকে কোন বারে গিয়ে এক্সট্রা নাচিয়ে হিসেবে কিছু উপরি উপার্জন করেন। কিন্তু স্বামী পটললালের শোকে তিনি ক্রমশ উথালপাতাল হয়ে উঠেছেন। উপরি রোজগারে তাঁর রুচি নেই। তিনি প্রায় শয্যাশায়িনী হয়ে রয়েছেন।

মিস্ জুলেখার ওখানে সন্ধ্যার দিকে যাওয়ার কথা ডাক্তার সহদেব শুকের। কিন্তু তাঁর আর তর সইছে না। গরমের দিনের দীর্ঘ বিকেল, দিনের আর অন্ত নেই। সাতটার আগে সন্ধ্যা হবে না।

বহুদিন ধুতি পাঞ্জাবি পরেননি সহদেববাবু। আজ বিকেল পাঁচটা থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন আর গরমে গলগল করে ঘামছেন।

বাইরের ঘরে পাখার নিচে বসে একটা আলগা তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এসেছিল ডাক্তার সহদেব শুকের, সেই তন্দ্রার ঘোরে আবছায়া স্বপ্নে দেখলেন কালকের মঞ্চের সেই নীল ওড়নাটা একটা ফুলের মালার মত গলায় জড়িয়ে মিস্ জুলেখা তাঁর কাছে এসে তাঁর গলায় সেই নীল ওড়নার মালাটা পরিয়ে দিয়ে বলছেন, 'তুমিই আমার পটললাল।'

তাড়াতাড়ি সুখস্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে সহদেববাবু ভাবলেন, দেরি হয়ে গেল। কিন্তু দেয়ালঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন তখনও ছটা বাজতে পাঁচ সাত মিনিট বাকি। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে এসে আবার বসলেন তিনি। একটু আগের স্বপ্নের আমেজটা তখনও তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে। নীল ওড়না কি করে ফুলের মালা হয়ে গেল সেই কথা ভাবতে লাগলেন সহদেববাবু।

অথচ তাঁর এখন ভাবার কথা পটললালের অন্তর্ধান নিয়ে, রহস্যজনকভাবে পটললালের গায়েব অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে।

দুঃখের বিষয় পটললাল বিষয়ে কিছুই ভাবতে পারছেন না গোয়েন্দাপ্রবর সহদেব শুক। পটললালের কথা ভাবার আগেই মিস্ জুলেখার লাস্যময়ী নৃত্যদশা ফিরে আসছে তাঁর অক্ষিপটে। তাঁর সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে নীল ওড়নার ছায়ায়।

কিন্তু পটললালের ব্যাপারটা নিয়েই তো ভাবতে হবে। মিস্ জুলেখা সহদেববাবু গেলে পরেই জানতে চাইবেন, 'কতদূর কি করলেন? আমার পটললাল, প্রাণের পটললাল কোথায়?'

যা হোক, কোনওভাবে সোয়া ছটা বাজল। বাইরে রোদ মিলিয়ে এসেছে। সুসজ্জিত সহদেব শুক বাড়ি থেকে বেরোলেন। মোড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে মৌলালিতে নামলেই মিস্ জুলেখার ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন।

কিন্তু সহদেববাবু আর দেরি করতে পারছেন না। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সামনে একটা ট্যাক্সি পেয়ে সেটাতেই উঠে বসলেন।

ট্যাক্সিটা মল্লিকবাজার আর পার্কস্ট্রিটের মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টে অনেকক্ষণ আটকিয়ে গেল। মোড়ের মুখে একটি অল্পবয়েসী ছেলে দৈনিক পত্রিকার সান্ধ্য বিক্রি করছিল। মাত্র পঞ্চাশ পয়সা দাম। আর এই সান্ধ্য সংস্করণে অনেক রকম রোমাঞ্চকর খবর থাকে যা সকালের কাগজে সাধারণত পাওয়া যায় না।

এক কপি কাগজ ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সহদেববাবু কিনলেন।

এবং তারপরেই সহদেববাবুর চমকিত হওয়ার পালা।

একেবারে প্রথম পাতায় কাটারি হাতে সকালবেলার ডাবওয়ালার ছবি ছাপা হয়েছে এবং তার পাশে সংবাদ, সেই সংবাদের হেডলাইন হল, 'ডাকাতির দায়ে ক্যাবারে নর্তকীর স্বামী গ্রেপ্তার।' সংবাদের মধ্যে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছে।...জেরার মুখে পুলিসের কাছে আসামী কবুল করেছে যে তার নাম হল পটললাল, সে বিখ্যাত ক্যাবারে নাচিয়ে মিস্ জুলেখার বর্তমান স্বামী।

...আজ সকালে একটি বহুতল বাড়ির লিফটের মধ্যে মারাত্মক কাটারি হাতে একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পুলিস প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় থানা থেকে দুপুরবেলা তাকে গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে গোয়েন্দা দপ্তরের উপপ্রধান স্বয়ং তাকে জেরা করছেন।

...দুপুরবেলাতেই আসামীকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পটললালের হয়ে কেউ জামিনের আবেদন করেনি। বিচা[illegible]কে সা[illegible]লিসি হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

...আবার গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে এসে [illegible]র জেরা চলছে। কি[illegible] পটললাল এখনও
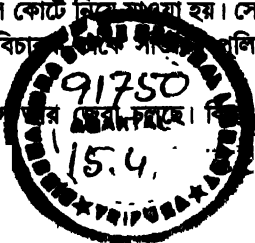
স্বীকার করেনি যে সে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ঐ বহুতল বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। তার হাতে কাটারি কেন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তরে পটললাল প্রতিবারই বলছে যে ঐ কাটারি ডাকাতির জন্যে নয়, ডাবকাটার জন্যে সে আনছিল। পুলিস অবশ্য এই আজগুবি কথা বিশ্বাস করেনি।

এই সংবাদ পাঠ করতে সহদেববাবুর এক মিনিটও লাগেনি।

ততক্ষণে ট্রাফিক খুলে গেছে, ট্যাক্সি লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে মল্লিকবাজার পেরিয়ে গেছে।

সংবাদটি পাঠ করে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সহদেববাবু। কিসে কি হয়, কিসে কি মিলে যায়।

আশ্চর্য, পটললালকে এত সহজে পেয়ে যাবেন সেটা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি সহদেব গোয়েন্দা।

কিন্তু এখন নিরীহ পটললালকে উদ্ধার করতে হবে। বলতে গেলে পটললালের বর্তমান হেনস্থার জন্যে সহদেববাবু নিজেও অনেকটা দায়ী। তিনি কাটারির অনুসন্ধান না দিলে পটললাল কাটারির অস্তিত্ব জানতেই পারত না, এইরকম গোলমালেও পড়ত না।

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ঘুরিয়ে সহদেববাবু গোয়েন্দা দপ্তরে চলে গেলেন। সেখানে পুলিসের গোয়েন্দা উপপ্রধান তখনও পটললালের জেরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পটললালকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলেন সহদেববাবু। সেই কালো ফুলপ্যান্ট, লাল স্পোর্টস গেঞ্জি, সকালের সেই চৌরঙ্গি মোড়ের ডাবওয়ালা।

সহদেববাবুকে দেখে গোয়েন্দা উপপ্রধান জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? মিস্ জুলেখার স্বামী রত্নটিকে দেখছেন? আপনি উদ্ধার করার আগেই আমরা ওকে গ্রেপ্তার করেছি। একেবারে সাক্ষাৎ ডাকাত।'

এবার সহদেববাবু বললেন, 'এ লোকটা কিন্তু ডাকাত নয়। পুরো ব্যাপারটার আমি সাক্ষী।'

সহদেববাবুর কথায় মনে জোর পেয়ে হঠাৎ বারান্দার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে পটললাল বললেন, 'ঐ তো। ঐ তো।'

দেখা গেল বারান্দায় একটি বেঁটে মতন লোক, মাথায় টাক, পরনে পাজামা, ফুলশার্ট, হাওয়াই চপ্পল ঘুরঘুর করছে। তাকে ভেতরে ডেকে আনা হল।

চেহারা, জামাকাপড় ইত্যাদি দেখে এবং পটললালের 'ঐ তো, ঐ তো' শুনে সহদেববাবুর কি মনে হওয়াতে তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি থিয়েটার রোডের মোড়ের ফ্ল্যাট বাড়িটার কেয়ার টেকার?'

লোকটি খুবই ভিতু প্রকৃতির, সামনের একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আমার নাম নিতাই সামন্ত, আমি ঐ বাড়ির কেয়ারটেকার, সতের তলার চিলেকোঠায় থাকি।'

গোয়েন্দা উপপ্রধান বিস্মিত হয়ে ব্যাপার কি ঘটে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সহদেববাবু নিতাই সামন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাটারিটা আপনিই ওকে দিয়েছিলেন?'

নিতাই বলল, 'হ্যাঁ।'

সহদেববাবু বললেন, 'তা হলে পুলিস যখন ওকে গ্রেপ্তার করল আপনি একটু এগিয়ে এসে সব কথা বললে এই লোকটির বিনা দোষে এতটা হেনস্থা হত না।'

নিতাই বলল, 'আমি ছিলাম বাথরুমে। তাছাড়া সতের তলায় যে নিচের কোনও শব্দ পৌঁছায় না। তাছাড়া লোডশেডিংয়ে লিফটও বন্ধ, ওঠানামা নেই। অনেক পরে যখন ঘটনাটা শুনলাম তখন পুলিস ওকে নিয়ে চলে এসেছে।'

সহদেববাবু বললেন, 'তখন পুলিসের কাছে চলে গেলেন না কেন?'

নিতাই বলল, 'পুলিসকে বড় ভয় পাই। বিশেষ করে থানায় ঢুকতে বুক দুরদুর করে। পরে যখন শুনলাম এখানে নিয়ে এসেছে, বিবেকের দংশনে ভয়ে ভয়ে চলে এলাম। তাও ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলাম না।'

সহদেববাবু বললেন, 'সে তো দেখলাম।'

গোয়েন্দা উপপ্রধানকে সকালবেলার পুরো ঘটনাটা গুছিয়ে বলতেই তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কাটারিটা বাজেয়াপ্ত করে পটললালকে তিনি ছেড়ে দিলেন।

পটললালকে নিয়ে আবার ট্যাক্সি করে এবার সরাসরি মিস্ জুলেখার মৌলালির আস্তানায় রওনা হলেন সহদেববাবু।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে পটললাল তাঁর বিড়ম্বিত জীবনের কথা সহদেববাবুকে বললেন। সব কথা লিখে লাভ নেই, এই কাহিনীতে তার প্রয়োজনও নেই। গত পরশু দিন সন্ধ্যার পর থেকে ঘটনাবলী হলেই চলবে।

সেদিন মিস্ জুলেখা থিয়েটার হলে চলে যাওয়ার পর তিনজন শক্তিশালী অনুগ্রাহককে নিয়ে এসে রেশমকুমারী জুলেখার বাড়িতে হামলা চালায়। তখন বীণাপানি একাই ছিল বাড়িতে। তাকে ভয় দেখিয়ে জেনে নেয় পটললাল কোথায়।

কিন্তু শুধু পটললালকে উদ্ধার করাই রেশমকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন মিস্ জুলেখাকেও শিক্ষা দিতে যাতে পটললালের ওপর স্বত্ব মিস্ জুলেখা ছেড়ে দেয়।

বীণাপানি যাতে চেঁচামেচি করতে না পারে সেই জন্যে ঠিক হল তাকেও পটললালের ঘরে শিকল দিয়ে রাখা হবে। কিন্তু বীণাপানি এতে কাঁদাকাটি করতে থাকে, বলতে থাকে, 'জামাইবাবুর সঙ্গে আমাকে একই ঘরে আটকিয়ে রেখো না। আমি তাহলে আর লোকজনকে মুখ দেখাতে পারব না।'

বীণাপানির বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তখন রেশমকুমারী সিদ্ধান্ত নিলেন বীণাপানির সঙ্গে তিনিও ঐ ঘরে পটললালের সঙ্গে থাকবেন। বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলে আর বোঝা যাবে না ভেতরে পটললাল ছাড়াও অন্যেরা রয়েছে।

থিয়েটার থেকে ফিরে কোনওদিনই মিস্ জুলেখা বীণাপানির খোঁজ করেন না। বাইরে থেকেই খেয়ে আসেন, বাড়ি ফিরে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েন।

রেশমকুমারীর হিসেবমত আজও ঠিক তাই হয়েছিল। তাছাড়া মিস্ জুলেখা শুয়ে পড়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু গলদ হয়েছিল অন্য জায়গায়। যে লোকটিকে রেশমকুমারী মিস্ জুলেখা ঘুমিয়ে

পড়লে বক্সরুমের শিকল খুলে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে নামকরা গুণ্ডা হলেও সাঙ্ঘাতিক ঘুমকাতুরে। মিস্ জুলেখা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে, ফলে দরজা খোলা হয় না।

তখন বাধ্য হয়ে রেশমকুমারীকে খুটখাট শব্দ করতে হয়, ঐটুকু বদ্ধ ঘরে, গরমে, গুমোটে তিনজনের দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

পটললালের কাহিনী শুনতে শুনতে ট্যাক্সি মিস্ জুলেখার বাড়িতে পৌঁছে গেল। শুধু আরেকটা প্রশ্ন ছিল সহদেববাবুর, 'ডাবওয়ালা হতে গেলেন কেন?'

পটললাল বললেন, 'জুলেখার বাড়ি থেকে দৌড়ে পালানোর সময় আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম, 'জুলেখা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। এভাবে তাকে ফেলে যেতে পারব না।' সঙ্গে সঙ্গে রেশম আমাকে লাথি মারে, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। রেশমের লোকেরা আমাকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে রেশমের বাড়িতে নিয়ে আসে। পরদিন দুপুরে রেশম যখন রিহার্সাল দিতে যায় আমিও পালাই। তারপরে সেকরার দোকানে গিয়ে বলি, 'নাকছাবি লাগবে না, আমার অগ্রিম দুশ টাকা ফেরত দিন।' লোকটা একটু গাঁইগুঁই করে শেষে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিল। সেই টাকা নিয়ে ভাবলাম নিজের পায়ে দাঁড়াব, থিয়েটার রোডের মোড়ে ডাবের ব্যাপারির কারবারটা কিনে নিলাম। তার পরে তো আপনি জানেন।

মিস্ জুলেখা পটললালকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। শুধু একটাই প্রশ্ন, 'পটললাল আবার পালাবে না তো?' সহদেব বললেন, 'পালালেও রেশমকুমারীর কাছে আর যাবে বলে মনে হয় না। এমনকি ওর নাকছাবির বায়নার টাকাও ফেরত নিয়ে এসেছে।'

আপাতত এতেই সন্তুষ্ট মিস্ জুলেখা। পটললালকে নিয়ে তিনি নৈশভোজ করতে পার্কস্ট্রিটের দিকে রওনা হলেন। ডাক্তার সহদেব শুককেও সঙ্গ দিতে বললেন। সহদেববাবু বাইরে খান না। স্বপাক খান। তাই গেলেন না।

এই মিলনান্ত কাহিনীর অবশেষে একটা ছোট দুঃখের ব্যাপার আছে।

ডাক্তার সহদেব শুক ভেবেছিলেন মিস্ জুলেখা তাঁকে ফি দেবেন তাঁর দু-মাসের নাচের মজুরি, দশ হাজার টাকা। মিস্ জুলেখা তো স্পষ্টই বলেছিলেন, 'আমার দু-মাসের নাচ।'

কিন্তু তার মানে যে নগদ টাকা নয়, মিস্ জুলেখা তাঁকে দুমাস উইংস থেকে তাঁর নাচ উপভোগ করতে দেবেন সেটা সহদেব ডাক্তার ভাবেন নি। সহদেব ডাক্তারের যে খুব ক্ষতি হয়েছে তা কিন্তু মনে হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত একটি শো-ও তিনি বাদ দেননি। প্রতি সন্ধ্যায় জুলেখার মোহময়ী নৃত্যে তিনি মশগুল।

পুনশ্চ :

এই রসরহস্য কাহিনীর নায়িকা মিস্ জুলেখা ওরফে শ্রীমতী লেখা ভট্টাচার্যের (তিন) ছেলেমেয়ে। কিন্তু কাহিনীটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে রচিত বলে ঐ তিন বালক-বালিকাকে কাহিনীর বাইরে রেখেছি।

নিজেকে জানো

উপনিষদে অনেক ভাল ভাল কথা লেখা আছে। তার মধ্যে একটা হল 'নিজেকে জানো।' মূল কথাটি বোধহয় 'আত্মানং বিদ্ধি'।

কে আমি? আমি কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাচ্ছি। এই বিশাল বিশ্বে আমাদের কি কাজ, কি ভূমিকা; এইসব নিয়ে প্রাচীন ঋষি আমাদের মাথা ঘামাতে, চিন্তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেকে জানতে বলেছেন।

এ অবশ্য খুবই জটিল ভাবনা। এর কোনও সোজা উত্তর নেই। ভাবার কোনও শেষ নেই, ইচ্ছে করলে ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাওয়া যেতে পারে।

পাগল হওয়ার ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবি থাক। আমরা এবার একজন মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষের গল্প লিখছি।

মানুষটির নাম বিরাজ।

বিরাজচন্দ্র নাগ একটি ছোটখাট মানুষ। একটি ছোটখাট অফিসে ছোটখাট চাকরি করে। কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। আগে রানাঘাটে বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত। সম্প্রতি কাজের সুবিধে হবে এই অজুহাতে বউকে নিয়ে কলকাতায় এসে উঠেছে। সত্যিই তো রানাঘাট থেকে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা কম ঝামেলা নয়। মা-বাবা একটু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ বাধা হয়নি।

কলকাতায় বাসা মানে শহরতলির শেষ সীমায় গড়িয়ায় ঐ পাশে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় ছোট একটা ঘর, এতটুকু বাসা। যেমন হয়, জল, বাথরুম সব কমন। রান্নার ব্যবস্থা সিঁড়ির নিচে।

বিরাজের বউয়ের নাম ভাস্বতী। সেও বিরাজের মতই ছোটখাট মানুষটি, বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলে ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। বিরাজের পরিবারও ছোট, তবে হয়ত সুখী বলা যাবে না।

রানাঘাটের বাড়িতে অল্প কয়েক মাসে অত লোকজনের মধ্যে ভাস্বতীর আসল রূপটা ভালভাবে প্রকাশ পায়নি। তাছাড়া নব পরিণয়ের, নব পরিচয়ের একটা আমেজ ছিল। বিরাজ মোটেই টের পায়নি তার বউ ভাস্বতী কি জিনিস।

বিরাজের তেমন কোনও বড় দোষ নেই। শুধু এই বয়েসের যুবকদের যা হয়, সে একটু আড্ডা দিতে ভালবাসে। 'একটু' কথার ব্যবহারটা হয়ত এখানে ঠিক হল না, বলা উচিত একটু বেশি আড্ডা দিতে ভালবাসে। সন্ধ্যাবেলা অফিস ভাঙার পর অফিসের ক্যানটিনে ঘণ্টা দেড়েক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যানটিন ধোয়ামোছা সেরে, আলো নিভিয়ে, জোর করে বার করে দেওয়া হয়।

একেকদিন দল খুব ভারি হয়, সেদিন আড্ডা গড়াতে গড়াতে অফিসের ক্যানটিন ছেড়ে বউবাজারের মোড়ে একটা রেস্টুরেন্টে এসে পৌঁছায়। কোনও কোনও দিন আড্ডা এতই জমে যায়, এর পরেও রাস্তার ধারের কাঠের বেঞ্চিতে বসে গুলতানি চলে।

সব আড্ডায় যেমন হয়, এই আড্ডাতেও নিয়মিত বাঁধাধরা সদস্য হল জনা পাঁচ-ছয়, বাকিরা ছুটছাট, অপেশাদার।

বলা বাহুল্য আড্ডার মধ্যমণি হল বিরাজ। বিরাজের অনুপস্থিতিতে আসর মোটেই জমে না। বিরাজ যে খুব গল্পবাজ বা আমুদে তা নয়, কিন্তু সে খুব মনোযোগী শ্রোতা এবং নানারকম খোঁজখবর রাখে। এছাড়া কলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত দুবেলা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, রেলগাড়ির কামরায় নানারকম মুখরোচক গল্প ও গুজবের সন্ধান পেত বিরাজ এবং যথাসময়ে আড্ডায় সেসব উগরিয়ে দিত। তবে ধীরে সুস্থে। কখনওই তড়বড় করে কিছু বলতে যেত না, যখনই আড্ডা ঝিমিয়ে পড়ত, সে একটু উস্কিয়ে দিত, আড্ডা আবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে চাঙা হয়ে উঠত।

অন্যান্য আড্ডাধারীদের মধ্যে সদানন্দ হল সবচেয়ে একরোখা। সে আড্ডার মধ্যমণি না হলেও সে আড্ডার প্রাণ। ডানকুনি না কোথায় একটা ইস্কুলে পড়ায়, থাকে বারুইপুরে। তবু ঝড়, বৃষ্টি, গণবিক্ষোভ, পথ অবরোধ সব অনায়াসে উতরিয়ে সে প্রতিদিন নিয়মিত আড্ডায় হাজিরা দেয়। এমনকি সামান্য শরীর খারাপ হলেও, ইস্কুল কামাই করলেও প্রায় যথাসময়ে বিবাদি বাগের অফিসের ক্যানটিনের আড্ডায় তার অট্টহাস্যময় উপস্থিতি সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের মত, শীত, গ্রীষ্মের মত অনিবার্য।

রানাঘাটে থাকতে এমনকি বিয়ের পরেও আড্ডা দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই লাস্ট ট্রেন নাগাদ বাড়ি ফিরত বিরাজ। মধ্যরাত পেরিয়ে যেত বাড়ি পৌঁছাতে, তবে বাড়িটা ছিল স্টেশনের লাগোয়া, তাই ট্রেন থেকে নামার পরে আর দেরি হত না।

বিয়ের আগে বিরাজের বাড়ির লোকেরা তার এই দেরি করে ফেরাকে মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। বিয়ের পরে তার মা অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'এই বিরু, ঘরে নতুন বউ, তাকে একলা ফেলে অত রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরিস নে।'

নতুন বউ ভাস্বতী কিছু মনে করত কিনা বিরাজ তা টের পায়নি। তবে প্রথম প্রথম তারও ইচ্ছে করত, হয়ত ভাস্বতীর টানেই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। কিন্তু আড্ডা কেটে বেরিয়ে পড়া অত সোজা নয়, আড্ডার একটা মায়া আছে, আকর্ষণ আছে; বউ নতুন থাকবে অল্প দিন, আর আড্ডা চিরদিনের। আর একটা চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও তো আছে। বন্ধুবান্ধব উপহাস করবে, টিটকিরি দেবে, বিশ্রী মন্তব্য করবে বউকে জড়িয়ে, নিজের হ্যাংলাপনা নিয়ে কোনও পুরুষমানুষই এটা চায় না, বিরাজও চায়নি। সুতরাং বিরাজ সেই মধ্যরজনী অতিক্রান্ত করেই বাড়ি ফিরত। সদ্য নিদ্রোত্থিতা ভাস্বতীর চোখেমুখে যে আগুন ঝলসাত, সে ভাবত সেটা প্রেমজ।

রানাঘাটের বাড়ির ভিড়ে ভাস্বতীর সঙ্গে তার কথাবার্তা কমই হত। ভাস্বতীকে সে মোটেই বুঝতে পারেনি, তাহলে সে রানাঘাট ছাড়ত না।

কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। বড় আশা করে গড়িয়ার শেষ প্রান্তের এই একঘরের বাসায়, এতটুকু বাসায় ভাস্বতীকে নিয়ে বিরাজ এসে উঠেছে। ভাস্বতী তার সামান্য ছোট সংসার তার নিজের, একান্ত নিজের সংসার, হাঁড়ি কড়াই-খুন্তি, শিল-নোড়া, জানলার পর্দা, দরজার পাপোশ, আলনা-চৌকি, (তক্তাপোশ) চোদ্দফুট বাই বারো ফুট ঘরের মধ্যে যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়েছে, এমনকি দেওয়ালের এক কোণায় একটা লক্ষ্মীর পট বসিয়ে যথাসাধ্যি ধর্মাচরণের আয়োজন রেখেছে।

দুঃখের কথা, ভাস্বতীর এই ঘর গোছানোর সঙ্গে, সংসার সাজানোর সঙ্গে বিরাজের আড্ডাবাজী মিলছে না।

গড়িয়ার ঘরে এসে প্রথমে বিরাজ মোটেই কিছু টের পায়নি। সে যথারীতি প্রথম প্রথম সেই আগের মতই, আড্ডা দিয়ে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল।

গোড়ার দিকে দু-একদিন ভাস্বতী কিছু বলেনি, কিন্তু ক্রমশ সে কঠোর হতে লাগল। প্রথমে সে দরজা খুলতে দেরি করতে লাগল। অত রাতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে একঘণ্টা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সোজা কথা নয়।

কিন্তু সে-ও ছিল মন্দের ভাল। এরপর দেরি করে এলে ভাস্বতী কঠোর, নিষ্ঠুর সব মন্তব্য করতে লাগল। অন্য একদিন দরজায় তালা দিয়ে দোতলায় বাড়িওয়ালার স্ত্রীর কাছে শুয়ে রইল, বাড়িওয়ালা কাজে কোথায় বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িওয়ালার স্ত্রী একা ঘরে শুতে ভয় পান। পুরো দোতলাটা ফাঁকা। ভাস্বতী বলেছিল, 'কোনও অসুবিধে নেই, আমি আপনার কাছে শোব।' গৃহস্বামীনী ভদ্রতাবশত প্রশ্ন করেছিলেন 'তোমার বর?' ভাস্বতী স্রেফ মিথ্যে জবাব দিয়ে দিল, 'ওর কোনও অসুবিধে নেই। ও আজ রানাঘাটে যাবে।'

কিছু বুঝতে না পেরে, কিছুই না জেনে সেদিন সারারাত বিরাজ তালাবন্ধ ঘরের সামনে বারান্দায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে কাটিয়েছিল।

দুঃখের বিষয় এর পরেও বিরাজের চরিত্র সংশোধন হল না। কিছুটা আড্ডার নেশায়, কিছুটা বন্ধুদের বিদ্রূপের ভয়ে সে আড্ডা তাড়াতাড়ি ছেড়ে আসতে পারল না। দু-একবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে উঠতে পারেনি। বিরাজের খেয়াল ছিল না যে বিয়ের আগে ভাস্বতী পাড়াগাঁয়ের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিল। ক্রমশ মৌখিক কটূক্তির সঙ্গে ভাস্বতী হস্তচালনা শুরু করল। রীতিমত প্রহার যাকে বলে তাই।

অত রাতে বাড়ি ফিরে দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা মাত্র মাথায় বা পিঠে খটাখট হাত-পাখার বাড়ি খাওয়া খুবই দুঃখের। আর, বউ মারছে এ নিয়ে তো চেঁচামেচিও করা যায় না।

নিঃশব্দে নিয়মিত প্রহৃত হতে হতে বিরাজ ক্রমশ সংশোধিত হতে লাগল।

কিন্তু সংশোধনের পথে বহু বাধা। ইতিমধ্যে ভাস্বতী সন্তানসম্ভবা হয়েছে, একসঙ্গে যমজ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। এবার নিজের টানেই বিরাজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু প্রথম যেদিন সে আড্ডা থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার চেষ্টা করল বাচ্চাদের শরীর খারাপ এই সাবেকি অজুহাতে, বন্ধুরা কিছু সন্দেহ করেনি।

বিরাজ চলে যেতেই আড্ডাটা কেমন যেন মিইয়ে পড়ল। সদানন্দ একা সামাল দিতে পারল না। সেদিন রাত আটটাব মধ্যেই আড্ডা ভেঙে গেল।

পরের দিনও যখন বিরাজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করল, সবাই মিলে বাধা দিল। সেদিন বহু কষ্টে রাত নটা নাগাদ বাড়ি ফিরতে পেরেছিল সে। কিন্তু তাতে অব্যাহতি পায়নি সে, সেদিন বউ তাকে একটা খুন্তি দিয়ে পেটে খোঁচা দিয়েছিল।

ব্যাপারটা বেশিদিন চাপা রইল না। বন্ধুরা ক্রমে ক্রমে জেনে গেল ভাস্বতী বিরাজকে মারধর করে, বিরাজ ভাস্বতীকে ভয় পায়, খুব ভয় পায়।

ব্যাপারটা বন্ধুরা ভাল মনে মেনে নিতে পারল না। তারা ঠিক করল বিরাজকে সাহসী করে তুলতে হবে, তাকে আড্ডায় আটকাতে হবেই।

কিন্তু বিরাজ অসহায়, সে বউকে ভয় পায়। এ ঘটনা আর বিস্তারিত করে লাভ নেই। শুধু শেষ যেদিন বিরাজ আড্ডা ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে এল, সেইদিন সদানন্দের সঙ্গে তার বাক্যালাপের কিয়দংশ উদ্ধার করছি।

'তুই কখনও ভেবে দেখেছিস, তুই একটা কাপুরুষ, কাপুরুষ নম্বর ওয়ান?' সদানন্দ চাপা আক্রোশের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

বিরাজ কোনও উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে বসে রইল।

মৌন থাকা মানেই স্বীকার করে নেওয়া এইরকম একটা পুরনো প্রবাদ আছে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, বিরাজ স্বীকার করল যে সে কাপুরুষ, কিন্তু পুরনো বন্ধু, প্রাণের বন্ধু সদানন্দ বিরাজচন্দ্রের এই মৌনতা মেনে নিল না।

আরও নিষ্ঠুরভাবে, দাঁতে দাঁত চেপে কষমষ করে চিবিয়ে চিবিয়ে সদানন্দ আবার আক্রমণ করল, বলে ফেলল, 'তুই একটা নপুংসক।'

ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল বিরাজচন্দ্র, চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'এ কথা বলিস কী করে? জানিস আমার যমজ ছেলে আছে।' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সদানন্দ, 'তা হলে এত ভয় পাস কেন? তুই আর তোর যমজ ছেলে। দলে-বলে তোরা তিনজন আর ভাস্বতী না আধশতী কি যেন নাম তোর বউয়ের, সে তো একা, তাকে এত ভয় পাস কি জন্যে?'

বিরাজ নিরুত্তর।

কে সদানন্দকে বোঝাবে যে নিতান্ত শিশু, দুই যমজ পুত্রসন্তান কিভাবে রক্ষা করতে পারে তাকে, আর তাছাড়া তারা যে মায়ের পক্ষে না গিয়ে বাপের পক্ষেই যাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি।

বিরাজের স্তব্ধতা আরও ক্ষিপ্ত, প্রজ্বলিত করে তুলল প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে। এবার মোক্ষম কথা বলল সে, 'আসলে তুই একটা ছুঁচো, একটা ইঁদুর, একটা নেংটি ইঁদুর।'

এতক্ষণে ম্লান হেসে বিরাজচন্দ্র কবুল করল, সদানন্দের অভিযোগ মোটেই সত্যি নয়, সে মোটেই ইঁদুর, ছুঁচো কিংবা নেংটি ইঁদুর নয়।

রাশভারি ফৌজদারি উকিলের মত সদানন্দ জেরা করল, 'এ বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ আছে?'

অধিকতর ম্লান হেসে বিরাজচন্দ্র বলল, 'অবশ্যই আছে।'

এই প্রথম বাধা পেয়ে সদানন্দ একটু থমকে গিয়ে বলল, একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি প্রমাণ দিতে পারিস তুই, তুই যে ইঁদুর নয়, সে কথাটা বোঝানোর জন্যে।'

বিরাজ বলল, 'খুব সোজা প্রমাণ। আমি যে ইঁদুর নই, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি এইজন্যে যে, আমার বউ মানে ভাস্বতী, ইঁদুর দেখে ভীষণ ভয় পায়। আমি যদি ইঁদুর হতাম তাহলে আমাকে দেখে ও নিশ্চয় ভয় পেত।

অবশেষে শেষ তীর নিক্ষেপ করল সদানন্দ। বলল, 'তাহলে তুমি একটা আরশোলা।'

বিরাজ অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, 'না আমি আরশোলাও নই। আমার বউ আরশোলাও খুব ভয় পায়।'

বিরাজচন্দ্র এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ছুটে গিয়ে সদানন্দ তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি কী?'

গমনের গতি বিন্দুমাত্র না থামিয়ে, রোষকষায়িত ভাস্বতীর মুখমণ্ডল স্মরণে রেখে উপনিষদের ভাষায় উত্তর দিল বিরাজ, 'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি।'

ডাকলে আসে না

অনুরাধা দেবীর নাম শুনে যাই মনে হোক, তাঁর কিন্তু বেশ বয়েস হয়েছে। এখন তাঁর বয়েস ঐ ইংরেজিতে যাকে বলে রঙ সাইড অফ সিক্সটিতে অর্থাৎ ষাটের খারাপ দিকে। আসলে অনুরাধা নামটা যত নতুন বা আধুনিক মনে হয় তা মোটেই নয়। সেই বিশেষ দশকের নামকরণ, পরপর তিন বোন, সাধনা, আরাধনা, অনুরাধা।

শহর কলকাতায় আর মফস্বলে ইতস্তত সঞ্চারিত এবং আধুনিক সমাজে নবজাতকের প্রগতির হাওয়া বইছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাম বিলি শুরু করেছেন। শ্রীযুক্তা হরিবালা দেব্যার মেয়ের নাম হচ্ছে নন্দিনী রায়। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসুর ছেলের নাম হচ্ছে অলোককুমার বাসু।

অনুরাধা দেবীর থেকে বারো বছরের ছোট এক ভাই ছিল। তার নাম ছিল অনিরুদ্ধ। সে আমার সহপাঠী ছিল। পরপর তিনবোন, তিনভাই। ভাইদের নাম হল প্রবুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, অনিরুদ্ধ।

আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। অনুরাধা দেবীর যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়েস দশের নিচে। বাসি বিয়ের দিন বিকেলে বর ও বরকর্তার সঙ্গে বেনারসী, লাল চেলি, এক গা অলঙ্কার আর সিঁথিভর্তি সিঁদুর নিয়ে তিনি যখন পুরনো দুই ঘোড়ার ফিটন গাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি গেলেন, সেই দিন কন্যা পক্ষ ও অনিরুদ্ধের সঙ্গে আমিও কেঁদে কোল ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

তখন আমি অনুরাধা দেবীকে অনুরাধাদি বলতাম, এখনও তাই বলি, এই গল্পেও তাই বলব।

আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ বহুকাল এই মানবজীবন থেকে বেপাত্তা। সেই বেদনাহত কাহিনী এই হাল্কা গল্পে টেনে আনা উচিত হবে না।

এ গল্প ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে।

অনুরাধাদির ব্যাপার।

অনুরাধাদি আমার খোঁজখবর করেন। আমার নিজের বোন নেই। তিনি কোনও কোনও বার আমাকে ভাইফোঁটায় ডাকেন, ফোঁটা দেন, একটা ধুতি বা পাঞ্জাবির কাপড় দেন। সম্বুদ্ধদা, প্রবুদ্ধদা এঁরা হয়ত ফোঁটা নিতে যান না। কিন্তু আমি যাই।

এমনিতেও ছুটিতে বা অবসরে অনুরাধাদির ওখানে পারলে যাই। পয়লা বৈশাখ বা বিজয়ার পরে অবশ্যই যাই। এখন আমি থিয়েটার রোডের কাছে যেখানে থাকি সেখানে কোনও বাজার নেই। মাঝে মধ্যে জগুবাবুর বাজারে যাই। অনুরাধাদিরাও ভবানীপুরেই থাকেন। বাজারে যাতায়াতের পথে ওখানে এক পেয়ালা চা খেতে ভালই লাগে।

অনুরাধাদির দুই ছেলে, মেয়ে নেই। দুটি ছেলেরই সময় মত বিয়ে দিয়েছেন। দুই

ছেলেই বাইরে কাজ করে, একজন জামশেদপুরে, অন্যজন শিলিগুড়িতে।

অনুরাধাদির বর কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। এখন তাঁর ঝাড়া হাত-পা যাকে বলে তাই। ভবানীপুরের বাড়িতে দুয়েকজন দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির অনিয়মিত অবস্থান বাদ দিলে প্রায় একলাই থাকেন। কখনও কখনও ছেলেদের কাছে যান, তবে কলকাতার বাইরে বেশিদিন মন টেকে না। যতদিন থাকবেন ভেবে যান অনেক সময় তার আগেই ফিরে আসেন।

আজ কিছুদিন হল আমি একটা নতুন জায়গায় কাজে ঢুকেছি। সকাল সকাল অফিস যেতে হয়। নিজে বাজার করার খুব একটা সময় পাই না, যদিও বা কখনও বাধ্য হয়ে বাজারে যেতে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজার সেরে ফিরে আসি। ছুটির দিনে অন্য দশটা কাজ থাকে, সে সব দিনে বাজারে যাওয়াই হয় না। ফলে এর মধ্যে বেশ কিছুদিন অনুরাধাদির সঙ্গে দেখা হয়নি।

সেদিন সকালে গৃহিণী বললেন, 'আজ বাজার না করলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না।'

বাধ্য হয়ে থলে হাতে বেরলাম। জগুবাবুর বাজার থেকে তাড়াতাড়ি মাছ তরকারি কিছু কিনে ফিরে আসব।

মাছের বাজারে হঠাৎ অনুরাধাদির ছেলে তিমিরের সঙ্গে দেখা। তিমির বড়, আর ছোটটির নাম তড়িৎ।

তিমির বলল, 'মা পরশুদিন হঠাৎ মাথা ঘুরে ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। আমি, তড়িৎ সবাই টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছি। আপনি কিছু শোনেন নি?'

আমি বললাম, 'না। এক অনুরাধাদিই ফোন করতে পারত। অনুরাধাদির নিজেরই শরীর খারাপ কে আর খবর দেবে? তা অনুরাধাদি এখন কেমন আছেন?'

তিমির বলল, 'এখন তো ভালই। কিন্তু কেন হঠাৎ অজ্ঞান হয়েছিল সেটা তো জানা দরকার। দৈনিকই ডাক্তার ডাকা হচ্ছে, ডাক্তারি পরীক্ষা চলছে হরেক রকম।'

পরের রবিবার সময় করে অনুরাধাদির ওখানে গেলাম। তিমির, তড়িৎ তাদের কাজের জায়গায় ফিরে গেছে। তবে তাদের বৌ-রা শাশুড়ির দেখাশোনার জন্যে রয়ে গেছে, নাতি-নাতনিরা রয়েছে। অসুখের বাড়ি হলেও বাড়ি বেশ জমজমাট।

গিয়ে দেখলাম, অনুরাধাদি ভালই আছেন। বেশ হাসিখুশি, নাতি-নাতনিদের নিয়ে আনন্দে সময় কাটছে। বড় ছেলে তিমিরের একটি মেয়ে বছর আটেক বয়েস তার, আর একটি ছেলে ছয় বছরের। ছোট ছেলে তড়িতের একটিই ছেলে তারও বয়েস ছয়। অসুখের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে অনুরাধাদি বললেন, 'আমার কিছুই হয়নি। সামান্য একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। এ বয়েসে ওরকম একটু হবে। ডাক্তার ঠিকঠাক এলে কিছুই হত না। তিমির-তড়িৎকে ছুটোছুটি করতে হত না। যা হোক আমার ভালই হয়েছে। নাতি-নাতনিরা, বৌমারা এসেছে। এমনিতে কি আসত?'

আমার নিজের নানা অসুখের বাতিক আছে। অসুখ বিষয়ে আমার কৌতূহলও যথেষ্ট। আমি অনুরাধাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো।'

'প্রায় কিছুই নয় বলা যায়', অনুরাধাদি বললেন, 'আমার কাজের লোক বাসন্তী ছাড়া

বাসায় তখন কেউই ছিল না। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা, ঠাকুরঘরে ধূপ-ধুনো দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় আসছি হঠাৎ দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।'

একটু থেমে অনুরাধাদি কি যেন চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'তবে ঠিক চৌকাঠে হোঁচট খেয়েই পড়েছি না মাথা ঘুরে পড়ার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছি সেটা বলতে পারছি না। তা যা হোক, বাসন্তী ছুটে এসে আমার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল। তখন আবার লোডশেডিং, পাখা আলো বন্ধ, শিয়রের কাছের জানলার পর্দাটা তুলে দিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই নিচতলার ভাড়াটে বিষ্ণুবাবুকে ডেকে আনল।'

আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিলাম, নিচতলার ভাড়াটে বিষ্ণুবাবুকে আমি সামান্য চিনি। অনেক দিনের পুরনো বাসিন্দা এ বাড়ির, বহুকাল ধরে দেখছি। আজকাল বাজারেও মাঝে মধ্যে দেখা হয়। দুজনে দুজনকে দেখে মুচকি হেসে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করি এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাই।

বিষ্ণুবাবু সেদিন সন্ধ্যায় বাসন্তীর মুখে অনুরাধাদির পতনের সংবাদ পেয়ে প্রথমেই গলির মোড়ের সুজয় ডাক্তারের কাছে যান। সুজয় ডাক্তারের বাবা বিজয় ডাক্তার এ পাড়ার পুরনো নামকরা ডাক্তার। এরা দু'পুরুষের ডাক্তার। বিজয় ডাক্তার আজকাল আর চেম্বারে বসেন না। বিশেষ দুয়েকটা ক্ষেত্রে কলে যান পাড়ার মধ্যে চেনাশোনা বাড়িতে।

বিষ্ণুবাবু সেদিন সুজয় ডাক্তারের চেম্বারে যখন গেলেন তখন ভর সন্ধ্যে, ইলেকট্রিক বন্ধ বলে চেম্বারে একটা ইমারজেন্সি লাইট জ্বলছে। রমরমা ভিড়। বিষ্ণুবাবু রোগীর ভিড় ঠেলে যখন সুজয়ের কাছে পৌঁছলেন, সুজয় ডাক্তার কিছুটা শুনেই বিষ্ণুবাবুকে বললেন, 'দেখছেন তো কি ভিড়, ভিড় কাটতে কাটতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে যাবে। আমি তার আগে যেতে পারব না। আপনি বরং বাবার কাছে যান। বাবা বাড়িতেই আছেন।'

কাছেই বাড়ি। বিষ্ণুবাবু সেখানেই গেলেন। একটু খটকা মনে নিয়েই গেলেন, কারণ তিনি এ পাড়ার পুরনো লোক, এ পাড়ার লোকেরা যারা জানে তারা সচরাচর বিজয় ডাক্তারকে সন্ধ্যার পরে কখনও বিশেষ একটা ডাকে না, কখনই ডাকত না।

বিজয় ডাক্তারের একটা মন্দ অভ্যেস আছে। সন্ধ্যের পর আধবোতল ব্র্যান্ডি পান করা। বিশুদ্ধ ডাক্তারি ব্র্যান্ডি, লাল ক্রশ মার্কা দেওয়া। কিন্তু তাতেই তার নেশা হয়। একেবারে বুঁদ হয়ে যান। এই সময় রোগী হাতের কাছে পেলে ওঁর মনের মধ্যে অপারেশন করার একটা দুর্বার বাসনা জাগ্রত হয়, সে রোগ যাই হোক না কেন ম্যালেরিয়া কিংবা একজিমা। আগে কয়েকবার ছুরি কাঁচি বার করে সে চেষ্টাও তিনি করেছেন তবে প্রত্যেকবারই রোগীর আত্মীয়-স্বজনের বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত অপারেশন করতে পারেন নি।

সেদিন সন্ধ্যায় বিজয়-ডাক্তারের বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বিষ্ণুবাবু মনে মনে আশা করছিলেন ডাক্তারবাবুর বয়েস হয়েছে এখন কি আর নেশাটেশা করেন, নিশ্চয় ছেড়ে দিয়েছেন।

খোলা লোহার গেট ঠেলে বিজয় ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকতে একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হয়। বিজয় ডাক্তার ওপরে দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে ছিলেন।

বিষ্ণুবাবু ঢোকার সময়ে ঐ ক্যাঁচ শব্দ হওয়ায় দোতলার ইজিচেয়ারের ওপরে সোজা হয়ে বসে বিজয় ডাক্তার বিষ্ণুবাবুকে বললেন, 'কোথাও যেতে হবে নাকি?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি, রোগী পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

বিজয়ডাক্তার বললেন, 'দাঁড়ান আমি এখনই আসছি।' বলে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি নিজেই টলমল করে বারান্দায় পড়ে গেলেন। তাঁর শরীরের ধাক্কায় কিংবা পদাঘাতে দুয়েকটা কাঁচের জিনিস চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। খুব সম্ভব কাঁচের গেলাস বা বোতল। অতঃপর বিষ্ণুবাবু নিঃশব্দে বিজয় ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির উল্টোমুখে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। গলির উল্টোমুখে বড় রাস্তা পার হলে অন্য একজন ডাক্তার বসেন, ডাক্তার চক্রবর্তী। গিয়ে দেখা গেল তিনি চেম্বারে নেই, রোদে বেরিয়েছেন, আজ সন্ধ্যায় আর চেম্বারে ফিরবেন বলে মনে হয় না। থাকেন ঠাকুরপুকুর না জোকায়, কাল সকাল সাড়ে নটার আগে তাঁর আর দেখা মিলবে না।

সামনে আরেকটু এগিয়ে একটা ওষুধের দোকান। সেখানে আর একজন ডাক্তার বসেন, বিষ্ণুবাবু যখন সেখানে গেলেন তিনি বেরচ্ছেন। হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বিষ্ণুবাবুকে দেখে একটু দাঁড়ালেন তারপর বাজারের ফর্দের মত একটা লম্বা কাগজ পকেট থেকে বার করে বললেন, 'নাম ঠিকানা বলুন।'

এখন পর্যন্ত বাইশটা ভিজিট আজ রাত্রের জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ঐ লিস্টে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধা থেকে গোলপার্কের দুধের শিশু পর্যন্ত, সবরকম রোগী তাঁর। তিনি নিজেই হিসেব করে বললেন, 'আপনাদের ওখানে যেতে যেতে রাত দেড়টা দুটো হয়ে যাবে। লোডশেডিং হয়ে গেলে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখবেন।'

গতিক বুঝে বিষ্ণুবাবু, 'না থাকুক, অত রাতে দরকার নেই,' এই বলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়লেন। 'ধুৎ' বলে ডাক্তারবাবু সময় নষ্ট হওয়ায় মুখ বিকৃত করে আরও জোরে হনহন করে হেঁটে প্রথম রোগীর গৃহপানে রওনা হলেন।

বিষ্ণুবাবু ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন অনুরাধাদি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এক কাপ গরম দুধ খেয়েছেন। এদিকে আলোপাখাও এসেছে।

বিষ্ণুবাবু যখন বললেন কোনও ডাক্তারই পাওয়া গেল না, বেশ কয়েকজনকে ডাকার চেষ্টা করেছেন কেউই আসেনি, অনুরাধাদি বললেন, 'আমার খুড়তুতো দেওর ডাক্তার, বেলেঘাটায় থাকে, তাকে একটা ফোন করুন।' ঘরের মধ্যেই ফোন. ফোন নম্বরটা বিষ্ণুবাবুকে বলতে তিনি বেলেঘাটায় ফোন করলেন। কিন্তু খুড়তুতো দেওরকে পাওয়া গেল না, সে সস্ত্রীক ক্লাবে গেছে, রাত বারোটা নাগাদ ফিরবে।

ডাক্তার ছাড়াই সে রাতটা অবশ্য ভালভাবেই কাটল কিন্তু মুশকিল হল পরদিন সকালে। অনুরাধাদি সকালে ঘুম থেকে উঠে খাট থেকে নামতে গিয়ে আবার মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। বাসন্তীর মুখে খবর পেয়ে পুনরায় বিষ্ণুবাবু ছুটে এলেন এবং এবার আর প্রথমে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে টেলিগ্রাম অফিসে দুই ছেলে, তিমির আর তড়িৎকে তার পাঠিয়ে দিলেন, সেই যথারীতি 'মাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম অ্যাট ওয়ান্স।' এরকম তার তড়িৎ আর তিমির আগে কখনও পায়নি সুতরাং তারা সপরিবারে ছুটে এল।

দুঃখের বিষয় আমার এই গল্পে আসল ব্যাপারের চেয়ে পটভূমিকা অনেক বড়।

আগের অংশটুকু পটভূমিকা মাত্র। পটভূমিকা দীর্ঘ হয়ে গেল, আমরা এবার সংক্ষেপে আসল অংশে যাচ্ছি।

আমি এক্ষেত্রে দেখলাম অনুরাধাদি ভালই আছেন। বেশ হাসিখুশি। বিশেষ গুরুতর কোনও রোগ ধরা পড়েনি। একলা বিধবা মানুষ, হয়ত খাওয়া দাওয়া ঠিক হয় না, প্রেসারটা বেশি নেমে গিয়েছিল তাই মাথা ঘুরেছিল। অবশ্য এখন আর তা নিয়ে অনুরাধাদির কোনও উদ্বেগ নেই। আমার সঙ্গে গল্প করছেন, ঘরে বারান্দায় নাতি নাতনি খেলা করছে। এক বৌমা এসে আমাকে এক পেয়ালা চা দিয়ে গেল। অন্য বৌমা এসে ওঁকে এক পেয়ালা দুধ দিয়ে গেল। বড় নাতনিটি, যার আট বছর বয়েস, সে ঠাকুমার খাটে বসেই একটা টিনটিনের বই পড়ছিল। গর্বিতা ঠাকুমা অনুরাধাদি তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই আমার বড় নাতনি বিশাখা। পড়াশুনোয় খুব মনোযোগ, ও বড় হলে প্রিন্সিপ্যাল হবে, না হয় ভাইস চ্যান্সেলর হবে।'

একটি ছেলে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে খাটের নিচে খুটখুট করছিল। তাকে ডেকে সামনে দাঁড় করিয়ে অনুরাধাদি বললেন, 'এ হল তড়িতের ছেলে অমিত। দেখেই বুঝতে পারছ ও বড় হলে খুব বড় এঞ্জিনিয়ার হবে।'

তৃতীয় নাতিটি বারান্দায় ঘুরঘুর করছিল, অনুরাধাদি তার নাম ধরে 'প্রমিত, প্রমিত' বলে কয়েকবার ডাকলেন কিন্তু সে এল না।

তখন অনুরাধাদি বললেন, 'এ হল তিমিরের ছেলে প্রমিত। ও বড় হলে ডাক্তার হবে।'

আমি বললাম, 'ঐ দুজনের ব্যাপারতো বুঝলাম কিন্তু এটি ডাক্তার হবে বুঝলেন কি করে?'

অনুরাধাদি একগাল হেসে বললেন, 'দেখলে না ও ডাকলে আসে না। ওর ডাক্তার না হয়ে উপায় নেই।'

ভালো-খারাপ

'হিব্রু ভাষায় একটা প্রবাদ আছে', হঠাৎ প্রভাকরবাবু বললেন।

নানা কারণে আমাদের সন্ধ্যাসমিতির সভ্যেরা প্রায় কেউই প্রভাকরবাবুকে পছন্দ করেন না। প্রভাকরবাবু আমাদের এ পাড়ায় এসেছেন প্রায় পনেরো বছর কিন্তু আগাগোড়া আমাদের এড়িয়ে গেছেন। পুজো-পার্বণে চাঁদা-টাদা দিয়েছেন; কিন্তু সন্ধ্যাসমিতির ক্লাবঘরে, যেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের জমাট আড্ডা বসে, তাস খেলা হয়, সেখানে তিনি ভুলেও কোন সন্ধ্যায় পা মাড়াননি।

আসলে প্রভাকরবাবুর ঝোঁক ছিল অন্যত্র। আমাদের তরল আড্ডার চেয়ে তরলতর দ্রব্য অর্থাৎ শক্ত পানীয়ের প্রতি তাঁর টান ছিল অনেক, অনেক বেশি।

আমরা সন্ধ্যাসমিতির সদস্যেরা অনেকদিন রাতে তাস এবং আড্ডার শেষে যখন ক্লাবঘরে তালা দিচ্ছি, দেখেছি প্রভাকরবাবু টলতে টলতে ট্যাক্সি বা রিকসা থেকে নামছেন এবং তারপর ভাড়া মিটিয়ে স্খলিত চরণে নিজের বাড়িতে ঢুকছেন।

সন্ধ্যাসমিতি কোন উঠতি মাস্তানদের ঠেক কিংবা রাজনৈতিক দলের ছদ্মবেশী প্রতিষ্ঠান নয়; পুরনো, বনেদি কলকাতার আদি ও অকৃত্রিম সমিতিগুলোর একটা। প্রতিটি সন্ধ্যায়

আফিসকাছারির শেষে বাড়ি ফেরত ভদ্রলোকেরা এখানে বসে একটু গল্পগুজব করেন, তাস-টাস খেলেন। তবে সে সবই নিতান্ত নিরামিষ ব্যাপার।

এতকাল এসব নিরামিষ ব্যাপার প্রভাকরবাবুর মোটেই পছন্দ ছিল না। তিনি এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের মাঝারি সাহেব। সন্ধ্যায় চা খাওয়া তাঁর পোষায় না। তিনি আমাদের এড়িয়েই চলতেন। সন্ধ্যায় তাঁর যাওয়ার জায়গা ছিল অন্যরকম।

কিন্তু সম্প্রতি প্রভাকরবাবু এক দুর্বিপাকে পড়েছেন। তাঁর লিভার না কি যেন খারাপ হয়েছে। সব রকম দুর্মূল্য পানীয় ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছেন। বাধ্য হয়েই তিনি আমাদের সন্ধ্যাসমিতির আড্ডায় ভিড়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় দূরদর্শনের প্রোগ্রাম বা বই পড়া, এসব কিছুই তাঁর সহ্য হয় না। কি আর করবেন, দু-চারদিন ইতস্তত করার পরে সন্ধ্যাসমিতিতে অনুপ্রবেশ করেছেন।

বলা বাহুল্য, সন্ধ্যা সমিতির সাবেকি সদস্যেরা প্রায় কেউই প্রভাকরবাবুকে পছন্দ করেন না। তাঁর উন্নাসিকতার ইতিহাস এত সহজে বিস্মৃত হবার নয়। তবে ভদ্রলোকের দুটো গুণ আছে।

প্রথম গুণ হল, কথা বলায় ওস্তাদ। যে কোনও বিষয়ে যে কোনও কথা বলতে পারেন। শুধু কথা নয়, অনর্গল চটকদার বাক্যের নক্সা, তার মধ্যে কল্পনার সোনালি ফুল মেশানো।

প্রভাকরবাবুর দ্বিতীয় প্লাস পয়েন্ট হল, তিনি অমায়িক, দিলদরিয়া ব্যক্তি। নিজে আজকাল চা-সিগারেটও কদাচিত খান, কিন্তু সন্ধ্যাসমিতির আড্ডায় এই সব রসদ ঘুস দিয়ে তিনি নিজের পূর্বকর্মের প্রায়শ্চিত্তই হয়তো করেন।

অনেকদিন পরে এবছর খুব জমাট শীত পড়েছে। তার ওপরে আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা-মেঘলা। এখন সন্ধ্যার দিকে একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে, খুব জোর নয়, বর্ষাকালে যে বৃষ্টিকে ইলশেগুঁড়ি বলে সেই রকম। তবে বেশ জোর উত্তুরে হাওয়া সঙ্গে আছে।

কথা হচ্ছিল এই অসময়ের বৃষ্টি নিয়ে। আমাদের এই সন্ধ্যাসমিতি বসে একটা পুরনো বাড়ির একতলার প্যাসেজের পাশে একটা বড় ঘরে। প্যাসেজ পেরিয়ে সামনে রাস্তার পাশেই একটা চায়ের স্টল। চা ছাড়া চানাচুর, বিস্কুট, সিগারেট, পান প্রায় সব কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসই পাওয়া যায়। দোকানটা চালান এক কর্কশকণ্ঠী মহিলা, তাঁর নাম কেউ জানে না। তবে তাঁর ছেলের নাম জগা। জগাই দোকানের বয়ের কাজ করে এবং জগার সূত্রেই মহিলাকে সবাই জগার মা বলে।

জগার মা'র ভূমিকা অবশ্য এ কাহিনীতে তেমন জোরদার নয়, তবু সূত্রপাত করে রাখলাম। এবার বৃষ্টির মধ্যে ফিরি।

অকালের বৃষ্টি, জমাটি ঠাণ্ডা তার ওপরে উত্তুরে হাওয়া। সুতরাং আবহাওয়া নিয়ে একটু কথাবার্তা হবেই। তাছাড়া অন্যান্যবার শীতকালে মোটেই লোডশেডিং হয় না কিন্তু এ বছর শীতকালেও ভয়াবহ বৈদ্যুতিক গোলমাল। আবহাওয়ার দুর্যোগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সন্ধ্যাসমিতির ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ। ইলেকট্রিকের বিকল্প একটা কেরোসিন লণ্ঠনের বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু অনেকদিন কাজে না লাগায় সেটা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে

পড়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে, কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকলে বা বেরিয়ে গেলে যেই দরজা খুলতে হচ্ছে দমকা হাওয়া ভিতরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটাকে ঘরের কোনা থেকে খুঁজে বার করে ধরে 'হুস্' করে নিবিয়ে দিচ্ছে।

একটু আগে প্রভাকরবাবুর ফরমায়েস মতো জগা চা দিতে এসেছিল, তখন দরজা খুলে দিতেই মোমবাতি নিবে গিয়েছিল। এখন আবার কে যেন দরজাটা ঠুকঠুক করে নাড়ছে, বোধহয় জগাই গেলাস ফেরত নিতে এল। সবাই ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে আছে। আবার দরজা খুলতে হবে, কনকনে হাওয়া ঢুকবে, মোমবাতি নিবে। কেউই উঠে দরজা খুলতে যায় না। দরজার কাছেই আমি বসেছিলাম, বাধ্য হয়েই আমাকেই উঠে দরজা খুলতে হলো।

না, জগা নয়। বিলাসবাবু। বিলাসবাবু সন্ধ্যাসমিতির একজন স্থায়ী সদস্য। প্রতি সন্ধ্যাতেই আসেন।

বিলাসবাবু চাকরি করেন আবহাওয়া দপ্তরে। তাঁর গলাবন্ধ ফুলহাতা সোয়েটারে এবং মাফলারে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি গুঁড়ো লেগে রয়েছে। বিলাসবাবুর দুর্ভাগ্য এই যে আবহাওয়া একটু এদিক-ওদিক হলেই সবাই তাঁর সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে রসিকতা করেন।

আমিও অবশ্য তাই করলাম আজকে। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে ঠাট্টা করে বললাম, 'কি, বৃষ্টিটা নামিয়ে এলেন বুঝি।'

এ ক'দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলছিল বলে সবাই অল্পবিস্তর আবহাওয়া বার্তার দিকে নজর রাখছিল। আবহাওয়া দপ্তরের আজকের পূর্বাভাসে বৃষ্টির কথা একেবারেই ছিল না এবং বলা ছিল শীত কমবে।

এরকম ভুল আবহাওয়াবার্তায় অনেক সময়েই হয়ে থাকে এবং সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিলাসবাবু নিজে খুবই সুরসিক লোক। তিনি ঘরে ঢুকে রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একপাশে বসলেন। এর মধ্যে মোমবাতিটা নিবে গিয়েছিল, আবার সেটাকে দরজা বন্ধ করে জ্বালানো হল।

বিলাসবাবু শক্ত হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা ঘরের মধ্যে কি নিয়ে যেন গোলমাল করছিলেন?' আমি বললাম, 'আপনার বিষয়েই, ঐ আবহাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রভাকরবাবু ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে বললেন, এই নিয়ে তৃতীয়বার বললেন কথাটা, 'আমি বলছিলাম, হিব্রু ভাষায় একটা প্রবাদ আছে।'...

আমরা সবাই জানি যে প্রভাকরবাবু হিব্রুভাষা জানেন না এবং প্রভাকরবাবু এখন যে প্রবাদের কথাটা বলবেন, সেটা হিব্রুভাষায় কেন, পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই হয়তো নেই। কিন্তু সেই জন্যেই তাঁর কথাবার্তা এত আকর্ষণীয় এবং তাঁকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাঁর গল্প শুনতে আমাদের খারাপ লাগে না।

প্রভাকরবাবুর কায়দা হল এক-একটি বাক্য বলে কিছুক্ষণ থেমে থাকা। এতে ওঁর সুবিধে হয়, অনেক কিছু ভেবে নিতে পারেন; আমাদেরও সুবিধে হয় টিকাটিপ্পনি করার।

সে যা হোক, আজকের আলোচনার গোড়ায় ফিরে যাই। শীতের বৃষ্টি নিয়ে কথা হচ্ছিল। উকিল নরেশবাবু বলছিলেন এই বৃষ্টি খুব খারাপ। ধান নষ্ট হবে, আমের বোল, লিচুর মুকুল, কাঁঠালের মুচি সব কিছুর ক্ষতি হবে। উকিলবাবুর দেশে জমিজমা আছে,

তাঁর এই বক্তব্যের গুরুত্ব আছে। কিন্তু অন্য একজন, পরেশবাবু, ভারিক্কি ধরনের হেডমাস্টার মানুষ। এককালে রীতিমত বখা ছিলেন এখন মেয়েদের স্কুলের হেডমাস্টার। একটু গম্ভীরভাবে সামলে-সুমলে চলতে হয়, তাঁর কথাবার্তায়ও হেডমাস্টারি ভাবটা এসে গেছে, তিনি বললেন, 'এ বৃষ্টি খুব ভালো ব্যাপার। এতে ফল ফসলের কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং উপকার হবে।' তিনি খনার বচন উদ্ধৃত করে রীতিমত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'স্বয়ং খনা বলেছেন, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'

সত্যিই সময়টা মাঘের শেষ চলছে, খনা পক্ষে থাকায় পরেশ হেডমাস্টারের একটু সুবিধে হল। কিন্তু উকিলবাবুও ছাড়ার পাত্র নন, গত সপ্তাহেই তিনি গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। সদ্য দেখে এসেছেন, আম গাছে বোল এসেছে, রবি ফসলে দানা বেঁধেছে। বৃষ্টি আর সেই সঙ্গে মেঘলা ভাবটা এক আধদিন থাকলেই সমূহ সর্বনাশ হবে, তখন কেতাবি বিদ্যা বা খনার বচনে মোটেই কাজ হবে না।

তুমুল তর্ক বেধে গেল। শীতের অকাল বৃষ্টি ভালো না খারাপ, এই প্রশ্নে সদস্যেরা দুই দলে ভাগ হয়ে রীতিমত হৈ হল্লা শুরু করে দিল। বলা বাহুল্য এদের কারোই এবিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, সবাই মোটামুটি কলকাতার লোক, শুধু একজন ছোটবেলায় কয়েক বছর কাকদ্বীপে ছিলেন, তিনি বললেন, 'বৃষ্টি হলে তরমুজ খুব বড় বড় হয়।'

এরই মধ্যে খনার বচনের সুবাদে প্রভাকরবাবু পরপর দুবার হিব্রু প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। এখন বিলাসবাবু ঘরে ঢুকতে তিনি আরেকবার বললেন, 'হিব্রুভাষায় একটা প্রবাদ আছে।'

আমরা জানি প্রভাকরবাবু যখন ধরেছেন প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত ধরে থাকবেন। তার আগে বিলাসবাবু একটা মজার কথা বললেন। বিলাসবাবু বললেন যে, এই হঠাৎ বৃষ্টিটা এসে গেলো এটা তাঁরা আবহাওয়া অফিসেও চব্বিশ ঘণ্টা আগে টের পাননি। কোথাও সহসা একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, তারই জের টেনে এই বৃষ্টি।

অতঃপর বিলাসবাবু যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য। এই অকালবৃষ্টি। মাঘের শেষের বর্ষণ ভালো কি খারাপ, এমনকি হিব্রু প্রবাদের অবতারণার প্রচেষ্টা চাপা পড়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

পাবলিক আর খবরের কাগজ আজ কিছুদিন হল যাচ্ছেতাই হেনস্তা করছে আবহাওয়া দপ্তরকে। বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত সাড়ে তিনশো দিন আবহাওয়া অফিস যা বলে তা মিলে যায় কিন্তু ঐ যে বছরে দিন দশ পনেরো ভুলভাল হয় তাই নিয়ে সবাই কটুকাটব্য, তিক্ত ও বক্র মন্তব্য করে। হাসাহাসি করে।

বিলাসবাবু বললেন, তাঁদের ওপরওয়ালারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন থেকে আর ওরকম হবে না, আবহাওয়া বুলেটিন এখন থেকে শতকরা একশো ভাগ শুদ্ধ হবে। এমন কি ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এই সব দুর্যোগও আবহাওয়া বুলেটিনে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ থাকবে।

আমরা সবাই বুঝলাম, এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। এ রকম হতেই পারে না, এর মধ্যে বিলাসবাবুর কোন চালাকি বা রসিকতা আছে।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসবাবু নিজেই ব্যাপারটা ভাঙলেন, বিলাসবাবু বললেন, 'ঠিক হয়েছে যে, এখন থেকে আমরা আর পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার বুলেটিন না দিয়ে পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়াবার্তা দেব। তাতে আর কোন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

একথা শুনে আমরা সবাই অল্পবিস্তর হাসলাম। তবে আমরা বিলাসবাবুর রসিকতা যতটা জোরালো হবে ভেবেছিলাম তা একেবারেই হয়নি।

এই সুযোগে, প্রভাকরবাবু আবার আত্মপ্রকাশ করলেন। চতুর্থ বার বললেন, 'হিব্রু ভাষায় একটা প্রবাদ আছে।'

বিলাসবাবুর গল্পটা প্রায় মাঠে মারা যাওয়ায় এবার আর প্রভাকরবাবুর দিকে নজর না দিয়ে পারা গেল না। আমিই বললাম, 'প্রভাকরবাবু, আপনার ঐ হিব্রু প্রবাদের ব্যাপারটা কি? আর তার সঙ্গে জল, বৃষ্টি, আবহাওয়ার কি সম্পর্ক?' বিলাসবাবু বললেন, 'আবহাওয়া সম্পর্কে কোনও হিব্রু প্রবাদ আছে নাকি?'

ইতিমধ্যে জগা এসে চায়ের ফাঁকা গেলাসগুলো তুলে নিয়ে গেল। আরেকবার মোমবাতি নিবল, আরেকবার জ্বালানো হল। জগার মা এসে বলল, বাদলার জন্যে আজ তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করবে। যদি আর চা লাগে এখনই দিয়ে যাবে।

প্রভাকরবাবু সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্যে আরেক রাউন্ড চা এবং চানাচুর আদেশ করলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা এতক্ষণ এই বৃষ্টিটা ভালো না খারাপ তাই নিয়ে তর্ক করলেন। তাই শুনে আমার ঐ হিব্রু প্রবাদটার কথা মনে পড়ল। আর সেই সঙ্গে একটা গল্প।'

উকিলবাবু জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'হিব্রু প্রবাদে এই বৃষ্টি সম্পর্কে কি বলেছে, ভালো না খারাপ?' প্রভাকরবাবু বললেন, 'বৃষ্টি সম্পর্কে হিব্রু প্রবাদে কিছু বলা নেই। প্রবাদটার কথা হল, যা ভালো তাই খারাপ আর যা খারাপ তাই ভালো। যেমন এই বৃষ্টিটা ভালো আবার খারাপও বটে।'

বিলাসবাবু আর আমি সমস্বরে বললাম, 'এ আবার কি হেঁয়ালি?'

প্রভাকরবাবু বললেন, 'দেখুন হেঁয়ালি-টেঁয়ালি নয়। প্রবাদটা বোঝাবার জন্যে আমি একটা ঘটনা বলছি।'

আমরা এটাই আশা করেছিলাম, এবার চুপ করে প্রভাকরবাবু কি বলেন শুনতে লাগলাম।

প্রভাকরবাবু বলতে লাগলেন, 'ধর্মতলার পূর্বদিকের শেষ মাথায় সানরাইজ বার বলে একটা জায়গা ছিল আমাদের মদ খাওয়ার আড্ডা।'

আমি বললাম, 'সানরাইজ বার নামে কোনও কিছু ওদিকে দেখিনি তো।' প্রভাকরবাবু বললেন, 'আগে গল্পটা শুনুন। এটা অনেকদিন আগের কথা। যে জায়গায় বারটা ছিল সে জমিতে এখন এগারোতলা বাড়ি উঠেছে।'

প্রভাকরবাবুকে আমরা আর বাধা দিলাম না। তিনি বললেন, 'ঐ সানরাইজে একসময় আমি সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিতুম। আড্ডা মানে মদ্যপান। তবে কখনও মাতাল হতুম না।'

আমরা কেউ কেউ তাঁর এ কথায় মুচকিয়ে হাসলাম, কিন্তু মোমবাতির সামান্য

আলোয় প্রভাকরবাবু হয়তো সেটা দেখতে পেলেন না।

যা হোক, চা এসে গিয়েছিলো, চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে প্রভাকরবাবু বলতে লাগলেন, 'সানরাইজে বসন্ত সেন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। দুজনে এক টেবিলে বসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মদ খেতাম। বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। শুনেছিলাম সে কোথায় এক কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে কাজ করে। হঠাৎ একদিন বসন্ত এল না। তারপর, সে আর এলই না। কানাঘুষো শুনলাম, সে নাকি কোঅপারেটিভ থেকে লাখখানেক টাকা সরিয়ে উধাও হয়েছে। এরপরে তার আর খোঁজ পেলাম না। তাঁকে ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ গতবার আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা। স্টেশনের থেকে তাজমহলে যাওয়ার পথে বাজারের মোড়টায় একটা মদের দোকান আছে, 'সাজাহান ওয়াইন শপ', সেখানে এক পাঁইট রাম কিনতে গেছি। দেখি কাউন্টারে বসন্ত সেন। এতদিন বাদে হলেও আমি তাকে একবার দেখেই চিনতে পারলাম। সেও চিনতে পারল, মোটেই আত্মগোপনের চেষ্টা করলো না। বরং সন্ধ্যায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। হোটেলে উঠব ভেবেছিলাম। সুটকেসটা হাতেই ছিল, সেটা তার দোকানে নামিয়ে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে রিকসায় করে তাজমহল দেখতে চলে গেলাম। বললাম তাজমহল দেখেশুনে সরাসরি তার বাড়িতে সন্ধ্যায় চলে যাব।'

ইতিমধ্যে চা পান এবং চানাচুর খাওয়া শেষ হয়েছে। বাইরে বৃষ্টির জোর আরেকটু বেড়েছে। শীতের রাতের বৃষ্টি সহজে হয়তো ছাড়বে না। আমরা কেউ কেউ উঠি উঠি করছিলাম। বাড়িতে যদি আবহাওয়ার মেজাজ বুঝে খিচুড়ি-টিচুড়ি রান্না হয় তাহলে সময়মত না পৌছালে গোলমাল আছে।

কিন্তু প্রভাকরবাবু গল্পটা ভালো ধরেছেন। বসন্ত সেনের গল্পটা জমবে বলেই মনে হচ্ছে, তাছাড়া গল্পের মধ্যপথে ওঠাটা ঠিক ভদ্রতাও নয়।

'সন্ধ্যায় গেলাম বসন্ত সেনের বাড়িতে।' প্রভাকরবাবু বলতে লাগলেন, 'বসন্ত আগেই চলে এসেছিল। দেখলাম বাসায় সে একাই থাকে। এক মধ্যবয়সী দেহাতি কাজের মেয়ে আছে, নাম বোধহয় জানকী। জানকী সধবা না বিধবা না অবিবাহিতা কিছুই বোঝা গেল না। তবে বুঝলাম রান্নাবান্না থেকে সংসারের সব কিছুই সে করে।

'একটা ছোটগলির একদম শেষে একটা ছোট একতলা বাড়ি, গেটে নেমপ্লেট রয়েছে এস বসন্ত (S. Vasanta)। বুঝলাম নামটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে সে, সেনকে এস করে বসন্ত নামটাকে উপাধি বানিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্যে বোধহয় এটা প্রয়োজন ছিল। নেমপ্লেটে নামের নিচে লেখা রয়েছে ওয়াইন মার্চেন্ট।

'বসন্ত কিন্তু খুব সমাদর করল। বাড়িতে আসার পথে একটা দোকান থেকে মাংসের বড়া আর কাবাব নিয়ে এসেছে। আমি পৌছে যাওয়ার পর সে সেগুলো উঠোনে একটা ছোটো জনতা স্টোভে গরম করতে লাগল। জানকী মাছ-মাংস ছোঁয় না, শুদ্ধাচারী। তাই এই ব্যবস্থা।

'সে যা হোক, বসন্ত বড় এক বোতল ফৌজি রামও এনে রেখেছিল। একটু পরে গেলাস, বোতল, জল এই সব নিয়ে দুজনে পরিপাটি করে বসলাম। প্লেটে প্রচুর পরিমাণে মাংসের বড়া এবং কাবাবও রইলো।

'কোনও কিছুরই অভাব নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের অন্তরঙ্গ আড্ডা জমে

উঠল। কথায় কথায় পুরনো প্রসঙ্গও উঠল। বসন্ত কিছুই রাখঢাক না করে নিজের কথা সব বলতে লাগল।'

এই সময় হঠাৎ আলোটা জ্বলে উঠল, বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে। সন্ধে কাবার করে রাতের দিকে এগোচ্ছে সময়। আলো জ্বলতে অনেকেই হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা সমিতিব দেয়ালেও একটা ওয়াল-ক্লক আছে। অভ্যাসমতো সেটার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতঘড়ির সময় মনে মনে মিলিয়ে দেখা আমার অনেকদিনের অভ্যেস। দেখলাম দুটোতেই প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বৃষ্টির সন্ধ্যায় এর চেয়ে বেশি দেরি না করাই ভালো। যে-কোনও সময় আরও বৃষ্টি আসতে পারে।

আমি উঠতে যাব এমন সময় হেডমাস্টার পরেশবাবু প্রভাকরবাবুকে ধরলেন, 'আপনি যে তহবিল তছরুপের গল্প ধরেছেন মশায়, তার মধ্যে আবার মদও এনে ফেলেছেন। গোড়ায় বললেন যা ভালো তাই খারাপ, এই বৃষ্টিটা ভালোও বটে, খারাপও বটে। এখন অন্য গল্প ধরলেন কেন?'

পরেশবাবু আমাদের সকলের মনের কথাই বলেছেন। আমরাও এই কথাই ভাবছিলাম।

প্রভাকরবাবু পরেশবাবুর কথার জবাবে বললেন, 'যা ভালো তাই খারাপ। যা খারাপ তাই ভালো। সেই কথাই তো বলছি। বুঝতে পারছি বৃষ্টির জন্যে আপনাদের বাড়ি যাওয়ার তাড়া আছে। অল্প একটু ধৈর্য ধরুন। গল্পটা এখনই গুটিয়ে আনছি।' তারপর প্রভাকরবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আরেক কাপ চা হলে ভালো হতো, তাই না?'

কিন্তু চায়ের আর উপায় নেই। একটু আগে জগা এসে আগের খালি গেলাসগুলো নিয়ে চলে গেছে। তাদের দোকান এখন বন্ধ।

তবু প্রভাকরবাবুর আন্তরিকতা দেখে আরেকটু বসে গেলাম। যদি দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে গল্পটা মিটে যায়, দেখাই যাক না।

প্রভাকরবাবু বললেন, 'চা তো হল না। আপনারা যদি অনুমতি করেন এবার তবে গল্পটা হোক। বলেছিলাম না, যা ভালো তাই খারাপ। এবার গল্পটায় সরাসরি যাচ্ছি। বুঝতে পারবেন কথাটার মানে।'

আমরা আর বাধা দিলাম না। এখন যত তাড়াতাড়ি শেষ করে ততই মঙ্গল।

প্রভাকরবাবু আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। জানকী আর বসন্ত সেনকে নিয়ে একটা রসালো গল্প বোধহয় তাঁর জিভের ডগায় সুড়সুড় করছিল। প্রভাকরবাবু বললেন, 'জানকীর ব্যাপারটা আজ না হয় থাক। বসন্তের সেই ভালো খারাপের ব্যাপারটা বলি।'

ভালো খারাপের ব্যাপারটা আমরা যতো সোজা ভেবেছিলাম প্রভাকরবাবুর গল্পে কিন্তু ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল।

আমি কারুকার্য করতে যাব না। প্রভাকরবাবুর লাইনেই গল্পটা বলি। সে লাইনটা আমার লাইনের চেয়ে খারাপ নয়।

প্রভাকরবাবু বললেন, 'বসন্তের সঙ্গে নানা সুখদুঃখের গল্প হল। সে বলল, তহবিল তছরুপ না করে কোনও উপায় ছিল না। কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে যা মাইনে-টাইনে পেতুম তাতে কায়ক্লেশে খাওয়াদাওয়া চলে যেত কিন্তু এই মদের নেশাটা ধরে বেকায়দায় পড়ে

গেলুম। সামান্য চাকরির টাকায় তো আর মদের খরচা চলে না। আমি অল্প অল্প ক্যাশ ভাঙতে লাগলুম। বছর খানেকের মধ্যে টাকার অঙ্কটা প্রায় তিরিশ হাজারে পৌঁছল। তখন রেস খেলতে শুরু করলাম এই আশায় যে রেসে জিতে যদি টাকাটা তুলতে পারি। সে তো হলই না বরং আরও হাজার কুড়ি টাকা গচ্চা গেল। তখন দেখলাম আর বেশিদিন ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা যাবে না, ধরা পড়বই, জেলে যাবই; সব রকম ভেবে চিন্তে ক্যাশে বাকি যা হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিল সেটা নিয়ে কেটে পড়লাম।'

প্রভাকরবাবু থামলেন। গল্পটা শেষমেশ মোটেই জমল না। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। এই এক মামুলি টাকা চুরির গল্পের জন্যে এত সব কায়দা, যা-ভালো তাই-খারাপ, হিব্রু প্রবাদ। আমি মনে মনে ঠিক করলাম আগামীকাল থেকে প্রভাকরবাবু গল্প আরম্ভ করলেই বাধা দেব।

কিন্তু প্রভাকরবাবুর মুখ দেখে মনে হল, আজকের গল্পটাই এখনও শেষ হয়নি। তিনিও নিঃশব্দে হাত তুলে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন, জানালেন যে এর পরে আর গল্প বিশেষ নেই শুধু তাঁর সঙ্গে সেই রাতে বসন্ত সেনের যা বাক্যালাপ হয়েছিল সেটুকু শুনলেই হয়ে যাবে।

প্রভাকরবাবুর গল্প লিখছি আমি। প্রভাকরবাবু বলছেন বসন্ত সেনের কথা। ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি এরপর পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার্থে সরাসরি প্রভাকরবাবু কথিত বসন্তবাবুর ও প্রভাকরবাবুর বাক্যালাপ তুলে ধরছি।

প্রভাকরবাবু : বসন্ত তুমি ঐ টাকা নিয়ে কোথায় গেলে? পুলিশে তোমাকে ধরার চেষ্টা করেনি?

বসন্তবাবু : দেখুন প্রভাকরদা, নিজে থেকে ধরা না দিলে কিংবা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ধরিয়ে না দিলে এসব কেসে পুলিশ কাউকে ধরার চেষ্টা করে না। আমি টাকা নিয়ে চলে এলাম এখানে আগ্রায়। পাশেই একটা দেহাতে ঘরভাড়া নিয়ে চুরির টাকায় দশটা দুধেল গরু কিনলাম। দুধের ব্যবসা শুরু করে দিলাম।

প্রভাকরবাবু : ভালো।

বসন্তবাবু : ভালো আর কি বলছেন দাদা। দুধের ব্যবসায় খুব লাভ হতে লাগল।

প্রভাকরবাবু : খুব ভালো।

বসন্তবাবু : কিন্তু হঠাৎ গোমড়ক শুরু হল। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। এক রাতে আমার দশটা গরুই মরে গেল।

প্রভাকরবাবু : খুব খারাপ।

বসন্তবাবু : কিন্তু কিছুই ক্ষতি হল না আমার। তাজা গরুর চেয়ে মড়া গরুর চামড়ার দাম বেশি। ওই মরা গরুগুলো কশাইয়ের কাছে বেচে যাট হাজার টাকা পেলাম।

প্রভাকরবাবু : ভালো।

বসন্তবাবু : তাছাড়া সরকার থেকে কয়েক মাস পরে ক্ষতিপূরণ পেলাম।

প্রভাকরবাবু : খুব ভালো।

বসন্তবাবু : তখন আর দুধের ব্যবসায় গেলাম না। চোলাই মদের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। রমরমা কারবার শুরু হল।

প্রভাকরবাবু : ভালো।

বসন্তবাবু : একদিন পুলিশ এসে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল।

প্রভাকরবাবু : খুব খারাপ।

বসন্তবাবু : খারাপ আর কি? থানার বড়বাবুকে ব্যবসার পার্টনার করে নিলাম। ব্যবসা আরও জমে উঠল।

প্রভাকরবাবু : ভালো। খুব ভালো।

বসন্তবাবু : এবার ঠিক করলাম বিয়ে করব। খুব সুন্দরী এখানকারই একটা পাত্রী দেখে বিয়ে করেই ফেললাম।

প্রভাকরবাবু : খুব ভালো।

বসন্তবাবু : কিন্তু মেয়েছেলেটা বড়ো দজ্জাল। বিয়ের সাত দিনের মধ্যে গালাগাল ঝগড়াঝাঁটি, এক মাসের মধ্যে মারধোর শুরু করল, ঝাঁটা দিয়ে, খুন্তি দিয়ে, চেলা কাঠ দিয়ে, এখন শরীরে কালশিটের দাগ আছে।

প্রভাকরবাবু : খারাপ। খুব খারাপ।

বসন্তবাবু : এর মধ্যে একটা বাড়িও তৈরি করে ফেলেছিলাম। খুব সুন্দর দোতলা বাড়ি। ফুল গাছ, লন।

প্রভাকরবাবু : খুব ভালো।

বসন্তবাবু : কিন্তু বৌয়ের যন্ত্রণায় বাড়িতে টিকতে পারতাম না। বাড়িতে ঢুকতে গেলেই চেলাকাঠ ছুঁড়ে মারত, দোতলা থেকে গরমজল গায়ে ফেলার চেষ্টা করত। আর চেঁচামেচি, চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার, মোগলাই গালিগালাজ, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত বাড়িতে টিকতে পারছিলাম না।

প্রভাকরবাবু : খারাপ।

বসন্তবাবু : বাড়িটায় হঠাৎ একদিন আগুন লেগে গেল। আগুনে বাড়িটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেল।

প্রভাকরবাবু : খুব খারাপ।

বসন্তবাবু : কিন্তু বাড়িটা ইনসিওর করা ছিল। দু'লাখ টাকা পেয়ে গেলাম।

প্রভাকরবাবু : ভালো।

বসন্তবাবু : বাড়িটার সঙ্গে দজ্জাল বৌটাও পুড়ে মরল। তার ইনসিওর থেকে আরও দেড় লাখ টাকা পেলাম।

প্রভাকরবাবু : খুব ভালো।

এই ভালো, খুব ভালো, খারাপ, খুব খারাপ কতক্ষণ ধরে চলত বলা কঠিন। এই সময়ে হঠাৎ আবার লোডশেডিং হল, আলো নিবল। আমরা প্রভাকরবাবুকে আর সুযোগ না দিয়ে দ্রুত উঠে পড়লাম।

এ বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। অন্ধকার রাস্তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে যেতে যেতে রাস্তায় বিলাসবাবুকে বললাম, 'এই বৃষ্টিটা ভালো

না খারাপ কিছুই জানা গেল না।' পিছনেই প্রভাকরবাবু ছিলেন, অন্ধকারে টের পাইনি, তিনি বললেন, 'একটা হিব্রু প্রবাদে আছে।' ...তাঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না বিলাসবাবু, দ্রুত পা চালাতে চালাতে বললেন, 'খুব ভালো, না খুব খারাপ?'

ব্যাঙ

কার্তিকের বৃষ্টি

প্রত্যেক দিন যে রকম হয়, আজও তাই হল। ভোরবেলা, খুব ভোরবেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল রমেশবাবুর।

অথচ এরকম কথা ছিল না।

গতকালই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন রমেশবাবু, রমেশচন্দ্র রায়। পাকা তেত্রিশ বছর আটমাস এগার দিন বন্যপ্রাণী ও পশুপালন অধিকারে এক নাগাড়ে চাকরি করেছেন তিনি। এরমধ্যে প্রথম কয়েকবছর নিম্নবর্গীয় এবং উচ্চবর্গীয় কেরানীর পদে, তারপরে বাকি জীবন ছোট বড়বাবু এবং বড় বড়বাবু হয়ে। বিপত্নীক রমেশবাবু তাঁদের সাবেকি পৈতৃক বাড়ির অর্থাৎ হাতিবাগানে হরি সেন স্ট্রিট এবং হেমেন্দ্র ঘোষ রোডের উত্তর-পশ্চিম মোড়ের দ্বিতীয় বাড়ির বাইরের ঘরে একাই থাকেন। বাড়ির মধ্যে ভাই-ভাইবৌ, ছেলে-ছেলের বৌ, ভাইপো, ভাইঝি একটা ছোট নাতনি ইত্যাদির বসবাস।

বছর দশেক আগে, স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে পরেই বাড়ির মধ্য থেকে এই বাইরের ঘরে সরে আসেন রমেশবাবু। তারপর থেকেই সংসারের সঙ্গে তাঁর একটু আলগা-আলগা সম্পর্ক। মাসকাবারি সংসার খরচের টাকাটা ভাইবৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ। মাঝেমধ্যে ছোট নাতনিটা তাঁর কাছে এসে ঘুর ঘুর করে, খুব মিষ্টি হয়েছে মেয়েটা। মুখের ছাঁচটা ধরে ঠাকুমার মত।

পরলোকগতা স্ত্রীর কথা স্মরণ হতে একটু উদাস হয়ে যান তিনি। কিন্তু নাতনিটাকে খুব পাত্তা দেন না। আর মায়া বাড়াতে চান না। এ সব অবশ্য অবান্তর কথা। ব্যাঙের ঘটনার সঙ্গে খুব প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু বড় গল্পোপম ছোট গল্প লিখতে গেলে অনেক আশপাশের কথা লিখতে হয়, সেটাই নাকি নিয়ম।

আসল কথা হল, বন্যপ্রাণী ও পশুপালন অধিকারের বড়বাবু রমেশচন্দ্র রায় গতকাল রিটায়ার করেছেন। তিনি মনে মনে স্থির করেছেন, এবার একটু বহির্মুখী হতে হবে। এতদিন বাড়ির ব্যাপারে আলগা দিয়েছেন, এবার অফিসও আলগা হয়ে গেল। এবার জিরানোর সময় এসেছে।

তবে শুধু জিরানো নয় সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটাকে, জগৎ সংসারকে একটু দেখতে হবে।

সেই নাইনটিন ফিফটি সিক্স, পৌনে তিন টাকায় এক সের মাংস, মিঠে পান তিন পয়সা, বাংলা পান দু পয়সা, একটা আইসক্রিম সোডা তিন আনা, পাইস হোটেলে ভাত-ডাল-ভাজা-তরকারি-মাছ দুবেলা তিরিশদিন মাসে সাড়ে আটাশ টাকা। রমেশচন্দ্রের মনে পড়ছে বাটা কোম্পানি সেই প্রথম হাওয়াই চটি বাজারে বার করল, দাম সাড়ে ছয় টাকা।

দাম শুনে চমকে গিয়েছিলেন রমেশবাবু, তখন কলকাতা-ধানবাদ রেলগাড়িতে যাতায়াতী টিকিটের দাম সাত টাকা। এ সব পুরনো কথা মনে করে দুঃখ করার লোক নন রমেশবাবু। তিনি সরকারি অফিসের বড়বাবু ছিলেন, রীতিমত বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন লোক। তিনি জানেন, যে সব সময় গেছে সে আর ফিরে আসবে না তবে অন্য সময় আসছে, সামনে পড়ে রয়েছে অঢেল ফাঁকা সময়। সে সময়টার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এতদিন পর্যন্ত বড় কষ্টে, বড় পরিশ্রমে কেটেছে। অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি, বিশেষ কোনদিন ছুটিছাটা নেওয়া হয়নি। সে যাওবা আগে নিয়েছেন, সেও সংসারের দরকারে, সে সময় পরিশ্রম হয়েছে আরও বেশি।

রমেশবাবু ঠিক করেছিলেন অবসরের পরের দিন থেকেই জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলিয়ে ফেলবেন। আজ সকালে সাড়ে সাতটার আগে কিছুতেই ঘুম থেকে উঠবেন না। কিন্তু আজও সেই সাত সকালে ঘুম ভেঙে গেল।

রমেশবাবু তবু বিছানা আঁকড়িয়ে পড়ে রইলেন, জানলা দিয়ে বাইরে থেকে ফিকে আলো আসছিল, গায়ে একটা পাতলা চাদর ছিল, সেটা দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। এবং যে কোনও কারণেই হোক এই অবস্থায় তাঁর একটু হালকা তন্দ্রার মত ভাব এল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয় মাত্র দশ-পনের মিনিট পরেই তিনি পুরো জেগে উঠলেন।

এতদিনের অভ্যেস একদিনে কি যাবে? তন্দ্রা কেটে যেতে রমেশবাবুর প্রথমেই মনে পড়ল, আজকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকার কথা তাঁর। বাড়ির কাজের মেয়েটা প্রত্যেকদিন সকাল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তাঁকে এক কাপ চা আর দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট দেয়। কাল রাতেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে বলে দিয়েছেন, 'বৌমা, কাল থেকে এত সকালে আমাকে চা দিতে বারণ করো। আমি বেলায় উঠে নিজেই চেয়ে নিয়ে চা খাব।'

কিন্তু অন্যদিনের মত আজও একই সময়ে, কিংবা হয়ত একটু আগেই ঘুম ভেঙে গেছে রমেশচন্দ্রের। তারপরে তন্দ্রাও মাত্র মিনিট দশেকের। যদিও এটা কার্তিক মাস। হাওয়ায় একটা হিমেল ভাব, শেষরাতে একটু ঠাণ্ডা থাকা উচিত। কিন্তু ঘুম ভাঙতে রমেশচন্দ্র বুঝতে পারলেন গরম লাগছে, কপালে, পিঠে একটু ঘাম। কানের লতির নিচে একটু উষ্ণভাব। যে চাদরটা দিয়ে মুখ ঢেকে আলো এড়াচ্ছিলেন, সেটা একটা পাতলা মুগার চাদর। সেটা এবার সরিয়ে দিলেন রমেশচন্দ্র। একটু স্বস্তি হল।

হরি সেন স্ট্রিটের এই একতলার উত্তর-পশ্চিম মুখের বাইরের ঘরটা চিরদিনই খুব গুমোট। বার ফুট গলি, চারপাশে সব দোতলা-তিনতলা বাড়ি—হাওয়া আসবে কোত্থেকে?

হয়ত এই সব কারণেই কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, যাকে সময় লাঘবের জন্যে ব্যস্ত লোকেরা বলেন সিইএসসি, যাঁদের প্রথম বিদ্যুৎ গছাতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে হরি সেন স্ট্রিটের নাগরিকেরা অন্যতম।

কাঠের চার ব্লেডের একটা আদ্যিকালের ডি সি পাখা এ ঘরে রয়েছে, সেটার বয়েস ষাট-সত্তর হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। রমেশবাবু নিজে জন্ম থেকেই সেটা দেখছেন।

আকাশে বোধহয় খুব মেঘ করেছে। চারদিকে কেমন একটা চাপা ভাব। এ ঘরের পাখাটা পারতপক্ষে রমেশবাবু ব্যবহার করেন না। কিন্তু আজ কি মনে হল, তিনি বিছানা থেকে উঠে পাখাটা চালিয়ে দিলেন।

পুরনো পাখাটা প্রায় দিন পনের বন্ধ ছিল। পরশুদিন জগদ্ধাত্রী পুজো গেছে। প্রত্যেক

বছরই নিয়ম করে কালীপুজোর পরে পাখাটা চালানো বন্ধ করে দেন রমেশবাবু। এবারেও তাই করেছেন।

আজ এই সকালে পাখাটার সুইচ অন করে দিতে পাখাটা কিন্তু স্টার্ট নিল না। অনেক সময় এরকম হয়, পুরনো পাখা কিছুদিন বন্ধ থাকলে চালু হতে সময় নেয়।

এ রোগের চিকিৎসা রমেশবাবুর জানা আছে। ঘরের কোনায় দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেওয়া একটা বেতের লাঠি আছে, সেই লাঠিটা নিয়ে পাখার ব্লেডে লাগিয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিলেন তিনি।

পাখাটা আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম পেলেন রমেশবাবু, আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এবার সত্যিসত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ভাঙল ব্যাঙের ডাকে আর বৃষ্টির শব্দে।

একটু ঠাণ্ডাও লাগছিল। বিছানার ওপর উঠে বসলেন রমেশবাবু। সারা রাতের গুমোট কেটে গিয়ে এই ভোরবেলায় প্রবল বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির তোড়ের শোঁ শোঁ শব্দ তারই মধ্যে 'ঘোঁঙর ঘোঁ' 'ঘোঁঙর ঘোঁ' ব্যাঙের ডাক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ঘুমের ঘোর কেটে যেতে রমেশবাবু খেয়াল করলেন কার্তিক মাসে কলকাতায় এমন বৃষ্টি কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনও কোনও বছর এরকম হয়।

কিন্তু ব্যাঙ? এই গহন শহরে হরি সেন স্ট্রিটে ব্যাঙ এল কোথায়। কোনদিন তো এ অঞ্চলে ব্যাঙ দেখেননি রমেশবাবু।

কিন্তু মনে হচ্ছে খুব কাছেই ডাকছে ব্যাঙটা।

রমেশবাবু প্রথমে ঘরের মধ্যে, তারপর জানলা দিয়ে ঘরের বাইরে চোখ মেলে ব্যাঙটাকে খুঁজতে লাগলেন।

[দুই] একটি প্রক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ : ব্যাঙ কি ও কেন?

গল্পটা পুরনো। কিন্তু ব্যাঙ নামের কাহিনীতে গল্পটা না লিখে উপায় নেই।

বিপিন পাল কলেজে বাংলা পড়াতেন এক ভদ্রলোক। অধ্যাপকের পৈতৃক বাটি ময়মনসিংহে, মাতুলালয় বাখরগঞ্জে।

[কি বলছেন, কি?

বিপিন পালের নামে কোথাও কোনও কলেজ নেই? সুরেন ব্যানার্জি থেকে হীরালাল পাল পর্যন্ত সকলের নামে কলেজ আছে কিন্তু মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় বিপিন পাল অ্যাবসেন্ট, অনুপস্থিত! বিপিন পাল বাদ?

ভাবা যায়?]

সে যাক।

ধরে নিচ্ছি, বিপিন পালের নামে না থাকলেও অন্য কোনও নামের একটা কলেজে এক বাংলার অধ্যাপক ছিলেন, যাঁর উচ্চারণে দেশজ টান ছিল যথেষ্ট প্রবল।

তিনি বৈষ্ণব কবিতা পড়াচ্ছিলেন, সেই যেখানে বর্ষার কথা আছে, মত্ত দাদুরীর কথা আছে। ছাত্রেরা স্বভাবতই দাদুরী মানে কি জানতে চাইল।

অধ্যাপক মহোদয় বললেন, 'সে কি তোমরা দাদুরী মানেও জান না। দাদুর মানে হল বেঙ, দাদুরী মানে হল মহিলা বেঙ।'

ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বুঝল ব্যাপারটা, কিন্তু অনেকেই তখন মজা পেয়ে গেছে, তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেঙ কি স্যার?'

অধ্যাপক বুঝলেন এরা কলকাতার ছেলে, জন্মেও ব্যাঙ দেখেনি, তাই তিনি শুদ্ধ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'বেঙ বুঝলে না? বেঙ হল ভ্যাক।'

শয্যাত্যাগ করে উঠে কলঘরের দিকে যেতে যেতে আজ অনেকদিন পরে এই বাজে গল্পটা মনে পড়ল রমেশচন্দ্রের। সেই সঙ্গে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আজ প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর বা তারও বেশি সময় তিনি কোনও ব্যাঙ দেখেননি।

এই হাতিবাগান-শ্যামবাজারী কলকাতায় ব্যাঙ আর কোথা থেকে আসবে। কলকাতার বাইরে বিশেষ বেরনো হয় না। মধ্যে দুবার পুরী আর একবার দিল্লিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে সে সব জায়গাতেও কোনও ব্যাঙ দেখেননি।

ব্যাঙ সত্যি দেখতে কেমন মনে করার চেষ্টা করলেন রমেশবাবু। মনে পড়ছে, ভালই মনে পড়ছে। সেই ছোটবেলায় যুদ্ধের সময়ে বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে এই হরি সেন স্ট্রিটের বাড়িতে তালা দিয়ে তাঁদের বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তাঁর বাবা কুষ্টিয়ার একটা গ্রামে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। নিজে ফিরে এসে একটা মেসে উঠেছিলেন, তাঁরও ছিল সরকারি চাকরি। চাকরির জন্যেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা এসব। কিন্তু কুষ্টিয়ার সেই ছোট জোলো গ্রাম হরিনাথপুরের স্মৃতি এখনও অম্লান রয়ে গেছে রমেশবাবুর মনে।

বাবা! কতরকম যে ব্যাঙ ছিল হরিনাথপুরে।

নামগুলো এখনও মনে আছে। সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, চুনো ব্যাঙ, রাজা ব্যাঙ, বাবু ব্যাঙ।

নামগুলো মনে রয়েছে কিন্তু সবরকম ব্যাঙের চেহারা এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে সোনা ব্যাঙের গায়ে সত্যি একটা সোনালি আভা ছিল, বিশেষ করে চোখের নিচে আর গলার কাছে, বৃষ্টির দিনের রোদ সোনা ব্যাঙের গায়ে পড়লে ঝলমল করে উঠত তাদের শরীর।

আর বাবু ব্যাঙের কথাও মনে আছে।

কেন যে সেগুলোকে বাবু উপাধি দেওয়া হয়েছিল সেই অল্প বয়েসে ধরতে পারেননি রমেশচন্দ্র। এখন, এতকাল পরে চেহারাটার আভাস মনে আসছে তাঁর, গোবদা গোবদা পা, লম্বা নাক, গোল চোখের মণির চারধারে কৃষ্ণবলয় ঠিক যেন পণ্ডিতী চশমা। বারান্দা দিয়ে কলতলার দিকে যেতে যেতে রমেশবাবু পঁয়তাল্লিশ বছর পরে আজ বুঝতে পারলেন কেন ওই ব্যাঙগুলোকে বাবু বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছিল।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগেই হরি সেন স্ট্রিটের ব্যাঙের ডাকের রহস্যটা উত্তীর্ণ হয়েছেন রমেশবাবু।

ব্যাঙটা ঘরেও ডাকছে না, বাইরেও ডাকছে না। গত একশ বছর কিংবা দেড়শ বছর হরি সেন স্ট্রিটে, হরি সেন স্ট্রিটের আশপাশে কোথাও কোনও ব্যাঙ ডাকেনি। অথবা

আরও হয়ত আগে থেকে। সেই যে বছর মারাঠা ডিচ্ খোঁড়া হয়, আদি কলকাতা আর চড়কডাঙা, জেলেপাড়া, কলুটোলা, হাতিবাগান আর শ্যামবাজার-চিৎপুরের সব ব্যাঙ নাকি পালিয়ে গিয়ে মারাঠা ডিচে আশ্রয় নেয়। তারপরে আর সদর শহরে একটাও ব্যাঙ দেখা যায়নি।

বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে যে ব্যাঙের 'ঘোঁঙর ঘোঁ' 'ঘোঁঙর ঘোঁ' ডাক শুনেছিলেন রমেশবাবু একটু পরেই বুঝতে পেরেছিলেন সেটা বেরচ্ছে পুরনো ঐ চার ব্লেডের ডি সি পাখার ভেতর থেকে। বহুদিন অয়েল করা হয়নি। কোনওরকম মেরামতিও হয়নি— পাখাটা আর চলতে পারছে না। ওই রকম করুণ আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে কিংবা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত রমেশবাবুর কাছে সে অবসর প্রার্থনা করছে। তারও তো অনেকদিন হয়ে গেল।

রমেশবাবুর চেয়ে বেশিই।

আস্তে উঠে রমেশবাবু ঘরের দেয়ালের কাছে গিয়ে পাখার সুইচটা অফ করে দিলেন। 'ঘোঁঙর ঘোঁ' শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে বৃষ্টিটাও প্রায় থেমে এসেছে। এখন আর বৃষ্টির আওয়াজে সেই শোঁ শোঁ ভাবটা নেই। ঝিরঝির করে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। উত্তর থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ বছর শীতটা একটু তাড়াতাড়ি এসে গেল। এই বৃষ্টিটাই এনে দিল।

কলতলা থেকে ফিরে এসে রমেশবাবুর চা খাওয়ার কথা খেয়াল হল। অন্যদিন হলে এতক্ষণ কাজের মেয়েটা চা দিয়ে যেত কিন্তু তিনি নিজেই কাল বারণ করে দিয়েছেন এত সকালে চা দিতে। একটু পরে বৃষ্টিটা থামতে রমেশবাবু ছাতাটা নিয়ে রাস্তায় বেরলেন কাছে পিঠে কোনও একটা ফুটপাথের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে নেবেন।

অফিস বা বাড়ির বাইরে বহুকাল কোনও দোকান-টোকানে চা খাননি রমেশচন্দ্র। পাড়ার মোড়ের দুদিকে দুটো চায়ের দোকান রয়েছে। কেমন যেন সঙ্কোচ হল রমেশবাবুর সে সব দোকানে চা খেতে। পুরনো পাড়া, আশপাশে অনেক চেনাজানা লোক। রাস্তায় কোথাও কোথাও এরই মধ্যে জল জমে গিয়েছে, কাদাও যথেষ্ট। কোনও একমে ধুতিজুতো বাঁচিয়ে সামনের দিকে কলেজ স্ট্রিটের বরাবর ট্রামরাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন রমেশবাবু।

বিবেকানন্দ রোড পার হয়ে ঠনঠনের কালীমন্দিরের উলটোদিকে একটা রাস্তার চায়ের দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে বসে একটা সস্তার কেক আর পরপর দু কাপ চা খেলেন তিনি।

চা খাওয়া হয়ে যেতে দোকানের পয়সা মিটিয়ে হাতের হাত ঘড়িতে রমেশবাবু দেখলেন সবে সোয়া ছয়টা বাজে। অফিস নেই, বাড়ি ফেবার তাড়া নেই। হাতে অঢেল সময়। এদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘও বিদায় নিয়েছে। গলিঘুঁজির ফাঁক দিয়ে সূর্যের হালকা আলো রাস্তায় এসে পড়ছে। এই ভোরবেলাতেই ফুটপাথের গর্তের ঘোলাজলে দুটো কাক মাথা ডুবিয়ে স্নান করছে।

অনেকদিন পরে এসব জিনিস চোখে পড়ল রমেশবাবুর। তাঁর কেমন যেন মনে হল জীবনটা বড় বৃথা গিয়েছে। অন্তত এখনও একটা কিছু করা দরকার। সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

[তিন] তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা

হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত এসে গেলেন রমেশবাবু। অনেকরকম এলোমেলো চিন্তা করছেন তিনি, এ বয়েসে নতুন করে কী-ই বা করবেন? কী-ই বা করতে পারেন? কবিতা লেখা, গান করা এ সব কোনোদিনই তাঁর ধাতে আসে না। আর তাছাড়া, সেটা এ বয়েসে আরম্ভ করাও খুব হাস্যকর দেখাবে। অনেকে দেখা যায় রিটায়ার করে রাজনীতি করতে নামে। সমাজসেবার অজুহাতে এ দল কি ও সঙ্ঘে নাম লেখায়। না সে সমস্তও রমেশবাবুর দ্বারা হবে না। ধর্ম-কর্মেও তেমন আস্থা বা মন নেই তাঁর।

কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবেই। জীবনটাকে একটু বাজিয়ে দেখা, একটু চেখে দেখা, এই তো শেষ সুযোগ। এরপর ক্রমশ বুড়ো, অথর্ব হয়ে যাবেন। তার আগে...

এদিকে ভোরবেলার সেই পুরনো পাখার 'ঘোঁঙর ঘোঁ', 'ঘোঁঙর ঘোঁ' ডাকটা এখনও তার কানে লেগে রয়েছে। মাথার মধ্যে ঘুরছে। সত্যিই সামান্য একটা ব্যাঙের ডাক কতকাল তিনি শোনেননি। একটা ব্যাঙ চোখে পর্যন্ত দেখেননি।

তিনি এতকাল চাকরি করেছেন বন্যপ্রাণী ও পশুপালন অধিকারে। সেখানে সাপ-কুমির, বাঘ-সিংহ, গরু-ছাগল এমনকি হাঁস-মুরগি পর্যন্ত কত রকম সব কত নোট তাঁকে লিখতে হয়েছে, চিঠি ড্রাফট করতে হয়েছে।

কিন্তু ব্যাঙ, না ব্যাঙের কথা ফাইলপত্রে কখনও উঠেছে বলে মনে পড়ছে না। অনেকদিন আগে বিদেশে ব্যাঙ রপ্তানি প্রসঙ্গে একটা নথি তাঁর কাছে এসেছিল, সেটাও তিনি দেখে শুনে বাণিজ্য দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এরই মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে গোলদীঘি, মেডিক্যাল কলেজ পার হয়ে বৌবাজারের মোড়ে চলে এসেছেন রমেশবাবু।

ব্যাঙের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘুরছে আর ঘুরছে। 'ঘোঁঙর ঘোঁ, 'ঘোঁঙর ঘোঁ'।

অবশেষে বৌবাজারে ভীমনাগের সন্দেশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রমেশবাবু ঠিক করলেন তা হলে ব্যাঙ দিয়েই নতুন জীবনটা শুরু হোক। অনেকদিন পরে আজ কোথাও গিয়ে একটা ব্যাঙ দেখে আসি।

কাছে পিঠের মধ্যে সেই প্রাচীন গড়ের মাঠ রয়েছে। আজ সকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চয়ই সেখানে অনেক ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যাবে। হয়ত ডাকও শোমা যাবে।

রাস্তা ক্রশ করে উলটো দিকের ফুটপাথে চলে এলেন রমেশবাবু। সেখানে বাসস্টপে গিয়ে একটা 'টু বি' দোতলা বাসে চেপে বসলেন তিনি।

সকাল বেলায় বাসে তেমন ভিড় নেই। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ট্রামে বাসে ভিড় বাড়তে থাকবে। এর মধ্যেই ময়দান থেকে ঘুরে আসবেন তিনি।

থিয়েটার রোডের মোড়ে বাস থেকে নেমে বিড়লা তারামণ্ডলের ওপাশ থেকে সরাসরি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকলেন।

সকালবেলায় বৃষ্টির জলে এখনও ছপছপ করছে মাঠটা। এখনও কিছু কিছু লেট ভ্রমণকারী মাঠে মুক্ত বায়ু সেবন করছে। মাউন্ট পুলিসের গোটা দশ-পনের অশ্বারোহী চক্রাকারে পাক খাচ্ছে। বোধহয় তাদের ট্রেনিং হচ্ছে।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন রমেশবাবু। কিন্তু পুরো মাঠটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটা ব্যাঙ দেখতে পেলেন না। বোধহয় ঘোড়ার উপদ্রবে ব্যাঙেরা লুকিয়েছে।

কিন্তু লুকোবে কোথায়?

মাঠটা কোনাকুনি ক্রশ করে যেখানে মোহনবাগান ক্লাবের ঘেরা মাঠের পেছনে ফোর্টের গা ঘেঁষে একটা নয়ানজুলি রয়েছে সেখানে উঁকি দিলেন রমেশবাবু। বৃষ্টির জলের স্রোত তরতর করে বয়ে যাচ্ছে ড্রেনটা দিয়ে সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলেন রমেশবাবু, কিন্তু ব্যাঙের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

একজন সদাশয় প্রকৃতির স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, পরনে ট্রাকস্যুট, চেহারাটা কেমন চেনাচেনা, প্রচুর ঘেমেছেন, মাঠের মধ্য দিয়ে আসছিলেন। ওপাশের রাস্তার ওপরে তাঁর গাড়িটা রয়েছে, সেটায় উঠতে যাবেন তিনি, রমেশবাবুকে উবু হয়ে ড্রেনে উঁকি দিতে দেখে এগিয়ে এলেন, সহৃদয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু হারিয়েছে আপনার?'

গলার স্বর শুনে এবং চেহারার আদল দেখে রমেশবাবুর খেয়াল হল টিভি-তে দেখেছেন এঁকে, ইনি হলেন পি কে। পি কে ব্যানার্জি—ফুটবলের নামজাদা কোচ, অতীতের দিকপাল ফুটবল প্লেয়ার।

কি আর বলবেন রমেশবাবু, থতমত খেয়ে বোকার মত বলে বসলেন, 'ব্যাঙ, ব্যাঙ খুঁজছিলাম।'

পি কে সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'ব্যাঙ কি আর পাবেন এসব জায়গায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখুন, সেখানে প্রচুর আছে। এখনও দুচারটে থাকতে পারে।'

তারপর একটু থেমে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পি কে বললেন, 'আমি তো আমার ছেলেদের ব্যাঙ ধরে খেতে বলি। প্রোটিন আছে, সুস্বাদু। কিন্তু কে কার কথা শোনে? শুধু টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে কি ফুটবল খেলা হয়। এইভাবেই বাঙালী গেল।'

পি কে চলে গেলেন। প্রায় এক কিলোমিটার উজিয়ে অতঃপর রমেশবাবু যখন ভিক্টোরিয়া উদ্যানে প্রবেশ করলেন, তখন রোদ্দুর বেশ চড়ে গেছে। দুচার জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রায় শূন্য। সকালবেলার সেই হিমভাব বাতাসে নেই, বরং রীতিমত গরম লাগছে, ঘাম হচ্ছে।

পিকের পরামর্শ কিন্তু কাজে লাগল না। ভিক্টোরিয়ার আনাচে কানাচে অনেক ঘোরাঘুরি করে পুকুরগুলোর পাড়ে এখানে ওখানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে একটিও ব্যাঙ নজরে এল না রমেশবাবুর। বরং বেশি অনুসন্ধিৎসু হতে গিয়ে গাছের আড়ালে, ঝোপের ভিতরে প্রেমিক যুগলদের অবিশ্বাস্য সব অশালীন দৃশ্য তাঁব চোখে পড়ল। এখন মানে মানে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই রক্ষা। উত্তরের দিকের গেট দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রবেশ করেছিলেন রমেশবাবু, অবশেষে ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, নিরাশ অবস্থায় উত্তরের গেট দিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের শেষ প্রান্তে এস এস কে এম হাসপাতালের মুখে বেরিয়ে এলেন।

বাড়ি ফেরার বাসে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি। কাছেই রবীন্দ্রসদনের পাশ থেকে উল্টোডাঙার খালি বাস ছাড়ে। কিন্তু হঠাৎ রমেশবাবুর খেয়াল হল এখান থেকে

চিড়িয়াখানা মোটেই দূরে নয়, হাঁটাপথে বড়জোর পনের মিনিট।

চিড়িয়াখানার ভেতরে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শেষবার গিয়েছিলেন রমেশবাবু তাঁর মা-বাবার সঙ্গে। সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। এরমধ্যে একদিন নাতনিকে নিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন তাও হয়ে ওঠেনি।

চিড়িয়াখানার দিকে এগতে এগতে রমেশচন্দ্র ভাবতে লাগলেন চিড়িয়াখানায় ব্যাঙের খাঁচা আছে কিনা। সারা দুনিয়ার হাজার রকম জীবজন্তু চিড়িয়াখানায় আছে আর ব্যাঙ থাকবে না, নিশ্চয়ই আছে।

চিড়িয়াখানায় পৌঁছে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে রমেশবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘুরলেন। তারপর একটা ম্যাপের সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়ালেন, তার মধ্যে বিভিন্ন রকম জীবজন্তুর খাঁচার পথ নির্দেশ দেওয়া আছে।

কিন্তু না। এর মধ্যে কোথাও ব্যাঙের খাঁচার কোনও অস্তিত্ব নেই। একটু বিভ্রান্ত বোধ করলেন রমেশবাবু। কিন্তু কি আর করবেন, কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়। আর আঁতিপাঁতি করে খুঁজতেও ভরসা পাচ্ছেন না তেমন। বিশেষ করে একটু আগের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেনের সেই অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়।

সাইনবোর্ডের সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই রমেশচন্দ্রের চোখে পড়ল বিজলি গ্রীল। অনেকদিন আগে বিজলি গ্রীলের দেবু বারিক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে এক স্কুলে কিছুদিন পড়েছিল। এখন হয়ত আর চিনতে পারবে না।

তা না পারুক। গুটি গুটি বিজলি গ্রীলে গিয়ে দাঁড়ালেন রমেশবাবু। দোকানটা তখন সদ্য খুলেছে, সামনে কাউন্টারের পাশে যে ভদ্রলোক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, দেবু আছে, দেবু বারিক?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না দেবুবাবুকে তো এখন পাবেন না। কেন, বলুন তো?'

একটু ইতস্তত করে রমেশবাবু বললেন, 'না তেমন কিছু নয়। আমি দেবুর ক্লাসফ্রেন্ড ছিলাম, একটা খবর জানতে চাইছিলাম।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কী খবর বলুন?'

রমেশবাবু একটু দম নিয়ে, একটু চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাদের এই চিড়িয়াখানায় ব্যাঙের কোনও খাঁচা নেই।'

কাউন্টারের ওপারের ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, কিছুক্ষণ রমেশবাবুকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর বললেন, 'ব্যাঙের খাঁচা? ব্যাঙের? হাসালেন দাদা আপনি। কাক, কাঠবেড়ালি, ব্যাঙ, চড়ুই এদের আবার খাঁচা কি? তাহলে তো নেড়িকুকুর, পাতি বেড়াল, টিকটিকি আর শালিককেও খাঁচায় রাখতে হবে।' ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে তবুও শেষরক্ষা হিসেবে রমেশবাবু বললেন, 'কিন্তু, মনে করুন, এমন কোনও লোক চিড়িয়াখানায় এসেছে যে জীবনে কখনও ব্যাঙ দেখেনি...'

'এমন কোনও লোক যে জীবনে কখনও ব্যাঙ দেখেনি!'...

ভদ্রলোকের অট্টহাস্য উচ্চতর হল, তারপর কী ভেবে তিনি হাসি থামিয়ে রমেশবাবুকে বললেন, 'ব্যাঙের কোনও খাঁচা নেই বটে, তবে কেউ যদি সত্যি সত্যিই ব্যাঙ দেখতে চায়, সে সাপের খাঁচায় গেলে ব্যাঙ দেখতে পাবে।

রমেশবাবু এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কী রকম?'

ভদ্রলোক ভারিক্কি চালে বললেন, 'সাপের খাদ্য হল ব্যাঙ। সব সাপকেই ব্যাঙ খেতে দেয়া হয়। এইতো এখনই দশটা-সাড়ে দশটার সময় সব খাঁচায় খাবার দেয়া হবে। আপনি সাপের খাঁচার ওখানে গেলে দেখতে পাবেন খাঁচায় খাঁচায় রাশিরাশি ব্যাঙ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।'

খবরটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এমন নৃশংস ঘটনার সঙ্গে আদৌ জড়িত হতে চান না রমেশচন্দ্র।

তবু নিতান্ত ব্যাঙ দর্শনের মানসেই গুটিগুটি রেপটাইল হাউস তথা সর্পভবনের দিকে এগিয়ে গেলেন রমেশবাবু।

প্রতি মুহূর্তে রমেশবাবু ভয়ে, দ্বিধায় কাতর হচ্ছিলেন। হয়ত গিয়ে দেখবেন কাঁচের দেয়ালের ওপাশে সাপ গিলে খাচ্ছে একটার পর একটা ব্যাঙ। ব্যাঙ দেখার আনন্দের চেয়ে তাহলে যে ব্যাঙ নিধনের এই যন্ত্রণা অনেক বড় হয়ে যাবে।

রমেশবাবুর ভাগ্য ভাল।

সপ্তাহে একদিন মাত্র সাপেদের খাবার দেয়া হয়। এবং আজকের দিনটি সেই দিন নয়। গতকালই নাকি ছিল সাপেদের খাবার দেয়ার দিন।

সুতরাং সর্পভবনে গিয়ে নিতান্তই অল্পবিস্তর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৃহদাপি বৃহৎ সাপ এবং কয়েকটি মেছো ও গেছো কুমির দেখলেন রমেশচন্দ্র, কিন্তু একটিও ব্যাঙ দেখতে পেলেন না। তবে কোনও কোনও সাপের উত্তুঙ্গ এবং সচল পাকস্থলী দেখে বুঝতে পারলেন, ওরই অন্তরালে রয়েছে এক কিংবা একাধিক ব্যাঙ, যাদের জীবন্ত গিলে ফেলা হয়েছে।

বেলা প্রায় বারোটা বাজে।

ভগ্নমনোরথ রমেশবাবু খিদিরপুর বাজারের রাস্তায় চিড়িয়াখানার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। বাইরে গন্‌গন্ করছে রোদ, কে বলবে এটা কার্তিকের শেষ। আজ সকালেই উঠেছিল জোর উত্তুরে হাওয়া আর শীতল বৃষ্টি।

তিন নম্বর বাস স্ট্যান্ড খিদিরপুর বাজারের পাশেই। সেটায় চড়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গ্রে স্ট্রিট-সার্কুলার রোডের মোড়ে নেমে অনেকটা হেঁটে যখন হরি সেন স্ট্রিটের কাছে এসে পৌঁছলেন রমেশবাবু তখন প্রায় দেড়টা বাজে। সূর্য ঢলে পড়েছে, বড় বড় লম্বা ছায়া পড়েছে রাস্তায়।

এদিকে তাঁর বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। লোকটা গেল কোথায়? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কি লোকটা বিবাগী হয়ে গেল। আস্ত লোকটা উধাও হয়ে গেল৷ শুধু বাড়ির লোক নয়, পাড়াসুদ্ধ লোক পর্যন্ত জড়িত হয়ে পড়েছে এই দুশ্চিন্তায়।

গলির মোড়েই ব্যাকুল মুখে রমেশবাবুর ভাইপো দাঁড়িয়ে ছিল। সে রমেশবাবুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো জ্যাঠা ফিরে এসেছে।' তার চিৎকার শুনে গলির ভেতর থেকে অনেক লোক ছুটে বেরিয়ে এল।

রমেশবাবু বাড়িতে এসে শুনলেন তাঁর ছেলে, ভাই কারও আজ অফিস যাওয়া হয়নি। বাড়ির কারও নাওয়া খাওয়াও হয়নি। ভাই কিংবা ছেলে এখন কেউই আর বাড়ি নেই।

দুজনেই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছে। একজন দক্ষিণে গেছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, অন্যজন গেছে উত্তরদিকে আর জি কর হাসপাতালে। বেলা তিনটে নাগাদ তারাও ফিরল। সবাই হৈ চৈ করতে লাগল, 'কী হয়েছিল? কোথায় গিয়েছিলে!'

রমেশবাবু তাদের কী আর বলবেন। শুধু মুখে বললেন, 'না। এই এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।' মনে মনে ভাবলেন, এদের যদি বলি ব্যাঙ খুঁজতে, ব্যাঙ দেখতে গিয়েছিলাম, তা হলে এরা হয়ত ধরে নেবে আমি পাগল হয়ে গেছি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে বিকেল হয়ে গেল।

সারাদিনের পথশ্রম এবং ক্লান্তিতে অবেলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন রমেশবাবু।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘোর সন্ধ্যা। ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর নাতনি একটা ছড়ার বই খুলে আপনমনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে,

'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায় গান গায়
তাইরে নাইবে না।'

বিছানায় বসেই নাতনিকে ডাকলেন রমেশবাবু, 'খুকু' তোর ছড়ার বইটা একটু নিয়ে আয়তো দেখি।'

দাদু সাধারণত খুকুকে কখনও এমনভাবে ডাকে না। আজ দাদুর ডাক শুনে পরম উৎসাহে খুকু ছড়ার বইটা নিয়ে দাদুর কাছে এল। বিছানা থেকে উঠে ঘরে আলো জ্বেলে খুকুকে সামনের কাঠের চেয়ারটায় বসিয়ে কলতলায় মুখ ধুতে গেলেন রমেশবাবু।

ফিরে এসে তাক থেকে চশমাটা নামিয়ে খুকুর ছড়ার বইটা খুলে ব্যাঙের ছবিটা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

ছড়ার বইটার প্রথম পাতাটা ছেঁড়া। বোঝা গেল না ছবিটা কে এঁকেছে, শিল্পীর নামটা পাওয়া গেল না। রমেশবাবু নাতনিকে বললেন, 'দেখেছিস ব্যাঙেব ছবিটা কী সুন্দর এঁকেছে।'

খুকু বলল, 'এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল ব্যাঙ আজ বিকেলে টিভিতে দেখিয়েছে। তাইতো ছড়াটা পড়ছিলাম।'

ভেতরের ঘরে একটা ছোট সাদাকালো টিভি আছে। বিকেলে খুকু রাস্তায় খেলতে যাওয়ার জন্যে যখন বায়না করে তখন খুকুর মা তাকে টিভি খুলে বসিয়ে দেয়। দূরদর্শনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সময় সেটা। অনেকদিন অনুষ্ঠান খুবই খটমট লাগে খুকুর। আবার খুব মজাও হয় কখনও কখনও যেমন আজকেই হয়েছে, আজকের প্রোগ্রাম ছিল . 'মানুষের পরম বন্ধু ব্যাঙ।'

[চার] তাইরে নাইরে না

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর বাড়ির বাইরে গেলেন না রমেশবাবু। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইপোর কাছ থেকে জীববিজ্ঞানের বইটা চেয়ে নিয়ে উভচর প্রাণীর অধ্যায়টা

খুব ভাল করে দেখলেন তিনি।

এবং সেখানেই একটা খবর পেলেন। খবরটা তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে ব্যাঙ অদৃশ্য হয়ে যায়। খানাখন্দে, গর্তে লুকিয়ে পড়ে। সুতরাং আপাতত কয়েকমাস আর ব্যাঙের খোঁজে আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে বিশেষ লাভ নেই। সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে একটা ভিডিও ক্লাব হয়েছে। অফিসে যাতায়াতের পথে রমেশবাবুর সেটা চোখে পড়েছে। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে সেই ক্লাবে গিয়ে তিনি খোঁজ করলেন, গতকাল টিভিতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে একটা ব্যাঙের প্রোগ্রাম হয়েছিল সেটা কি ভিডিওতে আবার দেখা সম্ভব।

ভিডিও পারলারের সুযোগ্য অ্যাসিসটান্ট কাম অপারেটর কাম মেকানিক মংলু প্রসাদ চতুর, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কলকাতা শহরে তার জীবিকার হাতেখড়ি হয়েছিল সুরেন ব্যানার্জি রোডে অশ্লীল বইয়ের দোকানে সেলসম্যানি করে।

মংলু প্রসাদ রমেশবাবুর কথায় কী বুঝল কে জানে। অশ্লীল সামগ্রীর খদ্দের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, সে হঠাৎ রমেশবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী একটা কু প্রস্তাব দিল।

রমেশবাবু মংলুকে একটা থাপ্পড় লাগাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ক্রোধ দমন করে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

বন্যপ্রাণী ও পশুপালন অধিকারেব সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সহায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় আমার আপন মামাতো দাদা। পবস্পর খবর পেয়েছিলাম যে রিটায়ার করার পর তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। .

এটা কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। সব অফিসেই বহু পাগল থাকে। যতদিন তারা অফিস করে বাড়ির লোকেরা, সেই সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশী জানতেই পারে না যে তারা পাগল। আর দশজনের মতই তারা স্নান করে, ভাত খেয়ে অফিস যায়—দশটা পাঁচটা করে। কিন্তু অবসর নেওয়ার পরে তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, ধরা প' যে তারা পাগল।

সে যা হোক সামাজিকতার খাতিরে একদিন রমেশদাকে দেখতে েলাম। বিজয়ার পরে যাওয়া হয়নি।

বাইরের ঘরে খাটে বসে রমেশদা খসখস করে কী সব লিখছেন একটা জলচৌকির ওপর কাগজ রেখে। খাটভর্তি তাড়া তাড়া কাগজ, গাদা গাদা বই। সে সব বইয়ের মধ্যে হিতোপদেশ, জাতকের গল্প থেকে শুরু করে এমন কি গতযুগের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী মায় বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা অব্দি রয়েছে'

বিজয়ার বিলম্বিত প্রণাম ও কোলাকুলি সাঙ্গ হওয়ার পরে রমেশদা বললেন, 'খোকন, যখন বুঝতে পারলাম আগামী কয়েকমাসের মধ্যে, ঐ 'মনের বর্ষার আগে সশরীরে কোনও ব্যাঙ দেখার কোনও সম্ভাবনা নেই, তখন সারা দিন রাত যতক্ষণ সম্ভব টিভি দেখতে লাগলাম। দিল্লির মর্নিং প্রোগ্রাম, দুপুরের ইউ জি সি, সন্ধ্যায় ঢাকা, কলকাতা, এক নম্বর, দুই নম্বর চ্যানেল, দিল্লি ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক সব তন্নতন্ন করে দেখতে লাগলাম যদি কোথাও একটা ব্যাঙের দৃশ্যও দেখতে পাই।'

‘এর মধ্যে অবশ্য একবার গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম সেখানে ব্যাঙের মাংস বিক্রি হয়, যদি মাংসে রূপান্তরিত হওয়ার আগে ব্যাঙের মরদেহটা দেখতে পাই এই আশায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলাম, ব্যাঙের মাংসের কোনও চাহিদা নেই, মেনু থেকে ঐ পদ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

আমি সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, ‘এত যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেন, সংবাদের পর সংবাদ, সিরিয়ালের পর সিরিয়াল কোথাও কোনওদিন একটা ব্যাঙ নজরে এল না।’

খুব গম্ভীর হয়ে রমেশদা বললেন, ‘না। একেবারেই না।’ তারপর আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘আমি নিজেই এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি।’

রমেশদার আত্মপ্রত্যয় দেখে আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর প্রশ্ন করলাম, ‘কী রকম?’

এইবার মুচকি হেসে রমেশদা বললেন, ‘টিভি দেখে দেখে সিরিয়াল করার ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি। আমি নিজেই একটা সিরিয়াল করছি, ‘যুগে যুগে ব্যাঙ।’

আমি প্রতিধ্বনি করলাম, ‘যুগে যুগে ব্যাঙ!’

রমেশদা বললেন, ‘অবাক হচ্ছিস কেন? এই সব বই থেকে একেকটা স্টোরি নিচ্ছি। তেরটা স্টোরি হবে। সাতটা করে ফেলেছি। হিতোপদেশের ধর্মপ্রাণ ব্যাঙ, কুয়ো আর সাগরের ব্যাঙ, ব্যাঙ জম্মে জাতক, ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীর হিট্-মিট্-ফ্যাট ব্যাঙ সাহেব এমন কি বুদ্ধদেব বসুর ব্যাঙের কবিতাটা নিয়ে একটা বাইশ মিনিটের চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছি।’

তারপর একটু দম নিয়ে রমেশদা আমাকে বললেন, ‘শুনবি একটু?’

আমি অথৈ জলে পড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রমেশদাই রক্ষা করলেন, বোধহয় একটু মায়া হল আমার ওপর, বললেন, ‘না থাক। তোরও সময় নষ্ট হবে, আমারও সময় নষ্ট হবে। পর্দায় তো দেখতে পাবিই। এই বর্ষাতেই শুটিং শুরু করব। ভাবছি যদি ভিসা পাসপোর্ট করে উঠতে পারি বাংলাদেশে কুষ্টিয়ায় গিয়ে হরিনাথপুর গাঁয়ে শুটিং করতে যাব। বাবা, কত রকম ব্যাঙ যে সেখানে দেখেছিলাম ছোটবেলায়।’

রমেশদাকে বাইরের ঘরে রেখে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।

অনেকদিন পরে এসেছি, সকলের সঙ্গেই দেখা করে যাই।

রমেশদা আবার মন দিয়ে সিরিয়াল লেখায় হাত লাগালেন।

[পাঁচ] সংযোজন

বোঝাই যাচ্ছে, এই গল্প শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। সে জন্যে অন্তত আগামী বর্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শুধু আপাতত দাঁড়ি টানার আগে অনেকদিন আগের এক নাক-উঁচু কবির এক বহুবিখ্যাত, বহুপঠিত কবিতার শেষ পঙক্তিটি অকারণেই স্মরণ করছি,

Not with a bang but whimper.

বরাহ মিহিরের উপাখ্যান

[এক]

বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। হঠাৎ আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল। যে দোকানের বারান্দা ছেড়ে ভরসা করে বেরিয়েছিলাম, ছুটে সেখানেই ফিরতে হল। মধ্যে থেকে যথেষ্টই ভিজে গেলাম। হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসলাম বারান্দায়, মাথাটা ভীষণ ভেজা, সর্দি হয়ে জ্বর আসতে পারে, কিন্তু আমার পকেটে রুমাল পর্যন্ত নেই যে মুছে ফেলি।

মাথার সামনেই এক ভদ্রলোকের বাগানো কোঁচা কিছুটা শুকনো অন্তত স্যাঁতসেঁতে ভেজা নয় বলেই মনে হল।

আস্তে আস্তে মাথাটা তাঁর কোঁচায় ঘষতে লাগলাম। ভদ্রলোক প্রথমে বিশেষ আপত্তি করলেন না, সাহস পেয়ে একটু জোরে ঘষতেই, তিনি সামান্য সরে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে একটা শুকনো রুমাল বার করে আমার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে নির্বিকারভাবে বললেন, নিন্ মাথাটা মুছে ফেলুন। যা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, জল বসে নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।'

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু গলার স্বরটা? কে বরাহমিহির না? আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সত্যিসত্যিই বরাহমিহির। আমি উঠে দাঁড়াতেই যেন কিছুই ঘটেনি এইভাবে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, 'কি খবর, আপনিও আটকে গেছেন দেখছি।' আমি বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম। একটু আগের ঘটনায় লজ্জিত হব কিনা স্থির করার আগেই লক্ষ করলাম বরাহমিহিরের হাতে ছোটো ছোটো চার-পাঁচটা ঠোঙায় যেন কি সব রয়েছে। ববাহমিহির তাহলে বিয়ে করে পুরোপুরি সংসারী হয়ে গেছেন। রাত দশটায় সওদা করে বাড়ি ফিরছেন।

'এগুলোর মধ্যে কি?' আমার প্রশ্নের উত্তরে বরাহমিহির বললেন, 'আর বলবেন না মশায়, আমি তো এদিকে হোটেলে খাই। রাত দশটা হয়ে গেল, আটকা পড়লুম বৃষ্টিতে, এদিকে হোটেল বন্ধ হয়ে না যায়।'

আমার প্রশ্নের কিন্তু উত্তর হল না। আমাকে আরেকবার কৌতূহল প্রকাশ করতে হলো, 'কিন্তু এগুলো কি, এইসব ছোটো ছোটো ঠোঙায়?'

এবার আমার জবাব না দিয়ে বরাহমিহির বারান্দার বাইরে হাত বাড়িয়ে একটু পরীক্ষা করে নিয়ে তারপর এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এক টান, 'বৃষ্টি ধরে গেছে, নেমে আসুন, আমার সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত আসুন দেখতেই পাবেন, এগুলো কি?' একটু থেমে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, এর থেকে ভাগ পাবেন না কিন্তু।'

কিছুটা হেঁটে গিয়ে হোটেলে উঠলাম। দেখলাম বরাহমিহির এখানে বেশ পরিচিত। আমি আর বরাহমিহির বসলাম। দূরে এক কোণে একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো রয়েছে দেয়ালে, তার উপরে সাদা হরফে লেখা রয়েছে 'খাদ্যতালিকা' আর নীচে 'সাত আনার কম খাওয়া নাই', এবং 'আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ বা শাখা নাই।'

সে যাহোক বরাহমিহির খুব ধৈর্য সহকারে খাদ্যতালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলেন প্রায়

মিনিট পাঁচেক ধরে। বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আর তার মূল্য লেখা চকখড়ি দিয়ে, দু একটার পাশে এরই মধ্যে ক্রশ চিহ্ন দেয়া, বোধহয় ফুরিয়ে গেছে কিংবা পাওয়া যাবে না।

যতক্ষণ বরাহমিহির খাদ্যতালিকা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, পাশে একটি ছোকরা বয় মৃদু হাস্যময় মুখে দাঁড়িয়েছিল, এইবার তার সঙ্গে বরাহমিহির নিচুগলায় কি একটু আলোচনা করে ঠোঙাগুলো তুলে দিলেন তারপর ম্যানেজারের দিকে মুখ করে অর্ডার দিলেন, 'দুপ্লেট ভাত, ডাল দুবাটি, আলুভাজা চারানা, পটল সেদ্ধ দুটো, রুই মাছের মাথা দুটো' ইত্যাদি হরেক খাদ্যদ্রব্য, সব দুটো করে।

আমি আপত্তি জানালাম, 'না, না বাড়িতে আমার রান্না হয়ে রয়েছে, আমি কিছু খাব না।' 'কিছু খাবেন না,' যেন কিছু নয় এইভাবে বরাহমিহির বললেন, 'ঠিক আছে আমি একাই খেতে পারব।' এর মধ্যে বাচ্চা বেয়ারাটা প্লেটে করে অনেকগুলো কাঁচালঙ্কা, পাঁচটা আস্ত পেঁয়াজ ফালি করা, তিনটে তিনটে করে লেবু আর লঙ্কার তেল-আচার এনে দিলো। বরাহমিহির মৃদু হেসে বললেন, 'এগুলো আমার ঠোঙায় ছিল বুঝলেন, হোটেলে আসার সময় মুদিখানা আর পানের দোকান ঘুরে কিনে আনি।'

খাওয়ার ঐ অর্ডারের পরে আমার আর অবাক হওয়ার উপায় ছিল না, আমি মনে মনে গুনে দেখলাম চব্বিশটা কাঁচালঙ্কা। ছটা কাঁচালঙ্কা, একটা তেল লঙ্কা, দেড়টা পেঁয়াজ সহযোগে একবাটি ডালভাত দিয়ে মেখে খেয়ে, পরের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে আমাকে বললেন, 'আপনি কিছু খান্। অন্ততঃ একটা আম।'

আমি দুসপ্তাহ মাছ খাইনি, আর বরাহমিহির এর পরে ঐ মাছের মাথা দুটো একলা আমার সামনে বসে বসে খাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি বললাম, 'তা, আম পাওয়া যাবে এখানে?'

বরাহমিহির খাদ্যতালিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। দেখলাম একেবারে নিচেব দিকে 'কলার পাতা পাঁচ পয়সা,' মাটির ভাঁড় চার পয়সা,' তার উপরে লেখা বয়েছে, আম পঞ্চাশ পয়সা।'

আপত্তি করে কোনও রকম বোকামির মধ্যে না গিয়ে আমি সোজাসুজি রাজি হয়ে গেলাম, 'ঠিক আছে একটা আম খাওয়া যাক্।' নীচু হয়ে রুইয়ের মাথাটা যথেষ্ট যত্নসহকারে চিবুতে চিবুতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম লেখা রয়েছে পাশে একটু দেখুন তো। সব জিনিসই খাওয়ার আগে দাম জেনে নেওয়া ভালো। না জেনে আমি একবার যা বিপদে পড়েছিলুম।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বরাহমিহির তাঁর হাতের তর্জনী দিয়ে ডান চোখের উপর দিকে একটা কাটা দাগ দেখালেন।

নিশ্চয়ই এর পিছনে খুব একটা করুণ কাহিনী রয়েছে, যা শুনলে হয়তো অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হবে। কিন্তু রাত্রে বাড়ি ফিরে আমাকে অদ্বিতীয়ের এই সপ্তাহের কিস্তি দিতে হবে, কোন করুণ কাহিনীর সুযোগ সেখানে নেই সুতরাং অশ্রুসম্বরণ করতে হল। আমি সোজা কথায় ফিরে গেলাম, 'আমের দাম দেখছি পঞ্চাশ পয়সা লেখা রয়েছে।'

দ্বিতীয় মস্তকটির গোড়ার দিকটি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিলেন না, একবার হাঁ করে মুখের মধ্যে পুরোটা ঢুকিয়ে দিয়ে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে প্লেটে নামিয়ে রেখে একটু হাঁপালেন। মোটা মানুষ অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। একটা আম খাওয়াচ্ছেন বলেই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক আমার একটু মায়া হল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আঙুল দিয়ে মুখ ঘাঁটলেন, বেশ পরিতৃপ্তিসহকারে একটা ঢেঁকুর তুললেন, ধীরে-সুস্থে প্লেটস্থিত মাছের মাথাটার দিকে তাকিয়ে আবার হাতে তুলে নিলেন।

মুখের ভিতর মাছের মাথার সামনের দিকটা চালিয়ে দিতে দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম বললেন?' তারপর আমার জবাবের জন্য প্রতীক্ষা না করে নিজেই মাথা ঘুরিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডটার দিকে তাকালেন, উচ্চারণ করে পাঠ করলেন, 'আম পঞ্চাশ পয়সা।' এই স্বগত উক্তিটুকু করে নিয়ে চোয়াল শক্ত করে মাড়ি দিয়ে মাছের মাথাটায় চাপ দিলেন, এবার মাথাটা বোধহয় মুখের মধ্যে ভেঙে গেল, কিছুক্ষণ আপনমনে চিবিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনার কাছে একটা টাকা হবে?'

'একটা টাকা?' মুখে বলতে বলতে আমি মনে মনে ভাবলুম আম খেতে রাজি না হলেই ভাল ছিল।

'হ্যাঁ, দুজনে দুটো আম খেতুম। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? আর আম হল সেরা ফল, বুঝলেন কিনা?' নিজের রসিকতার আনন্দেই হোক বা রুইয়ের মাথাটা আয়ত্তে আনার সার্থকতাতেই হোক তিনি আকর্ণ হাসলেন।

আমি থিতিয়ে থিতিয়ে জানালাম, 'তা হতে পারে একটা টাকা।' বরাহমিহির ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে অর্ডার দিলেন, 'ম্যানেজারবাবু, দুটো আম। ভালো করে ছুলে কেটে দুটো প্লেটে। দেখবেন খুব ছোটো না হয়।' ম্যানেজার তাঁর কাউন্টার থেকে চেঁচিয়ে, ভেতরে যেখানে রান্না হয় খাবার দাবার থাকে সেদিকে মুখ করে বললেন, 'এই দুটো আম, আলাদা আলাদা করে মিহিরবাবুর টেবিলে।'

বাচ্চা বেয়ারাটা খাবারের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যানেজারবাবুর আদেশ শুনে সামনের তাক থেকে দুটো ডিস নিয়ে ভেতরে চলে গেল, একটু পরই বেরিয়ে এল ফাঁকা ডিস দুটো নিয়ে, এসে যেখান থেকে নিয়েছিল সেখানে রেখে আমাদের টেবিলে বরাহমিহিরের পাশে এসে দাঁড়াল। বরাহমিহির তখন চোখ বুজে ডিমের ঝোল থেকে ডিম তুলে নিয়ে, যেভাবে বাচ্চারা লজেঞ্জস চোষে, সেইভাবে চুক-চুক করে চুষছেন। বেয়ারাটা ওঁকে একটু পর্যবেক্ষণ করল, তারপর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কি জানাল। ম্যানেজার শুনে নিয়ে আবার খাবার ঘরের দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললেন, 'এই ভজুয়া আম কাট্, আম কেটে দে তাড়াতাড়ি।'

অনুমান করলাম ভজুয়া নামে কোনও ভিতরস্থ কর্মচারী কোনও কারণে আম কাটতে অক্ষমতা জানিয়েছে। কিছু সময় গেল, এর মধ্যে বরাহমিহির খাওয়া প্রায় গুছিয়ে এনেছেন। দ্বিতীয় ডালের বাটির অর্ধেকটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, ডিমের ঝোলের দুটো আলু ছিলো, একটা লেবুর আচার আর কিছু লঙ্কা, পেঁয়াজ তখনো ছিলো; আরেক প্লেট ভাত এনে চটকিয়ে মেখে চেটেপুটে খেয়ে নিলেন।

আম কিন্তু দিল না। বরাহমিহির হাত ধুয়ে এলেন, আমের কথা তিনিও আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমি ভাবলাম ম্যানেজার তো আম কাটতে বলেছিলেন, দাম না চায় আবার। কাউন্টারে ম্যানেজারকে এসে বললাম, 'আম কিন্তু দেয়নি।'

'আজ্ঞে, আম তো কাটা হয়ে গেছে।' ম্যানেজারের বিনীত নিবেদনের উত্তরে আমি বললাম, 'কাটা হয়েছে কিন্তু আমাদের দেয়া হল না কেন?'

বরাহমিহির একটা কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে আমাকে বললেন, 'আরে তা নয়, ফুরিয়ে

গেছে বলে কেটে দিয়েছে। ঐ দেখুন।' ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকালাম আমের পাশে একটা কাটা চিহ্ন পড়েছে, কখন এর মধ্যে আম এবং আরও কিছু কিছু কেটে দেয়া হয়েছে।

'এবার বুঝলেন তো', বরাহমিহির মৃদু হেসে বললেন, 'আমের দামটা তো লাগল না, এবার তাহলে আমার মিলের চার্জটা দিয়ে দিন। আমের দামের বদলে আমার দাম।' হেঁ-হেঁ', বরাহমিহির পুনরায় আকর্ণ হলেন।

[দুই]

অনিবার্য কারণবশত আজ এই বিবাহ-উৎসব বন্ধ রহিল। অভ্যাগতদের পরবর্তী সময় এবং স্থান পরে জানানো হইবে।

কলকাতা থেকে ছত্রিশ মাইল রাস্তা লোক্যাল ট্রেনে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ঝুলতে ঝুলতে এসে, তারপর খোয়ার রাস্তা রিক্সায় কিছুটা, কিছুটা পায়ে হেঁটে পৌনে দুই মাইল; শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখব নিমন্ত্রণ বাড়িতে এসে এরকম আমরা কেউ কখনো দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

সঙ্গী বন্ধুরা মারমুখী। ধরতে গেলে বরাহমিহিরের বিয়েতে আমিই জোর করে তাদের ধরে এনেছি। কে আর কলকাতা ছেড়ে শনিবার সন্ধ্যাবেলা আসতে চায়? আর সকলেরই খট্‌কা ছিল বৌভাত কেন মেয়ের বাড়িতে হবে, ছেলের যেখানে কলকাতায বাড়ি রয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি দেখবার পর অবশ্য আর কোনও খটকাই রইল না, ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার মনে হল।

কেউ কেউ বলল, 'বিয়েটিয়ে সব বাজে কথা, বরাহমিহিরের আবার বিয়ে।' কিন্তু ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে আমি নিজে অন্যতম সাক্ষী ছিলাম। বিয়েটা যে অন্ততঃ সত্যি সেটা আমি আইনত অস্বীকার করতে পারব না।

সুতরাং আমি চুপ করে রইলাম। এমন সময় সমস্ত রহস্যের উপর যবনিকা টেনে বরাহমিহির নিজেই পাশের একটা গলি থেকে বেরিয়ে এলেন, মুখে অমল হাসি, 'এই যে আপনারা এসে গেছেন।'

বরাহমিহিরকে দেখে সকলের সঙ্গে আমিও প্রচণ্ড খেপে গেলাম। 'এসে গেছি মানে? এসব ইয়ার্কির মানে কি, মশায়?'

বরাহমিহির কিন্তু বিচলিত হলেন না। বললেন, 'কি করব এ-বাড়িটা বড় ছোটো, জায়গা হবে না। বিয়েবাড়ি যদি একটু খোলামেলা না হয়।'

'যদি একটু খোলামেলা না হয়, তাই বলে খাওয়া হবে না, বিয়ে বন্ধ থাকবে?' একজন নিমন্ত্রিত উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন।

'বিয়ে বন্ধ থাকবে কেন, বিয়ে তো আগেই হয়ে গেছে। আর খাওয়ার বন্দোবস্ত পিছনের ঐ বাড়িতে।' বরাহমিহির কিছু দূরে আলোকিত একটি বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

'তাহলে এই নোটিশ এখানে লটকানো রয়েছে কেন?' এতক্ষণ রাগে সমর কিছু বলতে পারছিল না, এবার গিয়ে একটানে সাইনবোর্ডটা টান দিয়ে নামাল।

বরাহমিহির খুব করুণ প্রায় পরিতাপের কণ্ঠে বললেন, 'কি করব বলুন, ওটা আমার শ্যালীরা টাঙিয়েছে, কতবার না করলুম কিছুতেই শুনল না। ওদের বাড়িতেই যখন

ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আর কি করি?'

অভ্যাগতদের অধিকাংশই অবিবাহিত, সুতরাং এই শ্যালীঘটিত প্রসঙ্গের উল্লেখে সবাই কেমন যেন কাবু বোধ করলেন। কিন্তু তখনও ঢের বাকি ছিল।

এতক্ষণ বরাহমিহির বলে যাঁর উল্লেখ করেছি তাঁর আসল নামের সঙ্গে বরাহ অংশটুকু যোগ করে এই পুরো নামটা বন্ধুদের প্রদত্ত। অবশ্য এই পশুত্ব অর্জনে তাঁকে বিশেষ শ্রমস্বীকার করতে হয়নি, তাঁর স্বভাব-চরিত্রই এর জন্য দায়ী বলা যায়। বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় সপ্তাহ দুয়েক আগে এই বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই অনেকের নজরে পড়েছিল ঃ

'নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বিবাহ রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়া গিয়াছে সুতরাং বন্ধুদের জানাইতে আর বাধা নাই। আলাদাভাবে অসংখ্য বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা অসম্ভব। সুতরাং এই বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় যাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক আগামী শনিবার বিকাল পাঁচ ঘটিকায় মনুমেন্ট পাদদেশে সমবেত হইয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করিতে আবেদন করিতেছি।'

বলা বাহুল্য, এই বিজ্ঞাপন বরাহমিহিরের বিয়ের। এর পরে বরাহত্ব প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নই বোধহয় ওঠে না। এবং এর পরেও কি করে এই নিমন্ত্রণে এত লোক এল, কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পাঠক নিশ্চয়ই এরকম প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু তিনি বরাহমিহিরের বন্ধুদের একবার জানলে আর এ প্রশ্ন তুলবেন না।

সে যাহোক্, বরাহমিহিরের শ্যালী প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন বাঞ্ছনীয়। আমি অঙ্কে কাঁচা। সুতরাং তাঁর শ্যালীর সংখ্যা কয়টি এ আমার পক্ষে গণনাতীত। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিশুদ্ধ অঙ্কে একজন ডি-ফিল ছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি খুব অপমানিত বোধ করে মুখ-চোখ লাল করে বললেন, 'আমি কি চৌকিদার না সেন্সাস অফিসার?' এ প্রশ্নের উত্তর নেই, বলতে কি সেদিন সেই নিমন্ত্রণবাড়িতে আমাদের অনেকেরই এরকম সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, আমাদের সমীপবর্তিনী সমস্ত কুমারীই বুঝি বরাহমিহিরের শ্যালীসম্পর্কীয়া।

সব একরকম দেখতে। একই ভঙ্গির কবরী রচনা, প্রত্যেকের চোখে একই কটাক্ষ, গ্রীবায় অবিকল এক বঙ্কিমতা। এই মুহূর্তে যাঁকে জানা গেল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করেন বলে, পরমুহূর্তে আবিষ্কার করলাম তিনি তিনি নন, তিনি পাড়ার শখের থিয়েটারে জনপ্রিয় অভিনেত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল তিনি তিনিও নন, তিনি এখন ঘি পরিবেশন করছেন আর সেই তিনি জুনিয়র হাইস্কুলে হেডমিস্ট্রেস। সমস্ত ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে হয়ে ঘুলিয়ে গেল। সমরেন্দ্র খেতে খেতে কার কাছে আলোয়ান জমা দিয়েছিল, আমি নেমেই কাকে আমার ব্যাগ রাখতে দিয়েছিলাম সব জড়িয়ে গেল। যাকে একটু আগে স্কুলের ছাত্রী জেনে শংকর এক গ্লাস জল চাইল, 'এই খুকী, এক গ্লাস জল দাও তো।' খুকী বলামাত্র তিনি রেগে দুটো কাঁচের গ্লাস আর একটা আয়না ভাঙার পর জানা গেল, তাঁর বয়স সাতচল্লিশ। তিনি স্কুল ছেড়েছেন আজ তিবিশ বৎসর, সেই প্রায় নন্-কো-অপারেশনের সময়।

[তিন]

সকালবেলা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রোদ পোহাবো কিনা মনস্থির করতে পারছি না এমন সময়ে একসঙ্গে গোটা কয়েক কোকিলের ডাকে খেয়াল হল রোদ পোহানোর

দিন চলে গেল। কিন্তু শুধু কোকিলই নয় আরও নানা পাখি আমাদের বাড়ির বাইরে ভীষণ কিচিমিচি লাগিয়ে দিয়েছে। আমার বারান্দা থেকে সদর রাস্তা দেখা যায় না, সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় যেতে হল। বিশাল দুই খাঁচায় অজস্র ভিন্ন জাতের, বিচিত্র রঙের পাখি, দূর দূর জঙ্গল আর জনপদের খ্যাত-অখ্যাত বিহঙ্গ সমিতি।

কি মনে করে পাখিওলার কাছ থেকে প্রায় পনেরো মিনিট দামদর করে দুটো টিয়াপাখি কিনে ফেললাম। এক ধরনের পাখি, চোখটা লাল টুকটুকে, চার পাশে বেগুনি অঞ্জন মাখা, মধ্যে মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে সিটি দিচ্ছে, এমনই সেই সিটি যে অ্যান্টি-রাউডি পুলিশের আওতায় পড়ে যায়। সেটাও কিনব ভাবছি, রাজেনবাবুর স্ত্রী এর মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি বললেন, 'এই পাখিগুলো মিছরি ছাড়া কিছুই খায় না।'

পাখিওলা শুনে বললে, 'না, তাজা ফড়িংও খায়।' একই সঙ্গে এমন শর্করাবিলাসী এবং মাংসাশী প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলাম। কিন্তু এই দুর্দিনের বাজারে মিছরি যোগাড় করা কিংবা গড়ের মাঠে গিয়ে অফিস কামাই করে ফড়িং ধরা কোনওটাই আমার পক্ষে সম্ভবপর বলে মনে হল না।

পাখিওলা টিয়াপাখি দুটোর দাম চেয়েছিল চৌদ্দ টাকা, আর সঙ্গে খাঁচা পাঁচ টাকা এবং করজোড়ে বকশিশ এক টাকা, সব মিলে কুড়ি টাকা। এই টিয়াগুলো নাকি মোটেই সাধারণ টিয়া নয়, নেপালে জয়বাবা হরহর ত্রৈলোক্যেশ্বর পাহাড় (পাখিওলা বর্ণনার সময় এইখানে এসে কপালে হাত ঠেকিয়েছিল) তার পেছনে নন্দামাঈকা আশ্রম (আবার কপালে হাত), সেই আশ্রমের টিয়া বহু শ্রমে সংগৃহীত।

আমি শুনে তাজ্জব বোধ করছিলাম, বারাসত, দমদম কিংবা শ্রীরামপুর, ত্রিবেণী থেকে না ধরে নন্দামাঈকা আশ্রম পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল টিয়া ধরবার জন্যে, এর পরে দাম-দরের বোধহয় প্রশ্নই ওঠে না। রাজেনবাবুর স্ত্রী কিন্তু বাদ সাধলেন, কোনও রকম অবান্তরতায় না গিয়ে সোজাসুজি বললেন, 'খাঁচার দাম পাবে না। টিয়া দুটো রেখে দুটো টাকা নিয়ে যাও। যদি বেঁচে থাকে সামনের মাসে এসে আর এক টাকা নিয়ে যেযো।'

এই প্রস্তাবে পাখিওলা তা-না-না করতে লাগল আর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে কত সহজেই সবসুদ্ধ পাঁচ টাকায় পাখিওলা পাখি দুটো দিয়ে দিল।

কিন্তু কেন কিনলাম টিয়া দুটো? বারান্দায় কাপড় ঝোলানোর তারে খাঁচা ঝুলিয়ে ভাবতে লাগলাম। এখন এর জন্যে কাঁচা লঙ্কা, ছোলা এইসব নিয়মিত সংগ্রহ করা সে আর এক দায় হয়ে দাঁড়াল। এই সব অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, খাঁচার ভেতর থেকে ঠোঁট বার করে একটা টিয়া কখন আমার ঘাড়ের নিচে খুবলে ধরেছে। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড গেল, কিন্তু ততক্ষণে কাঁধ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রাণভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলাম। নিচতলার অধিবাসীরা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে এলেন, আশেপাশের বাড়ির জানলায় লোকজন দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু টিয়া নাছোড়বান্দা, কিছুতেই কামড় ছাড়ে না। মধ্যে মধ্যে অল্প-অল্প ঘাড়ে ঝাঁকি দিচ্ছি, কিন্তু ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, টিয়া কিছুতেই ছাড়ে না।

ডানদিকের বাড়ির ছাদে এক ভদ্রলোক দাড়ি কামাচ্ছিলেন, তিনি দাড়ি কামানোর আয়নাটা রৌদ্রে ঘুরিয়ে টিয়াপাখির চোখে আলো ফেলে বিব্রত করতে চাইলেন। কিছু হল না, তখন নিরাশ কণ্ঠে বললেন, 'এসব পাখি একবার ধরলে বেঁচে থাকতে ছাড়ে না।'

নন্দামাঈকা আশ্রমের পাখি এত হিংস্র স্বভাবের, এ কখনোই ভাবা যায় না। এই সময়ে ভাগ্য ভালো কোথা থেকে একটা বিড়াল রেলিং টপকে আমাদের দোতলায় ঢুকল আর সঙ্গে সঙ্গে টিয়াটা আমার ঘাড় ছেড়ে গুটিসুটি মেরে খাঁচার এক কোনায় সরে গেল।

ঘাড়ে ডেটল লাগাতে লাগাতে স্থির করলাম টিয়া দুটোকে বিদায় করব। পাঁচ টাকা খরচ করে পাখি কিনে উড়িয়ে দেব, বুকটা খচখচ করতে লাগল, কিন্তু কি করা যায়?

[চার]

ঘাড়ের ব্যথা কমলে মাথায় বুদ্ধি এল, পাখি দুটো কাউকে উপহার দিলে বেশ হয়। তেমন কাউকে, যার দংশন চিরদিন আমাকে পীড়া দিয়েছে তারই বিনিময়ে এই সামান্য উপহার। কিন্তু কলকাতায় কাউকে নয়, সে তাহলে পরদিনই ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে; দূরে, বহু দূরে কাউকে যার পক্ষে এটা ফেরত পাঠানো অসম্ভব হবে।

কিন্তু কাকে দেয়া যায়? ভাবতে ভাবতে বরাহমিহিরের কথা মনে পড়ল। বরাহমিহিরের বিয়েতে কিছু উপহার দেয়া হয়নি, সেই ছলে এই দংশনপ্রিয় টিয়া দুটি দেয়া যেতে পারে, সুমধুর দাম্পত্যজীবনের প্রতীকরূপে। তবু কিভাবে পাঠাব, এই প্রশ্ন ঝুলে রইল সামনে। বারান্দায় পায়চারি না করলে আমার বুদ্ধি তেমন খোলে না, কিন্তু বারান্দায় টিয়ার খাঁচা ঝোলানো রয়েছে, কিছুতেই আর সাহস হচ্ছে না বারান্দায় যেতে। বালিসে চিত হয়ে শুয়ে ভাবব তারও অবস্থা নেই, ঘাড়ে দগ্‌দগে কাটা ঘা।

ডাকে কি পাখি পাঠানো যায়? একবার ডাকঘরে গেলাম। অনুসন্ধান কাউন্টারে যে মহিলা বসেছিলেন তাঁকে বিহঙ্গমের ডাকযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্নে বোধহয় আমার কিছু ত্রুটি হয়েছিল, তিনি দুবার শুনলেন প্রশ্নটা তারপর বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'কি বললেন, এতবড় আস্পর্ধা। পাখি ডাকে যায় কিনা, ভদ্রমহিলাকে অপমান।' তিনি তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, ভিড় জমে গেল। এই সর্বপ্রথম লক্ষ করলাম ডাক বিভাগের কর্মীরা বড় বলশালী হয়। 'পাখি ডাকে যায় কিনা' এই সামান্য সংবাদটি সংগ্রহ করা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না—এই কথাটা বোঝাতে আমার আধ ঘণ্টা সময় গেল।

ব্যর্থ, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে তখনই খাঁচা হাতে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা বরাহমিহিরের ওখানে যাব। দুই হাতে কব্জি পর্যন্ত পুরু করে তোয়ালে জড়িয়ে নিলাম। আত্মরক্ষার্থে।

এবার বাস। কিন্তু প্রথমেই বাধা। বাসে উঠতেই কন্ডাক্টর বললেন, নেমে যান, নেমে যান, বাসে পাখি নিয়ে যাওয়া আইনে নিষেধ আছে।

আমি তখন উত্তেজিত, 'কিসের আইন মশায়। কোথায় আপনার আইন?' কন্ডাক্টর পকেট থেকে একটা দুমড়ানো কাগজ বের করে দেখালেন, তাতে লেখা রয়েছে, 'মাতাল বা উন্মাদ অবস্থায়, বসন্ত হইলে অথবা কুকুর ও সাইকেলসহ বাসে উঠা নিষিদ্ধ।' এইসব সময়ে বিশেষ করে সাইকেল নিয়ে লোকে কেন বাসে উঠতে যাবে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু টিয়াপাখির কথা কোথাও লেখা নেই।

তখন কন্ডাক্টর বললেন, 'তাহলে টিকেট লাগবে। দুটো টিয়ের দুটো আলাদা টিকেট। কন্ডাক্টর যে বিজ্ঞপ্তি বার করেছিলেন তারই নিচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি দেখালাম, 'এই দেখুন তিন বৎসরের কম বয়স্কদের টিকেট লাগিবে না। আমার এই টিয়ে

দুটো নেহাৎ বাচ্চা, দুগ্ধপোষ্য; এখনও ছমাস হয়নি।'

সামনের সিট থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক আমার স্বপক্ষে বললেন, 'আর তাছাড়া টিয়েপাখি তিন বছর বাঁচেই না।'

কন্ডাক্টর গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলেন। শেয়ালদা অবধি আসা গেল। এইবার মূল সমস্যা। রেলওয়ে আইনে স্পষ্ট লেখা রয়েছে পশুপাখির আলাদা বুকিং লাগবে। গেটে চেকার-সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে কিঞ্চিৎ বচসা হল। ইতিমধ্যে সুযোগ মত টিয়া দুটো ইতস্তত তিনজন যাত্রী, একজন কুলি এবং একজন রেলকর্মচারীকে আহত করে ফেলেছে। প্রাথমিক শুশ্রূষার অঙ্গ হিসেবে আমি একশিশি ডেটল সঙ্গে এনেছিলাম, সেটা কিছু কাজ দিল। হয়তো মারধোরও কিছু হত আমার উপরে, কিন্তু আমার হাতে শানিত চঞ্চু দুটি টিয়া, কেউ আমাকে আক্রমণ করতে সাহস পেল না। পনেরো গজ ব্যাসে বৃত্তাকারে মারমুখী জনতা আস্ফালন করতে লাগল।

গতিক বুঝে আমি বুকিং করতে রাজি হয়ে গেলুম। বুকিংয়ে প্রথম ধাপ ওজন করা। এই রকম মারাত্মক দুটি জীব আলাদা আলাদা ওজন করা কি করে সম্ভব, ভাবতে ভাবতে বুকিং অফিসে এসে পৌঁছলাম। বুকিংয়ে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি, আমি কিছু বলবার আগেই, খাঁচার দরজাটা যেই খুলেছেন, একটা টিয়া বেরিয়ে গিয়ে তাঁর নাক থাবা দিয়ে ধরল। দ্বিতীয় টিয়াটি কোন গতিকে ছুটে ওপাশের প্লাটফর্মে এক ভদ্রলোক আপনমনে তরমুজের ফালি কামড়াচ্ছিলেন তাঁকে কিচমিচ করে জাপটে ধরল।

আর এক মুহূর্তও নয়। কোলাপুরী চপ্পলের মায়া ত্যাগ করে আমি এক লাফে স্টেশন থেকে সামনের ফুটপাথে, পরের লাফে একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে।

বিবি এগারো বারো

[এক] 'বি বি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু

সাদাত কলেজ করটিয়ার প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খান সাহেব খুব কড়া অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই আমলে সাদাত কলেজ ফার্স্ট গ্রেড কলেজে উন্নীত হয়।

ফার্স্ট গ্রেড কলেজ মানে বি. এ ক্লাশ পর্যন্ত। তার আগে সাদাত কলেজে আই. এ. পর্যন্ত পড়ানো হত। তখন কলকাতা ছাড়া সারা বঙ্গপ্রদেশে বি.এ পর্যন্ত পড়ার কলেজ সামান্য সংখ্যক ছিল, বলা যায় আঙুলে গোনা যেত।

কলেজ ফার্স্ট গ্রেড হওয়ার পর প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খান এম.এ বি.এল আরো কড়াকড়ি শুরু করলেন। বি.এ পরীক্ষার আগে প্রিটেস্টে আর টেস্টে যারা সব বিষয়ে পাশ করেনি তাদের তিনি ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে নির্বাচন করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল, বি.এ পরীক্ষা ছেলেখেলা নয়, এই পরীক্ষা প্রথম দিয়েছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, এই পরীক্ষা পাশ করলে গ্র্যাজুয়েট হয়, এই পরীক্ষার মান রক্ষা করতে হবে, যারা পরীক্ষা দিতে বসবে তারা যেন পরীক্ষার যোগ্য হয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের এই রকম কড়াকড়ির যুগে মীরের বেতকা গ্রামের বকর ভাই, আবু বকর চৌধুরী পর পর তিনবার বি.এ পরীক্ষার টেস্টে ডিস্‌অ্যালাউ হলেন এবং অবশেষে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন।

বকর ভাই আমার কাকার সঙ্গে স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাকা ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। বকর ভাই করটিয়ায় সাদাত কলেজে।

বি.এ পরীক্ষায় বসতে না পারার দুঃখে বকর ভাই বাড়ি ছাড়লেন, কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে চলে এলেন ব্যবসা করতে, বিভিন্ন সরকারি অফিসে কি সব টুকটাক জিনিসপত্র সাপ্লাই করতেন। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠলেন বকর ভাই, কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রিটে নিজের আলাদা অফিস করলেন, মীরের বেতকায় গ্রামের বাড়িতে দোতলা পাকা দালান বানালেন, পুকুরের ঘাট বাঁধালেন, আটিয়ার পুরনো মসজিদ একবার নিজের পয়সায় আগাগোড়া চুনকাম করিয়ে দিলেন।

ক্লাইভ স্ট্রিটে যে অফিস করেছিলেন বকর ভাই তার নাম দিয়েছিলেন এ-বি-সি সাপ্লায়ার্স। এ-বি-সি হল আবু বকর চৌধুরীর নামের আদ্যক্ষর সমষ্টি।

ব্যবসা ভালোই চলছিল বকর কাকার কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হল, ছেচল্লিশের ষোলই আগস্টের দাঙ্গায় কলকাতা তছনছ হয়ে গেল, স্বাধীনতা এল, দেশ ভাগ হল, আমাদের দিকের দেশটা পাকিস্তান হয়ে গেল, কিন্তু বকর ভাই কলকাতায় রয়ে গেলেন। তাঁর এ-বি-সি সাপ্লায়ার্স তখন আর তেমন চলছে না। তবু অফিসটা ছিল, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় বাড়ি যেতেন বকর ভাই, বাকি সময় কলকাতাতেই অফিস আগলাতেন। থাকতেন পার্কসার্কাসে, সেখান থেকে ট্রামে ডালহৌসি হয়ে ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিস।

ততদিনে আমরাও অনেকেই কলকাতায় চলে এসেছি। বকর ভাই আমার কাকার বন্ধু ছিলেন, গ্রাম সুবাদে তাঁকে আমাদের বকর চাচা বলা উচিত, কিন্তু আর সকলে বকর ভাই ডাকত বলে আমরাও তাই ডাকতাম। সে যা হোক, বকর ভাই প্রায় নিয়মিতই আমাদের পুরনো কালীঘাটের বাড়িতে আসতেন।

বকর ভাইয়ের ঐ এ-বি-সি সাপ্লায়ার্সের অফিসে একটা ফোন ছিল। তখন ঘরে ঘরে ফোনের এত ছড়াছড়ি ছিল না, একটা পাড়ায় দু-চারটে বাড়ির খোঁজ করলে ফোন দেখা যেতো, এমনকি সব অফিসেও ফোন ছিল না।

বকর ভাইয়ের অফিসের ফোন নম্বর ছিল বড়বাজার এক হাজার একশো বারো, সংক্ষেপে ইংরেজিতে বি বি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু (বি বি ১১১২)। তখনও এখনকার মত অটোমেটিক ফোন চালু হয়নি। ফোন তুলে এক্সচেঞ্জে নম্বর চাইতে হত।

ব্যবসাপত্র কলকাতায় ভালো চলছিল না। দিনকালও ভালো নয়। অবশেষে বকর ভাই ঠিক করলেন ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে দেশে ফিরে যাবেন।

চলে যাওয়ার আগের দিন আমাদের বাসায় এলেন হাতে একটা ভারী রেশনব্যাগ। অল্পবিস্তর কথাবার্তার পর ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলেন একটা টেলিফোনের রিসিভার, কষ্টিপাথরের মত কালো কুচকুচে সে একটা প্রমাণ সাইজের টেলিফোন যন্ত্র। আজকালকারগুলোর মত খেলনা জিনিস নয়। রীতিমত ভারী অন্তত দেড়সের, দুসের ওজন হবে। তার সঙ্গে কয়েক হাত লম্বা তার রয়েছে, সে তারও এক আঙুল মোটা, আজকালের তারের মতো ফিনফিনে নয়।

ফোনটার কথা বলার জায়গায় বেশ চওড়া করে ছড়ানো একটা চোঙার মত জিনিস রয়েছে। কানে দেওয়ার জায়গাটাও বেশ বড়।

বকর ভাই বললেন, 'এ জিনিস আর একালে পাওয়া যাবে না। আসল বেল কোম্পানির সাবেকি জিনিস। অফিসের ফোনটা কাল থেকে কাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু কোম্পানি থেকে এসে রিসিভারটা নিয়ে গেল না। এটা আর দেশে নিয়ে গিয়ে কি কাজ হবে। বর্ডারে কাস্টমসেও ধরতে পারে। তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। যদি কখনও ফিরে আসি, ফেরত নিতেও পারি, না হলে তোমাদেরই থাকবে।'

ফোনটা রেখে বকর ভাই দেশে চলে গেলেন। পরে দেশ থেকে তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত পৌঁছ সংবাদ এসেছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কখন দেখা হয়নি। বকর ভাই চলে যেতে আমরা ভালো করে ফোনটা দেখলাম। সাদা কাগজ এঁটে কালো ফোনটার গায়ে লাগানো, তাতে লেখা,

ABC Suppliers
BB 1112

সেই থেকে বি বি এক এক এক দুই আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল। বি বি মানে বড়বাজার, বড়বাজার এক্সচেঞ্জ, এখন যেমন ফোর ফাইভ বা ডবল টু তখন ছিল বড়বাজার, পার্ক সার্কাস এই রকম এক্সচেঞ্জের নাম ফোন নম্বরে। মাথা গোঁজার তাগিদে এই পোড়া বিদেশি শহরে বাক্স বিছানা ঘাড়ে করে কত যে ঘুরপাক খেলাম। বি বি এক এক এক দুই কিন্তু তদবধি আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল।

ফোনের লাইন নেই, কানেকশন নেই শুধু একটা জলজ্যান্ত রিসিভার আমাদের বাড়িতে বাইরের ঘরে এ জিনিস দেখে অনেকে বিস্মিত হত। কেউ কেউ ভুল করে ফোন করতে গিয়ে জব্দও হয়েছে।

তবে এ জাতীয় ব্যাপার আমাদের বাড়িতে ঘটে থাকে। আমাব দাদা একবার রেডিয়োর এরিয়েল জলের দরে পেয়ে কিনে এনেছিল তখন আমাদের কোঁন রেডিযো নেই। বিজন আমার ছোট ভাই, চাঁদনি চক থেকে একটা অ্যান্টেনা কিনে আনল কারণ সেটা তার সামর্থ্যের মধ্যে, আর কিনে আনল এই আশায় যে আমি যদি টিভিটা কিনি, অ্যান্টেনা ব্যবহার করার জন্যেই কিনব। এরও পরে আমার স্ত্রী মিনতি গ্যাসের উনুন কিনেছিলেন গ্যাসের সিলিন্ডার আসার ঢের আগে।

ঘোড়ার আগে লাগাম জোগাড় করে পরে সেই লাগামের জন্যে ঘোড়ার পিছনে আমরা অনেক ছুটেছি। সুতরাং টেলিফোনের রিসিভাবটার জন্যে এক সময় একটা কানেকশনের দরখাস্ত আমাদের করতে হল।

ততদিনে বি বি এক এক এক দুই আমাদের সংসারে, দেবত্ব অর্জন করেছে। কষ্টি পাথরের মত, শালগ্রাম শিলা কিংবা শিবলিঙ্গের মত কালো কুচকুচে বলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমার পিসিমা তাঁর অন্যান্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সঙ্গে জুড়ে দেন বি বি এক এক এক দুই। পিসিমা বলতেন বিবি এগারো বারো। তিথিপর্বে সিঁদুর, চন্দনের ফোঁটা পরানো হত, ফুল বেলপাতাও দেয়া হত বিবিকে। শেষেব দিকে দেখেছি ছোটো স্টেনলেস স্টিলের থালায় বাতাসা বা নকুলদানাও রাখা হত। পিসিমা বলতেন, 'বি বি এগারো বারো খুব জাগ্রত।'

আমরা বলতাম, 'এখনও জাগ্রত নয়, তবে জাগ্রত করার চেষ্টা চলছে', অর্থাৎ কানেকশন আনার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের গোড়ায় গলদ হয়েছিল। আমরা কেউ খেয়ালই করিনি যে এই আদ্যিকালের ভারী টেলিফোনটা এই অটোমেটিকের যুগে চলবে না। এই টেলিফোনে ডায়াল করার কোনও ব্যাপার নেই।

অবশেষে একদিন সর্বনাশটা ঘটল। আমরা কেউ বাসায় নেই, সেদিন উলটো রথ না কি যেন, পিসিমা গেছেন কালীঘাট মন্দিরে, এই রকম একটা দুপুর বেলায় টেলিফোনের লোকেরা এসে কানেকশন দিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে।

তখন বাসায় একা কাজের লোক ছিল। তাকে আগেই ভালো করে বুঝিয়ে বলা ছিলো যে বাইরের ঘরের টেবিলে বিবি এগারো বারোর পাশেই নতুন টেলিফোনটা বসবে। কারণ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে দুপুরবেলায় যখন আমরা কাজে কর্মে বাড়ির বাইরে থাকব তখনই কানেকশন দিতে, লাইন বসাতে টেলিফোন অফিসের লোক আসবে। তাই আসে।

কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি যে পিসিমাও বাড়িতে থাকবেন না। পিসিমা বাড়িতে থাকলে তাঁর আরাধ্য দেবতা বিবি এগারো বারো আমাদের হাতছাড়া হত না, হাতছাড়া হওয়া সম্ভব ছিল না।

[দুই] ফোর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু

আটচল্লিশ এগারো বারোর বৃত্তান্ত আরম্ভ করার আগে বিবি এগারো বারো কি করে আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল সে কথা অবশ্যই বলতে হবে। আসলে দুটো একই ব্যাপার।

সেই উলটোরথ নাকি ঝুলন পূর্ণিমা তা সে যাই হোক না কেন, এক ঝিরিঝির বরষার পুণ্য দিবসে টেলিফোন কোম্পানির লোকেরা আমাদের কালীঘাটের বাড়িতে টেলিফোন বসিয়ে গেল।

আমাদের বহুকালের অভিভাবিকা পুরনো কাজের লোক কুড়ানির মা তখন আমাদের দেখাশোনা করত। সে দেশ থেকে আমাদের কাছে এসেছিল, আমাদের কাছেই আমৃত্যু ছিলো। তার কেউ ছিল কি না তার কোন খবর আমরা রাখতাম না, সেও বোধহয় রাখত না। তার মৃত্যুর পরে কেওড়াতলা শ্মশানে দাদা তার মুখাগ্নি করেছিল।

কুড়ানির মার কথা কবে যেন অন্য কোথায় লিখেছিলাম এখানে শুধু একটা কথা বলে রাখি। কুড়ানির মা'র আসল নাম ছিল কুড়ানি, শুধুই কুড়ানি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায় যে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা তাকে কুড়ানির মা বলে ডাকতে থাকি এবং সেও এতে মোটেই আপত্তি করেনি। শুধু একবার বলেছিল, 'আমি আবার মা ছিলাম কোন্ জন্মে?'

কুড়ানির মা আমাদের সব জিনিসপত্র এমনকি স্মৃতি পর্যন্ত আগলে রাখত। হঠাৎ হঠাৎ বলে বসত, 'আজ তো বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবার, আজ বিকেলে তো হরিপাগলার মেলা।' কোথাকার কে হরিপাগলা, কবেকার এক গেঁয়ো মফস্বল শহরের উপান্তে তার নামে মেলা বসত বাংলা সনের প্রথম রবিবারে, কুড়ানির মা ছাড়া সে সব স্মৃতি কেই বা মনে রেখেছিল?

কুড়ানির মা ছাড়া কেই বা দীপান্বিতা শ্যামাপুজোর আগের ভূত চতুর্দশীর সন্ধ্যায় হঠাৎ

প্রদীপের সলতেগুলোয় বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলে উঠত, 'এই সন্ধ্যায় বড়বাবা স্বর্গে গিয়েছিল,' বড়বাবা মানে আমাদের ঠাকুরদা।

আমাদের মা-বাবা তখন দেশে রয়েছেন, আমরা পিসিমার সঙ্গে কলকাতায়, কুড়ানির মা'ও দেশ থেকে এসেছে। সেও ছোটবেলা থেকেই আমাদের দেখছে।

এতদিন পরে মনে হয় আমাদের অভিভাবকত্ব নিয়ে আমাদের ভালোমন্দ দেখাশোনার ব্যাপারে পিসিমার সঙ্গে বুঝি তাঁর অদৃশ্য একটা রেষারেষি ছিল।

সে যা হোক। একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার ছিল যে পিসিমার বিবি এগারো বারো ওরফে বিবি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু-কে সে একদম সমীহ করত না, তার দেবত্বে বিশ্বাস করত না। মোট কথা বি বি এগারো বারোর প্রতি তার কোন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না।

আমাদের বাড়িতে যেদিন টেলিফোন এল সেদিন দুপুরে শূন্যবাড়িতে কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখি পিসিমা খুব চেঁচামেচি করছেন।

কুড়ানির মাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো, দুপুরে ফোনের লোকেরা এসে নতুন ফোন বসিয়ে দিয়ে পুরনো ফোন নিয়ে চলে গেছে।

পিসিমা কালীমন্দির থেকে ফিরে আসার পবে সে এ সব কথা পিসিমাকে কিছুই বলেনি, বলার প্রয়োজন বোধ করেনি, এখন সন্ধ্যাবেলায়, এই একটু আগে পিসিমা আরতি দিতে গিয়ে দেখেন বিবি এগারো বারো নেই, তার জায়গায় একটা তন্বী, আধুনিকা, ছিমছাম নতুন যুগের দূরভাষ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরাও ব্যাপারটায় খুব চটে গেলাম। নতুন ফোনের জন্যে টাকা দিয়েছি, নতুন ফোন আসবে, ঠিক কথা, কিন্তু সেই জন্যে পুরনো ফোনটা, যেটার কোনও কানেকশন নেই, যেটা টেলিফোন কোম্পানি আমাদের দেয়নি, সেটা টেলিফোনের লোকেরা নিয়ে যাবে কেন?

আমরা ঠিক করলাম পরদিন টেলিফোন অফিসে গিয়ে বিবি এগারো বারোকে উদ্ধার করবো। কিন্তু পিসিমা তাতে রাজি হলেন না, বললেন, 'বিবি এগারো বারো নাম আর মুখে এনো না। ওটা এঁটো হয়ে গেছে, ওটাকে আর ঘরে আনা যাবে না।'

ব্যাপারটা আমরা ভালো বুঝলাম না। পিসিমা বললেন, 'দেবতা অপবিত্র হয়ে গেলে বিসর্জন দিতে হয়। ওটাকে উদ্ধার করে আমরা যেন গঙ্গায় ফেলে দিই।

গোলমালে বাড়িতে নতুন ফোন আসার আনন্দটাই মাটি হতে বসেছিল। আমরা এবার নতুন ফোনটাকে দেখতে লাগলাম। রিসিভারটা তুলে দেখলাম ডায়াল টোন নেই, মৃত। তার মানে রিসিভারটা দিয়ে গেছে এখন কানেকশন দেয়নি।

ফোনটার গায়ে একটা টিকেট ঝোলানো আছে, দেখা গেলো তাতে ফোনের নম্বরটা লেখা রয়েছে। সেটা পড়েই দাদা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি আশ্চর্য, এটাও এগারো বারো দেখছি।'

অবাক হয়ে আমরা সবাই উঁকি দিয়ে দেখলাম টিকিটের গায়ে ফোনের নম্বর দেয়া রয়েছে ৪৮-১১১২, ফোঁর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু।

আশ্চর্য মিল, অসম্ভব যোগাযোগ। এবং তখনই আমরা বুঝতে পারলাম নম্বরের এই সাদৃশ্যের জন্যেই পুরনো ফোনের বদলে নতুন ফোন আসছে, এই কথা ভেবেই টেলিফোন অফিসের লোকেরা পুরনো বাতিল ফোনযন্ত্রটা অর্থাৎ আমাদের বিবি এগারো বারোকে নিয়ে গেছে। তার বদলে বসিয়ে দিয়ে গেছে আটচল্লিশ এগারো বারো।

এর পরে আমরা প্রায় প্রতিদিন টেলিফোন অফিসে যাতায়াত করলাম। দুটো কারণ, (এক) বিবি এগারো বারোকে উদ্ধার করার জন্যে, (দুই) আটচল্লিশ এগাবো বারোয় প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে।

দুটোর কোনওটারই কিন্তু কোনও সুরাহা হল না।

বিবি এগারো বারো গুদামে জমা পড়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো গুদাম ঘর তার মধ্যে শত শত মৃত টেলিফোনের শবদেহ, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সেগুলো কার কি কাজে লাগবে সেটা কেউই জানে না।

দু চারদিন চেষ্টা করার পরই বোঝা গেল গুদাম থেকে বিবি এগারো বারোকে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। তাছাড়া টেলিফোন অফিসের কাউন্টারের দিদিমণি ইতিমধ্যে নানারকম বিপজ্জনক প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন।

আমাদের কানেকশন ছিল না তবু রিসিভার পেলাম কোথা থেকে, ঐ বাতিল পুরনো রিসিভার আমাদের কি কাজে লাগবে, রিসিভারটার নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে ওটা চোরাই রিসিভার কি না। এই সব খারাপ প্রশ্ন।

আমি তখন অল্প কিছুদিন ল কলেজে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। ফৌজদারি দণ্ডবিধিব 'রিসিভার অফ স্টোলেন প্রপার্টিস' কথাটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। রিসিভার অফ স্টোলেন রিসিভার হলে কি হতে পারে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম। বিবি এগারো বারোর আশা ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু আটচল্লিশ এগারো বারো, ঐ ফোর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু ফোনটাও চালু হল না। প্রত্যেক দিনই শুনি পরের দিনই কানেকশন পাওয়া যাবে। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে কেবল ডুবে গিয়েছে, জল শুকোলেই লাইন ঠিক হবে। যার লাইন দেয়ার কথা, সেই যন্ত্রীর চিকেন পক্স হয়েছে। অথবা, তিনি শ্রীরামপুর থেকে আসেন এখন রেল অবরোধ চলছে বলে আসতে পারছেন না।

একেকদিন একেকসময় একেকরকম অজুহাত। অনেক সময় বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ।

আমরা প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।

হঠাৎই চার সপ্তাহের মাথায় একদিন সকাল আটটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেন্ডে, সময়টা আমরা ডায়েরিতে নোট করে রাখি টেলিফোন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্যে, টেলিফোনটা পরপর তিনবার টিং টিং করে বেজে উঠল। হৈচৈ পড়ে গেল আমাদের বাড়িতে, কিন্তু ফোনটা তুলে কোনো ডায়ালটোন পাওয়া গেল না।

এর পরেও কিছুক্ষণ পরপর ঐ রকম তিনবার টিং টিং হতে লাগল। আমরা বিশদ বিবরণ এবং সময়-টময় জানিয়ে টেলিফোন অফিসে চিঠি দিলাম।

দিন পনেরো পরে টেলিফোন দপ্তর থেকে জানা গেল আমাদের রিসিভারটা খারাপ হয়ে গেছে ওটা বদলাতে হবে।

রিসিভারটা ভালোই বা ছিল কবে যে খারাপ হয়ে গেল, তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কি করে খারাপ রিসিভারের কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। দলে দলে লোক টেলিফোন কোম্পানি থেকে আসছি বলে আমাদের বাড়িতে এসে কড়া নাড়তে লাগল এবং লোভনীয় সব রঙের রিসিভার দেখাতে লাগল, মাত্র একশো টাকার বিনিময়েই যে কোনও একটা পাওয়া যাবে।

আমরা বেছে-বুছে একটা হালকা গোলাপি রঙের ফোন পছন্দ করলাম। কিন্তু অসুবিধে হল পিসিমাকে নিয়ে, বর্তমান আটচল্লিশ এগারো বারোর আরাধনা ইতিমধ্যেই পিসিমা শুরু করে দিয়েছেন। সেই ফুল, বেলপাতা, চন্দন, সিঁদুর, বাতাসা নকুলদানার প্রসাদ সবই চলছে।

পিসিমাকে অনেক কষ্টে বোঝানো হল, এটাও আটচল্লিশ এগারো বারো, শুধু রংটাই যা আলাদা।

গোলাপি টেলিফোনটা বসল আমাদেব বাড়িতে এবং একটু উন্নতিও দেখা গেল।

না। ডায়াল টোন নয়। শুধু টিংটিং শব্দ বেরোতে লাগল। আগের মতো কিছুক্ষণ পরপর তিনবার টিং টিং নয়। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-সারা রাত শুধু টিং টিং, টিংটিং।

প্রথমে মৃদুভাবেই আরম্ভ হয়েছিল ঐ টিং টিং ধ্বনি, কিন্তু ক্রমশ সেটা উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। দু চারদিন পরে আমরা বুঝতে পারলাম টেলিফোনটা রিসিভার থেকে তুলে নামিয়ে রাখলে আর টিং টিং করে না।

আমাদের পিসিমা কিন্তু সুযোগটার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সন্ধ্যারতির পর খঞ্জনী বাজিয়ে পিসিমা মিনিট পনেরো হরিবোল হরিবোল করতেন। বাঁ হাতে বাত হওয়ায় তখন খঞ্জনীটা বাজাতে কষ্ট হত।

গোলাপি টেলিফোনটা পিসিমার খঞ্জনী বাজানোর কষ্ট লাঘব করল। সন্ধ্যাবেলায় পনেরো মিনিটের জন্যে রিসিভারটা যুক্ত করে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার টিং-টিং শব্দ বেরোত আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিসিমা হরিবোল হরিবোল সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন।

ভালোই চলছিল ব্যাপারটা, হঠাৎ এর মধ্যে ফোন আসা আরম্ভ হল। টিং টিং নয় ঐ টিং টিংয়ের মধ্যেই সত্যিকারের ফোন বাজার ক্রিং ক্রিং শব্দ।

প্রথম ফোনটা এল জাপান কিংবা মাদ্রাজ থেকে। লোকটা কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে ফোনটা প্রথমে বিজন ধরেছিল, একটু পরে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না লোকটা জাপানি ভাষায় কথা বলছে।' আমার কিন্তু ফোনটা ধরে মনে হল তামিল ভাষায় কথা বলছে, মাদ্রাজ কিংবা শ্রীলঙ্কা থেকে নিশ্চয়।

আরও নানা রকম ফোন শেষ রাতে, মধ্য রাতে, মধ্য দুপুরে আসতে লাগল। আমরা কিন্তু ফোন করতে পারতাম না, তবে ধরতাম।

দাদা বুঝতে পেরেছিল। দাদা বলল, 'এ সব ফোন আসছে ইউনাইটেড নেশন থেকে। তোরা কেউ ধরবি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ চাইছে।'

ফোন বাজলেই দাদা ধরে ইংরেজিতে জবাব দিত, 'নো, নো, ফিলিপাইনসে আর গম নয়', 'ইয়েস ইয়েস পাকিস্তান তিনটে ছোট আণবিক বোমা বানানোর চেষ্টা করছে', 'ইয়েস ইয়েস। সুইড্রিশ ব্যাঙ্ক', 'নো নো নো অ্যাকাউন্ট', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সবের পরিণতি কি হতে পারে তা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ একদিন খুব ভোরবেলায় আটচল্লিশ এগারো বারোর মধ্য থেকে সাইরেনের ভোঁও-ও শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙল।

বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি টেবিলের উপরে, টেলিফোনের রিসিভারটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিসিভারটাব দু প্রান্ত দিয়ে নীল ধোঁয়া বেরোতে

লাগল, কি রকম একটা প্ল্যাস্টিক পোড়ার গন্ধ। তারপরে দুম করে একটা শব্দ হল। টেলিফোনটা ঘন নীল ধোঁয়ার মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। সব জানালা খুলে দিলাম, কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে ঐ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে দেখি সব শূন্য, টেলিফোনটা নেই; মহাশূন্যে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে।

কিন্তু সম্পূর্ণ লীন বোধহয় হল না। সন্ধ্যাবেলায় পিসিমার সঙ্গে আমরাও স্পষ্ট খঞ্জনীর ধ্বনি শুনতে পেতাম, পিসিমা তালে তালে হরিবোল গাইতেন।

বোধহয় টেলিফোনটা ভূত হয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে একটা টেলিফোনের ছায়া সারাদিন আমাদের বাড়িময় ঘুরে বেড়াত। কখনও অবিচ্ছিন্ন মৃদু টিং টিং শোনা যেত, কখনও অবিশ্বাস্য ক্রিং ক্রিং শুনে আমরা চমকে উঠতাম, অন্যমনস্কভাবে ফোনটা ধরতে যেতাম। ধরতে না পারলেও বেশ শুনতে পেতাম, 'হ্যালো, হ্যালো', কে যেন জাপানি না মাদ্রাজি ভাষায় কি বলছে।

আমরা বুঝতে পারতাম যে টেলিফোনটা আমাদের বাসাতেই রয়েছে, আমরাই শুধু সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

কালীঘাটের বাড়ি থেকে আমরা বহুকাল চলে এসেছি। দাদা, কুড়ানির মা বিগত।

তবে পিসিমা আছেন। হঠাৎ কখনও কখনও বিবি এগারো বারোর কথা বলেন। তখনই আমাদের আটচল্লিশ এগারো বারোর ভৌতিক স্মৃতি মনে পড়ে। ভয়ে গা শিউরে ওঠে।

জানি না কালীঘাটের সে বাসায় এখন কারা আছে, আটচল্লিশ এগারো বারোর বিদেহী আত্মা এখনও সে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় কি না তাও জানি না।

হুঁকো

[এক] মীরণ বনাম মিড়ন

'বাবা, হুঁকো কি?'

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল এই রকম অতি সাধারণ ভাবে। কিন্তু সেটা যে শেষ পর্যন্ত এত জটিল আকার ধারণ করবে সে রকম কিছু সমীরণ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি।

সেটা কোনও এক রবিবারের সকালবেলা। সমীরণ সদ্য বাজার থেকে এসে দিনের দ্বিতীয় পেয়ালা চা নিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসেছে।

সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকালবেলায় অফিস যাওয়ার তাড়া থাকে। রবিরারে সে ঝামেলা নেই। রবিবারে সকালের দিকে এই বাজার যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোথাও যায় না সমীরণ। ইংরেজি-বাংলা দুটো খবরের কাগজ খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে আর যতটুকু সম্ভব ছেলেকে পড়ায়, ছেলের পড়াশুনো দেখে।

সমীরণের একই ছেলে, মেয়েটেয়ে নেই। ছেলের নাম আগে ছিল মীরণ, এখন হয়েছে মিড়ন।

প্রথমটা কায়দা করে সমীরণ থেকে ছেলের নাম মীরণ রাখা হয়েছিল। এ নামটা

সমীরণ কোথায় যেন শুনেছিল এবং ছেলে জন্মানোর আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ছেলে হলে তার নাম রাখবে মীরণ। বাপের নাম সমীরণ, ছেলের নাম মীরণ বেশ জুৎসই হবে ব্যাপারটা।

কিন্তু বাদ সাধল সমীরণের ইতিহাসবোধের অভাব। মীরণ নামটা ইতিহাস-কুখ্যাত মীরজাফরের ছেলের নাম, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সে হত্যা করেছিল, যাতা হত্যা নয় রীতিমত গলা কেটে হত্যা এবং সেই মীরণ নিজেই একদিন বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছিল।

তবে এসব কূট প্রশ্ন প্রথম দিকে ওঠেনি। সমীরণ-মীরণ ভালোই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বছর কয়েক আগে পুজোর সময় সপরিবারে দিল্লি বেড়াতে গিয়ে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে উঠেছিল সমীরণ, সেখানে প্রশ্নটা ওঠে; খুড়শ্বশুর মানে সমীরণের স্ত্রী তথা মীরণের মা শ্যামলীর কাকা।

খুড়শ্বশুর ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী, দিল্লির একটা পুরনো কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি নাতির নাম মীরণ শুনে পৌঁছানোর দিনই সন্ধ্যাবেলা সমীরণ ও শ্যামলীকে বাংলার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করলেন। এবং বললেন, কোনও ভারতীয়ের নামই মীরণ রাখা উচিত নয়।

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে সময় মীরণের বয়েস সাত। চার বছর বয়েসে মীরণকে স্কুলে নার্সারিতে ভর্তি করা হয়েছে, তখন থেকে মীরণ নামটা চলেছে। নামটা চালু হয়ে গেছে, স্কুলের খাতায় নাম রেকর্ড হয়ে গেছে। এরপর নাম পালটানো খুবই ঝামেলা।

যথাসময়ে সমীরণ-শ্যামলীরা ছুটির অবসানে কলকাতায় ফিরে এল। কিন্তু দু'জনের মনের মধ্যেই ছেলের নাম নিয়ে একটা খুঁতখুঁতানি ভাব। অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে সমীরণ তার কলেজের সহপাঠী বন্ধু অনিমেষকে ধরল।

অনিমেষ খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে। একসময় ভাবি ভাবি প্রবন্ধ লিখত, এখন শুধুই চাকরি করে আর আড্ডা দেয়। তবে বাংলাটা মোটামুটি জানে।

অনিমেষকে গিয়ে সমস্যাটা বলতে সে প্রথমে একচোট খুব হাসল, তারপর বলল, 'এই আধুনিক নাম রাখার ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। লোকেরা নবজাতকের নাম ওঁর কাছে চেয়ে পাঠাত। এখন তো যে কেউ নামকরণ করছে। আর্ধেক সময় তো নামের কোনও মানেই করা যায় না।'

সমীরণ বলল, 'কিন্তু কি করা যাবে?'

অনিমেষ বলল, 'কি আর করা যাবে। লোকেরা বাহারি নামের জন্যে ওঁকে ধরত। কিন্তু তিনি নিজের ছেলেমেয়ের নাম তো সাবেকি মতেই রেখেছিলেন।'

সমীরণ বলল 'তা রেখেছিলেন।'

অনিমেষ বলল, 'আর রবীন্দ্রনাথ যে নামকরণগুলো করেছিলেন সেগুলোর তো মানে ছিল, অর্থ ছিল। তাঁর মধ্যে কাব্যও ছিল।'

এভাবে কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর অনিমেষ বলল, 'দাঁড়া, দু' চারদিন সময় দে। আমি একটু ভেবে দেখি।'

কয়েকদিন পরে অনিমেষ সমীরণকে অফিসে ফোন করে বলল যে, সে একটা সমাধান পেয়েছে, খুব সহজ সমাধান। সেদিনই বিকেলে ছুটির পরে অনিমেষের সঙ্গে সমীরণ দেখা করল।

অনিমেষ যে পরামর্শ দিল সেটা বেশ গ্রহণযোগ্য। মীরণ নামটা বদলাতে হবে না, শুধু বানানটা বদলাতে হবে। মীরণ বদলিয়ে মিড়ন হয়ে যাবে।

এবার সমীরণ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মিড়ন মানে কি?'

অনিমেষ বলল, 'সঙ্গীতের সেতারের মিড় আছে না, স্বর ওঠে নামে, সেই মিড় থেকে মিড়ন, কম্প থেকে যেমন কম্পন।'

বিনা বাক্যব্যয়ে সমীরণ অনিমেষের এই সমাধান মেনে নিল। তবে অনিমেষ বলে দিলো, 'মিড়ন বানানে প্রথমে হ্রস্ব ইকার হবে, দীর্ঘ ঈকার নয়।' আর শেষেরটা দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ নয়।'

অতঃপর মীরণ মিড়ন হয়ে গেল।

এখন মিড়নের বয়েস নয়। তার নাম সবার অলক্ষ্যে সংশোধন করা হয়েছে। ক্লাসে কেউ টের পায়নি, টের পাওয়ার কথাও নয়, বাচ্চা ছেলের নামের বানান নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়।

তা না ঘামাক। এ গল্প মোটেই মিড়নকে নিয়ে নয়। এ গল্প হুঁকো নিয়ে। আর হুঁকো, অর্থাৎ তামাক সেবনের সেই প্রাচীন যন্ত্র, সে তো প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাপার, তার মধ্যে নয় বছর বয়েসের দুধের শিশুকে ডেকে আনা কেন?

[দুই] হুঁকোমুখো হ্যাংলা

যদিও ক্লান্তি আর একঘেয়েমির প্রশ্নটা আছে, থেকেই যায়, তবু হাসির গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখলে ভালো হয়, কিছু রাখাঢাকা করতে নেই।

সেই জন্যেই গল্পের গোড়াতে মীরণ-মিড়ন উপকাহিনীটি বলে নিলাম। তা ছাড়া একটু পরেই বোঝা যাবে এই হুঁকোকাহিনীর মূল নায়ক হল ঐ নয় বছর বয়েসী মিড়ন, যে মিড়ন একটি আধুনিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে।

মিড়নের পড়াশুনোর দিকে নজর রাখছিল সমীরণ, আজ এই ছুটির দিনের সকালে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

একদিনের ম্যাচে সদ্য নির্বাচিত ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সর্বশেষ তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখছিল সমীরণ, বিশেষ মনোযোগ সহকারে। আজাহারউদ্দিন আর শচীন তেণ্ডুলকার, দুজনের ওপরেই সমীরণের প্রচুর আস্থা, কিন্তু হাজার হলেও খেলাটা ক্রিকেট, কখন কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না।

এমন সময় ক্রিকেট তালিকায় সমীরণের মনোযোগ ও একাগ্রতা ছিন্ন করে মিড়ন জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, হুঁকো কি?'

হঠাৎ এই প্রশ্নের ধাক্কায় বাংলা সিনেমার নায়কের মতো অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সমীরণ বলতে যাচ্ছিল, 'হুঁকো, ঐ হুঁকো আর কি?'

এবং সেই মুহূর্তেই তার খেয়াল হল তার ছেলে মিড়ন হয়তো হুঁকো জিনিসটা কখন দেখেনি।

কিন্তু হুঁকো, হুঁকো নামক সনাতন নেশার দ্রব্যটি ইস্কুলের নিচু ক্লাসের পাঠ্যতালিকায়

কি করে আসছে? দিনে দিনে কি যে হচ্ছে সব। সমীরণের বয়েস যদিও এখন মাত্র আটত্রিশ সে ধরে নিল নয়ানীতির পাঠ্যরীতির দোষ এটা, সব গোলমেলে জিনিস শেখানো হচ্ছে শিশুদের, বালক-বালিকাদের; দেশটা তুফানমেলে জাহান্নমের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

আসলে ঘটনাটা কিন্তু ঠিক তা নয়। ঘটনাটা মিড়ন ও তার সহপাঠীদের পক্ষে অনেক বেশি জটিল ও বিপজ্জনক।

সমীরণ খবরের কাগজের বোঝা টেবিলের ওপরে ফেলে টেবিলের ও প্রান্তে সোফায় ছেলের পাশে বসে তার হাতের বইখানা তুলে নিল।

বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর বাংলার পাঠ্যপুস্তক সেটা। তারই কবিতাংশে রয়েছে 'হুঁকোমুখো হ্যাঁংলা' নামক সেই অত্যাশ্চর্য, অবিস্মরণীয় ছড়াটি। শ্যামাদাস নামে আফিঙের থানাদার মানে একসাইজ সাব ইন্সপেক্টরের সে ভাগ্নে, সে হুঁকোমুখো, সে হ্যাংলা, সে বাঙালি কারণ বাড়ি তার বাংলা, সব চেয়ে বড় কথা তার দুটো লেজ, কিন্তু মানুষের তো লেজ নেই, পশুদের লেজ থাকলেও মাত্র একটা করে লেজ, পাখিদের, সাপেদের, টিকটিকিদের, মাছেদেরও মাত্র একটাই লেজ, সে দিক থেকে হুঁকোমুখো হ্যাঁংলা সকলের চেয়ে এক ডিগ্রি অথবা একশো ডিগ্রি ওপরে।

দু-লেজের একটা কিম্ভূত জন্তু, যে কখনও হাসে না, যার শুধু এক আবগারির দারোগামামা ছাড়া কেউ নেই শিশুচিত্রের কল্পনার জন্যে অসামান্য, অতি, অতিশয় চমৎকার একটি জানোয়ার।

কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পাঠক্রমে কোনও কল্পনাবিলাসের অবকাশ নেই, অতসব হালকা জিনিস চলবে না।

'হুঁকোমুখো হ্যাঁংলা' ছড়াটির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক ভূমিকা, নান্দনিক গঠনরীতি, আর্থ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এমনকি সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় ছড়াটির যৌক্তিকতা—চতুর্থ শ্রেণীর শিশুদের সবই জানতে হবে। আর শুধু তাই নয়, ব্যাকরণগত যা কিছু প্রশ্ন ঐ ছড়ায় নিহিত রয়েছে সেটাও অনুধাবন করতে হবে।

সেই অনুধাবন করতে গিয়েই ছড়াটির প্রথম শব্দেই ব্যাকরণের ধাক্কায় আটকে গেছে শ্রীমান মিড়ন।

'হুকোমুখো' সমাসবদ্ধ পদ, ঠিক আছে মেনে নিয়েছে মিড়ন, ব্যাসবাক্য হল 'হুঁকোর মত মুখ' যাহার বা যাহাদের', তাতেও আপত্তি নেই মিড়নের। কিন্তু হুঁকো জিনিসটা কি?

তাই তার সরল ও স্বাভাবিক প্রশ্ন, 'বাবা, হুঁকো কি?

সমীরণ সে জাতের বাবা নয় যে, 'হুঁকো জিনিসটা কি তা তোমার না জানলেও চলবে,' এই রকম গুরুগম্ভীর জবাব দিয়ে প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে যাবে। সুতরাং সে একটু ভেবে চিন্তে সমঝিয়ে তারপর উত্তর দিল, 'হুঁকো দিয়ে তামাক খায়, তামাক খাওয়ার জিনিস একটা।'

মিড়ন বলল, 'সিগারেটের মতো?'

সমীরণ বলল, 'আরে না। না। মোটেই সিগারেটের মত নয়। হুঁকো অনেক বড়, হুঁকোর মধ্যে জল থাকে। সিগারেটে তামাক কাগজ দিয়ে জড়ানো থাকে। আর হুঁকোয় তামাক এমনিই থাকে। হুঁকোর তামাকের গন্ধ খুব ভালো হয়।'

এ কথা বলতে বলতে সমীরণের স্মৃতি তিরিশ বছর পিছিয়ে গেল। তখনও দেশের

বাড়িতে ঠাকুরদা বেঁচে। বিকেলে বাইরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসে গড়গড়া টানতেন, উঠোনের এক প্রান্তে গন্ধরাজ লেবুর পুরোনো ঝাড়ে সাদা ফুলে আর কলিতে থই থই করছে সৌরভ, বারান্দায় উঠে আসছে সেই গন্ধ তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ার ঘ্রাণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুক ভরে একটানা হাওয়া টানলো সমীরণ, সুখস্মৃতির সঙ্গে পুরোনো দিনের সৌরভ যদি একটু ফিরে পাওয়া যায়।

বাদ সাধল মিড়ন, সে তো আর তার পিতৃস্মৃতির অংশীদার নয়, এটা তার জিজ্ঞাসার বয়েস, তার জিজ্ঞাসা অফুরন্ত, সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তাহলে কি সিগারেটের মত হুঁকো দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়?'

স্মৃতিজাল ছিন্ন করতে করতে সমীরণ বলল, 'তা বেরোবে না কেন?'

মিড়ন বলল, 'কিন্তু বাবা তুমি যে বললে হুঁকোয় জল থাকে।'

সমীরণ বলল, 'থাকে তো, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

মিড়ন বলল, 'জলে আগুন নিবে যায় না? তাহলে ধোঁয়া বেরোয় কি করে?'

সমীরণ বুঝতে পারল হুঁকো জিনিসটা যে দেখেনি তার পক্ষে বোঝা কঠিন, বিশেষ করে একটি শিশুর পক্ষে। কলকে থেকে নলচে পর্যন্ত সে এক এলাহি কারবার। উঠে গিয়ে ছেলের টেবিল থেকে একটা খাতা পেনসিল নিয়ে এসে হুঁকোর ছবি আঁকতে বসল সমীরণ। তার পাশে মিড়ন উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

সমীরণ প্রথমে আঁকল ধোঁয়া, নিচে থাকবে কলকে, কলকের ভেতর থেকে তামাকের ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ধোঁয়া আঁকা খুব সোজা, খুব সহজেই ধোঁয়া আঁকার ব্যাপারটা সেরে ফেলল সমীরণ, তবে মিড়নের প্রতিক্রিয়া সুবিধের নয়, সে বলল, 'বাবা, মেঘ আঁকছো? ঐ মেঘের জল দিয়ে হুঁকো হবে?'

সমীরণ কিছু বোঝানোর আগেই সকালবেলার স্নান সেরে এলোচুল ঝাড়তে ঝাড়তে বাইরের ঘরের পাখার নিচে সিক্ত কেশরাজি শুকোনোর জন্যে শ্যামলী প্রবেশ করল অকুস্থলে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সে চেঁচামেচি শুরু করল, সর্বনাশ! ছেলের ইস্কুলের খাতায় এসব কি হাবিজাবি কাটাকুটি করছো? এ খাতা নিয়ে কাল ইস্কুলে যাবে কি করে?'

হুঁকোর ধোঁয়ার ছবি আঁকা থামিয়ে ছেলের সরল প্রশ্নের আগে স্ত্রীর কঠিন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সমীরণ, 'হুঁকোর ছবি আঁকছি।'

শ্যামলীর চুল ঝাড়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বিস্ফারিত হল।

ইস্কুলের পবিত্র খাতায় হুঁকোর ছবি! তাছাড়া এই হাসিস, চরস, ড্রাগের দুর্দিনে বাপ নিজে কিনা-ছেলেকে, একমাত্র ছেলেকে, হুঁকোর ছবি এঁকে দেখাচ্ছে। বিয়ের পর থেকেই শ্যামলীর কোনও এক অনির্দিষ্ট কারণে মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল একদিন তার স্বামী সমীরণ তার সমূহ ক্ষতি, চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাবে। আজ এই মুহূর্তে শ্যামলী এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হল।

এক ছোঁ মেরে সে স্বামীর হাত থেকে ছেলের ইস্কুলের খাতা ছিনিয়ে নিল। সর্বনাশ, এ যে ভূগোলের খাতা, সাধারণ খাতা নয়, ল্যাবরেটরি নোট বুক। ভূগোলেব অবশ্য ল্যাবরেটরি নেই কিন্তু ঐ নোটবুকটা লাগে। বাঁয়ে সাদা পৃষ্ঠা, ডাইনে লাল মার্জিনে নীল রুল

টানা পৃষ্ঠা। এই পৃষ্ঠায় মানচিত্র, প্রয়োজনীয় ছবি আঁকতে হয়, ঐ পৃষ্ঠায় আক্ষরিক বর্ণনা।

কি ভয়ানক! এই রকম দরকারি খাতায় ছেলের মনোরঞ্জনের জন্যে সমীরণ ছবি আঁকছে, তাও কি না হুঁকোর ছবি। এরপর অধঃপতনের অতল সলিলে ডুবে যেতে ছেলের আর কয় ধাপ নামতে হবে?

শ্যামলী এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে সমীরণ তাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারল না যে ভূগোল না হোক সে ছেলেকে অন্তত ব্যাকরণ শেখাচ্ছিল। আর ওটা ঠিক হুঁকোর ছবি নয়, হুঁকোর ছবি সে এখনও আঁকেনি এবং তার সন্দেহ হচ্ছে সে হয়তো ভালো ভাবে এঁকে উঠতে পারবে না।

শ্যামলী চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'তবে যে তুমি বললে হুঁকো?'

সমীরণ বলল, 'ঠিক হুঁকো নয়, ছবিটা ভালো করে লক্ষ করো, ওটা হল ধোঁয়ার ছবি, হুঁকোর কলকের ধোঁয়ার ছবি।'

'সে যে আরও খারাপ ব্যাপার।' শ্যামলী আর্তনাদ করে উঠল। প্রত্যেকদিনই স্নান করার পর শ্যামলীর গলা কিছুক্ষণের জন্য একটু বসে যায়, ফলে আর্তনাদ তেমন জমল না কিন্তু এতে সে দমল না, সমীরণের কাছে জানতে চাইল, 'হুঁকোর কলকের ধোঁয়ার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক কি? এর মধ্যে ব্যাকরণ কোথা থেকে আসে?'

এই দাম্পত্যকলহের বিস্তাবিত বিববণ দিয়ে লাভ নেই। ব্যাপাবটা রুচিসম্মত নয়, এব মধ্যে কোন অভিনবত্বও নেই।

সুতরাং সংক্ষিপ্ত করে বলি, সমীরণ এরপর হুঁকোর ছবি আঁকা থেকে নিবৃত্ত হল।

[তিন] হুঁকোর সন্ধানে

আজকের সকালের ঘটনার আকস্মিকতায় বহু অভিজ্ঞ শ্রীমান মিড়নও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল।

ভূগোলের খাতা থেকে ধূমজাল কলঙ্কিত পৃষ্ঠাটি পরিচ্ছন্নভাবে নিশ্চিহ্ন ও কুচিকুচি করে ফেলে শ্যামলী যখন পাশের ঘরে অন্য একটা পাখা খুলে চুল শুকোতে গেল মিড়ন থতমত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, হুঁকো জিনিসটা খারাপ?'

সমীরণ এ প্রশ্নের আসল উত্তর না দিয়ে ছেলেকে সান্ত্বনার ভাষায় বলল, 'আমি তোমাকে হুঁকো দেখাব। দেখলেই বুঝতে পারবে জিনিসটা ভালো কি খারাপ?'

মিড়ন বললো, 'মা দেখলে বুঝতে পারবে?'

সমীরণ বললো, 'তোমার মা'র হুঁকো দেখার দরকার নেই। তোমার মায়ের মামারা ছিলেন এক নম্বরের হুঁকোখোর। সারাদিন তিন মামা গুড় গুড় গুড় গুড়, লম্বা নলে গড়গড়ায় টান দিয়ে যাচ্ছেন আর টান দিয়ে যাচ্ছেন।'

এই রকম তিক্ত কথা বলার পরে সমীরণের যৌবন-বেদনা ফিরে এল। মনে পড়ল নববিবাহের সুখস্মৃতি। দ্বিরাগমনের অব্যবহিত পরে এক রবিবারে বারুইপুরে শ্যামলীর মামার বাড়িতে যেতে হয়েছিল। সে বাড়িতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল এ বাড়িতে তামাক সাজা আর তামাক পান করা, পান সাজা আর পান খাওয়া ছাড়া কারও কোনও কাজ নেই।

মনে আছে, পৌঁছানোর পরে চা-জলখাবার শেষ করে সে উঠল গিয়ে দোতলায়

চিলেকোঠা ঘরে। একতলা বাড়ির দোতলায় চিলেকোঠা বিরাট ব্যাপার, বিরাট লম্বা-চওড়া ঘর, অনন্ত ছাদ। ছাদের পাশে নারকেলের গাছের সারি, ছাদের কার্নিশে অফুরন্ত কচি নারকেলের বোঝা নামিয়ে গাছগুলো বিশ্রাম করছে। কোন কোন নারকেল গাছের বুকে মঞ্জরী এসেছে, ঈষৎ সাদা হলদেটে কুসুমগুচ্ছ, কেমন যেন মনে হয়েছিল ক্ষীণ গন্ধও আছে সেই সব মঞ্জরীতে।

চিলেকোঠার ছাদে আসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনৈক নবকিশোরী শ্যালিকা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'জামাইবাবু, হাবল বাবল?'

হাবল-বাবল শব্দটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল সমীরণের কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল ধূমায়িত অম্বুরী তামাকের নল-গড়গড়া হাতে এক সোমত্তা, সুরসিকা দাসী।

সেই মুহূর্তে সমীরণের মনে পড়ছিল, হুঁকোর ইংরেজি হল হাবল-বাবল। তখন কড়া চ্যার্মিনার সিগারেট খায় সমীরণ। তার বদলে সেই অম্বুরী তামাক, কি যে ভালো লেগেছিল সমীরণের!

কিন্তু এসব কথা ভেবে এখন লাভ নেই। তার চেয়ে বড়ো কাজ হল ছেলেকে একটা হুঁকো দেখানো, যেটা দেখলেই মিড়ন বুঝতে পারবে হুঁকোমুখো মানে কি। সেটাই হবে হাতে কলমে শিক্ষা। মিড়নের ক্লাসের অন্য কোনও ছেলেই জানতে পারবে না হুঁকোমুখো কি রকম। এই প্রতিযোগিতার বাজারে সেটা কি কম কথা!

সুতরাং সমীরণ মিড়নের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল সে তাকে হুঁকো দেখাবে।

এইখানেই সমীরণ ভুল করে বসল। তার ধারণা হয়েছিল আশেপাশে, নিশ্চয়ই পাড়ার মধ্যেই এখনো কেউ না কেউ হুঁকো খায়; একটু চেষ্টা করলেই মিড়নকে নিয়ে গিয়ে সে হুঁকো দেখিয়ে আনতে পারবে। হয়তো ঠিক হুঁকো যাকে বলে তা হবে না সেটা, গড়গড়া হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল হুঁকো দর্শন এখন আর সহজ নয়। শুধু নিজের পাড়াতেই নয়, চার দিকে দু-চার-দশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও হুঁকোপায়ীর সন্ধান পেল না সমীরণ। সকলের অগোচরে কবে যে হুঁকো-গড়গড়া অবলুপ্ত হয়ে গেল!

অথচ সমীরণের প্রথমে মনে হয়েছিল এই তো সেদিনও যেন কোন বাড়ির বারান্দায় কোনও এক বুড়োকে সে হুঁকো খেতে দেখেছে। কিন্তু বোঝা গেল এটা মনের বিভ্রম মাত্র। সেই সব হুঁকোসেবী মানুষেরা পৃথিবী থেকে কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েকদিন সমীরণের আশা ছিল হয়ত পথেঘাটে, এখানে ওখানে সহসা তেমন কাউকে দেখতে পাবে যে কিনা হুঁকো হাতে প্রসন্নচিত্তে একগাল ধোঁয়া ছাড়ছে।

তা হলেই, কেল্লা ফতে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ছুটে গিয়ে মিড়নকে নিয়ে এসে হুঁকোটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু, তা কি আর হয়। একটা হুঁকোও সতত সন্ধানী সতর্ক সমীরণের দৃষ্টিগোচর হল না।

গলির মোড়ে পাড়ার ক্লাবে কয়েকজন প্রৌঢ় অফিস-কাছারি থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় তাস খেলেন। তাঁরা অভিজ্ঞ, প্রবীণ ব্যক্তি। সমীরণ ভাবল এঁদের কাছে হুঁকোর খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

সমীরণ এ ক্লাবের সদস্য নয়, কোনওদিনই এই ক্লাবে যায় না; আর ঐ যাঁরা সন্ধ্যার পর ক্লাবে বসে তাস খেলেন তাঁদের সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশী সূত্রে যাকে বলে মুখচেনা আলাপ। এঁদের কারও নাম ভালো করে জানে না সে।

তবু ছেলেব জন্যে সমীরণ এর মধ্যে একদিন অফিসফেরতা ক্লাবে ঢুকল। চারজন গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাস খেলছেন, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। টিমটিমে একটা পঁচিশ পাওয়ারের বালবেব আলোয় পুরোনো ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপরে জমে উঠেছে খেলা। যতক্ষণ খেলা চলছিল তাঁরা একজনও সমীরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। তাস খেলার সময় বাইরের লোকের অনুপ্রবেশ তাসুড়েরা মোটেই বরদাস্ত করতে চায় না।

যা হোক খেলা এক হাত শেষ হওয়ার পর এঁদের মধ্যে একজন সমীরণেব দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ভরসা পেয়ে সমীবণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কেউ হুঁকো খান কি না?'

ততক্ষণে পরের দানের তাস বাটা হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বাঁ হাত তুলে ইঙ্গিতে সমীরণকে মৌন থাকতে বলে তাস তুলে সাজাতে লাগলেন। প্রথমে থেমে থেমে গভীর চিন্তা করে 'টু হার্টস, টু নো ট্রামপস...' ইত্যাদি ডাক চলল, তারপর তাস পেটাপেটি। আবেক ডিল খেলা শেষ হতে দশমিনিট লাগল। সমীরণ আর কি করবে ঠায দাঁড়িযে রইল।

ডিল শেষ হতে সেই ভদ্রলোক সমীরণকে তার প্রশ্নের খেই ধরে বললেন, 'হুঁকো?' তিনি এর বেশি বলতে পারলেন না, কারণ এবারে তাঁর তাস বাটার পালা পডেছে।

ফলে ঐ প্রশ্নের মুখে সমীরণের আরও দশ মিনিট দাঁড়াতে হল। অবশেষে প্রায দেড়ঘণ্টা পরে ঐ চারজনের পক্ষে সমীরণকে যা জানানো হল তার সারমর্ম হচ্ছে, 'না আমরা হুঁকো খাই না। কোনওদিন খাইনি। আমাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনওদিন খায়নি।' তাসের লোকদের বাঁকা হাসি টপকিয়ে অপমানিত সমীরণ ক্লাবঘর থেকে বেরোতে বেরোতে শুনতে পেল চাবজনের মন্তব্য,

(ক) 'হুঁকো?'

(খ) 'খুব গরম পড়েছে।'

(গ) 'ছেলে ছোকবাদের মাথা খাবাপ হচ্ছে।'

(ঘ) 'ভাগ্যিস কামড়ায়নি।'...

[চার] কোথাও পাবে না তাকে

হুঁকোর ব্যাপারটা যে এত গোলমেলে তা সমীরণ মোটেই বুঝতে পারেনি। আন্দাজ করতেও পারেনি। ক্রমশ সে অভিজ্ঞ হতে লাগল। অফিসে, পাড়ায়, আড্ডায়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করে হুঁকো বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারলো সে, যদিও কেউ তাকে হুঁকো দেখাতে পারল না।

জানা গেল, হুঁকো একরকম নয়, নানা রকম।

যথা থেলো হুঁকো, ডাবা হুঁকো, আলবোলা, গড়গড়া, ফরাসি, সটকা। একেক হুঁকো একেক রকম দেখতে। সমীরণ সমস্যায় পড়ল, তা হলে মিড়নের হুঁকোমুখো হ্যাংলা ঠিক কি জাতের হুঁকোর মত দেখতে ছিল?

অবশ্য এটা একটা কাল্পনিক সমস্যা। কাবণ কোনও রকম হুঁকোই এ পর্যন্ত তাব

চক্ষুগোচর হয়নি, যেটা দেখিয়ে শ্রীমান মিড়নকে বলা যায়, 'দ্যাখো, এই হল হুঁকো, তোমার বইয়ের ছড়ার হ্যাংলা লোকটার মুখ এই রকম দেখতে।'

সে ধরনের পজিটিভ কিছু অদ্যাবধি বলার সুযোগ হয়নি সমীরণের কিন্তু শ্রীমান মিড়ন প্রতিদিন, প্রত্যহ সমীরণ অফিস থেকে ফিরে আসামাত্র বা জিজ্ঞাসা করছে, 'বাবা, হুঁকো?'

মিড়নের মা, ঐ শ্যামলী আজকাল আর এ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বোধহয় সয়ে গেছে কিংবা বুঝে গেছে।

কিন্তু সমীরণের তো সয়ে যায়নি। ছেলেকে হুঁকো দেখাবে সে বলেছে, সুতরাং তাকে দেখাতেই হবে। সে কোনও যা-তা বাবা নয়।

এর মধ্যে একটা অসামান্য সুযোগ জুটে গেল।

সমীরণের অফিসের এক সহকর্মী, প্রায় তারই সমবয়সী, দুজনে একই বছরে কাজে ঢুকেছিল, পাশাপাশি টেবিলে বহুদিন কাজ করেছে সেই অরুণকান্ত, সম্প্রতি একটু মোটা হয়ে পড়েছিল, এই বয়েসেই একটু থপথপে। অফিসে আসার মুখে সে সিঁড়ির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। অফিসের ডাক্তার বললেন, 'ম্যাসিভ হার্ট স্ট্রোক (Massive Heart Stroke)'।

সেদিনই বিকেলে অরুণের শেষকৃত্যে যেতে হল নিমতলায়।

নিমতলা শ্মশানঘাট থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় একটু ঘোরাঘুরি করছিল সমীরণ। সাধারণত শ্মশানে সে আসে না, শ্মশানঘাটের দৃশ্য তার ভালো লাগে না। কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে বাধ্য হয়ে আসতেই হয়। তা ছাড়া পুরনো সহকর্মীর মৃত্যু, একটা দায়িত্বও তো আছে।

শ্মশানের বাইরের রাস্তায় সন্ন্যাসী, ভিখিরি আর ভবঘুরেরা ইতস্তত বসে রয়েছে। মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ফুল-বেলপাতার দোকান এরই মধ্যে একটা মুদিখানা, শ্মশানেও মুদিখানা, খুব দুঃখের হাসি পেল সমীরণের এবং তখনই তার চোখে পড়ল পাশে পরপর দুটো কলকের দোকান।

একেবারে হাতে চাঁদ পেল সমীরণ। বন্ধু অরুণকান্ত মরে তাকে বাঁচিয়ে গেল। কলকের দোকানে নিশ্চয়ই হুঁকো থাকবে, হুঁকো না থাকলেও হুঁকোর খোঁজ পাওয়া যাবে।

কিন্তু, হায় হতভাগ্য, এবারেও সমীরণকে নিরাশ হতে হল।

দোকানদার বলল, 'না হুঁকো নেই। এগুলো তামাক খাওয়ার কলকে নয়। এগুলো হাসিস, চরস, গাঁজা খাওয়ার কলকে। ও সব খাওয়ার জন্যে হুঁকো লাগে না। কলকে থেকে সরাসরি টানতে হয়।'

দোকান ভর্তি কলকে আর কলকে। শুধুই কলকে। সেদিকে তাকিয়ে সমীরণ বলল, 'আপনারা শুধু কলকে বেচেন। শুধু কলকে বেচে দোকান চলে?'

এর উত্তরে দোকানদার বলল, 'জানেন আমাদের নিমতলা ঘাটের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। সারা পৃথিবী থেকে সাহেব-মেম, নিগ্রো-জাপানি সবাই গাঁজা খেতে আসে মাঝরাত্তিরের নিমতলায়। তারা বড়লোকের জাত এক কলকে দুবার ব্যবহার করে না। এক রাতে একশোটা কলকে বিক্রি হলে পঞ্চাশ টাকা লাভ থাকে। তার ওপরে আছে বখশিশ, গাঁজার লাভের বখরা।'

আর কিছু জানার ছিল না সমীরণের। শ্মশানঘাট থেকে সে আশাহত হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু এই সূত্রেই সমীরণের মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এল। জগুবাবুর বাজারে তো তামাকের দোকান আছে ; সহজে নজরে আসে না কিন্তু মাংসপট্টির ঠিক পিছনে একটা ছোট দোকান বেশ কিছুকাল আগেও সমীরণ দেখেছে। এখনও হয়তো আছে। সেখানে হুঁকোর খোঁজ পাওয়া যাবে। না পাওয়া গেলে সোজা কাজ হবে দোকানের সামনে প্রতীক্ষা করা, যেই কেউ তামাক কিনতে আসবে, কিনে ফিরে যাওয়ার সময় তাকে অনুসরণ করলেই হুঁকোর কাছে পৌঁছে যাবে।

তবু চিন্তা হল সমীরণের। যদি সেই তামাকের দোকান উঠে গিয়ে থাকে।

পরের রবিবার সকালে দুরুদুরু হৃদয়ে জগুবাবুর বাজারের শেষ সারিতে মাংসের পট্টিতে গিয়ে পাঁচশো পাঁঠার মাংস কিনল সমীবণ। পাঁঠার মাংস কদাচিৎ খায় সমীরণ, বয়েস চল্লিশের দিকে এগোচ্ছে। সঙ্গে রক্তচাপ বাড়ছে, রক্তে শ্যাওলা বাড়ছে, মেদ বাড়ছে। ডাক্তার বলেছে লাল মাংস খাবেন না, শুয়োর বা গরু নয়, নিতান্ত পাঁঠা-খাসির মাংস খায় সমীরণ কিন্তু ডাক্তারের বক্তব্য হল সেটাও লালমাংস, শরীরে মেদ ও রক্তে শ্যাওলা বাড়ায়।

তবু আজ মরিয়া হয়েই সমীরণ মাংসের দোকানে এল, আসল কারণ হল সেই হুঁকো।

মাংসের দোকানের এক পাশ দিয়ে সরু গলিব শেষ প্রান্তে উঁকি দিয়ে সমীরণ যুগপৎ পুলকিত ও আশ্বস্ত হল। দোকানটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বহুকালের পুরনো মলিন, ভাঙা সাইনবোর্ড একটু ঝাপসা, ঝুরঝুরে হযে গেছে, কিন্তু পড়া যাচ্ছে :

খাঁটি তামাকের দোকান
প্রোঃ বিপুলবিহারী পাল
মিহিমোটা, তাম্বুরী দাকাটা
রংপুর, দিনাজপুর, দিনহাটা
সকল প্রকার খাঁটি সুপেয় তামাকুর
একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

সাইনবোর্ডের দুপাশে তামাকপাতার ছবি। সে ছবির সবুজতা এতকাল পরে বিবর্ণ কিন্তু চেষ্টা করলে, বুদ্ধি করে তাকিয়ে দেখলে ভাঙা ফ্রেম, মরচে ধরা সাইনবোর্ডের মধ্যে বাঁয়ে ডাইনে দুদিকে দুপাশে দুটো তামাকপাতা অনুমান করা যাচ্ছে।

তার চেয়েও সুখবর হল এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছে ঐ সাইনবোর্ডের অন্তর্গত দোকানটিও খোলা রয়েছে।

কিন্তু আরেকবার স্বপ্নভঙ্গ হল সমীরণের।

মাংস কেনা হয়ে যাওয়া মাত্র সে দ্রুতপদে হেঁটে 'খাঁটি তামাকের দোকানের' সামনে গেলো, তারপর একটা সংক্ষিপ্ত চালাকি করল, সেই দোকানের অতিবৃদ্ধ দোকানীকে সম্বোধন করে বলল, 'দাদু একশো গ্রাম দাকাটা তামাক দিন।'

দোকানদারের পাশে বসে এক যুবক তখন সত্যিই দা দিয়ে তামাকপাতা কাঠের ওপরে

ফেলে কুচিকুচি করে কাটছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন বৃদ্ধ, এই বয়েসেও তাঁর কান মানে শ্রুতিশক্তি খুব খরখরে। তিনি সমীরণকে বললেন, 'কি বললেন, দাকাটা তামাক?'

সমীরণ বললেন, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ দোকানদার বললেন, 'দাকাটা তামাক কেন, আজ পনেরো বছর, শ্যামচাঁদ ব্যানার্জি লেনের গুরুপদ ডাক্তার মরে যাওয়ার পরে আমরা কোনও তামাকই বেচিনি, বেচতে পারিনি। ওই গুরুপদ ডাক্তারই ছিল আমাদের শেষ খদ্দের।'

বিভ্রান্ত সমীরণ জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে এগুলো কি? এই যে দা দিয়ে কুচিকুচি করে কাটছে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'এগুলো হল খৈনি।'

সমীরণ বলল, 'এগুলো হুঁকো দিয়ে খায় না?'

মলিন হাসি হেসে বৃদ্ধ দোকানদার বললেন, 'কতদিন পরে হুঁকো কথাটা শুনলুম। হুঁকো কোথায়? খৈনি খেতে হুঁকো লাগে না। স্রেফ চুন দিয়ে ডলে ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে ঢেলে দিলেই হল।'

অতঃপর সমীরণ বাড়ি ফিরল।

কিন্তু সে এখনও হাল ছাড়েনি।

সেদিন মধ্যাহ্নে অসম্পূর্ণ দিবানিদ্রা সেরে সে হুঁকোর কথা ভাবতে বসল। কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর তার মনে পড়ল সোনাকাকার কথা।

সোনাকাকা সমীরণের বাবার সেজভাই। ঠাকুরদার মৃত্যুর সময় তিনি দেশেই ছিলেন। ফলে ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে দেশের শূন্য বাড়ির যা কিছু জিনিসপত্র সোনাকাকাই সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং সবই নিজে রেখে দেন, অন্য ভাইদের কোনও ভাগ দেননি। এ নিয়ে সমীরণের বাবা বেঁচে থাকতে সমীরণের বাবা এবং অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে সোনাকাকার বেশ বাদবিসম্বাদ হয়েছে।

সমীরণেরও একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ঠাকুরদার একটা সোনার পার্কার কলম ছিল। ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে সমীরণকে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পরে এই কলমটা তুই পাবি। তোকে দিয়ে যাব।'

অবশ্য সেই কলমটাও সোনাকাকা সমীরণকে দেননি। নানা ভাবে কৌশল করে এড়িয়ে গেছেন। এক সময়ে সেই কলম পাওয়ার জন্যে অনেক হাঁটাহাঁটি করেছে সে। তখন সমীরণ সোনাকাকার বাসায় গেলেই ও বাসার সবাই ভাবতো সমীরণ কলম চাইতে এসেছে, এমনকি বিজয়া বা নববর্ষের পরে হলেও, ফলে অভ্যর্থনা তেমন মধুর হতো না।

আজ প্রায় দশ-পনেরো বছর সমীরণ সোনাকাকার বাসায় যায় না। কিন্তু এবার কলমের জন্যে নয়, সে ভাবলো ঠাকুরদার হুঁকো-গড়গড়া হয়তো সোনাকাকার কাছে থাকতে পারে।

অনেক দোনামনা করে অবশেষে সাহসভরে সমীরণ একদিন অফিস ফেরতা সোনাকাকার ওখানে চলে গেলো। সোনাকাকা এখন অনেক নরম হয়েছেন, বুড়ো হয়েছেন। বিগতদার, দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে, একই ছেলে, সেও প্রবাসী, আমেরিকায় লস এঞ্জেলসে থাকে। দু-চার বছরে একবার বাড়ি আসে। শূন্যগৃহে সোনাকাকা একা।

একথা ওকথার পর গড়গড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সোনাকাকা বললে, 'গড়গড়ার কথা আর বোলো না। সেটা নিয়ে অমু যা বিপদে পড়েছিলো।' অমু মানে অমরজ্যোতি, সোনাকাকার ছেলে।

জানা গেলো, অমু সেই গড়গড়াটা আগেরবার আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছিলো, সে দেশে এসব ধরনের জিনিসের খুব কদর।

কিন্তু যাওয়ার পথে ঐ গড়গড়া নিয়ে দুবার বিপদে পড়ে। প্রথমত নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে শুল্ক অফিসারেরা গড়গড়াটাকে মোগল শিল্পের প্রাচীন নমুনা বলে আটকিয়ে দেয়। বহু ধরাধরি করে এবং সেই সঙ্গে গোপনে এক শিশি কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত বিলিতি অডিকলন উপহার দিয়ে সেটা উদ্ধার করে।

কিন্তু লস এঞ্জেলসে সেটা সম্ভব হয়নি। সেখানে দুই কৃষ্ণাঙ্গ একং শ্বেতাঙ্গিনী অফিসারের সেটা নজরে পড়ে। তারা সেটাকে ছাড়েনি। মারাত্মক কিছু ভেবে তারা অমরজ্যোতিকে রসিদ দিয়ে গড়গড়াটাকে নাসায় পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে, আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

নিরাশ হয়ে সমীরণ উঠছিলো, তখন সোনাকাকা দেরাজ খুলে একটু হাতড়িয়ে ঠাকুর্দার সোনার পার্কার কলমটা বার করে সমীরণকে দিয়ে বললেন, 'কলমটা হারিয়ে গিয়েছিলো, হঠাৎ সেদিনই খুঁজে পেয়েছি। এটা তুই রাখ। বাবার জিনিস যত্ন করে রাখিস। আর মাঝেমধ্যে আসিস, বুড়ো কাকা একা থাকি। কেটু খোঁজখবর তো নিতে হয়!'

এরপর প্রায় আর কিছুই করার ছিলো না। তবু উদ্যোগী সমীরণ দুটো কাজ করলো।

সে শুনেছিলো পুরনো বাংলা সিনেমায় অনেক হুঁকো খাওয়ার দৃশ্য আছে। নন্দনে সপ্তাহব্যাপী প্রাচীন বাংলা ছায়াছবির উৎসব দেখলো। তিন সোতে একুশটা টিকিট কেটে স্ত্রী-পুত্রকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পরপর সাতদিন পুরনো ছবি দেখে সপরিবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো সমীরণ। কিন্তু কোনো ছবিতে একটাও হুঁকো সেবনের দৃশ্য দেখা গেলো না।

এরপরে যাত্রা। কে যেন বললো, যাত্রায় নাকি পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বামিত্র, নারদ ইত্যাদি মুনিঋষিরা ঘটনার পুরাণত্ব বোঝানোর জন্যে হুঁকো হাতে স্টেজে আসেন।

পৌরাণিক যাত্রা এ বছর খুব কম হচ্ছে। তবু সমীরণ অনেক খোঁজখবর নিয়ে মেমারিতে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে পাশের গ্রামের মণ্ডপে 'জায়া নই, কন্যা নই, মাতা নই, আমি দ্রৌপদী', এই রকম রোমাঞ্চকর নামের পৌরাণিক পালা দেখে এলো। কিন্তু সেখানেও হুঁকোর দেখা মিললো না।

[শেষ] শ্রীধর চৌধুরী

অবশেষে উদ্ধার করলেন শ্রীধর চৌধুরী।

শ্রীধর চৌধুরী অতিশয় পাকা লোক। তেল চুকচুকে পাকানো বাঁশের মত চেহারা, কলপ দেওয়া কালো চুল। পায়ে নাগরা জুতো এখনও সময় সময় গলায় উড়ুনি জড়ান।

শ্রীধর চৌধুরীর বয়েস কত কেউ জানে না। অফিসও না। সাতচল্লিশ সালে পার্টিশানের পর অপশন দিয়ে সমীরণদের অফিসে আসেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থেকে। সেও চার

দশক হয়ে গেল। হিসেবমত অনেক আগেই রিটায়ার করা উচিত ছিল। তাঁর সার্ভিসবুক হারিয়ে গেছে, নাকি সেই পাকিস্তান থেকে আসেইনি। কিছু প্রশ্ন করলে শ্রীধরবাবু বলেন, 'রিটায়ার করতে এখন পাঁচ বছর বাকি আছে। এই দ্যাখো মানিকগঞ্জের তারক পণ্ডিতের নিজের হাতে করা ঠিকুজি।'

কেউ যদি বলে, 'কিন্তু এ হিসেবে আপনি যখন চাকরিতে ঢোকেন তখন আপনার বয়েস ছিলো বড় জোর পাঁচ কি ছয়। সেটা কি ব্যাপার?'

গম্ভীর হয়ে শ্রীধর চৌধুরী বলেন, 'তখনকার মানিকগঞ্জে ওরকম হত।'

সে সব যা হোক শ্রীধরবাবু ত্রিকালজ্ঞ মানুষ। অনেক কিছু জানেন, বোঝেন, খবর রাখেন। নানা রকমের ভালো ভালো দোষ আছে। এটা সেটা পান-ভোজন, এই বয়েসেও এদিকে ওদিকে যাতায়াত, এই সব আর কি!

সমীরণ হুঁকোর প্রসঙ্গ অনায়াসেই সর্বপ্রথমে শ্রীধরবাবুর কাছেই তুলতে পারত কিন্তু এটা তার খেয়াল হয়নি।

একই অফিসে পাশের সেকশনে কাজ করেন শ্রীধর চৌধুরী। বয়েসের তফাত থাকলেও শ্রীধরের সঙ্গে অফিসের প্রায় সকলেরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কাজটাজ বিশেষ কিছু করেন না, প্রায় সারাদিনই আড্ডা দিয়ে, গালগল্প করে কাটিয়ে দেন। সেদিন টিফিনের সময়ে ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছিল সমীরণ। পাশের টেবিলে শ্রীধরবাবু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সব সময় রসের গল্প তাঁর মুখে।

হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে 'তামাক' শব্দটা কানে আসতে সমীরণ একটু সতর্কভাবে শোনার চেষ্টা করল শ্রীধরবাবু কি বলছেন; 'ধোঁয়া', 'নেশা' এসব শব্দও কানে গেলো।

ক্যান্টিনের জটলা ভাঙতে শ্রীধরবাবুকে একটু আলাদা করে সমীরণ জিজ্ঞাসা করলে, 'শ্রীধরদা টিফিনের সময় তামাক, ধোঁয়া এসবের কথা কি বলছিলেন। হুঁকোর ব্যাপার নাকি?'

শ্রীধর বললেন, 'হুঁকো? হুঁকো শুনলে কেমন হাসি পায়। আমরা দেশে বলতাম হুক্কা, এটাই আসল আরবি শব্দ।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'সাধারণ হুক্কা নয়। আমি বলছিলাম পঞ্চমুখী হুক্কার কথা, ঐ যাকে বলে পাঁচরঙ। পাঁচ মুখে পাঁচটা কলকে, এক সঙ্গে তামাক, গাঁজা, ভাং, হাসিস, চরস। এক টানেই মাথা সাফ।'

এতদিন হাজার চেষ্টা করেও একটা একমুখো হুঁকোর দেখা পায়নি সমীরণ আর এখন শুনছে পাঁচমুখো হুঁকোর কথা।

'কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে এই দুর্লভ বস্তুটিকে?' শ্রীধরবাবুর কাছে সমীরণ জানতে চাইল।

শ্রীধর বললেন, 'এখন আর ও জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে? ওসব সাবেকি দিনের জিনিস, সে কি আজকের কথা। পঞ্চরঙ খেতেন মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎ চাটুজ্যে। কতকাল হয়ে গেল।'

আবার সমীরণের নিরাশ হওয়ার পালা। তবু সে দায়ের খাতিরে জিজ্ঞাসা করল, 'হুঁকোও কি কেউ খায় না আজকাল?'

শ্রীধর বললেন, 'খাবে না। আমাদের হরিই হুক্কা ছাড়া কিছু খায় না।'

উত্তেজিত সমীরণ জিজ্ঞাসা করলো, 'হরি? হরি কে? কোথায় থাকে?'

শ্রীধর বললেন, 'হরি আমার পুরনো বন্ধু, ওলড চাম, মানিকগঞ্জ থেকে দুজনে একসঙ্গে এই শহরে আসি। এই তো কাছেই বৌবাজারে থাকে।'

সমীরণ বলল, 'আচ্ছা শ্রীধরদা একদিন আপনার ঐ বন্ধুর ওখানে গিয়ে হুঁকো খাওয়া দেখতে পারি।'

শ্রীধর বললেন, 'হুঁকো খাওয়া আবার দেখার কি আছে? তবে যেতে চাও চল। কবে যাবে?'

মিড়নের কথা স্মরণ করে সমীরণ বলল, 'আমার সঙ্গে কিন্তু একজন থাকবে।'

শ্রীধর বললেন, 'তাতেও আপত্তির কিছু নেই। এসব ক্ষেত্রে লোকে দল বেঁধেই আসে।'

শ্রীধরের কথায় একটু হেঁয়ালি লাগলেও তখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা করে ফেলল সমীরণ। সামনের শনিবার সেকেন্ড স্যাটারডে, অফিস ছুটি। সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে বৌবাজারের মোড়ে বহুদিনই বন্ধ হয়ে থাকা সিনেমাহলের গেটের সামনে সমীরণের জন্য শ্রীধরবাবু প্রতীক্ষা করবেন।

রাস্তায় রাস্তায় সাংঘাতিক যানজট। তবু একটা মিনিবাসে করে ছয়টা বাজার কয়েক মিনিটের মধ্যে মিড়নকে নিয়ে সমীরণ এসে দেখল শ্রীধরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীধরবাবু সমীরণের সঙ্গে মিড়নকে দেখে একটু যেন বিব্রত হলেন। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন সমীরণের সমবযসী কোন বন্ধু আসবে।

সমীরণ মিড়নকে দেখিযে শ্রীধরবাবুকে বলল, 'আমার ছেলে।'

শ্রীধর বললেন, 'বাবাজীবনকে সঙ্গে এনেছো তা কি আব করা যাবে, চল।'

কোথায় যাচ্ছে তারা? শ্রীধরবাবুর বাক্যভঙ্গি কেমন গোলমেলে মনে হল সমীরণের। তা হোক, এসে যখন গেছে হুঁকোটা মিড়নকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মিড়নও বাবার হাত ধরে শ্রীধরবাবুর সঙ্গে সামনের একটা গলির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সমীরণকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, সত্যি সত্যি হুঁকো দেখতে পাওয়া যাবে?'

সমীরণের আগেই শ্রীধর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখতে পাবে। আর একটু এসো।'

কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকে সমীরণের কেমন খটকা লাগল। এটা কেমনতর জায়গা। দরজায় দরজায়, সিঁড়িতে রাস্তায় মেয়েরা মুখে রং মেখে হল্লা করছে, সিগারেট ফুঁকছে। এটা তো খারাপ পাড়া মনে হচ্ছে! এ কোথায় এল সে ছেলেকে নিয়ে! রাস্তায় দাঁড়ানো রমণীদের মধ্যেও কেউ কেউ মিড়নকে দেখে অবাক হচ্ছে, এইটুকু ছেলেকে নিয়ে কেউ তো এসব জায়গায় আসে না।

বাধ্য হয়ে থমকে গিয়ে সমীরণ শ্রীধরকে বলল, 'শ্রীধরদা এ কোথায় যাচ্ছি আমবা?'

অদমিত শ্রীধর বললেন, 'অস্বস্তি হলে চোখ বুজে চলে এসো। ঐ তো মোড়ের বাড়ির দোতলায় হরিমতী থাকে।'

অবাক হয়ে সমীরণ বলল, 'হরিমতী?'

শ্রীধর বললেন, 'কাল হরির কথা বলেছি না, সেই হরি, হরিমতী, আমার ওল্ড চাম। হরিই তো হুক্কা খায়।' তারপর একটু থেমে সামনের দোতলায় জানলার দিকে আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দ্যাখো দোতলার জানলা দিয়ে তামাকের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তামাক তো আজকাল সব জায়গায় পাওয়া যায় না, এই তামাক আমিই সপ্তাহে একদিন বরানগর বাজার থেকে এনে ওকে দিই।'

দোতলার জানলায় সত্যিই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তামাকের গন্ধও একটু নাকে আসছে। সেই ধূমায়িত জানলার দিকে লক্ষ রেখে দরজায় দাঁড়ানো বিস্মিত কুলটাকুলের পাশ কাটিয়ে শ্রীধরের পিছু পিছু নয় বছরের ছেলের হাত ধরে জীবনে এই প্রথমবার নিষিদ্ধপল্লীর কোনও গৃহে প্রবেশ করল সমীরণ।

'ফুঃ'

'ফুঃ।'

ঘরের মধ্যে সোফায় বসে একবার 'ফুঃ' করেছিলেন অমরজিৎ। তারপর চুপচাপ গম্ভীর মুখে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সাদা মারুতি গাড়িটার পেছনের সিটে বসে আবার আরেকবার 'ফুঃ' করলেন অমরজিৎ চক্রবর্তী।

পাশাপাশি শুকনো মুখে হেঁটে আসছিলেন মিলনবাবু, মিলনলাল সেনগুপ্ত। তাঁর দালালগিরি সুদীঘ জীবনে তিনি আর কখনও এতটা অসফল, এতটা হতাশ হননি। ব্যাপারটা কি যে হল, পরপর পাঁচবার 'ফুঃ', এরকম তো হওয়ার কথা নয়—কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না মিলনবাবুর।

ঘটনাটা বোধহয় আর বেশিক্ষণ হেঁয়ালির কুয়াশায় ঢেকে রাখা উচিত হবে না। এরপরে পাঠিকাসুন্দরী হয়তো নিজেই ঠোঁট উল্টিয়ে 'ফুঃ' বলে গল্পটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

সুতরাং।

সুতরাং গল্পটা বরং সংক্ষেপে আদ্যপান্ত বলি। এবং একমাত্র বলি যে গল্পটা ঠিক গল্প নয়, একেবারে সাহেবরা যাকে বলে জীবন থেকে নেওয়া, ঠিক তাই। সুতরাং এই গল্পে যদি চরিত্রাবলীর নামধাম ঠিকানা ঘটনা কোনও কারণে মিলে যায় তার জানা সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই গল্পকারের এবং তার অক্ষম কল্পনাশক্তির।

বিধান সরণিতে অর্থাৎ পুরনো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে খুব নাম করা গয়নার দোকান চক্রবর্তী অ্যান্ড কোম্পানি, গোল্ড মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রমরমা চলছে এই দোকান, বাঙালীর যে কোনও ব্যবসার পক্ষেই সেটা গৌরবজনক। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছেন মূল প্রতিষ্ঠান স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরজিৎ চক্রবর্তী।

চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণের পক্ষে সোনার গয়নার ব্যবসা, স্যাকরার পেশা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল একটি সামান্য এবং পুরনো কারণে।

বৈকুণ্ঠনাথের পিতৃনিবাস ছিল উত্তরবঙ্গের কোনও এক জেলায়। চল্লিশ বছর বয়েসে পিতৃহীন হয়ে একটা সাবেকি বড় সংসারের পুরো দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তখনও তাঁর কনিষ্ঠতমা বোনের বিয়ে হয়নি। গৃহে নগদ অর্থ বিশেষ ছিল না কিন্তু স্থায়ী ধন ছিল মা ঠাকুমার স্বর্ণালঙ্কার। কালাশৌচের বছর পার হতেই বোনের বিয়ে স্থির করে ফেললেন

বৈকুণ্ঠনাথ। বোনের বিয়ের আগে নতুন গয়না করতে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে কিছু পুরনো ভারি অলঙ্কার নিয়ে বৈকুণ্ঠনাথ কলকাতায় আসেন। বড়বাজারে, বৌবাজারে দু-চারটি গয়নার দোকানে ঘোরাঘুরি করার পর তরুণ বৈকুণ্ঠনাথ একটি তত্ত্বে অবহিত হন যে পুরোনো গয়না ভেঙে নতুন গয়না করাতে গেলে পানমরা নামক একটি পদার্থ যায়। পুরনো গয়না বিক্রি করতে গেলেও ঠিক তাই। দশ ভরি ওজনের পুরোন সোনার গয়নার বদলে বড়ো জোর সাড়ে আট, নয় ভরি নতুন সোনার গয়না পাওয়া যাবে, বেচতে গেলে অনেক সময় তার চেয়েও কম।

বৈকুণ্ঠনাথের উপায় ছিল না, তিনি বাধ্য হয়ে পানমরা বাদ দিয়ে কিছু পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না বানিয়ে এবং কিছু সোনা পানমরা বাদ দিয়ে বেচে অর্থসংগ্রহ করে বিয়ের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরলেন।

কিন্তু এই পানমরা ব্যাপারটা তাঁর মাথার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল। নতুন গয়নায় পানমরা থাকে না অথচ সে গয়না পুরনো হলেই সেটার মধ্যে পানমরা প্রবেশ করে এবং সোনা কেনাবেচা করতে গেলে বা সোনার গয়না বানাতে গেলে অতি ধুরন্ধর এবং বিচক্ষণ ক্রেতাকেও যে পানমরা ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়—এই ঘটনার তাৎপর্য বৈকুণ্ঠনাথের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

সে যাহোক বোনের বিয়ে ভালোভাবে মিটে গেল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। একদিন কলকাতায়ও বোমা পড়ল, কলকাতা থেকে দলে দলে লোক পালাতে লাগল, লোক পালানোর রীতিমত হিড়িক পড়ে গেল। দোকানে দোকানে তালা ঝুলল, অবিশ্বাস্য সব কম দামে চালু ব্যবসা বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। কলকাতায় বাড়ির দাম হু হু করে পড়ে যেতে লাগল, হাজার হাজার শূন্য বাড়ির দরজায় লাগানো হলো 'টু-লেট' বিজ্ঞাপন, মানে ভাড়া দেওয়া হবে।

এই সময়েই অমন সাহসী বৈকুণ্ঠনাথ গ্রামের জমিজমা সব বেচে দিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে একটি জুয়েলারি দোকান এবং হাতিবাগানে একটা দোতলা বাড়ি কিনে কলকাতায় উঠে এলেন। কয়েকদিন আগেই কলকাতায় বোমা পড়েছে এই সময় গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসায়, যখন সবাই গ্রামে পালাচ্ছে, অনেকে বৈকুণ্ঠনাথকে উন্মাদ ভেবেছিলেন কিন্তু তা না হলে তো তিনি খাস কলকাতায় সাড়ে এগারো হাজার টাকায় দোতলা বাড়ি আর দু-হাজার টাকায় আসবাব সমেত দোকান কোনওদিনই পেতেন না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা এসব। গত অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে চক্রবর্তীদের সোনার দোকান রমরমা চলেছে। বৈকুণ্ঠনাথও বহুদিন বিগত হয়েছেন।

আমাদের এই গল্প বৈকুণ্ঠবাবুর নাতি অমরজিৎকে নিয়ে। অমরজিৎ বছর খানেক আগে পিতৃহীন হয়েছে, সেই এখন দোকান ব্যবসার মালিক। তাঁর পিতামহ তাঁর বাবাকে একুশ বছর বয়েসে এবং তাঁকে বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন অমরজিতের বয়েস পঁয়ত্রিশ, তাঁর স্ত্রী শ্যামলীর বয়েস অমরজিতের ধারণা তাঁর থেকে কিছু বেশিই হবে অন্তত ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ তো হবেই। তাঁদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তার মধ্যে প্রথম তিনটি মেয়ে এবং তারপরে যমজ ছেলে।

এই বয়েসেই শ্যামলী কেমন যেন মোটা, থপথপে হয়ে গিয়েছে, রাত দিন পান দোক্তা চিবোচ্ছে, টানা রিকশায় চড়ে ঘুরে ঘুরে বাংলা সিনেমা দেখছে, না হয় বাড়িতে বসে

টিভিতে বস্তাপচা সিরিয়ালে সময় নষ্ট করছে। লোডশেডিংয়ের সময় শ্যামলীর টিভি দেখতে যাতে বাধা না হয় সে জন্য অমরজিৎকে শক্তিশালী ইনভারটার কিনতে হয়েছে।

অমরজিৎ স্কটিশচার্চ কলেজ এবং যাদবপুরের ছাত্র। প্রজাপতির মত রঙিন ও সুন্দরী সহপাঠিনী ও বান্ধবীদের সঙ্গে তার প্রথম যৌবনের দিনগুলি কেটেছে। তারপর কলেজ ছাড়তে না ছাড়তে বিয়ে। শ্যামলী। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা খারাপ লাগেনি। বরং একটু মাদকতাই ছিল তার মধ্যে। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামলী তখন সেও দেখতে ভালই ছিল, সেই যে মাইকেল লিখেছিলেন না, 'যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা', অনেকটা প্রায় সেইরকম। শ্যামলীর তখন গায়ের কালো রঙের একটু লালিত্য ছিল, মুখে চোখে তারুণ্যের আহ্লাদ ছিল।

এখনকার শ্যামলীকে দেখলে সেই শ্যামলীর কথা মনে পড়া সম্ভব নয়। স্থূলাঙ্গিনী, কৃষ্ণকায়, মাংসল মুখের মধ্যে থ্যাতা নাক, কুঁতকুঁতে চোখ।

অথচ এখনও রাস্তাঘাটে অমরজিতের যখন পুরনো বান্ধবী বা সহপাঠিনীদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, এরা তখনও কেমন তরল, চঞ্চল, ফুটফুটে রয়েছে। তা ছাড়া অমরজিতের বন্ধুদের অনেকের এখনও বিয়ে হচ্ছে, সে সব বিয়েতে তাঁকে বরযাত্রীও যেতে হচ্ছে। সে সব বিবাহবাসরে গিয়ে সুসজ্জিতা নববধূ এবং তাদের সঙ্গিনীদের দেখে অমরজিৎ বিহ্বলবোধ করেন। নিজের ওপর রাগ হয়, কেন মরতে একুশ বছর বয়েসে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম। তার ওপরে ঐ কালো ধুমসিকে। পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথের ওপর তার আরও রাগ হয়, নাতবৌয়ের মুখ দেখার জন্যে বুড়ো তাকে ডুবিয়ে গেছে, বুড়ো তো মাত্র তিন মাস শ্যামলীর মুখ দেখতে পেয়েছিল তারপরেই অক্কা পায় কিন্তু তাঁকে যে সারাজীবন ঐ মুখ দেখতে হচ্ছে। অবশেষে এখন অমরজিৎ ওড়া শুরু করেছেন। স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথের ওপর যতই রাগ হোক তাঁর, কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ প্রতিষ্ঠিত 'চক্রবর্তী অ্যান্ড কোম্পানি, গোল্ড মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স' পানমরার কল্যাণে তখনও রীতিমত বহাল তবিয়তে আছে। অর্থাভাব নেই অমরজিতের।

গয়নার দোকান যথারীতি চলতে লাগল সেইসঙ্গে উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

প্রথমে ঠিক করলেন সিনেমা কোম্পানি করবেন। বাজারে এখবর ছড়িয়ে পড়তে ঝাঁকে ঝাঁকে পরামর্শদাতা জুটে গেল। দুবার বম্বে এবং একবার মাদ্রাজ গেলেন অমরজিৎ। কিন্তু দশ-বিশ লাখ টাকা পুঁজির বাঙালী প্রযোজকের কোনও সুবিধা হল না। সেখানকার তরলা যৌবনবতীরা এক ঝলকের জন্যেও অমরজিতের সঙ্গে দেখা করলেন না। মধ্যে থেকে দালালে টাউটে হাজার পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেল। পঞ্চাশ, একশো কোটি অন্তত মেরে কেটে দশ বিশ কোটি টাকা না হলে বম্বেতে পাত্তা পাওয়া অসম্ভব।

কলকাতায় ফিরে এসে এক অত্যাধুনিক প্রগতিশীল পরিচালকের পাল্লায় পড়ল অমরজিৎ। সে ছোকরা বছর সাতেক ধরে এম. এ পড়ার পরে কফিহাউস, কলেজ স্ট্রিটে প্রচুর ধোঁয়া উড়িয়ে গলা উঁচু খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে সুকান্তের আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি শুরু করে, সেখান থেকে ঐ যাকে বলে গ্রুপ থিয়েটার পরিচালনা ও অভিনয়, 'রাবণরাজারা তিন ভাই' নাটকের বিখ্যাত বিভীষণ চরিত্রে, তারপর দেশাত্মবোধক টেলিফিল্ম 'হাতে হাত মেলাও' অবশেষে সিনেমায় এসেছে। কলকাতার

রাস্তার কুকুরদের নিয়ে তার পনের মিনিটের তথ্যচিত্র কামস্কাটকা ফিল্ম উৎসবে অল্পের জন্য তাম্রগাভী পায়নি।

ছোকরার আগে কি নাম ছিল বলা কঠিন তবে এখন নাম বহ্নিবলয় চৌধুরী। সে এবার কলকাতার তিনশ বছর উপলক্ষে জব চার্ণকের যৌবন ও বাল্যকালের ওপর একটা চিত্রনাট্য লিখেছে।

বহ্নিবলয় তালেবর যুবক, অমরজিৎ কি চায় সে বুঝতে পেরেছিল। চার্ণকের বাল্য ও যৌবনকাল কেটেছে বিলেতে, সুতরাং শ্বেতাঙ্গিনী অন্তত অ্যাংলো প্রয়োজন নায়িকা ও অন্যান্য মহিলা চরিত্রে। মাসখানেক বহ্নিবলয় ও অমরজিৎ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে খালি কুঠি আব পার্ক স্ট্রিটে বারে হোটেলে ঘুরে শ্বেতাঙ্গিনী নায়িকার অনুসন্ধান কবে বেড়াল।

এই সময়েই ডাকাবুকো মেয়ে (কলগার্ল) পামেলা বর্দের খ্যাতি চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পার্ক স্ট্রিটেব ফুটপাথ থেকে কেনা বিলিতি কেচ্ছা পত্রিকায় পামেলার নানা মনোহারিণী ভঙ্গিমার ছবি দেখছিল একদিন অমরজিৎ। তখন বহ্নিবলয় তাকে পরামর্শ দেয়, 'চলুন লন্ডনে গিয়ে পামেলাকে জোব চার্ণকের যৌবনের প্রথম সঙ্গিনীর পার্টে আমাদের বইয়ের নাযিকাব ভূমিকায় প্রপোজাল দিই। যদি রাজি হয় সারা পৃথিবীতে হই-চই পড়ে যাবে।'

মাস দেড়েক বাদে পাসপোর্ট ইত্যাদিব ঝামেলা মিটিয়ে অমরজিৎ ও বহ্নিবলয় যখন লন্ডনে পৌঁছাল তখন পামেলা মেমসাহেব নাগালের বাইরে, তিনি তখন আজ এখানে কাল সেখানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু লন্ডনে নিশ্চয় কোনও গর্হিত, অতি গর্হিত করেছিল বহ্নিবলয়। কারণ হঠাৎ একদিন দুম করে গজভুক্ত কপিত্থবৎ বহ্নিবলয়কে ফেলে অমরজিৎ কলকাতায় ফিরে আসেন। বহ্নিবলযের এরপরে আর কোনো খবব পাওয়া যায়নি, শোনা গেছে সোহো অঞ্চলে সে একটি নাইট ক্লাবে গেলাস ধোয়ার কাজ করছে।

এদিকে কলকাতায় ফিরে অমরজিৎ স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে শোয়া বন্ধ করে দেন এবং কেউ কেউ বলে গোপনে এইডস রোগেব কারণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা বিষয়ে যথাসাধ্য খোঁজখবর করেন।

যতদূর মনে হয় অমরজিতের আশঙ্কাটা অমূলক ছিল। কঠিন এখন আবার তিনি পুরোপুরি উড়তে শুরু করেছেন এবং শ্যামলীর শয়নকক্ষে আর ফিরে যাননি। এবার তার বাহন জুটেছে মিলনলাল সেনগুপ্ত। মিলনলাল যাত্রার লোক। সে অমরজিৎকে বার্তা পাঠিয়েছে যাত্রাপার্টি খুলুন, এ হল যাত্রার যুগ, যাত্রার মরসুমে গ্রামগঞ্জের বাতাসে লাখ লাখ টাকা হাওয়ায় ওড়ে। ঠিক মত পালা আর খলবলে নায়িকা থাকলেই যাত্রার রমরমা।

কথাটা অমরজিৎ খেয়েছে। আগামী মরসুম থেকেই তার যাত্রাপার্টি চালু হবে। সে সাবেকি কায়দায় তাব যাত্রাদলের নাম রাখতে চেয়েছিল চক্রবর্তী কোম্পানি কিন্তু মিলনলাল বলেছে, 'আজকাল ও সব চলবে না। লাগসই আধুনিক নাম চাই।' অবশেষে অমরজিতের ভাবী যাত্রাদলের নাম হয়েছে 'সখাসখী অপেরা'।

সখাসখী অপেরার নামকরণ হওয়ার পর আজ মিলনলাল অমরজিতকে নিয়ে বেরিয়েছে হিরোইন নির্বাচন করতে। যাত্রার মরসুম এখনো বেশ দূরে, ধীরে সুস্থে হিরোইন নির্বাচন করলেই চলত। কিন্তু অমরজিৎ উতলা হয়ে পড়েছে অবিলম্বে হিরোইন

সংগ্রহ করার জন্য।

কারণটা অবশ্য একটু অন্যরকম। গতকালই শ্যামলীর সঙ্গে তাঁর একহাত হয়েছে। শ্যামলী তাকে ধরেছিল, তুমি আলাদা থাক কেন? বম্বে-মাদ্রাজে কি করেছিলে? ইত্যাদি বহুবিধ মর্মভেদী প্রশ্ন, সেই সঙ্গে 'লম্পট', 'হিজরে' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগে তাঁকে জর্জরিত করেছিল শ্যামলী, কুৎসিত, মোটা, কালো, কোলা ব্যাঙের মত থপথপে, মরা কাতলা মাছের মত ঠাণ্ডা শ্যামলী।

নিতান্ত প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে আজ এই সাতসকালে মিলনলালকে সঙ্গে নিয়ে নায়িকা পছন্দ করতে বেরিয়েছেন অমরজিৎ। মিলনলাল সকাল-সকালেই এসে গেছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমরজিতের সাদা বিরাট গাড়িটায় বসে মিলনলাল প্রথমেই বলল, 'স্যার, তাহলে প্রথম হেমামালিনীর কাছেই যাই।'

হেমামালিনীর নাম শুনে চমকিয়ে উঠলেন অমরজিৎ, বম্বেতে পঞ্চাশ হাজার টাকা গচ্চা যাওয়ার শোক এখনও তিনি ভুলতে পারেননি, ভাবলেন হেমামালিনী বোধহয় কলকাতায় এসেছে, মাঝে মাঝেই তো আসে, গ্র্যান্ডে বা এয়ারপোর্ট হোটেলে হয়ত উঠেছে। কিন্তু হেমা বাংলা যাত্রার হিরোইন হতে রাজি হবে কি, সময়ই বা পাবে কোথায়?

মিলনলাল বোঝালো, 'না, না। এ হেমামালিনী সে হেমামালিনী নয়। এ থাকে বরানগরে, আগের নাম ছিল বুঁচি পাল, ধর্মাধর্ম অপেরার ম্যানেজার গজানন মণ্ডল ও নাম চলবে না বলে হেমামালিনী করে দিয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি হেমাকে ধর্মাধর্ম অপেরা থেকে ভাঙিয়ে আনতে।'

বরানগবের গলিতে দোতলার ওপরে দু কামরার ফ্ল্যাট, বাইরের ঘরে বেতের সোফা সেট, খুব দামি নয় কিন্তু ভালই। হেমা খুব সপ্রতিভ মেয়ে, স্নান করতে গিয়েছিল, স্নান সেরে ভেজা এলোচুলে এসে নমস্কার করল, পাতলা, ছিপছিপে, শ্যামাঙ্গিনী তরুণী। সামান্য কথাবার্তার পর হেমা বলল তার একটু তাড়াতাড়ি আছে, পুরুলিয়ায় যাত্রা আছে রাতে, একটু পরেই বেরোতে হবে। মিলনলাল বলল, 'ঠিক আছে, পরে একদিন এসে কথা বলা যাবে।'

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমরজিৎ একবার 'ফুঁঃ' বললেন। তারপর আবার গাড়িতে বসে আরেকবার 'ফুঃ' বললেন।

'ফুঃ'! এই উক্তি অমরজিতের ওষ্ঠে শুনে মিলনলাল চিন্তিত হল, কি রে বাবা হেমাকে পর্যন্ত পছন্দ হল না। তারপর একটু ভেবে ঠিক করল যাত্রাজগতের মক্ষিরানী অনন্ত যৌবনা অমলাবালার কাছে নিয়ে যাই, অমলাবালাকে পছন্দ হতেই হবে। যাত্রার এক নম্বরী মহিলা যাকে বলে তাই।

অমলাবালা প্রায় মধ্য বয়সিনী, গৌরতনু, সুডৌল এক রমণী। তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন অমরজিৎ। কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ ও চা পান ইত্যাদিও হল। কিন্তু অমলাবালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের দরজার পাপোষে পা রেখেই অমরজিৎ আবার বললেন, 'ফুঃ'! গাড়িতে উঠে সিটে বসে যথারীতি আরেকবার 'ফুঃ।' রীতিমত চিন্তায় পড়ল মিলনলাল। হেমাকেও ফুঃ অমলাকে ফুঃ অমরজিতের রুচিটা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যা হোক একবার রেহানা বেগমের কাছে নিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করল মিলনলাল।

রেহানা বেগম যাকে বলে একেবারে আগুন। যেমন তার গায়ের রঙ, তেমনি গড়ন, যেমন তার চোখ, তেমন তার চাউনি, চলাফেরার কিন্তু ঐ রেহানা বেগমকে দেখে বেরিয়ে আবার অমরজিৎ 'ফুঃ' বললেন। ঘরের মধ্যে সোফায় বসেও একবার অস্ফুটে 'ফুঃ' বলেছিলেন, রেহানা যখন চা আনতে গেল তখন তাঁর পিছন দিকে তাকিয়ে। আবার এবার গাড়ির মধ্যে ফিরে এসে আরেকবার 'ফুঃ'।

রেহানার পর জবা, জবার পর মালতী। নায়িকা খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে গেল। কিন্তু সব জায়গাতেই ঐ 'ফুঃ'।

অবশেষে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত মিলনলাল সাহস করে অমরজিৎকে প্রশ্ন করল, 'সে কি স্যার এত ভাল ভাল রাজ্যের সব সেরা হিরোইন দেখালাম আপনার কাউকেই পছন্দ হল না?

অমরজিৎ বললেন, 'পছন্দ হবে না কেন? সবাইকে পছন্দ হয়েছে।'

মিলনলাল বলল, 'তা হলে?'

অমরজিৎ বললেন, 'তা হলে!'

মিলনলাল বলল, 'ঐ যে একেকজনকে দেখেই আপনি বললেন 'ফুঃ' আমি ভাবলাম বুঝি আপনার অপছন্দ হয়েছে।'

অমরজিৎ বললেন, 'ধুৎ, তুমি যেমন গাধা। আমি কি আর ওদের 'ফুঃ' বলেছি, আমি 'ফুঃ' বলেছি আমার বৌ শ্যামলীকে, কোথায় ওরা আর কোথায় শ্যামলী, তাই 'ফুঃ' বলেছি।

আশ্বস্ত হল মিলনলাল, বলল, 'তাহলে কাকে নেবেন।' অমরজিৎ বললেন, 'যে কয়জনকে পাওয়া যাবে সবাইকে নেব। সখাসখি অপেরা নয়, সখি অপেবা নাম হবে আমার কোম্পানির, নায়ক-টায়ক লাগবে না, সাতজন নায়িকা থাকবে।'

এই বলে আবার একটা বিশাল 'ফুঃ' করলেন অমরজিৎ, অবশ্যই সাতজন নায়িকা বনাম ধুমসী, থপথপে শ্যামলীর উদ্দেশে।

স্বর্গের গল্প

যাঁরা ভাবেন স্বর্গে শুধু পুণ্যবানেরা প্রবেশাধিকার পান, পাপীদের সেখানে কোনও স্থান নেই, তাঁরা স্বর্গ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না।

প্রত্যেক পাপীকে নরকে যাওয়ার আগে কম-বেশি কিছুদিন স্বর্গে থাকতে হয়, তা না হলে তারা কি করে বুঝবে স্বর্গে কি আরাম আর নরকে কি কষ্ট।

বলা বাহুল্য, পাপীদের পক্ষে এই স্বর্গদর্শন প্রায় কন্ডাক্টেড ট্যুরের মত, চট কবে স্বর্গটা দেখিয়ে তাদের নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শুধু তারতম্যটা বোঝানোর জন্যে, পাপের পরিণতি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে।

স্বর্গ বিষয়ে মানুষের অন্যান্য যা ধারণা, সে অবশ্য খুব অলীক নয়। বহু শত শতাব্দীর পুরনো ধারণা এটা, সেই যে-যুগে স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে একটু-আধটু যাতায়াত ছিল, সেই সময়কার ধারণা, তাই খুব ভুল নয়। একথা সত্যি যে স্বর্গের সীমানায় মলয় পবন ছাড়া আর কোনও বাতাস বয় না। নন্দন কাননের পারিজাত ফুল কোনওদিন মলিন হয় না, ঝরে পড়ে না। স্বর্গের অপ্সরীরা কখনও ক্লান্ত হয় না, তাদের বয়স বাড়ে না, তাদের

চঞ্চল চরণে নূপুরধ্বনি কখনও থেমে যায় না বা স্তিমিত হয় না। স্বর্গীয় দ্রাক্ষারসে যে আসব প্রস্তুত হয় তার মাদকতা স্কচ-হুইস্কির চেয়ে বহুগুণ বেশি, তার ফেনিল মধুরতার তুলনায় মরপৃথিবীর শ্যাম্পেনের স্বাদ নিতান্ত জোলো ও পানসে।

এসব তবু ঠিক আছে। অনেকেই এসব বিষয়ে অল্পবিস্তর জানেন।

কিন্তু স্বর্গের অন্য একটা ব্যাপার আছে যে সম্পর্কে পৃথিবীর লোকেরা কেউই বিশেষ কিছু জানে না। চিন্ময়বাবুও জানতেন না। চিন্ময়বাবু মানে বালিগঞ্জের চিন্ময় রায়। ব্যাপারটা হল স্বর্গের যানবাহন-সংক্রান্ত। পৃথিবীর মত স্বর্গে ট্রাম-বাস, ট্যাক্সি, রেল, পাতাল রেল, স্টিমার, ফেরিনৌকো, উড়োজাহাজ ইত্যাদি জনসাধারণের এক্তিয়ারভুক্ত কোন যান চলাচলের ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনও নেই।

তবে জগৎ-সংসারের পোড়খাওয়া, মারখাওয়া মানুষেরা যাই বলুন, ভগবান মোটেই অবিবেচক নন। তিনি স্বর্গে প্রত্যেকের জন্যে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবস্থা রেখেছেন। স্বর্গে পৌঁছানোমাত্র প্রত্যেককে যানবাহন বরাদ্দ করা হয়।

আমাদের চিন্ময়বাবু মোটামুটি সচ্চরিত্র লোক। স্বর্গে আসা তাঁর অবধারিত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরে তিনি স্বর্গের দরজায় পৌঁছে স্বর্গের দ্বাররক্ষীদের যে-সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন সেগুলি খুব রুচিসম্মত বা সম্মানজনক নয়।

ব্যাপারটা অনেকটা ইন্টারভিউয়ের মত। সুসজ্জিত দ্বাররক্ষীবৃন্দ, আসলে তাঁরাও বড় বড় দেবতা, মণিমুক্তাখচিত ঝলমলে পোশাক ও উষ্ণীষ তাঁদের, কোমরে সোনার খাপে রূপোর তলোয়াব, পায়ে জরির নাগরা, তাঁদের দেখলে মনে সম্ভ্রমবোধ জাগে।

স্বয়ং ভগবানও এঁদের সঙ্গে রয়েছেন। বলতে গেলে তিনিই ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান। তাঁর সাজপোশাক প্রায় একইরকম, তবে অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি মহার্ঘ।

অন্য কোনও বিষয়ে প্রশ্ন তুলে আলোচনায় না গিয়ে চিন্ময় রায়ের নামধাম ইত্যাদি প্রথমে চেক করা হল।

কলকাতার বালিগঞ্জের লোক। চিন্ময় রায় একটা বেসরকারি অফিসে বেশ ভাল চাকরি করতেন। তবে খাওয়া-দাওয়া, পান-ভোজনে সতর্ক ছিলেন না। কাল ছিল শনিবার, কাল রাতে গুরুভোজন করেছিলেন অখাদ্য-কুখাদ্য সব জিনিস, খাসির মাংসের বড়া, গোমাংসের কাবাব, শুয়োরের মাংসের সসেজ, সেই সঙ্গে অপরিমিত মদ্যপান—রাত দুটো হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর বাড়ি থেকে কোনওরকমে টলতে টলতে রাত আড়াইটে নাগাদ বাড়ি ফিরে ধড়াচূড়ো এমনকি পায়ের জুতো-মোজা সমেত গভীর নিদ্রামগ্ন স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়েন।

ঘুম ভাঙে সকাল সাড়ে চারটের সময়। গলগল করে ঘামছেন, বুকে অসহ্য ব্যথা। পাশে স্ত্রী সর্বজয়া তখন কি এক মধুর স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি। চিন্ময় সর্বজয়াকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'ওগো বুকে বড় ব্যথা।'

সুখস্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে বিরক্ত সর্বজয়া চিন্ময়ের হাত সজোরে সরিয়ে দিয়ে ধমকে উঠলেন, 'চোপ, মাতাল।'

সর্বজয়ার ধমকের প্রয়োজন ছিল না। ঠিক পনের মিনিট পরে পৌনে পাঁচটা নাগাদ

চিন্ময়বাবু চিরতরে সম্পূর্ণ চুপ করে গেলেন। ইহলোক পরিত্যাগ করলেন।

এখন সকাল দশটায় স্বর্গের অফিসঘর খোলার পর পরলোকে তাঁর ইন্টারভিউ হচ্ছে। আর বালিগঞ্জের বাড়িতে ভিড়েভরা আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তখনও সর্বজয়া ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছেন, 'ওগো, তুমি না একেবারে চুপ হয়ে গেলে গো।'

নামধাম ইত্যাদি ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক পর্যায় মিটে যাওয়ার পরে এবার আসল প্রশ্নের পালা।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেমন নানা বিষয়ে নানারকমের প্রশ্ন করা হয়, 'ভেনেজুয়েলা থেকে কুয়ালালামপুর কাছে না বাগদাদ থেকে রেঙ্গুন কাছে?' 'রেঙ্গুনের নতুন নাম কি, ভেনেজুয়েলার পুরনো নাম কি?' 'মাছির কটা চোখ, আরশোলার বা মাকড়সার কটা পা?' 'সত্যিই কি পা না হাত?'

এরকম ইয়ার্কি, এজাতীয় প্রশ্ন স্বর্গে করা হয় না। রীতি নেই।

চিন্ময়বাবু একদা একটা সরকারি চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। অনেকদূর উতরে যাওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় আটকে যান, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'হিজলপুকুর পল্লীসমবায় উন্নয়ন সমিতির পরিচালকের নাম কি?'

হিজলপুকুর পল্লীসমবায় উন্নয়ন সমিতির সেই পরিচালক ছিলেন প্রশ্নকর্তার শ্বশুর এবং তৎকালীন সমবায়-সচিবের ভায়রাভাই। কিন্তু চিন্ময়বাবু সেকথা কি করে জানবেন। সেই সরকারি চাকরি তিনি পাননি, কিন্তু তার জন্যে তাঁর কোনও আফসোসও নেই। তবে আজ এই স্বর্গীয় ইন্টারভিউয়ে তত জটিলতা নেই। শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীভগবানের একটাই মাত্র জিজ্ঞাসা, একটাই প্রশ্ন। তাঁর পাপপুণ্যের নিরিখ একটাই, সেটা হল নরনারীর নৈতিক জীবনের পবিত্রতা। তার চেয়েও বড় কথা অন্য কোনও নৈতিকতা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, এই বুড়োবয়সে তাঁর একমাত্র ভাবনা নরনারীর শারীরিক সম্পর্কের নৈতিকতা নিয়ে।

সবাইকে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয়, চিন্ময়বাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হল সেই একটিই প্রশ্ন।

প্রশ্নটি হল, 'তুমি কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ কিনা?'

চিন্ময়বাবু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বাংলা খবরের কাগজ, বইপত্র কিছু কিছু পড়েন বটে কিন্তু ব্যভিচারের মত কঠিন শব্দের প্রকৃত অর্থ তিনি জানেন না। প্রশ্ন শুনে চিন্ময়বাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন।

প্রশ্নকর্তা অন্য কেউ হলে ধরে নিত লোকটির দোষ আছে তাই এই আমতা-আমতা ভাব। কিন্তু এখানে প্রশ্নকর্তা স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সব বোঝেন, সব জানেন।

'ব্যভিচার' শব্দে চিন্ময়বাবুর অসুবিধা দেখে ঈশ্বর ইংরেজিতে অ্যাডাল্টারিব কথা বললেন, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন করলেন, 'বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে জীবনে কখনও ফস্টিনস্টি করেছ কিনা? ফস্টিনস্টির চেয়ে বেশি কিছু করেছ কিনা?'

অন্তত এই একটি ব্যাপারে চিন্ময়বাবুর কখনও কোনও দোষ ছিল না। প্রশ্ন বোঝামাত্র তিনি চট করে উত্তর দিলেন, 'নো স্যার। নেভার স্যার। কখনও না স্যার।'

যমরাজার বিশ্বস্ত সহকারী চিত্রগুপ্ত ভগবানের সামনে ছিলেন, তিনি পাশের ব্লকে যমপুরীর অফিসে তখনই দূরভাবে যোগাযোগ করে খোঁজ নিয়ে জানালেন চিন্ময়বাবু সত্যি কথাই বলেছেন।

আর কোনও প্রশ্ন চিন্ময়বাবুকে করা হল না। এই প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতেই তাঁকে একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত স্বর্গীয় মোটরগাড়ি বরাদ্দ করা হল।

গতকাল রাতে কিংবা আজ সকালে আরও যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদেরও প্রশ্নোত্তর চিন্ময়বাবুর সঙ্গেই চলছিল।

তবে সব ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর মোটেই জরুরি নয়। দু-চারজনের রেকর্ড এত খারাপ যে তাদের ক্ষেত্রে রেকর্ড বা জবানবন্দী কিছুই প্রয়োজন নেই।

এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীযুক্ত রামভজন চৌরাসিয়া, ক্রোড়পতি ও স্বনামধন্য লম্পট। চিন্ময়বাবু রামভজনকে আলগা-আলগা চিনতেন। রামভজনবাবুর দুর্বলতা ছিল অনতি-সাবালিকা, স্বভাবত অথবা জন্মজ গরঠিকানা-অভিনেত্রীদের প্রতি। একবার চিন্ময়বাবু দেখেছিলেন পুরীর সমুদ্রসৈকতে দুই সদ্যোত্থিতা উপনায়িকাকে দুই বগলে নিয়ে চিবগোলমেলে নুলিয়াদের হাত এড়িয়ে রামবাবু মাত্র তিনটে রবারের টিউব নিয়ে তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কুখ্যাত হোটেলের বারান্দায়, খারাপ পার্টিতে এবং এই জাতীয় নানা জায়গায় সময়ে-অসময়ে খারাপ-ভাল নানারকম মহিলার সঙ্গে রাম চৌরাসিয়াকে দেখেছেন চিন্ময় রায়।

চৌরাসিয়ার কাগজপত্র দেখে চিত্রগুপ্তের সঙ্গে অল্পবিস্তর আলোচনা করে ভগবান রামভজন চৌরাসিয়াকে বরাদ্দ করলেন একটি রিকশ।

ভগবানের নির্দেশ শুনে রামভজন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, করজোড়ে বললেন, 'হুজুর, পৃথিবীতে কোনওদিন আমি এয়ারকন্ডিশন গাড়ি ছাড়া চড়িনি আর আমাকে এখানে রিকশয় চড়তে হবে।'

ভগবান বললেন, 'না, না। তোমাকে রিকশয় চড়তে হবে না।'

শুনে রামভজন যেন একটু আশ্বস্ত হলেন এয়ারকন্ডিশন না হোক, স্বর্গে এয়ারকন্ডিশন দরকারও নেই। অন্তত একটা গাড়ি পেলেই হল। তিনি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভগবানের অঙ্গুলি নির্দেশে চিত্রগুপ্ত রামভজনকে জানালেন 'তোমাকে রিকশ চড়তে হবে একথা তো বলা হয়নি। তোমাকে তো রিকশ চড়ার জন্যে দেওয়া হচ্ছে না। তুমি রিকশ টানবে তোমার যা রেকর্ড তাতে এটাই তোমার প্রাপ্য।'

অনেক হাতেপায়ে ধরা, কাঁদাকাটি অনেক কিছু করেও রামভজন ভগবানের মন গলাতে পারলেন না। স্বর্গে হুকুম জারি হয়ে গেলে তার আর কোনও নড়চড় হয় না।

বিচারসভার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে স্বর্গের কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করছিলেন চিন্ময়বাবু। তাঁর আর কিছু করার নেই, তিনি তো নিজ পুণ্যবলে ভাল এয়ারকন্ডিশন গাড়ি পেয়েছেন। এখন শুধু মজা দেখছেন। যেমন-যেমন লোক আসছে তাদের কথাবার্তা শুনে, কাগজপত্র-রেকর্ড দেখে একেকজনকে একেকরকম যান বরাদ্দ করা হল।

একটি সুন্দরী মেয়ে এল। খুব চঞ্চলা, প্রগলভা ছিল পৃথিবীতে, তবে বোধহয় দুশ্চরিত্রা ছিল না, তাকে চাকা লাগানো দ্রুতগতি স্কেটিং বোর্ড দেওয়া হল।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এলেন, দেখা গেল দেশে তিনি যথেষ্ট সংযত থাকলেও যতবারই বিদেশে গিয়েছেন মেমসাহেবদের সঙ্গে যথেষ্ট বদমায়েসি করেছেন। তাঁকে একটা পুরনো মোটর সাইকেল দেওয়া হল।

পুলিসের এক প্রাক্তন বড়কর্তা এমনিতে ভালই ছিলেন, তবে মধ্যযৌবনে একবার যখন তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে মাসছয়েক হাসপাতালে ছিলেন তখন পাশের বাড়ির বিধবা বৌদির সঙ্গে একটু লটঘট বাধিয়ে ফেলেছিলেন।

ভদ্রলোককে একটা ফিটন গাড়ির কোচম্যান করা হল! ভদ্রলোক প্রাক্তন পুলিসকর্তা, তিনি জানতে চাইলেন, 'আমাকে কি খালি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে হবে।'

চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন, 'তা কেন? তোমার সেই পাশের বাড়ির বিধবা বৌদি তিনিই তো ঐ গাড়ি চড়েন। আগের কোচম্যান নরকে মেয়াদ খাটতে গেছে। এখন থেকে তুমি চালাবে ওঁর ঘোড়ার গাড়ি।'

এইভাবে ছোট বড়, সাধারণ, বিলাসবহুল মোটরগাড়ি, স্কুটার, মোটর সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল, সাইকেল রিকশ, টানা রিকশ, পায়ের নিচের স্কেটিং চাকা একেকজনকে একেকরকম বরাদ্দ করা হল।

চরিত্রদোষ অনুযায়ী চুলচেরা বিচার করে যার যেমন প্রাপ্য তেমন বাহন সে পেল।

কাউকে কাউকে বাহন দেওয়াই হল না। তাদের ড্রাইভার, কোচম্যান বা রিকশওয়ালা করা হল।

বিগত যুগের এক বিখ্যাত নর্তকী শ্রীমতী মদালসা দেবীকে দায়িত্ব দেওয়া হল চিন্ময়বাবুর গাড়ি চালানোর।

মহিলা বহুকাল আগেই এসেছেন, তবে আগে যাঁর সারথি ছিলেন তিনি সম্প্রতি আবার মানব জন্ম পরিগ্রহণ করতে ধরাধামে গিয়েছেন।

সে যা হোক, মদালসা দেবীকে নিয়ে চিন্ময়বাবুর আপত্তি নেই। আর আপত্তি করে লাভই বা কি? স্বর্গে নিজের ইচ্ছের কোনও দাম নেই।

মদালসা দেবী পারিজাত স্কোয়ারে চিন্ময়বাবুব জন্যে নির্দিষ্ট বাংলোয় গাড়ি চালিয়ে চিন্ময়বাবুকে নিয়ে গেলেন। চমৎকার বাংলো, সুন্দর ব্যবস্থা, সব নিখুঁত, কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। স্বর্গের ব্যাপারই আলাদা।

মদালসা কাছেই কোথাও থাকেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এসে তিনি চিন্ময়বাবুকে পারিজাত স্কোয়ারে, নন্দন অ্যাভিনিউয়ে, ব্রহ্মা রোডে, মহাদেব মার্কেটে গাড়ি করে বেড়িয়ে নিয়ে আসেন।

রাস্তায় অনেক চেনা লোক। তাদের বাহন দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় পৃথিবীতে কে কতটা সচ্চরিত্র ছিলেন। সেদিন চিন্ময় এক নীতিবাগীশ গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে দেখলেন সাইকেল চালাচ্ছেন, ভদ্রলোক চিন্ময়বাবুকে দেখে চিনতে পেরে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে পাশের গলিতে কেটে পড়লেন।

মদালসা দেবী অবশ্য বলেন, 'স্বর্গে আবার লজ্জা কি?' এ নিয়ে চিন্ময়বাবুর সঙ্গে মদালসা দেবীর অনেক আলোচনা হয়। সে আলোচনায় চিন্ময়বাবু বেশ মজা পান।

কিন্তু এ মজা দীর্ঘস্থায়ী হল না। রাস্তায় বিভিন্ন লোককে হরেক রকম যানবাহনে দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন চিন্ময়বাবু দেখলেন তাঁর স্ত্রী সর্বজয়া আসছেন সামনের রাস্তা দিয়ে।

সর্বজয়াকে দেখেই কপালে করাঘাত করলেন চিন্ময় রায়। গাড়ির গতি একটু মন্থর করে দিয়ে মদালসা দেবী বললেন, 'কি হল?'

চিন্ময় বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

মদালসা বললেন, 'কোথায়?'

চিন্ময় বললেন, 'ঐ টুং টাং করতে করতে সামনের গলিতে ঢুকছে।' বলে আবার কপালে করাঘাত করলেন, এবার বেশ জোরে।

মদালসা দেবী বললেন, 'আপনার স্ত্রী মারা গেছেন তাই পরলোকে এসেছেন। পৃথিবীতে স্ত্রী মারা গেলে স্বর্গে স্বামী শোক করে নাকি?'

চিন্ময় বললেন, 'আমি শোক করছি না, আমি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি।'

'ধিক্কার?' মদালসা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'ধিক্কার কিসের?'

চিন্ময়বাবু বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, 'দেখলেন না আমার স্ত্রী রিকশ টানছেন। বুঝতেই পারছেন কেমন চমৎকার চরিত্রবতী ছিলেন উনি। আর সারাজীবন ধরে মূর্খ আমি, ওঁকে কি তোয়াজটাই না করেছি। ওঁর মত মহিলার কথা ভেবে সারাজীবন শুকনো কাটিয়েছি। হায়, কপাল আমার।' বলে চিন্ময়বাবু আবার কপালে করাঘাত করলেন।

হরিনাথ ও হরিমতী

এক ভদ্রলোক প্রায় প্রতিদিনই অফিস থেকে সরাসরি বাড়ি না ফিরে এদিক ওদিকে অফিসের তাসের আড্ডায়, গলির মোড়ের চায়ের দোকানে, বেপাড়ার ক্লাবে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে তারপর আসতেন। এই খারাপ অভ্যেসটা তাঁর রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল এবং কোনদিনই সন্ধ্যেবেলায় তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। তাঁর বাড়ি ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যেতো।

গল্পের খাতিরে ভদ্রলোকের একটা নাম দিতে হবে। ধরে নেওয়া যাক, ভদ্রলোকের নাম হরিনাথবাবু।

হরিনাথবাবুর এই নৈশ আড্ডার ব্যাপারটা আব দশজন সাধারণ ঘরণীর মতই হরিনাথবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী হরিমতী দেবীর মোটেই পছন্দের নয়। রাত জেগে তিরিশ বছর ধরে স্বামীর ভাত বেড়ে অপেক্ষা করতে করতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তবু কিঞ্চিৎ চেঁচামিচি করে তিনি স্বামীকে ছেড়ে দিতেন। অবশেষে বোধহয় হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। খুব প্রয়োজন না হলে গালাগাল করেই ছেড়ে দিতেন। কিন্তু ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করল একদিন রাতে। হিসেব মত তখন রাত নয়, রাতগত দিন প্রায় সাড়ে বারোটা-একটা হবে।

হরিনাথবাবু আজ কোথায় গিয়েছিলেন কে জানে? অধিকাংশ দিন সাদাসিধে ভাবেই বাড়ি ফেরেন, আজ একটু নেশা করে বাড়ি এসেছেন। মুখে ম-ম করছে আরকের গন্ধ। চোখ ঠিক জবাফুলের মত না হলেও বেশ লাল, তা ছাড়া পা টলছে, ঠোঁটে গুনগুনানি গান।

এতক্ষণ দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ছিলেন হরিমতী দেবী। বিছানায় জেগে বসে ঢুলছিলেন খাটের বাজু ধরে আর মাঝেমধ্যে ভাবছিলেন পাড়া-প্রতিবেশীকে জানাবেন কি না। একই মেয়ে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে, নিজের বাড়িতে তো আর কেউ নেই।

কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীকে, খবর দিলে এখন কি কেলেঙ্কারিই না হত।

এই মধ্যরাত পেরিয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় টালমাটাল স্বামীকে দেখে হরিমতী দেবীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। জীবনে কখনও যা করেননি আজ এই প্রৌঢ় বয়সে তাই করলেন। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে নারকেল কাঠির মুড়ো ঝাঁটাটা এনে মনের দুঃখে স্বামীকে দু ঘা কষালেন তিনি।

নিগৃহীত হতেই কিঞ্চিৎ সম্বিত ফিরে এল হরিনাথবাবুর। তিনি দুহাত দিয়ে জাপটে গৃহিণীর হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ওগো তুমি আমাকে বিনা কারণে ঝাঁটা দিয়ে মারছ। আমার কথাটা আগে শোনো।'

ঝাঁটা মারার পরিশ্রমে হাঁফাতে হাঁফাতে হরিমতী দেবী বললেন, 'কি কথা'?

হরিনাথবাবু বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। খারাপ জায়গায় যাইনি। আমি হাসপাতালে এক মরণাপন্ন বন্ধুর শয্যার পাশে বসেছিলাম।'

এই কথা শুনে হরিমতী দেবী আরও খেপে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, 'তাই যদি হবে তোমার চোখ তবে এত লাল কেন?'

হরিনাথবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ওগো, তুমি মোটেই বুঝতে পারছ না। আমি এত রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছি আমার চোখ লাল হবে না? তোমার চোখও তো দেখি লাল হয়েছে।'

সত্যি তাঁর নিজের চোখ লাল হয়েছে কিনা এবং যদি লাল হয়েই থাকে তবে তার কতটা ক্রোধে ও উত্তেজনায় এবং কতটাই বা রাত্রি জাগরণে সে প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করে কোন জটিলতা সৃষ্টি না কবে হরিমতী দেবী এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে এরকম এলোমেলো দেখাচ্ছে কেন? তোমার পা টলছে কেন?'

নিষ্ঠুরা স্ত্রীর এ হেন কঠিন প্রশ্ন শুনে এবার কপালে করাঘাত করলেন হরিনাথবাবু। ইতিমধ্যে তাঁর নেশা প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। বেশ গোলাপি একটা নেশা হয়েছিল, সেটা কেটে যাওযায় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু খারাপই লাগছিল এখন হরিনাথবাবুর।

তাঁর বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল বৌকে তেড়ে যান, পরিষ্কার বলে দেন, 'নেশা করে এসেছি, বেশ করেছি, তার তোর কিরে মাগী। বেশি গোলমাল করবি তো এরপরে আব আসবোই না।' হরিমতীকে চুলের মুটি ধরে গোটা কয়েক থাপ্পড় ভালো করে তার গালে কষিয়ে কিছুক্ষণ আগের ঝাঁটা প্রহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা হরিনাথের মনের গোপনে উঁকি দিচ্ছিল।

কিন্তু হরিনাথের এরকম সাহস নেই। তাঁর তিরিশ বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ ধরনের সাহস প্রদর্শনের কোনও চেষ্টাই কখনই তিনি করেননি। আজও হরিনাথবাবু সেরকম' কোনও চেষ্টার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না।

বরং কপালে করাঘাত করে বললেন, 'কী বললে, গিন্নি? আমাকে এরকম এলোমেলো দেখাচ্ছে কেন, আমার পা টলছে কেন?'

অতঃপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হরিনাথবাবু বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না। রাত কাবার হতে চলেছে, আর সেই দুপুর থেকে কিছু খাইনি। চৌদ্দ ঘণ্টা পেটে একটা দানা পড়েনি। আমার পা টলবে না তো কার পা টলবে গিন্নি? আমাকে এলোমেলো দেখাবে না তো কাকে এলোমেলো দেখাবে গিন্নি? তুমি কি ভাব আমি মানুষ নই?'

হরিনাথবাবু এরপর একটু দম নিয়ে আর একটি উদ্‌গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপা দিয়ে প্রায় বিলাপের সুরে বললেন, 'আমার কি রক্ত-মাংসের শরীর নয়?'

কিন্তু ভবি এত সহজে ভুলবার নয়।

শ্রীযুক্তা হরিমতীদেবী এ জীবনে শ্রীযুক্ত হরিনাথবাবুর এতাদৃশ অভিনয় বহুবার দেখেছেন। তিনি এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বার দুয়েক নাক কুঁচকে হরিনাথবাবুর দেহনিঃসৃত কটু গন্ধ শুঁকে হরিমতী বললেন, 'কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে তোমার সারা শরীর দিয়ে এত খারাপ গন্ধ বেরচ্ছে কেন?'

এরপরে আর সহ্য করতে পারলেন না শ্রীযুক্ত হরিনাথবাবু। এ বয়সে ডুকরে কেঁদে ওঠা অস্বাভাবিক ব্যাপার, তা না করলেও বুক চাপড়ালেন হরিনাথবাবু, তারপর বললেন, 'হরিমতী, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। বারো ঘণ্টা হাসপাতালে ছিলাম। আমার গায়ে, মুখে, জামায় জুতোয় এসব হাসপাতালের গন্ধ।'

অতঃপর আজকের দাম্পত্য মামলায় জয়ী হলেন হরিনাথবাবু।

কিঞ্চিত অনুতপ্তা, (ঝাঁটামারা, কটূক্তি ইত্যাদির জন্যে), হরিমতীদেবী উনুনে ভাতটাত গরম করে হরিনাথবাবুকে খাওয়াতে বসলেন।

ইলিস মাছের মাথা দিয়ে চালকুমড়োর চচ্চড়ি চিবোচ্ছিলেন হরিনাথবাবু, আরেক হাতা গরম ভাত ঢেলে দিতে দিতে হরিমতীদেবী বললেন, 'তোমার যে বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলে আমি কি তাকে চিনি? কি নাম তার?'

পরিতৃপ্তভাবে ইলিস মাছের একটা কানকো চিবোতে চিবোতে হরিনাথবাবু বললেন, 'দেখো গিন্নি, ওর শরীরটা এতই খারাপ, ও এতই অসুস্থ যে ওকে আর জিজ্ঞেস করে উঠতে পারিনি ওর নামটা কি?'

হরিনাথবাবুর ভাগ্য ভালো। ঠিক এই মুহূর্তে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে উঠোন থেকে হরিমতীদেবী হরিনাথবাবুর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ঝাঁটাটা কুড়িয়ে আনতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন।

নিশ্চিন্ত চিত্তে অন্ধকারে ইলিস মাছের কাঁটা চিবোতে লাগলেন হরিনাথবাবু।

জীবনযাপন

শনিবারের সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়। কিংবা সঠিকভাবে বলা উচিত শনিবারের সকালে স্বেচ্ছায় দেরি করে ওঠেন জগদানন্দবাবু। জগদানন্দ রাহাচৌধুরী।

জগদানন্দবাবু কথাটার আমাদের অনেকের কাছেই কোনও মানে নেই, কিন্তু যদি সরাসরি বলি মিস্টার জে এন আর চৌধুরী সবাই চিনতে পারবেন।

খবরের কাগজে তাঁর নাম ভদ্রবাড়ির বাইরের ঘরে পর্দা বা পাপোষের মত থাকবেই। তাঁর নামে প্রশ্ন উঠবে বিধানসভায় লোকসভায় এমনকি রাজ্যসভায়। দূরদর্শনে, বেতারে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য।

কিন্তু মাননীয় রাহাচৌধুরী মশায় রাজনীতির লোক নন, রাজনীতির কিছুটা সাইড বিজিনেস তাঁর এক সময়ে ছিল, যথেষ্ট নিরাপদ নয় বলে এখন সেটাও করেন না। কিন্তু সবরকম ঘরানার লোক এখন তাঁকে খাতির করে কারণ তিনি একজন সফল ও কৃতবিদ্য কর্মযোগী, একালের ভাষায় শিল্পপতি।

শনিবার পরপর দুদিন হেডঅফিস বন্ধ থাকে। তাঁর কোম্পানির কলকারখানা সমূহের দিকে খুব একটা ঘেঁষেন না রাহাচৌধুরী সাহেব। 'দিতে হবে, দিতে হবে,' 'জবাব চাই, জবাব চাই', সে সব ভারি ঝামেলা। তিনি যথাসাধ্য হেড অফিসের নিরাপত্তার মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন, সেটাই নিরাপদ। ঝুটঝামেলা ম্যানেজারেরা সামলায়।

শনি-রবির ছুটির সুযোগে শুক্রবারের সন্ধ্যায় রাহাচৌধুরী সাহেবের আমোদ প্রমোদ একটু বেশি হয়ে থাকে, ফলে শনিবারের সকালে দেরি করে শয্যাত্যাগ করাটা সেই অর্থে খুব অস্বাভাবিক বলা যাবে না।

জগদানন্দ রাহাচৌধুরী নামটি বাংলায় খুবই জবরদস্ত। কিন্তু ইংরেজিতে জে রাহাচৌধুরী কেমন ম্যাটমেটে শোনায় সেইজন্যে জগদানন্দবাবু জগদা এবং নন্দ আলাদা করে ধরে জগদা থেকে জে, নন্দ থেকে এন, রাহা থেকে আর নিয়ে এবং চৌধুরী অটুট রেখে জে এন আর চৌধুরী হয়েছেন।

এতে নামটাই যে শুধু খোলতাই হয়েছে তা নয় আরও একটা সুবিধে হয়েছে পুরনো চেনাজানা লোকেরা সহজে ধরতে পারে না মহামহিম জে এন আর চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে নবযুগের ভগীরথ, তাদেরই জগা বা জগদানন্দ।

জে এন আর অতি সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন। আরোহণের বাঁকাচোরা চড়াই উৎরাইয়ের পথে তিনি তাঁর অতীত জীবনের অনেক কিছু ফেলে এসেছেন এবং কার্যকারণ বশত কিছু কিছু গর্হিত দোষ অর্জন করেছেন।

অনেক কিছু ফেলে এসেছেন জে এন আর, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে রীতিমত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর বহুদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী সহধর্মিণী হেমলতার জাল ছিঁড়ে বেরতে পারেননি। সেই প্রথম যৌবনে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, বড়লোকের মেয়ে হেমলতা গৃহশিক্ষক জগদানন্দের হাত ধরে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে চলে এসেছিল।

জগদানন্দের উত্থান সেখান থেকেই শুরু। ছেলেপিলে হয়নি, নিঃসন্তান হেমলতা এই মধ্যবয়েসে ভারি থলথলে শরীর, দোক্তাপান চিবোনো আতার বিচির মত কালো দাঁত আর সোনার চশমায় অপরূপা।

কিন্তু হেমলতাকে পরিত্যাগ করার সাহস জগদানন্দের ছিল না, এখনও নেই। যত দিন যাচ্ছে হেমলতার কঠোর শাসনে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। তাঁর সবরকম আমোদ ফুর্তিতে হেমলতা বাধা দেবে, গোপনে কিছু করলে রক্ষা নেই, ভয়াবহ গোলমাল শুরু হবে।

সে যা হোক মরনিং ওয়াক করা জে এন আর সাহেবের একটা পুরনো অভ্যাস। তিনি এটাকে উন্নতির একটা সোপান বলেই গণ্য করেন। সাবেকি শিল্পপতি পরিবারগুলির বংশধরদের মত অশ্বারোহণ, গলফ খেলা বা হেলথ্ ক্লাব তাঁর পছন্দ নয়। তিনি সকালবেলা হাঁটেন, হাঁটার পথে বহু ক্ষমতাবান, রইস্ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, জীবনে কাজে লাগে।

শনিবার সকালেও, যত দেরি করেই ঘুম থেকে উঠুন, স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন জগদানন্দবাবু। লেকের একটা ছায়া সুশীতল মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করে, কারণ এর পরে শনিবারের অনেক অন্যরকম কার্যকলাপ আছে তাঁর।

সে যা হোক আজ একটু বেশি বেলা হয়েছে, লেকে নিয়মিত পদচারীদের প্রায় কেউই নেই। তা ছাড়া বেশ ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠেছে, চড়া রোদে চারদিক ঝিমঝিম করছে।

এক গাছের ছায়ায় তাঁর প্রিয় বেঞ্চে প্রথমে কিছুক্ষণ বসেন জগদানন্দবাবু। আজ বসতে গিয়ে দেখেন সেখানে আগে থেকেই অন্য একজন লোক বসে রয়েছে।

লোকটার বয়েস হয়েছে, কেমন দীন, দুঃস্থ ভাব। গায়ে সেলাই করা পুরনো ময়লা পাঞ্জাবি, ততোধিক ময়লা ধুতি। পায়ে সুতো দিয়ে স্ট্রাপ জোড়া দেওয়া হাওয়াই চপ্পল।

একটু কোনা ঘেঁষে জগদানন্দবাবু বেঞ্চটায় গিয়ে বসলেন। তিনি বসার পর লক্ষ্য করলেন ঐ লোকটা তাঁর দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

একবার মুখ ঘুরিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে জগদানন্দবাবুর মনে হল কেমন চেনা-চেনা, যেন অনেক দিনের পূর্বপরিচিত। কিন্তু তাঁকে খুব বেশিক্ষণ সমস্যায় থাকতে হল না। হঠাৎ পাশের লোকটি তাঁকে বলল, 'আরে তুমি জগা নও।'

জগদানন্দবাবুও ততক্ষণে চিনতে পেরেছেন। সব্যসাচী, সব্যসাচী পাল। চল্লিশ বছর আগে একসঙ্গে দুজনে তীর্থপতি স্কুলে পড়তেন। সব্যসাচী ফার্স্ট হত। জগদানন্দ কোনওরকমে উতরিয়ে যেতেন।

পরেও মাঝেমধ্যে দু-এক জায়গায় দেখা হয়েছে তবে সেও অনেককাল আগে। যতদূর মনে পড়ে, গত বিশ পঁচিশ আর মোটেই দেখা হয়নি। তবু পুরনো সহপাঠী বন্ধু, চিনতে অসুবিধে হল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের সুখ-দুঃখের আলোচনা শুরু হল। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয় কিছুটা স্মৃতিকথা অল্পবয়েসের মধুর দিনের প্রসঙ্গ আর সেই সঙ্গে বর্তমান জীবনের গ্লানি—এই নিয়ে টুকটাক কথাবার্তা।

কথায় কথায় প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই জগদানন্দবাবু সব্যসাচীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ হাল হল কি করে?' আমতা আমতা করে সব্যসাচী প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, জগদানন্দবাবুও খুব জোর করলেন না জবাবের জন্য।

একটু পরে যখন জগদানন্দবাবু উঠছেন খুব সঙ্কোচের সঙ্গে সব্যসাচী জগদানন্দকে বললেন, 'দ্যাখো জগা, খুব লজ্জা হচ্ছে বলতে, এতদিন পরে দেখা, তবু পেটের দায়ে বলতে হচ্ছে, কাল রাত থেকে কিছু খাইনি কলের জল ছাড়া, খিদেয় মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে তাই লেকের বেঞ্চে এসে বসেছিলাম, তুমি যদি দশটা টাকা দাও তাহলে অনেকদিন পরে একটা ভাতের হোটেলে গিয়ে পেট পুরে একবেলা খেতাম।'

শনিবারের দুপুরে ক্লাবে একটা আড্ডা আছে। জগদানন্দ প্রত্যেক শনিবার দুপুরে সরাসরি লেক থেকে সেখানেই চলে যান। আজ সব্যসাচীর কথা শুনে তাঁর মনে হল একটু উদারতা দেখাই, ক্লাবের বন্ধুদের সব্যসাচীকে নিয়ে গিয়ে দেখাই, গরীব, অসফল, হতদরিদ্র বাল্যবন্ধুকে আমি ফেলি না, তাকেও সমান খাতির করি।

জগদানন্দ উদারভাবে বললেন, 'সব্য, তুমি আমার বাল্যবন্ধু তোমাকে ভাতের হোটেলে খাওয়ার টাকা আমি দিতে যাব কেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, ভাত খেতেই হবে এমন কোনও কথা নেই, আরও কত ভাল ভাল পেট ভরানোর জিনিস আছে সংসারে, তুমি আমার সঙ্গে চল।'

সব্যসাচী কি বুঝলেন কি জানি, একটু ইতস্তত, একটু দোনামনাভাবে তিনি জগদানন্দের

সাথে রওনা হলেন।

জগদানন্দের গন্তব্য মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে রবীন্দ্রসরোবরের এক প্রাচীন ক্লাবে। তিন মিনিটের মধ্যে জগা আর সব্য দুই বাল্যবন্ধু, একজন সফল অন্যজন অসফল দুজনে ক্লাবের দোতলায় পৌঁছে গেলেন।

জগদানন্দবাবু এক প্লেট বাদাম, দুই প্লেট আলুভাজা আর দুটো বিয়ার অর্ডার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন সব্যসাচী, 'একটা বিয়ার নাও, আমার জন্যে বিয়ার লাগবে না।'

জগদানন্দবাবু বললেন, 'সে কি, কেন? সঙ্কোচ করছ কেন?'

সব্যসাচী শুকনো মুখে জবাব দিলেন, 'না আমি ড্রিঙ্ক করি না, কোনও দিনই করিনি।' জগদানন্দ বোঝাতে চেষ্টা করলেন বিয়ার ঠিক মদ নয়, কিন্তু সব্যসাচী বিয়ার পান করতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

তবে আলুভাজা, বাদাম ইত্যাদি চাট জাতীয় জিনিস বিয়ারের সঙ্গে যা এল তার ভালোই সদ্ব্যবহার করলেন সব্যসাচী। বোঝা গেল তাঁর বেশ খিদে লেগেছে, যদিও আপাতত সেটা কিছুটা উপশম হল।

জগদানন্দ পুরনো বন্ধুকে সিগারেট এগিয়ে দিলেন, মহামূল্যবান বিলিতি ডানহিল সিগারেট। সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচী হাত নেড়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন, 'কিছু মনে কবো না জগা, কোনও নেশা আমার নেই, কোনওদিনই কোনও নেশা করিনি।'

এই ক্লাবে জগদানন্দের নিয়মিত বন্ধু-বান্ধবেরা যথারীতি অন্য টেবিলে হল্লা করছিল। তারা জগদানন্দের সাথে অন্য বাইরের লোক, বিশেষত ঐ রকম দুঃস্থ একজনকে দেখে আর ঘাঁটায়নি, তবে বিস্মিত হয়েছে।

এদিকে জগদানন্দ আপনমনে বিয়ার খেতে খেতে এবং সব্যসাচীকেঁ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সহধর্মিণী হেমলতার কথা ভাবছিলেন। মেয়েছেলেটা আজকাল রাতদিন জ্বালাতন করে, সিগাবেট খেলে বাধা দেয়, মদ খেলে বাধা দেয়, সব কিছুতে বাধা দেয়, আবাব কিছুই হেমলতার কাছে গোপন করা যায় না, সব কিছুই সে কি করে যেন টের পেয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে বিয়ারের পাত্র নিঃশেষ হল। তখন সব্যসাচী উঠে দাঁড়ালেন, জগদানন্দকে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আরেকটু খাবে। তুমি থাক, আমি যাই।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দশটা টাকা যদি ভিক্ষা দিতে দুপুরের খাওয়াটা কোথাও সেরে নিতাম। আজকের দিনটা কাটত।'

জগদানন্দ বললেন, 'তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে আমি ভিক্ষা দিতে যাব কোন দুঃখে, তুমি আমার সঙ্গে চল আমি তোমাকে টাকা ধার দেব সেই টাকা দিয়ে নিজে উপার্জন করবে, আমাব টাকা শোধ দেবে, নিজেরও দুপয়সা থাকবে।'

এবার গন্তব্যস্থল রেসকোর্স। গাড়িতে উঠে যেতে যেতে জগদানন্দ পার্স খুলে একটা একশ টাকার নোট সব্যসাচীর হাতে দিয়ে বললেন, 'আমরা ময়দানে রেসের মাঠে যাচ্ছি। প্রথম বাজির টিপ হল 'হ্যানি বয়', ও ঘোড়া না জিতে যায় না, জিতবেই, জিতলে টাকা তোমার, আর যদি ভাগ্য খারাপ হয়...

ততক্ষণে শিউরে উঠে একশ টাকার নোটটা জগদানন্দের মুঠোর মধ্যে গুঁজে ফেরত

দিয়েছেন সব্যসাচী, মুখে প্রতিবাদ জানালেন, 'না, না, রেসের মাঠে যাব না। জুয়া আমি কোনওদিনও খেলিনি, খেলব না।'

বিমূঢ় জগদানন্দ বুক পকেটে দোমড়ান একশ টাকার নোটটা রেখে অবাক হয়ে সব্যসাচীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সব্যসাচী তখন জগদানন্দকে বললেন, 'দ্যাখো, তোমার আমোদ প্রমোদে আমি বাধা দিতে চাই না। গাড়িটা থামাও, আমি কোথাও নেমে যাই, আর সেই দশটা টাকা যদি দিতে...

জগদানন্দ বললেন, 'দশ টাকায় কি খাওয়া হবে তোমার। বরং তুমি আমার সঙ্গে চল।'

সব্যসাচী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

জগদানন্দ বললেন, 'চলোই না। আশমানি বলে আমার এক গার্লফ্রেন্ড আছে। আমার ক্লায়েন্টদের দেখাশুনা করে। চমৎকার ঠুংরি গায় মেয়েটা। এই তো কাছেই ইলিয়ট রোডে ফ্ল্যাট। চল আশমানির ওখানে যাই। তোমাকে আসল মোগলাই খানা খাওয়াবো আজ দুপুরে।'

এবারেও প্রতিবাদ করলেন সব্যসাচী, 'ওসব আশমানির ফ্ল্যাট-ট্ল্যাটে খারাপ জায়গায় আমি যাব না। টাকা দশটা যদি দাও, এখানে নেমে যাই।'

কি চিন্তা করে জগদানন্দ বললেন, মাত্র দশ টাকা নয়, আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব, আর সেটা ভিক্ষাও নয় সেটা তোমার উপার্জন। শুধু তোমাকে একটা ছোট কাজ করতে হবে।'

আশঙ্কিত হয়ে সব্যসাচী বললেন, 'কি কাজ? আমি কিন্তু কোনও খারাপ কাজ করতে পারব না।'

জগদানন্দ বললেন, 'না হে, খারাপ কাজ কিছু নয়। তোমাকে শুধু একবার আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।'

সব্যসাচী বললেন, 'কিন্তু কেন? তোমার বাড়িতে গিয়ে আমি কি করব?'

জগদানন্দ বললেন, 'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বৌ হেমলতাকে একটু দেখাব?'

বিপন্ন সব্যসাচী জগদানন্দকে শেষ প্রশ্ন করলেন, 'হেমলতাকে কি দেখাবে? আমি দর্শনীয় কিসে?'

জগদানন্দ বললেন, 'হেমলতাকে দেখাব, সিগারেট না খেলে, মদ না খেলে, কোনও নেশা না করলে, জুয়া বা রেস না খেললে, আশমানির ফ্ল্যাটে কখনও না গেলে মানুষের কি দশা হয়।'

ফুলকুমারী

বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে এসে শ্রীলতার দিন আর কাটতে চায় না।

শ্বশুরবাড়ি কথাটা অবশ্য ঠিক হল না, বলা উচিত বরের বাড়ি, কলকাতার শহরতলিতে দুঘরের সরকারি কোয়ার্টার্স শ্রীলতার বরের। শ্বশুরবাড়ি কাটোয়ায়, সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ, ঝি-চাকর, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বাড়ি ভর্তি লোক। উকিলের

বাড়ি, সারাদিন কাকডাকা ভোর থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত মক্কেল-মুহুরিতে বাড়ি সরগরম। ছুটির দিনে আত্মীয়-কুটুমে হইচই আরো বেশি।

বিয়ের পর দু-তিন মাস শ্রীলতা কাটোয়ার সেই বাড়িতে ছিল। সে পাড়াগাঁর ইস্কুলের হেডমাস্টারের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ির হই হট্টগোলে প্রথম প্রথম তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। তাছাড়া বিয়ের পনেরো দিনের মধ্যেই অষ্টমঙ্গলার পরে পরেই শ্রীলতার স্বামী জ্যোতিষ কলকাতায় সরকারি চাকরিতে ফিরে আসে। হাঁফ লাগার সেটাও একটা কারণ।

শ্রীলতার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণের শেষে। এর মধ্যে অষ্টমঙ্গলা, পূজো এই সব ধরে কয়েক সপ্তাহ বাপের বাড়িতে কাটিয়ে কার্তিক বাদ দিয়ে, অঘ্রাণের প্রথম সপ্তাহে শ্রীলতা কলকাতায় স্বামীর ঘরে এসে পৌঁছল।

ঘরে মানে দশ ফুট বাই আট ফুট দুটো কামরা, সাবানের বাক্সের মত খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘর, এক চিলতে বারান্দা। তবু এই দুর্দিনের বাজারে শ্রীলতার স্বামী জ্যোতিষ কি করে এই ফ্ল্যাট পেল তা জানতে গেলে আরেকটা ঠক্কর কমিশন বসাতে হয়।

সে যা হোক স্বামীর ঘর করতে এসে শ্রীলতা প্রায় গৃহবন্দিনী হয়ে পড়েছে। স্বামী সাড়ে নয়টার মধ্যে অফিস বেরিয়ে যায়, তারপর থেকে সারাদিন সেই সন্ধ্যা ঘোর হওয়া পর্যন্ত সে একা, বাড়িতে আর কোনও লোক নেই।

একটা ঠিকে ঝি আছে, সেও শ্রীলতার স্বামী অফিস চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর মোছা, বাসন মাজা শেষ করে চলে যায়। নতুন সরকারি ফ্ল্যাট বাড়ি, পাশের ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। এ বাড়িটা হাউসিং এস্টেটের একেবারে শেষ প্রান্তে, এখান থেকে কোনও রাস্তা চোখে পড়ে না। মাঝে মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রীলতা উল্টোদিকের উঠোনে ছোট ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখে তাতে খেলার চেয়ে ঝগড়াই বেশি।

এত বড় কলকাতা শহরে শ্রীলতার আত্মীয়-স্বজন বলতে প্রায় কিছু নেই। এক দূর সম্পর্কের পিসি থাকে অনেক দূরে গড়িয়ায়। সেখানে শ্রীলতার একা একা যাতায়াত করার সাহস নেই। আর কোথাও যাওয়ার নেই তার, এ শহরে কোনও বন্ধুবান্ধবীও থাকার কথা নয় শ্রীলতার মত নিতান্ত মফস্বলী মেয়ের।

মোট কথা শ্রীলতার সময় আর কাটতে চায় না। জ্যোতিষ অফিস চলে যাওয়ার পরে সদর দরজায় শক্ত করে ছিটকিনি দিয়ে সে এসে একটু বারান্দায় দাঁড়ায়, জ্যোতিষের যাওয়া দেখে, প্রায় প্রতিদিনই কোয়ার্টার্স থেকে বেরুনোর পথে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হওয়ার আগে জ্যোতিষ একবার ঘুরে সোহাগভরা দৃষ্টিতে নবপরিণীতা বৌয়ের দিকে তাকায়।

এর পরে সব ফাঁকা। সাবাদিন দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে শ্রীলতার একা-একা অসহ্য লাগে। দুটো কুমিরের মত আকারের কালো ডোরাকাটা টিকটিকি আছে ঘরেব মধ্যে, একেকদিন তারা নিজেদের মধ্যে খুব লড়াই করে। শ্রীলতার মন খুব নরম, ঝগড়া-লড়াই এসব তার একদম পছন্দ নয়। সে একটা হাতপাখা তুলে দূর থেকে ওদের ভয় দেখায়, শাসায়। টিকটিকিরা যে খুব ভয় পায় তা নয় তবে শ্রীলতার সময় কিছুটা কাটে।

এছাড়া কয়েকটা চড়ুই পাখি আছে। তারা মাঝে মধ্যে শ্রীলতাদের ফ্ল্যাটে দল বেঁধে বেড়াতে আসে। কিচির-মিচির করে শ্রীলতাকে অনেক কিছু বলে। শ্রীলতা সব বুঝতে পারে না, তবে চালের কৌটো খুলে কয়েকটা দানা বার করে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়, চড়ুইগুলো খুট খুট করে খায়।

বিয়েতে উপহার পাওয়া কয়েকটা গল্প-উপন্যাসের বই আছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে খুব বেশি প্যাঁচ, সে সব পড়তে শ্রীলতার মোটেই ভাল লাগে না। তবু নিতান্ত বাধ্য হয়ে শ্রীলতা এসব বই-ই, সময় কাটানোর অজুহাতেই পড়ে ফেলেছে, এগুলো এমন বই নয় যে দুবার পড়া যায়। তবে খবরের কাগজ আছে। সেটা আবার ইংরেজী কাগজ। জ্যোতিষ ইংরেজী কাগজ পড়ে, শ্রীলতা স্বামীকে বলতে সাহস পায়নি বাংলা কাগজ রাখতে, কি জানি, সে হয়ত তাকে পাড়াগেঁয়ে, অশিক্ষিত, মূর্খ ভাববে। এখন আস্তে আস্তে ইংরেজী কাগজ পড়ার অভ্যেস করছে শ্রীলতা। তবে বড় খটমট, অনুমানে অর্থ বুঝে খবর পড়তে কারই বা ভাল লাগে? শ্রীলতারও লাগে না। তবু দুপুর জুড়ে বেশ কয়েকবার সে সমস্ত কাগজটা আগাগোড়া ওল্টায়।

ধীরে ধীরে জ্যোতিষ সমস্ত টের পায়। শ্রীলতার মধ্যাহ্নকালীন নিঃসঙ্গতার সমস্যা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং অল্প অল্প ব্যবস্থা নিতে থাকে।

জ্যোতিষ মাঝে মধ্যে অফিস কামাই করতে লাগল স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে। কিন্তু খুব বেশি অফিস কামাই করা যায় না, তা হলে চাকরি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া অফিসে সহকর্মীদের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট হাসাহাসি ও ঠাট্টা হয়।

শ্রীলতার একঘেয়েমি দূর করার জন্য অতঃপর জ্যোতিষ ইংরেজী খবরের কাগজ ছেড়ে দিয়ে বাংলা খবরের কাগজ রাখতে লাগল। ইংরেজী কাগজ ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে পড়া জ্যোতিষের বহুদিনের অভ্যেস, সে অভ্যেস ছেড়ে তার খুব কষ্ট হল কিন্তু শ্রীলতার জন্যে এইরকম কষ্ট করতে তার ভালই লাগল।

এতেও কিন্তু পোষাল না। তখন জ্যোতিষ অফিস থেকে গল্পের বই, ম্যাগাজিন স্টল থেকে সিনেমার অথবা মেয়েদের রঙিন কাগজ এইসব নিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু এতে আর কতটুকু সময় কাটে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ দীর্ঘ দ্বিপ্রহর শুধু ম্যাগাজিন বা গল্পের বই পড়ে কাটানো যায় না। শ্রীলতার হঠাৎ যে ছেলেপিলে হবে তারও আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই।

অবশেষে অনেক রকম চিন্তা করে, অনেক কথা বিবেচনা করে এক রবিবার সকালে জ্যোতিষ শ্রীলতাকে নিয়ে হাতিবাগান বাজারের ওখানে গেল। সেখানে নানারকম পশুপাখির মেলা। কুকুর, খরগোশ, টিয়া, চন্দনা, ময়না মানুষ পুষবার জন্যে কিনে আনে ওখান থেকে।

শ্রীলতার কুকুর পছন্দ নয়। বাড়িতে উঠোন না থাকলে কুকুর পোষা খুব হাঙ্গামা। খরগোশও ঘরদোর নোংরা করে, বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অনেক দেখেশুনে একটা পাখি কেনাই ঠিক হল, একটা টিয়া পাখি। উজ্জ্বল সবুজ রঙ, লাল ঠোঁট, ঝলমলে চোখ একটা টিয়া খাঁচাসুদ্ধ কেনা হল।

দুদিনের মধ্যে টিয়াপাখিটির সঙ্গে শ্রীলতার খুবই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। পাখির খাবার দেয়, স্নান করায়, খাঁচা পরিষ্কার করে—পাখিকে ঘিরে ভালই সময় কাটতে লাগল শ্রীলতার। সে ভালবেসে পাখিটির নাম দিল ফুলকুমারী।

এই নামকরণে জ্যোতিষের সামান্য আপত্তি ছিল। এই টিয়াটি কুমারী কিনা, এমন কি মেয়েপাখি কিনা সে বিষয়ে জ্যোতিষ নিঃসন্দেহ নয়। সে চেনাশোনা দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে খোঁজখবর করল কি করে ছেলেপাখি মেয়েপাখির পার্থক্য ধরা যায়। বিজ্ঞজনেরা

বললেন, দুটোর মধ্যে যেটা বড়সড় আর সুন্দর দেখতে সেটাই ছেলেপাখি। মেয়েপাখিগুলো একটু নিরেস দেখতে হয়, যেমন মুরগি আর মোরগ, ময়ূরী আর ময়ুর।

জ্যোতিষ এ সব শুনে যখন বলল, 'আমার তো দুটো পাখি নয় একটা পাখি, আমি কি করে বুঝব এটা নিরেস না সরেস, ছেলে না মেয়ে, মেলাব কি করে?'

সবাই ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাহলে অসম্ভব। তবে অপেক্ষা করে দ্যাখ ডিম পাড়ে কিনা। যদি ডিম পাড়ে তা হলে মেয়েপাখিই হবে।'

জ্যোতিষ এ কথার কোনও জবাব দিল না, সে ভাল করেই জানে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক খাঁচায় আটকানো নিঃসঙ্গ পাখির ডিম পাড়ার সম্ভাবনা শূন্য। আর তা ছাড়া গাছের ডালে যদি একজোড়া পাখি বাসা বাঁধে তবে তার মধ্যে কোন পাখিটা ডিম পেড়েছে সেটা বলাও খুবই কঠিন। সুতরাং জ্যোতিষ বিশেষ আপত্তি বা প্রতিবাদ করতে পারল না। শ্রীলতার টিয়াপাখির ফুলকুমারী নামই বহাল রইল। দিনে-দিনে শ্রীলতার আদরযত্নে, সোহাগে ফুলকুমারীর ঔজ্জ্বল্য বাড়তে লাগল। ফুলকুমারীর জন্যে জ্যোতিষকে বাজার থেকে সাদা কাবুলি ছোলা কিনে আনতে হয়। লাল রঙের পাঁকা কাঁচালঙ্কা ফুলকুমারীর খুবই পছন্দ, বাজার থেকে খুঁজে পেতে, বাছাই করে শ্রীলতার আদেশে সেইরকম লঙ্কা জ্যোতিষ নিয়ে আসে।

ফুলকুমারীর সঙ্গে সারাদিন কতরকম গল্প করে শ্রীলতা। 'ফু, ফুলু, ফুলকুমারী...' কত রকম ভাবে আদর করে ডাকে পাখিকে।

একেক সময় জ্যোতিষের রাগ হয়, খুব হিংসেও হয়, কিন্তু পাখির সঙ্গে তো আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চলে না, সে চুপ করে থাকে।

কিছুটা স্বামীর সঙ্গে, অনেকটা পাখির সঙ্গে শ্রীলতার দিনরাত এখন ভালই কাটছে। স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সে নিশ্চয়ই করছে কিন্তু জ্যোতিষের একেক সময় সন্দেহ হয় সে নিতান্তই দায়সারা।

কথাটা হয়ত কিছুটা সত্যিও, ক্রমশ ক্রমশ ফুলকুমারী অন্ত প্রাণ হয়ে উঠল শ্রীলতা। শ্রীলতার ধ্যান, জ্ঞান, সারাক্ষণ ফুলকুমারী। খাঁচার ভেতর থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে যাতায়াতের পথে শ্রীলতার আঁচল ধরে টানে ফুলকুমারী। তার খাঁচা টাঙানো হয়েছে শোয়ার ঘর থেকে রান্না ঘরের মধ্যে ছোট চিলতে খাওয়ার জায়গায়। শ্রীলতাকে দেখতে না পেয়ে খাঁচায় বসেই চেঁচায়। ফুলকুমারীর কিন্তু খুব রাগ জ্যোতিষের ওপরে। সে প্রায়ই চেষ্টা করে কোন অসতর্ক মুহূর্তে জ্যোতিষ খাঁচার কাছে চলে এলে তাকে ঠুকরিয়ে দিতে। একদিন ঘাড়ের ওপরে ধারাল ঠোঁটে ঠুকরিয়ে সে রক্ত বার করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রেয়সীর পাখিকে কিছু বলেনি জ্যোতিষ।

এর মধ্যে শীত শেষ হয়ে এল। প্রতি বছর ফাল্গুনের গোড়ায় শ্রীলতাদের গ্রামে কানা ভৈরবীর মেলা বসে। খুব বড়, অনেক পুরনো মেলা। সারা গ্রামে উৎসব লেগে যায়।

শ্রীলতার বাবা আগেই চিঠি লিখেছিলেন। মেলার আগে শ্রীলতাকে নিয়ে যেতে শ্রীলতার কে জ্ঞাতি কাকা এল। স্ত্রীর বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে আপত্তি করার মত ছোটলোক নয় জ্যোতিষ। কিন্তু আপত্তি দেখা দিল শ্রীলতার দিক থেকেই। সে ফুলকুমারীকে ছেড়ে কি করে যাবে?

বিয়ের বছরেই বাপের বাড়ি যেতে চায় না এমন মেয়ে দুর্লভ। স্তম্ভিত খুল্লতাত এবং

হতচকিত স্বামী অনেক বোঝানোর পরে শ্রীলতা তিনদিনের জন্যে পিত্রালয়ে যেতে রাজি হল শুধু এক শর্তে ফুলকুমারীর দেখাশোনা, স্নান করানো, খাওয়ানো সব কিছু জ্যোতিষকে ঠিকমত করতে হবে।

জ্যোতিষ অবশ্যই রাজি হল এবং মাত্র তিনদিনের মধ্যে শ্রীলতা বাপের বাড়ি থেকে ফিরবে শুনে খুশি হল, তার তো আর ফুলকুমারীকে নিয়ে সময় কাটবে না। শ্রীলতা যত তাড়াতাড়ি ফেরে ততই মঙ্গল।

এক শুক্রবার শ্রীলতা বাপের বাড়ি গেল, পরের মঙ্গলবার ফিরবে। বন্দোবস্তটা ভালই, শনি-রবিবার জ্যোতিষের ছুটি, সোমবারও ছুটি নেবে, ফলে ফুলকুমারীকে কোনদিনই অরক্ষিত থাকতে হবে না।

ফুলকুমারীকে কীভাবে স্নান করাতে হয়, কীভাবে খাওয়াতে হয়, কীভাবে ফুলকুমারীর খাঁচা পরিষ্কার করতে হয় সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্যোতিষকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল শ্রীলতা।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই ফুলকুমারীর দেখাশোনার ভার গ্রহণ করল জ্যোতিষ। কিন্তু সে এ কাজের মোটেই যোগ্য নয়। শনিবার সকালেই এক ভয়াবহ অঘটন ঘটল। সে অঘটনের কথা এখানে নয়, যথাস্থানে বলা যাবে, না হলে গল্পটা মারা পড়বে।

যথা নির্দিষ্ট মঙ্গলবার দিন শ্রীলতা ফিরল যথেষ্ট উৎকণ্ঠা নিয়ে কিন্তু তার উৎকণ্ঠার কোন কারণ ছিল না। সে ভেবেছিল তার অদর্শনে ফুলকুমারীর মন খারাপ, শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু শ্রীলতা এসে দেখল ফুলকুমারী আরও টগবগে, আরও উজ্জ্বল। ফলে জ্যোতিষকে এ জন্যে যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে সে ভুলল না।

আবার দিন কাটতে লাগল। শ্রীলতা, জ্যোতিষ আর ফুলকুমারীর সময় চমৎকার কাটতে লাগল। বাজার থেকে প্রচুর সাদা ছোলা আর রাঙামরিচ কিনে আনতে লাগল জ্যোতিষ ব্যাগ ভর্তি করে। ভালই চলছিল সবকিছু কিন্তু হঠাৎ একদিন, মাসখানেক পরে শ্রীলতা লক্ষ্য করল ফুলকুমারীর চাঞ্চল্য আর উজ্জ্বলতা কেমন কমে এসেছে। সে কেমন নেতিয়ে পড়েছে। সাদা ছোলায়, রাঙামরিচে তার আর রুচি নেই। খাঁচার মধ্যে নীল-লাল প্লাস্টিকের বাটিতে সে সব পড়ে থাকে। স্নান করাতে গেলে ফুলকুমারী আর আগের মত উল্লসিত হয় না।

অফিস থেকে জ্যোতিষ শুনে এল টিয়াপাখির এরকম অসুখ হয়, এরকম নেতিয়ে পড়ে, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়। গরম পড়লে টিয়াপাখির মাথায় একরকম গ্যাঁজ বেরয়। কতকগুলো সামলে ওঠে, কতকগুলো মারা পড়ে।

এসব কথা শ্রীলতাকে কিছু বলল না জ্যোতিষ কিন্তু পরদিন ভোরবেলা বারান্দায় শ্রীলতার আর্ত চিৎকারে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল জ্যোতিষের। সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে খাঁচার মধ্যে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে পাখিটা আর শ্রীলতা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, 'আমার ফুলকুমারী আমাকে ছেড়ে চলে গেল।'...

অনেকক্ষণ কাঁদাকাটি শোনার পর জ্যোতিষ শ্রীলতার মাথায় হাত রেখে বলল, 'তুমি এত কাঁদাকাটি কর না। আমি তোমাকে সামনের রবিবার সকালেই হাতিবাগান বাজার থেকে আরেকটা ভাল টিয়াপাখি এনে দেব।'

এই কথা শুনে শ্রীলতা কপাল চাপড়িয়ে, চিৎকার করে কেঁদে উঠল, বলতে লাগল,

'আমি ভাল টিয়াপাখি দিয়ে কি করব? ফুলকুমারীকে ছাড়া আমি বাঁচব না। অন্য পাখি আর ফুলকুমারী কি এক হল?' দুরন্ত কান্নার সঙ্গে রাগারাগি করতে লাগল শ্রীলতা।

এই সময় জ্যোতিষ বলল, 'কিন্তু এই পাখিটা তো তোমার ফুলকুমারী নয়।' এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল শ্রীলতা, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'এ আমার ফুলকুমারী নয়ত কার ফুলকুমারী?'

তখন জ্যোতিষ বলল, 'তুমি সেই যে বাপের বাড়ি গেলে, বাপের বাড়ি যাওয়ার পরদিন সকালে খাঁচা পরিষ্কার করে স্নান করাতে গিয়ে হঠাৎ তোমার ফুলকুমারী তো উড়ে পালিয়ে গেল। আমি আর কি করব পরের দিন রবিবার ছিল, হাতিবাগান গিয়ে ঐরকম আরেকটা পাখি কিনে আনলাম। এটাই সেই পাখিটা। না হয় আরেকটা এরকম পাখি নিয়ে আসব। সেটাকেও ফুলকুমারী নাম দিও।'

জ্যোতিষের কথা শুনে শ্রীলতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত বড় প্রবঞ্চনা তার সঙ্গে জীবনে কেউ করেনি। সে আরও অঝোরে কাঁদতে লাগল। শোয়ার ঘরে ছুটে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল।

শ্রীলতাঁর শোক আর অভিমান কীভাবে দূর করতে পেরেছিল জ্যোতিষ সে কাহিনী এখানে অবান্তর। তবে শ্রীলতা আর পাখি পোষেনি। জ্যোতিষ শেয়ালদার মোড় থেকে কয়েকটা বেলফুল গাছ নিয়ে এসেছে। সেগুলো সামনের ছোট বারান্দায় টবে সুন্দর লেগেছে। দুবেলা সে গাছগুলোয় জল দেয় শ্রীলতা।

ভরা গ্রীষ্মে গাছগুলোয় দুয়েকটা করে সুগন্ধময় ছোট ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। সেগুলো তুলে নিয়ে শ্রীলতা সন্ধ্যাবেলা খোঁপায় গোঁজে।

আজকাল জ্যোতিষ শ্রীলতাকে প্রায়ই ফুলকুমারী বলে ডাকে।

জতুগৃহ

[এক] অবতরণিকা

নিবারণবাবু লোকটাকে প্রথম প্রথম আমি যতটা বোকা ভেবেছিলাম, তিনি বোধ হয় তা নন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আজ প্রায় বছর দেড়েক আলাপ। দিল্লি না বোম্বাই, কোথায় যেন বড় চাকরি করতেন, সেখান থেকে অবসর নিয়ে আমাদের গলির মোড়ের এক মালটিস্টোরিড বিল্ডিংয়ে ফ্ল্যাট কিনে ডেরা বেঁধেছেন।

আমাদের রাস্তাটা সরাসরি ময়দানের দক্ষিণ মুখে গিয়ে পড়েছে। মোড় পেরোলেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। গ্রাউন্ডের উল্টো দিকে রানীর উদ্যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

সকালে বিকেলে এদিকে যাঁরা হাঁটতে আসেন তাঁদের মধ্যে রাজা, উজির, কোটাল, কোটিপতি থেকে সামান্য কেরানি, মাস্টার, জোচ্চোর, হাসির গল্পের লেখক ইত্যাদি সব রকম লোক আছে। এদের মধ্যে একটাই মাত্র প্রভেদ যে, একদল ভিক্টোরিয়ার বাগানে হাঁটেন, অন্য দল ব্রিগেড প্যারেডের মাঠে হাঁটেন। যাঁরা ভিক্টোরিয়ায় হাঁটেন তাঁরা কখনোই ব্রিগেড প্যারেডে যান না। অন্যদিকে ব্রিগেড প্যারেড হাঁটিয়েদের কাছে ভিক্টোরিয়া অস্পৃশ্য।

এ পাড়ায় আমি খুব বেশিদিন আসিনি, বছর আটেক হবে বড়ো জোর। এখানে এসে প্রথম প্রথম প্রাতঃ ও সান্ধ্যভ্রমণের সময় এই ভ্রমণ বিভেদের ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ খটকা লেগেছিল। ভিক্টোরিয়াতেও মন্ত্রী থেকে কেরানি হাঁটছেন, ব্রিগেডেও তাই। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রী কখনোই ব্রিগেডে হাঁটতে যাবেন না, আবার ব্রিগেডের কেরানি ভিক্টোরিয়ায়? নৈব নৈব চ।

অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা অনুধাবন করার পরে এখন বুঝতে পেরেছি, এটা নিতান্ত একটা অভ্যাসমাত্র। এর মধ্যে কোনো গূঢ় সামাজিক মনস্তত্ত্ব বা তথাকথিত আর্থ-রাজনৈতিক কারণ নেই। একেকজনের একেকরকম অভ্যাস ও পছন্দ।

আমি অবশ্য ভিক্টোরিয়ায় এবং ব্রিগেডে, এই দুই জায়গাতেই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে বিচরণ করি। সকালে ব্রিগেডে হাঁটতে যাই, খোলা মাঠে নীল আকাশের নিচে শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের গালিচায় খালি পায়ে হাঁটি। আমার রক্তচাপ কমে, দেহেমনে আরাম হয়।

আর ছুটির দিনের বিকেল, ঠিক বিকেলে নয়, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে হাঁটতে যাই। সুবেশ পুরুষ এবং সুন্দরী রমণীদের, তদুপরি অগণিত বেশরম প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলদের সঙ্গসুখ লাভ করি।

বলে রাখা ভালো যে আমার এই দুই বেলার দুই রকম ভ্রমণব্যবস্থার কারণটা একটু অন্যরকম। একটি প্রাচীন সারমেয় প্রতিদিন সকালে আমার ভ্রমণসঙ্গী। তাকে ভিক্টোরিয়া ঢুকতে দেয় না, তাই সকালে তাকে নিয়ে ব্রিগেডের মাঠে হাঁটি। আর ছুটির দিনের সায়াহ্নে ভিক্টোরিয়ার বাগানে আমি একা একটু ঘুরি। কাঠের বেঞ্চিতে বসে একটু দেবদারুর হাওয়া খাই, মানুষজন দেখি, তাদের টুকরো কথাবার্তা শুনি।

এই বাগানেই আরও বহু লোকের সঙ্গে যেমন করে নানা সূত্রে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, একদিন নিবারণবাবুর সঙ্গেও তাই হল।

দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের পুকুরের ধারে দেবদারুবীথির মধ্যে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিলাম। এই বেঞ্চটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, ঠিক সরাসরি ওপরে কোনও বৃক্ষশাখা নেই তাই পাখিরা বসে কোনও কুকর্ম করতে পারে না আবার ওই জন্যেই একটু খোলামেলা বলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের এ বেঞ্চটা তেমন পছন্দ নয়। গাছের আড়াল না হলে তাদের ভালোবাসা জমে না।

সে যা হোক, ছুটির দিনের সন্ধ্যা তাই সেদিন শার্টপ্যান্ট নয়, আমার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি, তাও সাধারণ কোনও ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, রীতিমত রেয়নের ধুতি আর নকশি ফুলতোলা রেশমের পাঞ্জাবি।

কঠোর কার্পণ্যই আমার এই সুবেশের কারণ। আমার নিজের কোনও ভালো জামাকাপড় নেই, ধুতি-পাঞ্জাবির প্রশ্নই ওঠে না। টেরিকটনের দু-একটা প্যান্টশার্ট আছে আর আটপৌরে পোশাক বলতে পাজামা আর হাফশার্ট সম্বল।

ওই রেশমি পাঞ্জাবি আর রেয়নের ধুতি আমি সম্প্রতি লাভ করেছি। ব্যাপারটা এ কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত, তবু সূত্রপাত হিসেবে একটু লিখছি।

বল্লভপাড়া গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা খন্দকার আলাউদ্দিন খান আমার বন্ধু, পুরনো ক্লাসফ্রেন্ড। অনেককাল আগের কথা, আলাউদ্দিন আর আমি একই বছরে দুজনে একই বিষয়ে একসঙ্গে এম. এ পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম। আজকাল কি হয় জানি না,

কিন্তু অনন্তকাল আগে সেই পঞ্চাশের দশকে যখন সামান্য আট আনায় ভাত-ডাল-তরকারি-মাঝের ঝোল পাইস হোটেলে ভরপেট খাওয়া যেত, এমনকি দামটা বেশি বলে অনেকে মাছটা বাদ দিয়ে সাড়ে পাঁচ আনায় ভরপেট খেত, সেই সময় কেউই বোধ হয় এম. এ পরীক্ষায় ফেল করত না। কদাচিৎ এক-আধজন, সেই প্রথম একসঙ্গে দুজন এম. এ ফেল করল, আমি আর আলাউদ্দিন।

বলা বাহুল্য, এর পর থেকে আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং সেই হৃদ্যতা আজও অব্যাহত রয়েছে। আমি আর জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারিনি, সম্প্রতি হাসির গল্প লিখে (বেশিটাই বিলিতি হাসির গল্প থেকে বাংলায় টুকে) সামান্য নাম ও পয়সা হয়েছে, কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যাচ্ছে। এদিকে নানা ঘুরপথ ধরে অবশেষে আলাউদ্দিন এখন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা হয়েছে।

আলাউদ্দিনের ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা কুচো চিংড়ি চাষের লোন পাইয়ে দিয়েছিলাম গজেন্দ্রকে। ফলতার কাছে একটা গ্রামে একটা শ্যাওলা ভরা কুঁচো চিংড়ির পুকুর এক বছরেব জন্যে ইজারা নিয়েছিলো গজেন্দ্র, সে আমার পিসতুতো ভাইয়ের দূর সম্পর্কের শালা। সে হিসেব করেছিল ওই কুঁচো চিংড়িগুলো তিন মাসে বাগদা চিংড়ি হবে এবং এক বছরের মধ্যে গলদা চিংড়ি হবে, এতে লাভ হবে দশ গুণ। তা অবশ্য হয়নি কারণ পরে জানা গিয়েছিল কুঁচো চিংড়ি কখনও বাগদা চিংড়িতে কিংবা বাগদা কখনও গলদায় পরিণত হয় না। এর একেকটার একেক জাত, তাছাড়া ওই পুকুরে সবটাই কুঁচো চিংড়ি ছিল না অনেকগুলোই ছিল ব্যাঙাচি, যথাসময়ে তারা লেজ পরিত্যাগ করে চারপায়ে জল থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আলাউদ্দিনের ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার লোনের পুরোটা অবশ্য গজেন্দ্র হাতে পায়নি। আলাউদ্দিনকে ফিফটি-ফিফটি মানে পঁচিশ হাজার তদুপরি কেরানি, ক্যাশিয়ার, পিয়ন, দারোয়ান এমনকি ব্যাঙ্কের দরজায় যে নেড়ি কুক্কুরী শুয়ে থাকে তার লেড়ে বিস্কুট, ধারে ফর্মের ফোটো, এফিডেভিট ইত্যাদি বাবদ সবসমেত একচল্লিশ হাজার চারশো বত্রিশ টাকা বাইশ পয়সা ব্যয় করতে হয়। অবশেষে পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে যখন সাকুল্যে তার হাতে হাজার সাড়ে আট টাকা আসে এবং সেই সঙ্গে কুঁচো চিংড়িগুলো বাগদা বা গলদা না হয়ে ব্যাঙ হয়ে পালিয়ে যায় সে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং দুটি কাজ করে বসে। এক, একটি দুর্মূল্য রেয়ন ধুতি কিনে আমাকে উপহাব দেয় এবং দুই, নিজে আত্মগোপন করে, এরপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশ্য এই রেয়ন ধুতির চেয়ে অনেক বেশি রোমহর্ষক ইতিহাস আমার রেশমি পাঞ্জাবিটির।

আমার এক অকৃতদার খুল্লতাত আদালতের পেশকারি কাজ থেকে রিটায়ার করার পর যাত্রাদলে প্রম্পটার হয়েছিলেন। যাত্রাপার্টির সঙ্গে যখন তাঁকে বাইরে যেতে হত না তখন কলকাতায় আমার কাছেই থাকতেন।

গোয়ালপাড়া থেকে বালেশ্বর এবং সুন্দরবন থেকে তরাই কাঁপানো যুগান্তকারী যাত্রাপালা 'শাঁখা ভাঙো সিঁদুর মোছো' দ্বিসহস্র রজনী অতিক্রম করেছিল তাঁর প্রম্পটিংয়ে। সেই পালার একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য ছিল নায়িকা বিউটিবালা এক রাতে সিল্কের পাঞ্জাবি

আর পাজামা পরে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে দুশ্চরিত্র, লম্পট স্বামীর খোঁজে পতিতালয়ে গেছে।

মারমার, কাটকাট সিন সেটা। কিন্তু কোনও এক নির্দিষ্ট কারণে, যাত্রার মালিক ভগবান মাইতির প্রৌঢ়া স্ত্রী সত্যভামা, রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে যখন চিৎপুরের গদিতে বিউটিবালার পাশে বসে ভগবানবাবুর নায়েকদের সঙ্গে লেনদেন এবং মিঠে পান, মিঠে হাসি বিনিময় করছিলেন, সহসা প্রবেশ করে গদির নিচ থেকে একটি ঝাঁটা তুলে নিয়ে বিউটিবালাকে আপাদমস্তক আশীর্বাদ করলেন।

বিউটিবালাকে ভগবান মাইতি ধারণা দিয়েছিলেন যে তিনি বিপত্নীক কিন্তু সেই মুহূর্তে সমুদ্যত ঝাঁটা, হাতের নোয়া, শাঁখা সেই সঙ্গে সিঁথির সিঁদুর, কস্তাপেড়ে লাল শাড়ি এবং সর্বোপরি অধিকারবোধ ইত্যাদি দেখে সত্যভামাকে বুঝতে বিউটিবালার এক লহমা লাগল। সে দ্রুত চিৎপুরের পথ ধরে পশ্চিমদিকে পালাল।

বিউটিবালা আর ফিরে আসেনি। কিন্তু ভগবানবাবু এরপর যথেষ্ট সাবধান হয়ে যান। বিউটিবালার স্থলাভিষিক্তা হয় শম্পারানী। তিনি তার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন।

কিন্তু অন্য একটা অসুবিধে হয়েছিল। বিউটিবালা ছিল প্রকৃত যাত্রাসুন্দবী। ওজন ছিল একশো কেজি, দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা ছিল পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট বাই আড়াই ফুট। এক কিলোমিটার দূরের সদ্য কাটা ধানখেতের আলের ওপর বসানো পাঁচ টাকার গ্যালারি থেকে জনতা তাকে চোখের সামনে দেখতে পেত।

বিউটিবালার ক অক্ষর ছিল গোমাংস। তার মানে লেখাপড়া শূন্য। সে তুলনায় শম্পা বিদ্যাবিলাসিনী, উত্তর মধ্যমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় থেকে সে পর পর চারবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে কারণেই কিংবা অন্য কোনও কারণে তার ওজন মাত্র চুয়াল্লিশ কেজি। ফলে শ্রীমতী বিউটিবালার পরিত্যক্ত পোশাক শম্পারানীর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তার জন্যে মহানুভব ভগবান মাইতি পয়সা খরচ করে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবির সেট বানিয়ে দেয়।

আমার প্রম্পটার খুল্লতাত প্রায় আমার মতই স্থূলবুদ্ধি, স্ফীতোদর এবং কৃপণ ছিলেন। তিনি ভগবানবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করে বিউটিবালার ওই পাঞ্জাবিটি নিজের জন্যে চেয়ে নেন।

কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই কোলাঘাটের কাছে এক গ্রামে একই রাতে 'শাঁখা ভাঙো সিঁদুর মোছো' পালার পরপর দুবার অভিনয় হয়। দ্বিতীয়বার অভিনয়ের শেষদিকে প্রম্পটিং করতে করতে অকস্মাৎ হৃদরোগে আমার খুল্লতাত মহোদয় আক্রান্ত হন এবং পরের দিন কলকাতার একটি হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

অকৃতদার খুল্লতাত মহোদয়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে যাত্রাপালার কয়েকটি মলিন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, এক জোড়া হাই-পাওয়ার চশমা, সামান্য তৈজসপত্র এবং তৎসহ জামাকাপড়ের সঙ্গে ওই সিল্কের পাঞ্জাবিটা আমি পেয়েছি।

ছুটির দিনের সায়াহ্নে গজেন্দ্রর দেওয়া রেয়নের ধুতি এবং বিউটিবালার রেশমের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেড়াতে বেরোই। বিউটিবালার পাঞ্জাবি আমাকে চমৎকার ফিট করেছে। তবে আমার এই হৃষ্টপুষ্ট, নধরকান্তি, ভুঁড়িওলা শরীরে ওই রেশমি পাঞ্জাবি

পরলে কেমন একটা অবাঙালি, বেওসায়ি সুলভ চেহারা হয়। সেদিন নিউমার্কেটে মাংস কিনতে গিয়েছিলাম, অচেনা সব দোকানদার, তারা সমস্বরে আমাকে 'আইয়ে শেঠজি, আইয়ে শেঠজি' বলে ডাকতে লাগল। শেঠজিরা যে মাংসাশী নয় সে কথা বুঝিয়ে আমি তাদের জানালাম যে আমি বাঙালি। তারা আমার কথা শুনে মিটমিট করে হাসতে লাগল। বোধ হয় মনে মনে ধরে নিল যে লোকটা মাংস খাওয়ার লোভে নিজেকে বাঙালি বলছে।

[দুই] মূল কাহিনী

এ গল্প তো নিবারণবাবুকে নিয়ে, অথচ আমি আমার নিজের কথাই বেশি বলে ফেললাম।

অনেক পুষ্করিণীতে সিঁড়ি বাঁধানো ঘাট থাকে। যখন জল গভীর থাকে টইটম্বুর বর্ষাকালে, সিঁড়িগুলো জলের নিচে থাকে। কিন্তু খর গ্রীষ্মে চৈত্র-বৈশাখে যখন জল ফুরিয়ে দীঘির নিচে নেমে যায় তখন দেখা যায় লম্বা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। আমার এই মূল কাহিনী খুবই সামান্য, গ্রীষ্মের দীঘির জলের মতই অগভীর তাই অবতরণিকার সিঁড়িটা এত লম্বা।

যা হোক জলের কাছে এসে গেছি, এবার নিবারণবাবুর কাহিনীতে প্রবেশ করছি।

যা বলছিলাম, সময়টা ছিল বোধহয় আশ্বিনের কাছাকাছি। একটু আগে জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিক্টোরিয়ার পুকুরধারে কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছি। দিন প্রায় শেষ, এখন মেঘ বা বৃষ্টি কিছু নেই। আকাশ সনাতন শারদীয় নীল আভায় ঝলমল করছে। সারা দুপুর গুমোট ছিল, এখন বৃষ্টির পর ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, সেই হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডার আমেজ মিশে আছে, টের পাওয়া যাচ্ছে শীতকাল আর খুব বেশি দূরে নয়।

আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলাম বেঞ্চিটায়। এমন সময় মেরুন রঙের সফরিস্যুট পরিহিত শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক এসে হাত জোড় করে নমস্কার করে বিনীত হিন্দিতে 'রাম, রাম, পণ্ডিতজি' বলে আমার অনুমতি চাইলেন আমার পাশে বসার জন্যে।

বুঝতে পারলাম খুবই খানদানি লোক, তা না হলে সরকারি বাগানের বারোয়ারি কাঠের বেঞ্চের শূন্য আসনে বসার জন্যে কেউ কারো কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে?

আমি আর অনুমতি কি দেব, একটু সরে বসে আমার নিঃশব্দ অনুমোদন জানালাম। ভদ্রলোক আমার পাশে বসে দিনশেষের ক্ষীণ আলোয় প্যান্টের পকেট থেকে একটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বাংলা যৌনরহস্যের পত্রিকা বার করে পড়তে লাগলেন। পত্রিকাটির প্রচ্ছদটি খুব চটকদার, একটি অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী এলোচুল রমণী বিবস্ত্র বসনে কোলবালিশ বুকে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, তার পাশে বড় বড় রক্তাক্ষরে লেখা আছে এবারের প্রচ্ছদকাহিনী : 'ব্যভিচারের বলি বিশাখা'।

তা হলে ভদ্রলোক বাঙালি, কিন্তু আমাকে ঠাউরেছেন অবাঙালি, একেবারে 'পণ্ডিতজি'। কয়েকদিন আগে কসাইরা শেঠজি বলেছিল। আজ এই ভদ্রলোক পণ্ডিতজি বললেন। মনে মনে ঠিক করলাম বিউটিবালার রেশমি পাঞ্জাবি পরে আর রাস্তায় বেরোব না।

তবে ভদ্রলোক যেহেতু বাঙালি এঁকে একটু আত্মপরিচয় দেওয়া অনুচিত হবে না এই

ভেবে তাঁকে আমি সাদা বাংলায় বললাম, 'আপনি কি নতুন? আপনাকে তো এর আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখেছি বলে মনে হয় না।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন এবং সেই সঙ্গে অতি দ্রুত এবং সন্তর্পণে যৌন রহস্যের কাগজটি প্যান্টের পকেটে চালান করলেন। তারপর কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'আরে, বড়দা, আপনি বাঙালি? কলকাতায় তা হলে এখনও বাঙালি আছে?'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, নাম নিবারণ দত্ত। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এক ছেলে সেও বিদেশে, হিউসটনে অয়েল কোম্পানির একজিকিউটিভ।

দত্তমশায় বড় সরকারি কাজ করতেন, বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, এখন রিটায়ার করে কলকাতায় বসবাস করতে এসেছেন। অনেকদিন আগেই টাকা জমা দেওয়া ছিল ক্যামাক স্ট্রিটের এক বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের জন্যে, টাকাটা বিদেশ থেকে ছেলেই পাঠিয়েছিল। কি সব আইনঘটিত গোলমালে ফ্ল্যাটটা পেতে বেশ দেরি হয়, মাত্র কিছুদিন আগে হাতে পেয়েছেন এবং স্বামী-স্ত্রী সেখানে এসে উঠেছেন। সংসারে আর কেউ নেই।

দিল্লি থেকে কলকাতার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সরল বিশ্বাসে ফ্ল্যাটের টাকা পাঠিয়েছিলেন নিবারণবাবু, তখন বুঝতে পারেননি ফ্ল্যাট কেনা আর ফ্ল্যাটে ঢোকা এক জিনিস নয়। তার চেয়েও বড় কথা তিনি জানতেন না যে এসব অঞ্চলে আজকাল বাঙালি প্রায় থাকেই না, বিশেষত এসব অঞ্চলের ফ্ল্যাটে যাদের কালো টাকা বা বিদেশী অর্থ নেই তাদের পক্ষে মাথা গলানো অসম্ভব।

নিবারণবাবুর ফ্ল্যাটবাড়িটা আমি চিনি, আমার বাড়ির কাছেই। কি এক অজ্ঞাত কারণে বাড়িটার নাম জতুগৃহ। যাঁরা কিংবা যিনি এই নামকরণ করেছিলেন তাঁরা বা তিনি অবশ্যই অতি প্রতিভাবান, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লোক। কিন্তু জতুগৃহ নামক বাড়িতে নিবারণবাবুর মত যাঁরা ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁরাও অবশ্যই অসমসাহসী। তাঁদের প্রত্যেককে প্রজাতন্ত্র দিবসে পরমবীর চক্র দেওয়া উচিত।

নিবারণবাবুর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ হল। খুব বিষয়ী এবং সাবধানী লোক। তবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার একটা অসুবিধে এই যে তাঁর প্রায় সব কথাবার্তাই ওই ফ্ল্যাটবাড়ি নিয়ে।

কয়েকদিন আগে দূরদর্শনে জ্বলন্ত চিত্র দেখিয়েছে দিল্লির একটি বহুতল বাড়িতে আগুন লাগার দৃশ্য। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের দৌড়োদৌড়ি, লেলিহান অগ্নিশিখা—সেসব দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন নিবারণবাবু, জতুগৃহ নামটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন।

এই ফ্ল্যাটবাড়ির প্রমোটর হলেন মেসার্স জে এল আগরওয়ালা অ্যান্ড কোম্পানি। আমার পরামর্শমত আগরওয়ালা কোম্পানির কাছে বাড়ির নামবদলের জন্যে নিবারণবাবু দরখাস্ত পাঠালেন। তাঁর চিঠি পেয়ে আগরওয়ালা কোম্পানি একদিন নিবারণবাবুকে অফিসে দেখা করতে অনুরোধ করল।

নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে নিবারণবাবু জে এল আগরওয়ালা অর্থাৎ কোম্পানির কর্ণধারের দেখা পেলেন না বটে, তবে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির দেখা পেলেন। সুখের বিষয় প্রাইভেট সেক্রেটারিটি বাঙালি, বিশদভাবে বলা উচিত মধ্যবয়সিনী, লাস্যময়ী বাঙালিনী।

হাই হিল, বব চুল, গোলগাল শক্তসমর্থা, আদ্যনাম অফিসে কেউ জানে না, সেখানে সবাই মিসেস সেন বলে জানে।

মিসেস সেনকে নিবারণবাবু 'জতুগৃহ' নামে তাঁর আশঙ্কা ও আপত্তির কারণ বিশদভাবে জানালেন। মিসেস সেন তাঁর সুচিক্কণ আঁকা ভুরু নাচাতে নাচাতে এবং বুকের ওপর থেকে লাল জর্জেট শাড়ির আঁচল পাঁচবার ফেলে এবং চারবার তুলে অতিশয় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

নিবারণবাবু জতুগৃহ নামের মহাভারতীয় উপাখ্যান এবং তৎসহ সাম্প্রতিক দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের কাহিনী সবিস্তারে বললেন।

বিনিময়ে মিসেস সেন একটা দীর্ঘ হাই তুলে শেষ বারের মতো বুকের আঁচলটা তুলে বললেন, 'আপনি গোড়াতেই ভুল করেছেন।'

মাঝে মাঝে হাইহিল জুতোসুদ্ধ চরণকমলদ্বয় নাচাচ্ছিলেন মিসেস সেন, সেদিকে অর্থাৎ গোড়ার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন, 'মানে?'

মিসেস সেন পা নাচনো থামিয়ে বললেন, 'আপনার ওই মহাভারত-টহাভারতের ব্যাপার নেই এর মধ্যে। আমাদের কোম্পানির কেউ কোনওদিন মহাভারত পড়েনি। সময় কোথায়? এমনকি টিভিতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহবণের দৃশ্য দেখার সময় পাওয়া যায়নি। মিস্টার আগরওয়ালা সে সব সিন ভিডিয়োতে তুলে রেখেছেন, সময় পেলে অবসরমত দেখবেন।' বুকের আঁচল আরেকবার ফেলে দিয়ে আবার পা নাচানো আরম্ভ করে মধুর হেসে মিসেস সেন যোগ করলেন, 'মিস্টার আগরওয়ালা বলেছেন তখন আমাকেও দেখাবেন।'

বস্ত্রহরণের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নিবারণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন, এবার আর মিসেস সেনের পদপ্রান্তে নয়, মেঝেতে চোখ রেখে নিবারণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে জতুগৃহ নাম কি জন্যে?'

মিসেস সেন বললেন, 'আমাদের মালিক, মিস্টার আগরওয়ালা, জে এল আগরওয়ালা সাহেব, ওঁর পুরো নাম হলো জতুলাল আগরওয়ালা।' জতুলাল সাহেবের বাড়ি, তাই নাম দেওয়া হয়েছে জতুগৃহ।'

বাড়ির নামকরণের কারণ বোঝা গেল। কিন্তু নিবারণবাবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আমি একদিন তাঁর বাড়িতে গেছি। তিনি দুদিন আমার বাড়িতে এসেছেন। এবং আজকাল প্রায় প্রত্যেক সকালেই ব্রিগেডে প্রাতঃভ্রমণে তিনি আমার সঙ্গী। ছুটির দিনের সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়ায়ও তাঁকে পাশে পাই।

যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তিনি তাঁর ফ্ল্যাট নিয়ে গজগজ করেন, বলেন, 'আগে জানলে কলকাতায় বাস করতে আসতুম না। সেই যদি অবাঙালিদের সঙ্গেই থাকব, তাহলে তো দিল্লিতে বা বোম্বাইতেই থাকতে পারতুম।'

শুধু বাঙালীর অভাবই নয়, 'জতুগৃহে' অন্যান্য সমস্যাও আছে। লোডশেডিংয়ের সময় লিফটের জেনারেটার চালু থাকার কথা কিন্তু তা থাকে না। একদিন নিচের তলায় পৌঁছাতে যখন মাত্র দেড় ফুট বাকি, লোডশেডিংয়ে লিফট আটকিয়ে যায়, নিবারণ দত্ত পাকা দেড় ঘণ্টা বন্দী থাকেন সেই আলোবাতাসহীন অন্ধকূপে, নিজের আবাস থেকে নিতান্ত দেড় ফুট দূরত্বে।

আরেকদিন জলের পাম্প খারাপ হয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা জল পেলেন না। এককে বালতি জল দশ টাকা করে কিনতে হল তাঁর তেরোতলার ফ্ল্যাটে তুলে দেওয়ার জন্যে। জতুগৃহের কড়া আইন জলের বালতি নিয়ে লিফটে ওঠা যাবে না। সুতরাং দশ টাকা মজুরি বালতি প্রতি বেশি বলা চলে না।

সামনের দরজার শৌখিন মৎস্যমুখী ছিটকিনি একদিন রাতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে খুলে গেল। সদর দরজা বন্ধ করতে পারা গেল না, সদর দরজা খোলা রেখে তো আর রাতে ঘুমোনো যায় না। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঠেলাঠেলি করে একটা সোফা এনে দরজায় ঠেকা দিয়ে সেই সোফার ওপর শুয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন সকালে প্রতিবেশীদের একথা জানাতে তাঁরা সমস্বরে নিবারণবাবুকে বললেন, 'এখানে তো আমরা সবাই নিজের ছিটকিনি, কড়া, এমন কি কেউ কেউ জানলা, দরজা, বাথরুম পর্যন্ত নিজের মত করে নিয়েছি। আপনারও তাই করা উচিত ছিল, প্রমোটার আর কত করবে?'

সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে নিবারণবাবুর সব ফ্ল্যাট একই রকম দেখতে বলে। একদিন ভুল করে একতলা বেশি উঠে হনহন করে নিজের ফ্ল্যাট ভ্রমে এক প্রমত্তা গুজরাটি যুবতীর শয়নকক্ষে ঢুকে পড়েছিলেন। যুবতীটি মুডে না থাকলে সেদিন নির্ঘাৎ শ্লীলতাহানির চেষ্টায়, অন্তত বেআইনি প্রবেশের দায় নিবারণবাবুর ঘাড়ে ঠিক চাপত।

অবশ্য নিবারণবাবু নিজেব ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে জিব কেটে 'সরি, ভেরি সরি' বলে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তবে এখনো লিফটে, সিঁড়িতে বা উঠোনে সেই সদাহাস্যময় গুজরাটি বধূটির সঙ্গে দেখা হলে নিবারণবাবুর বুক ঢিপঢিপ করে।

তাতেও কোনওরকমে চলে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। ভবানীপুরের নবনির্মিত বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি নিমেষের মধ্যে তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়ল। বহু লোক হতাহত হল। খবরের কাগজে, দূরদর্শনে, বেতারে হইচই, কেলেঙ্কারি। পুলিশ, করপোরেশন, সরকার সবাই মিলে তুমুল শোরগোল, কাদা মাখামাখি।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে নিবারণ দত্তমশায কেমন যেন ঘাবড়িয়ে গেলেন। দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের জতুগৃহ ভেঙে পড়বে না তো মশায়? শেষে আপনাদের কলকাতায় এসে ধনেপ্রাণে বিনাশ হব মশায়?' এ সব প্রশ্নের আমি আব কি উত্তর দেব? কিন্তু দত্তমশায়ের মাথায় জটিলতর জিজ্ঞাসা উঁকি দিল। তিনি থাকেন চৌদ্দতলা বাড়ির তেরোতলায়। তাঁর জ্ঞাতব্য হল, বাড়ি যদি সত্যিই ধ্বসে বা ভেঙে পড়ে তবে ওপরের দিকের লোকদেরই বেশি বিপদ, বেশি জীবনসংশয় নাকি নিচের দিকের লোকদের।

আমি নিবারণবাবুকে পাঠালাম আমার পরিচিত এক স্থপতি মানে আরকিটেকটের কাছে। তাঁর অভিজ্ঞতা আছে এ ধরনের বাড়ি বানানোর, তিনি যদি কিছু বলতে পারেন।

কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। অন্য এক গৃহপতনের মামলায় আদালত থেকে অগ্রিম জামিন নিয়ে তিনি কিছুদিন হল নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পুলিশই তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না, নিবারণবাবু আর তাঁকে পাবেন কি করে?

আজকাল নিবারণ দত্ত সস্ত্রীক যথাসম্ভব বাড়ির বাইরে থাকেন। দৈনিক নুন শো থেকে নাইট শো চারটে করে সিনেমা দেখছেন। গভীর রাত পর্যন্ত চোর ডাকাত, ছিনতাই পার্টি অগ্রাহ্য করে দত্ত দম্পতি ময়দানে, পার্কে ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। গভীর রাতে ঘুমের

জন্যে প্রাণ হাতে করে কয়েক ঘন্টার জন্যে বাসায় ফেরেন। খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত বাড়ির বাইরে সারেন।

নিবারণবাবু আমাকে বললেন, 'যতক্ষণ বাসায় থাকি, এমনকি ঘুমের মধ্যেও হাত মুঠো করে রাখি।' কথাটা আমার চেনা, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?' এত দুঃখের মধ্যেও নিবারণবাবু বললেন, 'প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখি কি না?'

শুধু নিজের বাড়ি সম্পর্কে ভয় নয়, আজকাল নিবারণবাবু কোথাও কোনও উঁচু বাড়ি দেখলে তার ধারেকাছে ঘেঁষেন না। যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন, কখন মাথার ওপর ভেঙে পড়বে কে জানে?

নিবারণবাবুর মাথার ওপর অবশ্য বাড়ি ভেঙে পড়ল না। কিন্তু সত্যি সত্যি যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

'জতুগৃহ' হল পাশাপাশি একজোড়া চৌদ্দতলা বাড়ি, একই কম্পাউন্ড, একই গেট, দুটো বাড়ির মধ্যে কুড়ি ফুট ব্যবধান। কি এক নৈসর্গিক কিংবা অনৈসর্গিক কারণে হয়তো বিশেষ পারস্পরিক আকর্ষণেই বাড়ি দুটি পরস্পর পরস্পরের দিকে ক্রমশ হেলতে শুরু করল।

প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি কেউ, তেমন বোঝাও যায়নি কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে সকলের নজরেই পড়ল ব্যাপারটা, বাড়ি দুটির ছাদ পরস্পরের খুব কাছে চলে এসেছে।

ওপরের দুই চৌদ্দতলার মধ্যে দূরত্ব কুড়ি ফুট থেকে কমতে কমতে বারো, দশ, আট, অবশেষে দুই ফুটে এসে দাঁড়াল। অবশ্য দুটি বাড়ির মধ্যে ব্যবধান অনিবার্য কারণেই এখন বিশ ফুট।

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বাড়ি দুটোর ছবি ছাপা হল। বি বি সি চ্যানেল চার না পাঁচ থেকে টেলিভিশনের আলোকচিত্রী এসে জতুগৃহের ছবি তুলে সারা পৃথিবীর লোককে দেখাল। ফরাসি খবরের কাগজে 'অষ্টম আশ্চর্য' ক্যাপশন দিয়ে পিসার হেলানো স্তম্ভের এবং হেলানো জতুগৃহের ছবি পাশাপাশি ছাপা হল।

নিবারণবাবুর বিবাহিত কন্যারা প্রবাসে থাকে। তারা টেলিগ্রাম পাঠাল 'ভ্যাকেট জতুগৃহ, কাম শার্প।' ছেলে সুদূর টেকসাসে হিউস্টন শহর থেকে ফোন করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়িতেই কি তোমরা আছ?'

আছেন বটে নিবারণবাবু কিন্তু বড়ো কঠিন হয়ে গেছে ব্যাপারটা। বাড়ি দুটির মাথা এখন সম্পূর্ণ একত্র হয়ে গেছে। মাতালেরা যেমন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সেইরকম অবস্থা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দুই অতি দীর্ঘকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তু পরস্পর গুঁতোগুঁতি করছে।

এদিকে বাড়ির মেঝে কাত হয়ে গেছে। চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি সব কাত। কাত হওয়ার জন্য লিফট আর উঠছে না, সিঁড়ির গর্তে কোনাকুনি ভাবে আটকিয়ে গেছে।

বাড়িতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কিছু গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। টেবিল থেকে চিনেমাটির পেয়ালা, পিরিচ, কাঁচের গেলাস ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে। বইয়ের র‍্যাক বই সমেত গড়াগড়ি খাচ্ছে। আলমারি খুললে তাকের ওপর থেকে ভেতরের জিনিসপত্র নিচে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমন কি ঘুমন্ত মানুষ হেলানো খাট থেকে পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাচ্ছে। জেগে থাকা অবস্থায় খাটে শুয়ে

থাকতে হলে খাটের বাজু আঁকড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

জতুগৃহের অধিবাসীরা একে একে বাক্স-বিছানা, আসবাবপত্র এবং মূল্যবান প্রাণ নিয়ে যে যার সাধ্যমত পলায়ন করল। যে যেরকম দামে পারে ফ্ল্যাট বেচে দিতে লাগল। কেনার দাম ছিল সাড়ে আট লাখ টাকা, এখন বেচার সময় দাম পড়তে পড়তে তিরিশ হাজারে নেমে এল।

পাড়ায় থাকি, সব খবরই পাই। কিন্তু নিবারণবাবুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। ধরে নিয়েছিলাম তিনিও পলায়ন করেছেন। কিন্তু হঠাৎ সেদিন রাস্তার মোড়ে দেখা।

দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি খবর? আপনি এখনও আছেন?'

নিবারণবাবু বললেন, 'আছি মানে কি? চমৎকার আছি। সব ছেড়ে যাওয়া খালি হওয়া ফ্ল্যাট আমি কিনে নিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ! এ সব কি করছেন? আপনার শরীর মানে মাথা ঠিক আছে তো? এ তো জীবন নিয়ে খেলা, আপনার ছেলেকে জানিয়েছেন সব ব্যাপার?'

নিবারণবাবু হাসলেন, হেসে বললেন, 'জানাব কি? ছেলের পরামর্শেই তো সব কিছু করছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পরামর্শ? আপনার ছেলে এ ব্যাপারে কি পরামর্শ দিয়েছে?'

নিবারণবাবু বললেন, 'এ বাড়ি নিয়ে আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে গেছে। আমার ছেলে এ বাড়ির ফ্ল্যাটগুলো আমেরিকায় ধনকুবেরদের কাছে 'অষ্টম আশ্চর্য—কলকাতার হেলানো ফ্ল্যাট' (Leaning flats of Calcutta) নামে একেকটা পাঁচ-ছয় লাখ ডলারে বেচছে, যার মানে আমাদের টাকায় প্রায় এক কোটি টাকা।'

আমি বললাম, 'তারপর।'

নিবারণবাবু বললেন, 'তারপর আর কি? কোটিপতি হয়ে যাব। এ বাড়িতে থাকি ভালো, না থাকি যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। আর থাকলেই বা অসুবিধে কি? আগেও অবাঙালীর সঙ্গে ছিলাম, এখনও তাই থাকব। এরা তবু মন্দের ভালো, খাঁটি সাহেব, কুলীন মার্কিনী সাহেব।'

বিষ

বাংলা গল্পের ইংরেজীতে নাম দেওয়া মোটেই উচিত নয়। তাই বাধ্য হয়ে এ গল্পের নাম দিতে হল 'বিষ'। না হলে গল্পটির প্রকৃত নাম হয় পয়জন (Poison), অবশ্য ইংরেজী শব্দটি বাংলা হরফে 'পয়জন' লিখলেও চলত। তবে শব্দটা গল্পের নাম হিসেবে চোখে ভাল লাগছে না। তাই অগত্যা 'বিষ', বিষই বা খারাপ কি?

গল্পের ভিতর যাতে কোনও অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি না হয় তাই পয়জনের ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

'পয়জন' একটি জগৎবিখ্যাত সুরভির নাম। আগেকার দিনে যেমন সুগন্ধির নামকরণে প্রস্তুতকারকেরা প্রায়ই কিছুটা, কোথাও বা চূড়ান্ত রোমান্টিকতা দেখাতেন যেমন 'ইভনিং ইন প্যারিস' বা প্যারিসের সায়াহ্ন অথবা প্রগাঢ় 'ইনটিমেট'।

এখনকার প্রচলিত বিদেশি সুরভিগুলোর নাম আর তেমন মধুর রোমান্টিক নয় বরং উল্টো, তীব্র তীক্ষ্ণ সেই সব নাম। ব্ল্যাক উইডো, ব্রুট বা পয়জন এসব নাম দেখে অনুমান করাই কঠিন এগুলো প্রসাধন সামগ্রী, গন্ধদ্রব্য। কাউন্টারে আনকোরা ক্রেতারা এসব নাম দেখে কখনও কখনও যে ভড়কিয়ে যায় না তা নয়।

আপাতত এই ক্ষুদ্র গৌরচন্দ্রিকার পরে আমরা আসল কাহিনীতে সরাসরি প্রবেশ করছি।

স্মৃতিশেখর দত্ত উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাজ্যের একটি ভুবনবিদিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের গবেষক। তাঁর বিষয় হল ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান। পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার সীমান্ত এলাকায় তাঁর কলা গাছের ফলের মধ্যে তাপ লেগে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ফল পাকে, সেই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় কিনা এই নিয়ে স্মৃতিশেখর গত সাড়ে দশ বছর গবেষণা করছেন। এই গবেষণায় যদি তিনি সফল হতে পারেন তাহলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ফল উৎপাদন দ্বিগুন, তিনগুন হারে বেড়ে যাবে। এবং সেই সঙ্গে স্মৃতিশেখর নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন।

স্মৃতিশেখরের বয়স চুয়াল্লিশ। আজ প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি মার্কিন দেশে আছেন। তিনি কলকাতারই ছেলে, কলকাতা থেকেই বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর দু-চারজন পুরনো বন্ধুবান্ধব, দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় তাঁর আর কেউ নেই। মা বাবা উভয়েই বেশ কিছুদিন হল বিগত হয়েছেন। থাকার মধ্যে এক দিদি আছেন, তাঁর জমজমাট সংসার বর্ধমানে।

স্মৃতিশেখর মুক্ত পুরুষ। বছর পনের আগে একবার কলকাতায় এসে বিয়ে করেছিলেন। তখন মা বাবা বেঁচে ছিলেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পাত্রী যাচাই করে, গড়িয়াহাট রোডে বিশাল বাড়ি ভাড়া করে, দেশাচার কালাচার পালন করে, শাস্ত্রসম্মতভাবে স্মৃতিশেখরের বিয়ে হয়েছিলো। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বিদূষী, সুলক্ষণা, সর্বগুণসম্পন্না, গৃহকর্মনিপুণা ইত্যাদি রবিবারের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপিত পাত্রীর যা যা যোগ্যতা থাকে স্মৃতিশেখরের স্ত্রী প্রিয়ংবদার সে সবই ছিল।

তবে কিছুদিন সংসার করার পর স্মৃতিশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী আর যাই হোক না কেন প্রিয়ংবদা নন। প্রবাসে কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে সামান্য বিশ্রাম ও শ্রান্তির সময়ে প্রায় অকারণে প্রিয়ংবদার কর্কশ ও নিষ্ঠুর বাক্যবাণ স্মৃতিশেখরের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

প্রিয়ংবদার রাগ হয়ত অকারণ ছিল না। মার্কিন শহরতলীতে নির্জন, বন্ধ বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে খিটখিটে করে তুলেছিল। এমনিই আশৈশব তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। তাছাড়া মার্কিনীদের কথা বোঝার অপারগতা এবং সেইসঙ্গে ইংরেজীতে মৌখিক কথাবার্তা চালানোর অভ্যাস না থাকায় প্রিয়ংবদা বিদেশে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম দু-চার মাস সাহেবি জীবনধারার চটক ও চমক দেখে এবং মধুচন্দ্রিমার আমেজে মোটামুটি ভালই ছিলেন প্রিয়ংবদা কিন্তু পরে অস্থির হয়ে পড়লেন। সেই অস্থিরতা প্রকাশিত হল স্মৃতিশেখরের প্রতি ব্যবহারে।

আরও একটা কারণ এখানে উল্লেখ করে রাখা উচিত। অনেকদিন ওদেশে থাকার

ফলে নিজের প্রতিষ্ঠানে এবং বাইরে স্মৃতিশেখরের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবী হয়ে ছিল, সাহেবমেম, ভারতীয় সব রকমই।

প্রথম থেকেই এদের কাউকেই প্রিয়ংবদা মোটেই সহ্য করতে পারেননি। তাঁর কেমন সন্দেহ হয়েছিল এরা সবাই তাঁকে করুণার চোখে দেখে। এবং সন্দেহটা ঠিকই ছিল। সবাই ভাবত স্মৃতিশেখরের মত ব্রিলিয়ান্ট লোক কি করে এমন সঙের পুতুলের মত শাঁখা, সিঁদুর পরা মেয়ে সম্বন্ধ করে বিয়ে করে নিয়ে এল।

অবশেষে যা অনিবার্য তাই ঘটল। একটা সদ্য দেশ থেকে আসা বাঙালী ছেলে তারও প্রিয়ংবদার মত একঘরে অবস্থা। তবে তার একটা কাজ আছে এই যা তফাৎ। অচিরেই সেই ছেলেটি আর তার প্রিয়ংবদা বৌদি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। সময়ে অসময়ে ছুটির দিনে সে যথাসাধ্য প্রিয়ংবদা বৌদিকে সঙ্গদান করতে লাগল।

একদিন অতিরিক্ত সঙ্গদান করার সময়ে স্মৃতিশেখর হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। তখন স্মৃতিশেখরের মুখ দর্শন করার অবস্থা প্রিয়ংবদার ছিল না। তিনি দয়িতের সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক বস্ত্রে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন।

তারপরে প্রিয়ংবদার কোন খোঁজখবর স্মৃতিশেখর নেননি। দেশ থেকে প্রিয়ংবদার নামে কখনও দুয়েকটা চিঠিপত্র প্রথম দিকে এসেছে, সেগুলো 'প্রাপক অনুপস্থিত' লিখে পরের ডাকে প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মুক্ত জীবন স্মৃতিশেখর মেনেই নিয়েছিলেন। এখানে বহুলোক এবকম জীবন যাপন করে। কিন্তু গত বছর দেশ থেকে দিদি এসেছিলেন তাঁর কাছে বেড়াতে। স্মৃতিশেখরই দিদিকে একটা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে ছিলেন।

স্মৃতিশেখর এক মেমসাহেবের সঙ্গে তখন যুগ্ম জীবনযাপন করছিলেন। মাস দুয়েকের জন্যে সেই মেমসাহেবকে তিনি অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দিদি আসার পরেও সেই মেমসাহেব মাঝেমধ্যেই আসত, রাতে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করত।

বুদ্ধিমতী অগ্রজাব দৃষ্টি এড়াতে পারল না এই ব্যাপারটা। দিদি স্মৃতিশেখরকে বললেন, 'ঐ ক্যারল না কি নাম ঐ মেয়েটার, ওর বয়েস কত?'

স্মৃতিশেখর ক্যারলের এ দিকটা কখনও ভেবে দেখেননি, আমতা আমতা করে অনুমানে বললেন, 'তা বোধহয় পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন হবে।'

দিদি তাই শুনে বললেন, 'এ কি অলক্ষুণে কথা। তাহলে তো ওর বয়েস আমার চেয়ে বেশি।'

মূল মার্কিন ভূখণ্ডে এ জাতীয় কথা খুব বেশি হয় না। স্মৃতিশেখর কি আর বলবেন, চুপ করে রইলেন।

স্মৃতিশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দিদি চেপে ধরলেন, 'এ ভাবে চলবে না। এ কি অনাচার। পশুর জীবন! তুই আবার বিয়ে কর।'

স্মৃতিশেখর সহজে রাজী হননি। অনেক দোনামনা করে আগের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা দিদিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনেক কথা বললেন তিনি। তাছাড়া বয়েস বাড়ার ব্যাপারটা রয়েছে।

দিদি বললেন, 'তোর আর কি বয়েস হয়েছে। তুই এবার দেশে আয়। এবার আর ভুল হবে না। এবার তোর যোগ্য, উপযুক্ত মেয়ে দেখে রাখব।'

স্মৃতিশেখর বললেন, 'আমি বছরখানেকের মধ্যে এখানকার পাট গুটিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। গবেষণা ঢের হয়েছে, বয়েসও বেড়ে যাচ্ছে। তখন দেশে ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করার কথা ভাবা যাবে।'

স্মৃতিশেখর ভেবে দেখেছেন গত কয়েক বছর ধরে তাঁর গবেষণা প্রায়ই একই জায়গায় ঠেকে রয়েছে, হঠাৎ নতুন করে আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। হাতে যে পরিমাণ ডলার জমেছে তা ছাড়া বাড়ি, গাড়ি বেচে যা পাওয়া যাবে ভারতীয় টাকায় তার পরিমাণ অকল্পনীয়। সে টাকায় কলকাতায় সবচেয়ে ভাল ফ্ল্যাট কিনে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে তার সুদে একটা জীবন চমৎকার কেটে যাবে।

সেই চমৎকার জীবন কাটানোর জন্যে অবশেষে স্মৃতিশেখর দেশে ফিরে এসেছেন। আগেই দক্ষিণ কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বায়না করে রেখেছিলেন এক বন্ধুর মারফত। এখন ফিরে এসে টাকা পয়সা মিটিয়ে, ফার্নিচার কিনে সাজিয়ে গুছিয়ে সেই ফ্ল্যাটে উঠেছেন।

অতঃপর দিদির বুদ্ধিমত ও পছন্দমত একটি বয়স্কা পাত্রীও সংগ্রহ হয়েছে।

বছর চল্লিশ বয়েস হবে হিমানী নামে এই পাত্রীটির। বিবাহ ব্যাপারে হিমানীর অভিজ্ঞতা বিস্তর। বছর দুয়েক আগে ডিভোর্স হয়েছে স্বামীর সঙ্গে। তার আগে একবার বিধবা হয়েছিলেন। তবে প্রথম বিয়েটার কথা সবাই জানে না, স্মৃতিশেখরের দিদিও জানেন না। তিনি খবরের কাগজে 'উদার মতাবলম্বী, সংস্কারমুক্ত পাত্র চাই। পাত্র নিজেও যোগাযোগ করিতে পারেন' এই বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিলেন।

হিমানী গায়ে গতবে শক্ত সমর্থা, আঁটোসাটো মেয়েমানুষ। একটি সওদাগবি দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করেন। বহুদর্শী রমণী এবং একটু দুশ্চরিত্রাও, সেটা অবশ্য হিমানী মনে করেন তাঁর চাকরির অঙ্গ।

স্মৃতিশেখর-জাতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে হিমানীর অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর অফিসেও ওপরওয়ালাদের মধ্যে দুয়েকজন বিলেতফেরত গবেষক, তার মধ্যে একজন রীতিমত লম্পট। হিমানী তাঁকেও কখনও কখনও সাহচর্য দিয়েছেন।

এই হিমানীদেবীর সঙ্গে স্মৃতিশেখর দত্তের বিয়ে আজ দুপুরেই রেজিস্ট্রি হয়েছে, নিতান্ত সাদাসিধেভাবে আজ স্মৃতিশেখরের দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে বিবাহরজনী তথা ফুলশয্যা পালিত হচ্ছে।

স্মৃতিশেখরের দিদি-জামাইবাবু, ভাগ্নে-ভাগ্নিরা দিনের বেলায় এসেছিল, তারা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বর্ধমান ফিরে গেছে। হিমানীর অফিসের কেউ কেউ আর এক ছোটভাই এসেছিল, স্মৃতিশেখর নিজে থেকে কাউকে বলেননি। নব দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হিমানীর লোকেরাও কিছু আগে বিদায় নিয়েছে।

শূন্য ফ্ল্যাটে এখন শুধু হিমানী আর স্মৃতিশেখর।

স্মৃতিশেখর বহুদিন মার্কিন দেশে থাকলেও সাধারণত মদ্যপান করেন না। বিমানবন্দরে সস্তায় কেনা এক বোতল কনিয়াক ছিল তাঁর কাছে, সম্পূর্ণ অটুট।

আজ এই মধুর সন্ধ্যায় তিনি সেই পানীয়ের বোতল খুলে বসলেন। দেখা গেল, সুপানীয়ে হিমানীর অরুচি নেই।

শৌখিন জাফরিকাটা ফিকে নীল বিলিতি কাচের গেলাসে বরফকুচি দিয়ে সোনালী

কনিয়াক খেতে খেতে খুবই অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন স্মৃতিশেখর ও হিমানী। অনেক গোপন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হল তাঁদের মধ্যে। দুজনেই কিঞ্চিৎ বেশি মদ্যপান করে ফেললেন।

স্মৃতিশেখর তাঁর দুঃখময় প্রাক্তন দাম্পত্যজীবনের কাহিনী করুণভাষায় ব্যক্ত করলেন। সে গল্প শুনে হিমানীর চোখে জল এল। বিশেষ করে মত্ত স্মৃতিশেখর যখন বললেন, 'এবারে যদি তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের না হয়, তিনি আত্মহত্যা করবেন।' এবং এই বলে সত্যিই যখন স্মৃতিশেখর হিমানীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, কিছুটা আবেগের আতিশয্যে কিছুটা কনিয়াকের প্রভাবে হিমানী কেমন গোলমাল হয়ে পড়লেন।

কথায় কথায় হিমানী তাঁর প্রাক্তন দুই পতিদেবতার গল্প এবং কখনও সখনও অল্পসল্প নৈতিক পদস্খলনের কাহিনী স্মৃতিশেখরকে শোনালেন। কিন্তু স্মৃতিশেখর তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাঁর এই গল্প শুনতে শুনতে কখন যে স্মৃতিশেখর ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মধুযামিনীতে সহধর্মিণীকে উপহার দেওয়ার জন্য 'পয়জন' নামক মহার্ঘ সুরভি, সেও বিমানবন্দরে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনা, এক শিশি বালিশের নিচে রেখেছিলেন স্মৃতিশেখব।

স্মৃতিশেখরের মাথার চাপে সেই সুদৃশ্য মসৃণ শিশিটা বালিশের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বালিশের ওপর স্মৃতিশেখবের মাথাটা ঠিক করে দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশিটা বিশেষ করে শিশিটার নামের দিকে হিমানীর চোখ পড়ল। এ নামের কোন সুরভি আছে হিমানী তা জানেন না।

মুহূর্তের মধ্যে মত্ত হিমানী ধরে নিলেন স্মৃতিশেখর আত্মহত্যার জন্য সদাই প্রস্তুত। মাতাল অবস্থাতেই তিনি ভাবতে লাগলেন আমার প্রাক্তন জীবনের সেইসঙ্গে চরিত্রের দোষের যে সব কথা বলে ফেললাম ঘুম থেকে উঠে সে সব মনে পড়লে স্মৃতিশেখর হয়ত তখনই ঐ পয়জন খেয়ে সুইসাইড করবে।

কনিয়াকের বোতলে তখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। দুশ্চিন্তা করতে কব'ত বোতল থেকে সরাসরি ঢক্‌ঢক্ করে পান করতে লাগলেন হিমানী। অবশেষে তাঁর ভাবনাচিন্তা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে একটা ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিলেন হিমানী। মরতে যদি হয় আমিই মরব, আমার এই অপবিত্র নারীদেহ থাকা না থাকা সমান। স্মৃতিশেখরের মত ভাল লোকটাকে মরতে দেওয়া যায় না।

মাতালের যেমন চিন্তা তেমন কাজ। মুহূর্তেব মধ্যে বালিশের পাশে হাত দিয়ে পয়জনের শিশিটা তুলে নিয়ে, একটু কষ্ট করে ছিপিটা খুলে পুরো শিশিটা নিজের গলার মধ্যে ঢেলে দিলেন হিমানী। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আর্ত চেঁচানি বেরিয়ে এল তাঁর গলা দিয়ে।

সেই আর্তনাদে স্মৃতিশেখরের নেশা কেটে গেল। তিনি ধড়পড় করে উঠে বসলেন, দেখতে পেলেন মেঝেতে শূন্য পয়জনের শিশি গড়াগড়ি যাচ্ছে আর মহামূল্য সুরভি হিমানীর ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কেমন গ্যাঁজলা বেরচ্ছে।

স্মৃতিশেখর বুদ্ধিমান লোক। একটু সময় লাগল ব্যাপারটা অনুধাবন করতে। তারপর হিমানীর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে লাগলেন। হিমানীর মুখ থেকে দরদর করে

বেরিয়ে বিশ্ববিখ্যাত সুরভির গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠল ফ্ল্যাট গৃহ। সেই মধুযামিনীর ফুলশয্যা কক্ষে যদি আড়ি পাতা যেত তাহলে দেখা যেত আধো ঘুমে আধো জাগরণে মদিরাময় স্মৃতিশেখর আর সুরভিস্নাতা হিমানী পরস্পরের বক্ষলগ্ন হয়ে কি সব অস্ফুট কথা বলছেন। সারা ঘরে ভুরভুর করছে ভুবনমোহিনী সৌরভ।

একেই বলে বাঁচার মতো বাঁচা

বড় বড় লেখকেরা বাঁচা মরার গল্প লিখে কিংবা উলটো ভাবে বলা যায় মরা বাঁচার কাহিনী লিখে নাম করেন। বাঁচা মরার গল্প খুব গুছিয়ে লিখতে পারলে, তার মধ্যে আর্থ সামাজিক বীক্ষণ যদি থাকে তবে তো পোয়াবারো, জয়জয়কার।

আমার মতো হালকা গল্প লিখে লেখক সমাজে কলকে পাওয়া অসম্ভব। পুরস্কার-টুরস্কার তো কোনদিনই পাব না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতেও কেউ সচরাচর ডাকে না, এমনকি আমার লেখা বই পর্যন্ত সমালোচকেরা আলোচনা করে হাস্যাস্পদ হতে চান না।

সুতরাং অবশেষে আমি একটা জীবনমরণ প্রতিজ্ঞা করেছি, অন্তত একটা, কমপক্ষে একটা বাঁচা মরার গল্প লিখবই, লিখব।

এই জীবনধর্মী গল্পটি সেই প্রতিজ্ঞারই ফসল।

প্রথমেই কবুল করে রাখি, এই গল্পের নায়কের নাম জীবনচন্দ্র চক্রবর্তী।

সুতরাং গল্পটি, এই ছোট রচনাটি কয়েক মিনিটের মধ্যে পাঠ করার আগে কোনও সমাজ সচেতন, আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তায় চিন্তিত পাঠক যদি কোনও কটু প্রশ্ন তোলেন তাই আগে ভাগেই ব্যাখ্যাটা দিয়ে রাখছি, আর কোনও কাবণে নয়, শুধু এই ক্ষুদ্র কাহিনীর নায়কের নাম জীবন বলেই এটাকে একটা জীবনধর্মী কাহিনী হিসেবে ধবা যেতে পারে।

আমাদের এই খণ্ড কাহিনীর সামান্য নাযক শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবন কাহিনী কিন্তু রীতিমতো রোমাঞ্চকর এবং যথেষ্টই শিক্ষাপ্রদ।

জীবনবাবুর পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল সাবেকি বঙ্গ প্রদেশের ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত ডিহি গজানন নগবের নন্দপুকুব গ্রামে।

স্বাধীনতা মানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে যেটা পার্টিশন, দেশ ভাগ, সেই দুঃখজনক, হৃদয়বিদারক ঘটনার পরেও প্রায় বছর তিনেক জীবনবাবু নন্দপুকুর গ্রামে পিতৃপুরুষের ভিটেয় থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

উনিশশো সতেরো সালে জীবনচন্দ্রের জন্ম। সেই গোলমেলে সাতচল্লিশ সালে তাঁর বয়েস নিতান্ত তিরিশ। কিন্তু বিরাট সংসারেব বোঝা ঘাড়ে।

বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে করেছিলেন জীবনচন্দ্র, তেইশ বছর বয়েসে তাঁর স্ত্রী মারা যান, পিত্রালয় থেকে ফেরার পথে ঝড়ে নৌকোডুবি হয়ে ধলেশ্বরী নদীতে।

কিন্তু তাতে সংসারের দায়দায়িত্ব মোটেই কমেনি। নিজের এবং খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো এবং সেই সঙ্গে পিসতুতো ভাই বোন (এক বিধবা পিসিমা তাঁদের নন্দপুকুর বাড়িতে থাকতেন)। শুধু তুতো ভাইবোনের সংখ্যাই একুশজন, সেই সঙ্গে নিজের বিধবা মা এবং

ঠাকুমা সমেত ঐ সব ভাই বোনদের জনকজননীর সংখ্যা এগারো। এর ওপরে ছিল আসোজন বসোজন।

একেক বেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের পাত পড়ত জীবনচন্দ্রদের নন্দপুকুরের বাড়িতে। এক সময়ে প্রচুর ধান জমি ছিল তাদের, পরবর্তীকালে কাঁচা টাকার লোভে এর কিছু কিছু জমিতে পাট চাষ করা হত। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে সেসব জমির ফসল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

তবু জমিজমা বেচে, কষ্ট করে জীবনচন্দ্র উনিশশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত নন্দপুকুরেই থাকার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে বছরের মারাত্মক দাঙ্গার পরে আর থাকতে পারলেন না। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী স্বজাতি সকলেই ক্রমে ক্রমে দেশ ছেড়েছে। এমনকি এতদিন যারা জীবনচন্দ্রের মুখাপেক্ষী ছিল, তারাও অনেকে একে একে এপারে চলে এল।

অবশেষে জীবনচন্দ্রও একদিন সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সংসারের বাকি যারা অবশিষ্ট ছিল সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। ভিটে বাড়ি, জমি জমা বেচে সামান্য কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল, সেই অর্থের ওপর ভরসা করে সেই সঙ্গে মা-ঠাকুমার গায়ের অবশিষ্ট গয়নাটুকু কলকাতায় এসে স্যাকরার কাছে বাঁধা দিয়ে জীবনচন্দ্র নতুন জীবন শুরু করলেন।

তখন জীবনচন্দ্রের বয়েস মাত্র তেত্রিশ। চাকরি করার বা ব্যবসার অভিজ্ঞতা কিছু নেই, কলকাতা মহানগরী সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা অজানা, দ্বিধাগ্রস্ত ভাব।

যা হক সদর কলকাতায় না থেকে শহরতলি দমদমে ষাট টাকায় একটা ছোট একতলা বাড়ি ভাড়া করে বসবাস শুরু করলেন জীবনচন্দ্র।

টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। এদিকে ঠাকুমা, মা দুজনেই বিগত হয়েছেন। তবুও সংসারে সাত আটটি পুষ্যি এখনও বর্তমান। তাদের বাঁচা মরা সবই এখনও জীবনবাবুর ওপরেই নির্ভর করছে।

অতঃপর শুরু হল জীবনবাবুর জীবন সংগ্রাম।

সে এক ভয়াবহ, অসম লড়াই।

বেঁচে থাকার জন্যে জীবনবাবুকে কী কী করতে হয়েছে তার তালিকা রচনা করতে গেলে সে খুবই দীর্ঘ হয়ে যাবে। তা ছাড়া যে কোনও বুদ্ধিমান লোকই সে সব অনুমান করতে পারেন।

কথায় আছে, অসফল ব্যবসায়ী আলপিন থেকে হাতি সব কিছুর ব্যবসা করার চেষ্টা করে।

ব্যবসা মানে কেনা বেচা। কোনও জিনিস কিনে সেটা বেচা। কেনার দর আর বেচার দর, এই দুইয়ের মধ্যে যত ব্যবধান হবে ততই লাভ।

হাতি কিংবা হাতি জাতীয় দুর্মূল্য, দুর্লভ জিনিস কেনা বেচার অসুবিধে হল যত সহজে কেনা যায় তত সহজে বেচা যায় না। আর ব্যবসার আস রহস্য হল ঐখানে, কেনার পর যত তাড়াতাড়ি বেচা যায়, লাভ যতই কম হক, আবার কেনা-বেচা করা যাবে। আবার লাভ, এই ভাবে পৌনঃপুনিক লাভ এক দফায় লাভের থেকে অনেক বেশি।

এই অর্থে হাতির ব্যবসা কোনও কাজের কথা নয়। যত ছোট, যত কম দামের জিনিস হবে তত সুবিধে।

জীবন সংগ্রামে জীবনবাবু সফল হয়েছিলেন।

তিনি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং সহজেই টের পেয়েছিলেন যে তার পক্ষে বড় কিছুর ব্যবসা ঠিক হবে না। বলা বাহুল্য, তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। তিনি হাতির ব্যবসা করেননি। এবং, শুধু হাতি কেন, তিমি, জিরাফ, জলহস্তী কোনও কিছুর ব্যবসাতেই তিনি মাথা গলাননি।

এখানে লিখে রাখা উচিত, সে সময়ে জীবনবাবুর সে সামর্থ্যও খুব ছিল না।

তখন দমদমে প্রচুর ব্যাঙ। সে দমদম এ দমদম নয়। পানাপুকুর, ডোবা, দমদম, সিঁথি আর বরানগরের মধ্যে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লম্বা-চওড়া জলা জমি।

আর সেই জলাজমিতে ব্যাঙ আর ব্যাঙ। সে যে কতরকম ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, চোলা ব্যাঙ, ধেড়ে ব্যাঙ, ধাড়ি ব্যাঙ, টুনি ব্যাঙ, টোনা ব্যাঙ।

দমদমের বাসিন্দাদের তখন খুব রাগ ছিল ব্যাঙের ওপরে। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সারাদিন সারারাত শুধু ঘ্যাঙর ঘোঁ, ঘোঁ ঘোঁ এবং ঘোঁ ঘোঁস, ঘ্যাঙর ঘোঁ—কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

কিন্তু জীবনচন্দ্রের জীবনবোধ ছিল অন্যরকম। তাঁর প্রজ্ঞাও ছিল অসাধারণ।

ঢাকা, মুন্সীগঞ্জের ছেলে, সরাসরি বলা যায় নন্দপুকুর গ্রামের সুসন্তান জীবনচন্দ্রের জীবনে ব্যাঙের অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। তিনি জানতেন, ভালই জানতেন ব্যাঙ পোকা মাকড় এমনকি জোনাকি ধরে খায়। জোনাকির আলো জ্বলে আর নেভে, সে শুধু ব্যাঙকে ধরানোর জন্যে।

কিন্তু দমদমে এসে জীবনবাবুর অভিজ্ঞতা হল যে সাধাবণ পোকামাকড় নয়, জোনাকি নয় ব্যাঙের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হল মশা, মানুষের রক্তাপ্লুত মশা।

তখন দমদমে মশাও খুব। রাতে মশারি টাঙিয়ে শুলেও মশারিব জাল ভেদ করে মশা ঢুকে যায়, তারপর কামড়িয়ে জর্জরিত করে।

কিন্তু যেদিন থেকে জীবনচন্দ্র টের পেলেন যে ব্যাঙ হল মশাভোজী প্রাণী, মুখের নাগালের মধ্যে পেলে উড়ন্ত মশাকে এক লাফে ধরে সে গিলে ফেলতে পাবে। তিনি ব্যাঙকে নিজের কাজে ব্যবহাব করতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায চারটে বড় কোলা ব্যাঙ ধবে তাঁর তক্তাপোষের চার পায়ার সঙ্গে এক পায়ে দড়ি বেঁধে আটকিয়ে দিলেন।

মশাবির মধ্যে মশা ঢোকে প্রধানত বিছানার তোষকের নিচে যেখানে মশারি গোঁজা হয় সেই গোঁজার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে।

ব্যাঙ বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করায় মশাদের অনুপ্রবেশ করার জায়গা ব্যাঙগুলোর নাগালের মধ্যে এসে গেল। তারপর, কী আশ্চর্য, সেই রাত থেকে জীবনচন্দ্রের মশারির মধ্যে আর একটি মশাও ঢুকতে পারল না।

এই ঘটনা এই কাহিনীর পক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধু একটা কথা এখানে জানানো দরকার যে মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ব্যাঙ ধরে ধরে জীবনচন্দ্র এই বিদ্যায় এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপরের ঘটনাবলি খুবই সংক্ষিপ্ত। যখন আলপিন, সেফটিপিন, গুলিসুতো, কান খোঁচানি, জিবছোলা ইত্যাদির ব্যবসায়ে জীবনচন্দ্র প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন সেই সময়ে

খবর পেলেন, খবরের কাগজে দেখতেও পেলেন জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুরে খুব ব্যাঙের চাহিদা তাদের দিশি ব্যাঙে আর হচ্ছে না তারা ভারত থেকে ব্যাঙ আমদানি করতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে যোগাযোগ করলেন জীবনচন্দ্র এবং সেই যোগাযোগ ফলপ্রসূ হল।

এরপর থেকে তিনি তাঁর আটজন সম্পর্কিত এবং নিজের ভাই বোন, এই বিরাট ম্যান পাওয়ার নিয়ে ব্যাঙ ধরতে নেমে গেলেন। পরে অবশ্য মাইনে করা লোকও তাঁকে রাখতে হয়েছিল।

সূর্যোদয়ের দু ঘণ্টা আগে থেকে সেই সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পর্যন্ত সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, সন্ধ্যা নেই সারাদিনমান ব্যাঙ ধরা চলতে লাগল, দমদমের খালে-নালায়, জলায়-ড্রেনে। সেই সময় দমদমকে তিনি প্রায় ব্যাঙ শূন্য করে ফেলেছিলেন, হয়তো সত্যিই ঐ অঞ্চল থেকে ব্যাঙ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কিন্তু ইতিমধ্যে বানর চালানের হিড়িক পড়ে গেল।

দমদমে আবার বানর নেই। তার জন্যে সেই দক্ষিণেশ্বর, আলমবাজার, কলকাতার হেস্টিংস, ময়দান এইসব জায়গায় ছুটতে হল। আর বানর ধরা সোজা কাজ নয়।

বিস্তারিত বর্ণনায় গিয়ে লাভ নেই।

মোদ্দা কথা, ব্যাঙ চালানের আর বানর চালানের কারবারেও কিন্তু খুবই সফল হলেন জীবনচন্দ্র। এক জীবনে একার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করলেন। সবচেয়ে বড় কথা টাকা দু হাতে উপার্জন করলেন বটে কিন্তু জীবনচন্দ্রের জীবনধারা একদম পালটাল না।

সেই মালকোঁচা মারা ধুতি, কালো কাবলি জুতো আর ফুলহাতা টুইলের শার্ট যে পোশাকে গ্রাম ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন সেই পোশাক আর বদলায়নি।

খাওয়া দাওয়া, চাল চলনেও কোনও ব্যতিক্রম নেই। নিজের কোনও গাড়ি নেই, একটা জাল ঢাকা ভ্যান আছে সেটা বানরদের জন্যে। জীবনচন্দ্র নিজে ট্রামে বাসেই যাতায়াত করেন।

শুধু ঐ দমদমের ভাড়াটে বাড়ি কিনে সেটাকে তিনতলা করেছেন। আর সবই খরচ করেছেন তাঁর পুষ্যিদের জন্যে।

জীবনচন্দ্র যখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফুটপাথের দোকানে মাটির ভাঁড়ে চা খেতেন কেউ ভাবতেও পারত না এই লোকটাই খুড়তুতো ভাইকে আমেরিকা পাঠিয়েছে, পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে বোনের বিয়ে দিয়েছে। এরই পয়সায় ভাই-ভাইপোরা লাল মারুতি, সাদা অ্যামবাসাডর হাঁকাচ্ছে, বারে-রেস্তোরাঁয় টাকা ওড়াচ্ছে, সল্ট লেকে বাড়ি বানাচ্ছে।

তাদের সব বড়লোকি চালচলন, বড়লোকি ব্যবসা। এক ভাইপো সিনেমার প্রডিউসার হয়েছে। আরেক ভাইপো কবিতার কাগজ করেছে। সব ফ্লপ হওয়ার কারবার। নিঃসন্তান, বিগতদার জ্যাঠার পয়সা, বহু কষ্টার্জিত পয়সার তারা সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

এবং এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে তারা ধরেই নিয়েছিল যে তাদের জ্যাঠা খুব বোকা, একেবারে মূর্খ, গণ্ড মূর্খ। এত কষ্টের উপার্জনের টাকা একটু ফূর্তি করল না। একটু আহ্লাদ করল না, একটু বিলাসিতা করল না, অন্তত আরও একটা বিয়ে তো করতে পারত।

জ্যাঠা আরেকবার দারগ্রহণ করলে তাদের যে কী অবস্থা হতে পারত, তারা সে সব ভাবেনি। তারা আগাগোড়া জ্যাঠাকে বোকাই ভেবে গেছে।

কিন্তু জীবনচন্দ্র বোকা নন। কোনও বোকা লোক ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে না।

তবে জীবনচন্দ্র জীবনসায়াহ্নে পঁচাত্তর বছর বয়েসে পৌঁছে ভেবে দেখলেন জীবনে সাধ আহ্লাদ কিছুই পূরণ করা হল না। এক নাগাড়ে দম না ফেলে খাটতে খাটতেই সারা জীবন চলে গেল।

এত টাকা পয়সা, সব ভাই-ভাইপোরা ধ্বংস করছে। তাঁর নিজের প্রয়োজন খুবই কম। আর এ বয়েসে এসে হঠাৎ বিলাসিতা শুরু করা বেমানান হবে। তা ছাড়া বিলাসিতার পরিশ্রমও কিছু কম নয়, সেটা অভ্যাস করতে হয়।

কিন্তু নিজের জন্যে তো কিছু খরচ করতে হবে। পুরো জীবনটা কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যয় করার পর এই চিন্তাটা বার বার ঘুরে ঘুরে জীবনবাবুর মাথায় আসতে লাগল।

অবশেষে নিজেই একটা বুদ্ধি বার করলেন। বুদ্ধির অভাব তাঁর কোনওদিনই হয়নি, এবারেও হল না।

জীবনচন্দ্র তাঁর সহ ব্যবসায়ী প্রাণগোপালের কাছে গেলেন। গিয়ে প্রাণগোপালকে বললেন, 'দ্যাখো, আমার পঁচাত্তর বৎসর বয়েস হয়েছে। আমার নিজের ধারণা আমি আব খুব বেশিদিন বাঁচব না।'

'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কিছু না বলে প্রাণগোপাল মন দিয়ে জীবনচন্দ্রের কথা শুনতে লাগলেন।

জীবনচন্দ্র তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে একশো টাকার নোটের দশটা বাণ্ডিল মোট এক লক্ষ টাকা বার করে প্রাণগোপালকে দিলেন এবং সেই সঙ্গে একটি তালিকা। প্রাণগোপাল সেই তালিকাটি খুঁটিয়ে দেখলেন এবং টাকার বাণ্ডিল ও তালিকাটি যত্ন করে দেয়াল সিন্দুকে ভরে রাখলেন।

এর অল্প কিছুদিন পরে জীবনচন্দ্র মারা গেলেন।

খবর পেয়ে নবাগতা নায়িকার ফ্ল্যাট থেকে ছুটে এলেন প্রডিউসার ভাইপো। বার থেকে টলতে টলতে এসে গেলেন আরেক ভাইপো। অন্য একজন গাঁজা পার্কে উঠতি কবিদের সঙ্গে গঞ্জিকা সেবন করতে করতে পরবর্তী সংখ্যার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনিও ছুটে এলেন।

দেখা গেল, কোনো রকমে জ্যেষ্ঠতাতের শেষকৃত্য নমোনমো করে শেষ করে যে যার ভাগ তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়াই তাদের সকলের উদ্দেশ্য।

জীবনচন্দ্রের এক ভাই তখনও জীবিত। কিন্তু পক্ষাঘাতে তিনি শয্যাশায়ী। বাকরুদ্ধ। তাঁর মতামত কিছু জানা গেল না। তবে তাঁর মত আর কী আলাদা হত?

সবাই বলাবলি করছে কাশী মিত্রের ঘাটে নিয়ে যাবে না নিমতলায়। কোথায় তাড়াতাড়ি হবে।

এমন সময় খবর পেয়ে প্রাণগোপাল এলেন। এসে বললেন, 'আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

সত্যিই সুব্যবস্থা। একজন মৃতের জন্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলে ঢাকা বিশাল ট্রাক এল। এক হাজার আটটি শ্বেতপদ্ম দিয়ে সাজানো। এল অগুরু, চন্দন। সিল্কের পাঞ্জাবি, তাঁতের কোড়া ধুতি পরানো হল জীবনচন্দ্রকে, যে সব জিনিস তিনি জীবনে পরিধান করতে পারেননি।

সাদা ফুলে সাজানো মাইক লাগানো আরও বহু গাড়ি এল। বিখ্যাত সানাইবাদক রহমতুল্লা করুণ, করুণতর সুরে সানাই বাজালেন। তার পিছনের গাড়িতেই ততোধিক বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা আশারাণী। তিনি মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতে লাগলেন।

শ্মশানে আর এক এলাহি কাণ্ড। কয়েক মণ চন্দন কাঠ, দুই কলসি ঘি। শ্মশান বন্ধুদের জন্যে দই, রাবরি, সন্দেশ।

মহাসমারোহে জীবনচন্দ্রের সৎকার হল। ভাইপোরা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শুধু যারা জীবনচন্দ্রকে জানত না, যারা শবযাত্রা ও সৎকারের প্রত্যক্ষদর্শী তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, 'একেই বলে বেঁচে থাকা। একেই বলে বাঁচার মতো বাঁচা।'

নস্যি

নস্যি শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ নস্য থেকে নস্যি। নস্য হল পুংলিঙ্গ, তাই থেকে স্ত্রীলিঙ্গে নস্যি। যেমন নদ ও নদী।

ছোট বয়েসে আমরা যা কিছু শিখি বা জানি তার সব কিছু ঠিক নয়। হয়তো নস্য-নস্যি, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গের এই ব্যাপারটাও ভুল শিখেছিলাম।

যিনি ভুল শিখিয়েছিলেন সেই সরসীপিসির ওপরে কিন্তু আমাদের আস্থা ছিল খুব। শুধু আমাদের কথাই নয় আমাদের ছোট শহরটার সবাই সরসীদিকে এক নামে চিনত, তখনকার সতেরো-আঠারো বছর বয়েসী শ্যামলা, একহারা চেহারার মেয়েটিকে সবাই মান্য করত।

মান্য করার কারণও যথেষ্ট ছিল।

হিসেবমত আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর সেটা।

ম্যাট্রিক?

প্রৌঢ় পাঠক, প্রৌঢ়া পাঠিকা তোমাদের কি এখনও মনে আছে ম্যাট্রিক? স্মৃতি-বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় ম্যাট্রিক শব্দটা হঠাৎ ঘণ্টার মত বেজে উঠল।

আমি ছিলাম শেষবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। তারপর ম্যাট্রিক উঠে গিয়ে এল স্কুল ফাইনাল। সে স্কুল ফাইনালও কবে উঠে গেছে, এল সেকেণ্ডারি, আমার ছেলেকে সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি দিন চার দশকেরও বেশি কাল ধরে চলেছিল ম্যাট্রিক। আমি আমার বাপ-কাকা সবাই ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। তার আগে এন্ট্রান্স চলেছিল সেই ইংরেজি শিক্ষার গোড়া থেকে, আমার জ্যাঠামশায়, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দাব বাবা সবাই ছিলেন এন্ট্রান্স পাশ। এই ধারাবাহিকতা চলেছিল ই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। মধ্যে তো উঠেই গিয়েছিল প্রায় দশ ক্লাসের এই শেষ পরীক্ষাটা, চালু হয়েছিল এগারো ক্লাসের শেষ পরীক্ষা।

এন্ট্রান্স, তারও পরে ম্যাট্রিকের যে মর্যাদা ছিল এখন বোধহয় বেঁচে নেই। আমাদের বাসায় সেকালের এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবাবু গর্ব করে বলতেন, একটা এন্ট্রান্স ফেল দশটা

ম্যাট্রিক পাশের সমান।

এতকাল পরে এন্ট্রান্স পাশ লোক আর একজনও বোধহয় বেঁচে নেই। আমার ক্ষমতা বা সম্বল থাকলে এই এন্ট্রান্স প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে শেষ মানুষটিকে খুঁজে বার করে সম্বর্ধনা দিতাম। তবে আমার মতই ম্যাট্রিক পাশ লোকেরা এখনও আছেন, পঞ্চাশের খারাপ দিকে, ষাটের কোঠায়, সত্তরের আশির হয়তো বা নব্বুইয়ের কোঠায়।

একটা সাধারণ গল্পে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে এতখানি আদিখ্যেতা না করলেও চলত। কিন্তু গল্পটা যে আমার নিজের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সংক্রান্ত। তা ছাড়া ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া, আজেবাজে গালগল্পের চেয়ে নিশ্চয় খারাপ নয়।

সে যা হোক, সরসীপিসির কথায় ফিরি। আমাদের ঠিক দুবছর আগে সরসীপিসি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে, সংস্কৃতে আর ভূগোলে লেটার পেয়ে। ভূগোল তখন ছিল পঞ্চাশ নম্বরের হাফ পেপার, তার মধ্যে চল্লিশের বেশি পাওয়া সোজা কথা নয়। তা ছাড়া সংস্কৃতে লেটার পাওয়াও রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার, সেকালের পণ্ডিতমশায়েরা সংস্কৃত খাতা খুব কড়া করে দেখতেন, সামান্য অনুস্বর বিসর্গ একচুল এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। কত ছাত্র সংস্কৃতে ফেল করে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারত না তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া সংস্কৃত তখন আবশ্যিক বিষয় ছিল, হিন্দু ছেলেদের সংস্কৃত আর মুসলমান ছেলেদের আরবি বা ফারসি বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ এগুলো ধর্মভাষা। যেমন ইংরেজি ছিল রাজভাষা, বাংলা মাতৃভাষা।

ধর্মভাষা পড়ানোর জন্যে সব স্কুলেই কয়েকজন পণ্ডিত ও মৌলভি থাকতেন। পদমর্যাদা অনুসারে হেডপণ্ডিত, ফার্স্ট পণ্ডিত, সেকেন্ড পণ্ডিত, ফার্স্ট মৌলভি, সেকেন্ড মৌলভি ইত্যাদি বলা হত। তবে সম্বোধন করা হত 'পণ্ডিতমশায' কিংবা 'মৌলবি সাহেব'।

আমার দাদা পড়ত আমার থেকে এক ক্লাস ওপরে আর সরসীপিসির এক ক্লাস নীচে। দাদা এইট থেকে নাইনে উঠতে সব বিষয়ে পাশ করেছিল, তবু সংস্কৃতে চৌদ্দ পেয়ে সেকেন্ড কলে প্রমোশন পেল।

দাদার সংস্কৃতে ভয় ধরে গিয়েছিল। দাদা বাসায় কাউকে কিছু না বলে নাইনে ওঠার পর ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি করে এক বোতল কাসুন্দি আর এক বয়াম আমের আচার দিয়ে হেড মৌলভি সাহেবকে বশ করে। তিনি রাজি হয়ে যান দাদাকে আরবি ক্লাসে নিতে। সে সময় দেখেছি দাদা লুকিয়ে 'আলিফ-বে-পে-তে-সে, এই সব কি যেন বিড়বিড় করত চোখ গোল-গোল করে, পরে জেনেছিলাম সেগুলো আরবি বর্ণমালা। কিন্তু দাদার সে সাধ পূর্ণ হয়নি, হেডমাস্টার মহোদয় সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে আরবি নিয়ে পড়তে অনুমতি দেননি, কি যেন বিধিগত কূট বাধা ছিল কোথায়।

এ খবর বাসায় পৌঁছালে একটু সোরগোল হয়েছিল। তবে দাদার ব্যাপার-স্যাপার ছিল আলাদা। দাদাকে কোনও বিষয়েই কেউ বিশেষ ঘাঁটাত না। শুধু ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন, 'পশ্চিমবাড়ির সরসী তো খুব ভাল সংস্কৃত জানে, তুই তার কাছে শিখে নে।'

দাদা গর্জে উঠেছিল, 'সরসী তো শত্রুপক্ষের মেয়ে। তোমার গতবারের কথা মনে নেই। ওর কাছে কি শিখব, ও ইচ্ছে করে ভুল শেখাবে।'

দাদা এই কথাগুলো যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, সরসীপিসি তখন ওঁদের বাড়ির জানালার পাশে টেবিলের সামনে এসে খাতায় কি যেন

লিখছিলেন, দাদার কথা শুনে একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে দেখে ফিক করে হেসে আবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

আমি বারান্দায় দাদার পাশেই ছিলাম। দাদার সদ্য ব্যবহৃত 'শত্রুপক্ষের' মেয়ে কথাটি আমার চেনা। কয়েকদিন আগেই এই নামে একটা নতুন বই এসেছে আহমদিয়া লাইব্রেরির শো কেসে, ইস্কুল যাওয়ার পথে দাদা আর আমি দুজনেই সেটা দেখেছি। ঢাকা বা কলকাতা থেকে নতুন কোনও বই এলে প্রথম কিছুদিন সেগুলো কাচের শো কেসে রাখা হত। খালধারের বইয়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে ইস্কুলে যাতায়াতের পথে আমরা সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতাম।

এখনও সরসীপিসির কথাই শুরু হল না। শত্রুপক্ষের ব্যাপারটা যথা সময়ে বলা যাবে।

সরসীপিসি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করলেন সে বছর আমাদের শহবের মাত্র পাঁচজন ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, তার মধ্যে সরসীপিসি একা মেয়ে। শুধু তাই নয় আমাদের শহরে অনেক কালের মধ্যে মাত্র দুটি মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, তার একজন ওই সরসীপিসি আর অন্যজন সরসীপিসিরই দিদি অতসীপিসি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর পর আমাদের তখন খুব অল্প বয়েস, অতসীপিসির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখনো একটু একটু মনে পড়ে বিয়ের বাসর-ঘরে অতসীপিসির বর হেঁড়ে গলায় 'এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধা ছায়াতে' গেয়েছিলেন।

এ সব অনেককাল আগেকার কথা। এত বছর পরে অত অল্প বয়েসের কোনও কিছু মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু কেমন যেন মনে পড়ে সেদিন খুব ঘন জ্যোৎস্না উঠেছিল। বাসবঘরের সামনের উঠোনে এক ঝাঁক কাঠচাঁপা গাছের ফুল-পাতা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল চাঁদেব আর হ্যাজাকের আলোয়।

অতসীপিসিমার বাসরঘর হয়েছিল আমাদেব দালানের সবচেয়ে বড় ঘরটায়, যে ঘরটায় আত্মীয়স্বজন এলে থাকতেন। তখন আমাদের ওখানে এরকমই হত। পাড়ায় একটা বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন হলে ব্যাপার হত আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ি মিলে। বিয়েটা হত নিজের বাড়িতে, বরযাত্রীরা উঠত অন্য এক বাড়িতে, বাসরঘর হয়তো আরেক বাড়িতে যেখানে ভালো খালি ঘর আছে।

আমাদেব পাশাপাশি বাড়ি। সবসীপিসিদের বাড়ির চলতি নাম ছিল পশ্চিমবাড়ি। লাগোয়া পাশের বাড়ি আমাদের সেই অর্থে বাড়ির পরিচয় হওয়া উচিত পূর্ববাড়ি নামে, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাদেব বাড়ি হল দক্ষিণবাড়ি। এবং ততোধিক অজ্ঞাততর কারণে পূর্ববাড়ি নামে কোনও বাড়ি ছিল না। এমনকি উত্তরবাড়িও ছিল না।

এই নিয়ে কারও মনে কখনও কোনও সংশয় দেখা গিয়েছে বলে শুনিনি। আরও অনেক কিছুর মতই এসব আমরা জন্মতক মেনে নিয়েছিলাম। বোধহয় শহর যখন নতুন পত্তন হয় সেই সময় সীমানা নির্দেশক এই সব নামকরণ হয়েছিল। আর নামাঙ্কিত বাড়িগুলোও স্থান বদল করেছিল। আমাদের বাড়িই নাকি আগে ছিল নদীর পাশে, বারবার ভাঙনের মুখে শহরের এ পাশে উঠে এসেছিল। স্থানবদল, দিকবদল হয়েছিল কিন্তু বাড়ির নামবদল হয়নি।

পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে কি যে সব অবান্তর কথা চলে এল। স্মৃতিঠাকুরানির

ঝুলিতে কি যে অবান্তর আর কি যে অবান্তর নয় আমি হেন সামান্য রচনাকার সেটা কিছুতেই ধরতে পারি না।

বরং সরসীপিসির কথা যেটুকু এখনও মনে আছে, শেষবার ভুলে যাওয়ার আগে সেটা লিখে রাখি।

সরসীপিসি দেখতে সুন্দরী ছিলেন না। শ্যামলা, ছিপছিপে বাঙাল মফস্বল শহরের ফ্যাসনহীন অনাধুনিকা। একটু আধুনিকতা অবশ্য ছিল, সেটা হল পুরনো বাংলা ধরনে শাড়ি না পরে ড্রেস করে মানে আজকালকার মত কুচিয়ে শাড়ি পরা।

সুন্দরী না হলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন সরসীপিসি। বুদ্ধি ও মেধা তাঁর যথেষ্টই ছিল। তাঁর চোখেমুখে বুদ্ধির একটা আভা খেলে যেত। তবে তার সবটাই সুবুদ্ধি নয়। কিছুটা দুষ্টবুদ্ধিও ছিল।

না হলে, শুধু শুধু আমাকে কেন শিখিয়েছিলেন লিঙ্গ পরিবর্তন করে নদ যেমন নদী হয়, বালক যেমন বালিকা হয়, সিংহ হয় সিংহী, তেমনিই নস্য হয়ে নস্যি।

এই গল্পেব নাম 'নস্যি'। সেই জন্যেই বোধহয় নস্যির প্রসঙ্গটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল।

আমাদের সেই বাল্যকাল, সেটা ছিল নস্য বা নস্যির সুবর্ণযুগ। নস্যিব দোকান যত্রতত্র, যে কোনও দোকানে নস্যি।

নস্যিই বা কতরকম। র, পরিমল, রোজ। তার কত রকম গন্ধ। র নস্যির কড়া ঘ্রাণ, রোজের গোলাপি সৌরভ, পরিমলে মধুর সুবাস।

উকিল-ডাক্তার, মাস্টার-ছাত্র, মুহুরি-মক্কেল, ঝি-চাকর সবাই নস্যি নিত। তখন নাকি বাকিংহাম প্যালেসে রাজবাড়ির ডিনার শেষে নস্যি পরিবেশন করা হত ব্রাণ্ডির বা লিকারের পাশাপাশি সোনার নস্যদানিতে।

নস্যদানিও যে কত রকম ছিল। টিনের, পিতলের, রুপোর, পাথরের হাতির দাঁতের। তার আবার কত কারুকার্য। অধিকাংশ নস্যির নেশার লোকের পকেটে দুটো করে রুমাল একটা ময়লা, মোটা কাপড়ের নস্যির রঙে চিত্র-বিচিত্র, অন্যটি শৌখিন সাধারণ ব্যবহারের রুমাল। বাড়ির কাজের লোক সে সব ঘৃণিত নস্য কলঙ্কিত রুমাল কাচতে চাইত না, গিন্নিরা নিজেদের চানের সময় বাঁ হাতে আলগোছে ধরে নাক সিঁটকিয়ে কর্তব্য পালন করতেন ওই রুমাল কেচে।

নস্যি নিত না কে? হেডমাস্টার মশাইয়ের টেবিলে নস্যির আস্তর পড়ে থাকত। হেডমাস্টারমশাই যখন ঘরে থাকতেন না বুড়ো দপ্তরি চকমোছার ডাস্টার দিয়ে সেগুলো জড়ো করে নিজের টিনের কৌটোয় ভরে নিত।

জজসাহেব নস্যি নিতে নিতে সওয়াল শুনতেন। উকিলবাবু প্রকাশ্য আদালতেই নস্যি টেনে সওয়াল করতেন, তাতে আদালত অবমাননা হত না। আসামি কয়েদখানায় ঢোকার মুখে শেষ টিপ নস্যিটা নাকে দিয়ে নিত, তাকে গারদে ঢোকানোর আগে জমাদারসাহেব তার পকেট তল্লাসি করে তাব নস্যির কৌটো বাজেয়াপ্ত করলেন।

বেকার যুবক, খদ্দরের নস্যিরঙা পাঞ্জাবি পরা বিপ্লবী নেতা, বাজারের দোকানদার, দারোয়ান, কোচম্যান প্রত্যেকের পকেটে বা কোমরের খুঁটে একটা করে নস্যির কৌটো। একদিন ইস্কুলে যাওয়ার মুখে ইঁদাবার ধারে দাদার কাচতে দেওয়া ছাড়া জামার পকেট

থেকে বেরোল এক নস্যির কৌটো। আমাদের বাড়ির পুরনো লোক সৌদামিনী দাসী সেই নস্যির কৌটো হাতে স্তূপাকৃতি ময়লা কাপড়ের বোঝা এক লাফে পেরিয়ে ইঁদারার ধার থেকে এসে পড়ল একেবারে বাড়ির মধ্যের উঠোনের মাঝখানে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কপাল চাপড়াতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'ওগো, আমাদের কি সর্বনাশ হল গো! বড় খোকন না একেবারে গোল্লায় গেল গো!'

বড় খোকন মানে আমার দাদা। আমি আর দাদা দুজনেই খোকন, দাদা বড় খোকন আর আমি ছোট খোকন।

সৌদামিনীর এই আর্ত বিলাপে, প্রাণাধিক কিশোর পৌত্রের পদস্খলনে যাঁর সবচেয়ে বেশি বিচলিত হওয়ার কথা ছিল সেই আমার পিতামহী তাড়াতাড়ি পুজোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পিতলের লক্ষ্মীমূর্তির নীচে থেকে তাঁর রূপোর নস্যির কৌটো বের করে তার থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিয়ে দ্রুত মালা জপতে লাগলেন। তখন ভাবতাম ঠাকুমা নস্যি পায় কোথায়, কে এনে দেয়। এতদিন পরে এখন মনে হয় ঠাকুর্দাই লুকিয়ে এনে দিতেন ওই নেশার দ্রব্যটি প্রিয় সহধর্মিণীকে।

সেইদিন সন্ধ্যায় দাদার এই অধঃপতন নিয়ে বাড়িতে খুব সোরগোল হল। সেদিনই সকালবেলা ঠাকুর্দার কাছে তার মক্কেল এসেছিল যারা ডাকাতি করে ধরা পড়েছে, এখন জামিনে আছে, ধরা পড়ার সময় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে গুপ্তি আর একটা করে নস্যির কৌটো পাওয়া গেছে—ঠাকুর্দার এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবাবু জানালেন। ছোট ছেলের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বেরোনোর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি এই খবরটা দিলেন।

দাদা কিন্তু নির্বিকার। বাড়ির নীচের বারান্দায় জটলা চলছিল। আমি আর দাদা ছাদের এক প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছাদ ঘেঁষে কয়েকটা পুরনো আমগাছ, বৈশাখের শুরু, কয়েকদিন আগে নববর্ষ গেছে। আমের মুকুল ঝরে গিয়ে সদ্য গুটি ধরেছে। আবছা অন্ধকারে থোকা-থোকা আম ছবিতে দেখা আঙুরগুচ্ছের মত দেখাচ্ছে। দুয়েকদিন আগে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, কালবোশেখি। আকাশে আজকেও মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমাদের দালানের পিছনে পুকুরপারে ব্যাঙ ডাকছে, সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাছে দূরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। খালের ধারে সিনেমাহল থেকে 'মানে-না-মানা' সিনেমার ডায়ালগ ভেসে আসছে বাতাসে। সিনেমাটা দেখা থাকলে বেশ বোঝা যায় কোন জায়গাটা চলছে।

নীচের তলার কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। দাদার বিচারসভা সাঙ্গ হয়েছে, দাদার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়ে যে যার কাজে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ পরম দার্শনিকের মতো দাদা আমাকে বলল, 'খোকন কথাটা নস্য না-নস্যি?'

আমরা বাঙাল দেশের লোক। আমাদের কথাবার্তায় সাধুভাষার দিকে ঝোঁক বেশি। আমরা কলিকাতা বলি, লবণ বলি, আমরা নস্যি বলি বটে তবে অনেকে নস্যও বলতেন।

সবাই বলে আমি অল্প বয়েস থেকেই একটু বেশি পাকা। তাই বোধহয় দাদার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, 'নস্য-নস্যি' দুই-ই হয়।

দাদা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, তার বদলে বলল, 'সরসীর কাছ থেকে একবার জেনে নিস তো। এ বছরের ঝগড়া লাগার আগেই জেনে নিস।'

সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়ি আর আমাদের দক্ষিণবাড়ির মধ্যে একটা বছরকার ঝগড়া ছিল, প্রতি বছরেই ঝগড়াটা হত, ঝগড়াটা চলত পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। তারপর আষাঢ়ের শেষে কিংবা শ্রাবণের গোড়ায় যখন যমুনা নদীর বেনোজল শহরের মধ্যের খাল ভাসিয়ে, রাস্তা ডুবিয়ে আমাদের উঠোনের মধ্যে ঢুকে যেত, তখন এই দুটো বাড়ি খুব কাছাকাছি চলে আসত, বিনা মীমাংসায় এক বছরের মত বিবাদ মুলতুবি থাকত। একই ডিঙি নৌকোয় সরসীপিসিরা আর আমরা স্কুলে যেতাম, যতদিন না স্কুলের ক্লাসঘরে জল ঢুকে স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। মক্কেলের ঢাকাই নৌকোয় করে আর সকলের সঙ্গে আদালতে যাওয়ার পথে সবসীপিসিমার বাবাকে ঠাকুর্দা তাঁর সেরেস্তায় নামিয়ে দিতেন।

ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত করে বলি। দুটো পাশাপাশি বাসা। মধ্যে একটা নড়বড়ে টিনের বেড়া রয়েছে। বেড়ার শেষ মাথায় একদম সীমান্ত একটা আমগাছ। খুব পুরনো বুড়ো আমগাছ।

এই গাছটা নিয়েই যত বিপত্তি। গাছটার দুটো নাম। আমাদের দক্ষিণবাড়িতে এই গাছটাকে বলা হত লালবাগের আমগাছ।

কবে সেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ নাকি মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ঠাকুরদার দাদা তাঁব ছেলেবেলায় গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি লালবাগে বেড়াতে গিয়ে ফেরার সময় এক ঝুড়ি খুব মিষ্টি আম নিয়ে এসেছিলেন। সেই আমেরই একটা আঁটি থেকে এই গাছ হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরে যখন প্রথম ফল এল সেই আম পাকলে পরে খেয়ে সবারই সেই লালবাগের আমের কথা মনে পড়েছিল, যদিও এর আঁটিতে অল্প একটু টক ছিল আর লালবাগের আম ছিল নিখুঁত মধুর।

ওদিকে ওই একই আমগাছের নাম ছিল সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়িতে কলমি আমগাছ। এ গাছের কলমের চারা নাকি সরসীপিসির ঠাকুমা অনন্তকাল আগে ধামরাইয়ের রথের মেলা থেকে স্বহস্তে কিনে এনেছিলেন।

সবচেয়ে গোলমাল বাধিয়েছিল দুই বাড়ির সীমানার ঠিক ওপরে এই আমগাছটার অবস্থিতি। আমি এখনও ভেবে পাই না এই একটি টোকো আমগাছ নিয়ে দুটি পুরনো সংসারের বন্ধুত্ব বছর বছর ভেস্তে যেত কি করে।

দুটি পুরনো সংসার। প্রায় একই চৌহদ্দির মধ্যে পাশাপাশি বাড়ি। একশো বছরেরও বেশি পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

যদিও স্বজাতি নই, আমরা ব্রাহ্মণ, সরসীপিসিরা বৈদ্য, আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে আত্মীয়তার অভাব ছিল না। সরসীপিসি, অতসীপিসি দুই বোনকেই দেখেছি ভাইফোঁটায় বাবাকে ফোঁটা দিতে। সরসীপিসি, অতসীপিসিদের যখন পাত্রপক্ষ দেখতে আসত, ওঁদের চুল বেঁধে দিতেন আমার মা সেকালের ফ্যাশনে, মাউন্ট করার স্টাইলে। ওঁরা মাকে বউদি বলতেন, বয়েসের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমার মা'র ছোটখাট রঙ্গতামাশা ছিল এই দুই বোনের সঙ্গে।

সরসীপিসিদের আমরা যে পিসি বলতাম, ওঁরা যে মাকে বলতেন বউদি এবং এবাড়ি ওবাড়ির সব সম্পর্কই যে এই ছকের অধীন ছিল তার কারণ অবশ্য আমাদের ঠাকুমা।

আমাদের ঠাকুমার বাপের বাড়ি মানে বাবার মামার বাড়ি ছিল যে গ্রামে সেই গ্রামেরই মেয়ে সরসীপিসির মা, ঠাকুমার চেয়ে বয়েসে বছর পনেরোর ছোটো। ঠাকুমা

পালটি ঘর দেখে, সম্বন্ধ করে পাশের বাড়ির বউ করে এনেছিলেন গ্রামের মেয়েটিকে। কি যেন নাম ছিল সরসীপিসির জননীর, ঠাকুমা ডাকতেন 'হরি' বলে, রাগ করলে বলতেন, 'হরির বড় বাড় হয়েছে।' খুশি থাকলে বলতেন, 'হরির মত মেয়ে হয় না।'

হরি মানে, যতদুর মনে পড়ছে হরিদ্রাসুন্দরী, আমাদের নোয়াঠাকুমা। নোয়া মানে নিশ্চয় নতুন। গল্প লিখতে বসে অভিধান খুলব না, যা লিখছি তাই সত্যি। সরসীপিসির মা আমাদের ঠাকুমাকে দিদি বলতেন, সেই সূত্রে তিনি আমাদের নোয়াঠাকুমা বা নতুন ঠাকুমা।

এই সব মধুর সম্পর্ক, পাতানো আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যেত কালবোশেখির ঝড়ে। ঝড়ের বাতাসে যখন সীমানার আম গাছ থেকে আম ঝরে পড়ত দু বাড়ির উঠোনে, তুমুল হুলুস্থুল পড়ে যেত দু বাড়িতে, দু পক্ষই দাবি করত সব আমই তাদের প্রাপ্য। কারণ গাছটা তাদের। একবার আমিন ডেকে জরিপ করে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল, তখন নাকি দেখা যায় দু বাড়ির মধ্যের সীমানা চলে গেছে সরাসরি আমগাছের বিশাল গুঁড়ির মধ্য দিয়ে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

যতদিন গাছে আম থাকত, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি আম নিয়ে, আম পাড়া নিয়ে তুমুল বচসা চলত দু বাড়ির মধ্যে। কয়েক দশক ধরে এই গোলমাল চলেছিল। এই বচসা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ঠাকুমা পেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে, নোয়া ঠাকুমাও হয়তো তাই।

দু বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। টিনের বেড়ার অন্য প্রান্তে দু বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের একটা গেট ছিল। ঝগড়া চরমে উঠলে গেটটা পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়া হত।

তখন আমি সরসীপিসির কাছে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা যাই; সংস্কৃত অঙ্ক এই সব একটু দেখিয়ে নিই। আমি সরসীপিসি বলতাম বটে, দাদা কিন্তু তাঁর সঙ্গে বয়েসের সামান্য ব্যবধান মোটেই মান্য করত না। দাদা তাঁকে নাম ধরেই ডাকত। তবে আমার মতই দাদারও সরসীপিসির বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না।

দাদার নির্দেশেই আমি সরসীপিসিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনটা ঠিক, 'নস্য না নস্যি?' সরসীপিসি যখন বললেন নস্যি নস্য একই শব্দ, পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ, সেটা দাদাকে জানাতে দাদা বলল, 'সরসী বানিয়ে বাজে কথা বলেছে। ডিকশনারি একবার দেখিস তো।'

ডিকশনারি দেখে কিন্তু কোনও উপকার হল না। আমাদের একটা পুরনো পাতাছেঁড়া ছাত্রবোধ অভিধান ছিল, হ্রস্ব ই'র আগে এবং হ'য়ের পরে সব শব্দ সেই বইয়ের থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। 'ন' অবশ্য মাঝামাঝি জায়গায় অক্ষত অবস্থাতেই ছিল। সেখানে পাওয়া গেল নস্য মানে নস্যি, নস্যি মানে নস্য।

আমাদের বাসায় একটা বড় অভিধান অবশ্য ছিল। খুব সম্ভব সুবলচন্দ্র মিত্রের কিংবা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের। কিন্তু সেটা কাকার হেফাজতে। কাকা কলকাতায় থাকেন, যাওয়ার সময়ে ভালো করে বাঁধিয়ে কাচের আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে গেছেন। ঠাকুর্দার কাছারি ঘরের আইনের বইগুলোর মত লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা 'বাঙলা ভাষার অভিধান', এবং তার সঙ্গে কাকার নিজস্ব সংযোজন, 'বিনা

অনুমতিতে ব্যবহার নিষেধ'।

সুতরাং নস্য এবং নস্যির পার্থক্য জানা হল না। দাদার মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল শব্দটা বোধহয় আরবি। হেড মৌলভি সাহেবকে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি দাদাকে ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প কিছুদিন আগেই তিনি অপদস্থ হয়েছেন দাদাকে ছাত্র বানাতে গিয়ে, এখন এই নস্যি শব্দের উৎপত্তি সূচক প্রশ্নটি তাঁর কাছে যথেষ্টই অবমাননাকর মনে হয়েছে। তা ছাড়া তিনি নিজে একজন নামকরা নস্যিখোর, সারাদিন দু আঙুলে নাকে নস্যি গুঁজে যান। তাঁর দাড়িতে, আলখাল্লার মত লম্বা পিরানে নস্যির ছড়াছড়ি।

দাদা কিন্তু রাগ করল না, দুঃখ পেল না মৌলভি সাহেবের আচরণে, বরং এই এক চড়ে দাদা নিজে থেকেই নস্যি নেয়া ছেড়ে ছিল। আমাদের দালানের বারান্দায় পুব দিকে মুখ করে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই নস্যির কৌটো। দাদার নস্যির কৌটোটা ছিল একটু অন্যরকম, চৌকো আকারের গ্রামোফোন পিনের খালি কৌটো, যা ওপরে সেই ভুবন বিখ্যাত সঙ্গীতপিপাসু কুকুর ও গ্রামোফোনের চোঙার ছবি। আগের গোল টিনের কৌটোটা সেদিন আবিষ্কার হওয়ার পরে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দাদা তারপর থেকে এই কৌটোটা ব্যবহার শুরু করে, এটার সুবিধে এই যে এর বিসদৃশ আকারের জন্যে এটাকে নস্যির কৌটো বলে হঠাৎ সন্দেহ করা কঠিন।

দাদার মনে কি ছিল জানি না। ভর সন্ধেয় দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদা সজোবে কৌটোটা উঠোনের ওপর দিযে ছুঁড়ে দিল। ওপারে জানালার ধারে তন্ময হযে বসে সরসীপিসি লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া করছিলেন। কি করে যে কি হল, সেই কৌটো কোনাকুনি জানালা দিয়ে ঢুকে লাগল সরসীপিসির ডানচোখের ঠিক ওপবে। তাবপব একেবারে যাকে বলে রক্তারক্তি কাণ্ড। সরসীপিসির ডান ভুরুর ওপবে কেটে গিযেছিল। ঠিক কতটা কেটে গিয়েছিল বলা কঠিন, কারণ আমাদের বাড়ি থেকে কেউই সেটা দেখতে যায়নি বা খোঁজ নিতে যায়নি।

সেই সন্ধ্যায় হাত-পা ছুঁড়ে সরসীপিসির আর্তনাদ, সরসীপিসির হাত ছোঁড়ার ফলে টেবিল থেকে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়া, কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতা, তারপর হই হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি, শুধু থানা-পুলিশ হয়নি।

তবে সেদিন আমরা টুঁ শব্দটিও করিনি। করার উপায়ও ছিল না। শুধু ঠাকুমা গোপনে দাদাকে শহরেরই অন্য এক পাড়ায় ঠাকুমার এক দূর সম্পর্কে বোনের বাড়িতে চালান করে দিয়েছিলেন।

আম-পাকার মরসুম চলছে সেটা। এর আগে কয়েকদিন ধরেই দু বাড়িতে ঐ লালবাগি তথা কলমিগাছের আম নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি গালাগাল বাকবিতণ্ডা চলছিল। আজ দাদার নস্যির কৌটো ছোঁড়ায় এবং তজ্জনিত সরসীপিসির আঘাতে ব্যাপাবটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল।

পুরো গ্রীষ্মটা এই রকম গেল। ওই একই ধারাবাহিকতায়। তারপর একদিন গাছের শেষ আমটি ফুরোল। এরই মধ্যে একদিন অম্বুবাচীর শেষদিন শেষ রাতে শহরবাসী হঠাৎ ঘুমঘোরে বিছানায় জেগে উঠে শুনতে পেল শোঁ-শোঁ, শোঁ-শোঁ শব্দ; সম্বৎসর যেমন হয়, যমুনার জল তোড়ের মুখে শহরের পাশের ছোট নদী ছাপিয়ে শহরের ভেতরের খালের

মধ্যে ঢুকছে তারই উচ্ছ্বাস।

এক সপ্তাহের মধ্যে বেনোজল রাস্তাঘাট পুকুর সব একাকার করে দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমাদের বাড়িগুলো ছিল ডাঙা জমিতে, নাবাল জমির উঠোন ডুবিয়ে প্রথমদিন সরসীপিসিদের উঠোনে তারপর দিন আমাদের উঠোনেও জল ঢুকে গেল। প্রথমে পায়ের পাতা ডোবা জল, তারপব আধ হাঁটু, হাঁটু শেষ পর্যন্ত আধ কোমর জল। তবে জলের দেশের লোক আমরা, আমাদের ঘর-দালানের ভিটে এত উঁচু করা হত যে কখনোই শোয়ার ঘরের মধ্যে জল ঢুকত না। গোয়ালঘর, ভাঁড়ারঘর, ঢেঁকিঘর এসবের ভিটে উঁচু হত না, এ সব ঘরে জল ঢুকে যেত।

সরসীপিসিদের একটা দুধের গাই আর বাছুর ছিল। আমাদেরও দুয়েকটা গরু ছিল। গোয়ালঘরে জল ঢুকতেই আমাদের গরুগুলোর সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে সরসীপিসিদের গাইবাছুর আমাদের বাইরের বারান্দায় স্থানান্তরিত হল।

সরসীপিসির বাবা দেলদুয়ারের গজনভিদের সদর সেরেস্তার নায়েব ছিলেন। তাঁর এক প্রজা বর্ষার ফল এক ধামা অম্লমধুর নটকা দিয়েছিল, তার অর্ধেক আমাদের বাড়িতে এল। ইতিমধ্যে বর্ষার জলের তোড়ে দুবাড়ির ভেতরের দরজা আবার খুলে গেল।

সরসীপিসিদের রান্নাঘরের বারান্দায় অল্প জল উঠেছিল। একদিন সন্ধ্যার দিকে নোয়াঠাকুমা সেই বারান্দা থেকে একটা বড় বেতের ধামা চাপা দিয়ে একটা বেশ বড়, অন্তত তিন চার সের কাতলা মাছ ধরে ফেললেন। বর্ষার জলে মিউনিসিপ্যালিটির পুকুর উপচিয়ে সব বড় বড় মাছ বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা তারই একটা।

সেদিন রাতে আমাদের বারান্দায় রীতিমত ফিস্টি হল। অনেকদিন পরে পেতলের ডুমলণ্ঠনটা মেজে ঘসে বারান্দায় টানায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সারা সন্ধ্যা ধরে তার আলো দুলতে লাগল উঠোনের জলে।

সামান্য আয়োজন; খিচুড়ি, দু চামচে করে খাঁটি গাওয়া ঘি আর কাতলামাছ ভাজা। স্পেশ্যাল আইটেম ছিল কাতলামাছের কাঁটার ঝাল-চচ্চড়ি। গাছকোমর করে শাড়ি বেঁধে সারা সন্ধ্যা বসে নিজের হাতে তরকারি কুটে, মশলা বেটে সরসীপিসি সেই চচ্চড়ি রাঁধলেন, মাছের কাঁটার সঙ্গে কচুর লতি, মিষ্টি কুমড়ো আর বরবটি দিয়ে। এখনও তার স্বাদ জিবে লেগে আছে।

সরসীপিসি যখন রান্না করছেন, কাঠের উনুনের গনগনে আঁচে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, ঘামের বিন্দুতে ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি ঠাকুমা একটা ভিজে গামছা নিয়ে মুখটা মুছিয়ে একটা লণ্ঠন তুলে মুখটা খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে সেই যে নস্যির কৌটোর আঘাত লেগেছিল, কোথাও খুঁত হয়ে গেল নাকি?

এই ভাবে দিন চলে গেল, মাস, বৎসর। এখন মনে হয় যেন যুগের পর যুগ।

দাদা একাই যে নস্যির কৌটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তা নয়। অনেকেই নস্যি নেওয়া ছেড়ে দিল। সদর হাসপাতালের বড় ডাক্তার মেজর মফিজুল্লা সাহেব নিজেই নাকে নস্যি নিয়ে ক্যানসার হয়ে মারা গেলেন। নস্যির রমরমা চলে গেল। অনেকে টেক্কা বিড়ি খাওয়া আরম্ভ করলেন, নীল সুতো দিয়ে বাঁধা, ছোট ছোট কড়া বিড়ি। পয়সাওলা কেউ কেউ কাঁচি সিগারেট ধরলেন।

নস্যির যুগ শেষ।

কিন্তু আমার গল্প এখনও একটু বাকি আছে। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ঘটনাটা।

আমাদের ওই ছোট শহরেও মেয়েদের একটা আলাদা কলেজ ছিল। সেই কাদম্বিনী গার্লস কলেজ থেকে সরসীপিসি সদ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। অল্প কয়েকদিন পরেই আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

পরীক্ষার অল্পদিন আগে বুঝতে পারলাম পড়াশুনো যা হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষার আগে একবার ভালোভাবে ঝালাই করে নিতে না পারলে সুবিধে হবে না। তবে সে জন্যে এখন যা সময় আছে তাতে রাত জাগা দরকার। কিন্তু চিরকালই আমি খুব ঘুমকাতুরে, সন্ধ্যে সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে আমার চোখ ঘুমে বুজে আসে।

সরসীপিসির কাছে গেলাম। এক নিমেষে এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন তিনি। বললেন, 'তুই মন্টুদার দোকানে চলে যা, দু পয়সার নস্যি কিনে নিয়ে আয়। এক টিপ নস্যি নাকে দিলে সারারাত ঘুম আসবে না।'

আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহ ও সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে তাকাতে সরসীপিসি বললেন, 'কোনও দোষ হবে না। আমিও তো বাবার ডিবে থেকে পরীক্ষার আগে নস্যি নিয়ে রাত জাগি।'

আমি তখন একটা নতুন অসুবিধের কথা বললাম, 'নস্যি রাখার কৌটো তো আমার নেই।' সরসীপিসি কি ভেবে একটু ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, 'আমার কাছে একটা কৌটো আছে। সেটায় তোর হয়ে যাবে।'

এই বলে সরসীপিসি তাঁর পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কৌটো বার করে দিলেন। দাদার ছুঁড়ে মারা সেই গ্রামাফোন পিনের চৌকো কৌটোটা।

একটু পরে কৌটোটা নিয়ে কাছারির মোড়ে মন্টুদার দোকানে গেলাম নস্যি কিনতে। নস্যির তখন বেশি বিক্রিবাটা নেই। কৌটোর নীচে সামান্য তলানি পড়ে আছে। মন্টুদা বললেন, 'দু পয়সার নস্যি হবে না। তুমি এখন এটুকু দিয়ে কাজ চালাও। দুয়েকদিন পরে দোকানে নস্যি এলে পরে এসে দু-পয়সার নস্যি নিয়ে যেয়ো।'

সেই চৌকো কৌটোয় নস্যিটুকু পুরে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু নস্যি আমার নাকে দেয়া হয়নি। হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে এক টিপ নস্যি ধরে রাখলেই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আমার লাগে না। নাকে দেওয়ার দরকার নেই।

ওই তলানি নস্যটুকুতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পার হয়ে গেল। মন্টুদার দোকান থেকে আর দু পয়সার নস্যি নিয়ে আসার দরকার হল না।

তারপর ম্যাট্রিক পাশ করে ছোট শহরের থেকে মহানগরে চলে এলাম। সেই চৌকো কৌটোর তলায় সামান্য এক ফোঁটা ঝাঁঝ চলে যাওয়া, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া নস্যি। আজও কৌটোটা হাতে নিলেই আমার হয়ে যায়। নাক পর্যন্ত নস্যি পৌঁছনোর দরকার পড়ে না। ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, এম এ, চাকরির পরীক্ষা ওই একই নস্যি ভরসা করে পার হয়ে গেলাম।

তারও পরে তিরিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। নস্যির কৌটোটা কিন্তু এখনও হারায়নি। একটু চেষ্টা করলেই দেরাজে না আলমারিতে খুঁজে পাব। পুরনো, দোমড়ানো কৌটোর গায়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা কবেকার কুকুর আর চোঙার ছবি।

ডিম

সাতদিন বা তিনদিনের নোটিসে, সম্পাদক মশায় যাই বলুন, জোরাজুরি করে যে হাসির রচনা হয় না, এই গল্পই তার প্রমাণ।

এই ডিম নামক গল্পটিকে কোনও সম্ভ্রান্ত পাঠক যদি আর্যভাষায় অশ্বডিম্ব বলে অভিহিত করেন তাহলেও বোধহয় আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

সে যা হোক, এই খাবাপ গল্পের সূত্রে আর একটা বিপদের কথা জানিয়ে রাখি।

তরল রচনায় কথিকার পাত্র-পাত্রীর নামকরণ খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। চেনাজানা কোনও পুরুষ-মহিলার নামের সঙ্গে নাম মিলে গেলে সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরে নেবে এ গল্প তাকে নিয়েই লেখা, আমি তাকে উপহাস করেছি, নিশ্চয়ই আমার মনে কোনও রাগ বা অভিসন্ধি আছে। অনেক পরিশ্রম করে মনোহর বা কেয়ামত আলি, জুলেখা বা শ্যামা নাম দিয়ে গল্প লিখে ভাবলাম যাক এবার বাঁচা গেছে, কেউ দাবিদার হয়ে গোলমাল বাধবে না। তা কার্যত দেখা গেল এ সব নামেও দু-চারজন করে আত্মীয়বন্ধু, পরিচিতজন আছেন, তাঁরা কেউ দুঃখিত হয়েছেন, কেউ কোপান্বিত হয়েছেন। ভাটপাড়া থেকে জুলেখা একটি চিঠি দিল অসহনীয় কুৎসিত ভাষায়, এদিকে খবর পাওয়া গেল বসিরহাটের উকিল কেয়ামত আলি—কবে আমার সঙ্গে কলেজে পড়েছে, এখন আমার গল্প পড়ে আমার নামে মানহানির মামলার কথা ভাবছে।

সুতরাং এবার আর কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না। তাছাড়া এবারের ঘটনাটা এতই বাস্তব যে কোনও কারণে নামধাম মিলে গেলে আর রক্ষা পাব না।

হাসির গল্প লিখে নাজেহাল হওয়ার মত বিড়ম্বনা সত্যিই আমার আর পোষাবে না। তাই অনেক রকম ভেবেচিন্তে এই গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম দিলাম কথাসাহেব আর কথাবিবি।

আশাকরি, জগৎ সংসারে এরকম নামে কোথাও কেউ নেই। থাকলেও আমি প্রয়োজন হলে আদালতে পর্যন্ত হলফ করে বলতে পারি আমি তাদের মোটেই জানি না, চিনি না, তাদের কথা আমি কখনও শুনিনি।

বলাবাহুল্য, এটি একটি দাম্পত্য-কাহিনী। এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নামকরণ দেখেই বুদ্ধিমতী পাঠিকা সেটা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন।

কথাসাহেব আর কথাবিবি স্বামী-স্ত্রী।

অবশ্য এই নারী-প্রগতির দিনে আজ কিছুদিন হল আমি স্বামী-স্ত্রী না লিখে স্ত্রী-স্বামী লিখছি, সেই সুবাদে বলা চলে কথাবিবি আর কথাসাহেব স্ত্রী-স্বামী।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই নগণ্য গল্পের গৌরচন্দ্রিকা বড় দীর্ঘ হয়ে গেল; ভণিতা ছেড়ে এবার আসল ঘটনায় যেতে হচ্ছে।

কথাসাহেব আর কথাবিবির মধ্যে বনিবনা মোটেই নেই।

বনিবনা থাকার কথাও নয়। কবে আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা থেকেছে। দাম্পত্য-জীবন এক দীর্ঘস্থায়ী টাগ অফ ওয়ার, কাছি টানাটানি খেলা, দুই পক্ষ দুদিক থেকে টানছে; কেউ হারছে না, কেউ জিতছে না। হঠাৎ যদি দুজনের কেউ টানাটানি ছেড়ে দেয়, অন্যজন

সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে যায়।

তবে এর মধ্যে টানাটানি করতে করতে পঁচিশ-তিরিশ বছর চলে গেলে একই দড়ির দুপাশে ক্রমাগত দুজনে মিলে টানতে-টানতে দুজনের কথাবার্তা, আচার-আচরণ এমনকি চেহারা পর্যন্ত একরকম হয়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় মায়ের পেটের ভাইবোনের মত হয়ে যায়।

কথাবিবি এবং কথাসাহেবের সম্পর্ক অবশ্য এখন পর্যন্ত এই পর্যায়ে আসেনি। পঁচিশ-তিরিশ নয়, এমনকি পাঁচ-দশও নয়, তাদের মাত্র দেড় বছরের পুরনো বিয়ে। তবে এরই মধ্যে মোক্ষম দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে।

কথাবিবি যদি বাঁয়ে যেতে চান, অবশ্যই কথাসাহেব যেতে চাইবেন ডাইনে।

ডাইনে মানে, ধর্মতলার মোড়ে যদি রাজভবনের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো যায় তাহলে কথাসাহেব যেতে চাইবেন শ্যামবাজার বা দমদমে, তাঁর যৌবনের বারাণসীতে যেখানে হাম্‌পটি ডামমটি কিংবা থেটাবেটা ক্লাবে তাঁর নিজের লোকেরা এখন তাস, পাশা কিংবা দাবা খেলছেন অথবা রাজা-উজির মারছেন।

আর কথাবিবি যেতে চাইবেন গড়িয়াহাটায় বা গোলপার্কে, সুদূর বাঁয়ে যেখানে অফুরন্ত শাড়ির দোকান, বেলোয়ারি, মনিহারি সামগ্রীর স্বর্গ।

বলে রাখা ভাল কথাবিবি-কথাসাহেবের বসবাস হাওড়ায়, আন্দুল রোডে, সেখান থেকে কোনও ছুটির দিন বিকেলে নবনির্মিত বিদ্যাসাগর সাঁকো পেরিয়ে তাঁরা চৌরঙ্গি-ধর্মতলা অঞ্চলে বেড়াতে আসেন। চৌরঙ্গিতে আসা পর্যন্ত দুজনের কেউই কাউকে বলেন না কোথায় যেতে চান, কী উদ্দেশ্য, গোলমালটা লেগে যায় ধর্মতলায় পৌঁছনোর পরে।

বাদ-বিসম্বাদ, তর্ক-বিতর্ক, রীতিমত উচ্চগ্রামের সে বিবাদ কোনও কোনও দিন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে অনেক সময় অজ্ঞাত পরিচয় পথচারীরা পর্যন্ত তার মধ্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান।

সেই যে প্রচলিত কথা রয়েছে না, বিয়ের পরে প্রথম ছয়মাস স্বামী কথা বলে যায়, স্ত্রী শুনে যায়, তারপরের ছয়মাস স্ত্রী কথা বলে যায় স্বামী শুনে যায়। তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কথা বলে যায়, তারা কেউই কারও কথা শোনে না, পাড়া-প্রতিবেশীরা শুনে যায়।

চৌরঙ্গির মোড়ে অবশ্য পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপার নেই, এখানে যা শোনার পথচারীরা শোনে। তবে পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ কখনও সখনও ছুটির দিনের বিকেলে কাজে-অকাজে এসপ্ল্যানেড বা ঐ চৌরঙ্গি-ধর্মতলা অঞ্চলে এলে এদের ঝগড়া করতে দেখেছে। পরে পাড়ায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, 'এরা রাস্তায় বেরিয়ে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে গোলমাল করে।'

এর মানে অবশ্য এই নয় যে কথাবিবি আর কথাসাহেবের মধ্যে ভালবাসাবাসি নেই। কথা-দম্পতির প্রণয়ও অতি প্রগাঢ়।

পাড়া-প্রতিবেশীরাও সেটা বিলক্ষণ জানেন।

আন্দুলপাড়ায় হরিধনবাবুর আড়িপাতার স্বভাব আছে। তাঁর স্ট্র্যাটেজি চমৎকার। যে সব বাড়িতে সেদিন খুব দাম্পত্য কলহ হয়েছে, রাতের দিকে হরিধনবাবু সেই সব

বাড়িতে আড়িপাতার চেষ্টা করেন।

সবসময়ে যে হরিধনবাবু সফল হন তা নয় তবে একদা একটা চমৎকার কথোপকথন শুনেছিলেন কথা-দম্পতির বাড়ির দরজায় কান পেতে :—

কথাসাহেব : ওগো আমাকে তুমি ভালবাস?

কথাবিবি : হুঁ।

কথাসাহেব : আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?

কথাবিবি : হুঁ। হুঁ।

কথাসাহেব : কেমন করে কাঁদবে? একটু কেঁদে দেখাও না।

কথাবিবি : কেমন করে মরবে? একটু মরে দেখাও না।

অতঃপর আর কানপাতার কোনও মানে হয় না। হরিধনবাবু নিঃশব্দে সরে গিয়েছিলেন, তবে তাঁর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছিল, এই যে অবিশ্বাস্য বাক্যালাপ তাঁর কর্ণগোচর হল, এটা ভালবাসার ডায়ালগ না কলহের ডায়ালগ। সে সমস্যা অবশ্য আমাদেরও রয়েছে।

কিন্তু গল্প বলতে বসে তো আর দ্বিধায় থাকলে চলবে না। কাহিনী, তা সে যত তুচ্ছই হোক, একটা পরিণতির দিকে এগোতেই হবে।

দিন দিন কথাসাহেব কথাবিবির মনোমালিন্য বেড়েই যাচ্ছে। কথাবিবি হয়ত একটা নতুন শাড়ি কিনলেন নীল রঙের, কথাসাহেব সেটা দেখে বললেন, 'আবার নীল?'

কথাবিবি তখন বললেন, 'আবার নীল আসছে কোথা থেকে? বিয়ের পরে এটাই আমার প্রথম নীল শাড়ি।'

কথাসাহেব হয়ত দামি সেলুন থেকে অতি আধুনিক ছাঁট দিয়ে চুল কেটে এলেন, বাড়িতে আসা মাত্র কথাবিবি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞানে চুল কেটে এলে, নাকি লোকে জোর করে ধরে তোমার চুল কেটে দিয়েছে?'

পুরো ব্যাপারটা অবশেষে হেঁসেল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

রবিবার সকালে বাজার থেকে শখ করে বড় বোয়াল মাছ নিয়ে এলেন কথাসাহেব। বাসায় এসে কথাবিবিকে বললেন, 'বড় বড় টুকরো করে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পরিষ্কার ঝাল হবে।'

কথাবিবি কিন্তু সেই বোয়াল মাছ হেঁসেলে ঢুকতে দিলেন না, বললেন, 'আমাদের বংশে বোয়াল মাছ খাওয়া নেই।'

কথাসাহেব বললেন, 'বিয়ের পরে তোমার বংশ তোমাদের বংশে আর নেই, সেটা আমাদের বংশ হয়ে গেছে। আমাদের বংশে কালীপুজোয় বোয়ালমাছের ঝোল দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়।

কথাবিবি ঠোঁট উলটিয়ে বললেন, 'তোমাদের আবার বংশ।'

এই রকম সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা। কথাবিবি উচ্ছে সুক্তো করলেন, কথাসাহেব বললেন, 'উচ্ছে সেদ্ধ করলে না কেন? সে অনেক পুষ্টিকর।'

সব কিছু নিয়েই দুজনার দুই মত। রাতে ভাত হলে কথাসাহেব বলেন, 'রুটি করনি কেন?' রুটি হলে বলেন, 'ধুত্তোরি। সারাদিন অফিস কাছারি করে এসে এই শুকনো রুটি চেবানো যায়?'

কথাবিবির সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে ডিম নিয়ে।

সব সময়ে সব বিষয়ে ঝগড়া করা যায় না।

সম্প্রতি কথাবিবি চেষ্টা করছেন ঝগড়াটাকে মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে রাখতে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে স্বামী-স্ত্রী অন্তর্নিহিত গোলমাল কখনও মেটার নয়। ষাট সত্তর বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের শেষে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে এখনও হামেশাই খুনসুটি করতে দেখা যায়। দাম্পত্যজীবনের সেটাই হল মূল মশলা।

সে যা হোক, এ গল্পের নাম ডিম। ডিমের প্রসঙ্গে গিয়েই কথাবিবি-কথাসাহেবের কাহিনী শেষ করতে হবে।

কথাসাহেব দৈনিক সকালে জলখাবারের সঙ্গে একটি করে ডিম খান। একেকদিন একেকরকম। কোনওদিন ডিম সেদ্ধ, কোনওদিন ওমলেট, কোনওদিন ডিমের পোচ।

কিন্তু অসুবিধে হয়েছে কথাবিবির। এরকম অসুবিধেয় অবশ্য অধিকাংশ স্ত্রীকেই পড়তে হয়।

কথাবিবি সেদিন সকালে ডিমের ওমলেট করলেন। খাওয়ার টেবিলে বসে ডিমের ওমলেট দেখেই নাক সিঁটকালেন কথাসাহেব, 'আবার ডিমের ওমলেট।'

পরের দিন কথাবিবি ডিমসেদ্ধ করলেন। আজ আবার উলটো কথা, কথাসাহেব ডিমসেদ্ধ দেখে বলেন, 'আজ ডিমসেদ্ধ কেন, কাল ওমলেটটা বেশ ভাল হয়েছিল।'

মহা বিপদ। ডিমের পোচ দিলে ওমলেট, ওমলেট দিলে ডিমসেদ্ধ, কথাসাহেব ঠিক যে কি চান কথাবিবি ধরে উঠতে পারেন না।

কিন্তু কথাবিবি স্বাভাবিক কারণেই সকালবেলায় জলখাবারের টেবিল থেকে গোলমালটা আরম্ভ করতে চান না। এরপরে সারাদিন আর দম থাকে না, বিকেলের দিকে ঝগড়াটা জুতসই হয়ে জমে না।

অনেক ভেবেচিন্তে কথাবিবি একটা মোক্ষম বুদ্ধি বার করলেন। কিছু অপব্যয় হবে বটে কিন্তু গোলমালটা এড়ানো যাবে।

কথাবিবি সেদিন সকালে একই সঙ্গে ডিমসেদ্ধ ডিমের পোচ আর ওমলেট তিনটেই করলেন। করে পাশাপাশি তিনটে প্লেটে সাজিয়ে স্বামীর সামনে ধরলেন।

কিন্তু কথাসাহেব তেমন সহজ লোক নন। ভুরু কুঁচকিয়ে তিনটি প্লেট অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে আঙুল দিয়ে ডিমসেদ্ধটাকে দেখিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ওই ডিমটা ওমলেট করা উচিত ছিল, আর ঐ ওমলেটের ডিমটাকে পোচ।'

এর পরে আর এ কাহিনী বাড়িয়ে লাভ নেই। কথাবিবি আর কথাসাহেবের টাগ অফ ওয়ার চলুক, সারা জীবন ধরে চলুক। প্রজাপতি ঋষির কাছে নিবেদন, 'প্রভু নজর রাখবেন। দেখবেন দড়িটা যেন ছিঁড়ে না যায়।'

পুনশ্চ :

গল্পটা যখন ডিম নিয়ে, ডিমের পুরনো গল্পটাও একটু ছোট করে লিখি।

বাজার থেকে একটা ডিম কিনে এনেছিলাম। বাসায় এসে দেখি সেটা পচা। দোকানে ফেরত দিতে নিয়ে গিয়ে দোকানদারের ওপর খুব রাগারাগি করলাম।

বুড়ো দোকানদার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে গালাগাল খেয়ে তারপর হাত তুলে আমাকে থামিয়ে তাঁর ডিমের ঝুড়ির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে আমাকে করুণ

কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, আপনার মাত্র একটা পচা ডিম তাই এত রাগারাগি করছেন আর আমার ঝুড়ি ভর্তি পচা ডিম আমি কি করি বলুন তো?'

আমার এই ডিমের গল্প পড়ে কারোর যদি মাথাগরম হয়, দয়া করে ঐ বুড়ো দোকানদারের কথাটা স্মরণ রাখবেন।

ভুবনসুন্দরী

ভুবনসুন্দরী, ঠিক সেই অর্থে, আমাদের কেউ নন। তাঁর শরীরের এক বিন্দু রক্তও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত নয়।

ভুবনসুন্দরী ছিলেন আমার প্রপিতামহের জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী জগৎসুন্দরী দেবীর কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী অর্থাৎ, তিনি ছিলেন আমার প্রপিতামহের মাসী।

জগৎসুন্দরী দেবী আমার প্রপিতামহ জন্মানোর কয়েকদিনের মধ্যেই আঁতুড় ঘরে মারা যান। সেকালে এমন হত। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল পিত্রালয়ে।

আমার প্রপিতামহ এর পরে বেশ কিছুকাল মাতুলালয়েই বড় হন, অনেক কষ্টে, বহু পরিচর্যায় সেই দুধের শিশুকে সদ্য যুবতী, সদ্য বিধবা, স্নেহশীলা ভুবনসুন্দরী লালনপালন করে ছিলেন। ভুবনসুন্দরী তখন শুধু সদ্য বিধবা নন। তিনিও সদ্য প্রসূতি। তিনিও পিত্রালয়ে এসেছিলেন প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে। যেদিন তাঁর কন্যাসন্তান জন্মায়, সেদিনই তাঁর স্বামী ঠিক কন্যার জন্ম মুহূর্তেই মারা যান। ভদ্রলোক সাবেকি ইঞ্জিনিয়ার, সাঁতরাগাছির ভাদুড়ীবংশ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জ্ঞাতিঘর, বোধহয় সম্পর্কে জ্যাঠা হতেন। হাওড়ায়, বেলিলিয়াস রোডে একটা কারখানায় ফোরম্যান ছিলেন। সেখানে কি একটা যন্ত্র ফেটে মুহূর্তের মধ্যে গতপ্রাণ হন।

আঁতুড়ঘরেই সে খবর ভুবনসুন্দরীর কাছে পৌঁছায়। ইংরেজিতে যাকে বলে টিনএজার, ভুবনসুন্দরী তখনো তার সীমানায়, এর মধ্যে বিবাহ, মাতৃত্ব, বৈধব্য এক জন্ম প্রায় শেষ।

পদ্মার পূর্বতীরের এক বিসর্পিল উপনদীর বাঁকে আমার প্রপিতামহের মাতুলালয়ের সেই সৎ ব্রাহ্মণ গ্রামে জীবন রসিক মহোদয়ের অভাব ছিল না। ভুবনসুন্দরীর সেই হতভাগিনী সদ্যোজাত কন্যার নাম রাখা হয়েছিল সুলক্ষণা।

এবং ততোধিক রসিকতা হল, এর অব্যবহিত পরে ভুবনসুন্দরীর দিদি জগৎসুন্দরী যখন একই আঁতুড়ঘরে পুত্র-সন্তান জন্ম দিয়ে চিরায়ুতী হলেন অর্থাৎ বাংলা বচনে সধবা মারা গেলেন, জগৎসুন্দরীর বয়েস তখন সদ্য একুশ, সেই পুত্র-সন্তানের নাম রাখা হল ভাগ্যধর।

ভাগ্যধর এবং সুলক্ষণা দুজনেই ভুবনসুন্দরীর স্তন্যপান করে বাঁচলেন এবং বড় হলেন। ইতিমধ্যে বিধবা ভুবনসুন্দরী ভাগ্যধর এবং সুলক্ষণাকে নিয়ে তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়িতে জামাইবাবুর কাছে চলে এসেছেন। কালক্রমে সেই সংসারেই তিনি থেকে যান, সেই বাড়ি থেকে, আমাদের বাড়ি থেকেই সুলক্ষণার বিয়ে হয় এবং ভুবনসুন্দরী দেবী যথাকালে পরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমার প্রপিতামহ তাঁর হাতে মানুষ হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে পুনরায় অকালে মাতৃহীন আমার পিতামহকেও তিনি পৌত্রস্নেহে লালনপালন করেছিলেন।

আমার জন্মে ভুবনসুন্দরী দেবীকে বা ভাগ্যধর রায়কে দেখিনি তবে পিতামহের কাছে ভুবনসুন্দরীর কথা অনেক শুনেছি। একটা কারণে ভুবনসুন্দরী দেবীকে আমি অন্তত মনে রেখেছি।

সেই কারণ নিয়েই এই গল্প।

গঞ্জশহরে আমাদের বাপঠাকুরদার চার পুরুষের ওকালতির ব্যবসা। পুরনো সেরেস্তা নানা ধরনের নানারকম মক্কেল।

বড় বড় মক্কেলরা, জোতদার-তালুকদার, পাটের দালাল এই সব লোকেরা চাইতেন মামলার তারিখ যেন বর্ষাকালে পড়ে। সেই সময়ে যাতায়াতের সুবিধে। বড় বড় পানসি নৌকোয় তাঁরা শহরের কাছে নদীর ঘাটে এসে ডেরা বাঁধতেন।

শহরের নানা আকর্ষণ। 'বিলাতি আরকের দোকান', কালীবাড়িতে ভাদ্রকালী পুজোয় অমাবস্যার মধ্যরাতে দ্বাদশ ছাগবলি, বাণীচিত্র টকিজে সরল হিন্দি চিত্রে অশোককুমার লীলা চিটনিস, শহরের নটিপাড়ায় গারো পাহাড় থেকে একটি সুন্দরী নতুন এসেছে, তার গায়ের রং মেমসাহেবদের মত ফরসা, তার চোখের রং খয়েরি, সে মেমসাহেবদের মত ফ্রক পরে।

এই তো জীবন।

ভরা বর্ষায় টইটুম্বুর নদী। ঝমঝম বৃষ্টিতে আড়াল হয়ে যায় সব দৃশ্য আর শব্দ। নদীর ঘাটে বাঁধা পানসি নৌকো জলে ভিজছে। বাঁয়াতবলা, হারমনিয়ম; কখনও নূপুর বেজে ওঠে নর্তকীর চঞ্চল চরণে।

একপাশ দিয়ে ইলিশের ডিঙি যায় তরতর করে, পানসির অধিবাসীরা দামদর করে দুহালি মাছ কেনে, প্রতি চারখানা মাছে এক হালি। জলে ভেজা বাতাসে ভাজা ইলিশের গন্ধ ঘুরপাক খায়। সেই গন্ধে জনপদের বেড়াল বৃষ্টি থেমে গেলে নৌকোর ঘাটে আসে, মিউ মিউ করে কাঁদে। কখনও দুঃসাহসে ভর করে উঠে যায় পানসিতে।

এই রকমই একটা পানসিতে গোপালগঞ্জের চৌধুরীরা এসেছিলেন এক বছর শ্রাবণ মাসে, আমাদের শহরের ঘাটে নৌকো বেঁধে ছিলেন।

চৌধুরীরা মানে বুড়ো চৌধুরীমশায়, সঙ্গে একজন নায়েব, একজন রান্নার লোক আব চারজন মাঝি। চৌধুরীমশায় মামলার কাজে শহরে এসেছিলেন। তিনি আমাদের সেরেস্তার পুরনো বনেদি মক্কেল, প্রথমে দুদিন নৌকোতেই ছিলেন, পরে ঠাকুরদার অনুরোধে আমাদের বাসায় এসে ওঠেন।

আমাদের কাছারিঘরটা ছিল এক বড় টিনের আটচালা, সেই আটচালার কাঠের দোতলায় অতিথিদের জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল।

চৌধুরীমশায় আমাদের বাড়িতে এসে ভালো করেছিলেন। আমাদের ওদিকে কোনও কোনও বার বর্ষাকালে শেষরাতের দিকে হঠাৎ একটা দমকা ঘূর্ণিঝড় হত। দীর্ঘ দিন বৃষ্টিতে ভেজা বড় বড় গাছ সেই ঝড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত। উড়ে যেত টিনের চালাঘর, নৌকো ডুবে যেত নদীতে।

সাধারণত সেই সব নৌকোই ডুবত যেগুলো নদীর ঘাটে বাঁধা থাকত। ঝোড়ো হাওয়ায় আচমকা ধাক্কায় দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকো দড়িতে টান পড়ে হঠাৎ উলটিয়ে জলে ডুবে যেত। বরং নৌকো যদি চলমান থাকত তা হলে ডোবার সম্ভাবনা কম ছিল।

অবশ্য এ রকম খ্যাপাটে ঘূর্ণিঝড় কদাচিৎ দুচার বছরে একবারই হত। তাই যতটা

সাবধান হওয়া দরকার, লোকেরা ততটা সাবধান হত না।

সে বার ঐ রকম এক ঝড়ে চৌধুরীমশায়ের পানসি নৌকো এক শেষরাতে আমাদের নদীতে ডুবে গেল। সুখের কথা কোনো প্রাণহানি হয়নি। ঝড়ের আভাস পেয়েই তাঁর লোকজন নৌকো থেকে ছুটে নদীর পারে নেমে কাঠের খুঁটি থেকে নৌকোর কাছি খুলে দিয়েছিল।

কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

বড় একটা বজরা নৌকোর সঙ্গে চৌধুরীমশায়ের পানসির ধাক্কা লাগে। এই সব বড় বড় বজরা নৌকোয় মালদহ থেকে ফজলি আম আসত সে সময়, মধুপুরের গড় থেকে আসত গজারি কাঠের লম্বা খুঁটি আর কাঁঠাল। আসত বালাম চাল, কয়লা এমনকি কাপড়ের গাঁট।

বজরা নৌকোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পানসিটা ছিটকিয়ে মাঝনদীর দিকে যেতে যেতে একদিকে কাত হয়ে উলটিয়ে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জলের নীচে তলিয়ে যায়।

পরদিন ভোর না হতে ওই দুঃসংবাদ আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছাল। শেষরাতের ঝড়বৃষ্টির পরে তখন বাতাসে একটা ঠাণ্ডার আমেজ। বাড়ির কেউই প্রায় তখনো বিছানা ছাড়েনি। চৌধুরীমশায়ও কাঠের দোতলায় শুয়ে রয়েছেন।

নৌকোর মাঝিদের হাঁকাহাঁকিতে প্রায় সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং মাঝিদের মুখে নৌকো ডুবে যাওয়ার বিবরণ শুনল।

আমাদের শক্তপোক্ত বাড়িঘর। কিছু গাছপালা বুড়ো হলেও ঝড়ে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। শুধু ভুঁইচাঁপা ও কলাপতি ফুলের ঝাড়গুলো কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে আর নারকেল গাছের মাথা থেকে একটা কাঠঠোকরা পাখির বাসা উঠোনে পড়ে গেছে। যে পাখি দুটো বাসা বেঁধেছিল তারা ছাদের কার্নিসে বসে উঠোনে ভাঙা বাসাটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তার ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাঝিদের সঙ্গে চৌধুরীমশায় নদীর ঘাটে গিয়ে অল্প পরেই ফিরে এলেন। ফিরে এসে পিতামহকে বললেন, 'নৌকোটা একেবারে মাঝগাঙে গিয়ে তলিয়েছে। ভরা বর্ষায় ভরা নদী। এখন তোলার চেষ্টা করে লাভ নেই। তোলা যাবেও না।'

ঠাকুরদা বললেন, 'তা হলে?'

চৌধুরীমশায় বললেন, 'নদীর জল শুকিয়ে এলে শীতকালে এসে নৌকোটা তুলব।' এটাই আমাদের জলা দেশে তখনকার প্রচলিত নিয়ম ছিল, জলে ডোবা নৌকোর অধিকার নিয়ে সাধারণত কোনও বাদ বিসম্বাদ হত না। যথাসময়ে যে যার নৌকো নদীর জল কমে গেলে লোক লাগিয়ে তুলে নিত। জলে ডোবা নৌকো তোলার জন্যে একদল দক্ষ শ্রমিক আসত শীতকালে, বোধহয় আজিমগঞ্জ অঞ্চল থেকে।

কয়েকদিন পরে আদালতের কাজকর্ম সেরে একটা ভাড়াটে নৌকোয় বাড়ি ফিরে গেলেন চৌধুরীমশায়।

চৌধুরীমশায় সেবার যে মামলার তদ্বিরে এসেছিলেন সেটা খুব বড় দেওয়ানি মামলা। সেই মামলাটা ছিল তাঁর জ্ঞাতিদের সঙ্গে। বহু বছর ধরে আদালতে মামলাটা ঝুলে ছিল।

খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে চৌধুরীমশায় বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। নৌকোডুবির মত অমঙ্গলজনক ঘটনা ঘটল, এ বার এত বড় মামলাটায় কি হয় কে জানে।

কিন্তু চৌধুরীমশায়ের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ হল। পুজোর ছুটির পরে মামলার রায় বেরোল, চৌধুরীমশায় মামলায় জিতেছেন।

গ্রামে বসে পত্রবাহক মারফত ঠাকুরদার কাছ থেকে মামলা জেতার সংবাদ পেয়ে চৌধুরীমশায় আত্মহারা হয়ে গেলেন।

পত্রোত্তরে তিনি যা জানালেন সে আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক। তাঁর চিঠির সারমর্ম হল, আমাদের নদীতে তাঁর যে পানসি নৌকোটি ডুবে আছে, মোকদ্দমায় জিতে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সেই নৌকোটি তিনি উকিলবাবুকে উপহার দিলেন। উকিলবাবু যদি এই সামান্য উপহার গ্রহণ করেন তা হলে তিনি বাধিত হবেন। আর মাস দুয়েকের মধ্যে নদীর জল নেমে যাবে তখন যেন উকিলবাবু নৌকোটাকে তুলে নেন। নৌকো তোলা বাবদ যা খরচ-খরচা হবে তার সব তিনিই বহন করবেন।

চিঠি পেয়ে আমাদের বাড়িতে প্রবল উত্তেজনা। এই প্রথম আমাদের নিজেদের একটা নৌকো, তাও সাধারণ কোনও নৌকো নয়, পানসি নৌকো হতে যাচ্ছে।

কিন্তু পিতামহ বিচক্ষণ লোক, তিনি অবিলম্বে চৌধুরীমশায়কে জানালেন, উপহারের কথা জেনে তিনি ধন্য হয়েছেন। কিন্তু নদীতে তো আরও অনেক নৌকো ডুবে থাকতে পারে। তার মধ্যে কোনটা চৌধুরীমশায়ের নৌকো কি করে বোঝা যাবে।

পরের দিনই চৌধুরীমশায়ের নায়েববাবু এলেন, বললেন, 'নৌকো চেনা কঠিন হবে না। নৌকোর পেছনের গলুইয়ের কাঠে মকরের মুখ আঁকা আছে, ওরকম মকরের মুখ আর কোনও নৌকোয় নেই।'

নায়েবমশায় আরও বলেন, নৌকো তোলার সময় খবর পাঠালে তিনি আসবেন, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নৌকো চিনে দেবেন।

পঞ্জিকাতে অন্য কোনও শুভকর্মের দিন না থাকুক নৌকোগঠন, নৌকোচালন এবং নৌকোযাত্রার দিন বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত সব মাসেই থাকে। ঐ রকম একটা দিন দেখে মাঘমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌধুরীমশায়কে খবর পাঠানো হল।

শীতকাল, মাঠঘাট সব শুকনো, নায়েবমশায় নয় চৌধুরীমশায় নিজেই পালকি করে এলেন। নৌকো তোলার দিন নদীর ঘাটে রীতিমত যাগযজ্ঞ করে নৌকোতুলুনিরা জলে নামল। যেখানে গিয়ে নৌকোটা ডুবেছিল তার চেয়ে বেশ কিছু দূরে, স্রোতের আর জলের গতি হিসেব করে প্রায় সুনির্দিষ্ট জায়গায় নৌকোটা পাওয়া গেল।

আমাদের আশঙ্কা ছিল নৌকোটা নিশ্চয় একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে ছয়মাস জলের নীচে থেকে। কিন্তু তা নয়। রীতিমত বিবর্ণ হয়েছে বটে, এখানে ওখানে কাঠের তাপ্পি ও জোড় খুলে গেছে, হালটা ভেঙে গেছে তবু মোটমাট কোনও ক্ষতি হয়নি সবচেয়ে আশ্চর্য নৌকোর গলুইয়ের মকর মুখ, সেটা নিখুঁত, অটুট রয়েছে।

ঠেলেঠুলে নৌকো নদীর চড়ায় তোলা হল। নৌকোতে কাঠমিস্ত্রি লাগানো হল মেরামতির জন্যে, রং মিস্ত্রি লাগানো হল রং করার জন্যে।

আমরা প্রত্যেকদিন সকাল বিকেলে নৌকো সারানো, নৌকো রং করা দেখতে যেতাম। মাঘ মাসের হাওয়া নদীর খোলা তীরে হু-হু করে বইছে, চারদিকে ঝলমলে রোদ্দুর, নদীর ওপাশে মটরশুঁটি আর সরষের ক্ষেতে সবুজ হলুদে মেশামেশি। কোথা থেকে কৃষ্ণকণ্ঠ বিদেশি পাখিরা দল বেঁধে এসেছে, সারাদিন নদীর জলে আর জলের ওপরে আকাশে

তাদের ছুটোপুটি।

নদীর এক পাশে খেয়াঘাট। সেই খেয়াঘাটের ওপরেই একটা বড় আমলকি গাছ, ঝিরিঝিরি শীতের বাতাস আর রোদ সেই গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে; সবই দেখছি মনে আছে।

এদিকে আমাদের পিতামহ কাউকে কিছুই বলেননি। রং হয়ে যাওয়ার পরে একদিন বিকেলে নদীর পারে গিয়ে দেখি নৌকোর গায়ে নৌকোর নাম লেখা হয়েছে 'ভুবনসুন্দরী।'

ভুবনসুন্দরী দেবীর স্নেহের ঋণ এইভাবে পরিশোধ হল কি না কে জানে। তবে আমাদের বাড়িতে স্বাভাবিক ভাবেই ভুবনসুন্দরী বিষয়ে অনেক গল্পকথা প্রচলিত ছিল, তাঁর নাম দিয়ে একটা নৌকোর নাম দেওয়ায় কেউ খুব মাথা ঘামাল না। তাছাড়া নৌকোর যে একটা নাম দিতে হবে এ কথাটা আর কারও মাথায় আসেনি। বিকেলে নদীর ঘাট থেকে ফিরে এসে আমি বাড়ির মধ্যে নৌকোর ভুবনসুন্দরী নামকরণের ব্যাপারটা জানালাম। সবাই একটু অবাক হল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অনেক আলোচনার পর পরের দিন সকালে বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে নদীর ঘাটে 'ভুবনসুন্দরী'কে দেখতে গেল।

ফাঁকা নদীর তীরে বালির ওপরে সদ্য রং করা সবুজ পানসি নৌকো, তার গলুইয়ে মকরমুখ—রূপকথার ময়ূরপঙ্খী নৌকোও বুঝি এত সুন্দর দেখায় না।

নদীর চড়ায় উঠিয়ে নৌকো সারানো হয়, রং করা হয়, নতুন নৌকো বানানো হয়। তারপর সেই খটখটে শুকনো ডাঙায় নৌকোগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বর্ষার দিনের জন্যে প্রতীক্ষা করে, কবে নদীতে জল আসবে, জল এসে স্পর্শ করবে নৌকোকে, তখন এক ধাক্কায় নদীতে নামিয়ে দেওয়া হবে নৌকো। নৌকোর জলের জীবন শুরু হবে।

সে বছর বর্ষার আশা নিয়ে, নদীতে জল আসা নিয়ে আমরা খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। বার বার আমার মনে হচ্ছিল এবার বর্ষার জল নদীতে ঢুকতে অনেক দেরি করছে।

তবে নদীতে না ভাসলেও আমাদের নৌকো চড়ার কমতি ছিল না। ভাইয়েরা মিলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদিন বিকালে নদীর তীরে গিয়ে আমরা সেই স্থাবর পানসি নৌকোয় চড়ে জাহাজ-জাহাজ খেলতাম।

অবশেষে একদিন নদীতে জল এল। ভুবনসুন্দরী জলে নামল। মা-ঠাকুমা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আমরা নদী বেয়ে চারমাইল দূরে স্টিমারঘাটে গিয়ে ঢাকা-সিরাজগঞ্জের রুটের বড় স্টিমার দেখে এলাম, বিশাল জলযান। হৈ-হৈ করছে লোকজনে, যাত্রীর চেঁচামেচিতে। কলকাতার লোক ঢাকায় আসছে, ঢাকার লোক কলকাতায় যাচ্ছে।

স্টিমারঘাট থেকে আমরা হাঁড়ি-ভর্তি মিষ্টি কিনে আনলাম আর পথে নদীর ধারে জেলেদের কাছ থেকে এক খালুই টাটকা ট্যাংরা, পাবদা।

বিকেল বিকেল বেরিয়েছিলাম, ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা, তখন বাণীচিত্র সিনেমাহলে সেকেন্ড শো সদ্য আরম্ভ হচ্ছে। একটাই ছবি চালানোর মেশিন, প্রতি রিলে ইন্টারভ্যাল, একটা রিল শেষ হয়ে গেলে পরের রিল ভরে আবার সিনেমা দেখানো শুরু হয়।

এর আগে কোনও দিন আমি এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকিনি। কিছুক্ষণ আগের

অন্ধকার নদীর জলে চলমান আলোকিত স্টিমারের দৃশ্য, স্টিমার ঘাটের কলরোল, নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে পানসির ছাদে বসে থাকা, যদিও অন্ধকার রাত আকাশে কোথাও চাঁদ ওঠেনি তবু পিসিমার গলা খুলে গান, 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো'—সব কিছু মিলে সেই সন্ধ্যায় আমি একবেলায় অনেকটা বড় হয়ে গেলাম।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর ঠাকুরদা কিন্তু খুব রাগারাগি করেছিলেন। রাগারাগি রাত হওয়ার জন্যে নয় বা অন্য কোনও কারণে নয়।

ভুবনসুন্দরীর তখনও শুভ উদ্বোধন হয়নি, নদীর ধারে জললক্ষ্মীর পুজো করে, সিঁদুর চন্দনে অভিষিক্ত করে তারপর ভুবনসুন্দরীকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, তার আগে নয়।

পরদিন সকালেই কালীবাড়ি থেকে পুরোহিত ডেকে পঞ্জিকা দেখে শুভ দিনক্ষণ নির্ধারিত হল। এই সূত্রে কিছু একটা খটকা দেখা দিল, ভুবনসুন্দরী তো বিধবা ছিলেন সারাজীবন শুদ্ধভাবে অতি শুদ্ধভাবে, যাপন করেছেন। তাঁর নামের নৌকোয় সিঁদুর পরানো কি শাস্ত্রসম্মত হবে?

বিশেষ সমস্যায় পড়ে গেলেন পুরোহিত মশায়। এ ধরনের সমস্যার সমাধান সহজ নয়। গ্রন্থে, পুঁথিতে এ বিষয়ে কিছু লেখা নেই। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হল ভুবনসুন্দরীর তো এটা পরজন্ম, নৌকোজন্ম, এ জন্মে তিনি বিধবা নন, সে আগের জন্মে ছিলেন। সুতরাং এই ভুবনসুন্দরীকে সিঁদুর পরানোয় কোনও দোষ হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, যাকে বলা হত ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যে শঙ্খ, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ফুল, বেলপাতা দিয়ে ভুবনসুন্দরীর উদ্বোধন হল জললক্ষ্মীর পুজো করে। মনে আছে সে পুজোর প্রসাদের মধ্যে খিচুড়ি, শোলমাছ ছাড়াও ছিল কলমি শাক আর শাঁপলার অম্বল।

পুজোর শেষে বাড়ির মহিলারা নৌকোর গলুইয়ে মকর মুখের সীমন্তে তেলসিঁদুর পরিয়ে দিলেন। শঙ্খ বাজল, উলুধ্বনি হল।

কয়েকদিন অশেষ আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটল আমাদের। ভুবনসুন্দরীকে নিয়ে আমরা আশেপাশের গ্রামে-গঞ্জে, রথের মেলায়, কাপড়ের হাটে ঘুরে এলাম। ঠাকুরদা একদিন হাকিম আমলা আর কিছু বন্ধু-বান্ধবকে ভুবনসুন্দরীতে নিমন্ত্রণ করে দুপুরবেলা ভাত মাংস খাওয়ালেন, আস্ত একটা পাঁঠা কাটা হল সেই উপলক্ষে। হাকিম সাহেবরা নাকি সেদিন অনেক মদও খেয়েছিলেন। বিকেল বেলায় আমরা গিয়ে দেখেছিলাম ভুবনসুন্দরীর ছাদে খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে আর নৌকোর ভেতরে একজন কোটপ্যান্ট পরা ব্যক্তি, খুব সম্ভব জনৈক হাকিম সাহেব, উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছেন। একজন মাঝি জানাল, দুপুর থেকে বেঁহুশ হয়ে আছে।

ভুবনসুন্দরী কিন্তু আমাদের খুব কাজে লাগল না। শহরের মধ্যেই আমাদের কাজকর্ম, যাতায়াত। কখনও কদাচিৎ জেলাসদরে, কিন্তু সে তো নৌকোয় তিন দিনের পথ, তার বদলে সরাসরি বাস রয়েছে তিনটে খেয়া পার হয়ে পঞ্চাশ মাইল পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে যায়।

আর কালেভদ্রে ঢাকা, কলকাতা। তার জন্যে স্টিমারঘাটে যেতে অবশ্য নৌকো দরকার পড়ে। কিন্তু সে তো দুচার বছরে একদিন। এদিকে ভুবনসুন্দরীর জন্যে আমাদের

সংসারের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। দুজন মাঝি রাখা হয়েছিল, একজন সব সময়ের, অন্যজন ঠিকে। প্রথমজন দুবেলাই বাসায় খেতে আসত, দ্বিতীয়জন শুধু দুপুরবেলায়। তা ছাড়া সকালে এক কোঁচড় করে মুড়ি আর এক দলা করে আখের গুড়।

কোনও এক অজ্ঞাত কারণে দুজন মাঝির নামই ছিল লখাই। এক নম্বর লখাইয়ের মাইনে ছিলো দেড় টাকা, দু নম্বরের এক টাকা।

একালের পরিভাষায় এক নম্বর লখাই ছিল দু'নম্বরি লোক। নদীর বুকে অন্ধকার নামতে না নামতে তার সৌজন্যে যত রাজ্যের দেশি-ভিনদেশি মাঝিমাল্লারা এসে ভিড় জমাত ভুবনসুন্দরীতে। এক নম্বর লখাই ভুবনসুন্দরীকে একটা গাঁজার আখড়ায় পরিণত করেছিল। গভীর রাতের দিকে নষ্ট রমণীরাও নাকি এসে উঠত আমাদের নৌকোয়।

ছোট শহরের কানাঘুসো একদিন ঠাকুরদার কানে পৌঁছাল। ঠাকুরদার নির্দেশে সেই দিন রাত এগারোটা নাগাদ বাবা তাঁর দু'জন বন্ধুকে নিয়ে পুরো ব্যাপারটা সরেজমিনে তদারক করতে গেলেন।

বাবা নদীর ঘাটে পৌঁছতেই কি করে যেন টের পেয়ে গিয়েছিল লখাই। সে দড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো নিয়ে তরতর করে নদীবক্ষে অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ নৌকোযাত্রা শুরু হওয়ায় ভুবনসুন্দরীর অন্তর্গত গেঁজেল, লম্পট এবং রমণীবৃন্দ চমকিত হয়ে উঠল। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রিব গভীর শূন্যতায় নারীকণ্ঠের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, 'বাবা গো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে গো।'

এরপর আর দু তিনদিন ভুবনসুন্দরীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তিনদিনের মাথায় এক দুপুরে আমাদের গঞ্জশহরের খারাপ পাড়ার কুখ্যাত মহিলা ননীমাসী ঠাকুমার কাছে এলেন।

বালবিধবা ননীমাসী গৃহস্থজীবনে গোয়ালা বাড়ির বৌ ছিলেন। ঘি, ননি, মাখন নিয়ে বহুকাল আমাদের এবং অন্যান্য প্রতিবেশী বাড়িতে তাঁর যাতায়াত। পরবর্তীকালে সাংসারিক অথবা নিতান্ত প্রাকৃতিক কারণে তিনি দেহচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর কোনও ভড়ং ছিল না, নরুন-পেড়ে সাদাখোল ধুতি, সাদা ব্লাউজ। আলতা, কুমকুম, ফুলেল তেল, রঙিন ফিতে, সুরমা-আতর, রঙিন তাঁতের শাড়ি ননীমাসীর প্রয়োজন ছিল না। নিজের দৈহিক আকর্ষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল তাঁর।

ননীমাসীকে আমরা মাসী বলতাম তিনি মাকে দিদি বলতেন বলে। আমাদের সেই সামান্য শহরে পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম, চরিত্র-অচরিত্র—এসব নিয়ে কোনও সংস্কার কুসংস্কার ছিল না।

ননীমাসী ঠাকুমাকে বললেন তাঁর তিনটি মেয়েকে নিয়ে আমাদের লখাই পালিয়েছে। এই তিনটি মেয়েকে বহু কষ্টে, বহু অর্থে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এখন তিনি কি করবেন আবার কি দোরে-ঘি-মাখন বেচে দিন চালাবেন।

ঠাকুমা খুব মনোযোগ দিয়ে ননীমাসীর কথা শুনলেন তারপর বললেন, 'ননী তুমি এখন যাও, দেখি আমি কি করতে পারি।'

ঠাকুমা একদিকে যেমন উদার ছিলেন, অন্যদিকে তেমন সংকীর্ণ ছিলেন। সেদিন ঠাকুরদা কোর্ট থেকে ফেরার পরে ফাটাফাটি কাণ্ড।

সেদিন ঠাকুরদার মনটা একটু ভালো ছিল। কারণ কোর্টে একটা লোক খবর দিয়েছিল,

সাত মাইল দূরে যেখানে যমুনার বাঁকে পটল নামে স্টিমার স্টেশন সেই পটল স্টেশনের একটু আগে একটা চরের পাশে সে একটা পানসি নৌকো দেখেছে, মকর মুখ সবুজ রঙের পানসি নৌকো, তার গায়ে লেখা রয়েছে 'ভুবনসুন্দরী'।

কিন্তু ঠাকুরদা কিছু বলার আগেই ঠাকুমা চেঁচামেচি শুরু করলেন। সেই চেঁচামেচিব মধ্যে দুটো প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে লাগল 'লখাই কোথায়? ননীর মেয়েরা কোথায়?'

ঠাকুরদা কিছুই বুঝতে না পেরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুদিন পরে মাঝিমাল্লা পাঠিয়ে পটল স্টেশনের পাশের চর থেকে ভুবনসুন্দরীকে উদ্ধার করে আনা হল।

বলাবাহুল্য ননীমাসীর মেয়েরা এর আগেই যে যার মত ফিরে এসেছিল। তবে লখাই ফেরেনি।

ভুবনসুন্দরী রয়ে গেল নদীর ঘাটে। আজকাল সে আর আমাদের কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু সে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাড়া-প্রতিবেশীরা ছেলের পৈতেয়, মেয়ের বিয়েয়, প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ঠাকুর্দার কাছে এসে ভুবনসুন্দরীকে চায়। এমনকি মেলায় যাওয়ার জন্যে, চড়ুইভাতির জন্যে, ভুবনসুন্দরীকে নেওয়ার জন্যে বহু দাবিদার।

দুই নম্বর লখাই বোকাসোকা মানুষ। সে একবেলা খায়, এক টাকা মাইনে পায় সেই ভুবনসুন্দরীর দেখাশোনা করে। যারা এসে ভুবনসুন্দরীকে চায়, ঠাকুরদা তাদের বলেন, 'নিতে পারো। কিন্তু আমার মাঝিমাল্লা নেই সে তোমাদের জোগাড় করতে হবে।'

এ সব সত্ত্বেও ভুবনসুন্দরীর চাহিদার অভাব ছিল না।

এক বছর কেটে গেল।

আরও এক বছর কেটে গেল।

তৃতীয় বছরের বর্ষায় একদিন শেষরাতে আবার সেই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এল। দু নম্বর লখাইকে ঠাকুরদা সব বলে রেখেছিলেন।

ঝড় আসার মুহূর্তে ভুবনসুন্দরী থেকে নেমে লখাই নৌকোর দড়িটা তীরের খুঁটি থেকে খুলে দিল।

তারপর আমরা আর ভুবনসুন্দরীর কোনও খবর পাইনি। নদীর জলে ডুবে গিয়েছিল নাকি নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ভুবনসুন্দরী?

কে জানে?

আমরা আর কখনও ভুবনসুন্দরীকে দেখিনি।

আলাভোলা

আমি একজন উদ্বাস্তু। আমি একজন গৃহহারা। কোনওদিন কোথাও আমার বাড়ি ছিল, ঘর ছিল। আমাদের ঘরের সামনে কাঠচাঁপা গাছের ডালে সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই শালিকপাখিরা ঝগড়াঝাঁটি করত। সেই সুযোগে সোনার বরণ চাঁপা ফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ত আমাদের সিঁড়িতে। আমাদের চিলেকোঠার কার্নিশে সারা দুপুর বাক-বাক-বাকুম

ডাকত এক ঝাঁক পায়রা।

তা ছাড়াও আমের ঝরা মুকুলে ছেয়ে যেত আমাদের উঠোন, ছাদ-বারান্দা বসন্তকালে। হঠাৎ শ্রাবণ মাসের কোনও এক রৌদ্রময় মধ্যাহ্নে আমরা চোখের সামনে দেখতে পেতাম আলসের পাশে গত জন্মের ভুঁই চাপা ফুলগুলো হাউই বাজির মত তরতর করে ফুটে উঠেছে। আর ঠিক তার পরের মাসেই সকাল সন্ধ্যা দিনদুপুর সারা রাত শুধু শিউলি, শেফালি আর শেফালিকা; সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করেও তার সৌরভ এড়ানো অসম্ভব।

এ সব চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর থেকে আমি বাড়ি ছাড়া, ঘরহারা। তারপর থেকে এই এতকাল বিছানা মাথায় বোঁচকা হাতে ভিন দেশের ভিন শহরের পথে পথে গলিতে গলিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছি। দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে, বেল বাজিয়ে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি, 'ঠাঁই আছে গো?'

এই পৃথিবীতে আমার মত দুঃখী অনেক। অনেকের কাছেই আমার এই সব আদিখ্যেতার কোনও মূল্য নেই।

তবে তাদের নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। কারণ আমার এইসব বেদনার একজন ভাগীদার আছে। আমার সেই সঙ্গীর নাম আলাভোলা। সেই আলাভোলাকে নিয়েই এই গল্প।

আলাভোলা নামটা কিন্তু আমারই দেওয়া। একটা গাছের নাম আমি দিয়েছি আলাভোলা। তার সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। তবে তার আসল নামটা আমি আজও জানি না, কেউ আমাকে বলতে পারেনি।

অনেকদিন আগে আমি ছোট ছিলাম।

এক হারিয়ে যাওয়া ছোট শহরের শেষ প্রান্তে একটা হাতপা-ছড়ানো প্রাণখোলা বিরাট বাড়িতে আমি বড় হয়েছিলাম। সে বাড়ির উঠোনে, হাতায়, সদরে, পুকুরপাড়ে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল থেকে সজনে, যজ্ঞডুমুর, চালতা, কামরাঙা কত রকমের যে গাছ, তেঁতুলতলায় কলাগাছের মত উঁচু মানকচু এমনকি শিমূল, অশোক হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সকলের কাছে শুনে শুনে তাদের নাম পরিচয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু আমাদের বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে আমি আলাভোলার দেখা পাইনি।

আলাভোলার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সুনীল ভাদুড়ির পাঠশালার পিছনে ডোবার ধারে।

আমার জীবনের প্রথম লেখাপড়া হয়েছিল ওই সুনীল ভাদুড়ির পাঠশালায় মাটির ক্লাসে। সেই পাঠশালায় পর্যাপ্ত বেঞ্চি ছিল না, সবচেয়ে নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা মেজেতে, মাটির দাওয়ায় বসে পড়াশুনো করত, তাই সেটা ছিল মাটির ক্লাস।

কথাটা এখনও চালু আছে কি না জানি না। তবে আমাদের সময়ে পাঠশালায় ছোট বাচ্চাদের 'কি ক্লাসে পড়ো' প্রশ্ন করলে তারা সরল মনে বলত, 'মাটির ক্লাসে পড়ি।'

সেই মাটির ক্লাসে একদিন বৃষ্টিমুখর দুপুরবেলায় খবর পৌঁছল রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কে কিংবা কি, কিছুই জানি না, তখন আমার ছয় বছর পূর্ণ হতে বেশ কয়েক মাস বাকি। কিন্তু পাঠশালা ছুটি হয়ে গেল। অঝোরে বৃষ্টি এল সেদিন ভরদুপুরে।

বৃষ্টি থামতে উঠোনে নেমে দেখি জলে জলাকার, পাঠশালার পাশের ডোবা জলে থই-থই আর সেই ডোবা এবং পাঠশালার সীমানার মাঝামাঝি একটা পোড়ো ভিটের ওপরে এক ঘনসবুজ ঝাঁকড়া গাছ, বৃষ্টিতে ভিজে মেঘলা দিনের হালকা আলোয় ঝলমল করছে।

সেই প্রথম দেখা। তখনও এবং এখনও আমি গাছটার নাম জানি না। খুব বড় নয়, তেমন ছোটও নয়, একটা শক্ত সমর্থ গাছ, বেশ ডালপালা ছড়ানো, পাতাগুলো কাঁঠালপাতার মত বেশ মজবুত তবে আকারে ছোট। সেই বর্ষায় গাঢ় সবুজ, প্রায় কালোর কাছাকাছি রঙ, কিন্তু একটা বন্য উজ্জ্বলতা আছে।

গাছটার সঙ্গে আমার চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সেই সময়ে আমি কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম গাছটার নাম জানতে। পাঠশালায় মাস্টারমশায় থেকে সহপাঠীরা কেউই আমার প্রশ্নকে পাত্তা দেয়নি। আমাদের পাড়ার বদন গোয়ালা ছিল সবজান্তা, বহুদর্শী মানুষ। একদিন তাকে দেখেছিলাম ঐ গাছটার নিচু ডালের পাতাগুলো দা দিয়ে কেটে নিচ্ছে তার গরুদের খাওয়ানোর জন্য। বদন গোয়ালাকে আমার বাবাকাকা বলতেন বদনদা, আমরা বলতাম বদনজ্যাঠা। আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'বদনজ্যাঠা, এই গাছটার নাম কি?'

বদনজ্যাঠা বলেছিল, 'এ গাছের আর কি নাম হবে? এর কোনও নামটাম নেই। এটা একটা জংলা গাছ।'

এরপর আমি আর কারও কাছে ঐ গাছটার নাম জানতে চাইনি। বরং আমি নিজের মনে মনে গাছটার নাম দিলাম 'আলাভোলা।'

ঐ অত ছোট বয়সে একটা নতুন গাছের এত ভাল একটা নাম কি করে দিয়েছিলাম সেই গোপন কথাটা এবার বলা উচিত।

আমাদের বাড়িতে একটা হরিণরঙা ছাগলের দুটো বাচ্চা হয়েছিল তখন। দুটোই কালো কুচকুচে, শুধু গায়ের লোম নয়, তাদের চোখও ছিল ব্ল্যাকবোর্ডের মত কালো। তাদের দুটিমাত্র কাজ ছিল, মায়ের দুধ খাওয়া আর লাফানো। আর সে কি লাফানো। তিড়িং তিড়িং করে দেড়হাত-দুহাত শূন্যে উঠে যাচ্ছে, তারপরেই চিৎপাত এবং মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চোঁচা দৌড় এবং সেই দৌড়তে গিয়ে আবার কোথাও ধাক্কা খেয়ে আবার চিৎপাত।

এইসব গোলমাল কাণ্ড দেখে আমার ঠাকুমা ওদের দুজনের নাম দিয়েছিলেন আলা আর ভোলা। তবে কে যে আলা আর কে যে ভোলা, সেটা আমরা কেউই এমনকি বোধহয় তাদের হরিণবসনা জননীও কখনও ধরতে পারত না।

তা হোক, আলা আর ভোলা, দুই কাজলকালো ছাগলছানার নাম মিলিয়ে নিতান্ত সরল চিত্তে এই অচেনা গাছটির নামকরণ করলাম', 'আলাভোলা'।

আলাভোলা কিন্তু তত আলাভোলা নয়। সে আমাকে সারাজীবন মনে রেখেছে।

মাটির ক্লাস থেকে বড় ইস্কুলে গেলাম। জেলা বোর্ডের সড়কের সীমানা থেকে নদীর ধারে। ক্লাসের শেষ বেঞ্চে চুপচাপ, বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ বসে থাকি। হঠাৎ গরমের ছুটির পরে স্কুলে ফিরে এসে শেষ বেঞ্চের শেষ প্রান্তে জানালার ধারে বসে সহসা বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশ বা দিগন্ত নয়। পুরো জানালা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর আলাভোলা।

সেই দিন বিকেলবেলা স্কুলের ছুটির পর পাঠশালার পিছনে সেই ডোবার ধারে পোড়ো ভিটের ওপরে পুরনো আলাভোলা গাছটাকে দেখতে গেলাম। কয়েকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। সেদিন গিয়ে দেখি ভিটে শূন্য, গাছটা ওখানে নেই, শুধু একটা শিকড়ের স্মৃতি পড়ে আছে জমির ওপর।

কেমন যেন সন্দেহ হওয়ায় পরের দিন ইস্কুলের আলাভোলা গাছটাকে যত্ন করে দেখলাম। ও মা এ তো সেই আলাভোলাটাই, এমনকি বদনজ্যাঠা যে ডালগুলো কেটে নিয়েছিল সেই কাটা চিহ্নগুলো পর্যন্ত আছে।

আলাভোলা গাছটা ইস্কুলে আমার সঙ্গে রয়ে গেল। শীতের শেষে পাতা ঝরে না, গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় না, বর্ষায় ঝলমল করে ওঠে ঘন সবুজ সেই নামহীন আলাভোলা গাছ।

তারপর একদিন ইস্কুলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। আমাদের দেশটাও ভেঙে গেল। একটা পুরনো ম্যাপ এক হ্যাঁচকা টানে ওপর থেকে নিচে মধ্য দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হল। ঘরবাড়ি ছেড়ে, বাক্স-বিছানা কাঁধে করে আমাদের চলে আসতে হল।

কিছুদিন পরে কোনওরকমে একটা মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে। তা একদিন দেখি আমাদের থাকবার জায়গাটা থেকে অল্প একটু পেছিয়ে ঠিক রাস্তার মোড়ে একটা পুরনো মসজিদের চাতালে আলাভোলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাসে তার পাতা ঝিরঝির করে কাঁপছে।

তারপর থেকে লক্ষ করেছি যখন যেখানে যাই, যখন যেখানে থাকি আলাভোলা আমার কাছেই থাকে। মধ্যে কিছুদিন ময়দানের কাছে একটা বাড়িতে ছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম, ময়দানের ভিকটোরিয়ার এত সব বনেদি গাছের মধ্যে আলাভোলা আসতে পারবে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য! একদিন ছুটির বিকেলে ময়দানে হাঁটতে গিয়ে দেখি উলটো দিকের ভিকটোরিয়ার পাশের মাঠে, যেখানে মেলা-টেলা হয় সেখানে আলাভোলা। ঠিক মাঠের মধ্যখানে নয়, একপাশে ভিকটোরিয়ার পাঁচিল ঘেঁষে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে যে সে এখানে বেমানান। কিন্তু উপায় নেই, তাকে আমার জন্যেই আসতে হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আমার জন্যে আলাভোলা সেখানে চুরি করে থেকে গেল।

অবশেষে আজ কিছুদিন হল আমি আবার বাড়িছাড়া হয়েছি। বাড়ি বদলের ঝামেলায় নতুন ঠিকানা, নতুন রেশন কার্ড, দুধের কার্ড—আলাভোলাকে মনেই ছিল না। হঠাৎই আলাভোলাকে আজ সকালে মনে পড়ল। ভাবলাম—যাই ভিকটোরিয়ার বাগানে একটু হেঁটেও আসি। আলাভোলাকে দেখেও আসি।

.কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের দরজা পর্যন্ত গেছি, দেখি আমার সামনে একফালি জলে-ডোবা জমিতে আলাভোলা দাঁড়িয়ে। এবার সে আমার বাড়ি পর্যন্ত, বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে গেছে।

ভি এম স্যার

তোমরা কি কেহ কখনো মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছো?' গ্রন্থের নাম নবনীতিসুধা। গ্রন্থকারের নাম যতদূর মনে আছে উপেন্দ্রমোহন দাস।

নবনীতিসুধা বইয়ের প্রথম রচনাটি মাছরাঙা পাখির বিষয়ে। বইয়ের শুরুতেই একটা পূর্ণ পৃষ্ঠা মাছরাঙা পাখির রঙিন ছবি রয়েছে।

তখন রঙিন ছবি সুলভ ছিল না। খবরের কাগজে, পত্র-পত্রিকায়, বইপত্রে সবই ছিল সাদাকালো ব্লকের ছবি।

সন, উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রীস্টাব্দ, তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ। মহাযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর। রঙ্গমঞ্চে নাটকের নায়কের আবেগকম্পিত কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা।'

আমি তখন বড় হচ্ছি। মফস্বল শহরের পুরনো দালান বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে পুকুরধারের কাঁচা রাস্তা ধরে খোঁয়া বাঁধানো সড়কে উঠছি। আর একটু এগিয়ে গিয়ে খালপাড়ে ইস্কুল বিন্দুবাসিনী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়। বড় ইস্কুল।

আমাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ক্লাস থ্রি। ঐটাই বড় ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাস।

আমি ইস্কুলে একা যাই না। আবার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধেও যাই না। আমাকে কেউ না কেউ বাড়ি থেকে ইস্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, আবার ছুটির পরে নিয়েও আসে।

আমাকে একা ছাড়া হয় না দুটো কারণে। ইস্কুল যেতে গেলে খালের ওপরে কাঠের সাঁকো পার হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া খালের ওপারেই বড় রাস্তা, বাসস্ট্যাণ্ড। সেখানে ধুলো উড়িয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসে জেলাসদর থেকে, আবার ধুলো উড়িয়ে ফিরে যায়। তখনও মফস্বলে, বিশেষত আমাদের ঐ নদীনালার দেশে এমন লোকের অভাব ছিলো না যারা বাস বা মোটরগাড়ি দেখে অবাক হত, চড়তে ভয় পেত।

অন্য যে কারণে আমার সঙ্গে ইস্কুল যাতায়াতের পথে লোক দেয়া হত, সেটা হল লঙ্গরখানা।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামান্য একটু কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে বাঁধানো সড়কে উঠলে ডানদিকে কালীবাড়ি, একটু বাঁদিকে এগোলে মসজিদ।

বোধহয় সরকারি দাক্ষিণ্যেই সে-সময় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য শহরে দুটো লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে; কালীবাড়ির সামনে হিন্দুদের জন্যে আর মসজিদের সামনে মুসলমানদেব জন্যে। দু জায়গায় একই খাবার, খিচুড়ি। লাল কুমড়ো, শোলা কচু, খোসাসুদ্ধ যে-কোনও জাতের ডাল আর মোটা চাল, বিশাল কাঠের উনুনে বড় বড় টিনের ড্রামে বহুক্ষণ ধরে অনেক জল ঢেলে ঢেলে ফোটানো হত। দিনে একবারই, দুপুরেব পরে বড় বড় লোহাব হাতায় গরম খিচুড়ি শরণার্থীদের ভাঙা থালায়, সানকিতে বা কলাপাতায় ঢেলে দেওয়া হত। খেয়াল রাখা হত যাতে মন্দির আর মসজিদের খিচুড়ি এক সময়েই পরিবেশন করা হয়, না হলে বড় ধবনের গোলমাল হতে পারে, তাছাড়াও

ক্ষুধার্তেরা খাদ্যের লোভে যদি ভিন্ন ধর্মের লোকের ভিড়ে মিশে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে তো জাত যাবে।

তবে জাত যাওয়ার ঢের আগে অনেকের প্রাণ চলে যেত। কালীবাড়ির সামনের রাস্তায় আর মসজিদের সামনের রাস্তায় প্রতিদিনই দুয়েকটা মড়া পড়ে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কবর দেওয়ার বা দাহ করার কেউ জুটত না। অনেকক্ষণ পরে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় কালু এসে মৃতদেহ নিয়ে যেত। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, আবলুস কালো, বিরাটকায় দৈত্যের মত চেহারা ছিল কালুর; চওড়া কাঁধ, বিশাল বিশাল হাতের থাবা। একটা বহু ব্যবহৃত, অতি জীর্ণ, শুকনো রক্ত-নোংরা মাখা খেজুরপাতার পাটিতে শক্ত নারকেলের দড়ি দিয়ে মড়াটা বেঁধে কাঁধে তুলে অক্লেশে নিয়ে যেত কালু। পরে শুনেছি প্রতিটি মড়া বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কালুর বরাদ্দ ছিলো আট আনা। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু লঙ্গরখানার মৃতদের নিয়ে যাওয়ার রেট কমিয়ে চার আনা করে দেন এই যুক্তিতে যে অনাহারে মৃত কঙ্কালসার মানুষের ওজন সাধারণের চেয়ে অনেক কম, তাই অর্ধেক রেট।

বড় তাড়াতাড়ি বড় খারাপ জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গল্পটা এক প্রায় দুগ্ধ পোষ্য বালকের ইস্কুল যাওয়া নিয়ে। পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা মফস্বল শহরের লাল সুরকি বাঁধানো রাস্তা। সাইকেল রিকশা তখনো আসেনি, ক্বচিৎ-কদাচিৎ খুটখুট করে ঘোড়ার গাড়ি যায় টমটম, এক্কা। পালকি দুরকম, পালকি ঘোড়ার গাড়ি আর বেহারা-টানা হুমহুম পালকি। তাতে চড়ে রোগী আসে ডাক্তার বাড়িতে, গ্রাম গঞ্জের নায়েব তহশীলদার আসে নথিপত্র নিয়ে উকিল বাড়িতে। আর দুই বেহারার কাঁধে ডুলি, কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে ঢাকা ডুলির মধ্যে নাকে নোলকপরা পাড়াগাঁয়ের কিশোরী বৌ আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে বসে নায়রে যায়, নায়র থেকে পতিগৃহে ফেরে।

দূরে কালীবাড়ির পিছনে আদালতের মাঠে গত শতাব্দীর একটা অশ্বত্থ গাছ, সারা সময় হাওয়ায় ঝিরঝির করে তার সবুজ পাতা নাচছে, তার চূড়ায় সারাদিন রোদ ছুঁয়ে আছে।

তারও ওপারে খালের ওপারে সিনেমা হল, বাসস্ট্যান্ড। একপাশে হাই ইংলিশ ইস্কুল, তারও বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। পুরনোদিনের লম্বা, টানা টিনের চালা, তার মধ্যে ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ভাগ করে করে ক্লাস, শুধু ইস্কুলের অফিসঘর, হেডমাস্টারের ঘর, টিচার্স রুম এইসব একটা সাবেকি থামওয়ালা দালানে।

সেই দালানের সামনের বারান্দায় একটা আংটার সঙ্গে ঝোলানো আছে খাঁটি কাঁসার বেল একটা। তিনজন দপ্তরি তিনরকমভাবে সে বেলটা বাজায়। সুন্দর, মধুসূদন আর ইসমাইল। বহু দূর থেকে বেল বাজানো শুনলে সারা শহরের লোক বুঝতে পারত এদের মধ্যে কে বেলটা বাজাচ্ছে।

বেল বাজানোয় সুদক্ষ ছিল সুন্দর, আমরা বলতাম সুন্দরভাই, সে বিহারী ছিল, আমাদের ওখানকার ভাষায় পশ্চিমদেশী বা পশ্চিমা, সেইজন্যেই বোধহয় সুন্দরদা না হয়ে সুন্দরভাই হয়েছিল।

বেল বাজানোকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল সুন্দরভাই। ফার্স্ট বেল, সেকেন্ড বেল, টিফিন বেল, ছুটির বেল, হাফ হলিডে বেল—সব কিছুর মাত্রা তাল লয়

একটু আলাদা ছিল। শুনলেই বোঝা যেত কোন বেলটা কিসের জন্যে।

বেল বাজানোর পুরো দায়িত্বটাই ছিল সুন্দরভাইয়ের। তবে ছুটিছাটায় কিংবা অসুখ-বিসুখে অন্য দুজন দপ্তরি এ কাজটা করত, কিন্তু তার কোনও মাধুর্য ছিল না।

ইস্কুল আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমি ইস্কুলে পৌঁছে যেতাম। দূর গ্রামের দু-চারজন ছাত্র ছাড়া সেই সময়ে আর কেউই এসে পৌঁছত না। অনেকটা হেঁটে জলকাদা ভেঙে, কিছুটা ডিঙি বা খেয়ানৌকোয় বেশ খানিকটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসতে হতো বলে দূরের ছাত্রেরা কিছুটা সময় হাতে করেই আসত।

আর আসতেন ভি এম স্যার।

সকালবেলা তালা খুলে ইস্কুল খোলার আগে থেকে বিকেলে ইস্কুল বন্ধের পর ঠিকমত তালা লাগানো হল কি না, সবগুলো তালা ধরে টেনে টেনে দেখে তারপর ভি এম স্যার ফিরতেন। সেকালে খোলা বারান্দা বা উঠোন থেকেও চেয়ার, বেঞ্চি বা তক্তাপোশ চুরি যেত না। তবুও প্রতিটি ক্লাসগৃহের তালা টেনে নিজে না যাচাই করে তাঁর মনে শান্তি হত না।

ঘণ্টা বাজানোর ঠিক আগের মুহূর্তে হেডমাস্টার মশায়ের দেয়াল ঘড়ি দেখে ভি এম স্যার ঘণ্টার কাছে এসে দাঁড়াতেন। এরপর তিনি আঙুল তুলে নির্দেশ দিলে সুন্দরভাই ঘণ্টা বাজানো আরম্ভ করত। তখন ঘড়িব এত ছড়াছড়ি ছিল না। পুরো ইস্কুলে একজন ছাত্রেরও কোনও ঘড়ি ছিল না। মাস্টারমশায়দের মধ্যেও মাত্র দুয়েকজনের পকেটঘড়ি ছিলো। হাতঘড়ি মনে পড়ছে না।

তা সে হাতঘড়িই হোক, আর পকেটঘড়িই হোক ঘড়িওলা লোক তখন একজন মান্যগণ্য। মাতব্বর মানুষ। হাতঘড়ি পবে একটা লোক রাস্তা দিয়ে গেলে বা বাড়িতে এলে লোকে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে দেখে। এমনকি ঘড়ি দেখা ব্যাপারটাও একটা বিশেষ বিদ্যা বলে ধরা হত, অনেকেই জিজ্ঞাসা করত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় নিতে গিয়ে, 'কি খোকা ঘড়ি দেখতে জানো?' আর কনে দেখার সময় এই প্রশ্নটা অনিবার্য ছিল।

সে এক অতীতকালের ব্যাপার।

ভি এম স্যার এক অবলুপ্ত প্রজাতি। বহুকালেব কথা, বহুদিন হল কোনও ইস্কুলে, বিদ্যালয়ে ভি এম স্যার দেখা যায় না।

ভি এম মানে ভার্নাকুলার মাস্টার। বোধহয় তাই ভুল হল কিনা বলতে পারছি না। হয়তো বা অন্য কিছুও হতে পারে ভি এম, কারো কাছে যাচাই করে নেব এতদিন পরে সে উপায়ও নেই।

সে যা হোক, আমাদের বিদ্যালয়ের খুচরো তদাবকি ছাড়াও তিনি আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস শিক্ষক ছিলেন। বড় ইস্কুলে যাওয়ার আগে আমি কোনও পাঠশালায় বা পাড়ার ইস্কুলে পড়িনি। সরাসরি ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই দিক থেকে ভি এম স্যারই আমার প্রথম শিক্ষক।

ভি এম স্যার আমাদের অঞ্চলের লোক ছিলেন না। আমরা পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্বর্তী যমুনা ধলেশ্বরীর অববাহিকার বাসিন্দা। ভি এম স্যার এসেছিলেন দূরাঞ্চল থেকে নোয়াখালি জেলা থেকে।

ভি এম স্যারের প্রকৃত নাম ছিল মৌলভী নঈমুল হোসেন কিংবা ঐরকম কিছু। কিন্তু

সে নাম ভি এম স্যার খেতাবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। বহুকাল ছিলেন তিনি আমাদের শহরে ও ইস্কুলে। শেষ বয়েসে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করতেন এই বলে যে অমুক অমুক বাড়ির বাপ-ঠাকুর্দা-নাতি তিন পুরুষকে তিনি পড়িয়েছেন, তিন পুরুষ তাঁর হাতে কানমলা খেয়েছে।

ঠিক তিন পুরুষ না হলেও বড় জ্যাঠামশাইকে বাদ দিলে আমার বাবা জ্যাঠারা তিন ভাই এবং আমরা চার ভাই তাঁর কাছে পড়েছি। ভি এম স্যার সম্ভবত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, বিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিচু ক্লাসগুলোতে বাংলা, ইতিহাস—এইসব বিষয় পড়াতেন।

তখন নিচু ক্লাসের শিক্ষক আর উঁচু ক্লাসের শিক্ষকের তারতম্য আমরা বুঝতাম না। কোন মাস্টার বেশি শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত, ভালো পড়ান বা খারাপ পড়ান এ নিয়েও খুব একটা মাথা ঘামানো হত না।

আমরা যখন ভি এম স্যারের ক্লাসে ভর্তি হয়েছি তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশের খারাপ দিকে। সে সময়ে মাস্টারমশায়দের অবসরের বয়েস নিয়েও কড়াকড়ি ছিল না, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাকে যতদিন ইচ্ছে রেখে দিতেন।

ভি এম স্যারকে ধুতি পরতে দেখেছি। তবে সাধারণত ইস্কুলে আসতেন ঢিলে হাতা একটা নীল পাঞ্জাবি আর গোড়ালির ওপরে ওঠা খাটো ঝুল একটা পাজামা পরে। পায়ে ফিতেওলা কালো চামড়ার জুতো, কেনার পরে সে জুতোয় কোনও কালে কালি দেওয়া হত বলে মনে হয় না। জামাকাপড়ও সব সময়ে পরিচ্ছন্ন থাকত তা নয়। তবে তখনকার মফস্বলে জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ ছিল অন্যরকম। ফিটফাট, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোকজন খুব কম দেখা যেত। ইস্ত্রিহীন সাবানকাচা জামা গায়ে দিয়েই আমাদের বাল্যকালে কেটে গেছে, জুতো একজোড়া বাসায় থাকলেও সব সময়ে পায়ে থাকত না।

ভি এম স্যার আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস শিক্ষক হিসেবে প্রত্যেক দিন প্রথম ঘণ্টার ক্লাস নিতেন, সেটা বাংলার ক্লাস। ঐ উপেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত নবনীতিসুধা। প্রথম রচনাই মাছরাঙা পাখি :

'তোমরা কি কেহ কখনো মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছো?'

আমাদেরও বাঙ্গাল দেশ, আমাদেরও কথার মধ্যে 'খামু', 'যামু' আছে, কিন্তু ভি এম স্যারের নোয়াখালির উচ্চারণের কাছে সে কিছু নয়। বহু বৎসর আমাদের ওদিকে থেকেও তাঁর উচ্চারণে কোন উন্নতি হয়নি। অনেক সময় বুঝতে একটু কষ্ট হত, কিন্তু তিনি দৈনন্দিন কথাবার্তা তাঁর নোয়াখালির উচ্চারণেই সারতেন। তাঁর উচ্চারণের অসুবিধে বা অসঙ্গতি সম্পর্কে ভি এম স্যার যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। এবং সেইজন্যে ক্লাসে পড়ানোর সময়ে তিনি যথাসাধ্য সাধুভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

বহুকাল পরে একটি বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্রে রূপকথার রাজাকে এই রকম সাধুভাষায় কথা বলতে শুনেছি এবং শোনামাত্রই বহু আগের ভি এম স্যারের কথা মনে পড়েছে।

চলচ্চিত্রের রাজা সাধুভাষায় কথা বলায় বেশ বৈচিত্র্যের এবং কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছিল। ভি এম স্যারের ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক তা নয়।

তখন তো পাঠ্যপুস্তকে প্রায় সমস্ত গদ্যরচনাই ছিল সাধুভাষায় আর আমাদের সেই বাঙাল মফস্বলে মাস্টারমশায়েরা প্রায় কেউই পড়ানোর সময় বা অন্য সময় প্রকৃত চলিত ভাষায় কথা বলতেন না, বলতে পারতেন না। সাধু, বাঙাল এবং চলিত ভাষার একটা

গোঁজামিল সংমিশ্রণ তাঁরা ব্যবহার করতেন।

তার চেয়ে ভি এম স্যারের সাধুভাষা খারাপ ছিল না। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য না হলেও মোটামুটি শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা ভি এম স্যার ব্যবহার করতেন, অন্তত ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন।

প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসেই নাম ডাকা শুরু করে ভি এম স্যার একে একে আমাদের প্রত্যেকের বংশপরিচয় জেনে নিলেন। আমরা অনেকেই তাঁর চেনাশোনা পরিবার থেকে এসেছি, 'তুমি যোগেন্দ্রের পুত্র, তুমি অনিলের ভাগিনেয়, তুমি ডাক্তারসাহেবের দৌহিত্র' ইত্যাদি সম্ভাষণে তিনি আমাদের সনাক্ত করলেন।

ঐ প্রথম দিনেই ভি এম স্যার তাঁর দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করতে কোনোও দ্বিধা করলেন না। আমার পাশে বসে ছিল আমাদের পাড়ারই জাহেদ, জাহেদদের বাড়ির পিছনের ডোবার ধারে মানকচুর ঝোপ, মাখনের মত নরম অতি বিখ্যাত সেই মানকচু, সারা শহরে সে কচুর সুনাম। তাছাড়া মানকচু নাকি বাতের ওষুধ, ভি এম স্যার পুরনো বাতব্যাধির রোগী, কোমরে ব্যথার জন্যে একটু টেনে টেনে চলেন। তিনি জাহেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের বাড়িতে কোনও মানকচু ইহার মধ্যে তোলা হইয়াছে কি?'

সেটা পৌষমাস, জলপাইয়ের ঋতু। ভি এম স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমার কর্তামা জলপাই জারক দিয়াছেন কি?' অর্থাৎ আমার ঠাকুমা জলপাইয়ের আচার করছেন কিনা।

এইরকম সব টুকটাক প্রশ্ন প্রায় সকলকে এবং সবই কোনও দ্রব্যের সন্ধান করার জন্যে। পরে বাসায় ফিরে এসে ঠাকুমাকে জলপাইয়ের আচারের কথা বলতে ঠাকুমা বললেন, 'ঐ ভি এম তো? খালি চাওয়া আর চাওয়া। কাসুন্দি, আচার, কাগজিলেবু, কলার মোচা তোর বাবার কাছে চাইত, কাকার কাছে চাইত। ও লোকটা এখনও আছে?'

আমার ঠাকুমার কথাবার্তা এই রকমই ছিল। কিন্তু পরের দিনই সকালে যখন ইস্কুলে যাচ্ছি, আমাকে বললেন, 'তোদের ভি এম-কে বলিস, রোববার সকালে একটা কাঁচের বয়াম নিয়ে আসতে।'

প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসের আরও দুয়েকটা কথা মনে আছে। আবার এমনও হতে পারে সবই সেই প্রথম দিনের ঘটনা নয়, আগে পরে মিলেমিশে স্মরণে একাকার হয়ে গেছে।

নাম ডাকা অর্থাৎ রোলকল এবং তৎসহ পরিবার-পরিচয় এবং সম্ভাব্য আদান বিষয়ে কথাবার্তা বলার পরে ভি এম স্যার তাঁর ঢোলা পাঞ্জাবির ঢোলা পকেট থেকে মলিন, অতি জীর্ণ, বহু ব্যবহৃত দুটো বই বার করলেন। একটা গোলাম মোস্তাফার 'আলোকমঞ্জরী' আর অন্যটা ঐ উপেন্দ্রমোহনের 'নবনীতিসুধা'।

বইদুটো দু হাতে উঁচু করে ধরে পুরো ক্লাসকে জিজ্ঞাসা করলেন ভি এম স্যার, 'তোমরা বই দুইটি কিনিয়াছ?'

আমরা কয়েকজন কিনেছিলাম, বাকিরা পরে কিনবে।

অনেকে এখনও বই কেনেনি দেখে তিনি যেন একটু খুশি হলেন, বললেন, 'তোমরা এই সপ্তাহের মধ্যেই বইদুটি খরিদ করিবে। খালপাড়ে কাঠের পুলের পাশে বলাই সান্যালের বইয়ের দোকানে আমার নাম বলিবে, টাকায় দুই পয়সা কমিশন পাইবে।'

বইয়ের দোকানটা অবশ্য বলাই সান্যালের নয়। দোকানের মালিক কানাই সান্যাল, অকৃতদার, বিপ্লবী, স্বদেশী। কানাই সান্যাল তখন রাজবন্দী নাকি ইনটার্ন হয়ে গ্রামবন্দী, ,দোকানটা তাঁর অনুপস্থিতিতে চালাতেন তাঁর ভাইপো বলাই সান্যাল।

দোকানের নাম ছিল স্বদেশী পুস্তকালয়, দোকানের বিরাট সাইনবোর্ডে ভারতমাতার ছবি ছিল, উদ্যত ত্রিশূল হাতে ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপরে ভারতজননী সামনে এক পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে, তাঁর মেঘের মত এলো কালোচুলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তাঁর চোখে আগুন।

সে বড় ধরাধরি, কড়াকড়ি, টানাপোড়েনের যুগ, আহত ব্রিটিশসিংহ পাগলের মত আচরণ করছে। স্বভাবতই ভি এম স্যার কানাই সান্যাল কিংবা 'স্বদেশী পুস্তকালয়ের' উল্লেখ না করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলাই সান্যালের কথা বললেন।

কেউ কেউ বলত, ঐ দোকান থেকে বই কিনলে ভি এম স্যার দু-চার পয়সা কমিশন বাবদ পেতেন। কিন্তু বোধহয় এটা ছিল বন্ধুকৃত্য।

ব্যক্তিগত জীবনে কানাই সান্যাল তাঁর সুহৃদ ছিলেন। যখন কানাইবাবু জেলে থাকতেন না বা আত্মগোপন করে থাকতেন না, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় কাছারির মোড়ে বিখ্যাত 'আইডিয়াল টি স্টলে'র একই কাঠের বেঞ্চির অংশীদার ছিলেন দুজনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে দুজনে দুদিকে বাড়ি ফিরতেন। একেক দিন গল্প করতে করতে একজন আরেকজনের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন, তারপর অন্যজনের এগিয়ে দেওয়ার পালা, এইভাবে রাত আরো বেড়ে যেত। অনেক সময় তাঁরা গলা নামিয়ে নিচু কণ্ঠে কি সব আলোচনা করতেন। অনেকের ধারণা ছিল ভি এম স্যারও গোপনে স্বদেশী ছিলেন। এক সময়ে নাকি খদ্দরের জামাকাপড়ও পরতেন।

এতদিন পরে আমার মনে হয় কোনওরকম ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, নেহাতই বন্ধুর অনুপস্থিতিতে দোকানের কোনও ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্যে তিনি আমাদের ঐ দোকান থেকে বই কিনতে বলতেন।

বছরে কয়েকবার দেশে মানে নোয়াখালিতে যেতেন ভি এম স্যার। এমনিতে তাঁর কোনও বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু বাড়ি থেকে যখন ফিরতেন একটু রঙিন হয়ে আসতেন। তাঁর ছিল একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি, কিন্তু বাড়ি থেকে যখন ফিরে আসতেন, দেখা যেতো তাঁর দাড়িটা মেহেদি দিয়ে রঙ করা হয়েছে। আমাদের শহরের রোদেজলে সেই মেহেদির রঙ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। যথাসময়ে কাঁচাপাকা দাড়ি বেরিয়ে পড়ত। পরে আবার দেশে গিয়ে রঙিন হয়ে আসতেন।

আমরা যেবার ইস্কুলে ভর্তি হলাম সে বছর ইংরেজি বছরের গোড়াতেই পর পর কয়েকদিন ছুটি; সরস্বতী পুজো তার আগে ঈদ না মহরম কি যেন জুড়ে প্রায় এক সপ্তাহ ইস্কুল বন্ধ।

ইস্কুল খোলারও দুয়েকদিন পরে ভি এম স্যার ফিরলেন রঙিন দাড়ি নিয়ে। যেদিন তিনি ইস্কুলে এলেন, উঁচু ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাদের ক্লাসঘরে ইস্কুল শুরু হওয়ার আগে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে গেল।

'ভি এম স্যারের রঙিন দাড়ি।'

ভি এম স্যার ক্লাসে এলেন। শুধু রঙিন দাড়ি নয়, সাজপোশাকেরও কিছুটা উন্নতি

হয়েছে, এবার পরনে লং ক্লথের পাঞ্জাবি, পাজামাটাও নতুন। তবে পায়ের বুটজুতো জোড়া অপরিবর্তিত রয়েছে।

ক্লাসে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলো নজরে পড়তে একটু ভুরু কুঁচকোলেন ভি এম স্যার। তারপর কিছুই না বলে ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডটা পরিষ্কার করে মুছে ফেললেন।

আজ তাঁর সঙ্গে বই নেই, তিনি সামনের ফার্স্ট বেঞ্চের প্রথম ছেলেটির কাছ থেকে নবনীতিসুধা বার করে পাতা খুলে মাছরাঙা পাখির রঙিন ছবিটা বার করে উঁচু করে ধরলেন, তারপর বললেন, 'তোমরা কে কে মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছ, হাত তোল।'

অনেকেই হাত তুলল। কিন্তু আমি হাত তুলতে সাহস পেলাম না। আমাদের বাড়িতে, বাড়ির চারপাশে, পুকুরপাড়ে অনেক গাছ-গাছালি, সেসব গাছে অনেক পাখি, কিন্তু সেসব পাখির নাম জানি না, বিশেষ করে ছবির পাখিটা আমার চেনা নয়।

আমাকে হাত তুলতে না দেখে ভি এম স্যার বললেন, 'তোমাদের বাড়ির পাশে অত বড় পুষ্করিণী। তুমি মাছরাঙা পাখি দেখ নাই?'

পরের রবিবার সকালে আমাদের বাসায় এসে ভি এম স্যার জলপাইয়ের আচার নিয়ে গেলেন। তাঁর মেহেদি রাঙানো দাড়ির সংবাদ বাড়ির মধ্যেও পৌঁছেছিল। অন্দরমহলে তাই নিয়ে একটু হাসাহাসি হল।

সে যা হোক, ভি এম স্যার আমাকে পুকুরপাড়ে নিয়ে গেলেন মাছরাঙা পাখি চেনাতে। কিন্তু কোন মাছরাঙা পাখি পুকুরপাড়ে দেখা গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভি এম স্যারের নজরে এল পুকুরের ওপারে একটা তেঁতুলগাছের নিচু ডালে জলের থেকে সামান্য ওপরে একটা মাছরাঙা পাখি ঝিম মেরে নিঃশব্দে বসে রয়েছে।

সে বছর বৃষ্টি ভালো করে হয়নি। নদীতেও জল কম এসেছিল, বর্ষায় পুকুর, বিল, এগুলো মোটেই ভরেনি। আর তখন তো শীতকাল, পুকুর মজে গিয়ে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ভি এম স্যারের সঙ্গে পায়ে হেঁটে পুকুরের ওপারের দিকে এগোলাম, পাখিটাকে কাছ থেকে দেখতে হবে। ·

পাখিটার কাছে পৌঁছানোর আগেই পাখিটা একটা বিদ্যুৎগতি ঝাঁপ দিয়ে জল থেকে একটা মাছ ধরে ওপাশের একটা বড় গাছের উঁচু ডালের আড়ালে গিয়ে বসল।

মাছরাঙা দর্শন আমার সম্পূর্ণ হল। ভি এম স্যার ফিরে গেলেন।

তখনো মাছরাঙা পাখির পাঠ চলছে। পরদিন ক্লাসে মাছরাঙার পাঠ পড়াতে পড়াতে ভি এম স্যার বললেন, 'মাছরাঙা পাখি জীবন্ত মৎস ছাড়া ভক্ষণ করে না।'

তিনি একটা গল্প বললেন, একবার জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরছিল, সেই জালের ওপর থেকে ছোঁ দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে একটা মাছরাঙা পাখি জালে আটকিয়ে যায়। তিনি সেই পাখিটা জেলেদের কাছ থেকে এক আনা দিয়ে কিনে বাসায় নিয়ে পুষেছিলেন। দৈনিক বাজার থেকে ছোট মাছ এনে পাখিটাকে দিতেন। কিন্তু সেই পাখিটা ঐসব মাছ খেতো না। কয়েকদিন পরে পাখিটা মারা যায়। তখন তিনি বুঝতে পারেন মাছরাঙা পাখি তাজা মাছ ছাড়া খায় না।

ভি এম স্যার আমাকে মাছরাঙা পাখি চিনিয়ে দেওয়ার পর আমি যখনই পুকুরপাড় ধরে যেতাম, পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করতাম। সব সময়ে দেখতে পেতাম তা নয়। তাছাড়া মাছরাঙা খুব সতর্ক পাখি, একটু শব্দ হলে, একটু লোকজন দেখলে ফুড়ুৎ করে

উড়ে পালায়।

মাঝে-মধ্যে আমাদের উঠোনের নারকেল গাছের ডালে এসে বসত পাখিটা। বোধহয় একটাই পাখি ছিল, কারণ একসঙ্গে দুটো পাখি কখনও দেখিনি। যখন নারকেল গাছের সতত কম্পমান শাখায় বসে পাখিটা দুলত, আমি বারান্দায় এসে নবনীতিসুধা খুলে রঙিন ছবিটা বের করে পাখিটার সঙ্গে মেলাতাম। কেমন যেন মনে হত এ বইতে যে মাছরাঙা পাখির ছবি দেয়া আছে, আর আমাদের এই মাছরাঙা পাখি, অনেকটা একরকম হলেও ঠিক এক নয়, একটু আলাদা।

এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ভি এম স্যার আমার ঠাকুরদার কাছে এলেন। ঠাকুরদা ওকালতি করেন, সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনের দিকে কাছারি ঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমা তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাতেন, কাছারিঘরের পিছনেই তুলসীতলা, আমি সে সময় এবং অনেক সময়েই ঠাকুমার কাছে থাকতাম। সেই সন্ধ্যায় তুলসীতলা থেকে দেখি ভি এম স্যার কাছারি ঘরে ঢুকছেন।

আমার কেমন আশঙ্কা হল, হয়তো আমার ক্লাসের পড়াশুনোয় কোনও গাফিলতির কথা ভি এম স্যার ঠাকুরদাকে বলতে এসেছেন।

আমি ঠাকুমাকে পুজোর ঘরে পৌঁছে দিয়ে ভি এম স্যার কি বলেন শোনার জন্যে চুপিসাড়ে কাছারি ঘরের দরজার একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঠিক তখনই আমাদের মুহুরিবাবু কাছারিঘর থেকে বাড়ির মধ্যে এলেন ঠাকুমার কাছ থেকে পনেরোটা টাকা নিতে। এইরকম অসময়ে ঠাকুরদা কাছারি ঘরে টাকা চাওয়ায় ঠাকুমা বললেন, 'এই রাতের বেলায এতগুলো টাকা দিয়ে কি হবে?'

মুহুরিবাবু বিচক্ষণ লোক, চাপা গলায় বললেন 'ভি এম স্যার'। ঠাকুমা বললেন, ভি এম? সংসার চালাতে পারে না, বারবার বাড়ি যায় কেন? তারপর পনেরোটা টাকা ক্যাশবাক্স খুলে বার করে দিয়ে বললেন, 'যার যেমন স্বভাব'।

আসলে ভি এম স্যারের বিষয়ে একটা অকারণ দুর্বলতা ছিল আমার ঠাকুমার। তাঁর বাবা ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার, তিন বছর ছিলেন নোয়াখালিতে। ঠাকুমার বাল্যকাল কেটেছে নোয়াখালিতে। সেখানে তাঁদের সরকারি বাড়ির সামনে একটা ড্যাফল গাছ ছিলো, জীবনে আর কোথাও সে গাছ ঠাকুমা কখনও দেখেননি। ভি এম স্যার তাঁকে নোয়াখালির কথা মনে করিয়ে দিত।

আমি কাছারি ঘরের সিঁড়ির ওপরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে; মুহুরিবাবু টাকাটা নিয়ে এসে ভি এম স্যারের হাতে দিলেন, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে।

ঠাকুরদার টেবিলে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় ভি এম স্যারের মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি, মুখাবয়বের সিলুয়েট, মাথার সাদাকালো চুল, সহসা আমার কেমন মনে হল ভি এম স্যারকে কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে, এবং তখনই বুঝতে পারলাম ভি এম স্যারকে একদম মাছরাঙা পাখির মত দেখাচ্ছে, যে পাখির রঙিন ছবি নবনীতিসুধায় রয়েছে।

এ কোনও গল্প নয়।

এ গল্পের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। এ এক অলীক স্মৃতিচারণ। অল্প কিছুটা সত্যি, কতটা,

তা আমি নিজেও জানি না। জানতেও চাই না। যা আছে মনে মনে-মনেই থাকুক, কাগজ-কলমে লিখে একটু বেকায়দা হয়ে যাচ্ছে।

তবে আরও একটু বেকায়দা আছে। সেই যে ভি এম স্যার বলেছিলেন, মাছরাঙা পাখি মরা মাছ খায় না, সে কথাটা সত্যি নয়।

মরা মাছের কথা জানি না, মরা মানুষের কথা বলি।

'যদি বর্ষে মাঘের শেষ', শীতের শেষাশেষি আমাদের ও প্রান্তে একটা বড় বৃষ্টি হত, সে বছর সেই বৃষ্টিও হল না। চৈত্রমাস আসতে না আসতে নদীনালা, খালবিল সব শুকিয়ে গেলো, আমাদের বাড়ির সামনের পুকুর শুকিয়ে বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তখন একটা দুটো লঙ্গরখানায় পোষাবে না, হাজার হাজার লঙ্গরখানা দরকার। কেউ ধান চাইছে না, চাল চাইছে না, ভাত চাইছে না, শুধু 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও'।

ফ্যানই বা কে দেবে, চাল না ফোটালে তো ফ্যান পাওয়া যাবে না। সেই চাল কার ঘরে আছে?

মফস্বলের নিস্তব্ধ আকাশ চঞ্চল করে উড়ে যাচ্ছে বোমারু বিমান, গোপন এরিয়েলে বর্মা সীমান্ত থেকে ভেসে আসছে নেতাজীর মন্দ্র কণ্ঠস্বর, কালীবাড়ি আর মসজিদের সামনের রাস্তায় এত মড়া পড়ে থাকছে যে কালুডোম আর সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না।

পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার পরে বহুদিন মাছরাঙা পাখিটাকে দেখিনি।

মহা মন্বন্তরের চরম দিনে সেদিন একের পর এক মৃতদেহ পড়ে আছে কালীবাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায়, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা মসজিদের মড়া আর কোনটা কালীবাড়ির মড়া।

কোনওরকমে মড়া এড়িয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখলাম সেই মাছরাঙা পাখিটাকে। পাখিটা মরা মানুষ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

পরের দিন ইস্কুলে ভি এম স্যারকে একথা বললাম। তিনি বললেন, 'হইতে পারে, সর্ব-বিষয়ে সর্ব কিছু আমরা জানি না।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'অকালের সময় অনেক কিছু ঘটে। তাহার সব ঠিক নহে।'

এক প্রধানের গল্প

শ্রীযুক্ত বটেশ্বর প্রধানের উপাধিই শুধু প্রধান নয়, তিনি গ্রাম প্রধানও বটেন। খলিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনিই প্রধান।

এত জায়গা থাকতে কেন খলিলপুর নামক একটি সাধারণ গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে এই গল্প লিখছি। সে প্রশ্ন যে কোনও পাঠক করতে পারেন।

আশা করি এই গল্পটি পাঠ করার পরে তাঁদের কারও মনে আর এ রকম কোনও প্রশ্ন থাকবে না। তার কারণ বটেশ্বরবাবু কোনও সামান্য ব্যক্তি নন, তাঁর মতো স্থিতধী, ঠাণ্ডা মাথার বুঝমান লোক খুব বিরল। কোনও রকম ছল-চাতুরী বা চালাকি করে বটেশ্বরবাবু গ্রাম প্রধান হননি। গ্রামবাসী প্রায় প্রত্যেকেই তাঁকে প্রধান বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা স্মরণে রেখে।

বেশি নয়, মাত্র একটা উদাহরণ দিয়ে বটেশ্বরবাবুর বিবেচনাবোধ প্রমাণ করছি।

খলিলপুর গ্রামের চক্রবর্তীরা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। বিরাট একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাঁদের। এখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়েছে। খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা সব ভিন্ন হয়ে গেছে। উঠোনে কোনাকুনিভাবে কঞ্চির বেড়া টেনে যে যার এলাকা ভাগ করে নিয়েছে। পুরনো বড় একতলা পৈতৃক দালানের বারান্দাতেও দেয়াল গাঁথা হয়েছে।

কিন্তু এত করেও খিটিমিটি, গোলমাল বন্ধ হয়নি। রাতদিন কলহ লেগেই আছে।

সে কলহ কখনও ফসলের ভাগ নিয়ে, কখনও গাছের ফল নিয়ে, কখনও বা এজমালি মানে যৌথ পুকুরের মাছের অংশ নিয়ে।

যেমন হয় পাড়াগাঁয়ের সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ি। একটা বড় কোঠাদালান, কয়েকটা ইতস্তত টিনের ঘর। অনেক ফলবান বৃক্ষ। একটা বড় পুকুর, যার জলে বাসনমাজা, কাপড় কাচা থেকে স্নান সবই হয়। আবার যথেষ্ট মাছও পাওয়া যায়।

সবাই জানেন এসব জিনিস কখনও চুলচেরা ভাগ করা যায় না, পুকুর ভাগ করা তো অসম্ভব। তা ছাড়া কোনও ভাগ-বাঁটোয়ারাই সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

গল্পে নামধাম গোপন রাখতে হয়। না হলে একেক সময় খুবই গোলমালে পড়তে হয়।

দুঃখের বিষয় এই গল্পে ধাম গোপন রাখতে পারিনি। খলিলপুরের চক্রবর্তী বাড়ি বলে ফেলেছি। তবে নামগুলো গোপন করছি।

বেশি নয় খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো পরস্পর সংগ্রামী ভাইদের চারজনকে ধরছি। তাঁদের নাম ধরা যাক নরেনবাবু, সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, বীরেনবাবু।

সেদিন এই চার পরিবারের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে, যাকে বলে এলাহি কাজিয়া।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পুকুরের মাছ নিয়ে। সাধারণ পুকুর থেকে জাল দিয়ে যে মাছ ধরা হয় সেটা চারভাগে ভাগ করা হয়, যদিও ভাগ নিয়ে, সমান অংশ নিয়ে গোলমাল যথেচ্ছই হয়।

এবার গোলমালটা একাধিক কারণে খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে।

সকলের চেয়ে বড় ভাই নরেনবাবুর ছেলে কলকাতায় কলেজে পড়ে। তার নাম বরেন। সেই বরেন গত শনিবার দিন কলকাতা থেকে চার-পাঁচজন বন্ধু সঙ্গে করে বাড়ি ফেরে, বরেন এবং বন্ধুদের সকলের সঙ্গে এক বা একাধিক ছিপ। বোঝা গেল বরেন নিজেদের বাড়ির পুকুরের কথা বন্ধুদের বলেছে এবং তারই উৎসাহে বন্ধুরা সবাই খলিলপুব চক্রবর্তীবাড়ির প্রাচীন পুকুরে মাছ ধরতে এসেছে।

এবং মাছ তারা ভাল ধরেছে, পাকা মৎস শিকারী প্রত্যেকে, একেকজন এক কেজি, দেড় কেজি ওজনের নোনা মাছ তিন-চারটে করে ধরেছে। এর মধ্যে একজন আবার বেশ কয়েক কেজি ওজনের একটা অতিকায় বোয়াল মাছও ছিপে গেঁথে তুলেছে।

আজ জাল দিয়ে মাছ ধরার পর মাছ ভাগাভাগির সময় প্রথমে সুরেনবাবু, নরেনবাবুর ছেলে বরেনের বন্ধুদের মাছ ধরার কথা তুললেন। না হলেও সাকুল্যে পনের কেজি মাছ এরা সেদিন বড়শি দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। সুরেনবাবু প্রস্তাব করলেন আজকের মাছের ভাগ থেকে ঐ পনের কেজি মাছের দাম বড়দার মানে নরেনবাবুর অংশ থেকে বাদ দিয়ে হিসেব ধরতে হবে।

বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবে বাকি দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা ধীরেনবাবু এবং বীরেনবাবু সায়

দিলেন। সেই সঙ্গে একটা উপরি দাবি করলেন ধীরেনবাবু। বছর তিনেক আগে পুকুরে চারাপোনা ছাড়া হয়েছিল। তখন নানা অজুহাতে সুরেনবাবু চারাপোনার দাম দেওয়া এড়িয়ে গেছেন। ফলে অন্য তিন শরিককে এই ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে।

আজ ধীরেনবাবুর বক্তব্য হল যে মেজদা মানে সুরেনবাবু যখন মাছের চারার দাম দেননি এখন গোটা মাছেও তাঁর কোনও অধিকার নেই। মাছ তিনভাগ হবে, সেই সঙ্গে হিসেবে বড়দার ভাগ থেকে পনের কেজি বাদ দিয়ে, তাঁকে এবং বীরেনবাবুকে সাড়ে সাত কেজি করে বেশি দিতে হবে। মাছ বেচার টাকার হিসেবটা এইভাবে করতে হবে।

এই সময়ে বাদ সাধলেন ঐ বড়দা নরেনবাবু। তিনি বললেন, তিনি পনের কেজি মাছ ছাড় দিতে রাজি আছেন। কিন্তু গত বছর বন্যার সময় নিজের উঠোনে জল দাঁড়াচ্ছে দেখে বীরেন পুকুরের ধার কেটে নালা করে জল বার করেছিল কিন্তু পরে বন্যা আরও বেড়ে যাওয়ায় ঐ নালা দিয়ে জল ঢুকে পুকুর ভাসিয়ে দেয় এবং সব বড় মাছ বেনোজলে ঢুকে বেরিয়ে যায় পুকুর থেকে। সেই জরিমানা তাকে দিতে হবে। আর বোধহয় বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। সবাই বুঝতে পারছেন এ গোলমাল মেটে না, মেটবার নয়।

এদিকে চক্রবর্তী বাড়ির মাছের ভাগ করতে গিয়ে আমরা এই গল্পের নায়ক শ্রীযুক্ত বটেশ্বর প্রধানকে বিস্মৃত হয়েছি। যে সকালে মাছের ভাগ নিয়ে চক্রবর্তী বাড়িতে জ্ঞাতি ভাইদের বিবাদ সেদিনের বিকালের কথায় যাই।

নিজের বাড়ির বারান্দায় একটা তক্তপোশের শতরঞ্জির ওপর বসে আছেন বটেশ্বরবাবু, ভেতরে ঘরের মধ্যে বটেশ্বর গৃহিণী সুপুরি কুচোচ্ছেন আর সাংসারিক কথাবার্তা বলছেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে চক্রবর্তী বাড়ির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেনবাবু এলেন।

সকালবেলায় মাছের ভাগ নিয়ে গোলমালের ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই বটেশ্বরবাবুর কানে উঠেছিল, সুতরাং তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

এখন নরেনবাবু এসেই গজগজ করে জ্ঞাতি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগলেন। সোনার টুকরো ছেলে বরেন তার কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পিতৃপুরুষের পুকুরে মাত্র দুচারটে মাছ ধরেছে, তার জন্যে খেসারত দিতে হবে। এদিকে বীরেন এই করেছিল, ধীরেন ওই করেছিল, নানারকম কাঁদুনি গাইতে লাগলেন নরেনবাবু, তারপর বললেন, 'আমি যা যা বললাম সবই তো শুনলেন, আমি কি ভুল বললাম'।

গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বটেশ্বরবাবু বললেন, 'না। না নরেনদা, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

গ্রাম প্রধানের অভিমত পেয়ে নরেনবাবু এবার উঠলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উদয় হলেন সুরেনবাবু। তাঁরও বলবার কথা কিছু কম নয়। তিনি আবার কৈশোরে একই স্কুলে বটেশ্বরবাবুর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বটেশ্বরবাবুর তুই-তোকারির সম্পর্ক। তিনি সুরেনবাবুর সব কথা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে থেকে তারপর তাঁকে বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস'।

অতঃপর সন্ধ্যার দিকে এবং তারপরে একটু রাতের দিকে এলেন যথাক্রমে ধীরেনবাবু ও বীরেনবাবু। তাঁদের কথাও খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বটেশ্বরবাবু এবং সব শোনার পরে আলাদা করে দুজনকেই বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

বটেশ্বর গৃহিণী এতক্ষণ ঘরের মধ্যে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার শেষ ভাই মানে বীরেনবাবু চলে যাওয়ার পরে গৃহিণী বারান্দায় এসে স্বামীকে বললেন, 'ওরা চার ভাই, চাররকম কথা বলল। আর তুমি সবাইকে বললে, 'ঠিকই বলেছ'। এতে চক্রবর্তী বাড়ির গোলমাল আরও বেড়ে যাবে। এটা তুমি মোটেই ভাল করলে না।' অন্ধকার বারান্দায় তক্তপোশে বসে একটা বিড়ি খাচ্ছিলেন শ্রীযুক্ত বটেশ্বর প্রধান। শেষ সুকটান দিয়ে বিড়িটা উঠোনে ফেলে দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার কণ্ঠে তিনি গৃহিণীকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ'।

আবগারীশ্বরী

(এক) স্থায়ী

বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থ বংশে, একটি প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে শ্রীযুক্ত সনাতন মিত্রের জন্ম।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে সনাতনবাবু মানুষটি যাকে ধার্মিক বা ধর্মপরায়ণ লোক বলে ঠিক সেই ধরনের নন। পুজো-আর্চায় তার মোটেই মন নেই। দেবদ্বিজে বিগ্রহে-প্রতিমায় তাঁর ভক্তি অচলা নয়।

তবে এ সবের জন্যে একটা বয়েস লাগে। সে বয়েসে পৌঁছাতে এখনও সনাতনবাবুর ঢের দেরি আছে। সনাতন নামটি উনবিংশ শতকীয় হলেও তার বাহক মোটেই উনবিংশ শতকের নয়। এই নামটি শুনে যার মনে যাই হোক, ভুল ধারণা পোষণ করে লাভ নেই। আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর আখ্যানের প্রাণপুরুষ উক্ত শ্রীযুক্ত সনাতন মিত্রের বয়েস এখন সদ্য বিশের ধাপ গুটি গুটি পার হয়ে তিরিশাভিমুখী, উচ্ছল কুড়ি আর উজ্জ্বল তিরিশের মধ্যের দরজায় তিনি দাঁড়িয়ে।

বলা বাহুল্য, এই সনাতন নামকরণটির পিছনে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস রয়েছে।

স্বর্গীয় নিত্যপ্রসাদ মিত্র ছিলেন সনাতনবাবুর পিতামহ। তিনি কর্মজীবনে পুলিশ কোর্টের দারোগা বা কোর্ট ইন্‌সপেক্টর ছিলেন কিন্তু অনেক পুলিস দারোগার মতোই তিনি খুব ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। 'সনাতন সঙ্কীর্তন সঙ্ঘ'-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যু সভাপতি।

যে বছর 'সনাতন সঙ্কীর্তন সঙ্ঘ' এক কথায় স-স-স প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক তার আগের বছর সনাতন্‌ জন্মান। এবং অনিবার্যভাবেই সনাতন নামটি তার কাঁধে পড়ে।

চাকুরি জীবনের শেষভাগে নিত্যপ্রসাদের মুল কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারী মামলার আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা।

এখানে বলে রাখা উচিত যে নিত্যপ্রসাদ অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার ছিলেন। নিজের কাজ খুব মন দিয়ে করতেন। উৎকোচে তাঁর যে খুব অনীহা ছিল তা নয়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব একটা বিচারবুদ্ধি ছিল। তিনি নিজে যে মামলাটা খারাপ মনে করতেন, সে মামলার আসামী তাঁর বিচারে গর্হিত অসামাজিক কর্ম করেছে বলে তিনি ভাবতেন সেখানে খুবই কঠোর হতেন। তাঁর তদ্বির তদারকিতে অসংখ্য প্রতারক-জোচ্চোর, মদ্যপ-লম্পট

শ্রীঘরবাসী হয়েছে।

আসল কথা এই যে কোর্ট ইন্‌সপেক্টর এন পি মিত্র প্রতারণা, লাম্পট্য, ব্যাভিচার ইত্যাদি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর হাতে পড়লে এদের নিস্তার ছিল না। কিন্তু সাধারণ চুরি-ডাকাতি, রাগের মাথায় খুন এই সব ধর্তব্যের মধ্যে নিতেন না। সুতরাং এদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে তাঁর বিবেক দংশন হত না।

পুলিশের দারোগার বিবেক দংশন এই কথাটা হয়ত কারও কারও কাছে গোলমেলে ঠেকতে পারে। তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই যে পুরুষানুক্রমে ধর্মপরায়ণ বংশের সন্তান শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মিত্র নিজেও চিরকালই খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন। প্রথম যৌবনে সেই যুদ্ধের বাজারে যখন চিনি ও চিনিজাত সব দ্রব্য অদৃশ্য হয়ে গেছে তিনি সখেরবাজারে বাতাসাপট্টি ঘুরে ঘুরে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গৃহদেবতা গোপালঠাকুরের জন্যে সাদা বাতাসা কিনে আনতেন। প্রতিবার কাজে বা অকাজে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় অষ্টধাতু নির্মিত গৃহদেবতার মুখে একটি সাদা বাতাসা গুঁজে দিয়ে বেরোতেন।

বেশি বয়েসে রিটায়ার করার মুখে এন পি মিত্র অতিশয় ধর্মপ্রবণ হয়ে পড়েন। গঙ্গার ঘাটের হিন্দুস্থানী কুলিদের আখড়ার বজরং ব্যায়ামাগার থেকে শুরু করে আট হাজার আটশত আটবার অবিরাম হরিনাম সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হন।

রিটায়ার করার পর এন পি মিত্র নিজ উদ্যোগে অবিরাম হরিনাম সমিতির নাম বদল করে 'সনাতন সঙ্কীর্তন সঙ্ঘ' নামে রেজিস্ট্রি করেন এবং নিজে তাঁর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

সেই সময় সনাতন নিতান্ত শিশু। পিতামহের অতি আদরের পৌত্র। আদরের আতিশয্যে এখন আজীবন সনাতনকে নামের বোঝাটি বহন করে যেতে হচ্ছে।

(দুই) অন্তরা

আসানসোল থেকে একটু এগিয়ে ধানবাদের পথে বঙ্গ-বিহার সীমান্তের কিঞ্চিৎ আগে একটি সদাব্যস্ত অঞ্চলের অনতিখ্যাত কিন্তু সুচালু কারখানার সহকারি ফোরম্যানের কাজ করেন সনাতন। তাঁর ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেই। একটি ডিপ্লোমা আছে কিন্তু কাজ জানেন, নিজের কাজটা খুব ভালভাবেই জানেন। সেখানে তাঁর যোগ্যতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া শক্ত সমর্থ যুবক, লোহাপেটা শরীর। কোম্পানিতে সনাতন মিত্রের সুনাম ও কদর দুই-ই আছে।

সনাতন মিত্র যে কোম্পানিতে কাজ করেন, সেটি খুব বড় না হলেও পুরনো এবং ভাল। কোনও উটকো, কাঁচা টাকায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাঙ্ক ঠকানো কারখানা নয়।

কারখানার কর্মচারীদের জন্যে একটা পুরনো আবাসন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্যাচেলরদের কোয়ার্টার দেয়া হয় না। তাদের জন্যে তিন কিলোমিটার দূরে কোলিয়ারী গঞ্জে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নেয়া আছে। সেটাই হল ব্যাচেলারস মেস।

এই মেসেরই একটা ঘরে সনাতন মিত্র থাকেন। কলকাতার সখের বাজারে তাঁদের সাবেকি বাড়িতে সনাতনবাবুর দাদা-বৌদি, বাবা-মা, অনূঢ়া দিদি রয়েছেন। সনাতনবাবু আর তাঁর এই অনূঢ়া দিদিটি পিঠোপিঠি ভাইবোন।

দিদিটির নাম অনুরাধা। পিতামহ প্রদত্ত নাম ছিল নিতান্তই রাধা। সেকেন্ডারি পরীক্ষার

ফর্ম পূরণ করার সময় বড়দিমণি মানে প্রধানা শিক্ষিকা মহোদয়ার হাতে পায়ে ধরে রাধা অনুরাধা হয়েছিল। তবে রাধা নামটা আজও বহাল আছে, সেটা ডাকনাম হিসেবে।

সেই রাধা কিংবা অনুরাধার বিয়েতে একদম মন নেই। কিন্তু ভালবাসার দিকে খুব ঝোঁক। আজ পর্যন্ত তিরিশ-চল্লিশ বার তিনি প্রেমে পড়েছেন, এমনকি একই ব্যক্তির সঙ্গে পাঁচ-সাতবার। তবে পুরো ব্যাপারটাই মানসিক, মৌখিক, ঐ সেই যে রজকিনী প্রেম, কিসের গন্ধ যেন তাতে নেই। সেই ব্যাপার আর কি।

দিদির বিয়ে না হলে সনাতন বিয়ে করেন কি করে? তাই তাঁরও বিয়ে হয়নি। দিদির যা মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে সদ্য সদ্য সেরকম কোনও সম্ভাবনাও নেই।

সে যা হোক, অনুরাধাদির কাহিনী এখানে প্রক্ষিপ্ত। সনাতন মিত্রের কথা বলি। গল্পের প্রথমেই তাঁকে অধার্মিক বলেছি। ভাবনাটা ব্যাখ্যা করা দরকার।

সনাতন মিত্রের মতো একজন পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়েসের যুবকের আবার ধর্মান্ধতা কি? এ বয়েসে আজকাল কেউ টিকিও রাখে না, তিলকও কাটে না, ত্রিসন্ধ্যা জপ-আহ্নিক করার প্রশ্নও আসে না।

আর একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আর দশটি স্কুল-কলেজের ছেলের মতোই সনাতন পরীক্ষার সময় কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে পরীক্ষার হলে যেতেন। কলকাতায় থাকতে রাস্তাঘাটে যাতায়াতের পথে মন্দির পড়লে আর দশজনের মতোই চোখ বুজে হাত জোড়া করে কপালে ঠেকাতেন।

আসানসোলের এই কাঠখোট্টা, খরা অঞ্চলে এসে ধর্মভাবটা কি করে যেন বিদায় নিয়েছে সনাতন মিত্রের কাছ থেকে। সনাতনবাবুও ব্যাচেলারস মেস থেকে কারখানার পথটুকু কাজে ঢুকে প্রথম প্রথম হেঁটেই চালিয়ে দিচ্ছিলেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এ অঞ্চলে গরম সাংঘাতিক। বেলা উঠতে না উঠতে চারদিক তেতে ওঠে। রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করে। তখন রাস্তায় হাঁটা খুব কষ্ট। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে কিছুদিন পরে একটা সাইকেল কিনেছিলেন।

তা সাইকেলেই হোক অথবা পায়ে হেঁটেই হোক, মেস থেকে কারখানা যাতায়াতের রাস্তা একটাই। সেই পথে কারখানা থেকে একটু এগিয়ে ঠিক কারখানায় ঢোকার পথের মুখে একটা হনুমানজীর মন্দির আছে। খুবই জাগ্রত মন্দির। তার সামনের উঠোনে কারখানার দারোয়ানরা সকাল সন্ধ্যে 'জয় বজরঙ্গবলী' বলে উরুতে থাপড় দিয়ে কুস্তি লড়ে।

কারখানার সমস্ত কুলি-কামিন, বাবু-অফিসার এই হনুমানজীর মন্দির পেরোবার সময় প্রণাম করে। কেউ যেতে যেতে কপালে হাত ঠেকিয়ে কেউ মনে মনে, কেউ বা গড় হয়ে আবার অতি ভক্তিমানরা সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানায়।

তাছাড়া বড় রাস্তার মোড়ে রয়েছে 'নবগ্রহ মন্দির'। শিল্পাঞ্চলের গরিব মানুষদের মনে ভাগ্য, তুকতাক এই সব নিয়ে, তন্ত্রে-জ্যোতিষীতে খুবই বিশ্বাস। নবগ্রহ মন্দিরেও দিনরাত ভিড় লেগেই আছে। এমনকি সনাতনবাবুর বন্ধুদের, সহকর্মীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা নবগ্রহ মন্দিরের দেয়ালে পরপর তিনবার মাথা না ঠুকে কারখানায় যান না। তার জন্যে তাঁদের কারখানায় ঢুকতে লেট হলেও তাঁরা সেটা মেনে নেন।

কিন্তু মাথা ঠোকা বা কপাল ছোঁয়ানো তো দূরের কথা সনাতনবাবু পায়ে হেঁটে বা

সাইকেলে যাতায়াতের পথে হনুমানজীর বা নবগ্রহ মন্দিরে কখনও প্রণাম জানান না। অনেকে এ সব জায়গায় থেমে, সাইকেল বা হাঁটার গতি কমিয়ে মনে মনে কিংবা ঠোঁট বিড় বিড় করে দেবতাকে নমো করেন।

সনাতনবাবু এসব কখনোই করেননি। এমনকি কাছেই বিহার বর্ডারে আন্তঃরাজ্য একসাইজ চেকপোস্টের পাশে এক জাগ্রত দেবী রয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন, দেহাতি মানুষ সেখানে পুজো দিতে আসে।

দেবীর নাম আবগারীশ্বরী। কলকাতা হাইকোর্টে যেমন এক শিবলিঙ্গ আছে। লর্ড হাইকোর্টেশ্বর; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো বটতলায় ছিল বিশ্বেশ্বরী, ঠিক তেমনই আবগারীশ্বরী।

এই রাস্তায় আবগারির মানে একসাইজের বাবুদের বড় অত্যাচার। এই চেকপোস্টে নজরানা না দিয়ে এ রাস্তা দিয়ে যাওয়া কঠিন। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গে আবগারির থাবা ক্রমশ বড় হচ্ছে, বিশেষ করে বিহার এলাকায়। শুধু গাঁজা-ভাঙ, মদ বা মাদকদ্রব্য নয়, আবগারির আওতায় ওষুধ থেকে দেশলাই, প্রসাধনী থেকে বিলাস দ্রব্য অনেক কিছুই এসে গেছে।

রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা বিশাল বিশাল হিন্দি ফর্ম পূরণ করতে দেওয়া। মালপত্তর কিছু লোপাট করা তদুপরি নগদ অর্থ-আবগারির বাবুদেব খাই বড় বেশি।

স্বাভাবিক কারণেই চারপাশে পাঞ্জাবি ধাওয়া, ভাতের হোটেল, পানের দোকান এবং এই বড় মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। এই মন্দিরের জাগ্রত দেবী আবগারীশ্বরীর পুজো দিলে চেকপোস্ট থেকে তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। শোনা যায়, আবগারীশ্বরীব প্রধান পুরোহিত চেকপোস্টের দারোগাবাবুর যমজ ভাই। দুজনে নাকি একইরকম দেখতে।

দুষ্টু লোকে বলে, এই দুজনে নাকি একই লোক। কারণ দারোগাবাবুকে আব পুরোহিতমশায়কে কখনও নাকি একসঙ্গে পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখা যায়নি। তা ছাড়া একজনের পরনে খাকি ইউনিফর্ম, বুট জুতো, মাথায় বারান্দা টুপি। অন্য জনের খালি গা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, পায়ে খড়ম, মাথায় টিকি। দুজনের মধ্যে চট করে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

যেমন হয় বিভিন্নরকম গাড়ির ড্রাইভারের মারফৎ আবগারীশ্বরী এই এলাকার চারদিকে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। যথারীতি তার কিছু মহিমা ও বিভূতির কথাও শোনা যাচ্ছে। শুধু ড্রাইভাররা নয়, সাধারণ মানুষ যাদের আবগারির চেকপোস্টে কোনও কাজ নেই, তারাও যাচ্ছে দেবীকে প্রণাম করতে। প্রতি অমাবস্যার রাতে মেলা বসছে দেবীমন্দির ঘিরে। পাঁঠা বলি হচ্ছে, ঢাক বাজছে, রাস্তায় হাইপাওয়ার লাইন থেকে তার টেনে বিদ্যুতের আলোয় চারপাশ ঝলমল করছে। এইসব রাত আবগারি মুক্ত। একসাইজ ফ্রী। মদের ফোয়ারায়, গাঁজার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মেলা প্রাঙ্গণ।

এদিকে আরেকটা খ্যাতি হয়েছে আবগারীশ্বরীর। ড্রাইভারদের কল্যাণেই সেটা হয়েছে। নতুন গাড়ি কিনলে, লাইসেন্স নিলে, পারমিট নিলে আবগারীশ্বরীর পুজো বাঁধা। প্রতিমার পায়ে ছুঁইয়ে লাল জবা ফুলের মালা গাড়িতে লাগাতে হবে। দৈব দুর্ঘটনা থেকে প্রতিকারের এটাই অমোঘ উপায়।

সনাতন বাবুর সহকর্মীরা, মেসবাসীরা অনেকেই অনেকবার আবগারীশ্বরীকে পুজো দিয়ে এসেছেন। প্রণাম করে এসেছেন। অমাবস্যার রাতে গিয়ে হৈহল্লোড় করে এসেছেন, কিন্তু সনাতনবাবু তাদের সঙ্গে যাননি। পুরো ব্যাপারটা তাঁর বাজে মনে হয়েছে।

(তিন) সঞ্চারী

সনাতনবাবুদের কারখানার উল্টোদিকে সারি সারি কর্মচারীদের কোয়ার্টার। পুরনো আমলের লাল ইঁটের বাংলো ধরনের ছোট ছোট বাড়ি।

ঢুকবার মুখে সবচেয়ে প্রথম বাড়িটায় থাকেন কারখানার বড়বাবু অনিল দাস। অনিলবাবুর মেয়ের নাম সঞ্চারী। বছর কুড়ি-একুশ বয়েস হবে। গোলগাল, বেঁটেখাটো, একটু মোটাসোটা, ফর্সা, আহ্লাদি গোছের মেয়ে। আসানসোলের কলেজে পড়ে।

সকালবেলা কারখানার জিপে করে আরো অনেকের সঙ্গে সে কলেজে যায়। বিকেলে একা একাই বাসে ফেরে। অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে সঞ্চারীর। কিন্তু কাউকেই বিশেষ পাত্তা দিতে চায় না।

সঞ্চারী সনাতন মিত্রকেও চেনে, ভালই চেনে। মুখোমুখি দেখা হলে মুচকি হাসে। কখনও সম্বোধন করার প্রয়োজন হলে সনাতনদা বলে। খুচরো কথাবার্তাও হয়।

ঠিক এই পর্যন্তই সনাতনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এর চেয়ে একটুও বেশি নয়। সঞ্চারীর মনের কথা বলা যাবে না, কথাবার্তা তো একটু বেশী হলে সনাতনের আপত্তি ছিল না।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল। নিজের পুরনো সাইকেলটা বেচে দিয়ে অফিস থেকে স্কুটার অ্যাডভান্স নিয়ে তিনি একটা টু-হুইলার কিনে ফেললেন।

এই টু-হুইলার কেনার পর কারখানায় বা মেসে না হলেও সঞ্চারীর কাছে সনাতনের গুরুত্ব খুব বেড়ে গেল। টু-হুইলারে দু তিনদিন সনাতন মিত্রকে দেখার পর সঞ্চারী আর লোভ সামলাতে পারল না। সনাতনকে বলেই বসলো, 'সনাতনদা আমাকে একটু পিলিয়নে চড়াবেন।'

পেছনের বসার জায়গাটাকে যে পিলিয়ন বলে সেটা সনাতন মিত্র সঞ্চারীর কাছে শিখলেন এবং পিলিয়নে সঞ্চারীকে নিয়ে আসানসোল শহর একপাক ঘুরে নিয়ে পরে পথে নেমে সঞ্চারীকে আলুকাবলি, লস্যি খাওয়ালেন।

এসবের চেয়ে বড় কথা সঞ্চারীকে বসিয়ে অভূতপূর্ব এক শিহরণ বোধ করলেন সনাতনবাবু। এরকম অভিজ্ঞতা এই সামান্য জীবনে আর কখনও হয়নি বিশেষ করে যখন উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় টু-হুইলার ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠছিল। ত্রস্তা সঞ্চারীর বাহুবন্ধন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সেই স্পর্শ, সেই সুখানুভূতি সনাতন মিত্রকে আবিষ্ট করে ফেলল।

কিন্তু সনাতন মিত্র একটা মহাপাপ করেছিলেন। নতুন গাড়ি কেনার পর প্রথামতো আবগারীশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিয়ে জবাফুলের মালা পরাতে হয়, নিজের কপালে এবং গাড়ির কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হয়, সনাতন যে সব কিছুই করেননি। দোকান থেকে কিনে এনে সরাসরি চালানো শুরু করেছেন।

শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব; সহকর্মী বন্ধুরা বারণ করেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন

আবগারীশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিয়ে দ্বিচক্রযানটিকে বিশুদ্ধ করে নিতে। কোনওরকম ফাঁড়া বা দুর্ঘটনার যোগ থাকলে তা হলে নিশ্চয় কেটে যেত।

কিন্তু অধার্মিক সনাতনবাবু সেসব কথা মান্য করেননি। সুতরাং যা হওয়ার তাই হল।

টু-হুইলার কেনার সাতদিনের মধ্যে পরপর দুটো দুর্ঘটনায় পড়ে গেলেন সনাতন মিত্র। সন্ধ্যাবেলা চালাতে গিয়ে রাস্তায় বাম্প ছিল খেয়াল করেননি, একদম গাড়ি সুদ্ধ ছিটকিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

আরেকদিন একটা লরির পাশ কাটাতে গিয়ে উল্টোদিকের একটা দ্রুতগামী ম্যাটাডোরের মুখে পড়ে গেলেন তিনি, কি করে যে সেদিন প্রাণ রক্ষা হয়েছিল ভাবতে গেলে এখনও সনাতনবাবুর হৃৎকম্প হয়।

এই দ্বিতীয় দিনে আবার সনাতনবাবুর পিলিয়নে ছিলেন তাঁরই মেসের এক বন্ধু জগৎলাল।

জগৎলাল সনাতনবাবুকে চেপে ধরলেন, অবিলম্বে আবগারীশ্বরীর পুজো দিয়ে বাহনটিকে বিপদমুক্ত করতে হবে। না হলে সমূহ সর্বনাশ হবে।

সুতরাং অনেক কিছু ভেবেচিন্তে পরের অমাবস্যার সন্ধ্যায় টু-হুইলারটি নিয়ে সনাতনবাবু আবগারীশ্বরীর মন্দিরে গেলেন। একাই গেলেন, তাঁর এই ধর্মকর্মের তিনি কোনও সাক্ষী রাখতে চান না।

গেঁজেল মাতালদের ভিড় রাতের দিকে বাড়ে, তাই সূর্যাস্তের পরে পরেই ভাল করে অন্ধকার হওয়ার আগেই তিনি মন্দিরে পৌঁছে গেলেন। মন্দিরের মুখে অনেকগুলো টু-হুইলার, ট্রাক, লরি, এমনকি নতুন সাইকেল এসে গেছে, পুজো দেওয়ার জন্যে। সনাতনবাবু দেখলেন তাঁদের কোম্পানির জিপটাও তার মধ্যে রয়েছে।

টু-হুইলারটা ঠিকমতো রেখে সনাতন মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে যাবেন এমন সময় দেখেন সঞ্চারী মন্দির থেকে বেরোচ্ছে, তার হাতে জবার মালা, শালপাতার ঠোঙা ভর্তি প্যাঁড়া, সঙ্গে বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী। তাদেরও কারও কারও হাতে ঐরকম ঠোঙা, জবা ফুলের প্রসাদী মালা।

হঠাৎ এমন জায়গায় সনাতনকে দেখে খুবই খুশি হল সঞ্চারী, 'ওমা, সনাতনদা আপনি এখানে। খুব লুকিয়ে লুকিয়ে পুজো দেন, তাই না। আজ ধরা পড়ে গেছেন। নিশ্চয়ই আপনার গাড়ির পুজো দিতে এসেছেন।

সত্যিই তো, এই তো সেদিনই পিলিয়নবাহিনী সঞ্চারীকে সনাতন বুঝিয়েছেন, 'সবাই যা করে তা আমি করি না। কোনও রকম পুজো না দিয়েই আমি আমার টু-হুইলার চালাচ্ছি। এসব ব্যাপারে আমার কোনও সংস্কার নেই।

ভাগ্যিস অন্যান্য স্কুটার ও গাড়ি ইত্যাদির ভিড়ে এখন সনাতনবাবুর টু-হুইলারটি চোখের আড়ালে পড়ে গেছে, তাই যে মুহূর্তে সঞ্চারী তার বন্ধুদের বলল, 'তোমরা চলে যাও, আমি সনাতনদার সঙ্গে ফিরবো।' সনাতন বলে বসলেন, 'সে কি করে হবে? আমার গাড়ি তো সঙ্গে আনিনি। আমি বাসে ফিরবো।

ব্যাপারটা কিন্তু আরও বেকায়দা হয়ে গেল। সনাতনবাবুর এই কথায় সঞ্চারী তাঁকে জোর করতে লাগলো, 'আমাদের জিপ থাকতে আপনি বাসে ফিরবেন কেন? আপনি আমাদের সঙ্গে জিপে উঠে আসুন।'

সনাতনকে সঞ্চারী প্রায় হাত ধরে টেনে জিপে তুলল। জিপের পিছনের সিটের শেষপ্রান্তে সঞ্চারীর উষ্ণ শরীর ঘেঁষে বসে হাইওয়ের উদ্দাম হাওয়ার মধ্যেও তিনি ঘামতে লাগলেন।

সঞ্চারীর সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেতে হল। আবগারীশ্বরীর পুজোর প্রসাদী প্যাঁড়া খেতে হল। কিন্তু এদিকে সারাক্ষণ সনাতনবাবুর মনটা খুঁত খুঁত করছিল নতুন টু-হুইলারটা মন্দিরের ওখানে পড়ে রইল। চুরি-টুরি না হয়ে যায়। তবু এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে আর কিছু করার ছিল না। সঞ্চারীদের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে রাত দশটা বেজে গেল। তখন লাস্ট বাসটাও চলে গেছে। এই রাতে দশ-এগারো মাইল রাস্তা উজিয়ে আবগারীশ্বরীর মন্দিরে যাওয়া অসম্ভব।

কোনরকমে একটা রিকশা ধরে মেসে ফিরে এলেন সনাতনবাবু।

(চার) আভোগ

সারারাত সনাতন মিত্রের ঘুম হল না। মেসের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করলেন, অত সখের নতুন টু-হুইলারটা নিশ্চয় চুরি হয়ে গেল। একটা পুরো রাত কি সেটা মন্দিরের সামনে পড়ে থাকবে?

ভোর হতে না হতে আলো ফোটার আগেই মেস থেকে বেরিয়ে বাস রাস্তায় এলেন সনাতনবাবু। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোরের প্রথম বাসের দেখা মিলল।

আধঘণ্টার মাথায় চেকপোস্ট স্টপে নেমে আবগারীশ্বরীর মন্দির। উৎকণ্ঠা ভরা হৃদয়ে দ্রুত হেঁটে মন্দিরের সামনে গিয়ে সনাতন দেখলেন মন্দিরের ফাঁকা উঠোনে শুধু তাঁর বাহনটি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। দুবার চোখ কচলিয়ে বুঝতে পারলেন ঠিকই দেখছেন।

কাল রাতে বিছানায় শুয়ে মনে মনে আবগারীশ্বরীর কাছে সনাতন প্রার্থনা করেছিলেন যে যদি কোনও কারণে তিনি টু হুইলারটি ফেরত পান একান্ন টাকার পুজো দেবেন।

তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন দেবী। এবার একান্ন টাকা মানতের পুজোর ব্যবস্থা করতে হয়।

তখন সদ্য মন্দিরের দরজা খুলেছে। কিন্তু বেশ ভিড়। রাস্তার ধারে সারারাত আটকিয়ে থাকা সারবন্দী ট্রাক-লরির ড্রাইভারেরা পুজো দিতে এসেছে।

কোনওরকমে ধাক্কাধাক্কি করে ঘণ্টা খানেক পরে একান্ন টাকার পুজো দিয়ে এক হাতে জবা ফুলের মালা আর অন্য হাতে এক চ্যাঙারি প্যাঁড়া, ঠিক কাল সন্ধ্যার সঞ্চারীর মতো সনাতন মিত্র বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে।

বেরোনোর মুখে মন্দিরের দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে জোর প্রণাম করলেন। মনে মনে ঠিক করলেন আজ বিকেলেই সঞ্চারীকে পিলিয়নে বসিয়ে একেবারে বরাকর পর্যন্ত ঘুরে আসবেন। কাল রাতের উষ্ণ সান্নিধ্যের স্বাদ এখনও শরীরে লেগে আছে।

কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে স্বপ্নভঙ্গ হল সনাতনবাবুর। কোথায় তাঁর টু হুইলার। এই এক ঘণ্টায় সেটা হাওয়া হয়ে গেছে। সকাল বেলার রোদে আবগারীশ্বরী মন্দিরের সামনের ফাঁকা উঠোন ঝকঝক করছে। টু হুইলার কেন, কোনও কিছুই সেখানে নেই। শূন্য উঠোনটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সনাতন মিত্র।

কাণ্ড-কারখানা

(এক)
বর্তমান

'এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্ত্যলোকে'
—রবীন্দ্রনাথ

পার্ক স্ট্রিটের পাশের একটা গলির মধ্যে অফিস। একটা পুরনো বাড়ির দোতলায়, সিঁড়িটা কাঠের। ঘরের দরজা জানালাগুলো অতিকায় আকারের, নয় ফুট বাই পাঁচ ফুট, ছাদের সিলিং প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচুতে।

এসব বাড়িতে এককালে সাহেবসুবোরা, সিভিলিয়ান বা ব্যাবিস্টাররা থাকতেন। তাঁরা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিদায় নিয়েছেন। তারপরে বেহাত, বেদখল হতে হতে এখন কে যে মালিক সেটা বোঝাই কঠিন।

বাড়ির মেরামত নেই, চুনকাম নেই। তবে সামনের লন-এ পুরনো দিনের দু-চারটে চাঁপা, গন্ধরাজ, কামিনী ফুলের গাছ রয়েছে। সময়ে-অসময়ে সে সব গাছে ফুল ফোটে, সেই ফুলের গন্ধ একেকদিন অকারণে আচ্ছন্ন করে তোলে পুরনো সাহেবপাড়ার জরাজীর্ণ বাড়ির চারপাশ।

বাড়িটার নিচে-ওপরে ফুটবল খেলার মাঠের মত লম্বা-চওড়া বড় বড় ঘরগুলোকে নানা কায়দায় পার্টিশন করে ছোট ছোট ঘর বানানো হয়েছে। এই যাকে বলে কিউবিকল।

এইসব কিউবিকলের অধিকাংশই ডাক্তারের চেম্বার। কিছু কিছু ঘুরে নতুন যুগের ধোপদুরস্ত জোচ্চোর প্রমোটর, ডেভলপার কোম্পানি বানিযেছে। তাছাড়া রয়েছে কমপিউটার কারবার, হরেকরকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এবং একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান, যাদের মডেল সুন্দরীরা এতই জনপ্রিয়া যে দিনের বেলায় কখনো আসেন না। তাঁদের প্রবেশ ঘটে সন্ধে গড়িয়ে রাতে।

এসব কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের গল্প এই প্রাচীন বাড়ির দোতলায় সিঁড়ির ডান পাশের একটি ছোট কিউবিকলের ব্যানার নিয়ে। কারণ এর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।

নিচে কাঠের সিঁড়ির পাশে একটা ডাকবাক্সে এবং উপরোক্ত ছোট কিউবিকলের গায়ে ইংরেজিতে কোম্পানির নাম লেখা আছে। দুই শব্দের নাম কিন্তু চট করে উচ্চারণ করা বেশ কঠিন। ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও যে কোনও সামান্য ইংরেজি জানা লোক বুঝতে পারে এই কোম্পানির নামের শব্দ দুটো মোটেই ইংরেজি নয়। কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারে, ফরাসী বা ইতালিয় কোম্পানি এটা।

বাগাড়ম্বর না বাড়িয়ে ঐ কোম্পানির নামটা আপাতত জানিযে রাখছি। তবে সাদা বাংলায় জানালে বিষয়টা বোধগম্য হবে না। তাই লেটার বাক্সে সাইনবোর্ডে যেমন আছে তাই জানাচ্ছি।

KANDA-KARKHANAÂ

যাঁদের এরপরেও বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে তাঁদের সুবিধের জন্যে নামটা সাদা বাংলায় পড়ে দিচ্ছি,

কারও কারও মনে কৌতূহল জাগতে পারে এরকম অদ্ভুত নামের কোনও কোম্পানি হতে পারে কিনা? না, পারে না, মাত্র এই একটিই আজ পর্যন্ত হয়েছে।

এর পরেই অবশ্য প্রশ্ন উঠবে এই রকম বেগতিক নামের কোম্পানি, কারখানা বা অফিসে কি কাজ হয়, কেন এই কাণ্ড-কারখানা?

এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ঐ ইংরেজিতে নাম লেখা কিউবিকলের মধ্যে, কাণ্ড-কারখানার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

কাণ্ডকারখানার ভেতরটা অবিকল ডাক্তারের চেম্বারের মতো, বোধহয় এককালে তাই ছিল কারণ পার্টিশনের কাঠের দরজার গায়ে একটা পুরানো দিনের গ্ল্যাক্সো বেবির ছবি, তার নিচে একটা দুই কাঁটাওয়ালা নকল প্লাস্টিকের ঘড়ি, যার কাঁটা দুটো হাত দিয়ে ঘোরানো যায় এবং যার উপরে লেখা আছে 'ডাক্তারবাবুর জন্যে ঘড়ির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

চেম্বারটি দুই অংশে বিভক্ত। ঘরের প্রথম আধাআধি অংশ ভিজিটরস রুম। সেখানে কয়েকটি পুরানো সোফা, বাড়তি দুটো কাঠের চেয়ার, একটা লম্বা নিচু টেবিলে অনেক রকম ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকা রয়েছে। সেগুলো প্রায় সবই ময়লা, ছেঁড়া। একটা সিনেমা পত্রিকার প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে, একটি প্রশ্নমূলক প্রবন্ধের অবতারণা। 'উত্তমকুমার কি বোম্বাই চলে যাচ্ছেন?' আর একটি খেলাধুলার পত্রে ছেঁড়া পাতায় বড় বড় অক্ষরে ঘোষণা রয়েছে 'পতৌদি এবার অবসর নিচ্ছেন'। এই আদ্যিযুগের কাগজগুলো বোধহয় সেই ডাক্তারের চেম্বার থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

ভিজিটরস রুমের পরেই দরজা বন্ধ প্রকৃত চেম্বার। তার মধ্যে টেবিল-চেয়ার। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এক পাশে একটা গদিমোড়া চেয়ার, সামনে দুটো হাতলওলা সাবেকি কাঠের চেয়ার।

ঐ গদিমোড়া চেয়ারটায় বসেন শশাঙ্ক রায়চৌধুরী, এই কাণ্ডকারখানা'র প্রাণপুরুষ, উদ্ভাবক ও পরিচালক। সামনের চেয়ার দুটো কাণ্ডকারখানার মক্কেলদের জন্যে। অধিকাংশই গোপন ব্যাপার। অনেকে একা আসেন। অনেকে আবার স্ত্রী কিংবা কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে আনেন।

কাণ্ড-কারখানায় কি ধরনের কাজ হয় সেটা বোঝানোর জন্য দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তার আগে একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

মনে করুন আপনি সারা সন্ধ্যা—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তাস পিটিয়ে হই হই করে কাটিয়েছেন, এখন চোরের মত বাড়ি ফিরছেন, আপনার স্ত্রী হাতা কিংবা খুন্তি হাতে আপনার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছেন। ঘড়িতে এগারোটা বাজে।

এই অবস্থায় আপনি নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে বলবেন না এত রাত পর্যন্ত তাস খেলেছেন, আড্ডা দিয়েছেন। আপনাকে বলতে হবে আপনার অফিসের এক সহকর্মী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে শহরের অপর প্রান্তে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো, কিংবা মানিব্যাগ পকেটমার হওয়ায় আপনি অফিস থেকে বাড়ি পর্যন্ত এগারো মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে আসছেন।

বলা বাহুল্য, এই দুটোর কোনওটাই তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এর ফলে আপনাকে হয়তো আপনার স্ত্রীর হাতে আরও বেশি মার খেতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি কাণ্ডকারখানায় এসে মাত্র দশ জেম অর্থাৎ একশো সত্তর টাকা ফি দিয়ে শশাঙ্ক রায়চৌধুরীর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন তা হলে এমন হত না।

ঠিক এই রকম একটা কেস কাল বিকেলেই শশাঙ্কবাবুর কাছে এসেছিল। বরানগরের ধনঞ্জয়বাবু বাড়িতে কুটুম এসেছে বলে দমদম বাজারে গিয়েছিলেন ভালো মাছ কিনতে। কিন্তু গলির মোড়েই আটকে গিয়েছিলেন একটা তিন তাসের ঠেকে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, বেলা চারটে পর্যন্ত চললো সেই জুয়োখেলা। বাজারের ব্যাগ পড়ে রইল ধনঞ্জয়বাবুর পায়ের কাছে।

বিকেল চারটেয় যখন ক্লান্ত জুয়াড়িরা যে যার মত পাততাড়ি গোটালো, তখন ধনঞ্জয়বাবুর প্রতি ভাগ্যদেবী শ্রীযুক্তা জুয়া ঠাকুরাণী খুবই প্রসন্না। তিনি প্রায় হাজার বারোশ টাকা জিতেছেন।

বাজারের ব্যাগটা পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঠেক থেকে বেরিয়ে ধনঞ্জয়বাবু ভাদ্র মাসের বিকেলবেলার কড়া রোদে হুঁশ ফিরে পেলেন। বাড়িতে কুটুম, রীতিমত বড় কুটুম, স্ত্রীর বড় ভাই, তাঁরই জন্যে ভালো মাছ কিনতে বার হয়ে তারপর এই কাণ্ড।

কিন্তু ধনঞ্জয়বাবু নানাসূত্রে কাণ্ডকারখানার খবর জানতেন। ভাসা-ভাসা ভাবে কোথায় কাণ্ডকারখানার অফিসটা সেটারও ধারণা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সাহেব পাড়ায় এসে খুঁজে খুঁজে কাণ্ডকারখানায় পৌঁছে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরে একশো সত্তর টাকার বিনিময়ে শশাঙ্কবাবুর পরামর্শ পেলেন।

শশাঙ্কবাবু ধনঞ্জয়বাবুর কথা শুনে বললেন, 'রদ্দি পুরনো বস্তাপচা ব্যাখ্যায় এ যাত্রা পার পাবেন না। আপনাকে নতুন কৌশল নিতে হবে।'

নতুন কৌশলগুলির অবশ্য রকমফের আছে। এবং তা আগেই লিখে সাইক্লোস্টাইল করে রাখা আছে। শশাঙ্কবাবু তাঁর টেবিলের বাঁ পাশে গাদা করে রাখা ফাইলের মধ্য থেকে একটা ফাইল খুঁজে বার করলেন, ফাইলের গায়ে লেখা 'গৃহশান্তি'।

'গৃহশান্তি শীর্ষক নথিটি খুলে তার মধ্য থেকে একটি নির্দেশাবলী বার করলেন তিনি, তারপর সেটা ধনঞ্জয়বাবুকে দিলেন।

নির্দেশাবলী অতি দীর্ঘ ও বিস্তৃত, বেশ কয়েক শিট মুদ্রিত পৃষ্ঠা। তার মধ্য থেকে কয়েকটি বাছাই করে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করছি।

(১) আপনার যদি টাকা থাকে ও সাহস থাকে, এখান থেকে সরাসরি বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে চলে যান। একটা বিমান ভাড়া করে সেই বিমান থেকে প্যারাসুটে করে নিজের বাড়ির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শুধু আপনার গৃহিণী কেন, পাড়া প্রতিবেশী সবাই এত চমৎকৃত হবেন যে দেরি করে আসার প্রশ্নই উঠবে না।

(২) বুকে বাথা করছে বলে যে কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যান, সেখান থেকে বাড়িতে খবর পাঠান।

(৩) যে কোনও ট্রাফিক পুলিশের হুইসেল বা ছাতা কেড়ে নিন। এক ঘণ্টা পরে থানার হাজত থেকে বাসায় খবর পাঠান।

এইরকম আরও অনেক আছে। পুরো ব্যবস্থাপত্রটি খুঁটিয়ে পড়ার পর ধনঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, এর কোনওটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তখন টেবিলের ওপর থেকে 'খবরের কাগজের কাটিং' লেখা একটি নথি তুলে নিয়ে সেটা খুলে কয়েকটা কাটিং পর্যালোচনা করে শশাঙ্কবাবু বললেন, 'বাগবাজারের ঘাটে চলে যান। সন্ধ্যার দিকে ইলিশ উঠছে, দুটো বড় দেখে মাছ কিনুন।' তারপর সেখান থেকে দৌড়ে বাড়ি চলে যান, ঘামে জামাকাপড় ভিজে জবজবে হয়ে যাবে, বাসায় প্রবেশ করে ধপ করে বসে পড়ুন, এক গেলাস জল চান। তারপর বলুন, 'বসনিয়ায় গণহত্যার প্রতিবাদে' ঘুঘুডাঙায় পথ অবরোধ চলেছে। এই রোদ্দুরে এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে আসছি। আঃ আরেক গেলাস জল।'

সৎ পরামর্শ পেয়ে ধনঞ্জয়বাবু খুশি মনে জোড়া ইলিশ হাতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

এই তো আজ এখন শশাঙ্কবাবুর সামনে বসে রয়েছেন নতুনবাজার থানার বড় দারোগা রমজান খান সাহেব।

খান সাহেব মহা বেকায়দায় পড়েছেন। তিনি বছর দেড়েক আগে নতুনবাজার থানার পোস্টিং নিলামে তিন লাখ টাকায় ডেকে নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে নিলামের ডাকে হেরে গিয়ে তাঁর পুরনো ব্যাচমেট তথা প্রতিদ্বন্দ্বী জগা মাইতি 'দুর্নীতি প্রতিরোধ' দপ্তরে ইনস্পেক্টর হয়ে চলে যায়। সেই জগা এখন তাঁর পিছনে লেগেছে।

বালিগঞ্জ লেকে, লেক গার্ডেনে, লেক টাউনে, সল্টলেকে, কলকাতার মধ্যে, আশেপাশে যতরকম লেকের ব্যাপার আছে সব জায়গায় খান সাহেবের বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে। লেকের ওপর খুব ঝোঁক তার। এ ছাড়া বেনামিতে সতেরোটা ট্রাক, বারোটা বাস মিনিবাস, গোটা তিনেক ট্যাক্সি, শ'খানেক রিকশা তাঁর হয়েছে। আর সেই অনুযায়ী ধনসম্পদ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় অ্যাকাউন্ট এবং লকার। প্রায় সবই ধরে ফেলেছে জগা।

ঘোর বিপদে পড়ে খান সাহেব কাণ্ডকারখানায় এসেছেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে শশাঙ্কবাবু 'সম্পত্তি রক্ষা' শীর্ষক একটি নথি খুলে একটা ব্যবস্থাপত্র রমজান খানের হাতে দিলেন। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে রমজান খান বললেন, 'দাদা, সবই ট্রাই করেছি, এই বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক পেয়েছি, নানান সম্পত্তি, চাচার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে, দান সূত্রে পেয়েছি, লটারিতে টাকা পেয়ে করেছি কিন্তু কিছুই ধোপে টিকছে না। জগা বড় ধূর্ত।'

তখন শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি আপনাকে নতুন একটা পরামর্শ দিচ্ছি, এটাই লেটেস্ট চলছে। আপনি যে কোনও বড় নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এমনকি লাটসাহেব বা বিচারপতির নাম বলুন, একটা গ্রহণযোগ্য নাম ভেবেচিন্তে বলবেন, তাঁর সঙ্গে কার্যকারণ কোনও সূত্রে আপনার যোগাযোগ আছে বা কখনও ছিল। তারপর বলুন এ সব সম্পত্তি, টাকা পয়সা, সোনাদানা সবই তাঁর, আপনার বেনামে তিনিই এসব করেছেন। নিজের নামে করতে অসুবিধে আছে কিনা তাই। দরকার হলে এফিডেবিট করে বলে দিন।'

রমজান খান হাজার হলেও পুলিশের লোক, আদালতকে এখনও ভয় পান। তিনি বললেন, 'আদালতে এফিডেবিট করে এসব কথা বলা যাবে?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'কলকাতায় এফিডেবিট করতে না চান, সুইজারল্যান্ড লন্ডন বা নিদেন পক্ষে ঢাকায় চলে যান। সেখানে নিশ্চয় আপনার আত্মীয়স্বজন আছেন, সেখানে

গিয়ে এফিডেবিট করিয়ে ফিরে আসুন।'

আশাকরি ইতিমধ্যেই পাঠক-পাঠিকা ধরে ফেলেছেন, কাণ্ড-কারখানা কোম্পানির কাজকর্ম কি।

এই কোম্পানির একজনই লোক। এই শশাঙ্ক রায়চৌধুরী। তিনি কিভাবে এই কোম্পানি পরিকল্পনা করলেন সেটা অনুধাবনের জন্যে শশাঙ্কবাবুর অতীত ইতিহাস একটু সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(দুই)
অতীত

'হে অতীত তুমি গোপনে গোপনে'

—রবীন্দ্রনাথ

শশাঙ্ক রায়চৌধুরীর অতীত জীবনের মাত্র দুটো ঘটনা বলব।

প্রথমে তাঁর স্কুল জীবনের একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা বলি। তখন তিনি বিদ্যালয়ের মাঝারি ক্লাসে এই সিক্স-সেভেনে পড়েন। একবার পর পর কয়েকদিন জ্বরে ভুগে প্রায় সপ্তাহখানেক কামাই করে প্রথম যেদিন অন্নপথ্য করে স্কুলে ফিরলেন সেদিনই পড়লেন বিপদে।

ভয়ঙ্কর বিপদ। প্রথম পিরিয়ডে ইংরেজির ক্লাস। সব ছাত্র হোম ওয়ার্কের খাতা জমা দিল, শুধু শশাঙ্কবাবু বাদ। তিনি যে স্কুলেই আসতে পারেননি, হোম টাস্ক কি ছিল তাই জানতেন না। এদিকে ইংরেজির মাস্টারমশাই ছিলেন একজন পার্টটাইম গুণ্ডা। 'জ্বর হয়েছে, তাই আসতে পারিনি' এই সব কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করলেন না। সদ্য রোগমুক্ত শশাঙ্ককে তিনি বেধড়ক পেটালেন।

কি করে শশাঙ্ক যেন বুঝে গেলেন সত্যি কথায় কাজ হবে না। বানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিচিত্র কারণ দেখাতে হবে। মাস দুয়েক পরে মামার বাড়িতে মাসিব বিয়েতে দিন দশেক কাটিয়ে স্কুলে ফিরতেই আবার সেই ইংরেজি মাস্টারের হাতে পড়লেন শশাঙ্কবাবু।

কিন্তু এবার ব্যাখ্যা প্রস্তুত ছিল। মামার বাড়ি তিনি গিয়েছিলেন তবে সেটা মাসির বিয়েতে, তা বললেন না। বদলে যা বললেন, সেটা হল তাঁর দাদু মানে মাতামহ আমলকি গাছ থেকে আমলকি পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে ফেলেছেন, সেই সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর মাকে সঙ্গে করে মামার বাড়িতে গিয়েছিলেন, অবস্থা গুরুতর দেখে এ কয়দিন তাঁকে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে থাকতে হয়।

ছাত্রের এই কথা শুনে মারকুটে মাস্টার পর্যন্ত উদ্যত চড় থামিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন, 'দাদু, মানে তোমার মা'র বাবা?'

শশাঙ্ক বলেছিলেন 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মাস্টারমশায় তখন আবার প্রশ্ন করেন, 'বয়েস নিশ্চয় অনেক হয়েছে।'

শশাঙ্ক জানিয়েছিলেন, 'বেশি নয়, এই সদ্য বাহাত্তর হয়েছে।'

মাস্টারমশায় স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'বাহাত্তর বছর কম বয়েস নাকি? এই বয়েসে তোমার দাদু গাছে উঠে ফল পাড়েন।'

শশাঙ্ক জানিয়েছিলেন, 'শুধু আমলকি নয়, আম, লিচু এমনকি দাদু তরতর করে নারকেল গাছের মাথায় উঠে গিয়ে ডাব-নারকেল পেড়ে আনেন।'

হতবাক মাস্টারমশায় সেদিন শশাঙ্ককে মারেননি। পরে নিয়মিত সেই কল্পিত দাদুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। মাস তিনেক পরে যখন তিনি জানলেন যে সেই বৃদ্ধ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং আবার গাছে উঠে ফল পাড়া আরম্ভ করেছেন, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

ছাত্রজীবনের পরে শশাঙ্কবাবুর চাকুরি জীবনের কথা বলতে হয়। বাইশ বছর বয়সে একটা সরকারি অফিসে কেরানির চাকরিতে তিনি প্রবেশ করেন। এ বয়েসটায় চাকরি করতে ভাল লাগে না। শশাঙ্কবাবু রাত জেগে চুটিয়ে আড্ডা দিতেন। ফলে মাঝেমধ্যেই অফিসে কাজের সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

শশাঙ্কবাবু দুর্ভাগ্যক্রমে রমলা পাল নামে এক মহিলা বড়বাবুর অধীনে কাজ করতেন। অবিবাহিতা, মধ্যবয়সিনী কুমারী রমলা পাল ভারি খিটখিটে স্বভাবের ছিলেন। তাছাড়া খুব খোঁচা দিয়ে কথা বলতেন।

একদিন শশাঙ্কবাবু প্রায় সারারাত আড্ডা দিয়ে সকালে স্নান-খাওয়া করে অফিস যাওয়ার আগে বিছানায় একটু গা এলিয়ে শুয়েছিলেন। ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে অফিসে আসতে দেরি হয়ে যায়।

বড়বাবু মানে রমলা পালকে তিনি নিজে থেকেই জানান যে বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাই এই বিলম্ব। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে রমলা পাল কাষ্ঠহাসি হেসে জানতে চান, 'সে কি আপনি বাড়িতেও ঘুমোন নাকি?'

এর পরে যে মাস ছয়েক চাকরিতে ছিলেন, শশাঙ্কবাবু আর রমলা পালকে একটিও সত্যি কথা বলেননি। একবার বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে পরের দিন বরযাত্রীর সাজে সিল্কের পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে বেশ দেরি করে কনের বাড়ি ডোমজুড় থেকে অফিসে এসে পৌঁছালেন।

বলা বাহুল্য, একে দেরি, তার ওপরে এই 'সাজপোশাক দেখে রমলা পাল কটাক্ষ করেছিলেন। তখন শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার বড় পিসিমার বিয়ে ছিল ম্যাডাম।'

রমলা পাল বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনার বড় পিসিমার বিয়ে?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'তেমন বয়েস হয়নি। এই আর্লি ফিফটি। আমারই এক বন্ধুকে বিয়ে করলেন।'

রমলা পাল বললেন, 'আপনার বড় পিসিমা আপনার বন্ধুকে বিয়ে করলেন, আর্লি ফিফটিতে?'

'ইয়েস ম্যাডাম', শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আপনার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড় হবেন।'

এরপর থেকে রমলা পাল কেমন সলজ্জ দৃষ্টিতে শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাতেন। তাঁকে দেখলেই শাড়ির আঁচলটা দিয়ে গলা ঢাকা দিতেন কিংবা অন্যমনস্কভাবে হাতের আঙুলে জড়াতেন।

ইতিমধ্যে শশাঙ্কবাবু বুঝে গেছেন যদি ঠিকমত মিথ্যার বেসাতি করা যায় তাহলে তার থেকে লাভজনক আর কিছু নেই।

স্ত্রীকে, বাবাকে, অফিসের ওপরওলাকে, বাড়িওলাকে, প্রেমিকাকে—পাড়ার মাস্তানকে, সবাইকে কত কারণে কতরকম ব্যাখ্যা দিতে হয়। সেই ব্যাখ্যা যদি চমকপ্রদ অথচ বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবেই কাজ চলে, না হলে বিপদ অনিবার্য।

প্রথম প্রথম শৌখিনভাবে একে-ওকে চেনা-জানাদের পরামর্শ দিতেন শশাঙ্ক রায়চৌধুরী। এখন ক্রমশ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, না ছেড়ে উপায়ও ছিল না। শেষের দিকে রমলা পাল বড়ই ব্রীড়াপরায়ণা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে দেখলেই কেমন ডগমগ হয়ে উঠতেন।

চাকরি ছেড়ে অবশ্য শশাঙ্ক রায়চৌধুরীর কোনও ক্ষতি হয়নি। কাণ্ডকারখানার এখন রমরমা চলছে। প্রতি সন্ধ্যায় হাজার খানেক টাকা আয় হয়।

বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেও যাওয়া যায়। পুজোসংখ্যার জন্যে যে লেখা ১ জুন দেয়ার কথা ছিল সেটা এই যে আমি এই ভাদ্রশেষেও লিখছি তা সম্ভব হয়েছে শশাঙ্কবাবুর কৃপায়। তারই পরামর্শে হাতের বুড়ো আঙুলে একটা মিথ্যে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সম্পাদকদের দেখিয়েছি, ঘুমের মধ্যে টিকটিকিতে কামড়িয়ে দিয়েছে বলে। তাঁরা যে আমার কথা অবিশ্বাস করেননি, আমার জন্যে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন, এই লেখা ছাপা হওয়াই তার প্রমাণ।

আধকপালে

সকলেই কেমন ভাল ভাল গল্প লেখে। প্রেমের, ভালবাসার, বিবহ-বিচ্ছেদের গল্প। জীবনের জয় পরাজয়, বাঁচার লড়াইয়ের গল্প। কত আর্থসামাজিক প্রশ্ন। বর্তমানের সমস্যাবলী সেই সব গল্পের মধ্যে ফুটে ওঠে।

সুখ-দুঃখের নিটোল গল্প সে সব। তার মধ্যে পাত্র-পাত্রী, চরিত্রাবলী রয়েছে, কথোপকথন অর্থাৎ চোখা-চোখা লাগসই সব ডায়ালগ আছে। সব চেয়ে বড় কথা সেখানে কাহিনী আছে। সেই কাহিনীর গতি আছে। পরিণতি আছে।

আমার গল্পগুলো কিছুতেই কেন যেন, সেরকম হয় না। হাজার চেষ্টা করলেও না। কী রকম ন্যালাখ্যাপা, উলটোপালটা গল্প হয়ে যায় আমার। সেগুলোর কারণ নেই। কাহিনী নেই শুধু ফ্যা-ফ্যা করে হাসি। কেন যে দয়ালু পাঠক, দয়াবতী পাঠিকা সেই হাঘরে গল্প পড়েন, কেন যে সম্পাদক মহোদয় অনুগ্রহ বশত সেই ফাঁপা গল্প ছাপেন, সেটা আমি যেমন বুঝতে পারি না, আরও অনেকেই পারেন না। এমনকি আমার স্ত্রী পর্যন্ত পারেন না।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো একটা যৎকিঞ্চিৎ গল্পে তিন অনুচ্ছেদ ভূমিকা ফেঁদে বসার পরে খেয়াল হল যে এরকম ভাবে কালক্ষেপণ করা উচিত হচ্ছে না কারণ আমাদের বর্তমান কাহিনীর নায়কের আধকপালে হয়েছে। তাঁকে বেশিক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা উচিত হবে না।

আমাদের এই কাহিনীর নায়কের নাম সুদর্শন পাল। সুদর্শনের আধকপালে হয়েছে।

আধকপালে ব্যাপারটা যাঁরা জানেন না তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করব না। তবে যেটা আশঙ্কা করেছিলাম যে এই আজব শব্দটি কোনও অভিধানেই থাকবে না, সেটা ঠিক নয়। শব্দটি দেখছি সব অভিধানেই রয়েছে, খুব সম্ভব অভিধানকারেরা সঙ্গত কারণেই এই আধকপালে ব্যারামে খুব ভোগেন, সে জন্যেই শব্দটি অভিধানে চলে গেছে।

অভিধানের কথাই যখন উঠল, আগে আধকপালে শব্দটার অভিধানগত মানেটা দেখে

নিই। চলন্তিকায় আধকপালে মানে রয়েছে 'এক দিকে মাথা ধরা'। আর সংসদ বিস্তারিত করে বলেছেন, 'অর্ধেক বা আংশিক মাথা বা কপাল জুড়িয়া আছে এমন মাথাধরা।'

আধকপালে খুব গোলমেলে ব্যারাম। সহজে সারতে চায় না। মাথার একদিকে বাঁয়ে বা ডাইনে একটা মাথাধরা সদাসর্বদা লুকিয়ে থাকে। কিছুতে যেতে চায় না। সারা দিনমান ধরে খুব কষ্ট দেয়। সেই সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শোয়া পর্যন্ত যন্ত্রণা, কখনও কম, কখনও বেশি।

কিন্তু আমাদের এই কাহিনীর নায়ক সুদর্শনবাবুর আধকপালে অসুখটা অভ্যেস হয়ে গেছে। তিনি প্রায় বছরখানেক ধরে এই অসুখে ভুগছেন। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট, খাওয়া-পরা, অফিস-কাছারি করা, টিভি দেখা, খবরের কাগজ পড়া, সব কিছুতেই কষ্ট হত। সব সময় মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা। কপালের বাঁ দিকে ঘেঁষে একটা অসহ্য টনটনানি। অডিকলোনের পট্টি কপালে দিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে চোখ বুজে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলে একটু আরাম হতো।

মাথা ধরাটা এখনও সব সময়েই মাথার মধ্যে আছে, কিন্তু ব্যাপারটা সহ্য হয়ে গেছে সুদর্শনবাবুর। মাথায় একটু ঝাঁকি লাগলেই যন্ত্রণাটা চিড়িক দিয়ে ওঠে, তাছাড়া অন্য সময়ে তেমন কষ্ট হয় না। কোনও রকমে কাজকর্ম, দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া যায়। ব্যথাটা থাকলেও জানান দেয় না।

গত বছরের গোড়ায় যখন প্রথম আধকপালে হল সুদর্শনবাবুর, তিনি দু'চারবার পাড়ার ডাক্তারের কাছে যাতায়াত করে অবশেষে একশো টাকা ভিজিটের বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। বড় ডাক্তার নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেডিকেল টেস্ট করেও যখন অসুখটার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করতে পারলেন না, তিনি সুদর্শনবাবুকে বললেন, 'সরি, আপনার অসুখটা সহজে সারবে না। ওষুধপত্র খেয়ে কিছু সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। অপেক্ষা করে দেখুন। একা একা সেরে যায় কিনা।'

কালক্রমে অসুখটা সম্পূর্ণ সেরে যায়নি বটে, তবে তার দাপট অনেকটা কমেছে। সুদর্শনবাবু টের পান যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে, মাথা নড়া-চড়া করলে, বিশেষ করে জোরে হাসলে মাথায় লাগে। তাছাড়া মালুম হয় না।

সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ আগে সেই বড় ডাক্তারবাবুর কাছে আবার গিয়েছিলেন সুদর্শনবাবু। আরেকবার একশো টাকা ভিজিট দিয়ে দেখালেন। সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাহলে তো এখন আর আপনার কষ্ট নেই।'

সুদর্শনবাবু বললেন, 'না স্যার কষ্ট আছে, ওই যে বললাম না হাসলে পরে মাথায় ঝাঁকি লাগলে ব্যথা লাগে। যন্ত্রণা হয়।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'এর কিছু করা যাবে না। আপনি হাসা ছেড়ে দিন। এখন থেকে হাসবেন না।'

সেই থেকে সুদর্শনবাবু হাসা ছেড়ে দিয়েছেন। মানে ছাড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাসা ছেড়ে দেয়া সহজ কাজ নয়। হাসি সম্পূর্ণ বন্ধ করার আগে এ নিয়ে আরও একদিন আরও একশো টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন, সুদর্শনবাবু। সুদর্শনবাবুর জিজ্ঞাসা ছিল একটা, 'হাসা ছেড়ে দিলে কোনও ক্ষতি হবে না তো?' সুদর্শনবাবু বলেছিলেন, 'অতি বড় বেয়াড়া বদমাইস, শয়তান লোক পর্যন্ত হাসে। হার্টের রোগী, ফাঁসির আসামী, জজসাহেব, মন্ত্রী, উকিল, পুলিশের দারোগা, ডাক্তার পর্যন্ত

হাসে। হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে, থানার লক-আপে, শ্মশানে পর্যন্ত লোক হাসে। এ অবস্থায় যদি আমি হাসি বন্ধ করি আমার কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

অনেক রকম ভেবেচিন্তে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'আপনার কথার মধ্যে একটা যুক্তি আছে। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে বা শখ করে হাসি বন্ধ করছেন না। হাসতে আপনার কষ্ট হয়, যন্ত্রণা বাড়ে তাই আপনি হাসি বন্ধ করছেন। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে হাসতে যে হবেই এমন কোনও কথা নেই। কোথাও কোনও বইতে, ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা লেখা নেই যে হাসতে হবেই, প্রতিদিন এতক্ষণ না হাসলে মানুষ মরে যাবে বা তার কোনও কঠিন অসুখ হবে।'

সুদর্শনবাবু বললেন 'একদম হাসে না এমন কোনও রোগী আপনি দেখেছেন কি?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না। সে রকম দেখেছি বলে হলফ করে বলতে পারব না। তবে অনেক রোগীর মধ্যে দু'চারজন এরকম ঘটতেই পারে। সে হয়তো হাসে না কখনই, কোন কারণেই হাসে না। সে হয়তো নিজেই জানে না, যে সে কখনও হাসে না। অন্যেরাও হয়তো খেয়াল করে না। এই রকমভাবে না হেসে সে দিব্যি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কাটিয়ে দেয়। খায়-দায়-ঘুমোয়, বাজার করে, অফিস করে কেউ কিছু টের পায় না। কেউ ধরতে পারে না যে এই লোকটি একদম হাসে না।' এই পর্যন্ত একদমে বলে একটু থেমে খুবই দার্শনিকের মতো গলায় ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর ধরবেই বা কী করে। কেউ তো আর সব সময় হাসে না। কথায় কথায় তো আর সর্বদা হাসার দরকার পড়ে না। কেউ যদি একেবারেই কখনও না হাসে সেটা ধরা সহজ নয়। যে লোকটাকে এখন হাসতে দেখা যাচ্ছে না সে যে কখনই হাসে না সেটা কী করে বোঝা যাবে?'

ডাক্তারবাবুর সুপরামর্শ শুনে খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সুদর্শনবাবু।

বলা বাহুল্য ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তাঁর খুব হাসি পাচ্ছিল। বহু কষ্টে ডাক্তারবাবুর সামনে হাসির বেগ দমন করেছিলেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে যখনই ডাক্তারবাবুর উপদেশ তাঁর মনে পড়েছে তিনি অনর্গল হাসির দমকে ফেটে পড়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে বাঁ দিকের কপালটা যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে উঠেছে। তীব্র ব্যথায় হাসি থেমে গেছে। কিন্তু হাসির কারণটা থেকে গেলে, যত যন্ত্রণাদায়কই হোক হাসি বন্ধ করা কঠিন।

এছাড়া আরেকটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। সুদর্শনবাবুর ঠাকুর্দা ছিলেন হেড পণ্ডিত। বাবা ছিলেন হেডমাস্টার। দু'জনেই মোটাসোটা লম্বাচওড়া, কৃষ্ণকায় পুরুষ। আর, সুদর্শনবাবু রোগা, ফর্সা চিকন চেহারার মানুষ।

আসলে সুদর্শনবাবু হলেন, মা-গঠনী মানুষ। মায়ের মতো গঠন পেয়েছেন। সুদর্শনবাবুর সেই কৃশকায়া অনতিদীর্ঘা পরমা সুন্দরী জননীর জননী অর্থাৎ তাঁর দিদিমাও একই রকম ছিলেন।

সুদর্শনবাবুর পিতা-পিতামহ ছিলেন স্বভাবত এবং বৃত্তিগত কারণে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। দৈনন্দিন পৃথিবীতে তাঁরা হাসির কারণ খুঁজে পাননি। বিশেষ কখনও হাসতেন না।

আদতে এটা একটা শৃঙ্খলার নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপার। সব কিছু নিয়মমাফিক, শৃঙ্খলার মধ্যে চললে এমন কিছু ঘটা বা ভাবা সম্ভব নয়, যাতে হাসি পেতে পারে।

সুদর্শনবাবু যদি পিতৃপিতামহের সরাসরি উত্তরাধিকার পেতেন তাহলে হাসি বন্ধ

করার ব্যাপারে তাঁকে অত কষ্ট করতে হত না।

কিন্তু ওই যে বলেছিলেন, সুদর্শনবাবু মা-গঠনী সন্তান। তাঁর জিন-কোষ, চিন্তা-ভাবনা সবই মাতৃতান্ত্রিক। ফলে হাসির ব্যাপারটা তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছেন। মায়ের দিক থেকে।

সুদর্শনবাবুর দিদিমা ছিলেন সুখে-দুঃখে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে সদারসিকা। দুয়েকটা ছোট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা প্রমাণ হবে।

দিদিমা ছাদে আমসত্ত্ব শুকোতে দিয়েছেন হালকা বাঁশের ফাঁক ফাঁক ঝুড়ি চাপা দিয়ে। সেই ঝুড়ি উলটিয়ে কালো পাথরের অতিকায় থালা ভর্তি আমসত্ত্ব নামাতে গিয়ে ওলটানো ঝুড়ি এবং শূন্য থালা দেখে দিদিমা হেসে আকুল হয়ে গেলেন। সেদিন কেন যে তিনি অত হেসেছিলেন সুদর্শনবাবুর সেটা আজও বোধগম্য নয়।

আরেকবার একটা ব্যাঙ উঠোন থেকে বার বার লাফ দিয়ে ঠাকুর দালানের বারান্দায় উঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুতেই প্রয়োজনীয় উচ্চতায় উঠতে না পারায় বার বার বারান্দার নীচে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। দিদিমা পুজোর ঘরে পুজো বন্ধ করে হাসতে লাগলেন।

সুদর্শনবাবুর মায়ের ব্যাপারে একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট।

সুদর্শনবাবুর মা একদিন পা পিছলিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সে সাংঘাতিক পড়া। এক ঘর লোকের সামনে ভারী শরীর নিয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে গিয়েছিল। সাধারণত কেউ হঠাৎ পা পিছলিয়ে পড়ে গেলে যে পড়ে সে ছাড়া বাকি সবাই হেসে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম হয়েছিল। সকলের সঙ্গে নিজের পতনে তিনিও হেসেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে কপাল দিয়ে।

মা-দিদিমার ধাতটা সুদর্শনবাবুও পেয়েছেন। সব কারণেই তাঁর হাসি পায়। ডাক্তারবাবুর হাসতে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সুদর্শনবাবু ভেবে দেখলেন যে তাঁর মা যদি মাথা ফেটে গেলেও হাসতে পারেন তিনি কেন মাথা ধরা নিয়ে হাসতে পারবেন না। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ কষ্টের ব্যাপার।

পূর্বজন্মের গুণ বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। সুদর্শনবাবু নিশ্চয়ই বড় ডাক্তারবাবুর কাছে আগের জন্মে অনেক টাকা ধার করেছিলেন। এ জন্মে সেটা শোধ না দিয়ে অব্যাহতি নেই।

তাই এর পরেও আরেকদিন সেই বড় ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হল সুদর্শনবাবুকে। তিনি ইতিমধ্যে সুদর্শনবাবুকে মোটামুটি বুঝে ফেলেছেন। আজ ভদ্রতার খাতিরে আর ভিজিট নিতে চাইলেন না। কিন্তু সুদর্শনবাবু জোর করে একটা একশো টাকার নোট ডাক্তারবাবুর টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তিনি বিচক্ষণ লোক। তিনি জানেন ডাক্তারের ভিজিট আর উকিলের ফি সব সময়েই দেওয়া উচিত। তাতেই মঙ্গল হয়।

সে যা হোক, আজ মহা দুর্যোগের দিন। বাইরে চারদিক কালো করে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে আজ ভিড় নেই। সর্বশেষ রোগী এক সুদর্শনবাবুই রয়েছেন। আজ সুযোগ পেয়ে তিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মন খোলসা কবে আলোচনা করলেন।

সুদর্শনবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু আপনার পরামর্শ মেনে যে চলা যাচ্ছে না।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পরামর্শ?'

সুদর্শনবাবু বললেন, ওই যে আপনি বলেছিলেন না, 'ওই যে না হাসতে বলেছিলেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হাসলে আপনার কষ্ট হয় তাই আপনাকে হাসতে বারণ করেছিলাম।'

সুদর্শনবাবু বললে, 'না হেসে যে পারি না। হাসব না ভাবলে আমার যে আরও বেশি হাসি পায়।'

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি বলেছিলেন না বেশি হাসলে আপনার যন্ত্রণা বেশি হয়, ব্যথা বাড়ে।'

সুদর্শনবাবু জানালেন, 'খুব কষ্ট হয়। খুব ব্যথা হয়।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তা হলে আপনি হাসবেন কেন? এত কী হাসির ব্যাপার আছে। কিসে আপনি হাসেন।'

সুদর্শনবাবু স্বীকার করলেন যে, বাজারে জিনিসপত্রের দাম শুনলে তাঁর হাসি পায়। খবরের কাগজের খবর পড়লে, নেতাদের বক্তৃতা শুনলে তাঁর হাসি পায়। হাসির গল্প পড়লে, হাসির সিনেমা বা সিরিয়াল দেখলে তাঁর হাসি পায়। দুঃখের গল্প পড়লে, দুঃখের সিনেমা বা সিরিয়াল দেখলে তিনি হাস্য সম্বরণ করতে পারেন না।

সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনাকে তো হাসলে চলবে না। একটু সাবধানে থাকতে হবে। আচ্ছা আপনি কি ভেবে দেখেছেন এই যে এত পশুপাখি এরা কখনও হাসে না। কুকুর হাসে না, বিড়াল হাসে না, কাক হাসে না, কোকিল হাসে না, গরু-ঘোড়া, বাঘ-সিংহ এমনকি হায়েনা পর্যন্ত হাসে না। অথচ এদের না হেসে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। যে যার মতো বেশ তরতাজা থাকছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। না হেসে জীব জগতের এদের কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধে বা ক্ষতি হচ্ছে না। তা হলে আপনি কেন হাসবেন? লতা-পাতা গাছ কেউ কখনও হাসে না, তবু আপনাকে হাসতে হবে?'

ডাক্তারবাবুর এই বক্তৃতা শুনে ছোটো করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন সুদর্শনবাবু। হাসতে হাসতে মাথার যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে উঠতে সুদর্শনবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি যে মানুষ। না হেসে আমার যে কোনও গতি নেই। না হেসে আমার কোনও উপায় নেই।'

এই বলে ডাক্তারবাবুর চেম্বারের মেঝেতে পেটে হাত দিয়ে হেসে গড়াতে গড়াতে সেই সঙ্গে মাথার ঝাঁকিতে অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলেন সুদর্শনবাবু। তাঁর বক্তৃতার পরিণতি দেখে ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত। এর চেয়েও অবাক কাণ্ড হো-হো করে হাসতে হাসতে হঠাৎ এক সময় যন্ত্রণার গোঙানিটা থেমে গেল সুদর্শনবাবুর। তিনি টের পেলেন যন্ত্রণাটা মাথা থেকে চলে গেছে। ডাক্তারবাবুও বুঝতে পারলেন তাঁর সেই পুরনো রোগী এই মাত্র রোগমুক্ত হয়েছেন।

কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব হল সেটা তিনি ধরতে পারলেন না।

ধরতে পারলেও তেমন কোনও সুবিধে ছিল না।

শুধু হাসতে-হাসতে আধকপালের মতো কঠিন অসুখ সেরে যেতে পারে ডাক্তারবাবুর পক্ষে সেটা ভাবা কঠিন।

কানাহুলো

একবার আমাদের কানাহুলোয় ধরেছিল। তখন আমি খুব ছোট নই। সে বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। উত্তেজনাহীন মন্থর মফঃস্বল শহরে দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনগুলো আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

এই সময়ে আমাদের শহরে মাছ ধরার খুব হিড়িক পড়ে গেল। মিউনিসিপ্যালিটির প্রান্তসীমায় সন্তোষের রাজবাড়িতে অনেকগুলো পুরনো আমলের দিঘি। রানীদিঘি রাজাসায়র, সাহেবপুকুর—ছোট-বড় চার-পাঁচটা জলাশয়। তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। রাজবাড়িতে কেউ নেই। দিঘিগুলোতে যে যেমন ইচ্ছে মাছ ধরছে, বাধা দেওয়ার মত তেমন কেউ নেই। তা ছাড়া, আমার বাপঠাকুর্দারা ছিলেন সন্তোষের রাজাদের বহুদিনের উকিল। সেই সুবাদে তাঁদের পুকুরে মাছ ধরার একটা অলিখিত অধিকারও ছিল।

সে যা হোক, এই ছোট গল্পটা খুবই ছোট, আরম্ভ করতে করতেই শেষ হয়ে যাবে। তাই আগেভাবে কানাহুলোর ব্যাপারটা বলে নিই।

কানাহুলো শব্দটা কোনও অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, অন্তত আমি তো পেলাম না।

কানাহুলো হল এক ধরনের গোলমেলে ভূত। সন্ধ্যার পরে পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার রাস্তায় ওরা ঘুরে বেড়ায়। কানাহুলো একবার ধরলে পরে নিস্তার পাওয়া কঠিন। চেনা পথঘাট সব ভুলিয়ে দেয়। রাতের বেলার নির্জন রাস্তায় ঘুরপাক খেতে হয় এদের পাল্লায় পড়লে। চেনা রাস্তাও অচেনা হয়ে যায়, ঠিক পথে হাঁটলেও মনে হয় বেঠিক চলেছি। বাড়ির খুব কাছে এসেও বোঝা যায় না যে এসে গেছি।

তবে যতদূর জানা গেছে কানাহুলোরা কাউকে প্রাণে মারে না, ঘাড় মটকিয়ে দেয় না। নিরীহ ঘরমুখো পথিককে বনেবাদায়, আলপথে, গ্রামের রাস্তায় ঘুরপাক খাইয়ে নাকানি-চোবানি দিয়ে এরা মজা পায়। আজন্ম-পরিচিত নিজের এলাকার আধমাইলের মধ্যে পথ হারিয়ে সারা রাত পাক খেতে হয় কানাহুলোর পাল্লায় পড়লে; ভোরের আলো ফুটলে প্রথম কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কানাহুলো পালিয়ে যায়, তখন নিষ্কৃতি মেলে।

যখন লোকেরা এভাবে গোলকধাঁধার রাস্তায় পাক খেতে থাকে—একদিন থেকে ঘুরে আবার সেদিকেই ফিরে আসে, সামান্য দূরে অদৃশ্য থেকে কানাহুলোরা হাততালি দেয়, সেই হাততালির শব্দে পথিক আরও ঘাবড়িয়ে যায়। বিভ্রান্ত বোধ করে।

সেবার মাছ ধরার হিড়িকে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। আমাদের নিজেদের বাসায় ছিপ-বঁড়শি কিছুই ছিল না। পাড়ার এক মেছোবাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে একটা ছিপ জোগাড় হল। সুতো বঁড়শি এসব কিনলাম। তারপর একটা পুরো দুপুর ধরে আমবাগানে ঘুরে ঘুরে বাসা ভেঙে লাল পিঁপড়ের ডিম জোগাড় করলাম মাছের খাবারের জন্যে, যাকে আমাদের ওখানে বলা হত আধার বা আদার।

পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম সংগ্রহ করা অতি কঠিন কাজ। পিঁপড়ের কামড়ে যেমন জ্বালা, তেমনি সারা শরীর হাতমুখ ফুলে চাকাচাকা হয়ে গেল।

পরেরদিন খুব ভোরে পাড়ার আর সকলের সঙ্গে মাছ শিকারে বের হলাম। যেন যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছি।

সারাদিন পুকুর পাড়ে ছিপ ফেলে কাটত। বাড়ি থেকে চিঁড়ে-গুড়, মুড়ির মোয়া আর নারকেলের নাড়ু নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন হল।

কথায়-বলে, নতুন শিকারির ভাগ্য ভালো হয়।

যে কোনও কারণেই হোক আমার ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি হল না। সবাই সারাদিন ধরে টুকটাক মাছ ধরল। অনেকের মাছ-রাখার খালুই ভরে গেল। আমার হাতে ধরা পড়ল মাত্র দুটো ট্যাংরা আর একটা ছোট শোল মাছ। হয়ত আমার অনভিজ্ঞতাই এ জন্য দায়ী।

হঠাৎ বিকেলের দিকে একটা বড়সড় বোয়াল জাতীয় মাছ আমার বঁড়শিতে আটকিয়ে তারপরে একটা বড় হ্যাঁচকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দিঘির চারপাশ নীরব, নিঝুম। শুধু ঘরে-ফেরা পাখিরা ডাকাডাকি করছে, সে ডাকও নীরবতার মধ্যেই মিলে আছে। পুকুরপাড়ের গাছগুলোর ছায়া বড় বড় হয়ে অন্ধকার করে এল।

আমাদের পাড়ার লোকেরা তখন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। আমার জন্যে কেউ কেউ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু কিছু পরে তারাও চলে গেল।

বড় মাছটা ছুটে যাওয়ায় আমার কেমন যেন রোখ চেপে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দিঘির ধারে রইলাম আমি আর থানাপাড়ার আসলামভাই।

আসলামভাই দুবছর আগে আমাদের স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। তখন বেঁটেখাটো শক্ত চেহারার যুবক, টাউন ক্লাবে গোলে খেলেন।

সেদিন আসলামভাইয়ের ভাগ্যেও মাছ বিশেষ জোটেনি। যতক্ষণ অন্ধকারে ছিপের ফাৎনা দেখা গেল, আমরা দুজনে দিঘির ধারে বসে রইলাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না।

অবশেষে আমরা দুজনে উঠলাম। এখানের থেকে মাঠের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করে কর্মকারপাড়া, তারপর গাছ-গাছালি, আম-কাঁঠালের বন, ফাঁকা হাটখোলা, পুরনো শ্মশান। সেখান থেকে গ্রীষ্মের মরা নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে আবার খেতের মধ্য দিয়ে পথ ঢুকে গেছে বাজারে। সেখানে শহরের শুরু। শহরে ঢুকে ডানদিকে যাবেন আসলামভাই, আমি আর অল্প একটু এগিয়ে বাঁয়ে।

কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি একটা তিথি। আকাশে টিমটিম করে অসংখ্য তারা জ্বলছে। তারার আলোয় মাঠটা কোনাকুনিভাবে পার হয়ে আমরা দুজনে কর্মকারপাড়ার মধ্যে ঢুকলাম। কর্মকারপাড়ায় লোকজন ভালো। এর পরে আমবাগানের রাস্তাটাই যা অন্ধকার। তবে চেনা রাস্তা হলেও অন্ধকারে সাপখোপ থাকতে পারে। তাই আমরা দুজনে ঠিক করলাম আমবাগানের ভেতর দিয়ে না গিয়ে বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে সোজা নদীর ধারে গিয়ে পড়ব। একটু ঘোরা পথ, তবে এতে শ্মশানটাও এড়ানো যাবে।

আমবাগানের বাঁ পাশ ধরে হাঁটছি তো হাঁটছি, কেবলই হাঁটছি। কিছুতেই আর পথ শেষ হয় না।

এক সময়ে কি রকম সন্দেহ হল। আসলামভাইকে বললাম, 'পথ হারালাম না তো?'

আসলামভাই বললেন, 'না। পথ হারাব কেন?' একটু ঘোরা পথ তাই দেরি হচ্ছে। ওই তো ডানপাশে গাছের ফাঁকে বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।'

সত্যিই দেখলাম দূরে বেশ কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। আমরা এগোতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূরে এগিয়েই দেখি ডানদিকে আলোর কোনও চিহ্ন নেই।

এই সময়ে আসলামভাই একটা গাছের মাটি থেকে বের হয়ে আসা শিকড়ে হোঁচট খেলেন; থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি এই গাছের গোড়াটায় আধ ঘণ্টাখানেক আগে আরেকবার হোঁচট খেয়েছি'।

মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম একটা বিশাল ঝুরি নেমে আসা প্রাচীন বট কিংবা অশত্থ গাছ। আমারও মনে হল এই গাছটার নীচ দিয়ে কিছু আগে গিয়েছি, আর ঠিক তখনই খেয়াল হল এদিকে তো এরকম বড় বট গাছটাছ থাকার কথা তো নয়। কখনও তো দেখিনি।

বোধহয় আসলামভাইয়েরও মনে খটকা লেগেছিল। আমরা দুজনেই কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর আসলামভাই বললেন, 'আমরা রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি। চলো পিছনের দিকে ফিরি।'

পিছনের দিকে ফিরে কিছুটা দূর এগোতেই আবার সেই ঘনান্ধকার ঝুরিনামা বটতলায় ফিরে এলাম। এত আঁধারের মধ্যেও জায়গাটা চেনা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা পেঁচার বাচ্চা গাছের গভীরে কোথাও ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছিল। এই চেঁচানিটা আগের দুবারও শুনেছি।

এই সময়ে স্পষ্ট হাততালির শব্দ শুনলাম। একটু দূরে গাছের আড়াল থেকে শব্দটা আসছে। সচকিত হয়ে আসলামভাই বললেন, 'কানাহুলোরা হাততালি দিচ্ছে। আমরা কানাহুলোর পাল্লায় পড়েছি।'

রাত কত হয়েছে জানি না। আমাদের কারও হাতে ঘড়ি নেই, থাকলেও দেখা যেত না।

কানাহুলোর কথা শুনে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। সারা রাত এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে। এদিকে বাড়িতে বোধহয় এখনই চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, হয়ত বা কান্নাকাটিও।

আসলামভাই বললেন, 'মাছের লোভে কানাহুলো আমাদের পিছনে লেগেছে। মাছগুলো ওদের না দিলে রক্ষা নেই।'

ভয় পেয়ে খালুইসুদ্ধ মাছ তিনটে বটতলায় নামিয়ে রাখলাম, আসলামভাইও রাখলেন। সামান্য তিনটে ছোট মাছ, তখনকার বাজার দরে দু পয়সাও হবে না। তবুও মনে খুব কষ্ট হল। হাজার হলেও জীবনের প্রথম নিজের হাতে ধরা মাছ।

আসলামভাই একটা গামছায় তাঁর ধরা মাছগুলো গিঁট দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন। সেই পুঁটুলিটা আর আমার খালুইটা পাশাপাশি রেখে এবার আমরা বটগাছটার ডানদিক ধরে রওনা হলাম। আবার স্পষ্ট হাততালির শব্দ পেলাম। আসলামভাই বললেন, 'মাছ পেয়ে কানাহুলোরা খুশি হয়েছে। এবার আমরা ছাড়ান পাব।'

কোথায় যাচ্ছি জানি না। বাঁদিক, ডানদিক ছাড়া আর কোনও দিক বোঝার ক্ষমতা নেই, তবে আমরা ভাবছিলাম যে, এভাবে গেলে আবার কর্মকারপাড়ায় পৌঁছে যাব। তখন ঠিক পথ ধরে নেওয়া যাবে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। অনিবার্যভাবে আবার আমরা দুজনে সেই বটতলায় এসে পড়লাম।

অন্ধকারে আবছায়া দেখলাম খালুই আর পুঁটুলিও পড়ে রয়েছে, তুলে দেখলাম তার

মধ্যে মাছগুলো অটুট রয়েছে। আমাদের উপহার কানাহুলোরা গ্রহণ করেনি। মাছগুলো ফেরত পেয়ে কোথায় খুব আনন্দ হবে, তা নয়, তার বদলে তখন ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে, হাত-পা কাঁপা শুরু হয়েছে।

সেদিন উদ্ধার পেয়েছিলাম আশ্চর্যভাবে। কর্মকারপাড়ার কাদের গরু হারিয়ে গিয়েছিল। তারা লণ্ঠন নিয়ে লাঠি হাতে কয়েকজনে মিলে আমবনের মধ্যে গরু খুঁজতে বেরিয়েছিল। সেদিন তারা গরু পায়নি। কিন্তু আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম।

লণ্ঠন হাতে তারা নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। নদীর ধার থেকে বাড়ি পৌঁছানো কঠিন হল না।

এখনও যখন কোনও শহরের রাস্তায় গলি-ঘুঁজিতে পথ হারিয়ে ফেলি, সেই কানাহুলোর কথা মনে পড়ে। রাস্তা হারানো, চেনা বাড়ি খুঁজে না পাওয়া আমার ভাগ্যে নিয়মিতই ঘটে। টের পাই সেই কানাহুলো এখনও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

মৎস্যগন্ধা

পাঁচ-আনি বাজারে পোদ্দারদের দোকানে একটা ময়ূরের পালক বড় জোর এক আনা দাম। তবু এক আনা কিছু কম নয়। বর্ষায় আধসের, আর শীতের প্রাচুর্যের সময় যখন গোয়ালের গরুর বাঁটভর্তি দুধ তখন একসের দুধের দাম ওই এক আনা। এক আনায় এক গাদা চিংড়ি মাছ, আজকের বাজারে ওজনে যার দাম কম করে দশ টাকা।

আমরা শুনতাম এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হরিণ আর ময়ূর হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে জঙ্গলে গাছের নীচে ময়ূরের পালক বিছিয়ে পড়ে থাকে, কোনও দাম দিতে হয় না, কুড়িয়ে নিলেই হল।

কিন্তু আমাদের তো পাহাড়, জঙ্গলের দেশ নয়, নিতান্তই সমতল বাংলার নদীনালা, খাল-বিল, মাছ-দুধের দেশ। হরিণ ময়ূর আমাদের ছিল না, আমরা দেখিনি।

ময়ূরের পালক কেনা হত বঁড়শির জন্যে ছিপের সুতোয় টোন বাঁধবার জন্যে, টোন মানে এদেশে যাকে বলে ফাতনা, হালকা সাদা পালক জলে ভাসে, মাছ বঁড়শিতে মুখ দিলেই টোন কেঁপে ওঠে, তখনই টান দিতে হয় ছিপে।

এক আনা দামের ময়ূরের পালকটা টোন বানানোর আগে পরেও কাজে লাগত। ওপরের বাহারি দিকটা দিয়ে হত ঠাকুরের ঝালর, সেটা পুজোর ঘরে চলে যেত, সেটাকে গঙ্গাজলে শোধন করে ব্যবহার করা হত। সেটা কখনও হত কৃষ্ণঠাকুরের চূড়া, পটের মাথায় গুঁজে দেওয়া হত। কখনও সেটা হত চামর, ঠাকুমা সেটা দিয়ে খুব আলতো করে দেবতাদের হাওয়া করতেন।

ময়ূরের পালকের সবচেয়ে নীচের ফাঁপা অংশটা দিয়ে হত কলম। খুব ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে সূক্ষ্ম একটা নিব বার করা হত। কালিতে ডুবিয়ে সেই কলমে লিখতে হত, খুব টেকসই ছিল না সে কলম, খুব শিগগিরই নিব ভোঁতা হয়ে যেত, তবে তাতে বিশেষ অসুবিধে হত না। সূক্ষ্ম কাজে দক্ষ ছিলেন আমাদের মুহুরিবাবু সুরেশকাকা। প্রথমে কলম কেটে দেওয়া এবং তারপরে যতবার সম্ভব থ্যাতা নিব ছুরি দিয়ে কেটে সূক্ষ্ম করা—সুরেশকাকার এ কাজে ক্লান্তি ছিল না।

আমার ছোটকাকার ছিল মাছধরার বাতিক। বাতিক কিংবা ব্যারামও বলা যায়। বছরে দুচারবার বাড়ি আসতেন কলকাতা থেকে, যতবারই আসতেন কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন ছিপের জন্যে মুগার সুতো, নতুন নতুন হুইল। প্রয়োজন পড়লে ঢাকার মগবাজার থেকে ভালো ছিপ কিনে আনতেন সুরেশকাকা গিয়ে। আর খোদ বঁড়শির ব্যাপারে ঢাকাই বঁড়শির খুব সুনাম ছিল তাই ওটা কলকাতা থেকে আনতে হত না। তা ছাড়া ময়ূরের পালক দিয়ে টোন বানানোর কথা তো আগেই বলা হল।

বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। এবং প্রতিটি সূক্ষ্ম কাজেই সুরেশকাকার পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। ছোটকাকা বাড়ি এলেই সুরেশকাকা তাঁর সঙ্গে জুটে যেতেন। আদালতের কাজ মাথায় উঠত। বাবার কাছারি ঘরের কাজে একজন মুহুরি কয়দিনের জন্যে কম পড়ত।

সুরেশকাকা আর ছোটকাকা ছিলেন সমবয়সী। দুজনে ইস্কুলে একই ক্লাশে পড়তেন। দু তিনবার পরীক্ষা দিয়েও ম্যাট্রিক পরীক্ষা সুরেশকাকা পাশ করতে পারেননি। তাঁদের বাড়ির অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। সুরেশকাকার বাবা সন্ধ্যাবেলা ছায়াচিত্র সিনেমা হলে টিকিট বেচতেন আর বছরে চার মাস সিজনের সময় এক পাটের গোলায় দিনের বেলা খাতা লিখতেন। বেশ বড় সংসার ছিল তাঁদের, এ দুটোর কোনওটাই বা একত্রেও জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

বাবার তখন ওকালতির পশার সবে বাড়তে শুরু করেছে। বাবাকে বলে ছোটকাকাই সুরেশকাকাকে বাবার সেরেস্তায় মুহুরির কাজে ঢোকান।

মুহুরিবাবুদের মায়না নেই। উকিলবাবুরা তাঁদের কোনও মায়না দেন না। তাঁদের যা আয় সবই মক্কেলদের কাছ থেকে। তবে ভাল মুহুরিরা অনেক সময় নিজেরাই পশার করে ফেলে। তখন মক্কেলরা মুহুরিবাবুর মারফত উকিলবাবুর সেরেস্তায় আসে। দালানকোঠা, মন্দির, ভূসম্পত্তি ইত্যাদি এক জীবনের পরিশ্রমে করেছেন, ছেলেদের ওকালতি, ডাক্তারি পড়িয়েছেন কলকাতায় রেখে, এমন ডাকসাইটে মুহুরিবাবুও ছিলেন। ধলাপাড়ার হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য শুধুমাত্র ডাকাতদের মুহুরি ছিলেন, সব ডাকাতির মামলা তাঁর মারফত উকিল-মোক্তারের সেরেস্তায় যেত। তিনি নিজে সাক্ষী পড়াতেন, জামিনদার হতেন। তিনি তাঁর দৌহিত্রকে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন।

হরগোবিন্দ ভট্টাচার্যের ডাকনাম ছিল হরু। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল মুনসেফি চৌকিতে পেয়াদাগিরি করেছিলেন, পরে মুহুরির স্বাধীন পেশা গ্রহণ করেন। তাঁর অনুগত মক্কেলরা, অধিকাংশই ডাকাত বা বাটপাড়, নিজেদের হরু পেয়াদার লোক বলে গৌরবান্বিত বোধ করত এবং চৌকিদার, দফাদার, সেপাই, জমাদার ইত্যাদি আইন রক্ষকেব কাছে ওই পরিচয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করত।

হরুপেয়াদা আমাদের শহরের লোক ছিলেন না। শুধু যখন ফৌজদারি আদালতে তাঁর মক্কেলদের মামলা উঠত তখন আসতেন।

দুরকম ডাকাত ছিল তখন। একদল যারা বাবরি চুল রাখত, গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করত, মুখে কালি ভুসো মেখে বাঁহাতে মশাল আর ডানহাতে রামদা নিয়ে অন্ধকার মধ্যযামে শেয়ালের দ্বিতীয় হুক্কাহুয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'ববম-ববম বোম-বোম' করে সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ি আক্রমণ করত।

আর অন্যেরা ছিল নৌকো ডাকাত, নদী ডাকাত। জলদস্যু। ছোট বড় প্রায় সব নদীরই বাঁয়ে ডাইনে বিল আছে, খাল আছে। সেই বিল বা খালের বাঁকে নৌকো ডাকাতেরা ওত পেতে থাকত। উপযুক্ত শিকার নজরে পড়লেই এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ অনুকূল হলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকারের ওপরে।

আমাদের বাড়িতে ছিল মনোপিসি, জেলের মেয়ে, জেলের বউ। মনোপিসির বর ছিল নৌকো ডাকাত, পৈতৃক মাছধরার ব্যবসা ছেড়ে ডাকাতির দিকে ঝোঁক গিয়েছিল মনোপিসির বরের। যাকে আমরা কখনও দেখিনি, অথচ যাকে আমরা মনোপিসে বলতাম মনোপিসির নাম মিলিয়ে।

মনোপিসি তার বরের বিষয়ে কারও সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় যেত না, খবরও খুব কম রাখত। তবু মাঝে মধ্যে থানা থেকে পুলিশ এসে মনোপিসিকে তার বরের সম্ভাব্য ঠিকানা, গতায়াত ইত্যাদি বিষয়ে জোর জেরা করত।

ডাকাতের বউ হলেও মনোপিসি খুব নরম স্বভাবের, চেহারাটাও নরম নরম, ছোটখাট কিশোরীর মত হালকা পাতলা, শ্যামল মুখশ্রী।

পুলিশের জেরায় মনোপিসি খুব অপমানবোধ করত, একেকদিন কেঁদেও ফেলত। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মনোপিসি নিজের বরের কার্যকলাপ, গতিবিধি কোনও কিছুরই খবর রাখত না, হয়তো রাখা সম্ভবও ছিল না। কদাচিৎ কালেভদ্রে হাটের রাস্তায়, পুজোর মণ্ডপে তার বরের সঙ্গে তার সামান্য সাক্ষাৎ হত।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

আমার ঠাকুমা খুবই সুবিবেচক মহিলা ছিলেন। মনোর বর ডাকাত হোক যাই হোক হঠাৎ কখনও রাতেবিরেতে তার ধর্মপত্নীর কাছে আসতেও তো পারে, আর মনোরও তো নবীন যৌবন। বাড়ির সবচেয়ে সুরক্ষিত অথচ চক্ষুকর্ণের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ইঁদারাপাড়ে মহানিম গাছের নীচে ভাঁড়ার ঘরটা একটা মনোপিসির জন্যে ছিল। ভাঁড়ার ঘর বলেই সারা বছরের চাল, ডাল, তেল, নারকেল, সুপুরি সেই সঙ্গে আচার, আমসত্ত্ব, কাসুন্দি সবই থাকত সেই ঘরে।

খুব বিশ্বাসী লোক না হলে তাকে ভাঁড়ার ঘরে রাখা হত না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না মনোপিসিকে নিয়ে, তার কোনও লোভ ছিল না, মোহ ছিল না, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে তার কোনও বোধ ছিল না।

তবু সেই ভাঁড়ার ঘরের সংকীর্ণ এক কোণে একটা দড়ির বিছানা আর একটা কোথাও থেকে পাওয়া পরিত্যক্ত কালো স্টিল ট্রাঙ্ক নিয়ে ছিল মনোপিসির পৃথিবী। ভাঁড়ার ঘর কিংবা অন্য কোথাকার কোনও ক্ষতিবিচ্যুতির জন্যে মনোপিসিকে কেউ কখনও দায়ী করেনি। সবাই তাকে মায়া করেছে, মমতা করেছে।

মনোপিসির এই নরম নরম ভাব হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যেত। তখন খুব হিংস্র হয়ে পড়ত মনোপিসি।

সে সব খুব খারাপ দিন। হরু পেয়াদা আসতেন আমাদের বাড়িতে ডাকাতির মামলার শুনানির তারিখে। হরু পেয়াদাকে দেখলেই মনোপিসির মাথায় রক্ত উঠে যেত। 'এই শালাই যত নষ্টের গোড়া', শালা থেকে শুরু করে জন্মাবধি তার মাঝিপাড়ায় শোনা যত রকম খারাপ গালাগাল যেগুলো মনোপিসির মুখে নিতান্তই বেমানান, আমাদের কাছারিঘরের

পাশে চিনেজবার একটা ঘনবিন্যস্ত গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হরুপেয়াদার কর্ণগোচর করত সে।

এই রকম দিনে কাউকে সমীহ করত না মনোপিসি। স্বামীহীনা এই রমণীকে আমার বাবা মা ঠাকুমা যথেষ্টই প্রশ্রয় দিতেন। শুধু বাবা হরুপেয়াদাকে কখনও-কখনও ভদ্রতার খাতিরে বলতেন, 'হরুদা, কিছু মনে করছ না, নিশ্চয়ই।' হাজার হোক হরুপেয়াদা সারা বছর অনেক মামলা নিয়ে আসে।

কিন্তু মনোপিসি একদম ঠাণ্ডা হয়ে যেত কাকা বাড়িতে এলে। সেই সময়ে হরুপেয়াদা যত ডাকাতির মামলা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুক না কেন মনোপিসি ঠোঁট বন্ধ করে থাকত। শুধু মাছ কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলত, ইঁদারা থেকে জল তুলতে গিয়ে দড়ির ঢিলে গিঁট খুলে বালতি তলিয়ে যেত তার হাত থেকে, বাবার বিকেলবেলার সরবত বানানোর জন্যে বাতাবি লেবুর পাতা ছিঁড়তে গিয়ে গোড়ালিতে একটা বিরাট কাঁটা আমূল ফুটিয়ে ফেলত।

আমার কাকার নাম ছিল বিভাস। আমার মা বলতেন, 'এ সবই বিভাসের জন্যে।' এই মুখবন্ধ, আঙুলে রক্ত, পায়ে কাঁটা মনোপিসির, সবই নাকি কাকার জন্যে।

মা বলতেন, 'তোদের কাকাও একটা জেলে। কলকাতা থেকে কয়দিনের জন্যে আসে, এসেই বঁড়শি, চার, মাছ। তোর বাবাকে বলিস একটা জাল কিনে দিতে।'

সত্যি কথা বলতে কি, সেই বালক বয়েসে বুঝেছিলাম, কাকার কিন্তু মনোপিসির দিকে ততটা মনোযোগ ছিল না। তা ছাড়া কাকা আর মনোপিসি দুজনে দুই গ্রহের মানুষ। তবুও একমাত্র কাকা বাড়িতে এলে মনোপিসি মাথায় ঘোমটা দিত, না হলে চেনা অচেনা কারও সামনে তার ঘোমটার বালাই ছিল না। ছিল না কোনও রকম জড়তা, আবার বেহায়াপনাও ছিল না। কিন্তু কাকার সামনে হলেই সে কেমন যেন সিঁটিয়ে যেত।

মনোপিসি যখন আমাদের বাড়িতে কাজে লাগে তখন কাকা কলকাতায়। সেও এক গল্প। তাদের জেলেপাড়ায় কে যেন মনোপিসিকে বলেছিল যে উকিল বাড়িতে গেলে স্বামীর খোঁজ পাবে। তখন প্রায় বছর খানেক তার বর বেপাত্তা। নিঃসন্তানা, যৌবনবতী ডাকাত বউ উকিলবাড়ি বলতে আমাদেরই বুঝেছিল, কারণ ওকালতির অ'-ক আগে থেকে আমরা ছিলাম স্থানীয় জেলেদের গুরুবংশ। হয়তো সেই সূত্রেই কাকা মাছের ঝোঁকটা পেয়েছিল।

স্বামীর খোঁজ করতে এসে মনোপিসি আমাদের বাড়িতে আটকিয়ে গেল। আটকিয়ে দিলেন আমার মা। স্বামীসঙ্গহীনা শিষ্যবাড়ির বউ, সোমত্ত মেয়ে, মাথার উপরে পিতৃকুলে, শ্বশুরকুলে বুড়োবুড়ি কেউ নেই। মা মনোপিসিকে দেখে বাড়ির মধ্যে ডেকে আমাদের বাড়িতে রেখে দিলেন।

ছুটিতে কলকাতা থেকে এসে কাকা মনোপিসিকে দেখে শুধু একবারই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বউদি, এ মেয়েটা আবার কবে এল?'

কাকা মনোপিসিকে পাত্তাও দেয়নি, গুরুত্বও দেয়নি। আসল ঘটনাটা ঘটেছিল পরের বছর যখন কাকা ছুটিতে বাড়ি ফিরল।

সেদিন চৈত্র মাস। নদী, খাল, বিল, পুকুর সব শুকিয়ে এসেছে। আমাদের শহরের শেষ প্রান্তে গোস্বামীদের রূপসায়রে মাছ ধরার ধুম পড়ে গেছে। 'মাত্র এক টাকার

বিনিময়ে একেকজন যতগুলো ইচ্ছে ছিপ নিয়ে বসতে পারে। কাকা আর সুরেশকাকা দুজনে দুটাকা দিয়ে দুটো টিকিট কেটে শেষ রাতে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসল। তার আগে সারারাত ধরে হামানদিস্তার টুংটাং শব্দ। একাঙ্গী, টম্বল, মেথি, পচানো সরষের খোল, মিষ্টির দোকান থেকে আনা চিনির গাদ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে অতি লোভনীয় চার তৈরি হল। স্বভাবতই জেলের মেয়ে বলে মনোপিসি চার মাখায়, মাছের টোপের জন্যে খাবার তৈরি করার খুবই সাহায্য করল। মনোপিসির হাতের গুণেই হয়তো সারা পাড়া ম-ম করতে লাগল চারের মাতাল গন্ধে।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। সেই চৈত্র মাসের গনগন রৌদ্রে ঠায় ছিপ নিয়ে বসে রইলেন কাকা আর সুরেশকাকা। ভরদুপুর পর্যন্ত কিন্তু একটি মাছেরও তাঁরা নাগাল পেলেন না। আশেপাশে সবাই তো বেশ মাছ ধরছে, ছোট বড় রুই কাতলা, কাকার পাশের চারেই একজন পর পর দুটো প্রায় পাঁচ সেরি মৃগেল মাছ ধরেছে।

বাঁশের খুঁটির মাথায় ছাতা জুড়ে চাঁদি ফাটা রোদে কাকা আর সুরেশকাকা ঝিম মেরে বসে কিন্তু মাছের দেখা নেই।

বেলা প্রায় একটা বাজে। ঠাকুমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মনোপিসিকে খবর নিতে পাঠালেন, এরা কখন খেতে আসবে। মনোপিসিকে দেখে কাকা বললেন, 'তুমি যা তা চার মেখেছ, একটা মাছও আমাদের কাছে ঘেঁষছে না,' কিন্তু কাকা এই বাক্য সম্পূর্ণ করার আগেই প্রথমে সুরেশকাকার এবং প্রায় সেই সঙ্গে কাকার ছিপের ফাতনা দ্রুত তলিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনেই দুটো মাছ প্রায় পাড়ে এনে ফেললেন। মনোপিসি নিজেই ছুটে নেমে প্রথমে কাকার মাছটা বঁড়শি থেকে ছাড়াল। খুব বড় না হলেও বেশ সাব্যস্ত একটা কাতলা মাছ।

আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম সুরেশকাকার মাছটা ধরতে। কিন্তু কাতলা মাছটা কাকার হাতে তুলে দিয়ে মনোপিসি আমাকে সরিয়ে পরের মাছটা ছাড়াতে গেল, একটু ঢিলে পড়েছিল বোধ হয় কোথাও, মাছটা হঠাৎ বঁড়শি খুলে পালিয়ে গেল।

কিঞ্চিৎমাত্র ভাবান্তর হল মনোপিসির তাতে। জলের ধার থেকে একটা কলমির দাম তুলে নিয়ে সেটা আপনমনে কুচি কুচি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে মনোপিসি মন্তব্য করল, 'যার যেমন কপাল।' সুরেশকাকা রেগে ছিপ তুলেছিল মনোপিসিকে মারতে, কিন্তু আগেই মনোপিসি কাকার হাত থেকে মাছটা তুলে নিয়ে ভেড়ার বাচ্চা কোলে নেওয়ার মত করে শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল, শুধু যাওয়ার সময় বলল, 'তোমরা থাকো, আমি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসছি।' মনোপিসির কোলের মধ্যে চঞ্চল, জীবন্ত মাছটা তখন ছটফট করছে। কাকা সেই দিকে তাকিয়ে।

সেদিন অপরাহ্ণে মনোপিসি বাড়ি থেকে যে খাবার নিয়ে এসেছিল তার মধ্যে ওই কাতলা মাছভাজাও কয়েক টুকরো ছিল।

সেই আরম্ভ।

উজ্জ্বল আরম্ভ।

মনোপিসি যতক্ষণ ছিল না কাকা বা সুরেশকাকা আর কোনও মাছ পায়নি। মনোপিসির সঙ্গে আমি কাকাদের মধ্যাহ্নভোজন কাঁসার থালায় পেতলের গামলা দিয়ে ঢেকে নিয়ে এলাম, তাঁরা ছিপের সামনে অকর্মণ্য হয়ে বসে আছেন।

কিন্তু এর পরের ঘটনা রোমাঞ্চকর।

মনোপিসি ঘাটে পৌঁছানোমাত্র আবার দুটো ফাতনা অতলে ডুবে গেল, কাকা ও সুরেশকাকা মধ্যাহ্নভোজন ভুলে ছিপ হাঁকিয়ে মাছ গেঁথে ফেললেন।

এর পরে আরও অনেক মাছ ধরা পড়ল। এমনকি একটা ঝলমলে চিতল মাছ যা বঁড়শিতে ধরা পড়া খুব অস্বাভাবিক।

মনোপিসি সেদিন সারাবেলা সন্ধ্যার অন্ধকার জমে আসা পর্যন্ত, যতক্ষণ না ফাতনা চোখে দেখা যাচ্ছিল, আমার হাত ধরে কাকাদের ছিপ গুটিয়ে চলে আসার জন্যে দাঁড়িয়েছিল।

সবাই একসঙ্গে ফিরলাম। রূপসায়রের কিনারা থেকে শহরের বড় রাস্তা প্রায় আধ মাইল। আম আর সুপুরি বাগানে ঘেরা। সুপুরি বাগানে হাওয়া, পাতার ঝিরিঝিরি। সেদিন শুক্লপক্ষ, চৈত্র চতুর্থী। পাতলা ঠোঁটের মত ক্ষীণ ক্ষীণতর সুপুরিপাতার ফাঁকে কি এক মায়াজাল রচনা করেছিল।

বিরাট মাছের বোঝা সুরেশকাকার মাথায়। আমার হাতে চারটে ছিপ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। কাকার বাহুলগ্না মনোপিসি, তার মাথায় প্রমাণ ঘোমটা আর মধ্যে মধ্যেই আমাকে বলছে, 'খোকা তোর সুরেশকাকাকে নিয়ে আগে আগে যা। আমি তোর কাকাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আসছি।'

মহাপাপ করেছিল মনোপিসি। চিৎকার করে এ কথা সেদিনই ঠাকুমা বলেছিলেন, মা চুপ করে ছিলেন। আরও অনেকে বলেছে অনেক কথা।

তার আগে আর একটা গল্প বাকি আছে।

সেই রূপসায়রে সন্ধ্যার পরে মনোপিসিকে নিয়ে কাকার আর কোনও অস্বস্তি রইল না। কাকা তার মাছ ধরার কপালের সঙ্গে মনোপিসিকে জড়িয়ে ফেলেছিল। মনোপিসি সঙ্গে থাকলেই ফাতনা কাঁপে, বঁড়শিতে মাছ আটকায়, চারে ঘন হয়ে আসে মাছের ঝাঁক। মনোপিসি ঘাটে এলেই তার গায়ের গন্ধে মাছেরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিনা দ্বিধায় কাকা মনোপিসিকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে কাছে দূরে যেখানে মাছ ধরতে যাবে সেখানেই নিয়ে যেত। অতকাল আগের মফস্বল শহরে একই সাইকেলে নারীপুরুষ, যথেষ্ট নিন্দেমন্দ, কথাবার্তা হয়েছিল তা নিয়ে।

একদিন ঘোর সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারের ফাঁকা সড়ক দিয়ে মনোপিসিকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মুখে চাদর মুড়ি দেওয়া একজন লোক কাকাকে আক্রমণ করে। কাকা সাইকেল থেকে হাঁটু মুচকিয়ে পড়ে যায়। লোকটি মনোপিসিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায়। পাশেই নদীতে ডিঙি বাঁধা ছিল। সেই ডিঙিতে নিয়ে তোলে। সব শুনে আমার ঠাকুমা বললেন, 'ঠিক হয়েছে। যথার্থ হয়েছে।'

পরের দিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাকা কলকাতা গেল। পরের মাসে দুদিনের জন্যে এসে সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করে শেষবার কলকাতায় ফিরে গেল বিলেতে মানচেস্টারে যাবে বলে, সেখানে কাপড়ের কলে কি এক বৃত্তি পেয়েছে।

এই শেষবারে কাকা কিন্তু একবারও মাছ ধরার কথা, মনোপিসির কথা উচ্চারণ করেনি। এবং সত্যিই শেষবার কাকা সেই যে বিলেত গেল, আর কোনও দিন দেশে ফিরল না। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ইংরেজি নতুন বছরে একটা গ্রিটিংস কার্ড পেতাম

এখন আর তাও পাই না। কোথায় আছে, একেবারেই আছে কিনা, কি জানি।

মনোপিসি কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার আমাদের বাড়ি ফিরে এসেছিল। ঠাকুমা প্রথমে মনোপিসিকে বাড়ি ঢুকতে দেয়নি, প্রশ্ন করেছিলেন, 'পোড়ারমুখি, আগে বল তুই এতদিন কোথায় ছিলি।' মনোপিসি বলল, 'আমার কি দোষ? আমার বর আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল।'

এর পরে আর কথা চলে না। সেই থেকে মনোপিসি আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল।

কাঁঠালপাতা

যে কোনও গাছের পাতার মতই কাঁঠাল গাছের পাতাও সবুজ। গাছের পাতাদের সবুজ হওয়াই নিয়ম।

আমাদের ছোটবেলায়, আমাদের উঠোনেও তাই ছিল। সবরকম লতা, পাতা, ঘাসের সঙ্গে কাঁঠাল গাছের পাতাও ছিল সবুজ। তবে সে সবুজেরও মাত্রা ছিল। কোনও সবুজ ছিল শরৎকালের প্রথম প্রহরে শিশির-ভেজা ঘাসের মত কম্পমান, কোনও সবুজ ছিল কচি কলাপাতার মতো, টিয়াপাখির গলার সবচেয়ে নিচের আবছায়ার মতো। সবুজ না সবুজ নয়, বোঝাই দায়। আবার কখনও এত খাঁটি সবুজ যে কল্পনাই করা যায় না।

কিন্তু কাঁঠালপাতার ব্যাপারটা ছিল আলাদা। একেবারেই আলাদা।

আমাদের মামার বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের সামনে একটা বাঁকা কাঁঠাল গাছ ছিল। সেই জন্যে ভাঁড়ার ঘরের নামই ছিল কাঁঠালতলা। বাড়ির কেউ ভাড়ার থেকে চাল, ডাল, নুন, তেল আনতে যেত, বলত, 'কাঁঠালতলায় যাচ্ছি।' তার অর্থ, সেই বাঁকা কাঁঠাল গাছের নিচের ঘরটায় যাচ্ছে।

ছোটবড় দুচালা, চারচালা টিনের ঘর, খড়ের পালা, বাড়ির উঠোনের চারপাশে ছড়ান। প্রত্যেকটা যেন একেকটা স্বতন্ত্র দ্বীপ। হবিষ্যি ঘর, কাছারিঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঢেঁকিঘর, গোয়ালঘর, পুজোর ঘর সব আলাদা আলাদা। আর ঠিক বাড়ির মধ্যিখানে একটা দালান। একেক ঘরের গল্প বলতে এক যুগ কেটে যাবে। শুধু ভাঁড়ার ঘরের গল্প বলেই দু চার মাস কাটিয়ে দেওয়া যায়। দালানের গল্পে দশ বছর।

তার চেয়ে বরং খুব অল্প করে ভাঁড়ার ঘরের সামনের কাঁঠাল গাছটার কথা বলি।

এই কাঁঠাল গাছটা ছিল আমাদের গাছে ওঠা শেখার প্রথম ভাগ। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' আর আমরাও কাঁঠালতলায় পৌঁছে যেতাম। শীতের দিনে সবচেয়ে আগে রোদ্দুর আসত কাঁঠালতলায়। ভাঁড়ার ঘরটা ছিল পূর্বমুখী, কাঁঠাল গাছটা তারই সামনে।

আর আমরা তো বছরে ঐ একবারই, ঐ শীতকালে বার্ষিক পরীক্ষার পরে মামার বাড়ি যেতাম। অঘ্রানের শেষাশেষি গিয়ে পৌষ মাস কাটিয়ে একেবারে মাঘের প্রথমে ফিরতাম।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজার আগে বাসিমুখে কাঁঠালতলার রোদে গিয়ে দাঁড়াতাম। কাঁঠালতলা বলা অবশ্য ঠিক নয়, কাঁঠাল গাছটায় গিয়ে বসতাম। গাছটা ছিল একদম বাঁকা, মইয়ের মত কাত হয়ে ভাঁড়ার ঘরের চালে উঠে গেছে।

গাছটায় ওঠা ছিল জলের মত সোজা। যে যার বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী গাছের গুঁড়ি থেকে ডাল পর্যন্ত এমনকি ভাঁড়ার ঘরের চালে উঠে রোদ পোহাতাম। ঐ কাঁঠাল

গাছে চড়েই আমরা, মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনেরা গাছে ওঠা শিখি।

কোনও কোনও সকালে কপাল ভালো থাকলে আমাদের কাউকে আর দাঁত মাজতে বা মুখ ধুতে হত না। একটা ঘটিতে গরম জল নিয়ে তাতে গামছা ভিজিয়ে দিদিমা আমাদের চোখমুখ মুছিয়ে দিতেন, অল্প একটু সৈন্ধব লবণ দিয়ে দাঁত মেজে কুলকুচি করিয়ে দিতেন। শুরু হয়ে যেত আমাদের দিন।

শীতের পুরো দিনটাই প্রায় কাটত ঐ কাঁঠালগাছের নিচে বা আশেপাশে। বর্ষা শেষ হওয়ার পরেও শীতের শুরুতে আমাদের ওদিকে আর এক পাল্লা ঝড়বৃষ্টি হয়ে যেত। তার নাম ছিল কাইতান, বোধহয় কথাটা এসেছে কার্তিক মাসের থেকে।

ঘন সবুজ কাঁঠালপাতা বর্ষাতেই গাঢ়তর হয়ে কালো রঙের হয়ে যেত, তারপরে কাইতানের ঝোড়ো হওয়ায় সব বুড়ো পাতা উড়ে গিয়ে শুধু সবুজ পাতাই থাকত। বড় বেশি ঘন সবুজ।

কিন্তু আমাদের প্রয়োজন পড়ত হলুদ কাঁঠাল পাতার, যে পাতাগুলো গাছের ডাল থেকে খসে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মাটির ওপরে এসে পড়ত।

নারকেল পাতার কাঠি গুঁজে ছোট বড় হলুদ পাতা সারি দিয়ে সাজিয়ে মাথার মুকুট বানানো হত। রাখালরাজার মুকুট। সবচেয়ে হলুদ, সবচেয়ে বড় পাতাটা থাকত মধ্যেখানে। ইচ্ছে করলে সে মুকুট মাথায় দেওয়াও যেত।

তবে মাথার মুকুটের জন্যে নয়। হলুদ কাঁঠালপাতার সবচেয়ে দরকার পড়ত সন্ধ্যাবেলায়, কোনও কোনও সন্ধ্যাবেলায়, তখন তপ্ত গুড়ের গন্ধে শীতকালের সন্ধ্যার পাড়াগাঁয়ের ঠাণ্ডা বাতাস ঝিমঝিম করে উঠত।

হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় বড় কাঠের উনুনে বিরাট পেতলের কড়াইতে জ্বাল দেওয়া হত গুড়। নাড়ু-মোয়া এইসব বানানোর জন্য। কাঠের উনুনে গনগনে আগুনে দেখা যেত টগবগ করে ফুটছে আখের গুড়, বুরবুর করে ফেনা উঠছে, বুদ্বুদ উঠছে। গুড়ের পাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাইরের নীল কুয়াশা।

গুড় জ্বাল দেওয়া খুব সোজা কাজ নয়। গুড়ের পাকে যখন তার আসে, যখন আঠা জড়িয়ে যায় গরম গলা গুড়ের মধ্যে, কড়াই থেকে হাতা উঁচুতে তুলে ধীরে ধীরে তরল সোনার মত গরম গুড় ঢেলে দিতে হবে আবার কড়াইয়ে, দেখা যাবে রেশমের সোনালি সুতোর মতো গুড়ের পাক সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। পাকা জ্বালুনি তপ্ত গুড়ের সৌরভেই বুঝতে পারে সোনালি সুতোর সময় এসে গেছে।

এবং এটাই মোক্ষম মুহূর্ত। এর অল্প পরেই গুড় ধরে যাবে কড়াইয়ের গায়ে, পোড়া গন্ধ বেরোবে। তার আগে উনুন থেকে কড়াই নামাতে হবে। আমার ছোট দিদিমা ছিলেন গুড়ের পাকের রসিকোত্তমা। তাঁর মত মোয়া, নাড়ু কেউ বানাতে পারত না।

কিন্তু এ ত গুড় জ্বাল দেওয়ার, মোয়া-নাড়ুর কথা নয়। এটা কাঁঠাল পাতার কথা।

শুধু কাঁঠালপাতা নয়, হলুদ কাঁঠালপাতা। গুড় জ্বাল দেওয়া শুরু হলেই আমরা কাঁঠাল পাতা খুঁজতে যেতাম ভাঁড়ার ঘরের সামনে। কিছু কিছু হলুদ পাতা প্রতিদিনই ঝরে পড়ত কিন্তু যেহেতু দুবেলাই উঠোন ঝাড় দেওয়া হত, সেই পাতাগুলো মামার বাড়ির বনমালী মালি সব ঝাড় দিয়ে বাড়ির পিছনের ডোবায় ঢেলে দিত।

আরও দুয়েকটা কাঁঠাল গাছ বাড়ির এপাশে ওপাশে ছিল কিন্তু সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে

সে সব গাছের নিচে পাতা কুড়োতে যেতে সাহস হত না। ভূত-পেত্নীর ভয় তো ছিলই, তাছাড়া ছিল শেয়াল, সাপ, বুনো শুয়োর।

ভাঁড়ার ঘরের কাঁঠালতলায় ঝরা পাতা না পেলেও ভাঁড়ার ঘরের চালে কিছু কাঁঠালপাতা পাওয়া যেত। কিন্তু কোনওদিনই আমি তেমন তৎপর বা উদ্যোগী ছিলাম না। অন্য সব ভাইবোনেরা চালে উঠে কাঁঠালপাতা কুড়িয়ে নিত, আমার এবং আরও কারও কারও ভাগে অনেক সময়ই কাঁঠালপাতা জুটত না।

হলুদ কাঁঠালপাতার ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এই শক্ত পিরিচের মত পাতার পিঠে একটু সরষের তেল মাখিয়ে তেলতেলে করে আমরা সবাই দল বেঁধে গুড় জ্বাল দেওয়ার উনুনের পাশে দাঁড়াতাম।

আর যখন গুড়ের পাকে তার উঠত, ছোট দিদিমা পেতলের কড়াই থেকে হাতায় করে টগবগে গুড় একটু একটু করে ঢেলে দিতেন তেল মাখানো কাঁঠালপাতায়। শীতের ঠাণ্ডায় সেই উত্তপ্ত তরল গুড় জমে যেত। তখন সেই জমানো গুড়ের তালটা আমরা টেনে টেনে লম্বা করতাম। যত টানতাম ততই লম্বা হত, ততই সাদা হত। সেই দিশি চকোলেটের নাম ছিল টানা।

আমাদের যাদের কাঁঠালপাতা জুটত না, তাদের ভরসা ছিলেন ছোট দিদিমা। কাঁঠাল গাছের কিছু কিছু পাতা উড়ে ছোট দিদিমার ঘরের সামনে বারান্দায় পড়ত। তার থেকে কয়েকটা ছোট দিদিমা আমাদের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতেন। যে যে কাঁঠালপাতা পায়নি, তাদের তিনি নিজের কোঁচড় থেকে পাতা বার করে দিতেন। আর সেই পাতাগুলিই ছিল সবচেয়ে সেরা, বাছাই কবা পাতা। মসৃণ, হলুদ, প্রায় গোলাকার।

অল্পদিন আগেই কাঁঠাল গাছ নিয়ে আরেকটা গল্প লিখেছি। আজ কাঁঠালপাতা নিয়ে লিখলাম। অথচ গত দশ-পনেরো বছর কাঁঠাল খাওয়া হয়নি।

কিন্তু আমাদের সিঁড়ির নিচে একটা ইঁটের ফাঁকে এই বর্ষার পরে একটা কচি কাঁঠাল গাছ গজিয়েছে, কি জানি কোথা থেকে কাঁঠালবিচি এল এখানে।

কয়েকটা কচি সবুজ কাঁঠালপাতা প্রথম শীতের উত্তুরে বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে। এখনও এদের হলুদ হবার সময় হয়নি। হয়ত কোনওদিন এসব পাতা হলুদ হবে না, তার আগেই গাছ শুকিয়ে মরে যাবে।

কিন্তু এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকদিন আগের কাঁঠালপাতার স্মৃতি ভেসে আসছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কাঠের উনুনে গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে, সেই সুঘ্রাণ উড়ে আসছে।

মোহরলতা

আমার ছোট কাকিমা বিয়ের পরে প্রথম দিকে কয়েক বছর বর্ষাকালে বাপের বাড়ি যেতেন। ছোট কাকিমার বাপের বাড়িতে মনসা পুজো হত, ভাদ্র সংক্রান্তিতে।

কিন্তু তখনকার দিনে তো ভাদ্র আর পৌষ মাসে যাতায়াত ছিল না, বিশেষ করে বাড়ির বৌ-ঝিদের বাড়ি থেকে বেরনো হত না এই দু মাস।

তাই শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি ছোট কাকিমার বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসে তাঁকে নিয়ে যেত। তারপর ভাদ্র মাসের শেষে আমাদের বাড়ি থেকে কেউ যেত সে বাড়ির

মনসা পুজোর উৎসবে, উৎসব শেষে আশ্বিনের গোড়ায় ছোট কাকিমাকে নিয়ে আসত সে।

লোক-লৌকিকতা, কুটুম্বিতার যুগ ছিল সেটা। যত কাজকর্মই থাকুক ছোট কাকিমার বাপের বাড়ির মনসা পুজোয় আমাদের বাড়ি থেকে কাউকে যেতেই হত, তাছাড়া বাড়ির বৌকে পিত্রালয় থেকে নিয়ে আসাই রীতি। তবে যে-ই যেত তার একটা উপরি পাওনা ছিল, ওখানকার ভাসানের মেলা ছিল বিখ্যাত, আর সেই সঙ্গে ঝলমলে নৌকোবাইচ। লাল নীল পতাকা উড়িয়ে ঋজু, তীক্ষ্ণ ছিপ নৌকোর সাবলীল বিদ্যুৎগতি।

সে বছর ভাদ্র মাসের শেষে একটা আচমকা ঝড়ে আমাদের স্কুলের দক্ষিণ চাতালের বড় টিনের দোচালাটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঝড়টা এসেছিল শেষ রাতে। তাই আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম। স্কুলের সময়ে ঘটনাটা ঘটলে আমরা নিশ্চয় প্রাণে বাঁচতাম না।

সে যাই হোক, এই কারণে সেবার স্কুলবাড়ি সারানোর জন্যে আমাদের পুজোর ছুটি এগিয়ে দেওয়া হল। আর, এই সুবাদেই সে বছর আমি গেলাম পণ্ডিতগঞ্জে ছোট কাকিমাকে আনতে।

আশ্বিন মাস আরম্ভ হতে তখনও দু-তিনদিন বাকি রয়েছে। এক ঝিরঝির, টিপটিপ, ছায়াছায়া, বৃষ্টিভরা, মেঘে ঢাকা, সকালে আদালতের ঘাট থেকে একটা ছই-দেওয়া ঢাকাই নৌকোয় রওনা হলাম। আমার সঙ্গে অনেক জিনিস, ছইয়ের ছাদে, ছইয়ের ভেতরে।

আমাদের খালে বরিশাল থেকে বড় বড় নৌকো আসে ঝুনো নারকেলের পাহাড় সাজিয়ে। মধুপুরের গড় থেকে পাহাড়িয়ারা নিয়ে আসে রাশি রাশি কাঁঠাল। আজিমগঞ্জ-মালদহ থেকে বিশাল মানোয়ারি নৌকো আসে এই সময়ে ফজলি আমের সম্ভার নিয়ে।

ঝোলা ভর্তি নারকেল, আম আর কাঁঠাল, সেই সঙ্গে মনসাঠাকুরানীর জন্যে লাল পাড় লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের একজোড়া ডোড়া শাড়ি, এক জোড়া লাল শাঁখা আর এক বাক্স মেটে সিঁদুর আমার নৌকোয় তুলে দেওয়া হল। ছোট ঢাকাই নৌকো দোল খেতে খেতে রওনা হল পণ্ডিতগঞ্জের দিকে।

আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র চার-পাঁচ ক্রোশ মানে বড়জোর মাইল দশেক পথ। শহরের খাল থেকে বেরিয়ে প্রথমে পড়লাম ছোট নদীতে, ভরা বর্ষায় সে-ও তখন টইটম্বুর। ছোট নদী থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে পড়লাম কূলচিহ্নহীন সাগরোপম অপার যমুনায়। আমাদের ওখানে যমুনা নদী এত চওড়া যে ভাবাই যায় না নদী বলে। গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা বলে পাথার।

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। যমুনায় আসতে আসতে মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠল। শরৎকাল, রোদে এর মধ্যে ক্ষীণ সোনালি রঙের আভা লেগেছে। নীল আকাশের নিচে সেই রোদের মায়ায় বৃষ্টিভেজা গাছপালা, কাছে দূরের গ্রাম, ধানক্ষেত সব সবুজে সবুজ হয়ে আছে, এমনকি নদীর জল পর্যন্ত সবুজ দেখাচ্ছে।

পণ্ডিতগঞ্জ যমুনায় দক্ষিণমুখী একটা বাঁক ছেড়ে দিয়ে পরের বাঁকের মুখে। বেলা পড়তে রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠলেও নদীর জলে-ভেজা ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ ভালই লাগছিলো।

দুপুরের একটু আগে ছোট কাকিমাদের বাড়ির ঘাটে এসে নৌকো লাগল। বাড়ির কাজের লোকেরা এসে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল। ছোট কাকিমা আমি যে যাব সেটা

আশা করেননি, আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। প্রথম থেকেই আমাদের দুজনার একটা বন্ধুত্ব ছিল।

ছোট কাকিমার ঠাকুমা তখনও বেঁচে। ও বাড়ির ছোটরা সবাই তাঁকে বড়মা বলত। কাকিমা আমাকেও শিখিয়ে দিলেন বড়মা বলতে। যে কয়দিন ওখানে ছিলাম, রাতে বড়মার কাছেই শুতাম। চার ফুট উঁচু কাঠের পালঙ্কে সিঁড়ি বেয়ে শুতে উঠতে হত। সেই পালঙ্কের নিচেটা ছিল গামলা, হাঁড়ি-কুড়ি, চিনেমাটির বয়াম, বড় বড় মাটির জালায় ভর্তি। সেগুলো সম্বৎসরের ডাল-মশলা, আচার-আমসত্ত্ব, নাড়ু, বড়ি, মুড়ি-মুড়কিতে ঠাসা। ঘরের মধ্যে কেমন একটা লোভী-লোভী, জিবে-জল-আসা থমথমে জমাট গন্ধ। এই এতকাল পরেও খিদের মুখে এখনও সেই গন্ধটা টের পাই।

প্রথম দিন রাতে সকাল-সকাল বিছানায় উঠে শুয়ে পড়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙল খুব ভোরবেলা। তখনও বড়মা ঘুমিয়ে আছেন। ঘুম ভাঙতে আমি পালঙ্কের মাথার দিকে উঠে বসে সামনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

সামনেই একসারি সুপুরি গাছ, সেই সুপুরি গাছগুলো বেয়ে উঠেছে একটা অচেনা জাতের লতা, সুপুরি গাছের নিচে উঠোনেও ঐ লতাগাছের ছড়াছড়ি। টাকার মত গোল গোল কচি কলাপাতা রঙের পাতা ভোরের বাতাসে থিরথির করে কাঁপছে।

ঠিক এই সময় সুপুরি গাছের ফাঁক দিয়ে ভোরবেলার রোদ এসে পড়ল উঠোনে। আগের দিনে নদী দিয়ে আসার পথে যেমন রোদ দেখেছিলাম সেইরকম সোনালি আভার আলো, সুপুরি গাছের ডালপালা ছুঁয়ে গাছ বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। সেই আলোয় টাকার মত গোল গোল পাতাগুলো সোনার মোহরের মত ঝকঝক করছে।

এ রকম লতা এর আগে আমি জীবনে দেখিনি। রাশি রাশি সোনার টাকা, গিনি, মোহর, আশরফি আমার চোখের সামনে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, যেন আলিবাবার গুহা, রাজা সলোমনের গুপ্তধন।

টের পাইনি কখন বড়মা ঘুম থেকে উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সম্বিৎ ভাঙলো তাঁর কথায়, খুব আলতো করে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দেখছ?'

আমি বললাম, 'এই লতার পাতাগুলো, কেমন সোনার টাকার মতো।'

বড়মা বললেন, 'এই লতা হল মোহরলতা। নামটা আমার দেওয়া। এই লতা এখানে কোথাও নেই। আমি এনেছিলাম আমার মামার বাড়ি থেকে।'

পরে ছোট কাকিমার কাছে জেনেছিলাম বড়মার মামার বাড়ি মানে হল চেরাপুঞ্জি, যেখানে বড়মার একমাত্র মামা বৃষ্টি অফিসে বড়বাবু ছিলেন। যদিও তাঁদেব আসল বাড়ি রংপুরে না পাবনায়। অনেক দিন, সে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে বড়মা মামার বাড়িতে মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন, সেই সময় এই মোহরলতা সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বড়মার কাছে শুনলাম খুব বেশি জল না পেলে এই লতায় পাতা আসে না, তবে শুকিয়ে মরেও যায় না। যদিও ঘন বৃষ্টির দেশ চেরাপুঞ্জিতে সারা বর্ষাকালই এই পাতাগুলো ফোটে, এখানে এই পণ্ডিতগঞ্জে বর্ষার শেষাশেষি মোহরলতায় পাতা দেখা যায়। 'খুব বেশি জল চায় এই গাছগুলো, তাই, বড়মা বললেন, 'পুরো গরমকালটা আমি পুকুর থেকে কলসীভর্তি জল এনে উঠোনটায় ঢালি।'

মনসা পুজো, ভাসানের মেলা, নৌকো বাইচ—চার পাঁচটা দিন তরতর করে কেটে

গেল, সে অন্য বৃত্তান্ত। দোসরা আশ্বিন ছোট কাকিমাকে নিয়ে রওনা হলাম। সেদিন আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নৌকোর ঘাটে বাড়ির সবাই, পাড়াপ্রতিবেশী এসে ভিড় করেছে। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে, সবারই চোখ কেমন ছলছলে। ঘাটে সবাইকে দেখছি কিন্তু বড়মাকে দেখছি না। লক্ষ করলাম কাকিমাও ইতি-উতি তাকাচ্ছেন। এমন সময় ভিড় ঠেলে বড়মা নৌকো পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। বড়মার হাতে কলাপাতা দিয়ে মোড়া কি যেন, সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'কয়েকটা মোহরলতার চারা দিয়ে দিলাম। জলের জায়গায় ইঁদারার ধারে বা পুকুরপাড়ে লাগিয়ে দিয়ো।'

মোহরলতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

পরের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। তারপরে গরমের ছুটিতে, পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছি, কিন্তু ভরা বর্ষায় আর বাড়ি যাওয়া হয়নি। তবে মনে আছে, পণ্ডিতগঞ্জ থেকে ফিরে এসে সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের দালানের পিছনে ডোবার ধারে কাকিমার সঙ্গে মোহরলতার চারাগুলো লাগিয়েছিলাম।

মোহরলতার কথা আরও অনেক কিছুর মতই ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও ছিল। দেশে-বিদেশে এই এতকাল ধরে যখনই কখনও অঝোর বৃষ্টির পরে হালকা রোদ উঠেছে, সেই রোদের সোনালি মায়ায় সহসাই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ, রাশি-রাশি, খাঁটি সোনার মোহরের মত একটা অল্প-চেনা কিন্তু ভুলে-যাওয়া লতার ছবি—অনেককাল আগের বহু দূরের এক নদীর তীরের গ্রামঘরের উঠোনে আসন্ন শরতের রোদে ঝলমল করছে।

সেই কবেকার কথা। সেই পণ্ডিতগঞ্জের বাড়িঘর, লতাপাতা, মানুষজন তারা কবে হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে।

আমারও আর পণ্ডিতগঞ্জে যাওয়া হয়নি। নিজের দেশের বাড়িতেই যাওয়া হয় না। যাওয়ার কোনও কারণ নেই। যাদের জন্যে যেতাম তারা কেউ নেই। আমাদের পুরনো দালানের দরজা-জানালা-ইট সব খুলে খুলে বিক্রি হয়ে গেছে। সেই বাস্তুভিটা, ভদ্রাসনের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

তবু কোথায় যেন একটা মায়ার টান থাকে। গত বছর পুজোর আগে ঢাকা হয়ে ফিরছিলাম। ঢাকায় দুদিন ছিলাম। সেখান থেকে আমার জন্মভিটে দু ঘণ্টার পথ। একদিন সকালে পৌঁছে গেলাম সেখানে।

হাড়-বার করা শুন্য ভিটে পড়ে রয়েছে, শুনশান। একটা বুড়ো আমগাছের ডালে একটা তক্ষক ডাকছে। হঠাৎ মেঘলা আকাশের ফাঁক দিয়ে একটুকরো সোনামাখা রোদ এসে পড়ল আমাদের উঠোনে। এক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ছন্নছাড়া, পোড়ো ভিটে ঝলমল করে উঠল। মোহরলতায় ছেয়ে আছে সারা উঠোন, শূন্য ভদ্রাসন। সোনার টাকার মত, গোল গোল পাতাগুলি শারদীয় বাতাসে থিরথির করে দুলছে। সেই কবেকার মোহরলতা।

মেঘমালা

সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় একটা মোড়ার ওপরে চুপচাপ বসেছিলাম। শরৎকালের সুন্দর স্নিগ্ধ সকাল, দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম নিচে গাছের পাতায়, ঘাসের শিষে শিশিরের ছোঁয়া লেগেছে, বর্ষাশেষের ঠাণ্ডা বাতাসে শীত-শিহরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

একটা আবেশের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম, হঠাৎ ঘোর ভাঙল চিলের করুণ কান্নায়। আমরা এখন যে সরকারি বাড়িতে আছি তারই পিছনদিকে একটা অতিকায় পাকুড় গাছ রয়েছে, সে হয়ত কলকাতা শহরেরই সমান বয়েসী, কি করে এতকাল আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে, কি জানি। এই পুরনো কালের পাকুড় গাছের ডালে দক্ষিণ কলকাতার এক দঙ্গল চিলের আস্তানা, তারাই সময়ে-অসময়ে কান্নাকাটি করে। সেই কান্না সুখের না দুঃখের, আনন্দের না বেদনার—তা আমি জানি না।

আর শুধু ভোরের বেলাতেই নয়, রোদ ঝলমল ভরা দুপুরে, বৃষ্টি-ভেজা বিকেলবেলায় যে কোনও সময় চিলের কান্না অস্থির করে তোলে আমাকে। মনে হয় মেঘমালা কাঁদছে।

মেঘমালা? সেই কবেকার মেঘমালা? এক হারিয়ে যাওয়া গল্পের আকাশে সেই কবে তার ঘুরপাক শেষ হয়ে গেছে?

সব কথা একটু একটু করে মনে পড়ে।

সেই আমাদের পুরনো গঞ্জ শহর। আমাদের ভাঙা দালান। আমাদের জলটলমল পুষ্করিণী, কুমুদ-কহ্লার ভাসে থই-থই জলে। সুড়কির রাস্তা, টিনের চালার ইস্কুল। টমটম গাড়ি। সব কিছুই তো বলেছি, শুধু মেঘমালার কথা বাদ আছে।

আমাদের কাছারি ঘরের সামনে পরপর পাঁচটা লম্বা নারকেল গাছ। আগে নাকি আটটা ছিল, তিনটি কবে মরে গেছে, আমরা ছোটবেলায় ঐ পাঁচটা গাছই দেখেছি।

গাছগুলো ছিল বড় পুকুরের মুখোমুখি। পাড়ায় আরও একটা পুকুর ছিল, সেটা বোঝানোর জন্যে বড়পুকুর এবং ছোট পুকুর। একপাশে কাছারি ঘর, তারপরে উঠোন, তারপরে মিউনিসিপ্যালিটির সড়ক, তারপরে বড় পুকুর। সড়ক ঘেঁষে দাঁড়ানো নারকেল গাছগুলোর ছায়া পড়ত পুকুরের জলে, নারকেলের পাতার ঝালরের ছায়া ভাসত, দোল খেত পুকুরের জলের ঢেউয়ে।

বেশ কিছুদিন পরপর যখন গাছের ডাবগুলি বড় হয়ে শুকিয়ে ঝুনো হত তখন কাঁদি নামানো হত। অতটা লম্বা নারকেল গাছের মাথায় উঠে কাঁদি কেটে নিচে নামানো বেশ কঠিন ও সাহসের কাজ। রঘু নামে এক আধা-পাগল হিন্দুস্তানী চানাচুরওয়ালা ছিল শহরে, গাছে উঠে ডাব-নারকেল পাড়তে সে ছিল ওস্তাদ। কয়েকটা নারকেল ভাগ দিলেই সে এ কাজটা খুশি মনে করত।

সন্ধ্যা না হতেই এক পাল চিল এসে বসত নারকেল গাছগুলোর মাথায়। সারাদিন এরা চরে বেড়াত খাল ধারে, নদীর তীরে, বাজারের পাশে। দিনের শেষে ওরা ফিরে আসত নারকেল গাছের চূড়ায়। ওটাই ওদের আস্তানা।

অনেকদিন রাতের বেলায় জানালা দিয়ে দেখেছি অন্ধকার নারকেল গাছের ডালে ডালে সার সার চিলগুলো স্থির হয়ে বসে রয়েছে। পাখির নীড় বলে একটা কথা আছে, কিন্তু চিলের কোনও নীড় বা বাসা নেই। শুধু মা-চিল ডিম পাড়ার আগে শুকনো ডাল, খড়, পাতা দিয়ে একটা যেন-তেন দায়সারা বাসা বানিয়ে নেয়।

সেবার বৈশাখের গোড়ায় পরপর বেশ কয়েকদিন ঝড় হল। ঝড়ে বড় বড় ঝুনো নারকেলগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। তাই নারকেলের কাঁদি নামানোর জন্যে একদিন সকালবেলা রঘুকে ডেকে আনা হল।

রঘু পরপর পাঁচটা গাছে তরতর করে উঠে কাঁদি কেটে কেটে নিচে ফেলল। সেগুলো উঠোনের এক পাশে জমা করা হল। এ সব ঠিকই ছিল, কিন্তু তার যে মাথায় একটু ছিট ছিল! সে শেষ গাছটা থেকে নামার সময় হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে একটা চিলের বাচ্চা নিয়ে নামল।

বাচ্চাটা খুব ছোট নয়। ডিম ফুটে বেশ কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো বাচ্চা ছিল। সারাদিন চ্যাঁ-চ্যাঁ করে মাকে ডাকত। একটা বাচ্চা কয়েকদিন আগে ঝড়ে পুকুরের পারে পড়ে মরে গেল, পরের দিন সকালে মা-চিলেব কি করুণ আকুতি সেই মরা বাচ্চার চারপাশে উড়ে উড়ে।

রঘুর হাতের বাচ্চাটা তার ধারালো, কচি নখ দিয়ে রঘুর তালু ছিঁড়ে দিয়েছে, সেখান দিয়ে দবদর করে বক্ত পড়ছে। এদিকে বাচ্চাটার এখনও ভাল কবে পালক গজায়নি। লোমহীন হাড়গিলের মত গলা, ছোট গোল চোখদুটো জোনাকির মত ঝকঝক কবছে, হাঁ-করা লাল ঠোঁট, গলার ভেতরটায় গোলাপি আভা।

বাচ্চা নিয়ে নিচে নেমে এসে রঘু একগাল হেসে বলল, 'পাজি খুব। বাসাটা বোধহয় ঝড়ে উড়ে গেছে, দুটো কাঁদির ফাঁকে বসে ছিল। এবার পড়ে গিয়ে মরে যেত। তাই নিয়ে এলাম।'

উলটোপালটা ঘটনা আমাদের বাড়িতে খুব অস্বাভাবিক ছিল না। যেন কিছুই হয়নি। এইভাবে দালানের বারান্দায় একটা বাঁশের পলোর নিচে চিলেব বাচ্চাটাকে রাখা হল। একটা ভাঙা পাথরের বাটিতে জলের বন্দোবস্ত হল পলোর নিচে। আমি আর দাদা গামছা দিয়ে পুকুর থেকে কুচো মাছ ধরে বাচ্চাটাকে দিতাম। প্রথমদিকে একটু ইতস্তত করত, পরে গবগব করে খেয়ে নিত।

আমাদের তিন ভাইকে বাসায় পড়াতে আসতেন মাইনর ইস্কুলেব হলধর মাস্টার। তিনি একটু কবি-স্বভাবের ছিলেন। তিনি চিলের বাচ্চাটার নামকরণ করলেন মেঘমালা, বড় হয়ে মেঘের রাজ্যে উড়ে বেড়াবে কি না!

দাদা বলল, এটা যদি মেয়ে চিল না হয়, তাহলে মেঘমালা নাম চলবে কেন!' হলধরবাবু বললেন, 'তাতে অসুবিধে হবে না। সব পাখিই স্ত্রীলিঙ্গ।' কথাটা ঠিক কিনা বলতে পারব না, তবে হলধর মাস্টার এ রকম বলতেন।

সে যা হোক, প্রতিদিন বিকেলে চানাচুর বেচতে যাওয়ার পথে রঘু একবার মেঘমালাকে দেখে যেত। কোনও কোনও দিন একটা কাগজের ঠোঙায় কেঁচো এনে সে মেঘমালাকে খেতে দিত।

মেঘমালার আত্মীয়স্বজন, নারকেল চূড়ার বড় চিলেরা তার ওপরে তীক্ষ্ণ নজর

রাখত। ছাদের কার্নিসে বসে পলোটার দিকে তাকিয়ে থাকত, কখনও কখনও আরও কাছে আসত। তবে তার মধ্যে কে যে মেঘমালার মা তা বুঝতে পারিনি।

দুয়েক সপ্তাহের মধ্যে মেঘমালা বেশ সাবালক হয়ে উঠল। পলোর মধ্যে সে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াত। সুন্দর পালক গজাল তার শরীরে। অবশেষে শেষ রাতের আঁধারে চিলেরা যখন সদ্য আলোর আভাস পেয়ে নারকেল গাছের ডালে করুণ কান্নার স্বরে ডেকে উঠত, পলোর মধ্যে মেঘমালাও সাড়া দিতে লাগল।

ঠাকুর্দা একদিন বললেন, 'তোমাদের মেঘমালাকে এবার ছেড়ে দিতে হবে। আর আটকানো থাকলে ও আর পরে উড়তে পারবে না।'

ততদিনে মেঘমালার ওপরে আমার আর দাদার তেমন টান ছিল না। তখন আমরা দুজনে মিলে একটা বেজির বাচ্চা পুষতে শুরু করেছি, হলধর মাস্টার যার নাম দিয়েছেন নকুলনারায়ণ।

পরের দিন সকালে পলো তুলে মেঘমালাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে বোধহয় এ রকম আকস্মিক মুক্তির আশা করেনি, তাছাড়া বন্দীজীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ছাড়া পেয়ে মেঘমালা কেমন যেন ইতস্তত করতে লাগল। বারান্দা দিয়ে একটু এগিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে পলোর কাছে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরে ছোট একটা উড়ান দিয়ে উঠোনে গিয়ে পড়ল। সেখানে শিকল দিয়ে নকুলনারায়ণ বাঁধা ছিল। হঠাৎ নকুলনারায়ণকে সামনে দেখে চমকে গিয়ে আরেকটু উড়ে রান্নাঘরের টিনের চালে গিয়ে বসল।

সব মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, দুচারদিনের মধ্যেই মেঘমালা পুরোপুরি উড়তে শুরু করে। প্রথম দুয়েক রাত বারান্দায় পলোর নিচে কাটিয়ে শেষে নারকেল গাছের ডালে চিলের ঝাঁকে রাত্রিবাস শুরু করল, তাদের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু সে ঘুরে ঘুরে আসত বারান্দার সেই জায়গাটায় যেখানে সে শিশুকালে আশ্রয় পেয়েছিল।

আমরা মেঘমালাকে দেখে চিনতে পারতাম কারণ তার ডান পায়ের ভেতরের দিকের মোটা নখটা সোজা ছিল না, ঝুলত। বোধহয় সেই প্রথম দিনে শিশু-নখে রঘুকে আঁচড়ানোর সময় সেটা মচকিয়ে গিয়েছিল।

মেঘমালাও আমাদের চিনত। বাজারের রাস্তায়, নদীর ঘাটে, সে আমাদের কাউকে দেখতে পেলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে আমাদের সঙ্গে বাসা পর্যন্ত আসত। বিনিময়ে রান্নাঘর থেকে চেয়ে-চিন্তে একটুকরো মাছ তাকে ছুঁড়ে দিতাম। অসামান্য দক্ষতায় শূন্য থেকে সেই মচকে-যাওয়া নখের থাবা দিয়ে সে সেটা লুফে নিত।

মেঘমালার কথা বিস্তারিত করে বলার মতো আর কিছু নেই।

শুধু শেষ দিনের কথা বলি।

সেটা খুব দুর্যোগের বছর। দাঙ্গা, রক্ত, আগুন—বিভীষিকাময় সব দিন। খুব ভোরবেলা নিঃশব্দে আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরোলাম অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে। খালধারে গিয়ে দেখি মাথার উপরে উড়তে উড়তে মেঘমালা আসছে।

খাল থেকে বেরিয়ে ছোট নদী। ছোট নদী পার হয়ে বড় নদী ধলেশ্বরী, সে পর্যন্ত মেঘমালা আমাদের সঙ্গে উড়ে চলল। আমি ছইয়ের ওপরে বসে তাকিয়ে দেখছিলাম।

মেঘলা আকাশ, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে কখনও কখনও। বাড়ি ছেড়ে আসার

বেদনায় অল্প ভেজা গায়ে লাগছিল না।

ধলেশ্বরীর মুখে এসে দেখলাম হঠাৎ করুণ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ঘুরপাক খেয়ে আকাশে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে একটু পরে মেঘের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেঘমালা।

সেই শেষ দেখা। তারপর আর মেঘমালাকে দেখিনি।

এখনও কোনও ভোরবেলায়, ভরা দুপুরে নিঝুম সন্ধ্যায় যখন চিলের কান্না শুনি কেমন অস্থির লাগে, মন খারাপ হয়ে যায়।

মেঘমালাকে মনে পড়ে।

মনে পড়ে আমাদের পুরনো শহর, নদীরঘাট, খালধার, আমাদের ভাঙাদালান। পুকুরের জলে সেই কবেকার নারকেল গাছের ছায়া।

একটি স্বপ্নাদ্য কাহিনী

শতবর্ষ আগে

'জগতে সকলই মিথ্যা,
সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর
সত্য কিছু নয়।'...

[এক]

**'যেন এই পৃথিবীর বেলা শেষ হয়ে গেছে'
ম্লান ঘোড়া নিয়ে একা তুমি
কড়ির পাহাড় খুঁজে ঘুরিতেছ'...**

নাম শুনেই নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, এটা হাসির উপাখ্যান নয়। এটাকে বড়জোর ভৌতিক বা রোমহর্ষক কাহিনী বলা যেতে পারে।

আমি জানি, পাঠকেরা আমার কাছে হালকা হাসির খোলামেলা দায়দায়িত্বহীন রচনা আশা করেন। সম্পাদক মহোদয়েরাও হাসির গল্পের জন্যে আমাকে তাগাদা এবং পয়সা দেন, আমার খোঁজ করেন। আর আমি নিজেও হাসির গল্প লিখতেই সবচেয়ে ভালবাসি।

কিন্তু এটা একটা স্বপ্নাদ্য গল্প। তাই না লিখে উপায় নেই, তবে বলে রাখা ভালো যে, স্বপ্নটা মোটেই আমার নয়, এই স্বপ্নটা দেখেছিলেন এই গল্পের নায়ক চন্দন রায়। ব্যক্তিগতভাবে জানাতে পারি স্বপ্ন-টপ্ন আমি খুব একটা দেখি না, দেখলেও সে খুব ছাড়াছাড়া, ভয়ভয়, আলগা স্বপ্ন। চেনা-অচেনা মানুষ, চেনা অচেনা টুকরো টুকরো ঘটনা —তার মধ্যে গল্পটল্প খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এখনো গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিনি। অনিবার্য কারণেই একটু পাঁয়তারা কষতে হল। এই সূত্রে একটু ঋণ স্বীকার করতে হবে। আমার সমবয়সী পাঠকদের কারও কারও নিশ্চয় মনে আছে, ঠিক এই 'শতবর্ষ আগে' নামে একটা নাটক আমাদের যৌবনকালে খুব

চলেছিল। বোধহয় সিপাহি যুদ্ধের ওপর নাটক, স্টার থিয়েটারে। চল্লিশ বছর আগের কথা, ভুল হলে মাফ করবেন। শুধু একটু জানিয়ে রাখি যে, সেই নাটকের সঙ্গে এই সামান্য গল্পের কোনওরকম মিল নেই। শুধু এ নামটুকু থেকে গিয়েছে। এবং সেও অনিবার্য কারণে।

'ওয়ালা' বা স্রেফ 'আলা' নামক একটি শব্দলেজ বহুকাল চালু আছে, যেমন টাকাওয়ালা, ঢাকওয়ালা, ফেরিওয়ালা, বাঁশিওয়ালা, ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা।

এসব ঠিকই ছিলো। কিন্তু আজ কিছুকাল হল ওই ওয়ালা ইংরেজিতে ঢুকে জাতে উঠেছে। এখন আর ওয়ালাকে গোয়ালা বা পাখিওয়ালায় আটকে রাখা যাচ্ছে না, এখনকার নতুন শব্দ হচ্ছে সেক্সপীয়ারওয়ালা, নিউজওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, স্ক্যামওয়ালা।

ঐ একই সূত্র ধরে আমাদের আখ্যানের কাহিনীওয়ালা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত চন্দন রায়। পাঠকদের সুবিধার্থে আরেকটা আধুনিক কর্তব্য সম্পাদনা করছি, চন্দনবাবুর বায়োডাটা পেশ করছি :—

নাম : চন্দন রায়
পিতার নাম : এ গল্পে প্রয়োজন নেই।
ঠিকানা : ২/২/১ রজনী দাশ রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫।
বয়েস ইত্যাদি : ৫০ (কমবেশি) অবিবাহিত।
জীবিকা : পুরনো মোটরগাড়ির কেনাবেচা বা দালালি।
(কলকাতায় পৈতৃক বাড়ি আছে।)

রজনী দাশ রোডের বসত বাড়িটাই চন্দনবাবুর পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। এই বাড়ির একতলায় তিনি একাই থাকেন। দোতলা তালা বন্ধ, ঐ অংশটি চন্দনবাবুর দাদার, দাদা-বৌদি আজ সাড়ে সাত বছর হল তাঁদের মেয়ের কাছে কানাডায়, তিনমাসের জন্য গিয়ে এখনও ফিরে আসেননি। প্রথম প্রথম সপ্তাহে সপ্তাহে ফোন করতেন, তারপর মাসে মাসে চিঠি দিতেন, বলতেন দোতলায় ফ্ল্যাটটা মাঝে মধ্যে দরজা জানালা খুলে ধুলোটুলো ঝাড়তে, এখন সে সব বন্ধ হয়েছে। শুধু বিজয়া দশমীর পরে একটা আশীর্বাদ আসে, সেই সঙ্গে ভাইঝিও লেখে, 'কাকা, তুমিও চলে এসো'। প্রথম কয়েক বছর মার্চ মাসে আরেকটা চিঠি আসত, সেই চিঠি পেয়ে চন্দনবাবু একটা পঞ্জিকা কিনে এয়ারমেলে পাঠাতেন। গত তিন বছর পঞ্জিকার অনুরোধও আসেনি। দাদা-বৌদির সঙ্গে একেবারে সংস্রবহীন হয়ে গেছেন চন্দনবাবু।

আগে দাদা-বৌদির হেঁসেলেই চন্দনবাবুর চা-জলখাবার, মধ্যাহ্ন, নৈশভোজন সব কিছুর বন্দোবস্ত ছিল। দাদা-বৌদি চলে যাওয়ার পরে ব্যবস্থাটা পালটেছে। একজনের জন্যে হেঁসেল চালানো এ বাজারে পোষায় না।

প্রথম প্রথম চন্দন রায় যদুবাবু তথা জগুবাবুর বাজারের পাশে পাইস হোটেলে কিছুদিন খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন দুবেলা মিষ্টিকুমড়ো দিয়ে মাছের কাঁটার ঘ্যাঁট, ভাতের ফ্যান মেশানো মুসুরির ডাল আর আমেরিকান রুইমাছের ঝোল খেয়ে তিনি অতিষ্ট হয়ে উঠলেন। তখন আর কোনও উপায় না দেখে বাড়িতে এক ঠিকে রাঁধুনি রাখলেন, কিন্তু মহিলার বড়ই হাতটান। একজনের রান্নায় তিনদিনে এক কেজি সরষের তেল খরচ হতে লাগল, কথায় কথায় রাঁধুনি ঠাকরুন কিসমিস, গরম মশলা,

ঘি এসব আনতে বলতেন, কিন্তু সেগুলো দিয়ে কি রান্না হত চন্দনবাবু তা কখনোই টের পেতেন না। আড়াইশো গ্রাম কাটা পোনায় দু'বেলা দু'টুকরোও হত না।

অতঃপর 'ধুত্তোরি' বলে একদিন সেই রাঁধুনি মহিলাকে ছাড়িয়ে দিলেন চন্দনবাবু। ঘরদোর ঝাড় দেওয়া, জামাকাপড় কাচা, জলতোলা ইত্যাদির জন্যে মানদা নামে আদ্যিকালের এক বুড়ি আছে, যার ধারণা তার বয়েস একশো পেরিয়ে গেছে। তা হয়তো নয়, তবে সত্তর-আশি হবে, চন্দনবাবুই তাকে দেখছেন বহুকাল ধরে। মানদা বুড়ি লোক ভালো কিন্তু তার একটা ব্যাপার চিরদিনই চন্দনবাবুর অপছন্দ। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে নিয়মিত খুঁচিয়ে আসছে চন্দনবাবুকে বিয়ে করার জন্যে।

চন্দনবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানেন গাড়ি কেনা-বেচার উটকো আয়ে বিয়ে করা যায় না। আগে বুড়ির কথায় তিনি রেগে যেতেন, আজকাল আর বুড়ির কথা গায়ে মাখেন না। খুব জোরাজুরি করলে বলেন, 'দেখি, চেষ্টা তো করছি।'

তাছাড়া শুধু আর্থিক টানাপোড়েনেই নয়, একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে চন্দনবাবু একটি খারাপ অভ্যাস করে ফেলেছেন। যেটি দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে মিল খাবে না। চন্দনবাবু মদ খাওয়া ধরেছেন। মাতলামি করেন না, কদাচ বাড়ির বাইরে মদ খেয়ে বেরোন না। বিকেল-বিকেল অনতিদূরে গাঁজাপার্কের পালের সরকারি ভাটিখানা থেকে এক পাঁইট দু'নম্বর বাংলা মদ কিনে আনেন। সেটা বাসায় বসে একা একাই পান করেন।

আজকাল বকুল বাগানের 'ফেমিলি ক্যাটারার্স' কোম্পানির সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করেছেন। রাত্রে সাড়ে আটটা নাগাদ তাদের সাইকেল পিয়ন টিফিন কেরিয়ারে করে চারটে হাতে গড়া রুটি আর সপ্তাহে তিনদিন মাছ, দুদিন মাংস, একদিন চিকেন, একদিন ডিম দিয়ে যায়। সঙ্গে শশার কুচি, আদা, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, কোনওদিন একটু আমের আচার।

দিবাভোজন চন্দনবাবু কমিয়ে দিয়েছেন। লাঞ্চ, ব্রাঞ্চ কিছু নয়। সকালে মোড়ের দোকানে চা-টোস্ট, বেলার দিকে চন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দুটো সিঙ্গারা আর দুটো জিলিপি। দুপুরে খুব খিদে লাগলে হরি সিংয়ের গোল্ডেন খালসা অমৃতসর হোটেলে এক গেলাস অতল-শীতল লস্যি আর একটা দিল্লিকা লাড্ডু এবং এটাও একঘেয়ে না হওয়ার জন্যে আরেকটু দক্ষিণে হেঁটে নিউ কেরালা কাফেতে মশলা দোসা কোনও কোনও দিন, আরও কোনও কোনও দিন দুপুরে খিদে লাগলেও কিছুই না খাওয়া—মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন চন্দন রায়।

তবে নিতান্ত সাদা জল দিয়ে দু'নম্বর পাঁইটের তরল আগুন যথাসাধ্য সন্ধ্যার কিছু পরে থেকে পান করতেন চন্দনবাবু, 'ফেমিলি ক্যাটারার্স' যখন খাবার পাঠাত তিনি পানীয়ের শেষাংশটুকু সেই খাবারের সঙ্গে তারিয়ে তারিয়ে খেতেন, অর্থাৎ পান করতেন এবং খেতেন। এই বয়েসেও মেদহীন শরীর রাখতে পেরেছেন বলে মনে মনে গর্ব আছে তার।

[দুই]

'একদা এমনি বাদল শেষের রাতে
মনে হয় যেন শত জনমের আগে'...

সেদিন সকাল থেকে ঝরঝর করে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। কিন্তু কিছুতেই অল্প সময়ের জন্যেও একেবারে থেমে যাচ্ছে না। এবং

শুধু সেদিনই নয়। তারও আগে কয়েকদিন, কয়েকরাত্রি ধরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এ রকম আর কয়েকদিন চললেই লোকে হয়তো ভুলে যাবে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র কেমন দেখতে।

আজ আর বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোনো হয়নি চন্দনবাবুর। সকালে চা খেতে বেরিয়েছিলেন। তারপর বৃষ্টি বাড়তে পারে ওই আশঙ্কায় বেলার দিকে বেরিয়ে গাঁজাপার্কের দোকানটা থেকে এক সঙ্গে দু'বোতল পানীয় আর সেই সঙ্গে মোড়ের ভুজাওয়ালার দোকান থেকে অনেকটা মুড়ি আর ছোলাভাজা কিনে আনেন।

দুপুরে মুড়ি আর ছোলাভাজা খেয়ে ভালই কেটেছে। এখন বিকেল হতে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। কিছুক্ষণ আলসেমি করে শুয়ে বসে থাকার পর আজ একটা অনিয়ম করে ফেললেন চন্দনবাবু। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মদের বোতলটা খুলে বসলেন।

দুপুরের ছোলাভাজার বেশ কিছুটা অংশ তখনো ছিল। ছোলাভাজার সঙ্গে ভুজাওয়ালা দুটো কাঁচালঙ্কা ফ্রি দিয়েছিল, তারও একটা আছে। কাঁচালঙ্কা ছোলাভাজার চাট সহকারে অল্প জল মিশিয়ে বাংলা মদ, একটু পরেই নেশাটা বেশ জমে উঠল।

এ রকম অবস্থায় একাকী নির্জন ঘরে মানুষের মনে নানা রকম উথাল-পাতাল চিন্তা আসে।

পুরনো দালানের বারান্দায় ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, হয়তো রাতের দিকে ঘরেও জল পড়বে। গলির মোড় থেকে বাড়ির উঠোন পর্যন্ত জলে ডুবে আছে। রাস্তার নোংরা, ময়লা, আবর্জনা ভেসে আসছে বাড়ির ভেতরে। সেই সঙ্গে খারাপ একটা গন্ধ।

চন্দনবাবু ভাবতে লাগলেন, কি ছাই মরতে কলকাতায় পড়ে আছি। এ বাড়িতে দাদার অংশ ছেড়ে দিলেও নিজের অংশ বেচে অন্তত লাখ তিনেক টাকা পাওয়া যাবে এ বাজারে, তার থেকে লাখখানেক টাকা দিয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে একটা মাথাগোঁজার ঠাঁই করে নিতে পারলে, বাকি দু'লাখ টাকা ব্যাঙ্কে সুদ খাটিয়ে বেশ চলে যাবে নিজের একার। এক ঢোঁক মদ খেয়ে, তারপর আরও এক ঢোঁক তারপর চন্দনবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, মদ খাওয়াটাও না হয় ছেড়ে দেবেন। অবশ্য মদ্যপেরা এরকম সিদ্ধান্ত অনেক নিয়ে থাকে।

হাতের কাছে সেদিনের ইংরেজি খবরের কাগজটা পড়ে ছিল, সকাল থেকে ভালো করে দেখাই হয়নি। একটু আগের ভাবনার সূত্র ধরে চন্দনবাবু কাগজটা খুলে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় কলমটা দেখতে লাগলেন। রবিবার ছাড়া অন্যদিন মাত্র দু'চারটে বিজ্ঞাপন থাকে এ কলমে। না। আজ কিছুই নেই। শুধুই কলকাতার আর শহরতলীর ফ্ল্যাটবাড়ির বিজ্ঞাপন। এর অধিকাংশই আবার ভুয়ো বিজ্ঞাপন সেটাও চন্দনবাবু জানেন। জানাশোনা অনেককে চন্দনবাবু ঠকতে দেখেছেন, তাছাড়া গ্রামে বাড়ি চান তিনি, শহরে ফ্ল্যাট নয়। হতাশ হয়ে খবরের কাগজটা সামনেই বিছানার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চন্দনবাবু। কাগজটা মাঝামাঝি খুলে গিয়ে ঘরের হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগল বালিশটার পাশে আটকিয়ে গিয়ে।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চন্দনবাবুর মনে হলো মধ্যের বাঁদিকের পৃষ্ঠার নিচের কলমে, যেখানে থাকার কথা নয়, ঠিক সেইখানে একটা বাংলো বাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞাপন রয়েছে। ঝুঁকে পড়ে খুব মন দিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লেন তিনি। চমৎকার বাড়ি, লিলুয়ায় গঙ্গার ধারে মনোরম নির্জন পরিবেশে ফল-ফুলগাছ সমেত একটা একতলা বাংলো বাড়ি বিক্রি আছে। বিজ্ঞাপনের নিচেই বিক্রেতার

নাম, ঠিকানা রয়েছে। ঠিকানাটা কলকাতার সদর স্ট্রিটের। পুরনো মোটর গাড়ি কেনার ব্যাপারে যেমন করেন, কি খেয়াল হতে চট করে ড্রয়ার থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখলেন তিনি বিক্রেতার উদ্দেশ্যে। বিক্রেতার নাম লেসলি টেলার, বোধহয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে, সম্ভবত গঙ্গার ওপারের কোনও কারখানায় কাজ করত, এখন রিটায়ার করে বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। অ্যাংলো সাহেবরা আজকাল হামেশাই এরকম দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় চলে যাচ্ছে।

মদ্যপান একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় হাতটা একটু কাঁপছিল চন্দনবাবুর। ধৈর্য সহকারে ধরে ধরে চিঠিটা লিখে সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট করতে চলে গেলেন চন্দনবাবু।

বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে একটু এগিয়ে একটা ডাকবাক্স রয়েছে। রাস্তায় হাঁটুজল জমেছে, তাই তো চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন।

বাড়ি ফিরে দেখলেন ক্যাটারার্সের লোক বারান্দায় টিফিন কেরিয়ার রেখে গেছে। তাড়াতাড়ি খাবারটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। নেশার ঘোরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পরদিন রোদ ঝলমল সকালে ঘুম থেকে উঠে চন্দনবাবুর আর মনেই রইল না যে, তিনি ওরকম একটা চিঠি দিয়েছেন।

[তিন]

'চিঠি শুধুই চিঠি,
কোটের থেকে তক্ষকটা হকচকিয়ে ফেলে
অবশেষে হাসলো মিটিমিটি।'...

এবার বেশ কয়েকদিন টানা রোদ্দুর চলেছে। আকাশে মেঘ-বৃষ্টির আর কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, যদিও সময়টা ভরা বর্ষাকাল।

দুটো পুরনো গাড়ি হাতে ছিল। সেগুলো সারাই, রং করা তারপরে বেচা কয়েকদিন বেশ ব্যস্ত ছিলেন চন্দন রায়। সেই যে এক বৃষ্টির রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, লিলুয়ায় গঙ্গাতীরে বাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে সেটা কেনার জন্যে চিঠি পর্যন্ত লিখেছিলেন—সে সব কথা তাঁর মনে নেই।

আর সেই চিঠি গিয়েছিল কি না তাই বা কে বলবে। জল থই-থই রাস্তায় অর্ধনিমজ্জিত ডাকবাক্সে ফেলা সেই চিঠি হয়তো জলেই ভেসে গেছে।

বেশ কয়েকদিন টানা রোদ চলার পর হাজার হলেও সেটা হলো শ্রাবণ মাস, আবার একদিন সকাল থেকেই মেঘলা, আকাশ অন্ধকার। দুপুরের দিকে প্রবল বৃষ্টি হল। বৃষ্টি আর সহজে ছাড়ে না, বিকেলের দিকে এবং তার পরে সন্ধ্যা পার হয়ে বৃষ্টির গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পেল। ঝোড়ো বাতাস সাঁ-সাঁ করতে লাগলো কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায়।

গ্যারেজে গাড়ি রং হচ্ছে, জায়গাটা জগুবাজারের কাছেই। সকালবেলা চা খেয়েই রেস্টুরেন্ট থেকে চন্দনবাবু সেখানে চলে গিয়েছিলেন। কাজ তদারকি করতে করতে বেলা হয়ে গেল। বৃষ্টিতে আটকিয়ে গেলেন চন্দনবাবু। শেষে জল সহজে থামবে না বুঝে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরলেন। ফেরার পথে গোল্ডেন খালসা অমৃতসর হোটেল থেকে এক প্লেট তড়কা আর চারটে রুটি খেয়ে নিলেন এবং বলাবাহুল্য পথে ভাটিখানা

থেকে বৃষ্টি স্পেশ্যাল এক বোতলের বদলে দু'বোতল দু'নম্বর বাংলা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

যেমন হয়, বৃষ্টি কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। সেই সঙ্গে পূর্বদিক থেকে হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে, কে বলবে যে এটা শীতকাল নয়। আজ আবার চন্দনবাবুর ছন্দপতন হল। সাধারণত তিনি দিনের বেলা মদ খান না। ভেজা মাথায়, ভেজা জামাকাপড়ে চন্দনবাবু কোনও মতে দরজা খুলে বাড়ি ঢুকেই আজ আবার সদ্য কেনা বাংলার বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে নির্ভেজাল পানীয় গলায় ঢাললেন। ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে গিয়ে শরীর একটু চাঙা হতে, ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো লুঙ্গি, গেঞ্জি পরিধান করতে করতে বোতল প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর বিছানায় বসে বাকি অর্ধেক। এর পর বিছানায় শোয়ামাত্র অচেতন হয়ে গেলেন চন্দনবাবু। ঘরের দরজা, বাড়ির সদরের দরজা কিছুই বন্ধ করা হল না।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। চন্দনবাবু অঘোরে ঘুমোতে লাগলেন। বাড়ির সামনের দরজা খোলা, শোয়ার ঘরের দরজা খোলা, এদিকে অবিরাম বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। হু-হু করে বাতাস বইছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। বৃষ্টির দিন বলে একটু তাড়াতাড়ি 'ফেমিলি ক্যাটারার্সে'র ছেলেটি টিফিন কেরিয়ার নামিয়ে দিয়ে গেল, আজ তার সাইকেল অচল, তাই পায়ে হেঁটে এসেছে।

সামনের দরজা, ঘরের দরজা খোলা, উঠোনে, রাস্তায়, প্যাসেজে আবার সেই থই-থই জল।

চন্দনবাবু অঘোরে ঘুমিয়ে আছেন। আজ এই দুর্যোগের দিনে চোর-জোচ্চোর পর্যন্ত অনুপস্থিত, কিছুই চুরি যাওয়া সম্ভব নয়।

রাত আটটা নাগাদ যখন বৃষ্টি ঘনঘোর হয়ে এসেছে, হঠাৎ বাতাস দিক বদল করল আর সেই সময়েই ছাদ থেকে ঘরের মধ্যে বিছানা ঘেঁষে জল পড়তে লাগল। খোলা দরজা দিয়ে এবং ফাটা ছাদ দিয়ে যুগপৎ ভাবে জলের ধারা এসে চন্দনবাবুকে আপ্লুত করে দিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি কোনওমতে জেগে বসে আলতো করে চোখ খুলে দেখলেন পদপ্রান্তে ফেমিলি ক্যাটারার্সের টিফিন কেরিয়ার, বাঁ পাশে প্রায় নিঃশেষিত বাংলা দু'নম্বর বোতল আর ডানহাতি বোতলটা একদম টইটুম্বুর।

খিদে লেগেছিল। খাবারটা প্রায় গোগ্রাসে খেয়ে সেই সঙ্গে প্রথম বোতলটা নিঃশেষ করে দ্বিতীয় বোতলটা খুললেন চন্দনবাবু এবং ঢকঢক করে খেতে লাগলেন। আধো জাগরণে, আধো তন্দ্রায় পান করতে লাগলেন তিনি। দ্বিতীয় বোতল প্রায় অর্ধেক এমন সময় খোলা সদর দরজার বাইরে কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কোই হ্যায়'। চোস্ত উর্দুতে বা হিন্দিতে কে যেন ডাকছে, মেঘের গর্জন আর ঝোড়ো বাতাসের শব্দের উর্ধ্বে উঠে ভবানীপুরের পুরনো বাড়ির প্যাসেজ দিয়ে সেই ডাক ঘরের মধ্যে এল।

ফৌজি সংরক্ষিত এলাকায় কেউ প্রবেশ করতে গেলে পাহারারত শান্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠে 'হুকুমদার'। কথাটা আর কিছু নয়, ইংরেজি 'হু কামস্ দেয়ার' (Who comes there?) এই প্রশ্নের ভারতীয় রকমফের।

'কোই হ্যায়' জিজ্ঞাসাটাও অনুরূপ কিছু একটা হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভূয়সী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চন্দনবাবু মূল ইংরেজি কথাটা খেয়াল করতে পারলেন না। তাছাড়া তাঁর মনে

একটা ন্যায্য খটকা দেখা দিয়েছে এই ঝড়-বাদল-দুর্যোগের রাতে ভবানীপুরের পুরনো গলিতে এই ভাঙা বাড়িতে এরকম খানদানি পেয়াদা কে পাঠাল?

চন্দনবাবু যখন এই রকম ভাবছেন, সেই সময়ে স্বল্প বিরতির ব্যবধানে আরও তিনবার 'কোই হ্যায়' আওয়াজ উঠল এবং তারপর চন্দনবাবু টলতে টলতে ঘর থেকে বেরোনোর আগেই প্যাসেজের ভেতর দিয়ে একটা জল ছপ ছপ চলে আসার শব্দ বারান্দার ডাঙায় উঠে বুটের সোলের লোহার নালের খটখট শব্দে পরিণত হল।

খটখট শব্দে চমকিত চন্দন রায় বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন রীতিমত যাত্রা বা থিয়েটারের পোশাকে দীর্ঘদেহ, দীর্ঘনাসা, দীর্ঘগুম্ফ এক হাস্যকর দেখতে চরিত্র তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

চরিত্রটির পরিধানে প্রায় আভূমিলাঞ্ছিত রক্তাভচাপকান এবং মুগার চেপা পাজামা। তদুপরি অস্ত্র আইনকে ভঙ্গ করে তার রুপালি অথবা প্রকৃতই রূপোর কোমরবন্ধের সঙ্গে দোদুল্যমান দীর্ঘ ছুরিকা, যা দৈর্ঘ্যে প্রায় তরবারির সমান। লোকটির এক হাতে একটি সাদা কাপড়ের বিশাল ছাতা, অন্য হাতে একটি রেড়ির তেলের গোল লণ্ঠন। ঘরের দরজায় ওকে ডানহাতের ছাতাটি সামনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে একটি সেলাম করল লোকটি, তারপর নিজের পরিচয় দিল, বলল যে সে লোকটি টেলার সাহেবের হেড খানসামা, টেলার সাহেব এই চিঠিটা দিয়েছেন।

এই বলে সে তার বিচিত্র চাপকানের পকেট থেকে শক্ত বাঁশ কাগজে তৈরি একটা বড়সড় খাম চন্দনবাবুকে দিল। পরেরদিন এসে জবাব জেনে যাবে, এই বলে আরেকটি দীর্ঘ সেলাম জানিয়ে কেতাদুরস্ত খানসামাটি প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে বৃষ্টিতে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে টেলার সাহেব, কিসের চিঠি রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে গেলেন চন্দনবাবু। এদিকে বৃষ্টির জোর এখন আরও বেড়েছে। হাওয়াও ক্রমশ আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। বৃষ্টি এবং বাতাসের শব্দের যুগলবন্দী ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। চন্দন রায় একবার বোঝার চেষ্টা করলেন ঘটনাটা কি ঘটল? তারপর বুঝলাম এই নেশাতুর অবস্থায় সেটা বোঝা কঠিন। এবার তিনি চেষ্টা করলেন বাত কতটা গভীর হয়েছে বোঝার জন্যে।

রাত কত?

ঘরের ভেতরের দেয়ালে বহুকালের ঢং ঢং পেন্ডুলাম ওয়াল ক্লকটা অনেকদিন আগের কোনও এক সকাল কিংবা বিকালের পাঁচটা একান্নয় আটকে পড়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে বলে দুপুরে বাড়ি এসে চন্দনবাবু নিজের হাতঘড়িটা বিছানায় তোশকের নিচে রেখেছিলেন্। সেই বিছানাও বৃষ্টির ঝাপটায় এখন ভেজা ভেজা।

সেই আধ ভেজা বিছানাতেই শুয়ে পড়ে, তোশকের নিচ থেকে ঘড়িটা বার করে সময়টা দেখে নিতে গেলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই, বিছানায় শুতে শুতে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

[চার]

'এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলাম রেখে'...

পরদিন সকালবেলাতেও ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তবে তোড়টা কেটে গেছে।

বাতাসও ঢিল দিয়েছে।

গলির মধ্যে প্রায় এক কোমর জল, প্যাসেজেও জল, তবে অতটা নয়। যদি আগের দিনের মতো জোর বৃষ্টি আজও হয় তবে নিশ্চয় বারান্দায় এবং ঘরে জল ঢুকবে।

প্রচণ্ড মাথাধরা, চোখ লাল, সারা শরীরে ব্যথা আর জ্বর জ্বর ভাব, বেশ আচ্ছন্ন অবস্থায় বেলা করে ঘুম ভাঙল চন্দনবাবুর।

কটা বাজে দেখতে গিয়ে অবশ্য এখন আর কালকে রাতের মতো হল না। তোশকের নিচ থেকে হাতঘড়িটা বার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হল না। হাত ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে আছে, বৃষ্টির জল ঢুকেই নিশ্চয় বন্ধ হয়েছে। দম দেবার পরেও চলল না।

একটু কষ্ট করে বিছানা থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চন্দনবাবু ঠিক করলেন আগে একবার দোতলার বারান্দায় যেতে হবে। দোতলার বারান্দা থেকে জল গড়িয়ে দরজা গলে দাদার ঘরের মেঝেতে যায়, পুরনো বাড়ির ফাটা মেজের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে চুইয়ে জল এসে পড়ে নিচের এই ঘরে। আগেও এমন হয়েছে, দোতলার বারান্দাটা পুরোপুরি জানালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সেও অনেক খরচার ব্যাপার, পুরনো বাড়িতে এত খরচের ইচ্ছে নেই চন্দনবাবুর।

দোতলার বারান্দায় উঠে চন্দনবাবু দেখলেন সত্যিই জলে ডুবে আছে বারান্দাটা। বারান্দা দিয়ে বাইরে জল বেরোনোর কোনও ড্রেন পাইপ বা নল নেই, একটা ছোট গর্ত ছিলো একপাশে, সেটাও ময়লা জমে শক্ত হয়ে বুজে আছে।

নিচে নেমে নিজের ঘর থেকে একটা পেন্সিল নিয়ে এসে বারান্দার গর্তটা একটু খুঁচিয়ে দিতে জমা জল আস্তে আস্তে বেরোতে লাগল।

দোতলার বারান্দার ভেতরের ছাদের নিচে একটা বেতের দোলনা বহুকাল বাঁধা আছে। চন্দনবাবুর ভাইঝি যখন শিশু ছিল, চন্দনবাবুই ওটা নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনে দিয়েছিলেন। সে কতকাল আগের কথা, চন্দনবাবু তখন কলেজে পড়েন। আশ্চর্য। দোকানটা এখনও রয়ে গেছে।

বৃষ্টির দিনের কয়েকটা ভেজা কাক শূন্য বারান্দায় ঐ দোলনাটার ওপরে আশ্রয় নিয়েছিলো। চন্দনবাবুকে দুবার আসতে দেখে, এবং গর্ত খোঁচাতে দেখে তারা চেঁচামেচি করে কিছু প্রতিবাদ জানাল। তারপর বাইরে উড়ে গেল।

বাইরে বৃষ্টিটা এখন একটু ধরে এসেছে, প্রায় নেই বললেই চলে।

চন্দনবাবু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন। এবার চা খেতে হয়। রাস্তার দোকান কি খুলেছে? তবে প্যাসেজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তার জল ভেঙে লোকজন চলাচল করছে। হয়তো বেলা ভালোই হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার মুখে হঠাৎ চন্দনবাবুর চোখে পড়ল নিচতলার বারান্দায় দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে একটা অদ্ভুত ছাতা।

চন্দন রায় নিজে ছাতা ব্যবহার করেন না। এক সময় করতেন। বহু ছাতা হারিয়ে তাঁর শিক্ষা হয়েছে। শেষমেশ একটা বর্ষাতি কিনেছিলেন। সেটাও গত বছর বর্ষায় মনসুন কাপ ঘোড়দৌড়ের দিন রেস কোর্সে ফেলে এসেছিলেন।

তাছাড়া বারান্দায় এই যে ছাতাটা রয়েছে, এরকম ছাতা দেখা যায় না। ঠিক ট্র্যাফিক

পুলিশের ছাতার মত, বাইরের দিকটায় সাদা কাপড় লাগানো ভেতর যথারীতি কালো কাপড়। কিন্তু আকারে অতি বড়, আর ওই ছাতার বাঁটটা মোটা বেতের, এরকম মোটা বেত আজকাল সহজলভ্য নয়। বাঁটের মাথায় হাতলটা তামা কিংবা ঐ জাতীয় কোনও ধাতু দ্রব্য দিয়ে মোড়া।

নিজের বাড়ির বারান্দায় এরকম একটা প্রাগৈতিহাসিক আশ্চর্য ছাতা দেখে খুবই খটকা লাগল চন্দন রায়ের।

এই ছাতাটা এই বারান্দায় কি করে, কোথা থেকে এল ভাবতে গিয়ে কেমন যেন আবছায়া মনে পড়ল, চন্দনবাবুর, কালকেই এই ছাতাটা যেন কোথায় কার হাতে দেখেছেন। কেমন যেন খেয়াল হল তাঁর কাল অনেক রাতে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যখন তিনি বেহেড মাতাল, এই ছাতা হাতে যাত্রাদলের পোশাক পবনে কে একটা গোলমেলে লোক এসে হিন্দি না উর্দুতে কি সব বলেছিল। এটা সেই লোকটারই ছাতা, ভুল করে বারান্দায় ফেলে গেছে। লোকটাই ভুলে রেখে গেছে নিশ্চয়।

এই মুহূর্তে কাল রাতের ঐ ব্যাপারটা নিছক স্বপ্নের ঘটনা বলেই বাতিল করে দিতে পারতেন চন্দনবাবু, কিন্তু চোখের সামনে ঐ জলজ্যান্ত প্রাচীন ছাতাটা সটান দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ চন্দনবাবুর মনে পড়ল ঐ যাত্রাদলের পোশাক পরা লোকটি তাঁকে একটি চিঠি দিয়ে গেছে। কিসের চিঠি, কেন চিঠি, কার চিঠি কিছুই মনে করতে পারলেন না চন্দনবাবু।

কাল বাতের নেশার ঘোরে চিঠিটি পড়ে ওঠাও হয়নি।

একটু আগে বৃষ্টি পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে, সকালের মেঘলা ভাব যদিও কাটেনি।

চন্দনবাবু ভাবলেন এই ফাঁকে গিয়ে মোড়ের রেস্তোরাঁ থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসা যাক। তা হলে হয়তো হ্যাংওভারটা একটু কাটবে। তাবপর ফিরে এসে ঘরের মধ্যে থেকে চিঠিটা খুঁজে বার করে পড়ে দেখা যাবে কি বার্তা আছে সেই পত্রে।

[পাঁচ]

'কতকালের পুরনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে সই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি'...

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশের মেঘলাভাব না কাটলেও সেই থমথমে জলদগম্ভীর ভাবটা নেই। কিন্তু এখনও রাস্তা থই-থই করছে জলে। যদি আজ সারাদিন বৃষ্টি না হয় আর সেই সঙ্গে হালকা, ফিকে মত রোদ ওঠে তবে বিকেলের দিকে রাস্তায় জল শুকোবে।

কিন্তু এখন তো গলির মোড়ের চায়ের দোকানটায় যেতে হবে। বাসায় চায়ের পাট কবেই চুকে গেছে, একা মানুষের সংসারে এসব ঝামেলা পোষায় না।

কিন্তু অসুবিধে হয়। বৃষ্টি-বাদলার দুর্দিনে, হরতাল-বাংলা বন্‌ধে-ভারত বন্‌ধে।

রাস্তায় মোড় পর্যন্ত পৌঁছে চন্দনবাবু দেখলেন চায়ের দোকানটা খোলেনি। খোলার উপায়ও নেই, দোকানটা একটা গ্যারেজের মধ্যে, মেজেটা নিচু। দোকানের মধ্যে জল ঢুকে রয়েছে।

আর একটু এগিয়ে পূর্ণ থিয়েটারের মোড়ের কাছে কটা চায়ের দোকান রাস্তার ওপারে আছে। সে দোকানটা হয়তো খুলেছে। জল ভেঙে সেদিকেই যাবেন ভাবলেন

তিনি, কিন্তু শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে এ শুধু হ্যাংওভার বা খোঁয়ারি নয়, একটু জ্বরও হয়েছে, মাথাটাও দপদপ করছে। সারা শরীরে ব্যথা। তবু একটু ইতস্তত করে চায়ের দোকানের দিকেই পা বাড়ালেন চন্দনবাবু।

সুখের কথা এই চায়ের দোকানটা খুলেছে। এক কাপ চা আর টোস্টের অর্ডার দিলেন। কিন্তু টোস্ট পাওয়া গেল না, বৃষ্টির জন্যে পাঁউরুটির গাড়ি আসেনি। দুটো থিন এরারুট বিস্কুট দিয়ে এককাপ চা খেয়ে উঠলেন চন্দনবাবু।

বিস্কুটটা খেতে কেমন তেতো তেতো যেন লাগছিল। শরীর খারাপ হওয়ায় মুখটাই বোধহয় তেতো হয়ে রয়েছে। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। হাড় হিম করা ঠকঠকে কাঁপুনি।

জ্বরের ঘোরে কোনও রকমে রাস্তায় থেমে থেমে হেঁটে আচ্ছন্নের মতো চন্দনবাবু বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলো বিকেল গড়িয়ে। তখনও জ্বর-জ্বর ভাবটা রয়েছে তবে কাঁপুনিটা নেই। চন্দনবাবু উঠে হাতমুখ ধুয়ে রাস্তায় বেরোলেন। এখন আর কোনও হোটেলে ভাত পাওয়া যাবে না। সামনের রাস্তার হিন্দুস্থানী দোকানটা থেকে দুটো কচুরি আলুর দম খেলেন, জ্বরের মুখে ভালই লাগল।

রাতের খাবার তো ক্যাটারার দিয়ে যাবে কিন্তু পানীয় সংগ্রহ করতে হবে। তার আগে পাড়ার বুড়ো ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়।

পাড়ার ডাক্তারবাবু চন্দন রায়কে বহুদিন ধরে দেখছেন। আজ তাঁর বুকপিঠ স্টেথোসকোপ দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন, 'একটু সর্দি বসে গেছে। বৃষ্টিতে ভেজা চলবে না। ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না। দিন কয়েক বিশ্রাম নিতে হবে।' সেই সঙ্গে তিনদিন দুবেলা জ্বরে খাওয়ার জন্যে দু'রকম রঙিন ক্যাপসুল দিলেন।

ওষুধের দোকান থেকে ক্যাপসুলগুলো কিনে, মদের দোকান থেকে সন্ধ্যার জন্যে পানীয় সংগ্রহ করে চন্দন রায় বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে ঢুকেই তাঁর খেয়াল হলো সকালবেলায় বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেওয়া যে আশ্চর্য ছাতাটা দেখেছিলেন সেটা নেই। দুপুরে কাজের বুড়িটা ঘরঝাঁট দিতে, জল তুলে দিতে এসেছিল। ঘুম ও জ্বরের ঘোরে চন্দনবাবু তাকে আবছায়া দেখেছিলেন, সেই নিশ্চয় ছাতাটা ঘরের ভেতরে তুলে রেখে গেছে।

কিন্তু ঘরের ভেতরেও সেই ছাতাটা দেখতে পেলেন না তিনি। আর ঐ ছাতাটা খুঁজতে গিয়েই কাল রাতের সেই লোকটার কথা আর তার চিঠিটার কথা মনে পড়ল তাঁর।

এবার চিঠিটাও খুব খুঁজলেন চন্দনবাবু। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। বোধহয় মেজেতে পড়ে গিয়েছিল। বুড়ি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় মানদাবুড়ি আরেকবার আসে। সিঁড়ির নিচে অনেকদিন আগের পুজোর ঘর আছে। আগে মা পুজো করতেন, তারপরে বৌদি। একটা লক্ষ্মীর পট, সারদা-রামকৃষ্ণের জোড়া ছবি। একটা পিতলের সরস্বতীর মূর্তি আছে ঘরটায়। বুড়ির কাজের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে ধূপধুনো দেয়া, পিদিম জ্বালানো এই সব। আর সেই সঙ্গে যদি কিছু ফাইফরমাস থাকে সেগুলো করে।

একটু পরেই কাজের বুড়ি মানদা এল। চন্দনকে বসে থাকতে দেখে বুড়ি খুশি হয়ে বললো, 'দুপুরে আমি ভেবেছিলাম তোমার বুঝি শরীর খারাপ হয়েছে'। এর পরেই বুড়ি

যা বলবে তা চন্দন জানেন, বুড়ি ঠিক তাই বলল, 'রাতের বেলা ঐ ছাইভস্মগুলো, বিষগুলো বসে বসে গেল, তোমার শরীর খারাপ হবে না তো কার শরীর খারাপ হবে।'

বুড়ির এই অভিভাবকগিরির পাশ কাটিয়ে গিয়ে চন্দনবাবু ছাতা আর চিঠির কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বুড়ি স্পষ্ট বলল যে, ছাতা বা চিঠি কিছুই সে চোখে দেখেনি।

কিছুক্ষণ পরে পুজোর ঘরের দরজা বন্ধ করে বুড়ি চলে গেল। এরপরেও একটু ধুনোর গন্ধ বাতাসে থাকে। চন্দনবাবুর কেমন মন খারাপ হয়ে যায়।

আজ বিকেলের দিক থেকে রাস্তায় জল নেমে গেছে, তবে এখনও থিকথিক করছে কাদা, আজ সারারাত যদি বৃষ্টি না হয়, কাল দিনের রোদে এই কাদা শুকিয়ে ধুলো হয়ে যাবে। ধুলো না কাদা, কোনটা বেশি দূষণ, কোনটা বেশি পলিউশন চন্দন রায় তা নিয়ে এই অসুস্থ শরীরে মাথা ঘামাতে চান না, কিন্তু নোংরা কাদা চোখে দেখা যায়, ধুলো জমাট না হলে চোখে পড়ে না, সেই অঙ্ক অনুসারে চন্দন রায় চান কাদা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাক।

তবে এরকম সব তত্ত্বচিন্তার বদলে, যেহেতু সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে, চন্দনবাবু সান্ধ্য আচমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন নাকি উত্তর কলকাতায় এক মহারাজার নগরবাটিতে ছিলেন' সূর্যাস্তের পরে মধুসূদন চনমন কবতে লাগলেন, 'কই মহারাজ, আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের বন্দোবস্ত করুন। কোষাকুষি গঙ্গাজল কোথায়? মাইকেলের কথা বুঝতে বুদ্ধিমান মহারাজের অসুবিধে হয়নি, তিনি দ্রুত বাবুর্চিমহলে গিয়ে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। মাইকেলের কোষাকুষি অর্থাৎ কাটগ্লাসের লম্বা চৌকো গেলাস আর সেই সঙ্গে ফিরিঙ্গিভোগ্য বিলিতি ব্রাণ্ডির বোতল এল। মাইকেল সন্ধ্যা-আহ্নিক শুরু করলেন।

এই বহু পরিচিত গল্পটি চন্দনবাবুর খুবই প্রিয়। তাঁর নিজের ধর্মকর্মে মোটেই মতি নেই। সকালে পুজোর ঘর ঝাড়পোঁছ থেকে সন্ধ্যাবেলায় পিদিম জ্বালানো সব কিছুর দায়িত্ব মানদা বুড়ির। শুধু রাত্রিবেলা মদ্যপান আবম্ভ করার আগে দেযালে টাঙানো একটা মা কালীর ফটোর পায়ে পানীয় ভর্তি গেলাসটা একটু ছুঁইযে নেন চন্দনবাবু এবং সেই সময় একবার ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এই ব্যাপারটাকে চন্দনবাবু নিজের মনে মনে নাম দিয়েছেন সান্ধ্য আচমন। অনেক সময় সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে কোথাও কোনও কাজে আটকিয়ে গেলে তাড়া দেন, 'আমার সন্ধ্যা আচমনের দেরি হয়ে যাচ্ছে এই বলে এবং এই অজুহাতেই বাড়ি ফিরে আসেন, নিতান্ত মদ্যপানের জন্যে।

এ বেলা শরীরে জ্বর-জ্বর ভাবটা নেই। শরীরটা একটু ঝরঝবে বোধ হচ্ছে, যদিও একটা অবসাদের ভাব, একটা শারীরিক ক্লান্তি রয়ে গেছে।

সে যা হোক যথারীতি বাংলার বোতল খুলে সান্ধ্য আচমনে বসে গেলেন চন্দন রায়। আবার ওদিকে কোথাও কিছু নেই, সারাদিন পরিষ্কার থাকার প'র হঠাৎ আবার, খবরের কাগজের ভাষায় বজ্র-বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। সকালে দোতলার বারান্দায় জলটা খুঁচিয়ে দিয়ে আসায় এখন আর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে না। "া ছাড়া চন্দনবাবু আজ যথেষ্ট সাবধান হয়ে গাড়িব প্যাসেজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে ঘরের দবজাটা ভেজিয়ে দিলেন। কিন্তু ঝোড়ো বাতাসে দরজা ভেজিয়ে রাখা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করে দিলেন।

ঘরের মধ্যে একটা জিরো পাওয়ারের নীল রঙের নাইট বাল্ব আছে। টিউব লাইটটা

নিবিয়ে দিয়ে শুধু নীল আলোটা জ্বেলে ঘন ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় নির্জনে একলা ঘরে তরল মদির পানীয়ে মনোনিবেশ করলেন চন্দন রায়। আজ আর কালকের মত ঢোঁকে ঢোঁকে নয় ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে সিপ করে করে মদ্যপান উপভোগ করতে লাগলেন তিনি।

ফিকে নীল আলো বন্ধ ঘরের মধ্যে একটা স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করেছে। নেশার ঘোরে ঝিম মেরে বসে চন্দনবাবুর মনে পড়ে গেল সেই ছাতা আর চিঠির কথা। জিনিস দুটো অদৃশ্য হল কি রে?

নেশায় রীতিমতো বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার কর্কশ শব্দে হুঁশ হলো। বাইরের দরজাটায় কেউ খুব জোরে কড়া নাড়ছে, সেই সঙ্গে ধাক্কাও দিচ্ছে। শব্দটা উঠোন পেরিয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছাচ্ছে।

নিশ্চয়ই ক্যাটারারের লোক খাবার দিতে এসেছে, তা ছাড়া ঝড়-বাদলের দুর্দিনের রাতে কে আর আসবে? কিন্তু দুয়েকবার কালকের মত 'কোই হ্যায়' শোনা গেল।

বাইরের দরজা খুলে দিয়ে চন্দনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন কালকের 'কোই হ্যায়' বরকন্দাজ আজ আবার ফিরে এসেছে, হঠাৎ এই লোকটাকে দেখে চন্দনবাবুর মনে পড়লো, গতকাল লোকটা একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল, যে চিঠিটা হারিয়ে যাওয়ার জন্যে এখনো পড়ে ওঠাই হয়নি। সেই চিঠিটার উত্তর নিতেই আজ এসেছে। তাই কথা ছিল।

বরকন্দাজটির হাতে কালকের মতই গোল লণ্ঠন আর বড় সাদা ছাতা। হঠাৎ চন্দনবাবুর খেয়াল হল এই ছাতাটাই লোকটা কাল রাতে ফেলে গিয়েছিল, আজ সকালেই তিনি বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখেছেন। আশ্চর্য! এই লোকটা এসে কখন ছাতাটা নিয়ে গেছে।

আজ চন্দনবাবু লোকটিকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

বরকন্দাজটি একটি সেলাম ঠুকে জবাব দিল, 'হ্যামার নাম আছে খাজানা শেখ। হামি লেসলি টেলর সাহেবের হেড খানসামা আছে।'

এই কথাটা, চন্দনবাবুর মনে পড়ল, এই লোকটি আগের রাতেও বলেছিল তবে নিজের নামটা বলেনি, সেটা আজ জানা গেল, যেমন আজব পোশাক তেমনি চমৎকার লাগসই নামটা।

খাজানা শেখের নাম নিয়ে যখন ভাবছেন চন্দনবাবু তখন খাজানা শেখ বলল, যে টেলর সাহেব চিঠির উত্তর নিতে পাঠিয়েছেন।

সত্যিই চন্দনবাবুর খেয়াল হল আজই তো চিঠির উত্তর দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু চিঠিটাই তো পড়া হয়নি। কে এক টেলর সাহেব হঠাৎ তাঁকে কেন স্মরণ করেছেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না চন্দনবাবু, তাছাড়া টেলর সাহেবের পাঠানো চিঠিটা না পড়লে তো কিছু বোঝা যাবে না।

সেই কথাই তিনি খাজানা শেখকে বললেন, 'সাহেবের চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছি না। সাহেব কি লিখেছিলেন তাও তো জানি না।'

কথা বলতে বলতে খাজানা শেখ বারান্দায় উঠে ঘরের দরজার কাছে চলে এসেছিল। ঘরের মধ্যের আবছায়া নীল আলোয় কি করে দেখতে পেল সে কে জানে, হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ তো সাহেবের লেখা লেফাফা।'

সত্যিই ঘরে ঢুকে চন্দন রায় দেখতে পেলেন বিছানার গায়ে লাগানো তেপায়া টেবিলের ওপরে মদের বোতলের পাশে কালকের সেই চিঠিটা রয়েছে।

সারাদিন এত খুঁজেও কেন চিঠিটা পেলেন না, চন্দনবাবু বুঝতে পারলেন না।

[ছয়]

...'এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাক'...

ঘরে ঢুকে টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানার ওপরে বসলেন চন্দনবাবু, বসে লেফাফাটা হাতে নিলেন।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, একটু আগে পা দুটোও খুব টলছিল। নেশাটা কি খুব বেশি হয়ে গেছে? নাকি আবার জ্বর এল?

সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে একবার যাচাই করার চেষ্টা করলেন। পরপর চারটে বোতল রয়েছে।

কিন্তু চারটে বোতল তো থাকার কথা নয়। আজ তো দু'বোতল কিনেছেন। তাহলে সেই সঙ্গে কালকের দটো শূন্য বোতলও রয়ে গেছে।

মত্ত মস্তিষ্কেও চন্দনবাবু মনে করতে পারলেন সন্ধ্যাবেলা কাজের বুড়িটা এসেছিল, সকাল বেলায়ও এসেছিল। টেবিলে খালি বোতল, এঁটো গেলাস থাকলে সেই সরিয়ে দেয়। আজও নিশ্চয় অন্যথা হয়নি। তদুপরি বুড়ি বহুকালের অভিজ্ঞ রমণী, সে জানে বাংলা মদের খালি বোতল মদের দোকানে ফেরত দিলে ভালো টাকা পাওয়া যায়, বিলিতি মদের খঅলি বোতলে যেখানে বিক্রিওয়ালারা পঁচিশ পয়সা, তিরিশ পয়সার বেশি দিতে চায় না, বাংলার খালি বোতল শুঁড়িখানায় ফেরত দিলে পাওয়া যায় আড়াই টাকা, তিন টাকা।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক মজার গল্প মানুষের মাথায় খেলে।

হঠাৎ চন্দনবাবুর মাথায় এই রকম একটা গল্প খেলে গেল।

গল্পটা আধা সত্যি। এই কিছুদিন আগে চন্দনবাবু তাঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন।

বন্ধুটি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা কোনও না কোনও বারে মদ খেতে যেতেন। যাতে বেশি নেশা না হয় তিনি পাশের টেবিলের কোনও একজন গ্রাহককে নির্দিষ্ট করে তার দিকে তাকিয়ে মদ খেতেন। যখনই দেখতেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি ডবল হয়ে গেছে, মদ খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। একদিন তিনি বারে বসে আছেন, যাকে তিনি নির্দিষ্ট করেছিলেন লোকটা বেমক্কা উঠে চলে গেছে, অন্য টেবিলে চোখ রাখতে গিয়ে দেখলেন একই মানুষ চারটে হয়ে বসে আছে। তিনি বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে যখন চলে যাচ্ছেন, বেয়ারাটি বলল, 'স্যার, আজ এত তাড়াতাড়ি'। বন্ধুটি তাঁর সমস্যাব কথা বেয়ারাকে বলতে সে একগাল হেসে বলল, স্যার এক-ন কোথায়? ওরা তো দুজন, যমজ ভাই একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে।'

এই গল্পটা এই মুহূর্তে মনে পড়ায় নেশার ঘোরেও হাসি পেল চন্দনবাবুর।

তা হাসি পাক। এখন চিঠিটা পড়তে হয়, খাজানা শেখ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জবাবটা দিতে হবে।

চিঠিটা দেখে মনে হয় যেন অনেককাল আগের পুরনো দিনের চিঠি। ফিকে হলুদ রঙের হাতে তৈরি মোটা কাগজে ঘন কালো ভুষো কালিতে খুব মোটা নিবে, সম্ভবত খাগের বা পাখির পালকের কলমে চিঠিটি লেখা। সাবেকি ইংরেজি ভাষায়, সাবেকি হরফে চিঠিতে লেখা হয়েছে।

২/২/১০ সদর স্ট্রিট,
কলিকাতা
৭ আগস্ট, মঙ্গলবার
মহাশয়*,

আমার লিলুয়ার বাংলো বাড়ি ক্রয় করা বিষয়ে আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আপনি যদি সময় করে আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যাবেলা আমার হেড খানসানা খাজানা শেখের সঙ্গে আমার এখানে আসেন তবে দামদর ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

অসুবিধা থাকিলে অন্য দিনও আসিতে পারেন। খাজানা শেখকে তারিখ জানাইয়া দিলে সে গিয়া আপনাকে লইয়া আসিবে। তবে তাড়াতাড়ি করিবেন।

ইতি ভবদীয়
লেসলি টেলাব

বাবু চন্দন রায়
ভবানীপুর

নিজের নামের আগে বাবু শব্দটি দেখে বেশ মজা লাগল চন্দনবাবুব। এদিকে নেশাটাও বেশ জমে এসেছে।

চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ খটকায় থাকার পর চন্দনবাবুর আবছা-আবছা মনে পড়ল সেই যেদিন প্রথম প্রবল বৃষ্টি হল সেই রাতে তিনি খবরের কাগজ দেখে লিলুয়ায় গঙ্গাব ধারে এক বাংলো বাড়ির বিক্রেতা বিজ্ঞাপনদাতাকে চিঠি দিয়েছিলেন। এখন সেই চিঠিব উত্তর এসেছে।

আজও সেই সে রাতের মত দুর্যোগ। কখনও বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে, কখনও তেড়ে আসছে। তাছাড়া শরীরটাও তেমন ভালো নেই।

কিন্তু নেশার ঝোঁকেই বোধহয় দ্রুত মনস্থির করে ফেললেন চন্দনবাবু। খাজানা শেখকে বললেন, 'ঠিক আছে, সদর স্ট্রিট তো দূরে নয়। আজই যাওয়া যায়। কিন্তু যা জলঝড়, গাড়িঘোড়া পাওয়া যাবে কোথায়?'

খাজানা শেখ বললো যে, তার সঙ্গে গাড়ি আছে, তা নিয়ে কোনও অসুবিধে নেই। তাছাড়া আজই যাওয়াটা নাকি জরুরি, কারণ সাহেব সামনের সপ্তাহে চলে যাবেন।

তাড়াতাড়ি ঢোঁক ঢোঁক করে পানীয়ের শেষাংশটুকু গলাধঃকরণ করে একজোড়া রবারের পাম্পসু পায়ে গলিয়ে চন্দনবাবু ঘরে তালা দিয়ে বেরোলেন। বেরোনোর মুখে মনে পড়লো নৈশাহার এখনও হয়নি, ক্যাটারারের লোকের কাছে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে, সে এসে দরজা খুলে বারান্দায় খাবার রেখে যেতে পারবে, ফিরে এসে খেলেই হবে।

বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। খাজানা শেখের বড় ছাতাটার নিচে মাথা গলিয়ে প্যাসেজ পার হয়ে

রাস্তায় এসে দেখলেন রাস্তা জলে টইটুম্বুর। প্রায় ফাঁকা, লোকজন কোথাও কেউ নেই। কোনো গাড়িও যাতায়াত করছে না। শুধু বাড়ির দরজা থেকে একটু এগিয়ে একটা রাজসিক ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সাবেককালের দুই ঘোড়ার ব্রুহাম গাড়ি। দুটো বাদামি রঙের টগবগে আরবি ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে জোড়া রয়েছে। গাড়ির ছাদে প্রায় খাজানা শেখের মতই কেতাদুরস্ত উর্দি পরা কোচম্যান, তারও মাথায় সাদা ছাতা।

কলকাতা শহরে এখনও এই রকম একটা ঘোড়ার গাড়ি থাকা সম্ভব একথা ভেবে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেলেন চন্দনবাবু। কিন্তু তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই খাজানা শেখ 'আইয়ে, আইয়ে' করে নবাবি কায়দায় তাঁকে ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে প্রায় জোর করে তুলে দিয়ে নিজে গাড়ির ছাদে উঠে কোচম্যানের ছাতার নিচে বসল।

গাড়ি চলতে লাগল। চারদিকে নিঝুম কলকাতা। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, ব্যাঙ ডাকছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে কোথায় শেয়াল ডেকে উঠল। শেয়ালের ডাক শুনে চন্দনবাবু একটু চমকিয়ে উঠলেন।

নেশায় এবং জ্বরের ঘোরে কেমন একটা ঝিম ধরে গেছে। তবুও শেয়ালের ডাক কানে যেতে চন্দনবাবুর মনে হল বহুকাল পরে শেয়ালের ডাক শুনলেন। কলকাতায় এখনো যে শেয়াল আছে, এ তো ভাবা যায় না।

বৃষ্টির ছাঁটের জন্যে গাড়ির জানালার পাল্লা তোলা রয়েছে। বাইরে কিছু দেখা যায় না। শুধু ঘোড়াব পায়ের খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এমনিতে গাড়িটার বন্দোবস্ত খুবই আরামদায়ক। নরম, গভীর কৌচ। পা ছড়াবার জন্যে অনেকখানি জায়গা। পিঠের দিকেও গদিটা বেশ হেলান দেয়া, সারা শরীর ছড়িয়ে দেয়া যায়। গদিতে গা এলিয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে ছিলেন চন্দনবাবু। কতক্ষণ বসেছিলেন সেটা তাঁর কোনও খেয়াল নেই। হাত ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে রয়েছে। হাতঘড়ি থাকলেও বিশেষ সুবিধে হত না। যদিও এখন বন্ধ গাড়ির ভেতরের অন্ধকারটা চোখে কিছুটা সরে গেছে, এ রকম আবছায়ায় ঘড়ির কাঁটা চোখে পড়ত না।

বৃষ্টি বোধহয় একটু ধরে গেছে। ঘোড়ার গাড়ির জানালাটা খুলে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলেন চন্দন রায়। আদ্যিকালের ভারি জানালা কুলুপ দিয়ে আঁটা। কুলুপটাই বা কোথায়? জানালাটা খুলতে পারলেন না তিনি। কুলুপটা অন্ধকারে খুঁজে পেলেন না।

কিন্তু হাতের স্পর্শে বুঝতে পারলেন জানালাটায় খড়খড়ি লাগানো আছে। একটু চেষ্টা করে চন্দনবাবু একদিকের একটা খড়খড়ির পাল্লা একটু খুলতে পারলেন, তার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি।

প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। নিশ্চয় আবার লোডশেডিং হয়েছে। বৃষ্টিসিক্ত বাতাসে ভেজা ঘাস ও গাছের পাতার সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। কোথায় একটা পাখি টি-টি করে ডেকে যাচ্ছে।

একটু পরে বাইরের অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে চন্দনবাবুর কেমন মনে হল তিনি একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলেছেন। বড় বড় ঘাস, বুনো ঝোপ। রাস্তার পাশে বাড়িঘর দোকানপাট কিছু নেই। রাস্তায় লোকজন নেই।

চন্দনবাবু মনে মনে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এটা কোন জায়গা? কোথায় যাচ্ছেন

তিনি, এই আশ্চর্য ঘোড়ার গাড়িতে, এই দুর্যোগের রাতে।

তিনি গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অসম্ভব। দরজা খোলা যাচ্ছে না। দু চারবার গাড়ির দরজায় আর ছাদে করাঘাত করলেন, খাজানা শেখ আর কোচম্যানের দৃষ্টি অর্থাৎ শ্রুতি আকর্ষণের জন্যে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। খটখট করে ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে চলল।

এবার গাড়ির গতি যেন একটু কমেছে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চন্দনবাবু দেখতে পেলেন দূরে রাস্তায় আলো দেখা যাচ্ছে। বোধহয় লোকালয় এসে গেছে।

আর একটু এগিয়ে যেতে রাস্তাঘাট। দোকানপাট স্পষ্ট হল। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে। কিন্তু ল্যাম্প-পোস্টগুলো কি রকম যেন, আলোগুলোও বিদ্যুতের আলো নয়। চন্দনবাবু ভাবলেন, একেই কি গ্যাসের বাতি বলে।

এ দিকটায় বৃষ্টি হয়নি কিংবা হলেও খুব কম হয়েছে। রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন বোধহয় সায়াহ্ন ভ্রমণে বেরিয়েছে। অনেকে কেনাকাটাও করছে, অনেকে অলসভাবে রাস্তায় পদচারণা করছে যেন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে। বড় বড় দোকানপাট খোলা রয়েছে। সে সব দোকানের কাচের জানালায় নানা রকম চেনা-অচেনা সামগ্রী থরে থরে সাজানো।

খুব অবাক হয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন চন্দনবাবু। এ তো কলকাতা নয়। অথচ দুয়েকটা বাড়িঘর চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অনেকটা চৌরঙ্গীর মতই। ঐ তো চৌরঙ্গী আর সদর স্ট্রিটের মোড়ের যাদুঘরের বাড়ির মত একটা বাড়ি।

সবচেয়ে আশ্চর্য বোধ করলেন চন্দন রায় দুটো জিনিস দেখে। রাস্তায় কোনও মোটরগাড়ি বা বাস-লরি-টেম্পো নেই। আর পথচারীদের অধিকাংশই সাহেব-মেম। দেশি লোকজন নেই বললেই চলে। যে দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকেরই মাথায় পাগড়ি, পায়ে শুঁড় তোলা বাঁকানো নাগরাই জুতো।

চন্দনবাবু অবাক হয়ে ভাবছিলেন, কলকাতার কাছেই কিংবা কলকাতার মধ্যে এরকম কোনও অঞ্চল আছে বা থাকতে পারে যেখানে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাওয়া যায় —কোনওদিন কল্পনাও করেননি তিনি।

চন্দনবাবু এই রকম যখন ভাবছেন সে সময় ঘোড়ার গাড়ি চৌরঙ্গী থেকে সদর স্ট্রিটে ঢুকলো এবং ঢুকে কিছুটা এগিয়েই একটা উঁচু দেয়ালওলা বাড়ির গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেলো। দুদিকে দুটো পুকুর। তার মধ্য দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যাওয়ার রাস্তা। রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দোতলা কাঠের বারান্দাওলা বাড়ির সামনের উঠোনে।

বোধহয় এ বাড়িতে আজ কোনও উৎসব আছে, অনেক ঘোড়ার গাড়ি, ফিটন, ল্যানডো, ব্রুহাম পালকি উঠোনে ভিড় করে রয়েছে। ঘরে বারান্দায় অনেক সাহেব-মেম, তাদের কথার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পেয়ালা পিরিচের টুংটাং শব্দ, তা ছাড়াও কেউ বোধহয় খুব নিচু গ্রামে পিয়ানো বাজাচ্ছে আর ওই সব ছাপিয়ে মাঝে মধ্যেই পুরুষ কণ্ঠ বা বামাকণ্ঠ সজোর উচ্চ গ্রামে পিয়ানোর বাজনাকে উতরিয়ে চলে যাচ্ছে, কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠছে সমস্ত বাড়ি।

গাড়িটা উঠোনে গিয়ে থামতেই গাড়ির ছাদ থেকে দ্রুত নেমে এসে দরজা খুলে দিল খাজানা শেখ। ঠিক পিছনেই আরেকটা ঘোড়ার গাড়ি এল, তার থেকে এক জোড়া সাহেব-মেম নামল, সাহেবের পরনে লম্বা ফ্রক কোর্ট, চেনা ফুল প্যান্ট। আর

মেমসাহেবের ফ্রিল দেওয়া গাউন প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, মাথায় কালো নেটের টুপি।

বিভ্রান্ত চন্দনবাবু এ সব দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ভুল দেখছি নাকি, স্বপ্ন নাকি, নাকি নেশার ঘোরে এসব দেখছি। ঐ যে ঘরে বারান্দায় বেলোয়ারি ঝাড়লন্ঠনে বিকীর্ণ আলো, পিয়ানোর নরম বাজনা এসব যেন অনেক দূরের, বহুকাল আগের। এই মানুষজন, সাহেব-মেম, কোচম্যান-খানসামা এঁরাও কোনও এক বিগত যুগের। তিনি কি করে যেন ওই পুরনো পৃথিবীতে চলে এসেছেন।

গাড়ি থেকে নেমে চন্দনবাবুকে দাঁড় করিয়ে খাজানা শেখ বাড়ির মধ্যে গিয়েছিল, বোধহয় টেলার সাহেবকে খবর দিতে। একটু পরেই খাজানা ফিরে এল। এসে চন্দনবাবুকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে একপাশে চলে গেল। এদিকটা ফাঁকা, পার্টিটা বাড়ির ওপাশে হচ্ছে।

একটা হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে খাজানা শেখ চন্দনবাবুকে বসতে বলল। তারপর সে আবার বাড়ির মধ্যে গেল। বোধহয় টেলার সাহেবকে ডাকতে।

একটু পরেই সাহেবকে নিয়ে খাজানা ফিরল। ভাঙাভাঙা বাংলা মেশানো ইংরেজিতে সাহেব নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, যে তিনিই লেসলি টেলার, তিনিই চিঠি দিয়ে তাঁকে আসতে বলেছেন।

লেসলি টেলার সাহেব বললেন যে তিনি চাঁপদানিতে পাট কোম্পানিতে ম্যানেজারের কাজ করতেন। তখনই লিলুয়ায় গঙ্গার ধারে জমি কিনে বাংলো বাড়িটা বানিয়ে ছিলেন। খুব যত্ন করে বানিয়ে ছিলেন। বাড়িটার উঠোন থেকে টানা সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার জলে। দেশি-বিদেশি সবরকম গাছ—আতা, বাতাবি, আম, মেহগনি, শিমুল, কদম এই বাংলো বাড়িটায় রয়েছে।

এখন রিটায়ার করে হোমে মানে বিলেতে ফিরে যাচ্ছেন। আজকেই খবর পাওয়া গেছে জাহাজ সামনের সপ্তাহে ছাড়বে। সেই কারণেই আজ তাঁর বাড়িতে ফেয়ারওয়েল পার্টি হচ্ছে।

চন্দনবাবুকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাহেব বললেন, আজ তিনি ব্যস্ত আছেন। তবে চন্দনবাবু ইচ্ছে করলে কাল দুপুরেই বাংলোটা দেখতে আসতে পারেন। খাজানা শেখই নিয়ে যাবে। মোটমাট পাঁচশো পাউন্ড পেলেই সাহেব বাংলোটা ছেড়ে দেবেন। চন্দনবাবুর সুবিধের জন্যে সাহেব পাউন্ডের দামটা টাকার অঙ্কে বলে দিলেন, প্রতি পাউন্ড তেরো টাকা করে ধরলে সাড়ে ছয় হাজার রুপিয়া দাম পড়বে। টেলার সাহেবকে চন্দনবাবুর বলা হল না পাউন্ডের দাম এখন তেরো টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকা।

টেলার সাহেবের নির্দেশমতো খাজানা শেখ চন্দনবাবুকে সেই ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিলো বাড়ি ফেরার জন্যে। ফেরার পথের কথা চন্দনবাবুর আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে গাড়িতে উঠেই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

[সাত]

...'স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক বিকার
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার'...

মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা। সমস্ত শরীর ব্যথায় অবশ—এরই মধ্যে কাদের যেন গলার

স্বর কথাবার্তা শুনে চন্দন রায়ের ঘুম ভাঙল। কোনও রকমে কষ্ট করে চোখ মেলে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন তার চারপাশে, তাঁকে ঘিরে একটা ছোট মত ভিড়।

একটু পরে চন্দনবাবু বুঝতে পারলেন তিনি তাঁর বাড়ির সামনের ফুটপাথে ঠিক প্যাসেজের মুখটায় শুয়ে আছেন। চারপাশে ভিড় করে থাকা মানুষেরা, তার মধ্যে পাড়ার লোক বলে অনেকেই চেনা, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, 'খুব নেশা করেছিল কাল রাতে', 'মাতাল', 'না না। শরীরটা বোধহয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, এ রকম তো আগে কখনও দেখিনি।'

ঠিক এই সময়ে মানদা বুড়ি পাড়ার বুড়ো ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে অকুস্থলে এসে পৌঁছালো।

সাতসকালে ঘর ঝাঁট দিয়ে এসে মানদা বুড়িই সর্বপ্রথম দেখতে পায় ধরাশায়ী চন্দনবাবুকে। তাই দেখেই সে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল।

ডাক্তারবাবুকে দেখে ম্লান হাসলেন চন্দন রায়। ডাক্তারবাবু ধমকের সুরে বললেন, 'আমি আপনাকে সাবধান হতে বলেছিলাম।' এই বলে দুজন লোককে দিয়ে ধরাধরি করে চন্দনবাবুকে ঘরের মধ্যে বিছানায় এনে শোয়ালেন। ভালো করে নাড়ি দেখে, স্টেথোসকোপ দিয়ে বুক দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, কিছু তো পাচ্ছি না। কি হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ আকাশপাতাল এলোমেলো চিন্তা করে চন্দনবাবু বললেন, 'আমি বোধহয় একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলাম।'

ডাক্তারবাবুদের কাছে এ ধরনের কথার কোনও মানে হয় না। তিনি তিন-চার রকম ওষুধ, সাত-আট ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

বিছানায় অবসন্ন শরীরে শুয়ে কালকে বাতের কথা ভাবার চেষ্টা কবতে লাগলেন চন্দনবাবু। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মানদাবুড়ি গজগজ করতে লাগল।

কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া, ছেঁড়া-ছেঁড়া, ছায়াছায়া বহুকাল আগের কোনও ব্যাপাব, কেমন খাপছাড়া ঘটনা।

বালিশের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে বিছানার প্রান্তে একটা পুরনো খবরের কাগজ আধখোলা পড়ে রয়েছে। ঘর ঝাঁট শেষ করে ঘরের পাখাটা মানদা ফুলস্পিডে খুলে দিয়েছে, সেই হাওয়ায় খোলা কাগজটা ফড়ফড় করে উড়ছে।

অন্যমনস্কভাবে কাগজটা হাতে তুলে নিলেন চন্দনবাবু। মধ্যের পাতার ডানদিকের কলমের নিচের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন চন্দনবাবু।

এই তো সেই সেদিনের বিজ্ঞাপনটা। বিজ্ঞাপনটা তো মিথ্যে নয়। এই তো লেখা রয়েছে,

'লিলুয়ায় বাংলো বাড়ি বিক্রয়'

বিজ্ঞাপনের নিচে সদর স্ট্রিটের লেসলি টেলার সাহেবের বিজ্ঞাপনটাও স্পষ্ট লেখা হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাদাচোখে বিজ্ঞাপনটার অসঙ্গতি ধরে ফেললেন চন্দনবাবু। বিজ্ঞাপনটা সমসাময়িক নয়, একশো বছর আগের। সংবাদপত্রে 'শতবর্ষ আগে' নামে যে কলম আছে, সেই কলমে একশো বছর পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তখনকার দিনের বিজ্ঞাপনের নমুনা হিসেবে।

পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে কোনও কূলকিনারা পেলেন না চন্দনবাবু। তাঁর মাথা আবার ঝিমঝিম করতে লাগল। অবসাদে তাঁর চোখ বুজে এল। একটু পরে খবরের কাগজটা তাঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

মানদাবুড়ি বড় রাস্তায় সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে চন্দনবাবুর জন্যে এক গেলাস দুধ আনতে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে দেখে তার মনিব অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

পাশের তেপায়া টেবিলটা থেকে শূন্য মদের বোতলগুলো সরিয়ে সেখানে দুধের গেলাস রাখল সে। সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মেজে থেকে পুরনো খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

বুড়ি হয়তো আজ বিকেলেই কাগজটায় কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে তার কয়লার উনুন ধরাবে। সম্ভব-অসম্ভব একটা ধোঁয়াটে স্বপ্ন ধোঁয়া হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বর্ষার ভারি বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

তবু একটা ছায়াছায়া অস্পষ্ট, অবিশ্বাস্য স্মৃতি থেকে যাবে চন্দনবাবুর মনের মধ্যে। নেশায় এবং ঘুমের ঘোর কেটে যাওয়ার পরে, কখনও নেশার ঘোরে, কখনও ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে চন্দনবাবুর অবচেতন মনে খাজানা শেখ এসে 'কোই হ্যায়' বলে একটা ভাঙা দরজায় কড়া নাড়বে। একটা দুই ঘোড়ার সাবেকি গাড়ি এসে তাঁকে নিয়ে যাবে এক শতাব্দী আগের রাস্তা ধরে এক পুরনো দিনের বাড়িতে।

[আট]

পুনশ্চ :

'খুন করেছে কলকাতা হে
খুন করেছে
গুনিন হয়ে ফের বাঁচিয়ে
গুণ করেছে...
...আড়াল করে উড়াল ধরে
যেই পালাবো
জানতে পেরে মন কাড়ানির
ছল ধরেছে'...

সব কাহিনীর মতই এই স্বপ্নাদ্য কাহিনীটিরও একটি উপসংহার আছে। সেই উপসংহারটি বড়ই বাস্তব, খুবই সাদামাটা।

পূর্বলিখিত বিচিত্র ঘটনাবলীর পর শ্রীযুক্ত চন্দন রায় আর কখনও জ্ঞানত এই মহানগর ছেড়ে দূরে কোথাও নিভৃত নিরালায় বসবাস করার বাসনা পোষণ করেননি।

পুরো তিন সপ্তাহ সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে ভুগে খুব কাহিল হয়ে চন্দনবাবু সেরে উঠলেন।

ডাক্তার ডাকা থেকে পথ্য যোগানো, মানদাবুড়ি এই একুশ দিন যে সেবাশুশ্রুষা করলো অতিবড় নিকট আত্মীয়াও করে না। কাছেই চেতলায় চন্দনবাবুর মামার বাড়ি, সে বাড়িও মানদার চেনা, সে সেখানে হেঁটে গিয়ে চন্দনবাবুর সমবয়সী এক মামাতো ভাইকে চন্দনবাবুর শারীরিক অবস্থা জানিয়ে এল।

সব শুনে সেই ভদ্রলোক পাঁচু পাল, তিনি কনট্রাক্টরি করেন, কয়েকদিন কাজে যাতায়াতের পথে চন্দনবাবুর খোঁজ-খবর নিলেন। মানদার কথা শুনে পাঁচুবাবুর মনে হয়েছিলো ভাঙা ছাদ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বিছানা ভিজে যাওয়ায় এবং সেই ভেজা বিছানায় শোয়ায় চন্দনবাবুর অসুখটা হয়েছে।

তিনি চন্দনবাবুর দাদাকে বিদেশে চিঠি দিলেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর একটা স্বার্থ ছিল। পাঁচুবাবু কলকাতা শহরের মধ্যে কনট্রাক্টরি ব্যবসা করেন, পুরনো বাসাবাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি বানানোর প্রমোটরদের কাজ করেন তিনি।

পাঁচুবাবুর অনেকদিনের স্বপ্ন নিজেই প্রমোটর হওয়া। এবার একটা অভাবিত সুযোগ এসে গেছে তাঁর হাতে। চন্দনবাবুর দাদাকে তিনি লিখলেন, এ রকম জরাজীর্ণ বাড়ি ভবানীপুরের মত জায়গায় ফেলে রেখে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। যদি এই জমির ওপর পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি বানানো যায়, সবচেয়ে ভালো দুটো ফ্ল্যাট তিনি এবং চন্দনবাবু পাবেন, তদুপরি কিছু নগদ টাকাও পেতে পারেন।

পাঁচুবাবুর পিসতুতো ভাই মানে চন্দনবাবুর প্রবাসী দাদার ভারতীয় মুদ্রার প্রতি আকর্ষণ তেমন প্রবল নয় কিন্তু একটা মোজেইক ফ্ল্যাট, বড় বড় জানালা, হালফিল বাথরুম তদুপরি কলকাতা যাওয়ার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে, তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

চন্দনবাবু সুস্থ হয়ে ওঠার পরে সব শুনে তাঁরও আপত্তি করার কিছু রইল না।

পাঁচুবাবুর সঙ্গে কথা বলে পুরনো গাড়ির ব্যবসা ছেড়ে পুরনো বাড়ির ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেন চন্দনবাবু।

একটা খাঁটি বাঙালি নতুন প্রমোটার কোম্পানি গঠিত হল। 'পাল অ্যান্ড রায়'। দুই বাই দুই এক রজনী দাশ রোডে প্রথম পাঁচতলা বাড়ি তৈরি হল। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট চন্দনবাবুর আর চন্দনবাবুর দাদার।

ছাদ ঢালাই করতে কি একটা গোলমাল হয়েছিল, পাঁচতলার ছাদ দিয়ে ভরাবৃষ্টির দিনে অঝোরে জল পড়ে। ঐ তলার ফ্ল্যাট দুটো জলে ভেসে যায়। কিন্তু সে জল দোতলায় চন্দনবাবুর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে পৌঁছায় না। কখনও কখনও পাঁচতলার লোকেরা চন্দনবাবুর দোতলায় এসে হামলা করেন। কিন্তু সেরকম ঘটনা ঘটে বছরে পাঁচ সাতদিন।

'পাল অ্যান্ড রায়' কোম্পানির কর্মব্যস্ততা ইতিমধ্যে দশগুণ বেড়ে গেছে। চেতলায়, বেহালায় এমনকি চৌরঙ্গী সদরে তারা পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাটবাড়ি বানাচ্ছে।

সদর স্ট্রীটে এরকম একটা বাড়ি ভাঙতে গিয়ে চন্দনবাবুর মনে হল এ বাড়িটা তাঁর চেনা। একবার যেন এসেছিলেন। প্রায় পোড়ো বাড়িটার বারান্দার শেষপ্রান্তে গিয়ে দেখলেন সিমেন্টের আস্তরণে ঢাকা লোহার ফ্রেমের একটা হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চি।

চন্দনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল কবে যেন এক অবাস্তব রাতে এই হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চিটাতে তিনি কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তিনি ঠিক করলেন, ভবানীপুরের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে এই বাড়িটায় একটা ফ্ল্যাট তিনি নেবেন।' দাম কিছু বেশি পড়বে, তা পড়ুক।

ভাগাভাগি

অল্প একটু-আধটু ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির কথা বাদ দিলে, গত কয়েকদিন আবহাওয়া মোটামুটি ভাল ছিল। কিন্তু কাল শেষ রাতে জবর সৃষ্টি হয়েছে। এখনও আকাশ মেঘলা, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বোধহয় দেড়টা-দুটো বাজে। বেশ অনেকক্ষণ আগে মদনপুর বাজারে হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের গদিতে দেয়ালঘড়িতে কার্তিক দেখেছিল বারোটা প্রায় বাজে। কবজিতে একটা হাতঘড়ি থাকলে এত ভাবতে হত না। ঠিক সময়টা যখন ইচ্ছে কার্তিক টুক করে দেখে নিতে পারত।

একটা হাতঘড়ি থাকারও কথা ছিল কার্তিকের হাতে। বিয়ের সম্বন্ধ করার সময়ে শ্বশুরমশায় তার বাবাকে বলেছিলেন জামাইকে সোনার বোতাম, হাতঘড়ি, সাইকেল দেবেন। গয়না, তত্ত্ব, প্রণামী, ননদ পুঁটুলি, বাসন-বিছানা, নগদপণ ইত্যাদির সঙ্গে নবজামাতার একটি হাতঘড়িও প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মফস্‌সলের বাজারে শ্বশুরমশায় হাতঘড়ি সংগ্রহ করতে পারেননি।

বাংলা তেরোশো বাহান্ন সালের আশ্বিন মাস। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর শেষ। কোনও রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে গ্রাম বাংলা উঠে বসার চেষ্টা করছে। জোড়াতালি দিয়ে পুরনো জীবনযাত্রা একটু একটু করে ফিরে আসছে সমতল পূর্ব বাংলায়।

যুদ্ধের আগে ঘড়ি আসত বিলেত থেকে। বিলেত মানে ইউরোপ। যুদ্ধের বাজারে ঘড়ির আমদানি প্রায় বন্ধ ছিল। বাণিজ্যপোতের জন্যে মোটেই নিরাপদ ছিল না সমুদ্রপথ। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে এখন বিলিতি জিনিসপত্র অল্প অল্প করে বাজারে আসা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ, মফস্‌সল শহরের বাজারেও বিলিতি ঘড়ি, ছাতা, হ্যারিকেন ইত্যাদি শৌখিন দ্রব্য ঠিকমত আসছে না।

হয়তো আর আসবেও না। স্বরাজ প্রায় এসে গেছে। তখন দেশের মধ্যেই এসব জিনিস তৈরি হবে। ইউনিয়ন জ্যাকের দিন শেষ। এর মধ্যে এখানে সেখানে আড়ালে আবডালে গৃহস্থ বাড়িতে, ক্লাব ঘরে, সভা সমিতিতে লোকেরা তেরঙা পতাকা ওড়াচ্ছে কোথাও কোথাও সবুজের মধ্যে চাঁদ-তারা।

এসব হুজুগ নিয়ে কার্তিক অবশ্য খুব একটা মাথা ঘামায় না। এই মুহূর্তে তার সব চেয়ে বড় চিন্তা স্টিমারটা ধরতে পারবে কি না। দু হাতে দুটো মাল নিয়ে সে হনহন করে স্টিমারঘাটের দিকে হাঁটছে। দৌড়তে পারলেই ভাল হত। কিন্তু দৌড়োনোর উপায় নেই।

ধানখেতের মধ্য দিয়ে আলপথ। বড় রাস্তা স্টিমারঘাট পর্যন্ত যায়নি, গিয়ে লাভ নেই, নদীর ধারের রাস্তা কেবলই ভাঙে। ঘাট পর্যন্ত আলপথ দিয়ে যেতে হবে। ভোর রাতের বৃষ্টিতে আলপথটার কাদামাটি পিছল হয়ে রয়েছে, একটু অসত . হলে, একটু তাড়াতাড়ি করলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তা ছাড়া এবার বর্ষা খুব জোর হয়েছিল। বর্ষার সময় শামুকগুলো আলপথের ওপরে এসে উঠেছে, যে কোনও সময় শামুকের খোলায় পা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড হতে পারে। জুতো পায়ে থাকলে সে ভয় ছিল না, কাদা মাখামাখি হবে ভয়ে মদনপুর বাজারেই কার্তিক

বিয়ের সময় কেনা প্রায় নতুন ফিতেওলা ক্যানভাসের জুতোজোড়া পায়ের থেকে খুলে হাতের বোঁচকার মধ্যে ভরে নিয়েছে। এখন সাবধানে এই দুর্গম রাস্তা ধরে যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব তারই চেষ্টা করছে। সারা গায়ে কাদা মেখে কিংবা রক্তাক্ত পায়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া খুব শোভন হবে না। তা ছাড়া দ্বিরাগমনের পরে এই প্রথম কার্তিক শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।

কার্তিকের বাঁ হাতে বিয়ের পাওয়া নীল রঙের টিনের সুটকেস, তার পিঠে লাল-সবুজ রং দিয়ে লতা-পাতা-পদ্ম আঁকা। সুটকেসের গায়ে বেঢপ আকারের বড় একটা পিতলের তালা, সিক্স লিভারস্। বাক্সের মধ্যে তার নিজের জামা-কাপড়, আয়না-চিরুনি। একটা নতুন ধুতি শ্বশুরমশায়ের জন্যে, আর একটা নতুন শাড়ি শাশুড়ি ঠাকরুনের জন্যে। পুজোর প্রণামী। এ দেশে তত্ত্ব দেওয়ার প্রথা খুব চালু নেই, তবে সম্বৎসরের পুজোর সময়ে গুরুজনদের নতুন কাপড় পারলে সাধ্যমত দেওয়া হয়।

কার্তিকের ডান হাতে ছোটখাটো একটা বোঁচকা। বোঁচকার ওপরেই রয়েছে গামছা দিয়ে জড়ানো তার কাপড়ের জুতোজোড়া। গামছাটা একটু নোংরা হবে, তা হোক, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভাল করে কেচে নিলেই হবে।

এ দুটো ছাড়া বোঁচকার মধ্যে রয়েছে আরও কিছু মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস। মদনপুর বাজারে এসব জিনিস একটু আগেই সে দোকান থেকে ঘুরে ঘুরে কিনেছে। কার্তিকের নববিবাহিতা স্ত্রীর নাম সাবিত্রী, এসব জিনিস সাবিত্রীর জন্যে কেনা। দুয়েকদিন আগেই তাদের ভুয়াপুর বাজার থেকে সে এগুলো কিনে রাখতে পারত। কিন্তু নতুন বউয়ের জন্যে কেনাকাটা করায় তার একটু সঙ্কোচ রয়েছে, বাসার লোকেরা, বউদিরা কী ভাববে এবং ভুয়াপুর বাজারের স্টেশনারি দোকানিরা সবাই তাকে কমবেশি চেনে, বউয়ের জন্যে কিনছে সেটা বুঝে ফেলবে, হয়তো হাসাহাসি করবে।

অবশ্য বিশেষ কিছু কেনেনি কার্তিক। দুটো চন্দন সাবান, একটা তরল আলতা, এক কৌটো পাউডার, এক শিশি ফুলেল তেল। এ ছাড়া চার হাত চুলের ফিতে কিনেছে, দোকানদার অবশ্য বলেছিল তিন হাতেই হয়ে যাবে, কিন্তু কার্তিক যে জানে সাবিত্রীর চুল খুব লম্বা।

গত আষাঢ় মাসের শেষদিকে কার্তিকের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে সাবিত্রীকে সে খুব বেশি কাছে পায়নি। ভাদ্র মাস পড়ার আগেই সামাজিক নিয়ম মেনে তাকে বাপের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। সাবিত্রীকে এখন কার্তিক আনতে যাচ্ছে। পুজো এসে গেছে, আশ্বিনমাস অর্ধেক হয়ে গেছে। কাদামাটি, শামুকের খোলার মধ্যে যতটা সম্ভব দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে কার্তিক স্টিমারঘাটের দিকে এগোচ্ছে।

সাবিত্রীর কথা মনে আসায় কার্তিকের মনটা একটু উৎফুল্ল হয়েছে। আজ সন্ধ্যাতেই সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হবে, যদি স্টিমারটা ধরা যায়। কিন্তু একটু আগেই বাজারে একটা অন্য খবর শুনে এসেছে।

পয়লা অক্টোবর মানে এই আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি থেকেই স্টিমারের সময়টা এক ঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। এই স্টিমারটা নদীর ওপারের রেল স্টেশনে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেয়। পয়লা অক্টোবর থেকে রেলের টাইম টেবল এগিয়ে আসে, আবার গ্রীষ্মের শুরুতে পয়লা এপ্রিলে পিছিয়ে যায়। এত খবর পাড়াগাঁয়ের সাধারণ লোক রাখে না,

কার্তিকেরও জানার কথা নয়। আগে জানলে বাড়ি থেকেই আগে বেরোত, বাজারেও সময় একটু কম খরচ করত।

সামনের স্টিমার স্টেশনটার নাম পটল। আশ্চর্য নাম! হাঁটতে হাঁটতে কার্তিক ভাবতে লাগল, নামটা কেন এমন হল? এখানে খুব পটলের চাষ হয়, এরকম কথা তো কার্তিক জানে না; নাকি এখানকার লোকেরা খুব পটল তোলে। পটল তোলা মানে মরে যাওয়া, সেটা অবশ্য কার্তিক জানে। নদীর এ ধারে শেষ স্টেশন পটল। এর পর স্টিমারটা নদীর পার হয়ে ওধারে চলে যায়। ওখানে সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন থেকে কলকাতার গাড়ি ধরিয়ে দেয়।

কার্তিকের শ্বশুরবাড়িও নদীর ওধারে। স্টিমারের সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশনে নেমে এক স্টেশন পরে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে ঢোকার একটু আগেই পালপাড়া, সেখানেই সাবিত্রীর বাপের বাড়ি।

পালপাড়ায় ট্রেনে না গেলেও চলে। নদীর ঘাট থেকে খুব বেশি রাস্তা নয়। মাত্র কয়েক মাইল হবে, পাড়াগাঁয়ের কথায় দেড়-দু ক্রোশ। রেল লাইন ধরে, কাঠের পাটাতনে পা ফেলে ফেলে বেশ যাওয়া যায়। এ লাইনে ট্রেনের যাতায়াত কম। একটা মেল গাড়ি, আর একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করে। তবে মালগাড়ির যাতায়াত আছে। এদিক থেকে পাট আর মাছ যায় কলকাতায়, কলকাতা থেকে ডাল, মশলা, স্টেশনারি আর বেনের দোকানের জিনিস, কাপড়চোপড় আসে। তবে কোনও ট্রেনই তাড়াতাড়ি চলে না, অতি ধীর শ্লথগতি। জলের দেশের নড়বড়ে ট্র্যাকে জোরে চলার বিপদ রয়েছে।

এখন স্টিমারটা ধরতে পারলে হয়। তারপর ট্রেন না থাকলেও পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।

মুশকিলটা হয়েছে এই যে এই ধানক্ষেতের মধ্যে আলের রাস্তা থেকে ঘাটটা দেখা যায় না। সামনে ডান দিকে মিঞাবাগান গ্রাম, নারকেল-সুপুরি, আম-কাঁঠাল গাছ-গাছালিতে ছাওয়া, মাঝে মধ্যে ছোট-বড় টিনের চালা, খড়ের ঘর, একপাশে পুরনো মসজিদ। মিঞাবাগান গ্রাম নদীর বাঁকটাকে পুরো আড়াল করে রেখেছে। একদম নদীর পার পর্যন্ত না পৌঁছালে ঘাটটা ভাল করে চোখে পড়ে না।

তবে নদীর পাড় খুব কাছে এসে গেছে। পথটা প্রায় মেরে এনেছে কার্তিক। এখানে নদীর বাঁকের মুখে একটু চাপা, অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে এই নদীই ভীষণ চওড়া, একেবারে অকূল পাথার বলা চলে। বর্ষায়, বর্ষার পরে ভাল করে তাকালেও ওদিকের দিগন্ত চোখে পড়ে না। শুধু ঢেউ আর ঘোলা জল।

ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পাখির ঝাঁক উড়ে এসে আলপথে বসছে। খেতের মধ্যে জল জমে আছে বলে সেখানে নামতে পারছে না। অধিকাংশই গাংশালিক, প্রচুর কিচিরমিচির করছে। পথচারীদের তারা ভয় করে না, কার্তিককে আসতে দেখে একটু সরে গিয়ে পথ করে দিল।

নদীর দিক থেকে জোরে বাতাস আসছে। তাতে জলের গন্ধ মেশানো। দুপাশের ধানখেতে হাওয়া মাতামাতি করছে। ধানে এখনও মঞ্জরী আসেনি কিন্তু নতুন শিষে সবুজের মধ্যে সোনার আভাস লেগেছে।

দিনটা ভারী সুন্দর। এখনও একটু ঠাণ্ডা ভাব আছে। আকাশে সূর্য মেঘে ঢাকা, তবে

মেঘ তেমন ঘন কালো নয়। আশেপাশে এলোমেলো কিছু সাদা মেঘও এসে জুটেছে। ঘুড়ি কাটাকাটির মতো আকাশে সাদা কালো মেঘে কাটাকাটি হচ্ছে।

মিঞাবাগানের মসজিদের মাথায় স্টিমারের চোঙার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। স্টিমারটা এখন নিশ্চয় ঘাটের খুব কাছে। কিন্তু ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না, ছেড়ে যাচ্ছে, না ঘাটে এসে ভিড়ছে?

একটু পরেই সংশয়ের অবসান হল। নদীর ধারেকাছে পৌঁছে কার্তিক বুঝতে পারল স্টিমারটা ছেড়ে গেছে। হুশহুশ করে জলে ঢেউ তুলে ফেনা কাটতে কাটতে, মেঘলা আকাশে আরেক পোঁচ ধোঁয়ার আস্তর ছড়িয়ে, স্টিমারটা বাঁকের মুখে আড়াল হয়ে যাচ্ছে। তবু আরও একটু জোরকদমে স্টিমারঘাটে কার্তিক যখন এসে পৌঁছোল তখন ত্রিসীমানায় জলযানটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, এমন কী আকাশের ধোঁয়া আর জলের মধ্যে ফেনার দাগ সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে।

এবার তা হলে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। কিন্তু ঘাট পর্যন্ত এসে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা কার্তিকের মোটেই নেই। বাসায় দুই বউদিদি আছে, কার্তিক ফিরে গেলে তারা খুব হাসাহাসি করবে, বলবে, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে বউ নিয়ে আসার মুরোদ আমাদের ঠাকুরপোর নেই। না হলে কেউ স্টিমার ফেল করে!'

বউদিদিদের উপহাসের ব্যাপারটা রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল কার্তিকের মনের সুতোয় এখন জোর টান দিয়েছে সাবিত্রী।

এই দেড়মাসের বিরহকালে এমনটি আর কখনও অনুভব করেনি কার্তিক। বাড়ির কাজেকর্মে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, কালীবাড়ির বারোয়ারি দুর্গাপুজোর চাঁদা তুলে, সাবিত্রীকে অনেকটা ভুলে ছিল সে।

কিন্তু আজ এই নবীন হেমন্তের বিলম্বিত মধ্যাহ্নবেলায়, সাদা-কালো মেঘে ভরা খোলা আকাশের নীচে ভাঙাচোরা নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে স্টিমার-ফেল কার্তিকের মনটা হু হু করে উঠল। কী যেন পেতে পেতে তবুও সে পাচ্ছে না।

যে কোনও ধরনের শূন্যতা মানুষের মনে একটা অনির্বচনীয় হু হু ভাব সৃষ্টি করে, আজ এই মুহূর্তেও তাই হল। তবে কার্তিক ধরে নিল এ সবই সাবিত্রীর বিরহে।

এখানে একটু আগে শূন্য শব্দটা অবশ্য ঠিকমত ব্যবহার হয়নি। স্টিমার ছেড়ে গেলেও স্টিমারঘাট শূন্য হয়ে যায় না। যেমন স্টেশনে ট্রেন না থাকলেই স্টেশনকে শূন্য বলা যায় না, স্টেশন তখন ফাঁকা থাকে না।

স্টিমারঘাটও আসলে স্টেশন, স্টিমার স্টেশন। স্টিমার ঘাটে না থাকলেও, ভিড়, ব্যস্ততা, হট্টগোল না থাকলেও লোকজন, দোকানপাট থাকে, ঘাটের কর্মচারীরা থাকে।

স্টিমারটা ঘাট থেকে ছেড়ে গেছে বুঝবার পর নদীর ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কার্তিক। কয়েকটা বক সারি বেঁধে নদীর ওপার থেকে এদিকে উড়ে আসছে, সত্যিকারের অকূল পাথার পাখিগুলো কেমন অনায়াসে পার হয়ে আসছে। ধবধবে সাদা বকগুলো খুব নিচু হয়ে উড়ে আসছে, কম্পমান স্রোতের চূড়ায় দ্রুত অথচ অস্পষ্ট ছায়া তীরের দিকে এগিয়ে আসছে।

নদীর জলে ডান দিকে ঘাটের সঙ্গে লেগে ভেসে আসছে একটা গাধাবোট, সেটাই স্টিমার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কাজ করে। গাধাবোটের উপরে স্টিমার কোম্পানির

অফিস। টিকিট কাউন্টার, বড়বাবুর ঘর, মালবাবুর টেবিল। সারেংদের বিশ্রামকক্ষ। মহিলা ও উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়। এ ছাড়াও একটা চায়ের দোকান, পানবিড়ির দোকান রয়েছে।

এখন স্টিমারঘাট ফাঁকা। এমনিতেই পটল স্টেশনে যাত্রী যাতায়াত খুব বেশি নেই। মালপত্রই ওঠানামা করে। তা ছাড়া একটু আগেই জাহাজ ছেড়ে গেছে, এ সময়ে কোনও ব্যস্ততা নেই। গাধাবোটের পাটাতনে কয়েকজন কুলি জাতীয় লোক গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। চায়ের দোকানে এক জোড়া বোষ্টম বোষ্টমী, বোধহয় একটু আগেই স্টিমারটা থেকে নেমেছে, চায়ের গেলাসে এস্-বিস্কুট চুবিয়ে চুবিয়ে খাচ্ছে।

গাধাবোটের সামনে নদীর চরের ওপরে একটা ছোটখাটো সাময়িক বাজার। নদী যেমন নড়াচড়া করে, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় এগিয়ে পিছিয়ে যায়, প্ল্যাটফর্মসমেত গাধাবোটও সঙ্গে সঙ্গে চলে। অসুবিধে এই ঘাটের দোকানগুলোর, গাধাবোটের সঙ্গে সঙ্গে স্থান বদল করতে হয়।

দোকানের সংখ্যা বেশি নয় দুটো হিন্দু হোটেল, তার মধ্যে আবার একটা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল। একটা মুসলিম হোটেল, তার সাইনবোর্ডে চাঁদতারা আঁকা। আর সেই সঙ্গে পাশাপাশি কয়েকটা মিষ্টির দোকান। দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম। হাতে গড়া বড় বড় আটা-ময়দা মেলানো রুটিও পাওয়া যায়। চার আনা দিয়ে দুটো বড় রসগোল্লা কিনলে সঙ্গে প্রচুর ঘন লাল রঙের রস ফাউ, এক আনা দামের দুটো রুটির সঙ্গে খেলে সারাদিনের মতো পেট পুরে যায়, মাত্র পাঁচ আনায়।

তবে রসগোল্লা নয়, এখানকার দই আর চমচম বিখ্যাত। স্টিমার এসে ঘাটে লাগলেই মিষ্টির দোকানের ছোকরা কর্মচারীরা দই আর চমচমের হাঁড়ি হাতে নদীর মধ্যে কোমরজলে নেমে যায়, স্টিমারের প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করে, 'ঘন দই, লাল চমচম।'

গাধাবোট পেরিয়ে এসে কার্তিক ভাতের হোটেলগুলো ছাড়িয়ে সুরজলাল তেওয়ারির মিষ্টির দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চটায় বসে পড়ল।

মিষ্টান্ন ব্যবসায় সুরজলালের সুনাম আছে। সুদূর বিহারের ছাপরা জেলা থেকে এসে জ্ঞাতিগোষ্ঠীসমেত তেওয়ারিরা পূর্ববঙ্গের গঞ্জে-বাজারে, বন্দর শহরে একশো বছর ধরে মিষ্টির ব্যবসা করছে।

সুরজলাল কার্তিককে চেনে কার্তিকের ছোটবেলা থেকে। কার্তিকের বাবা দশরথ সরকারের চিনি-গুড়-বাতাসা-কদমার দোকান আছে ভুয়াপুর বাজারে। ভুয়াপুর বনেদি গ্রাম, বাজারটাও বেশ বড়। সেই বাজারে খুব পুরনো দোকান সরকারদের, প্রায় পাঁচ-সাত পুরুষের ব্যবসা।

সুরজলালের দোকানে মাসে প্রায় দু-আড়াই মণ চিনি লাগে, আগে পুরোটাই কেনা হত ভুয়াপুর বাজারে সরকারদের দোকান থেকে। এখন নদীর ওপারে সিরাজগঞ্জ পাইকারি বাজারে গেলে মণ প্রতি অনেকটা সাশ্রয় হয় নৌকোভাড়া দিয়েও। কিন্তু সরকারের সঙ্গে এখনও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে সুরজলালের। এই তো সেদিন কার্তিকের বিয়েতে দই-রসগোল্লা দিয়েছিল সুরজলাল শুধু তৈরি করার খরচায়, এক পয়সাও লাভ নেয়নি। তদুপরি কার্তিকের বউয়ের মুখ দেখেছিল কোমরে পরবার রুপোর

এক ছড়া ভারী হিন্দুস্থানি গোট দিয়ে।

কিন্তু সুরজলাল আজ দোকানে নেই। সে দেশে গেছে ভাতিজার বিয়েতে।

একথা শুনে বিজ্ঞের মতো কার্তিক বলল, 'আশ্বিনমাসে আবার বিয়ে কীসের?'

সুরজলালের দোকানের দায়িত্বে রয়েছে হালুইকর গদাধর ঘোষ। সবাই তাকে ঠোঁট-কাটা গদাই বলে। সে খুবই মিতভাষী, সে ঠোঁটকাটা বিশেষণ পেয়েছে সত্যিই তার ওপর পাটির ডান ঠোঁটটা মাঝামাঝি বরাবর কাটা বলে।

কার্তিকের গোলমেলে প্রশ্ন শুনে ঠোঁট কাটা গদাই বলল, 'পশ্চিমারা আশ্বিন মাসটাস মানে না।' এ অঞ্চলে বিহারি সমেত সবাই যারা হিন্দি বলে সকলেই 'পশ্চিমা'।

শ্বশুরবাড়িব জন্যে এক হাঁড়ি দই আর এক হাঁড়ি চমচম কিনবে কার্তিক। তার আগে তার যেটা জানা দরকার পরের দিনের স্টিমারের আগে নদী পার হওয়ার কোনও উপায় আছে কি না আজকের মধ্যেই। সে খবর তার খুব দরকার হয়ে গেছে।

স্টিমার যাতায়াত রেলের মতো নয়, এর মধ্যে একটা গড়পড়তা সময় আছে, তা ছাড়া একটা মানসিকতা আছে, নদীর তীরের গ্রামের মানুষদের এক-আধদিন এদিক ওদিক হলে কী-ই বা আসে যায়।

সেদিনও কার্তিকের মতো স্টিমার ফেল করা লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে দশ এগারোজন হল। এই সময় একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। ওপাশে মফিজ হাজির ঘাটে একটা সিরাজগঞ্জের গয়নার নৌকো আছে। ঘণ্টা দুয়েক পরে সিরাজগঞ্জে ফিরতে পারে যদি জনা পনেরো যাত্রী হয়ে যায়।

মফিজ হাজির ঘাট এখান থেকে সিকি মাইল হবে, সেটাই নৌকো পারাপারের ঘাট। ঘাটের ইজারাদার মফিজ হাজির নামে ঘাটের নাম। স্টিমার কোম্পানির ঘাটে স্টিমার থামলে নৌকো ভিড়তে দেয় না, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তা ছাড়া কিছুটা মাতব্বরিও আছে।

সুরজলালের মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে মাফিজ হাজির ঘাটটা স্পষ্ট দেখা যায়, বেশ কয়েকটা নৌকো ঘাটে লেগে রয়েছে। ওই দিকে এগোবে ভাবছিল কার্তিক এমন সময় দেখল একটা গয়নার নৌকো এদিকে আসছে ওই ঘাট ছেড়ে। নৌকোটা এসে গাধাবোটটার থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল।

জানা গেল এই গয়নার নৌকোটাই সিরাজগঞ্জ ফিরবে। তবে একটু দেরি হবে। তার মানে সিরাজগঞ্জ পৌঁছাতে রাত হবে। তা হোক, অন্য একটা বড় সুবিধে রয়েছে, নৌকোটা সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন পেরিয়ে বাজারে স্কুলঘাট পর্যন্ত যাবে। কার্তিককে অন্ধকারে রেল লাইন ধরে যেতে হবে না; বর্ষার শেষ, নানা রকম সাপখোপের উপদ্রব আছে। স্কুলঘাটে নেমে মাইলখানেক হাঁটলেই পালপাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে যাবে।

গয়নার নৌকো এক ধরনের বড় যাত্রী নৌকো, বাঁশের গোল ছই দিয়ে ঢাকা শক্তসমর্থ জলযান, লগি, বৈঠা ছাড়াও পালের ব্যবস্থা আছে, গুন টানার বন্দোবস্ত আছে, যখন যেমন প্রয়োজন। মাঝিরা অভিজ্ঞ। দূর দূর পথ, লম্বা নদী অনায়াসে পার হয়ে যায় গয়নার নৌকো। ছইয়ের ভিতরে, বাইরে, উপরে তিরিশ চল্লিশজন যাত্রী ধরে, অনেক সময় গাদাগাদি করে পঞ্চাশ পেরিয়ে যায়। অনেকটা প্যাসেঞ্জার বাসের মতো নির্দিষ্ট রুটে চলে এবং যাত্রীর লোভে সময় একটু এদিক ওদিক করে ফেলে। তবে একটা বড় কথা এই যে

গয়নার নৌকো নদীতে ডুবে গেছে এমন কথা বিশেষ শোনা যায় না, সেদিক থেকে যথেষ্টই নিরাপদ।

গয়নার নৌকোটা ঘাটে বেঁধে দুয়েকজন ছাড়া বাকি মাঝিমাল্লারা নৌকো থেকে নেমে এদিক ওদিক চলে গেল। বলে গেল চারটের সময় নৌকো ছাড়বে। তা ছাড়ুক, তাতে কার্তিকের কোনও আপত্তি নেই। তা হলেও সে রাত আটটার মধ্যে স্কুলঘাটে পৌঁছে যাবে। সাবিত্রীদের ওখানে পৌঁছাবে রাত সাড়ে আটটায়, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পক্ষে সেটা খুব বেশি রাত্রি নয়।

আসলে গয়নার নৌকোর মাঝিরা দেরি করছে আরও যাত্রী পাওয়া যাবে এই আশায়। আশাটা মোটেই অন্যায় নয়। সবাই লাভ করতে চায়।

একবার কার্তিক ভেবেছিল গদাইয়ের কাছ থেকে দই-চমচম কিনে নিয়ে গয়নার নৌকোয় গিয়ে উঠে বসবে। কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ নৌকোর মধ্যে একা একা থাকা কার্তিকের পছন্দ নয়, তা ছাড়া ছইয়ের মধ্যে একটু গুমোটও হবে। মেঘ সরে গিয়ে এখন একটু রোদের ভাব দেখা যাচ্ছে। আশ্বিন মাস হলেও এই পড়ন্তবেলায় তাপটা চড়া ঝাঁঝের।

বরং এই ঘাটের ওপরে একটা উটকো যজ্ঞডুমুর গাছের নীচে সুরজলালের মিষ্টির দোকানের ঝাঁপের ছায়ায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে নদীর ফুরফুরে হাওয়াটা সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে; এই জায়গাটাই ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রামের পক্ষে ভাল।

সুটকেসটা মাথায় দিয়ে, হাতের বোঁচকাটা বেঞ্চির নীচে রেখে শুয়ে পড়ল কার্তিক কাঠের বেঞ্চির ওপরে। এখন কেনাবেচা নেই, খদ্দেরও আসছে না, কোনও আপত্তি করল না গদাই। তা ছাড়া দোকানের ভিতরে আরও একটা বেঞ্চি আছে, দুটো কাঠের চেয়ার আছে।

শোয়ার আগে গদাইকে খুশি করার জন্যে কার্তিক দরকারি কাজটা সেরে রাখল, এক হাঁড়ি দই আর দেড় সের চমচম কিনল। হাঁড়ি দুটো গদাইয়ের কাছে রাখল, নৌকোয় ওঠার সময় নিয়ে নেবে।

এর মধ্যে অবশ্য কার্তিক নিজেও দুটো চমচম খেয়ে নিল। খাঁটি ছানার তৈরি লালচে, চৌকো আকারের বড় বড় মিষ্টি, ভিতরে মধুর মতো গাঢ় রস, ওপরে বরফের গুঁড়োর মতো ক্ষীরের সাদা দানা ছড়ানো। এখানে থালা-প্লেটের বন্দোবস্ত নেই। সবুজ পদ্মপাতায় মিষ্টি দুটো দিয়েছিল, পাতার ওপরে চুঁইয়ে পড়া রস আর ক্ষীরের গুঁড়ো আঙুল দিয়ে চেটেপুটে খেয়ে কার্তিক এক গেলাস জল খেল, তারপরে সুটকেসে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এখানে অবশ্য একটা ভাল যাওয়ার জায়গা ছিল কার্তিকের, ছয়মাস আগেও ছিল। ইচ্ছে করলে এখনও যাওয়া যায়, ইচ্ছে করছেও কিন্তু যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ের পরে এখন আর সেখানে যাওয়া উচিত নয়।

নদীর ঘাট থেকে একটা পায়ে চলার পথ এই মিষ্টির দোকানগুলোর পাশ দিয়ে উলুঝোপ আর কাশবনের মধ্যে দিয়ে উঠে গেছে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তায়।

ঠিক কাঁচা রাস্তার মুখোমুখি শ্মশানকালীর থান। মন্দির-টন্দির নয়, খড়ের চালাঘরে মাটির কালীপ্রতিমা। দশগাঁয়ের লোক এখানে এই নদীর তীরে মড়া পোড়াতে আসে,

তাদের জন্যে এই বারোয়ারি থান। থানের চালাঘরের মধ্যে মাকালীর প্রতিমার দুপাশে কয়েক আঁটি খড় বিছানো আছে, শ্মশানবন্ধুরা দরকারে শুতে পারে।

শ্মশানকালীর থান একটা প্রাচীন পঞ্চবটির নীচে। ওই পঞ্চবটিই নাকি বহুযুগ ধরে নদীর ভাঙন ঠেকিয়ে চারদিকের গ্রামগুলোকে রক্ষা করে আসছে। কবে নাকি ওখানে পাঁচটা গাছ ছিল, অশ্বথ, বট, অশোক এইসব। এখন শুধুমাত্র একটা আমলকি গাছ আছে; আরেকটা কোমরভাঙা মুখ থুবড়ে পড়া বেলগাছ। চারপাশের নীচেটা ঘিরে বুনোতুলসীর জঙ্গল।

শ্মশানকালীর থানের গা ঘেঁষে, ছোট টিনের দোচালা, তার গায়ে নোটিসবোর্ড,

গাঁজা ভাং ও আফিমের দোকান।

প্রোপাইটর : হরেরাম সাহা।

লাইসেন্স নং : ১৭৪/৩৩ (ময়মনসিং)।

হরেরামবাবু অবশ্য বলেন, তাঁদের এই লাইসেন্স পুরুষানুক্রমিক, দুশো-আড়াইশো বছরের সেই পচার আমল থেকে।

সে যাই হোক হরেরামবাবু তাঁর দোকানে গাঁজা-ভাং ছাড়াও কাঠের আলমারির মধ্যে দুচার বোতল দিশি মদ রাখেন, দুয়েক বোতল আসল বিলিতিও, জনি ওয়াকার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। নদীপথে সাহেবসুবো যাতায়াত করেন, কখন কার কি দরকার পড়ে কে জানে। কেউ যদি হরেরামকে প্রশ্ন করে আপনার মদ বেচার লাইসেন্স আছে, হরেরাম বলেন, 'আমার গাঁজার লাইসেন্স আছে, মদ গাঁজার মধ্যেই পড়বে।'

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা শ্মশানকালীর থানের ওপাশে, পুরনো পঞ্চবটির নীচে হরেরামের কয়েকটা চালাঘর রয়েছে। সেগুলোও নাকি নবাবি আমলের, তখন নাকি এগুলো তাঁবুঘর ছিল। রায়বাগান রাজবল্লভ খানের এক খাজাঞ্চির গোমস্তা ছিলেন হরেরামের এক পূর্বপুরুষ। একদা ঘোর দুর্দিনে পানসি নৌকোয় করে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁবুসুন্দরীদের এই সুদূর যমুনাতীরে গঙ্গাতীর থেকে। না হলে সুন্দরীদের মারাঠারা নিয়ে চলে যেত।

সেই থেকে সুন্দরীদের নিবাস এখানে। নদীপথে রাজারাজড়া, বণিক-আমলা, ফিরিঙ্গি-হিন্দুস্থানী হরেক রকম যাত্রী যায় আসে, দশকের পর দশক পেরিয়ে যায়, শতাব্দী পার হয়ে যায়। সবাই জানে এখানে এই নদীর বাঁকে জলপরীদের আস্তানা। যমুনার বুকে ভাসমান জলযান থেকে গভীর রাতে নূপুর-নিক্কণ আর তবলার বোল শোনা যায়।

আগে নাকি খুবই রমরমা ছিল। চারদিকে সুখ্যাতি ছিল এখানকার সুন্দরীদের। এখন খুবই পড়তি অবস্থা। লোকজন নদীপথে যাওয়া-আসা কমই করে। পাশের চালাঘরগুলো অর্ধেকই ফাঁকা। সবসুদ্ধ সাত ঘর চালু আছে এখনও।

এরই এক ঘরে থাকে বুলবুল। বিয়ের আগে কখনও-কখনও রাত-বিরেতে বুলবুলের ওখানে থেকেছে কার্তিক। কারবারের চিনিগুড় কেনাবেচা সেরে এ গঞ্জ সে গঞ্জ থেকে ফেরার পথে বুলবুলের ওখানে থেকে গেছে দুয়েকদিন।

অনেকবার এসে এসে বুলবুলের সঙ্গে শুধুই শারীরিক সম্পর্ক নয়, একটা বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল কার্তিকের। বুলবুলের রং ফর্সা নয়, চোখ দুটোও ছোট ছোট; কিন্তু মুখটা খুব ঢলঢলে, চলন-বলনও মাদকতাময়। বিশেষ করে তার হাতের লাল শাঁখা, কপালের

সিঁদুর, পায়ে আলতা আর পানের রসে রাঙানো ঠোঁট। সব মিলে ডগমগ বুলবুল। খারাপ মেয়ে হলেও বুলবুলের একটা আবরুবোধ আছে, মাথায় ঘোমটা না দিয়ে ঘরের বাইরে আসে না। শাঁখা, সিঁদুর, ঘোমটা এসব নিয়ে অন্য ঘরের মেয়েরা বলে, 'ন্যাকামি'। তা ন্যাকামি হলেও সেটা বুলবুলকে মানায়।

সুরজলালের দোকানের বেঞ্চিতে শোয়ার আগে কার্তিক একবার বুলবুলের কাছে যাওয়ার কথা ভেবেছিল। কিন্তু বিয়ের আগে থেকে সে আর এদিক মাড়ায়নি। আর এখন সাবিত্রীকে আনতে যাওয়ার পথে বুলবুলের ঘরে যাওয়া উচিত হবে না।

সুটকেসটা মাথায় দিয়ে নদীর ঝিরঝির বাতাসে একটু সুখতন্দ্রার মতো এসেছিল কার্তিকের। একটা দরজা ধরে একটি মেয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটির মুখের আদল অনেকটা সাবিত্রীর মতো, অনেকটা বুলবুলের মতো—হঠাৎ ঘুমের চটকাটা কেটে যেতে কার্তিকের স্বপ্নটা উবে গেল।

ঘুম থেকে উঠে কার্তিক বুঝতে পারল যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। এবং অন্তত পক্ষে ঘন্টাখানেক ঘুমিয়েছে। এই সময়ে তার খেয়াল হল মাথার নীচে সুটকেসটা ঠিকই আছে, কিন্তু বেঞ্চের নীচে বোঁচকাটা নেই। কার্তিক চারদিকে তাকাতে লাগল, গদাইকেও দেখতে পাচ্ছে না।

এমন সময় এক মাথা সমান উঁচু কাশঝোপের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা থেকে গদাই এল। এসে বলল, 'মাঠে গিয়েছিলাম', মাঠে মানে প্রকৃতির ডাকে। গদাইকে সরাসরি কার্তিক বলল, 'আমার বোঁচকাটা কী হল?'

গদাই আকাশ থেকে পড়ল, 'তোমার সঙ্গে বোঁচকা ছিল একটা। কই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এখানে এই দোকান পর্যন্ত এনেছিলে?'

কথা না বাড়িয়ে কার্তিক সুরজলালের দোকান থেকে উঠল, গদাইকে বলে গেল, 'দই-মিষ্টি রইল। নৌকোয় ওঠার সময় নিয়ে নেব।'

সুটকেস হাতে হনহন করে হেঁটে কার্তিক গিয়ে উঠল ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায়, সেখান থেকে পঞ্চবটির পাশ দিয়ে এগিয়ে একেবারে বুলবুলের ঘরের দরজায়। এখানেই সোজা চলে আসা উচিত ছিল, গদাইয়ের দোকানে থাকাটাই ভুল হয়েছে। অত কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে জিনিসগুলো কেনা, সব চুরি গেল।

বুলবুলের ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে কেউ আছে নাকি? এতদিন পরে এসে কার্তিকের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু ভরসা করে কাঠের দরজার ওপরের দিকে লোহার শিকল ধরে একটু নাড়া দিল।

দুবার নাড়া দিতেই ঘুম চোখে অবিন্যস্ত শাড়ি গোছাতে গোছাতে ভেতর থেকে দরজা খুলল বুলবুল। প্রথমে কার্তিককে ঠাহর করতে পারেনি বুলবুল, তারপর চোখ কচলিয়ে সামনে কার্তিককে দেখে হাসিমুখে তাকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের মধ্যে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে কার্তিক বলল, 'এই অবেলায়, বিকেলে ঘুমোচ্ছিলে?' খিল খিল করে হেসে বুলবুল বলল, 'আমাদের আবার সকাল-বিকেল, দিন-রাত।'

ছেঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো আসছে কিন্তু বাইরে থেকে এসে

কার্তিকের ঘরের ভেতরটা আবছায়া মনে হচ্ছিল। বুলবুল আবার বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। বুলবুল কি একটু রোগা হয়ে গেছে?

বিছানায় বুলবুলের পাশে বসতে যাচ্ছিল কার্তিক। বুলবুল জিজ্ঞাসা করল, 'বউ কেমন হয়েছে?' কী আর বলবে কার্তিক, চুপ করে রইল। তার বিয়ের কথা নিশ্চয় অন্য কারও কাছে শুনেছে বুলবুল।

কার্তিকের জবাব না পেয়ে বুলবুল পাশ ফিরে শুতে শুতে কার্তিককে আবার প্রশ্ন করল, 'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

গোপন করার মানে হয় না, সাবিত্রীকে নিয়ে ফেরার পথে ঘাটেই হয়তো বুলবুল দেখতে পাবে, তাই বলল, 'বউকে আনতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, সিরাজগঞ্জে।'

বুলবুল কী বুঝল কী জানি, কার্তিককে বলল, 'তুমি বিছানা থেকে নেমে ওই মোড়াটায় গিয়ে বোসো। আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নিই। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বোকার মতো কার্তিক বিছানা থেকে উঠে এসে মোড়ায় বসল। বুলবুল পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগল।

একটু পরে ঘরের মধ্যের অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে কার্তিক চেনা ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগল, এই কয় মাসে কিছু পরিবর্তন হল কি না। বুলবুলকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ কার্তিকের নজরে গেল তাকের ওপরে রাখা কয়েকটা জিনিসের দিকে। বাঁশের বেড়ার সঙ্গে কাঠের তাক, তার এক পাশে মাঝারি আকারের একটা আয়না।

কার্তিক দেখতে পেল কাঠের তাকের ওপরে রাখা রয়েছে, দুটো চন্দন সাবান, আলতা, তেল, চুলের ফিতে। যা কিছু সে কিনেছিল সাবিত্রীর জন্যে সবই এখানে পৌঁছে গেছে। এমন কী তার ব্যবহারের গামছাটা যেটা দিয়ে বোঁচকা বাঁধা হয়েছিল, সেটাও বাঁশের বেড়ায় বাতার ফাঁকে গোঁজা রয়েছে। শুধু নতুন জুতো জোড়া নেই। যে এগুলো দিয়ে গেছে, জুতোজোড়া সে নিশ্চয় তার নিজের ব্যবহারের জন্যে নিয়ে গেছে।

কার্তিক উঠে গিয়ে তাকের থেকে জিনিসগুলো হাত দিয়ে নামিয়ে পকেটে পুরে নিল, গামছাটাও নিল। সুটকেসটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, একবার পিছনে ফিরে বুলবুলের দিকে তাকাল।

বুলবুল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তার সুঠাম দেহ আন্দোলিত হচ্ছে। ঠোঁটে গালে কয়েকটা ঘামের ফোঁটা অল্প আলোয় ঝলমল করছে।

থমকিয়ে দাঁড়াল কার্তিক। তারপর তাকের কাছে গিয়ে পকেট থেকে বার করে একটা চন্দন সাবান, আলতার শিশিটা সেখানে রেখে দিল। মাথার তেল আর একটা সাবান সাবিত্রীর জন্যে থাক। চুলের ফিতেটা ভাগ্যিস বড় কিনেছিল, এখন সমান করে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল, অর্ধেক রইল বুলবুলের জন্যে।

এবার আস্তে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল।

এখন তাড়াতাড়ি যেতে হবে। গদাইয়ের দোকান থেকে মিষ্টির আর দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে গয়নার নৌকোয় উঠতে হবে।

খুব দেরি হয়নি। নৌকোটা নিশ্চয়ই এখনও ছাড়েনি।

বিমান কাহিনী

সার্থকনামা মানুষ বিমানচন্দ্র। তাঁর পদবী এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে প্রয়োজনীয় নয়। শুধু বিমানচন্দ্র লিখলেই চলবে। বিমানচন্দ্রের বয়েস, মাত্র দু-এক বছর আগে, পঞ্চাশের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। চর্বিহীন, সুন্দর সুগঠিত দেহ। তাঁকে যুবক না বললেও বৃদ্ধ, এমনকী প্রৌঢ় বলাও সঙ্গত হবে না। একটিও চুল পাকেনি, একটিও দাঁত নড়েনি। ঋজু, দীর্ঘ শরীর।

বিমানচন্দ্র জন্মেছিলেন সেই চল্লিশের দশকের গোড়ায় কলকাতার শহরতলিতে জাপানি বোমার বছরে। কলকাতার আকাশে তথাকথিত শত্রুপক্ষের, মিত্রপক্ষের বিমানের ক্ষিপ্র আনাগোনা। সাইরেন, ট্রেঞ্চ। দু-চারটি বোমা, দু-দশটি মৃত্যু। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিমানযুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনী। ভীত, সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা শহর থেকে শহরতলিতে পালাচ্ছে, শহরতলি থেকে গ্রামে। ভয় যতটা ছিল, ভয়ের কারণ ততটা ছিল না। জাপানি বিমানের বোমাবর্ষণে কলকাতায় সবসুদ্ধ যত লোক মারা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক মারা যায় যে কোনও সময় নৌকোডুবিতে বা বাসদুর্ঘটনায়। এমনকী কখনও-কখনও কলেরা বা টাইফয়েডে প্রতি সপ্তাহে তার চেয়ে বেশি লোক মারা যেত তখনকার কলকাতায়।

সে যাই হোক, সেই বিমানযুদ্ধের বছরে কলকাতায় যেদিন প্রথম বোমা পড়ল, তার পরদিন ঘুঘুডাঙায় পৈতৃক ভদ্রাসনে বিমানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অবশ্য ভবানীপুরে মাতুলালয়ে জন্মানোর কথা ছিল। কিন্তু জাপানি বিমানের আক্রমণের ভয়ে বিমানচন্দ্রের পিতামহ পুত্রবধূকে তার পিত্রালয়ে পাঠাননি। পাঠিয়েও কোনও লাভ ছিল না। কিছুদিন আগেই তাঁরা, অর্থাৎ বিমানচন্দ্রের মাতুল বংশীয়েরা, ভবানীপুরের বাসাবাড়ি তালাবন্ধ করে খুলনায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে বিমানচন্দ্রের জন্ম। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পিতামহ তাঁর বিমান নামকরণ করেন। বিমানচন্দ্র ভাল ছাত্র ছিলেন। পরে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সেখান থেকেই বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি সংগ্রহ করেন। চাকরিসূত্রে বিমান বহুদিন বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি খোলামেলা অর্থনীতির হাওয়ার সুবাদে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর কোম্পানি দিল্লিতে একটি শাখা স্থাপন করেছে। সেখানেই উচ্চপদে তিনি আসীন হয়েছেন।

বিমানবাবু যে কোম্পানিতে কাজ করেন, তাঁদের বিমার ব্যবসা। সেও সাধারণ বিমা বা জীবনবিমার কারবার নয়, বিমানবিমার কারবার।

বিমানপথে যাত্রী, মালপত্র সব কিছুরই বিমা করা হয়ে থাকে। বিমান দুর্ঘটনা হলে কারও যদি মৃত্যু হয়, তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নিকটজনকে। শারীরিক ক্ষতি, অঙ্গহানি ইত্যাদি হলেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিমানযাত্রীর মালপত্র হারিয়ে গেলে তার জন্যেও যাত্রীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

বিমানচন্দ্রের কাজ হল তদন্ত করা। এই রকম প্রতিটি ক্ষেত্রে যাত্রীটির আঘাত কতটা গুরুতর কিংবা জিনিসপত্র খোয়া গেলে সত্যিই খোয়া গেছে কি না, নাকি মিথ্যে করে

ক্ষতিপূরণ চাওয়া হচ্ছে আর সত্যিই যদি খোয়া গিয়ে থাকে, সেইসব জিনিসের মূল্যমান কত—বিমানচন্দ্রকে অকুস্থলে গিয়ে সরজমিন তদন্ত করে কোম্পানিকে রিপোর্ট দিতে হয়। আর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁর কোম্পানি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে।

রীতিমত কঠিন কাজ। বিমানচন্দ্রকে অনবরতই ছোটাছুটি করতে হয় ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

আজকাল বিমান দুর্ঘটনা খুব বিশেষ একটা হয় না। কিন্তু মালপত্র খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা হামেশাই ঘটছে। দিল্লিতে ব্রেকফাস্ট, কলকাতায় লাঞ্চ আর লাগেজ মাদ্রাজে, বিমানযাত্রীদের এ রকম ঝামেলা প্রায়ই পোহাতে হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দু-চারদিন পরে মালপত্র যথাস্থানে ফিরে আসে। তখন ঝামেলা মিটে যায়। বহুক্ষেত্রেই ঝামেলা এত সহজে মেটে না, অনেক সময় মাল ফেরত পেয়ে যাত্রী বলে, 'আমার সুটকেসটা পেয়েছি, কিন্তু ভেতরের জিনিসপত্র কিছু নেই।'

এসব ক্ষেত্রে বিমানকে ছুটতে হয়। যথাস্থানে পৌঁছে যাত্রীকে খুঁজে বার করেন, তাঁর কাছে জানতে চান, 'সুটকেসের মধ্যে কী কী জিনিস ছিল?'

যাত্রী তখন বলেন, 'জামা-কাপড় ছিল, অফিসের কাগজপত্র ছিল, পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, সাঁইবাবার ফটো ছিল, আমার শ্বশুরমশায়ের বাঁধানো দাঁতজোড়া ছিল।'

বিভ্রান্তের মতো বিমান জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার শ্বশুরমশায়ের বাঁধানো দাঁত প্লেনে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন?'

অদমিত প্যাসেঞ্জার সাহেব জবাব দেন, 'আমার শ্বশুরমশায় আগে পাটনায় পোস্টেড ছিলেন কিনা। সেখানেই দাঁত বাঁধিয়েছিলেন। আমি পাটনায় আসছি শুনে দাঁতজোড়া আমাকে দিয়ে বললেন, তাঁর পুরনো ডেন্টিস্টকে দিয়ে সেটা মেরামত করিয়ে নিয়ে আসতে। এখন বলুন তো শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাই কী করে, আমার এই বেইজ্জতির খেসারত আপনি দেবেন?' উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বোম্বাই-মাদ্রাজ ফ্লাইটের বাথরুমে এক চিত্রতারকার উইগ চুরি গিয়েছিল। কী করে গিয়েছিল বলা কঠিন। কিন্তু সেই সুন্দরীকে ন্যাড়ামাথা ঢাকতে স্কার্ট তুলে ঘোমটা দিতে হয়েছিল। এভাবে কোনও সিনেমায় অবতীর্ণ হলে দর্শকসাধারণ লুফে নিতেন, কিন্তু বিমানের ভিতরে সে-এক হাস্যকর অবস্থা। সবার দৃষ্টি তাঁর দিকে। অবশেষে খবরের কাগজ দিয়ে টুপি বানিয়ে বিমান থেকে অবতরণ করেন। আর দুঃখের কথা এই যে, তাঁর সঙ্গেই সুটকেসের মধ্যে আরও পাঁচটি উইগ ছিল কিন্তু সেগুলো ছিল বিমানের খোলের মধ্যে এবং মাদ্রাজে নামার ঘণ্টাখানেক বাদে যখন সুটকেসটা পেলেন, সেটার মধ্যে থেকে উইগসমেত অন্যান্য সব জিনিস হাওয়া হয়ে গেছে। বিমানচন্দ্র আযৌবন বিদেশে ছিলেন। সেই উনিশ বছর বয়সে বি. এসসি. পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি মার্কিন দেশে স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কালেভদ্রে ছুটি-ছাটায় দেশে, মানে কলকাতায় এসেছেন। এতদিন পরে আবার স্বদেশে দিল্লিতে ফিরে এসে তিনি কিঞ্চিত ইতস্তত বোধ করছেন। দু-চারদিনের জন্যে অল্পবয়সের কলকাতায়ও তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন, কী যেন মিলছে না। এমনকী নতুন কলকাতা তাঁর সেই পুরনো কলকাতার চেয়ে ভাল কি খারাপ, সেটাও বিমানচন্দ্র বুঝতে পারলেন না। মনে মনে মেনে নিলেন হয়, হয়, জীবনে এরকম হয়, হয়ে থাকে।

কিন্তু তিনি মেনে নিতে পারছেন না বিমানবিমা সম্পর্কিত তাঁর অভিজ্ঞতাগুলো।

বিমানচন্দ্রের বিমানবিমা কোম্পানির খদ্দেরদের অভিযোগ হাজার রকম। দুটি উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে, দু-একটি উল্লেখযোগ্য—

১) সর্দার মস্ত সিং দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় বিমানে গিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, বিমানের মধ্যে আবহচাপ অত্যন্ত বেশি ছিল। তিনি যে পাগড়ি মাথায় দিয়ে দিল্লি থেকে টানটান প্লেনে উঠেছিলেন, সেই পাগড়ি ঢিলে হয়ে, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে রিসিভ করতে আসা তাঁর নবযৌবনা, অবিবাহিতা শ্যালিকার পদপ্রান্তে পড়ে যায়।

২) একজন দিল্লি প্রবাসী বাঙালি লেখক দিল্লি থেকে তাঁর সদ্যরচিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কলকাতায় প্রকাশকের কাছে নিয়ে আসছিলেন, পাণ্ডুলিপিটি একটি খামের মধ্যে ছিল। খুব সাবধানে, অতি সন্তর্পণে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বেরনোর সময়, সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি ছিনতাই হয়।

অবশ্য এই ধরনের অধিকাংশ কেসই বিমা ক্ষতিপূরণের আওতায় আসে না। কিন্তু এই সব বিচিত্র ক্ষতিপূরণের কেসের তদন্তের সূত্রে বিমানবাবুকেও সারা দেশে অনবরত ঘুরপাক খেতে হয়।

বিমানবাবু নিজেও একজন ভুক্তভোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিমানভ্রমণের। তাঁর অবশ্য জিনিসপত্র হারায় না। সে-বিষয়ে তিনি খুব সাবধান। ছোট একটা বহনযোগ্য হাতব্যাগে কিছু জামা-কাপড়, তোয়ালে, দাড়ি কামানোর জিনিস, টুথব্রাশ নিয়ে তিনি যাতায়াত করেন, সেটা সঙ্গেই রাখেন।

দীর্ঘকাল বিদেশে থাকায় একটু খুঁতখুঁতে স্বভাব হয়েছে বিমানবাবুর। তিনি সর্বদাই সচেতন থাকেন যে এ দেশটা বিলেত বা আমেরিকা নয়, কিন্তু সবসময় সামলিয়ে উঠতে পারেন না।

এ দেশে যাঁরা নিয়মিত বিমানযাত্রী, তাঁদেব অভিজ্ঞতা থেকে বিমানচন্দ্রের অভিজ্ঞতা মোটেই স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু এখনও তিনি মানিয়ে উঠতে পারেন নি।

বিমান চলাচল সম্পর্কে যেগুলো সাধারণ অভিযোগ—যেমন ঠিক সময়ে ছাড়ে না, পাইলট সাহেব আসেননি কিংবা কলকব্জা খারাপ, রানওয়েতে শকুন নেমেছে, লাটসাহেবের শ্যালিকা এখনও এসে পৌঁছয়নি, বিমানে বোমা রাখা আছে, বোর্ডিং পাশের তুলনায় যাত্রীর সংখ্যা একজন কম, কুড়ি-বাইশটি নারকেল ভর্তি একটি চটের বস্তার মালিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাস্তব-অবাস্তব নানারকম অজুহাত।

আর অজুহাতই বা কে দিচ্ছে। বিমান ছাড়ছে না, ছাড়বে না। যাচ্ছে না, যাবে না।

বিমানে ওঠার পর বিমান না ছাড়লে আরও কষ্ট। গরম, ঘাম, তৃষ্ণা, গলা শুকিয়ে ওঠা, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া দমবন্ধ ভাব। এ রকম অবস্থায় একবার সিট থেকে উঠে বিমানচন্দ্র সামনের পর্দাঘেরা জায়গাটায় গিয়েছিলেন এক গ্লাস জল কিংবা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের অনুসন্ধানে। কিন্তু পর্দা সরাতেই যে দৃশ্যটি তাঁর নজরে আসে, তাতে কিছু না চেয়েই তড়িদাহতের মতো তিনি সিটে দ্রুত ফিরে আসেন। অবশ্য সেই দৃশ্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীরাও বিমানবাবুর এই অনধিকার প্রবেশে কম চমকিত হয়নি।

বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হয়েছে বিমানচন্দ্রের। কিন্তু

গত সপ্তাহে পাটনায় যা হয়েছে তার কোনও তুলনা নেই।

বিমানবাবুকে গৌহাটি এয়ারপোর্টে প্লেনের মধ্যে হাজার হাজার মশায় কামড়ে ছালাফালা করে দিয়েছে। মাদ্রাজে প্লেনে ওঠার সময় সিঁড়ি ভেঙে পড়ে হাঁটু মচকিয়েছেন। একবার বাগডোগরায় প্লেন থেকে নামামাত্র একটা শুয়োর কোথা থেকে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। শুয়োরটার বোধহয় মাথা খারাপ ছিল। কিংবা কাকে, কেন সে আক্রমণ করছে সেটা সে জানত না। বিমানবাবুর ভাগ্য ভাল, দাঁত দিয়ে ফুলপ্যান্টের নীচের দিকটা কামড়ে ধরে শুয়োরটা একবার মাথা উঁচু করে বিমানবাবুকে দেখেই কামড় ছেড়ে দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

দুর্ভোগের ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু পাটনায় যা ঘটল, সেটা অকল্পনীয়। বিমানচন্দ্র প্লেনে উঠে সিটে বসার আগে মাথার ওপরেব বাঙ্কে একটা আমের ছোট ঝুড়ি রাখতে গেছেন। পাটনায় এই সময়ে ভাল আম পাওয়া যায়, তাই কিনেছিলেন। ঝুড়িটা বাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সেই সময়ে একটা 'ফোঁস' করে শব্দ হল তার সঙ্গে তাঁর হাতে কী একটা কামড়িয়ে না আঁচড়িয়ে দিল।

ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন বিমানবাবু। সর্বনাশ! সাপে কামড়াল নাকি? এই সময়ে মিউ মিউ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলেন এবং দেখতেও পেলেন ওই মালপত্র রাখার জায়গায় মেনি বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চাগুলো খুব ছোট নয়, চোখ ফোটার স্টেজ পার হয়ে এসেছে। তার মানে বেশ কিছুদিন হল বেড়ালটা এখানে আছে। আরও অনেক প্যাসেঞ্জারকে হয়তো আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে।

দিল্লিতে ফিরে এসে পরদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই একটা খুব কড়া চিঠি লিখলেন সংশ্লিষ্ট প্লেন কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তাকে। এ রকম তদারকির অভাব, এ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা একটি বিমান কোম্পানির কাছে আশা করা যায় না। যে কোনওদিন এদের বিমানে যে কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না। এইরকম সব কঠিন কঠিন বাক্য।

চিঠিটা রাগের মাথায় লিখেছিলেন বিমানচন্দ্র, ধরেই নিয়েছিলেন কেউ উত্তর দেবে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই বিমান কোম্পানির খোদ প্রধান কর্মকর্তা নিজে সই করে চিঠি দিয়েছিলেন।

চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিমানচন্দ্র। এতটা তিনি আশা করেননি। পত্রের প্রথমেই কর্মকর্তা ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন যে, তাঁদের কোম্পানিকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানোর জন্য তাঁরা অতিশয় কৃতজ্ঞ বোধ করছেন।

কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, বিমানচন্দ্রের চিঠি পাওয়ার পরেই তিনি পাটনা অফিসের সমস্ত কর্মচারীকে আন্দামানে বদলি করে দিয়েছেন। পাটনা বিমানবন্দরে যাঁর দায়িত্ব ছিল, সেই অফিসারকে এবং বিমানের পাইলট ও কো-পাইলটকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এয়ারহোস্টেস যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। সেই বিমানে যে মেনি বিড়ালটি ছিল, বাচ্চাসহ সেটাকে ধরে বিমানে করে ব্যাঙ্কক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বিমানবন্দরে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পত্রটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিমানচন্দ্র। সামান্য একটি অভিযোগের এত বড় প্রতিক্রিয়া। মনে মনে সাবাস জানালেন ওই কর্মকর্তাকে।

কিন্তু স্তম্ভিত হওয়ার আরও একটু বাকি ছিল। চিঠিটি আদ্যোপান্ত বেশ কয়েকবার পড়ে খামের মধ্যে ভরে রাখতে গেছেন বিমানচন্দ্র, তখন দেখেন খামের মধ্যে আরও একটা কাগজ রয়েছে। সেটা বার করে দেখলেন তাঁর সেই চিঠিটা, যাতে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। সেই চিঠিটার ওপরে লাল পেন্সিলে লেখা—

'মিসেস গোমেস,

আরও একটা পাগলের চিঠি। প্লেনের মধ্যে বেড়াল? ফুঃ। সেই বেড়ালের চিঠির একটা কপি একেও পাঠিয়ে দিন। চিঠির নীচে সইটা আমার হয়ে আগের চিঠিগুলোর মতো আপনিই করে দেবেন।'

চিঠির নীচে স্বাক্ষর অস্পষ্ট। তবে মার্জিনে মার্কা করা আছে, 'মিসেস গোমেস, পি এ।'

শালিক ও শ্যালিকা

এক

'সম্রাট শালিবাহন'...

শিবরাম চক্রবর্তী

শিবরাম চক্রবর্তীকে মনে আছে? সেই যে মহর্ষি শিবরাম চক্রবর্তী।

অনেকদিন আগের কথা, সে আমাদের হারিয়ে যাওয়া অমল কৈশোরের কথা। সত্যযুগ না হলেও, সে প্রায় ত্রেতা-দ্বাপরের কথা। তখন টাকায় চার-পাঁচ সের চাল পাওয়া যেত, তিন-চার সের দুধ। কলকাতা থেকে নৈহাটি রেলভাড়া আট আনা। ঢাকা-বরিশাল যেতে দলিল-দস্তাবেজ লাগে না তখনও বঙ্গজননীর বাম হাতে কমলার ফুল। লোকজন রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে আলোচনা করে, সুভাষ বসু দুয়েকদিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছেন, গত মাসে তাঁকে সিঙ্গাপুরে দেখা গেছে, কিংবা আগের সপ্তাহে রেঙ্গুন শহরে।

সেই প্রাচীন যুগে মহর্ষি শিবরাম সম্রাট শালিবাহনের কথা লিখেছিলেন. সে গল্প পাঠ করে আমরা হেসে আকুল হয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, শিবরাম ইতিহাসখ্যাত সম্রাট শালিবাহনের কথা লেখেননি। ইতিহাস রসিকতা পছন্দ করে না। সে বড় জবরদস্ত বিষয়।

ইতিহাসের সম্রাট শালিবাহনও জবরদস্ত নৃপতি ছিলেন। শালিবাহন ছিলেন শক বংশের রাজা, সেই যে শকহুণ দলের কথা আছে ভারতভাগ্য-বিধাতায়, সেই শক। তিনি শকাব্দ প্রবর্তন করেন যা আজও চলে আসছে। সে প্রায় খ্রিষ্টাব্দের সম বয়সী। সবচেয়ে বড় কথা প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি বিক্রমাদিত্যকে শালিবাহন যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন।

না। ইতিহাসের রাজা শালিবাহনকে নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী কিছু লেখেননি। লেখার কথাও নয়। রাজা-উজির নিয়ে সময় নষ্ট করার লোক ছিলেন না শিবরাম।

শিবরাম যে সম্রাট শালিবাহনের কথা লিখেছিলেন, তিনি কোনও রাজাগজা ছিলেন না। শ্যালিকাবাহন এক গোলগাল, বিপর্যস্ত জামাইবাবুর কথা লিখেছিলেন শিবরাম।

আমাদের চিরচেনা সেই সেকালের জামাইবাবু, শ্যালিকা পরিবেষ্টিত হয়ে হাঁসফাঁস করে, টালমাটাল হয়ে বারবার হাস্যকর হওয়াই যার অনিবার্য পরিণতি।

আজকাল সংসারে শ্যালক-শ্যালিকার খুব অভাব। সেকালের সেই শালিবাহন জামাইবাবুদের একালে আর বিশেষ দেখা যায় না। তাঁরাও এমন ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের জীব।

তবু এখনও যা দু-চারজন আছেন। অল্প কিছু দিন পরে, পরের প্রজন্মে তাও আর দেখা যাবে না। পরিবার পরিকল্পনার প্রকল্পে অদ্বিতীয়-অদ্বিতীয়বার পৃথিবীতে শ্যালক-শ্যালিকাই থাকবে না, জামাইবাবু আসবে কোথা থেকে।

এবং একই কারণে পিসি-মাসি, কাকা-জ্যাঠা, মামাতো-পিসতুতো কিছুই থাকবে না। জামাইবাবুরা থাকবে না।

তুলসী মঞ্চ, আকাশ প্রদীপ, একান্নবর্তী পরিবার ইত্যাদির মতো হারিয়ে যাবেন জামাইবাবুরা। প্রাগৈতিহাসিক ডায়নোসরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন তাঁরা।

আফসোস করে লাভ নেই। হাসির গল্প লিখতে বসে আফসোসের সুযোগ নেই। আবার এই ছলে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করাও উচিত নয়।

সুতরাং এবার সরাসরি গল্পে প্রবেশ করার কথা ভাবতে হচ্ছে। স্বীকার করা ভাল গল্পটি পুরনো ঢংয়ের এক শ্যালিকা বিহ্বল জামাইবাবুকে নিয়ে। গোলগাল, ঢিলেঢালা ভাল মানুষ জামাইবাবু, হয়তো ইনিই বঙ্গীয় সমাজের শেষ জামাইবাবু। আর, তা না হলেও ইনি শেষ জামাইবাবুদের মানে শেষতম জামাইবাবু প্রজন্মের একজন তো বটেই।

দুই

'দেখে শুনে বুঝিলাম
করি তালিকা,
সবচেয়ে ভাল মোর
ছোট শ্যালিকা।'

গোলাম মোস্তাফা

বেশিক্ষণ ধরে শুধু জামাইবাবু-জামাইবাবু করলে চলবে না। জামাইবাবুর নাম বলতে হবে, না হলে গল্প জমবে কি করে।

অবশ্য জামাইবাবুরা শেষ হয়ে যাওয়ার ঢের আগে এই মধুর সম্বোধনটি প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। নব্য যুগের আধুনিকা শ্যালিকাগণ জামাইবাবু না বলে দাদা বলা শুরু করেছিল। খগেনদা, বলরামদা, কপোতাক্ষদা, ইত্যাদি। অন্যদিকে আজিজ-মফিজকে যারা দুলাভাই বলত তারা হঠাৎ আলোকপ্রাপ্তা হয়ে জামাইবাবুদের আজিজ ভাই, মফিজ ভাই বলতে লাগল।

এই সাবালিকা ও নাবালিকাদের কেউ কোনওদিন বোঝানোর চেষ্টা করেনি জামাইবাবু দাদা কিংবা ভাই নন, 'সহস্র বর্ষের সখী সাধনার ধন'।

সে যা হোক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমাদের এই ক্ষুদ্র কথিকার জামাইবাবুর নাম মেঘলাল চক্রবর্তী এবং সৌভাগ্যক্রমে মেঘলালবাবু শুধুই জামাইবাবু, দাদা কিংবা ভাই নন।

প্রায় দশ বছর হল মেঘলালবাবু বিয়ে করেছেন, যথারীতি সম্বন্ধ করে, পাত্রী দেখেশুনে যাচাই করে। মেঘলালবাবু বসবাস করেন হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের হুগলি জেলার একটি পরিচিত রেল স্টেশনের থেকে মাইল পাঁচেক ভিতরের দিকে একটি পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রামে।

গ্রামের নাম হরিশপুর। পাশের গ্রামে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেঘলালবাবু শিক্ষকতা করেন। তাঁর একটি স্কুটার আছে, স্কুটারেই যাতায়াত করেন। প্রয়োজনে হাওড়া-কলকাতা পর্যন্ত স্কুটারে আসেন।

তবে স্কুল শিক্ষকতাই মেঘলালবাবুর একমাত্র বা মূল জীবিকা নয়। তিনি প্রাক্তন জোতদার বংশের সন্তান। এখনও কিঞ্চিৎ ধানজমি আছে, সম্বৎসরের খোরাকি চলে যায়। আরও জমিজমা ছিল, সেগুলো যথাকালে হস্তান্তর করেছেন। এখন আসল ব্যবসা বাজারের পাশে একটা টিনের আটচালা ঘরে ভিডিও পারলার।

তবে মেঘলালবাবু বেআইনি কিছু করেন না। তাঁর সরকারি লাইসেন্স আছে, স্থানীয় থানাতেও যথারীতি মাসোহারা দেন। অশ্লীল বা নীল বই ফাঁকে-ফুরসতে দেখানো হয় না এমন কথা নিশ্চয়ই করে বলা যাবে না, তবে বাজার চালু হিন্দি সিনেমার ক্যাসেটই সাধারণত দেখানো হয়। সেও কম উত্তেজনাপ্রদ নয়।

মেঘলালবাবুর স্ত্রীর নাম হেমছায়া। হেমছায়ারা দুই বোন, এক ভাই। হেমছায়াই বড়। পরের ভাই গণনাথ নাসিকে টাকার কারখানায় কাজ করে। সবচেয়ে ছোট মহামায়া। আমাদের মেঘলালবাবুর একমাত্র শ্যালিকা।

মেঘলালবাবুর শ্বশুরবাড়ি আরও দু স্টেশন দূরের ভিতরের দিকের একটা গ্রামে। মেঘলালবাবুর বিয়ের সময় গণনাথের বয়স আঠারো-উনিশ। মহামায়া চোদ্দো-পনেরো বছরের নাবালিকা, স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে।

শুধু ছোট শ্যালিকা বলে নয়, একমাত্র শ্যালিকা বলেও মেঘলালবাবু মহামায়াকে খুব স্নেহ করেন। মেঘলালবাবুর নিজের কোনও বোন নেই, কয়েকটি অপোগণ্ড ভাই আছে, এদিক ওদিক করে বেড়ায়। আগে মহামায়া ছুটি-ছাটায় জামাইবাবুর বাড়িতে এলে তারা তাকে খুব বিরক্ত করত। এখন আর অবশ্য সে রকম ঝামেলা নেই, বছর দুয়েক হল মহামায়ার বিয়ে হয়ে গেছে।

মহামায়ার বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। তার বর অনুপম কাজ করে একটা কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে। চারপুরুষের বসবাস কলেজ স্ট্রিট-বৌবাজার অঞ্চলে। ছেলেটি এমনিতে চমৎকার; কথাবার্তা, চালচলন, লেখাপড়া সবই ভাল। কিন্তু এই অনুপমের একটি মহৎ দোষ আছে, সে সুদূরের পিয়াসী।

অনুপম, 'গিরিবান্ধব' সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক। পাহাড় বলতে সে অজ্ঞান। সমতল কলকাতায় ইট-কাঠের জঙ্গলে জন্মে এবং বড় হয়ে পাহাড়ের প্রতি তার এই আকর্ষণ কী করে জন্মাল সেটা বলা কঠিন।

প্রতি বছর গ্রীষ্মকাল পড়তে না পড়তে, কলকাতার রাস্তায় পিচ গলে যাওয়ার অনেক আগে, যখন পাহাড়তলির আমের গাছে মুকুল ঝরে গিয়ে সবে গুটি এসেছে, গিরিবনে সদ্য কোকিলের ডাক শুরু হয়েছে সেই মুকুলের ঘ্রাণ না পেয়েও, সেই ডাক না শুনেও অনুপমের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'গিরিবান্ধব' সমিতির সদস্যেরা আবার পাহাড়ে যাওয়ার

তাল করতে থাকে।

তারপর সঙ্গীসাথী জুটিয়ে কোনও এক শুভ দিনে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে এবং শুভার্থী কোনও মন্ত্রী বা আমলা মহোদয়ের পরিয়ে দেওয়া গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরে অনুপমেরা বেরিয়ে পড়ে, লোটা-কম্বল, টর্চ-অক্সিজেন, কুড়ুল-গাঁইতি, তাঁবু-দড়ি এইসব নিয়ে।

শ্রাবণ বা চৈত্রসংক্রান্তির রঙিন কাপড় পরে তারকেশ্বর যাত্রার মতো প্রায় ব্যাপার। কয়েক সপ্তাহ্ ধরে অনুপমেরা একের পর এক পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। এ এক মারাত্মক নেশা।

বিয়ের প্রথম বছরে নতুন বউ কী ভাবতে পারে ভেবে কিংবা হয়তো প্রণয়ের আধিক্যবশত অনুপম পাহাড়ে চড়তে যায়নি। তারপর সারা বছর সে নিজেই শুধু হা-হুতাশ করেছে তা নয়, 'গিরিবান্ধব' সমিতির বন্ধু-বান্ধবেরাও তাকে প্রচুর টিটকিরি দিয়েছে।

তাই এ বছর অনুপম প্রাণের টানেই হোক কিংবা বিদ্রূপের ভয়েই হোক গিরিলঙ্ঘনে শামিল হয়েছে। তবে যাওয়ার আগে মহামায়াকে সে ছোট একটি উৎকোচ দিয়েছে। মধ্য কলকাতার ঘিঞ্জি গলির চার দেওয়ালে বন্দী শ্বশুরবাড়ির নিগড়মুক্ত করে তাকে পিত্রালয়ের খোলামেলা পাখিডাকা, ছায়াভরা পরিবেশে রেখে গেছে। বসন্ত শেষে নবগ্রীষ্মের দিনের পল্লীগ্রাম এখনও মনোরম।

পাহাড় জয় করে অনুপমদের ফিরে আসতে সপ্তাহ পাঁচেক লাগে। এই পাঁচ সপ্তাহেব মধ্যে দেড় সপ্তাহ্ বোনের বাড়িতে কাটিয়ে আগের দিন মহামায়া দিদি হেমছায়ার কাছে এসেছে। আগের মতোই জামাইবাবু মেঘলাল গিয়ে তাকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসছে। বিয়ের আগে মহামায়া বহুবার এ গাড়িতে এসেছে। মেঘলালবাবু জামাইবাবু হিসেবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, প্রিয়তমা শ্যালিকার আদর-আপ্যায়নে যত্ন-তদ্বিরে কখনও কোনও ত্রুটি হয়নি।

মহামায়া এবং হেমছায়া দু'জনায় পিঠোপিঠি বোন না হলেও প্রায় একই আদলের। উচ্চতা গায়ের রঙ সবই প্রায় এক রকম। তফাৎ শুধু এইটুকু যে হেমছায়া একটু থেমে থেমে ভেবেচিন্তে কথা বলে, তার আবেগ-অনুভূতি একটু চাপা।

এদিকে মহামায়া দিদির একেবারে বিপরীত। সে খিলখিল করে হাসে, গমগম করে রাগ করে, তেমন অঘটন ঘটলে ঝিরঝির করে চোখের জলে ভাসে।

দুই বোনের এই পার্থক্য নিতান্ত ব্যক্তিগত। পুরোপুরি মন মেজাজের ব্যাপার। কিন্তু চেহারা এবং চালচলনের দিকটা চোখে পড়ার মতো।

নিজের বিয়ের পরে প্রথম প্রথম মেঘলাল এদিকটায় খুব নজর দেননি, সে অবকাশও ছিল না কারণ তখন তাঁর পুরো নজর হেমছায়ার ওপরে।

তবে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একদিন আকর্ষণ কমে যায়, তখন মেঘলাল আবার চাব পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মেঘলাল দুশ্চরিত্র বা সাদা কথায় যাকে বলে লম্পট তা নন, সুতরাং তাঁর বিপথগামী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ একটু হ্রাস পেল।

এই সময় মহামায়া বড় হচ্ছে। শ্বশুরালয়ে গেলে কিংবা যখন মহামায়া দিদির কাছে

বেড়াতে আসত মেঘলাল শ্যালিকাকে দেখতে পেতেন। তাঁর চোখের সামনে সাধের শ্যালিকা পল্লবিতা, কুসুমিতা হয়ে উঠল। হেমছায়া বেশ সুন্দরী। মহামায়াও ভাল দেখতে, তবে সেই সঙ্গে তার নবযৌবনের চটক ছিল।

দু' বোনই প্রায় এক রকম দেখতে, আকারে-প্রকারে সুতরাং দূর থেকে দেখে কিংবা অন্যমনস্কভাবে মেঘলাল অনেক সময় ক্ষণিকের জন্যে দু'জনকে গুলিয়ে ফেলতেন।

মেঘলালের এই সমচেহারায় স্ত্রী ও শ্যালিকাকে গুলিয়ে ফেলার কথা আগে কোথায় যেন লিখেছি। কিন্তু এই 'শালিক ও শ্যালিকা' নামক গল্পে বিষয়টি এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখনও অনুপমের সঙ্গে মহামায়ার বিয়ে হয়নি, বোধহয় কথাবার্তাও চলছে না। সেই সময়ে একদিন, বোধহয় সেটা কোনও ছুটির দিন ছিল, মহামায়া দিদির কাছে বেড়াতে এসেছে।

বিকেল বেলা বাইরের বারান্দায় বসে মেঘলালবাবু দুজন সহকর্মীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। দু'জনই বয়েসে মেঘলালের থেকে একটু ছোট। মেঘলালের সঙ্গে একই ইস্কুলে মাস্টারি করে।

বাড়ির মধ্যে থেকে হেমছায়া বোনের হাত দিয়ে বারান্দার আড্ডায় চা পাঠিয়ে দিল। মফঃস্বলের বিকেলে তখন একটু আবছায়া ভাব। চায়ের ট্রে হাতে মহামায়া বারান্দায় আসতেই মেঘলালের তরুণ বন্ধুদ্বয় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মেঘলাল ব্যাপারটা অনুমান করে দুজনাকেই বসতে বললেন, তারপর বললেন, 'কাকে দেখে উঠে দাঁড়াচ্ছ?' ইনি তোমাদের বৌদি নন, বৌদির ছোট বোন।'

দু'জনারই তখন বেশ অপ্রস্তুত অবস্থা। মহামায়াও লজ্জায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকার পরে এদের মধ্যে একজন বলল, 'আমরা তো বৌদি ভেবে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু জব্দই হয়ে গেলাম।'

মেঘলাল বলেছিলেন, 'সাহেবরা মহিলা এলেই উঠে দাঁড়ায়। তোমরাও সাহেবি আচরণ করছো।'

যেমন হয়, চা খেতে খেতে এরা আবার কৌতূহলী হয়ে উঠল, 'আচ্ছা, বৌদি আর বৌদির বোন দু'জনে একই রকম দেখতে।'

মেঘলাল স্বীকার করলেন, 'ঠিক একরকম না হলেও, অনেকটাই একরকম।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হল, 'আপনার অসুবিধে হয় না?'

প্রশ্নটা বুঝতে পেরেও একটু হেসে মেঘলাল প্রশ্ন করলেন, 'কিসের অসুবিধে?'

এবার আসল জিজ্ঞাসা এল। 'মেঘলালদা, আপনি 'চট করে আলাদা করে বুঝতে পারেন কে সত্যি সত্যি বৌদি। আর কে বৌদির ছোট বোন?'

মেঘলাল মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, চট করে আলাদা করে বোঝার খুব একটা চেষ্টা করি না। প্রয়োজনও বোধ করি না।'

এই অপ্রয়োজনীয় পুরনো ব্যাপারটি পুনরুল্লেখ করলাম নিতান্ত গল্পের খাতিরে। এরপরেও যদি গল্প না জমে সে দোষ আমার নয়, পাঠিকা ঠাকুরানী বুঝুন বা না বুঝুন সম্পাদক মহোদয় অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছি না।

সুতরাং এবার বর্তমান সময়ের সমীপবর্তী হচ্ছি। সেই যেখানে আমরা এই গল্পটাকে

ফেলে এসেছিলাম, সেই বসন্তশেষ, নবগ্রীষ্মের বিহ্বল দিন, মহামায়ার বর অনুপম গেছে পাহাড় জয় করতে। মহামায়ার মনের যা অবস্থা আগেকার দিন হলে সে পাহাড়কে সতীন বলে ধরে নিত।

কিন্তু মহামায়া গ্রামের মেয়ে হলেও, মোটেই গ্রাম্য নয়। দু-চারটি প্রাচীন পাড়াগেঁয়ে সংস্কার হয়তো তার মনের মধ্যে আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত সে মাধ্যমিকে অঙ্কে আর জীববিজ্ঞানে লেটার পেয়েছিল, উচ্চমাধ্যমিকে তার বিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যে সেই একা গ্রেস ছাড়া ইংরেজিতে পাস করেছিল।

কিন্তু লেখাপড়ার কথা নয়। এসব নীরস ব্যাপারে গিয়ে লাভ নেই। বরং এবাব আমরা শ্রীমতী মহামায়াকে একটু ভাল করে নিরীক্ষণ করি। মেঘলালবাবুর দৃষ্টিতে তাকে একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক।

দিদি হেমছায়ার বাড়িতে এবার মহামায়া এসেছে উৎসব উপলক্ষে। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। এ বাড়িতে খুব ধূম।

ওই মহামায়া আসছে। তার হাতের থালায় রুপোর বাটি, লম্বা প্রদীপ। চন্দন আর সিঁদুরের দুটো রুপোর বাটি থেকে শোয়ার ঘরের, বাইবের ঘরের, রান্না ঘরের, গোয়ালঘরের দরজায় দরজায় নিপুণ তর্জনী হেলিয়ে ফোঁটা দিচ্ছে।

সালঙ্কারা, সযৌবনা, বেনারসী পরিহিতা শ্যালিকাকে বারান্দায ইজি চেয়ারে বসে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মেঘলালের আগের দিনের বিকেলের কথা মনে পড়ছিল। যখন মহামায়াকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে সে এসেছিল সেই সময়কার ঘনিষ্ঠ শিহরণের কথা মনে পড়ছিল।

একটু আগে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন মেঘলাল। পুরোহিত এখনও আসেননি। লোকজন, অতিথি অভ্যাগতও বেলার দিকে আসবে। একটু আগে বারান্দায় মহামাযা ছিল, কিন্তু এখন তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মেঘলাল ভাবলেন, বোধহয় উঠোনেব ওদিকটায় পুরনো ঢেঁকিঘবেব দবজায় সিঁদুব-চন্দন লাগাতে গেছে। একটু সাবধান করতে হবে। গরমের দিন। ওদিকে আবাব সাপ আছে।

বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে মেঘলালবাবু দেখলেন মহামায়া উঠোনের চাবপাশে, ঘরের ছাদে, গাছের ডালে চারপাশে তাকাচ্ছে। তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে মেঘলালবাবুকে দেখে আকুল কণ্ঠে বলল, 'জামাইবাবু, কী হবে?'

চিন্তিত হয়ে মেঘলালবাবু বললেন, 'কেন কী হয়েছে?'

মহামায়া বলল, 'ভারী অমঙ্গুলে ব্যাপাব হয়েছে, মাত্র একটা শালিক দেখে ফেললাম।' বলে গোয়ালঘরের চালে বসা একটা শালিককে আঙুল দিয়ে দেখাল। মেঘলালও চোখ দিয়ে চারদিকে খুঁজে দেখলেন দ্বিতীয় কোনও শালিক নজরে আসছে না। অবশ্য রান্নাঘরের পিছনে একটা বহু প্রাচীন ঝাঁকড়া গাছ আছে। তার ডালপাতার ভিতবে বহুরকম পাখি কিচমিচ করছে, যার মধ্যে নিশ্চয় শালিকও আছে। তবে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তিন

'একটি শালিক অমাঙ্গলিক'...

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাঙালী মাত্রেই একথা অবশ্য জানেন যে একটা শালিক হঠাৎ দেখে ফেলা খুবই অমঙ্গল ব্যাপার। বাঙালি কবি এ বিষয়ে কবিতা পর্যন্ত লিখেছেন।

একটি শালিক দৃষ্টিপথে আসা মানেই চরম দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত পাওয়া, খুঁজে পেতে যেভাবে হোক দ্বিতীয় শালিকটি দেখা না পেলে এই অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

এ ব্যাপারটা মেঘলালবাবু জানেন। আর হেমছায়া—আর মহামায়া দুজনেরই এ ব্যাপারে সংস্কার অতি প্রবল, পিত্রালয় থেকে পেয়েছে।

একটা শালিক দেখে দেখে এবং হাজার চেষ্টা করেও দ্বিতীয় শালিক দেখতে না পেয়ে হেমছায়া বেশ কিছুদিন হল ঘরের বাইরে উঠোনে বা গাছপালায় দৃষ্টিপাত করে না।

কিন্তু আজ এই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য প্রভাতে গোল বাধাল মহামায়া। বহু খুঁজে দ্বিতীয় শালিকটির সন্ধান না পেয়ে জামাইবাবুর কাছে এসে ব্যাকুল চোখে আবার বলল, 'কী হবে জামাইবাবু?'

জামাইবাবু মেঘলাল চক্রবর্তী সামান্য লোক নন। তাঁর ধমনীতে তালুকদারের রক্ত রয়েছে। তিনি শ্যালিকাকে বললেন, 'দাঁড়াও'। বলে শোয়ার ঘরের মধ্যে গিয়ে বড় কাঠের আলমারিটা খুলে বহুকালের পুরনো একটা গাদা বন্দুক বার করে আনলেন। তারপর বন্দুকের নলটা শূন্যে মুখ করে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কাঁঠাল গাছ থেকে এবং আশপাশের থেকে অসংখ্য পাখি কিচমিচ, কিচির মিচির কা-কা ইত্যাদি নানারকম চেঁচামেচি করতে করতে দ্রুত বেগে বেরিয়ে উড়তে উড়তে বিভিন্ন দিকে চলে গেল।

এই পাখির দলের মধ্যে অন্তত দশটা শালিক।

মহামায়ার অমঙ্গল ভঙ্গ হল।

পাখিদের চিৎকার চেঁচামেচি মিটে যাওয়ার পরে মেঘলাল মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কলকাতায় বৌবাজারের শ্বশুর বাড়িতে জোড়া শালিক দেখতে পাও?'

মহামায়া বলল, 'আমাদের ওদিকে কোনও শালিক নেই। একটা শালিক দেখে যেমন অমঙ্গল হয় না আবার জোড়া শালিকের সৌভাগ্যও মেলে না।'

বলা বাহুল্য, জামাইবাবু মেঘলাল চক্রবর্তী শ্যালিকার এই দুঃখের সমাধান করেছেন। মহামায়ার যাতে নিয়ত সৌভাগ্য সূচিত হয় সেই জন্যে শেয়ালদা রথের মেলা থেকে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ দপ্তরের দৃষ্টি বাঁচিয়ে একটি খাঁচা শুদ্ধ এক জোড়া শালিক পাখি কিনে শ্যালিকাকে গত মাসে উপহার দিয়ে এসেছেন।

কিন্তু আজ সকালের শালিক নিয়ে বেশ সুখেই ছিল কিন্তু পাখি দুটোকে গতকাল স্নান করাতে গিয়ে দুটোরই গা থেকে রং উঠে গিয়ে ধূসর রং বেরিয়েছে। স্নানের পর পাখি দুটো দেখে মহামায়ার শাশুড়ি বলেছেন, 'এ দুটো ছাতারে পাখি।'

চিঠিটা পড়ার পর বাংলা অভিধান খুলে মেঘলালবাবু দেখলেন ছাতারেও শালিকজাতীয় পাখি। কোথাও কোথাও এই পাখিকে ভাঁটশালিক বলে।

মহামায়াকে এই কথা মেঘলালবাবু জানালেন। তবে শালিকের জায়গায় ভাঁটশালিক, জোড়া ভাঁটশালিক কতখানি মঙ্গলজনক হবে সে বিষয়ে জামাইবাবু কোনও ভরসা দিতে পারলেন না।

তরমুজের বীজ

আজ কয়েকদিন হল খুব গরম পড়েছে। সেইসঙ্গে মশার উৎপাতও খুব বেড়েছে। সারারাত মশারির মধ্যে গুমোটে হাঁসফাঁস করেছি। ভাল করে ঘুম হয়নি, ঘুম হওয়ার কথাও নয়।

ভোর হতে-না-হতে বারান্দায় এসে একটা বেতের মোড়া নিয়ে বসেছি। ভোরবেলার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বেশ আরাম লাগছে।

একা-একা চুপচাপ বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছিল। গরমের দিনে সকালেব দিকে এই দু'-এক ঘণ্টাই যা আরাম। কাছে-দূরে গাছের ডালে, ডালের আড়ালে পাখি ডাকছে। দুটো কোকিল যুগলবন্দিতে মেতেছে। একটা টিটি পাখি ডাকছে। সামনের উঠোনে শালিক, চড়ুই, সব নেমে এসেছে। কিচমিচ করছে। এমন সকালে কাকের ডাকও কর্কশ মনে হচ্ছে না।

বাইরে হালকা রোদ উঠেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে টুংটাং করে অলস ভঙ্গিতে দু'-একটা রিকশা যাচ্ছে সকালবেলার স্কুলের শিশুদের নিয়ে।

ভাবছি এবার চা খেতে উঠব। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সুদর্শন সান্যাল এসে উপস্থিত। তার হাতে একটা ছেঁড়া বই। সুদর্শন সান্যাল, মানে এই সুদর্শনকে বহুকাল হল চিনি। অসময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা তার পুরনো অভ্যেস। সাধারণত প্রায় বিনা কাবণেই সে এরকম করে থাকে।

সুদর্শনের অতীত ইতিহাস এই সূত্রে একটু বলে রাখা অনুচিত হবে না। বছর-কুড়ি আগে সে আমাদের পাড়ায় ঠিক আমাদের উলটো দিকের বাড়িতে ভাড়া এসেছিল সামনের দোতলাটায়।

মাত্র দেড় বছর ছিল। তার মধ্যেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

সুন্দর খোলামেলা, দক্ষিণমুখী দোতলার ফ্ল্যাট ছিল সুদর্শনের। সে একাই একটা কাজের লোক নিয়ে থাকত। তার মা-বাবা মেদিনীপুরের ওদিকে একটা গ্রামে ছেলের বাড়িতে থাকত। তখনও এবং এখনও সে বিয়ে করেনি।

সে যা হোক, এমন সুন্দর একটা ফ্ল্যাট আজকের বাজারে কেউ ছাড়ে! কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে সে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে চলে গেল।

হঠাৎই একদিন সে এসে বলল, 'দাদা, 'ওজোন' কথাটা কি ইংরেজি?'

আমি বললাম, 'ইংরেজি হবে কেন? বাংলা 'ওজোন' হল ইংরেজিতে ওয়েট।'

সুদর্শন বলল, 'আপনি আমাকে অত মূর্খ ভাববেন না, সে আমি জানি। আমি যে ওজোনের কথা বলছি সেটা হওয়ায় থাকে।'

কলেজে আমার দু'ক্লাস বিজ্ঞান পড়া ছিল। যেটুকু মনে ছিল সেই ভুলসুদ্ধ বিদ্যায়

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'ওজোন প্রায় অক্সিজেনই, একটু মাত্রা বেশি, সমুদ্রের বাতাসে থাকে।'

সুদর্শন বলল, "ডাক্তার সেইজন্যে আমাকে স্বাস্থ্যের কারণে সমুদ্রের ধারে থাকতে বলেছেন। সাধারণ অক্সিজেন আমার চলবে না, আমার ওজোন চাই। আমি সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে দিঘার কাছে একটা গ্রামে বাড়ি ভাড়া করে চলে যাচ্ছি।"

সুদর্শন সেই গ্রামে উঠে গিয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিল, নিমন্ত্রণ করেছিল তার ওখানে যেতে। লিখেছিল যে, সে কাজুবাদামের চাষ করছে। আমি গেলে সে আমাকে প্রাণ ভরিয়ে কাজুর সন্দেশ, কাজুর হালুয়া, কাজুর পোলাও, এমনকী কাজুর চাটনি খাওয়াবে।

আমার অবশ্য আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সুদর্শন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল।

দিঘা চলে যাওয়ার বছর তিনেক পরে তার কাছ থেকে একটা চিঠি পাই, সে বিশেষ একটা কাজে কলকাতা আসছে, আমার সঙ্গেও দেখা করবে।

একদিন রাত বারোটা নাগাদ সে এল, অত রাতে ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। রীতিমত বিপর্যস্ত চেহারা। চিনতে পারার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত রাতে?'

সুদর্শন বলল, 'এই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলেই চলে যাব।'

আমি বললাম, 'কোথায় যাবে? কীভাবে যাবে? এত রাতে গাড়ি-ঘোড়া...'

আমার কথা শেষ না করতে দিয়ে সে বলল, 'আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, আমি হেঁটেই যাব, ভোর চারটেয় হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে দিঘার বাস ছাড়ে, একটু পরে হেঁটে বেরিয়ে গেলে সে-বাসটা ধরতে পারব।'

সে যা হোক, এর পর সে যা বলল তেমন কিছু সচরাচর শোনা যায় না।

দিঘায় সুদর্শন ভালই ছিল, বিশেষত সামুদ্রিক ওজোন বায়ু সেবন করে। কিন্তু দিঘার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে যে গ্রামে সে বসবাস করছিল, সেখানে ভুঁড়োশেয়ালের খুব অত্যাচার।

খুল অল্প বয়সে ছেলেভোলানো ছড়ায় ভুঁড়োশেয়ালের কথা পড়েছিলাম এবং তার ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে ওই নামে একটা জীবন্ত প্রাণী এই পৃথিবীতে আছে, সুদর্শন না বললে সেটা জানতেই পারতাম না।

সুদর্শনের কাছেই জানা গেল খেঁকশেয়াল বা সাধারণ শেয়ালের চেয়ে ভুঁড়ো শেয়াল অনেক বেশি মারাত্মক। তবে বেশি মারাত্মক এই অর্থে নয় যে, ভুঁড়োরা অন্য শেয়ালদের চেয়ে বেশি দংশনপ্রবণ, ভুঁড়োরা অন্যদের মতোই লাজুক স্বভাবের, মানুষ এড়িয়ে চলে, দিনের আলোয় বের হয় না, খুব বেকায়দায় না পড়লে আক্রমণ করে না।

'তা হলে?' আমার নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে এই প্রশ্ন শুনে সুদর্শন সামান্য খুচরোয় জবাব দিল, 'হুক্কা হুয়া।'

আমি বললাম, 'সে আবার কী?'

সুদর্শন বলল, 'শেয়ালের ডাক শোনেননি?'

আমি স্বীকার করলাম, 'তা শুনেছি।'

এর পর সুদর্শন যা বলল তার সারমর্ম হল, ভুঁড়োশেয়ালও হুক্কা হুয়া করে, তবে সে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে এবং উচ্চনাদে। একশোটা ভাঙা কাঁসার থালা একসঙ্গে বাজালে

যেরকম শব্দ হয়, প্রতিটি ভুঁড়োশেয়ালের কণ্ঠে সেইরকম ধ্বনি নির্গত হয়। তা ছাড়া অন্য জাতের শেয়ালেরা প্রহরে-প্রহরে সবসুদ্ধ রাতে চারবার ডাকে। ভুঁড়োশেয়াল ডাকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এবং একসঙ্গে দলে থাকে প্রায় পনেরো-বিশটা, যা অন্য শেয়ালদের তিন-চার গুণ।

সুদর্শন জানান যে, সে ভুঁড়োশেয়ালের অত্যাচার থেকে বাঁচতে একটি দোনলা বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছিল, কিন্তু একদিন রাতে গুলি চালিয়ে একটি ভুঁড়োশেয়ালকে আহত করার পরেই লোকমুখে সংবাদ পেয়ে বন দফতরের লোকেরা এসে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে তাকে গ্রেফতার করে এবং তার বন্দুকের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে। বহু কষ্টে এবং অর্থব্যয় করে সে এখন জামিনে খালাস আছে।

এত কথা শুনে আমার ঘুমভাব কেটে গিয়েছিল। আমি সুদর্শনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে এখন কী করবে?'

সুদর্শন বলল, 'আজ ফিরে গিয়ে ওখানকার পালা চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে আসব।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওজোন? ওজোন ছাড়া তোমার অসুবিধে হবে না?'

সুদর্শন বলল, 'তা হোক। ডাক্তার বলেছেন ওজোনের চেয়ে সুনিদ্রা অনেক বেশি জরুরি।'

সুদর্শনের বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে সে এক নতুন মহাভারত বচনা করতে হবে। সে কলকাতায় ফিরে এসেছিল এবং মূল শহরে আর বসবাস না কবে বারুইপুরের দিকে বসবাস আরম্ভ করে।

ফলের দেশ বারুইপুরে যাওয়ার জন্যই হোক অথবা তার নিজের নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির জন্যই হোক বারুইপুরে এসে সুদর্শন নতুন-নতুন ফলের চাষে মনোযোগ দেয়।

দুঃখের বিষয়, সে খুব সফল হতে পারেনি, তবে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সে পেয়ারাগাছের কলমের সঙ্গে গোলাপজামের কলমের মিশ্রণ ঘটিযে গোলাপপেয়ারা নামে একটা নতুন ফলগাছ তৈরির চেষ্টা করেছিল, যে-গাছের ফল খেতে হবে পেয়াবাব মতো, কিন্তু তাতে গোলাপের গন্ধ হবে। সে বাঁশগাছ এবং আখগাছের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লম্বা ও সুমিষ্ট আখবাঁশের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সফল হতে পাবেনি।

তবু সুদর্শন সম্পর্কে একটা প্রশংসার কথা এখানে বলতেই হয়, বারবার ব্যর্থ হয়েও সে কখনও দমে যায়নি। একটা চেষ্টা যেই ছেড়ে দিয়েছে অন্য একটায সঙ্গে-সঙ্গে হাত দিয়েছে।

আজকেও তাই প্রমাণ হল।

এই যে সাতসকালে সুদর্শন একটি ছেঁড়া বই হাতে এসেছে সেটি কোনও সামান্য বই নয়, একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। বইটির নাম, 'তৈল বিজ্ঞান'।

বইটি আমার দিকে এগিয়ে দিতে বইটির মলাটে তৈলবিজ্ঞান নাম দেখে আমি প্রথমে ভাবলাম হয়তো পেট্রোল, ডিজেল জাতীয় কোনও যান্ত্রিক তেলের বিষয়-সংক্রান্ত বই। তারপরে ভাবলাম হয়তো-বা কোনও হালকা লেখা, সরস রসিকতার বই, মানুষকে তেল দেওয়া সম্পর্কে ঠাট্টা করে কোনও লেখা।

কিন্তু তা নয়। বইটির পাতা খুলে দেখি অতি গুরুগম্ভীর বই। বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঠিকমত চিনতে পারলে সব জিনিস থেকেই তেল বের করা যায়। ধানের তুষ, ডালের খোসা, পাটের আঁশ ইত্যাদি থেকে তেল তো বেরোবেই, এমনকী ইট, কাঠ, পাথর থেকে তেল বের করা অসম্ভব নয়। শুধু চিনেবাদাম থেকেই তেল হয় তা নয়, চিনেবাদামের খোসা থেকেও তেল বেরোবে ঠিকমত পেষণ করলে। আমের আঁটি, কাঁঠালের বীজেও তেল আছে।

মলাট-ছেঁড়া বইটি দেখে লেখকের নাম জানা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হল তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে গবেষণা করেছেন।

এ-কথা বলতে সুদর্শন জানাল যে, সেও খুব খোঁজ নিয়েছে কিন্তু লেখক-গবেষকের নাম জানতে পারেনি। সে যা হোক, আজ সুদর্শন আমার কাছে এসেছে পরামর্শ নিতে। অবশ্য গ্রহণ করুক বা না করুক, সব ব্যাপারেই, সেই পরিচয় হওয়ার পর থেকে সে আমার পরামর্শ চাইতে আসে।

আজ সুদর্শন আমার কাছে জানতে চাইল কী ধরনের ফলের বীজ থেকে তেল বের করা সঙ্গত মনে করি।

আমি এ-বিষয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। কিন্তু আমি কোনও মতামত দেওয়ার আগেই সুদর্শন আমাকে সাহায্য করল। ছেঁড়া বইটির একটি পাতা খুলে ধরে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। দেখলাম সেখানে লেখা আছে, ফলের বীজের আকার যত ছোট হবে, তেল বের করা তত সোজা হবে।

এই জায়গাটা পড়ে আমার প্রথমেই মনে পড়ল আমার প্রিয় ফল পেয়ারার কথা। পাকা পেয়ারা, এমনকী কাঁচা বা ডাঁশা পেয়ারাতেও অসংখ্য ছোট-ছোট, গোল-গোল বীজ থাকে, ঠিক সরষের আকারে। সরষের তেলের মতো পেয়ারার বীজেও হয়তো চমৎকার তেল হবে।

কিন্তু আমি পেয়ারার কথা বলতেই সুদর্শন প্রবল আপত্তি জানাল। আমার মনে পড়ল, গোলাপ-পেয়ারার চাষ করে একবার সুদর্শন জব্দ হয়েছিল। তাই হয়তো তার এই আপত্তি।

আমি আর জোর করলাম না। একটুখানি চিন্তা করে আমি পেঁপের বীজের কথা বললাম। এক-একটা পাকা পেঁপেতে অজস্র বীজ থাকে। কাটা ফলের দোকান থেকে কুড়িয়ে আনলেই যথেষ্ট সংগ্রহ করা যাবে।

তবে সুদর্শন জানাল যে, সে ইতিমধ্যেই পেঁপের বীজ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পেঁপের বীজ সংগ্রহ করা অসম্ভব!

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'কেন?'

সুদর্শন বলল, 'পেঁপের বীজের সাঙ্ঘাতিক দাম। পাকা পেঁপে যদি আট-দশটাকা কেজি, পেঁপের কালো বাছাই বীজ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কেজি।'

আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বললাম, 'সবাই বুঝি পেঁপের বীজের তেল বানাচ্ছে? তা চল্লিশ টাকা করে বীজ কিনলে সেটা চিপে এক কেজি তেল তৈরি করলে তার দাম হাজার টাকা পড়বে। অত দামি তেল কী কাজে লাগবে? কে কিনবে?'

সুদর্শন আমাকে বোঝাল পেঁপের বীজের চাহিদা তেল তৈরির জন্য নয়, সে খোঁজ

নিয়েছে যে, ওগুলোকে গোলমরিচের সঙ্গে সেদ্ধ করে রোদ্দুরে শুকনো হয়। তারপরে সেটাই হয়ে যায় গোলমরিচ। তখন সেই ভেজাল মসলা আড়াইশো টাকা কেজি।

সুতরাং পেঁপে চলবে না। সুদর্শনকে সাহায্য কবার জন্য আমাকে আবার ভাবতে হল। বেশি ভাবতে হল না। তরমুজের কথা মনে পড়ল, তরমুজে প্রচুর বীজ হয়।

কথাটা বলতেই দেখলাম সুদর্শনও তরমুজের কথা ভেবেছে। তবে তার অসুবিধে হয়েছে তরমুজের বীজ পাওয়া নিয়ে। রাস্তাঘাটে কাটা ফলের দোকানে তরমুজের তেমন বিক্রি নেই। অথচ আস্ত তরমুজ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুদর্শন বলল যে, সে হিসেব করে দেখেছে, সে যদি দৈনিক মাঝারি সাইজের বারোটা তরমুজের বীজ সংগ্রহ করতে পারে, তা হলে গড়পড়তা দৈনিক এক কেজি বীজ পাওয়া যাবে।

সুদর্শন আমার সাহায্য চাইল। সে দৈনিক বারোটা তরমুজ কিনে ছ'টা নিজে নেবে, বাকি ছ'টা আমাকে দিয়ে যাবে। তরমুজ খেয়ে তাব বীজগুলো রেখে দিলেই হবে। সে পরের দিন তরমুজ দেওয়ার সময় বীজগুলো নিয়ে যাবে।

সুদর্শন অবিবেচক নয়। সে জানাল, তরমুজের সিজন বড়জোর মাসদুয়েক। এর মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ দিন আমাকে এই কষ্টটা করতে হবে।

আমিও অবিবেচক নই। সুদর্শনের অনুরোধ রক্ষা করেছি। এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আধখানা তরমুজ খেয়ে হাঁটতে যাই। তারপর ফিরে এসে চায়ের সঙ্গে আধখানা তরমুজ খাই। একটু বেশি বেলায় জলখাবার দু' গেলাস তরমুজের শরবত। দুপুরে ভাতের পাতে দই দিয়ে তরমুজ। এইভাবে চলতে-চলতে রাতে শোওয়ার আগে আস্ত একটা তরমুজ দিয়ে নৈশভোজ করে ঘুমোতে যাই।

ক্রমাগত তরমুজ খেয়ে-খেয়ে আমিও তরমুজের মতো হয়ে গেছি। রীতিমত গোলগাল। দেখলেই মনে হয় লোকটা খুব তরমুজ খায়। তবে তরমুজের বীজগুলো যত্ন করে রেখে দিই। প্রতিদিন তরমুজ দিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলো সুদর্শন নিয়ে যায়। কিন্তু তরমুজের বীজের তেল কী কাজে লাগবে, সেটা তার কাছে এখনও জানা হয়নি!

টালিগঞ্জে পটললাল

চিরকাল এমন তো ছিল না। আজ সিনেমা বলতে সবাই 'হলিউড-হলিউড' করে যাচ্ছে। আমেরিকার লস এঞ্জেলস শহরের গোলমেলে শহরতলি এখন হলিউড নামে পৃথিবীর চলচ্চিত্রের রাজধানী। অন্যদিকে হৃতগৌরব, দীর্ণ, জীর্ণ টালিগঞ্জ বছরের পর বছর ধুঁকছে। এবং সবচেয়ে অপমানের কথা এখন ওই ম্লেচ্ছদেশীয় হলিউডের অনুকরণে টালিগঞ্জকে টলিউড বলা হয়। কিন্তু ভাল করে অবশ্যই মনে আছে, অন্তত মনে না থাকার কথা নয়, এই টালিগঞ্জকে সঙ্গে মিলিয়েই একদা হলিউডকে হলিগঞ্জ বলা হত।

এর সব কথা ডাক্তার সহদেব শুকের জানার কথা নয়। তিনি তাঁর পার্কসার্কাসের চেম্বারে বসে শেষ রোগী চলে যাওয়ার পরে হোমিওপ্যাথিক কবিতা লিখছিলেন।

সহদেববাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কবিতাও তিনি হোমিওপ্যাথিক ডোজে লেখেন। তাঁর কবিতায় তেজ বেশি, যদিও আকারে ছোট।

একটু সময় পেলেই সহদেববাবু কাব্যচর্চা করেন। চর্চা মানে অবশ্য পাঠ নয়। শুধু লেখা। লেখার জন্যেই লিখে যাওয়া।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে মিস জুলেখার শেষতম স্বামী পটললালকে উদ্ধার করার পর তাঁর গোয়েন্দাগিরিতে রীতিমত হাতযশ হয় (পটললাল ও মিস জুলেখা দ্রষ্টব্য)। সহদেববাবু এখন ডাকাতি, রক্তারক্তির মধ্যে নেই, তিনি খুচখাচ পালিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, দলিল-উইল জাল, তহবিল তছরূপ, জোচ্চুরি এইসব তদন্ত করেন। তবে তাঁর পছন্দের কাজ হল, ব্যাভিচার, নারী হরণ, ফুঁসলানো ইত্যাদি সব স্ত্রী ঘটিত ব্যাপার।

কিন্তু কড়েয়া রোডে তাঁর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় রোগী গিজগিজ করে। কদাচিৎ সহদেব ডাক্তার সময় পান রোগী দেখা ছাড়া, ওষুধ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার। এবং এতে তাঁর চমৎকার আয় হয়। আর সেই জন্যই হয়তো সহদেববাবুর মন চায় প্রাণ ভরে পদ্য লিখতে এবং সুযোগ পেলে গোয়েন্দাগিরির উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়তে।

এই তো আজই কলকাতার বনেদি পাড়া গুরুসদয় দত্ত রোডের বিখ্যাত বড়লোক কোটিপতি খাণ্ডোলিয়ার বাড়ি থেকে একটা গোলমেলে কেস এসেছিল তাঁর হাতে।

খাণ্ডোলিয়া পরিবারের প্রধান পেশা স্মাগলিং। দুবাইতে, সিঙ্গাপুরে, হংকংয়ে তাঁদের কাজকারবার, যাতায়াত। এবছর গ্রীষ্মকালে খাণ্ডোলিয়া পরিবারের প্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়া সিঙ্গাপুর থেকে একটি কালো কুচকুচে পমেরেনিয়ান কুকুর বহুমূল্যে কিনে এনেছিলেন।

পমেরেনিয়ান হল ঝুলো-ঝুলো লোমওয়ালা ফুটফুটে সাদা জাতের কুকুর। এ জাতের কুকুর অন্য কোনও রঙের প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু সিঙ্গাপুরের এই কুকুরটা হল অস্বাভাবিক কালো। এই কুকরটি অত্যধিক দাম দিয়ে, দশ হাজার ডলারে ক্রয় করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু।

অবশ্য এর পেছনে তাঁর একটা ব্যবসায়িক বুদ্ধিও কাজ করেছিল।

নানা রকম ঝঞ্ঝাট, পুলিশ-আবগারি-আয়কর ইত্যাদির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়া সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চোরাকারবারির লাইন ছেড়ে দেবেন। নতুন ব্যবসায় যাবেন।

ব্যবসাটা ক্যাসেটের। ভিডিও ক্যাসেট। দূরদর্শনের জন্যে নয়, সরাসরি ভি সি পি-তে দেখানোর জন্যে, পঞ্চাশ মিনিটের আকাশি ছবি। পুরোপুরি নীল বা ব্লু-ফ্লিম যাকে বলে, তা নয়—সেন্সরের চোখে ধুলো দেবার জন্য একটু ঢাকাঢাকি থাকবে, একটু খোলাখুলিও থাকবে, তবে সেটা আলাদা প্রিন্টে, ছাড়পত্র পর্ষদের মাননীয় সদস্যদের সেটা দেখানো হবে না।

উত্তরপ্রদেশ, একটা ইউনাইটেড প্রভিন্সের, ইউ আর পি রয়েছে, ইংরেজি বানানে উত্তরপ্রদেশেও। ইউ পি অর্থাৎ ওপরে, আর সেই ওপরের ওপরে খাণ্ডোলিয়া পরগণা।

খাণ্ডোলিয়া পরগণার শেষ মনসবদার শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়া প্রথম যৌবনে উর্দুমিশ্রিত হিন্দি ভাষার কয়েকটি কাহানিয়া রচনা করেছিলেন। দুই একটি গল্পের নাম এই রকম 'পার্বতীর সঙ্গে তিনদিন চাররাত'। কিংবা 'গভীর রাতে দিঘির পারে।'

গল্পগুলির নাম শুনেই কেমন আমিষ মনে হয় এবং সত্যিই তাই। পুরুষানুক্রমে

নিরামিষভোজী উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীকৃষ্ণবাবু বলা বাহুল্য, তাঁর সময় ও দেশের তুলনায় খুবই আধুনিক ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল গোঁড়া সম্পাদকেরা তাঁর লেখা ছাপেনি।

তাঁর নবযৌবনের সেই অবদমিত ইচ্ছা এখন শ্রীকৃষ্ণবাবু পূরণ করতে চান। তাঁর ভিডিও ছবিগুলি তিনি নিজেই পরিচালনা করবেন বলে মনস্থ করছেন। এখন নায়িকা সংগ্রহে মন দিয়েছেন, একটু খলবলে উঠতি বয়সিনী তাঁর বিশেষ পছন্দ। তেমন তেমন নায়িকার সন্ধান পেলে তিনি নিজেই তাঁর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে সেই নায়িকার স্ক্রিন টেস্ট নিচ্ছেন। সম্প্রতি হালতুর মম মজুমদার তাঁর নজরে পড়েছে। কালো, ছিপছিপে অথচ উজ্জ্বলযৌবনা মম শহর ও শহরতলির যে কোনও ফাংশনের মুখ্য আকর্ষণ। 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'র 'ফাঁকি দিয়েছে' কিংবা খলনায়কের 'চোলি কা পিছে'র সঙ্গে মম যখন কোমর এবং কোমরের কাছাকাছি জিনিসপত্র আন্দোলিত করে নাচে, স্বচ্ছ ও সামান্য বসনে, দর্শকবৃন্দও একইভাবে আন্দোলিত হতে থাকে।

সবই ঠিকঠাক ছিল।

'গভীর রাতে দিঘির পারে' মূল কাহিনীতে বেশ কয়েকটি স্ত্রী চরিত্র ছিল। কিন্তু মম মজুমদারের সুবাদে শ্রীকৃষ্ণবাবু স্ত্রী চরিত্র একটিতে দাঁড় করিয়েছেন। আগে ছিল দিঘির চার পারে চারটি সজীব ঘাঘরা-কাঁচুলি পরিহিতা রঙচঙা দেহাতি রমণীর চরিত্র, এখন একাই মম মজুমদার।

শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়ার নতুন চিত্রনাট্যে দিঘির চার পারেই মম।

প্রথম পারে বৈষ্ণবীর ভূমিকায়। গলার কণ্ঠী। ললাটে চন্দন, পরিধানে অন্তর্বাসহীন হাঁটু পর্যন্ত তোলা দোভাঁজ সিফন শাড়ি। দ্বিতীয় পারে কোমরের নীচে স্বচ্ছ লুঙ্গি, ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধুমাত্র প্রায় স্বচ্ছ ওড়না।

চতুর্থ এবং শেষ পার একটু ছায়া-ছায়া, একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, চপলা নায়িকা মম মজুমদার কী পরে আছেন কিংবা সত্যি কিছু পরে আছেন কি না?

তৃতীয় পার বাদ রয়ে গেল আমার এই বর্ণনায়। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়ার কল্পনাশক্তি ব্যাখ্যা করার। তবু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। তৃতীয় পারে মম মজুমদার পারেই নেই। তিনি আছেন পারের কাছে জলে সিঁড়ির পৈঠা ধরে চিৎ সাঁতার দিয়ে। ফিকে নীল জলের নীচে মাছের মতো ঝলমল করছে তাঁর অনাবৃত শরীর।

শ্রীকৃষ্ণবাবু মম মজুমদারের ব্যাপারটা প্রায় কব্জা করে ফেলেছেন। এখন আর এ নিয়ে তেমন কোনও চিন্তা নেই। ব্যবসায়িক ভাষায় বলা যায় ম্যানেজ করে ফেলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবাবু তাঁর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এখন প্রায় প্রতিদিনই কুমারী মম মজুমদারের স্ক্রিন টেস্ট নিচ্ছেন। মম মজুমদার অবশ্য কখনও একা আসেন না। কোথাকার যেন, কুলমারি নাকি কী এক পরগণার গোঁড়া বনেদি কায়স্থকুলকন্যা, তাঁর রাখ-ঢাক অনেক।

মম মজুমদারের মা-বাবা থাকেন আসামের চা বাগানে। মম থাকেন হালতুতে মামার বাড়িতে। তাঁর মামা হলেন জীবানন্দ দত্ত। অতীতের দিকপাল তবলাবাদক। কয়েকটি জলভর্তি চিনেমাটির পেয়ালা দু'হাতের দুটো কাঠি দিয়ে বাজিয়ে জলতরঙ্গ বাদক হিসেবে দত্তমশায় একদা দেশ বিখ্যাত হয়েছেন। এখন তিনি মম মজুমদারের এসকর্ট, সেক্রেটারি এবং সর্বোপরি অভিভাবক।

জীবানন্দবাবু বুদ্ধিমান লোক। বহুকাল এ লাইনে আছেন। স্ক্রিন টেস্টিংয়ের তিনি কিছু

বোঝেন না, সুতরাং সে ব্যাপারে মোটেই নাক গলান না। ভাগিনেয়ীকে শ্রীকৃষ্ণবাবুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে নীচের একটা বার-এ তিনি অপেক্ষা করেন। ঘণ্টা দুয়েক বাদে কাজ সেরে মম ফিরে আসে। ততক্ষণে জীবানন্দবাবু কয়েক গেলাস লাইম জিন, এক প্লেট তন্দুরি চিকেন খেয়ে নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। বার-এ বিলটা তিনিই মিটিয়ে দেন।

এই পর্যন্ত ভালই চলছিল।

শ্রীকৃষ্ণবাবু নিজের নামেই শ্রীকৃষ্ণ ক্যাসেট কোম্পানি চালু করতে উদ্যোগী হলেন। এই সময়েই তিনি সিঙ্গাপুর থেকে দুর্লভ কৃষ্ণ পমেরেনিয়ানটি বহু মূল্যে কিনে আনেন।

কুকুরটির নামকরণ হয় ব্ল্যাক প্রিন্স। শ্রীকৃষ্ণবাবুর মনোবাসনা হল হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো তিনিও তাঁর কালো কুকুরের লোগো দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ ক্যাসেট' বাজারে ছাপবেন। বিজ্ঞাপনে, প্রচারে, ক্যাসেটের কভারে সর্বত্র ব্ল্যাক প্রোফাইল ফটো থাকবে। নীচে লেখা থাকবে।

'কুকুরও ভালবাসে
শ্রীকৃষ্ণ ক্যাসেট'

দুই
পটললালের আগমন

মিস জুলেখার তৎকালীন পতিদেবতা পটললালকে উদ্ধার করে মিস জুলেখার ক্রোড়ে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে অল্প কিছুদিন জুলেখা দম্পতির সঙ্গে ডাক্তার সহদেব শুকের যোগাযোগ, যাতায়াত ছিল।

তারপর, যেমন হয় ধীরে ধীরে ডাক্তার শুক নিজের কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ায় তাঁদের আর খোঁজখবর নিতে পারেন নি, আর কার্যসিদ্ধি হওয়ার পর গোয়েন্দাকে, অসুখ সেরে যাওয়ার পরে ডাক্তারকে, মামলা জেতার পরে উকিলকে কেই বা খেয়াল রাখে, জুলেখা দম্পতিও যোগাযোগ রাখেননি। তাঁদের নিজের নিজের কাজকর্ম আছে।

জুলেখা অবশ্য গোড়ার দিকে একবার এসেছিল ওষুধ নিতে। না, কোনও অসুখ-বিসুখের ব্যাপার নয়, তাঁর অসুবিধে দাঁড়িয়েছে তাঁর শরীরের আয়তন, মেদবৃদ্ধি নিয়ে।

মিস জুলেখা ভীষণ মোটা হয়ে গেছেন। বিশাল ভুঁড়ি হয়ে গেছে। নাচের মেয়েদের এরকম হয়। একটু ঢিল দিলেই বিসদৃশ মোটা হয়ে যেতে হয়।

এদিকে বিশাল দেহে, ধামার মতো ভুঁড়ি নিয়ে নৃত্যকলা প্রদর্শন খুব মনোরম হয় না। বিশেষ করে আদিরসাত্মক নৃত্যদৃশ্য যে দর্শকেরা দেখতে আসে তারা খুব কোমল রুচির হয় না। তারা হলের মধ্যেই হাসাহাসি করে, শিস দেয়, টিটকিরি দেয়। এমনিতেই এ ধরনের নাচে কঠোর পরিশ্রম। তার ওপর ওই টিটকিরি, প্রতিবাদ। নাচের শেষে মিস জুলেখা কাঁদতে কাঁদতে স্টেজ থেকে উইংসে ফিরে চোখের জল মোছেন।

ডাঃ শুক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জানেন ওই স্থূলতা কোনও ওষুধে কমানো যাবে না। বেশি খাটতে হবে, কম খেতে হবে। এই হল এর একমাত্র চিকিৎসা।

বলা বাহুল্য, এই চিকিৎসা মিস জুলেখার মনঃপুত হয়নি। ডাঃ শুক প্রেসক্রিপশন

দিয়েছিলেন, ভাজা, মিষ্টি বন্ধ। বাংলা মদ বন্ধ। কিন্তু এই তিনটি ছাড়া জুলেখার চলে না। বহুদিনের অভ্যেস।

ডাঃ শুক বুঝেছিলেন মিস জুলেখা মোটেই ব্যায়াম করার পাত্রী নয়, তা হলে নাচের তালিমই করে যেত, মেদ বাড়তে পারতো না। তাই বলেছিলেন, দৈনিক দশ কেজি করে কয়লা ভাঙতে এবং চারবার করে তাঁর ফ্ল্যাটের সবগুলো ঘরের মেজে মুছতে।

কিন্তু চারবার না হলেও, ঘরের মেজে যদিও বা দৈনিক দু-একবার পোছার চেষ্টা করা যায়, কয়লা ভাঙা অসম্ভব।

এমনিতেই আজকের বাজারে দশ কেজি কয়লার দাম কম নয়। তা ছাড়া এত কয়লা দিয়ে জুলেখা কী করবেন। কী কাজে লাগবে এত কয়লা, মাসে প্রায় আট মণ কয়লা। বলতে গেলে একটা রেলগাড়ির খোরাক। এদিকে জুলেখাদের গৃহে কয়লার উনুন কেন কোনওরকম উনুনই নেই। খাবার দাবার, চা জলখাবার, সবই আসে হোটেল থেকে। খুব প্রয়োজনে একটা ছোট কেরোসিন স্টোভ আছে, সেটা ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং মিস জুলেখা অন্তর্হিতা হলেন। এবং তারপর আর আসেননি।

আজ হঠাৎ সকালবেলা চেম্বার ভাঙার মুখে পটললাল পাল এসে হাজির। পটললালকে অনেকদিন সহদেব দেখেননি। আজ দেখলেন, চেহারা খুব বদলায়নি। তবে মুখ খুব গম্ভীর।

পটললালকে দেখে প্রীতি নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার শুক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন।'

পটললাল একই রকম শুকনো মুখে জবাব দিলেন, 'মোটামুটি।'

পটললাল মোটামুটি বলার সঙ্গে মুটির কথা মনে পড়লো ডাক্তার শুকের। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মিস জুলেখা? জুলেখা দেবী কেমন আছেন? আজকাল আর খবরের কাগজে যাত্রা-থিয়েটারে বিজ্ঞাপনে জুলেখা দেবীর নামটাম দেখতে পাই না।'

পটললাল গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'জুলেখা এখন কলকাতায় থাকে না।'

সহদেব শুক কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'সে কি, কোথায় গেলেন উনি?'

পটললাল বললেন, 'জুলেখা, দি গ্রেট মাদার ইন্ডিয়া সার্কাসে জয়েন করেছে। এখন বোধহয় দুবাইতে আছে। এখন আর নাচ করে না।'

ডাক্তার শুক এই সংবাদে বেশ বিস্মিত হলেন, একটু থেমে তারপর বললেন, 'তা হলে এখন মিস জুলেখা কি করেন?'

পটললাল মুখ তেতো করে বললেন, 'অন্য সময় কী করে বলতে পারবো না, তবে সার্কাসের খেলার সময় বুকের ওপর হাতি তোলেন।'

এই সংবাদে আরও চমকিত হলেন ডাক্তার শুক, বুকের ওপর হাতি তোলেন!

পটললাল বললেন, 'কাজটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। জুলেখা স্টেজের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, বুকের ওপর কাঠের পাটাতন দেয়া থাকে। একটা বড় হাতি এসে সেই পাটাতনের দু'ধারে সামনের দু'পা দিয়ে দাঁড়ায়।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে যোগ করলো, 'হাতি যত বড় হবে,-হাতির যত ওজন বেশি হবে, তত সুবিধে।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সহদেব ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'তাই নাকি? কিন্তু কেন? ব্যাপারটা তো বোঝা যাচ্ছে না।'

পটললাল এবার বুঝিয়ে বললেন, 'বুকের ওপর যে কাঠের তক্তাটা থাকে হাতির সামনের দুটো পায়ের চাপ তার দু'দিকে পড়লে তক্তাটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। বুকের ওপর মোটেই চাপ পড়ে না। হাতি যত ভারী হবে তত বেশি বেঁকবে।'

ডাঃ সহদেব শুকের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে এরপর পটললাল বললেন, 'তবে সাহস লাগে। রিস্কও আছে। হাতির পা একটু বেসামাল হলে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, মানে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে জুলেখা।'

এই রকম প্রাথমিক আলাপ হয়ে যাওয়ার পরে সহদেব ডাক্তার এবার পটললাল পালের কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কী প্রয়োজনে এসেছেন।

পটললাল যা বললেন, তার মোদ্দা কথা হল এই যে, জুলেখা চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁর খুব কষ্টে কাটছে। যাত্রা-থিয়েটারে আর সুবিধে নেই, এখন টালিগঞ্জে আছেন। এক প্রযোজকের ফাইফরমাস খাটেন, কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে।

স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তার সহদেব শুক বুঝতে পারলেন, এটা কোনও চিকিৎসার ব্যাপার নয়, নিশ্চয়ই গোয়েন্দাগিরি কাজ। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজটা কি?'

পটললাল বললেন, 'একটা কুকুর খুঁজে দিতে হবে?'

সহদেব গোয়েন্দা বললেন, 'আমাকে কুকুর খুঁজতে হবে?'

পটললাল বললেন, 'কিন্তু আপনি তো সেবার আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন।'

সহদেববাবুর চিরকালই একটু ঠোঁট কাটা, তিনি বললেন, 'কিন্তু পটলবাবু, আপনি কি যা তা বলছেন। আপনি কি কুকুর? আপনি তো কুকুর নন।'

একবার নিজের কানের পাতা দুটোর ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে এবং নিজের পশ্চাৎদেশ ঘাড় ঘুরিয়ে অবলোকন করে মনে মনে নিশ্চিত হয়ে নিলেন পটললাল যে তিনি কুকুর নন, তারপর জানালেন, 'কিন্তু আপনাকে বলছি ডাক্তারবাবু, এটা কোনও সামান্য কুকুর নয়।'

সহদেব গোযেন্দা প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, 'সামান্য কুকুর নয়? অসামান্য কুকুর? সে আবার কি?' সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিলেন, 'গোয়েন্দার কাজে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে ডাক্তারবাবু বলবেন না। আমাকে এস এস বলবেন, প্রথমে এস সহদেব পরে এস, শুক।'

পটল বললেন, কুকুরের দাম দশ হাজার ডলার। শুনে এস এস বললেন, 'কুকুরটা কোথায় কেনা হয়েছিল?'

পটললাল বললেন, সিঙ্গাপুরে স্যার।'

এস এস বললেন, 'সে যা হোক, সিঙ্গাপুরি ডলারের এত দাম নয়, তবুও একটা কুকুরের দাম হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু কুকুর খোঁজার কাজ আমি করি না।'

সত্যিই পটললাল কুকুর খোঁজার কাজ নিয়ে আসায় সহদেব গোয়েন্দা খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। এমনকী তেমন তেমন না হলে নারী খোঁজার কেসও সবসময় তিনি নেন না।

মন-না-ভরানো, তুচ্ছ-অতি তুচ্ছ সব কেলেঙ্কারি যার মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই, রহস্যের ঘোরটোপ নেই সহদেব ডাক্তার ঠিক করেছেন যদি মিস জুলেখার কেসের মতো কেস পান, ভেবে দেখবেন, না হলে গোয়েন্দাগিরিতে যাবেন না।

তাই সহদেব ডাক্তার এখন সময় পেলেই কাব্যচর্চা করেন, তাঁর রোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কবি আছেন, দু'জন লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং কয়েকজন আধুনিক কবিও আছেন, এমনকী একজন নারীবাদী মহিলা কবিও আছেন।

এই অবস্থায় তাঁর কাছে একটি কুকুর ঘটিত কেস এসেছে। কবি-গোয়েন্দার জীবনে এটা একটা দুঃসহ অপমান। তাও কিনা প্রস্তাবটা এসেছে তাঁর প্রিয় পাত্রী জুলেখার বর এই পটললালের কাছ থেকে।

তিন

কবি সহদেব

কিন্তু আজ ডাক্তার সহদেব গুকের মনটা খুব প্রসন্ন। তা না হলে পটললালের ওই কুপ্রস্তাবে তিনি এতক্ষণ খেঁকিয়ে উঠে তাকে চেম্বার থেকে বার করে দিতেন।

কাল শেষরাত থেকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেছেন সহদেববাবু। প্রতিদিন এর একটু পরেই তিনি মর্নিং-ওয়াকে বেরোন। কিন্তু আজ বৃষ্টির জন্যে বেরোতে পারলেন না। ফলে প্রাতঃভ্রমণের দেড় ঘণ্টা সময় চুটিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন।

প্রথম দিকে সহদেববাবু শুধুই গান লিখতেন। কিন্তু আজকাল কবিতা লেখার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। গান লেখার ঝামেলা অনেক, অনেক আটঘাট, সঞ্চারী-অন্তরা কত কিছু মেনে চলতে হয়।

কবিতা লেখা অনেক সোজা। খোলামেলা ব্যাপার। একটু তাল মিলিয়ে লিখে যাও, পারলে মিল দাও, মিল না দিলেও কিছু আসে যায় না। আর তেমন বেকায়দা দেখলে মুক্ত ছন্দ বা এলানো গদ্যে লিখলেই হয়ে যায়।

এই তো আজ সকালেই ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে খাতা কলম খোলার আগেই দাঁত মাজতে মাজতে সহদেববাবুর ফ্লো এসে গিয়েছিল। বড় বড় কবির মতো সহদেববাবুরও মনের মধ্যে ফ্লো এসে গেলে নিজেকে আর সামাল দিতে পারেন না।

আজ সকালেও তাই হল। বাঁ হাতটা টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ডান হাতের তর্জনীতে টুথপেস্ট থেকে পেস্ট বার করে লাগিয়ে তাই দিয়ে বাথরুমের আয়নায় কাঁচের ওপরে দ্রুতগতিতে লিখে ফেললেন।'

রক্ত হারতাভ
দন্ত মঞ্জন,
চড়ুই-গাংচিল
শালিক-খঞ্জন
শ্যালিকা ঠাকুরানী
নয়নে অঞ্জন।
আমারে দোষ দ্যায়
সে ব্যাটা কোনজন॥

দুঃখের বিষয় এই কবিতাটি লিখতে প্রায় দশটাকা খরচ হয়েছিল সহদেব ডাক্তারের। একটা রঙিন টুথপেস্টের প্রায় আধাআধি ফুরিয়ে ফেলেছিলেন। বাথরুমের আয়নাটা যার

ওপরে নীল টুথপেস্টে এই কাব্যচর্চা হয়েছিল সেটা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে সহদেববাবুর পরিচালিকা। তাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সে বাসন মাজতে পারে, কাপড় কাচতে পারে, মেজে মুছতে পারে কিন্তু টুথপেস্ট মাখানো আয়না সাফ করার তার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তার হাত থেকে স্লিপ করে আয়নাটি চৌচির হয়ে যায়।

এই আয়নাটির ক্রয়মূল্য দেড়শো টাকা ধরলে আজ সকালের ফ্লো আসা কবিতাটির জন্যে সহদেববাবুর গচ্চা গেল একশো ষাট টাকা। কিন্তু কেউ যদি ভেবে থাকেন যে আয়নার কাঁচে রঙিন টুথপেস্ট নিয়ে কবিতা লিখে সহদেববাবু ক্ষান্ত হয়েছিলেন, এতেই তাঁর ফ্লো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা হলে বলবো এই কবি-গোয়েন্দার বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণাই গড়ে ওঠেনি।

দাঁত মাজার পরে ধীরেসুস্থে চায়ের টেবিলে বসে চা খেতে খেতে সহদেববাবু তাঁর অতি প্রিয় নিউ মার্কেট থেকে কিনে আনা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই কবিতার খাতায় ওই একই বিষয়ে, মানে দাঁত মাজা নিয়ে কবিতা রচনায় মন দিলেন।

এবার অবশ্য রঙিন টুথপেস্ট দিয়ে নয়। বেছে বেছে বারো রঙের বারোটা ফেল্ট পেনের একটা সেট কিনেছেন সহদেববাবু, সেই কলমের সেট দিয়ে একেক পংক্তি একেক রঙে লিখতে ল।গলেন তিনি। বলা বাহুল্য, রঙের বাহুল্যে এই কবিতাও যথেষ্ট খোলতাই হল।

সবুজ সুনীল দাঁতের মাজন,
তুমিই রাজ্ঞী তুমিই রাজন॥
ঝিরঝির দিন ঝিরিঝিরি রাত
তাজ্জব বাত ঝকঝকে দাঁত
ওগো সাদা ফেনা কেউ তো জানে না
তব কাছে মম কতখানি দেনা...

এই রকম লাইনের পর লাইন একটি দীর্ঘ পদ্য, দু পেয়ালা চা খেতে খেতে সহদেব শুক রচনা করে ফেললেন। সহদেববাবু তাঁর কবি পেশেন্টের দৌলতে ভালই জানেন যে এখন আর 'তব' কিংবা 'মম' এই জাতীয় প্রাচীন শব্দ কবিতায় ব্যবহার করা হয় না কিন্তু তিনি পরোয়া করেন না। তিনি তো আর আধুনিক কবিতা লিখছেন না, তিনি লিখছেন চিরায়ত জীবনধর্মী পদ্য।

এই তো চা খাওয়ার পরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিভিন্ন টাডা মামলার বিবরণ, সঞ্জয় দত্ত উপাখ্যান, ইয়াকুব মেমন কাহিনী পাঠ করতে করতে ঝরঝর করে অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখে ফেললেন :

টা-টা টাডা
তোর গাডা
গরম গরম।
কাজু সাজু
আজু আজু
শরম শরম॥

এইরকম চলেছে আজ সকালবেলা থেকে। বেলা হতে রোগী আসার সময় হয়ে যাওয়ায় মরক্কো লেদারেব কবিতার খাতা নিয়ে সহদেববাবু তাঁর চেম্বারে চলে এসেছেন, রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে পদ্য রচনা করে যাচ্ছেন, সেগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও অকিঞ্চিৎকর নয়। বিভিন্ন বোগী দেখে মনে যেমন যেমন ভাব আসছে তেমনই লিখছেন। যথা :

ওলাওঠা কলেরা।
মন বলে চলেরা।
অথবা
বুকভরা নিঃশ্বাস,
ফুসফুসে ফিসফাস।

পদ রচনার এ জাতীয ফ্লোরের মধ্যে যখন হাবুডুবু খাচ্ছেন ডাঃ সহদেব 'শুক' ঠিক সেই সময় কিনা কুকুর খুঁজে দেওযার মতো হাস্যকর প্রস্তাব নিযে এসেছেন পটললাল পাল।

মনের আবেগ যথাসাধ্য সংযত করে সহদেববাবু জানতে চাইলেন, 'কী এমন মহামূল্য কুকুর, যেটাকে খুঁজে বার না করলে চলবে না?'

এবং এই সমযেই বুদ্ধিমান সহদেব ডাক্তারেব মাথায় একটা কথা খেলে গেল যে পটললাল এখন টালিগঞ্জে সিনেমার লাইনে আছেন, নিজেব একটা ব্যাপাবে পটললালকে কাজে লাগতে পারে।

চার

যার ধন তার ধন নয়

কবিতা লিখে কোনও পয়সা হচ্ছে না, গোয়েন্দাগিরিতেও বিশেষ কিছু নয, তবে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারির ব্যবসায় আজ কিছুদিন হল বেশ ভাল উপার্জন হচ্ছে ডাঃ সহদেব শুকের।

মোট কথা, ব্যয়ের চেয়ে আয় অনেক বেশি ডাক্তার শুকের। এক কবিতা লেখাব নেশায় খরচ-খরচা খুব কম। সবচেয়ে দামি কাগজে, দামি কালিতে লিখলেও সারা বছরে যা খরচ হয় তা যারা মদ বা সিগারেট খায় তাদের এক বেলার খরচেব সমান।

সুতরাং সহদেব শুকের হাতে টাকাপয়সা ভালই জমে যায়। এসব ক্ষেত্রে অন্য দশজন যা ভুল করে থাকে, অতি বুদ্ধিমান সহদেববাবুও ঠিক তাই করেছেন।

উদ্বৃত্ত আয়ের হিসাব আয়কর দপ্তর জানতে পারবে না, ফলে বেশি আয়কর দিতে হবে না এই ভরসায়, তদুপরি বেশি সুদ পাওয়া যাবে এই আশায় ব্যাঙ্কে বা পোস্টাপিসে টাকা না রেখে তিনি চিটফান্ডে টাকা জমাতে আরম্ভ করলেন।

চিট ফান্ড শোনার পরও লোকে কী সাহসে এখানে বহু কষ্টের বহু পরিশ্রমের টাকা জমায় এ বিষয়ে অবশ্য সহদেববাবুর মনে বেশ খটকা ছিল।

কিন্তু এই সময়ে ডাঃ শুকের এক নতুন রোগী তাঁকে বোঝালো যে এ চিট সে চিট নয়। এ চিট মানে জোচ্চোর নয়, এ চিট অন্য জিনিস, একেবারে যাকে বলে কামধেনু কিংবা রূপকথার টাকার গাছ। তেমন তেমন জায়গায় ঠিকমতো টাকা গচ্ছিত রাখতে

পারলে বছর বছর টাকা ডবল হয়ে যাবে।

বছর বছর টাকা ডবল হয়ে যাওয়ার লোভ কম নয়। তা ছাড়া তাঁর সেই রোগী সত্যকুমার ভক্ত যখন জানালেন যে তিনি নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিটফান্ডের প্রধান এজেন্ট তখন শুকদেববাবু আর ইতস্তত করলেন না তাঁর উদ্বৃত্ত আয় সত্যকুমারবাবুর কোম্পানিতে গচ্ছিত রাখতে।

তা ছাড়াও চিট ফান্ড হলে কী হবে সত্যকুমারবাবুর কোম্পানির নামটি বড় আশাব্যঞ্জক 'মারিনা'। ইংরেজিতে নামের বানান এম এ আর আই এন এ (MARINA)।

'মারিনা' শব্দটা ভাঙলে সাদা বাংলায় দুটো শব্দ মারি এবং না পাওয়া যায়। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তার নামের মধ্যেই বলে দেয় মারি না, তা হলে তার ওপরে আস্থা না থেকে যায় না।

সুতরাং সত্যকুমারবাবুর প্ররোচনায় সহদেববাবু 'মারিনা'র ওপরে যথেষ্ট আস্থা রেখেছিলেন এবং অবশেষে ভরাডুবি হয়েছেন। ঠিক কত টাকা তিনি মারিনার চিট ফান্ডে বিনিয়োগ করেছিলেন সেটা অবশ্য কোনওদিন কাউকে খুলে বলেননি। তবে তাঁর ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডার হরি চক্রবর্তীর ধারণা মোট টাকার পরিমাণ লক্ষাধিক হতে পারে। সে দেখেছে প্রত্যেক শনিবার ওই সত্যকুমার এসে বেশ কয়েক হাজার টাকা করে নিয়ে যেত আর নানারকম রঙিন কথা বলত।

সত্যকুমারবাবু কখনও বলতেন, 'আপনার সেই জুলাই মাসের এগারো হাজার টাকা কুড়ি হাজার হয়ে গেছে, টাকাটা এনে দেব নাকি ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু বলতেন, 'আরে না না। আবার লাগিয়ে দিন।'

আরেকবার সত্যকুমার বললেন, 'একটা আর্ট ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। মারিনার মালিক ভবসিন্ধু ঘোষ সিনেমা প্রযোজনায় নেমেছেন, নেমেই প্রথম দুটো বইতে দশ-বারোটা মেডেল পেয়ে গেছেন।'

ডাক্তারবাবু হয়তো বলেছেন, 'তাই নাকি?'

সত্যকুমারবাবু গড় গড় করে সিনেমা দুটোর নাম বলে দিয়েছেন, তারপর গলা নামিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলেছেন, 'আপনার সব টাকা এবার আর্ট ফিল্মে লাগিয়ে দিন।'

আর্ট ফিল্ম জিনিসটা যে কী ডাঃ সহদেব শুকের সে বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। কিন্তু কী করে যেন এটা বোঝেন যে ওসব জিনিস সাধারণ দর্শক দেখে না। তাই আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আর্ট ফিল্ম তো ফ্লপ হবে, ওখানে টাকা খাটিয়ে মারা পড়ব যে।

তখন আরও গলা নামিয়ে সত্যকুমারবাবু গোপন কথাটি বললেন।

আর্ট ফিল্মের লাভ হলের টিকিট বিক্রির ওপরে নির্ভর করে না। তার ফিকির আলাদা।-

প্রথম বই তোলার খরচ খুব কম। অভিনেতা, অভিনেত্রী, লেখক এদের জন্যে বিশেষ টাকাপয়সা লাগবে না। অভিনেতা, অভিনেত্রী হয় আনকোরা অর্থাৎ যাকে সিনেমার ভাষায় বলে নবাগত-নবাগতা। কিংবা থিয়েটারের লাইনের বড় জোর টালির নালায় ভেসে যাওয়া অতীতের আবর্জনা, যাঁদের বক্স অফিস শূন্য এবং যে কোনও সুযোগ পেলেই হল, অর্থ না পেলেও কৃতার্থ বোধ করেন।

এদিকে পরিচালক নিজেই চিত্রনাট্যকার, সুরকার, সঙ্গীতকার ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুটিংয়ের জন্যেও স্টুডিও ভাড়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই, রাস্তায় ঘাটে, বস্তিতে বাজারে লোকেশন শুটিং। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথা, আর্ট ফ্লিমের পিছনে ব্যয় খুবই যৎসামান্য।

অথচ আয়ের মোটা পথ রয়েছে। সরকারের, ফিল্ম কর্পোরেশনের সাহায্য, ভর্তুকি, অনুদান, ব্যাঙ্কের ঋণ (পরিশোধ করতে হয় না) একটু চেষ্টা করলেই সংগ্রহ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আয় যা হয়, ব্যয় তত না করলেও চলে, ইচ্ছেমতো লাভ রাখা যায়।

বলা বাহুল্য, সহদেববাবু লোভের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন এবং এখন আফসোস করছেন। মারিনা কোম্পানির চেয়ারম্যান সাহেব জোচ্চুরি ও প্রতারণার দায়ে ধরা পড়েছেন। বহু কষ্টে একবার জামিন পান তো সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্রেপ্তার হন। তিনি সহদেববাবুর এবং আরও কারও কারও টাকায় 'দিন আনি দিন খাই' নামে যে বইটি প্রযোজনা করেছিলেন সেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। কয়েকদিন আগে পুলিশ সেই সব ফিল্ম আরও অনেক কাগজপত্রসহ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

এই সব নিয়ে দৈনিকই সব চাঞ্চল্যকর খবর বেরোচ্ছে। সহদেববাবু আশা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেননি, এখনও ভাবেন টাকার কিছু অংশ অন্তত উদ্ধার হবে।

পাঁচ

মারিনা

যদিও পটললাল আজ তাঁর কাছে কুকুর খুঁজে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসায় সহদেববাবু পটললালের ওপর খুবই চটে গিয়েছিলেন, পরে ভেবে দেখলেন এই লোকটা সিনেমা লাইনের সুলুক সন্ধান জানে। হয়তো পটললাল টাকা উদ্ধারের ব্যাপারে লাগতে পারে।

সুতরাং তাঁর সমস্যা পটললাল গুছিয়ে বলার আগেই সহদেব ডাক্তার নিজের সমস্যার কথা পটললালকে জানালেন।

সব কথা পটললাল খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, মাঝে মাঝে তাঁর চোখ ঝকঝক করতে লাগল।

সহদেববাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পটললাল প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'তা হলে ভুজঙ্গবাবুর ছোবল আপনিও খেয়েছেন।

কে ভুজঙ্গবাবু? ছোবল মানেই বা কী? সহদেববাবু পটললালকে অনুরোধ করলেন রহস্য না করে সমস্ত ব্যাপারটা খোলসা করে বলতে।

দেখা গেল জনৈক ভুজঙ্গবাবুর ওপর পটললালের ভীষণ রাগ। তিনি কেবল গজরাতে লাগলেন, তাতে পরিষ্কার করে কিছুই বোঝা যায় না।

বহু কষ্টে সহদেব ডাক্তার পটললালের ভাষণ থেকে যেটুকু উদ্ধার করতে পারলেন তা হল দীর্ঘদিন ভুজঙ্গবাবু প্রাচীন পাপী। পটললাল তাঁকে দীর্ঘদিন হল চেনেন।

অহিভূষণ, ভুজঙ্গভূষণ দুই ভাই। পারিবারিক ব্যবসা ছিল হাটখোলায় রেড়ির তেলের পাইকারি কারবার। রেড়ির তেলের চাহিদা কমে যেতে সরষের তেলের ভেজালের জন্যে তাঁরা শেয়ালকাঁটার বীজ আর সজনেগাছের ছাল সরবরাহ করতেন বড়বাজারে, তারপর চিৎপুরের যাত্রা হয়ে হাতিবাগানের থিয়েটারে।

সেই হাতিবাগানের হল থেকে পটললাল এদের চেনেন। জুলেখা যখন থিয়েটারে নাচত, তখন এরা কম জ্বালিয়েছে জুলেখাকে। এমনকী সতীসাধ্বী জুলেখার কোমরের নীচের মাদুলি নিয়ে এই দুই ভাই নোংরামি করেছে।

তবে ওই থিয়েটারের সময়েই দু'ভাইয়ে গোলমাল শুরু হয়, বনিবনা বন্ধ হয়।

এক শুভ সন্ধ্যায় বহু লক্ষ টাকার ইন্সিওর করে এবং পরে থিয়েটার হলের জমিটা জীবনভাই-মরণভাই প্রোমোটার্স অ্যান্ড ডেভেলাপার্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে লিজ দেওয়ার চুক্তি করে দু'ভাই দু'দিকে চলে গেলেন।

তার আগে হাতিবাগান বাজারের পেছনের চক্রবর্তী বাড়ির চোখে ছানি পড়া বৃদ্ধ দারোয়ান সীতারামকে অহি-ভুজঙ্গ দু'জনে পাঁচশো-পাঁচশো করে হাজার টাকা দিয়ে গেলেন।

টাকাটা বকশিস নয়, পারিশ্রমিক।

সীতারাম উত্তর কলকাতার পেশাদার অগ্নিসংযোগকারী। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় সে রাজাবাজার ও উল্টোডাঙার বস্তিতে আগুন লাগিয়ে হাত পাকিয়েছিল। এই বৃদ্ধ বয়েসে, অশক্ত শরীরে আগুন লাগানোর ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনস্বীকার্য। কোথায় পেট্রোল লাগবে, কোথায় কেরোসিন হলে হবে নাকি শর্ট সার্কিট করাতে হবে, তার ওপরে কখন ভাল সময়, দিনে না রাতে, কখন কাজটা নিরাপদ এবং নিঃসন্দেহে হবে, এ সমস্ত বিষয়ে সীতারামই শেষ কথা।

সে যা হোক, অগ্নিকাণ্ডের বিবরণে গিয়ে লাভ নেই। তবে পটললালের কথা থেকে সহদেববাবু বুঝতে পারলেন যে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে অহিভূষণের আর কোনও খোঁজখবর নেই। কিন্তু পটললালের বিশ্বাস যে অহিভূষণকে কোনও কায়দা করে ভুজঙ্গভূষণ ধরাধাম থেকে সরিয়ে ফেলেছে কিংবা কোনও পাগলাগারদ-টারদে জোর করে ভরে রেখেছে।

পাগলাগারদ বড় সাংঘাতিক জায়গা, বিশেষ করে জেলখানার ভিতরের পাগলাগারদ, একেবারে সেখানে প্রবেশ করলে কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষেই প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে সে পাগল নয়। সে যা-ই করুক তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ আবিষ্কৃত হবে।

এই পর্যন্ত শুনে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'আমাকে কুকুর খুঁজতে বলছেন কেন? তার চেয়ে বলুন আমি এই অহিভূষণকে খুঁজে বার করে দিচ্ছি।'

পটললাল বললেন, 'স্যার, অহিভূষণ হারিয়ে গেলে কারও কিছু আসে যায় না, তার স্ত্রী পুত্র পরিবার নেই, সে বিয়ে করেনি। কিন্তু এই কুকুরটা হারিয়ে যাওয়ায় ঘোর সর্বনাশ হয়েছে।

কুকুর হারানোয় এমনকী সর্বনাশ হতে পারে যা মানুষ গুম করে ফেলার চেয়েও মারাত্মক? একটু চিন্তায় পড়লেন সহদেববাবু। তাঁর গোয়েন্দা মন বলল ব্যাপারটা খুব সোজা নয়।

এরপরে পটললাল ঘণ্টাখানেক ধরে যা যা বলে গেলেন তা খুবই মর্মান্তিক।

জুলেখা সার্কাসে যোগদান করে বিদেশে যাওয়ার পরে জুলেখার পূর্বতন মালিকদ্বয় ফাইফরমাস খাটার কাজে পটললালকে নামমাত্র বেতনে নিয়োগ করেন। দৈনিক সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত থিয়েটার হলের দোতলায় ডিউটি। পটললালের কাজ ছিল

মালিকদের ঘরে। দোতলায় পাশাপাশি দুটি ঘরে দুই মালিকের সন্ধ্যার পরে শোয়া বসা। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিল যেমন আছে, তেমনই আছে সোফা কাম বেড। যদি কখনও অভিনেত্রী অথবা অভিনেত্রী যশপ্রার্থিনী দুই ভাইয়ের কারও সঙ্গে ঘরের ভিতরে থাকেন তখন বাইরেটা আগলানোর দায়িত্ব ছিল পটললালের।

এ ছাড়া জর্দা পান, সিগারেট, সোডা, ফরমায়েস মতো ছুটে ছুটে আনতে হত, তাও পান থেকে চুন খসলে পরিত্রাণ নেই।

এর বদলে দুই ভাই পটললালকে যা মাসোহারা দিত তাতে দুবেলা পেট ভরে, হোটেলে ভাত খাওয়া হত না। কিন্তু পটললালের এমন কোনও যোগ্যতা নেই যাতে এ বাজারে অন্য কোনও কাজ যোগাড় করতে পারেন।

অবশেষে অগ্নিকাণ্ডের দিন সন্ধ্যাবেলা পটললালের ওপরে সাংঘাতিক একটা কাজ চাপিয়ে দু'ভাই দু'দিকে চলে গেলেন।

তাঁরা পটললালকে বলে গেলেন, রাত সোয়া দশটায় থিয়েটার হলে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগবে। যে ঘরে শর্ট সার্কিট হবে সেই ঘরে কয়েক টিন কেরোসিন তেল রাখতে হবে। আগুন লেগে যাওয়ার পরে আসল কাজ। মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকান রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখান থেকে কিংবা অন্য কোথাও থেকে, অগ্নিকাণ্ডের অগ্রগতি প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ফোন করে একটা জায়গায় জানাতে হবে। এসব কাজ ঠিকমত করতে পারলে পটললালের যে সাড়ে তিন মাসের মাইনে বাকি আছে সেটা পরদিন সকালে পাবে।

আপাতত সেদিন রাতের খরচ-খরচা একটি দশ টাকার নোট পটললালেব হাতে তুলে দিয়ে দু'ভাই কেটে পড়লেন।

দুঃখের বিষয়, সেদিন কী একটা হিসেবের ভুলে সোয়া দশটাব জায়গায় থিয়েটার হলে আগুন লাগে সাড়ে নয়টায়। অহি-ভুজঙ্গ আর একটু আগেই চলে গেছেন। সবে পটললাল জিনিসপত্র গোছার্তে বসেছেন, থিয়েটার হল যখন পুড়েই যাবে, যা কিছু ছিল, ছোটখাটো জিনিস—হাতের কাছে কুঁজো, গেলাস, ফুলদানি, অ্যাশট্রে, পাপোশ, পর্দা সব কিছু তিনি একটা বড় ঝোলার জন্য ভরছিলেন, এমন সময় চিড়িক চিড়িক করে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের আগুন, তারপর কেরোসিন টিন ফেটে যাওয়ার গগনবিদারী আওয়াজে একলাফে চোঁচা দৌড় দিলেন।

এক দৌড়ে হাতিবাগান থেকে টালিগঞ্জে। তবে পথে দু'বছর লেগেছিল। রীতিমত ঘুরপথ যাকে বলে।

এই দু'বছর পটললাল করেননি এমন কোনও কাজ নেই। পটললাল তাঁর বিভিন্ন কাজের যে তালিকা সহদেববাবুকে পেশ করলেন সেটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

১) ময়দানে ফুচকাওয়ালাদের কাছ থেকে ফুচকা খাওয়ার পর লোকেরা শালপাতা ফুটপাথ বা মাঠে ফেলে দেয়। শালপাতার ঠোঙা জোড়ার কাঠি খুলে সেই শালপাতা পাইপের গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আবার ফুচকাওয়ালার কাছে বেচলে দৈনিক সাত থেকে দশ টাকা পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ফুচকাওয়ালা দয়ালু হলে, দুয়েকটা ফুচকা ফ্রি।

২) অনুরূপভাবে অক্ষত চায়ের ভাঁড় কুড়িয়ে সেটা ধুয়ে আবার বিক্রি করা।

৩) দরজির দোকানে নতুন তৈরি জামায় সুঁচ সুতো দিয়ে বোতাম লাগানো।

৪) আদালতে সাক্ষি দেওয়া। ছোটখাটো চুরি-জোচ্চুরি, মারামারি এই রকম ফৌজদারি মামলায় আবার ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা, স্বামী-স্ত্রী ঘটিত দেওয়ানি মামলায় নানারকম সাক্ষী লাগে। সব আদালতের বটতলা মিথ্যা সাক্ষীতে ভর্তি। কাজটা ভাল। তবে তীব্র প্রতিযোগিতা।

মামলায় মিথ্যে সাক্ষী হওয়ার পর্যায়ে পটললাল আবিষ্কার করেন যে ফৌজদারি মামলায় মিথ্যে সাক্ষী হওয়ার চেয়ে কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক অথচ যথেষ্ট লাভজনক কাজ রয়েছে একটা, সেটা হল মিথ্যে আসামি হওয়া।

অনেক বড়লোক, গুণ্ডা, ব্যবসায়ী বা স্মাগলার ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। পরে জামিনে খালাস হয়ে বেপাত্তা হতে পারেন না। তাঁর জায়গায় কাঠগড়ায় অন্য একজন প্রক্সি দেয়। এ কাজে আয় বেশি, দৈনিক পাঁচশো টাকার মতো।

তবে জেল-জরিমানা হলে একটু ঝামেলা আছে। জরিমানার টাকা অবশ্য মূল আসামিই দিয়ে দেয়। জেল হলে জেল খাটতে হয়, এর একটা ভাল দিক যে জেলে থাকা-খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না, সেটা ফ্রি। তা ছাড়া জেল খাটার সময় আসল আসামির কাছ থেকে মাসোহারা পাওয়া যায়। মাসে প্রায় পাঁচশো টাকা। ছয় মাস জেল খাটলে মোটা আয়। তা ছাড়া জেল থেকে বেরোলেই টাকাটা নগদে হাতে পাওয়া যায় এবং এই টাকা প্রায় কখনওই মারা যায় না।

একটা প্রতারণার কেসে মিথ্যে আসামি হয়ে একবছর মেয়াদ খাটতে গিয়ে আলিপুর জেলে আবার ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে পটললালের দেখা।

ভুজঙ্গবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন 'মারিনা' কোম্পানির প্রধান পরিচালক হিসেবে। থিয়েটার পর্ব শেষ করে ভুজঙ্গবাবু প্রথমে একটা অভিনব কোম্পানি খোলেন। কোম্পানির নাম 'ম্যমি ইন্ডিয়া কর্পোরেশন'। এই কোম্পানির বহু বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, বিজ্ঞাপনটি পাঠ করলেই কোম্পানিটির অভিনবত্ব জানা যাবে।

ম্যমি ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন
প্রাচীন মিশরীয় পদ্ধতি
ম্যমি বানাইবার সহজ উপায়

আর চিন্তা নাই
প্রিয়জনের মৃত্যুর পর মৃতদেহ
অল্প খরচে
ম্যমি করিয়া ঘরে রাখুন
মৃতদেহ আর পোড়াইতে হইবে না।
মৃতদেহ আর কবর দিতে হইবে না॥
যোগাযোগ করুন : পোস্ট বক্স নং...

দুঃখের বিষয়, কয়েকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে বিষয়টি বহুজনের সঙ্গে পুলিশেরও নজরে পড়ে। এবং একটু খোঁজ খবর নিয়েই পুলিশ বুঝতে পারে ব্যাপারটি পুরো জোচ্চুরি। নারকেল তেল এবং সরষের তেল একত্রে মিশিয়ে তার মধ্যে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে এক রকম প্রলেপ বানানো হয়েছে, সেটাই মৃতদেহের গায়ে মাখাতে হবে। ব্লিচিং

পাউডারের গন্ধে কয়েকদিন মৃতদেহের পচনের গন্ধ টের পাওয়া যাবে না। এর পর পুলিশের চাপে পড়ে ভুজঙ্গবাবু লাইন বদল করেন এবং সরাসরি টাকা জাল করার ব্যবসায় চলে আসেন। নতুন কোম্পানি করে নাম দেন 'মারিনা'।

এই পর্যন্ত শুনতে সহদেববাবুর প্রায় ধৈর্যভঙ্গ হয়ে এসেছিল। 'মারিনা'র প্রসঙ্গ উঠতে তিনি বেশ চনমনে হয়ে উঠলেন। 'মারিনা' থেকেই ভুজঙ্গবাবু আর্ট ফিল্মের কথা সহদেববাবুর মনে পড়ল। 'দিন আনি দিন খাই' করতে গিয়ে সহদেববাবুর টাকাটা যে চোট খেয়েছে, সেটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

পটললালের কাহিনী আরও একটু বাকি ছিল।

পটললাল জেল খেটে যখন বেরোলেন তখনও জেলে বিচারাধীন বন্দি হয়ে আছেন ভুজঙ্গবাবু।

ভুজঙ্গবাবুই পটললালকে খাণ্ডোলিয়ার ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন দেখা করতে।

কিন্তু দেখা করে খাণ্ডোলিয়াকে ভুজঙ্গবাবুর নাম বলতেই খাণ্ডোলিয়া এই মাবেন কী সেই মারেন।

ছয়

খাণ্ডোলিয়ার বেনামি এজেন্সি জীবনভাই মরণভাই প্রোমোটারস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অহি-ভুজঙ্গ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে হাতিবাগানের থিয়েটার হলটাব লিজ নিয়েছিলেন বিশেষ গোপনে।

আগুন লাগানো, অগ্নি সংযোগ যাকে ইংরেজিতে বলে আর্সন, আইনেব চোখে অত্যন্ত গর্হিত, জামিনের অযোগ্য অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়া পরিকল্পনা করেছিলেন আগুনের ব্যাপারটা অল্পে মিটে গেলে সেই জমিতে বহুতল বাড়ি বানাবেন।

কিন্তু বাদ সাধলো জনগণ। জনগণের মাথায় কখন যে কী পোকা লুকিয়ে থাকে খাণ্ডোলিয়া সাহেব সারা জীবনেও বুঝে উঠতে পারেন নি।

হল পুড়ে যাওয়ার পরে সাংঘাতিক হইচই, খবরের কাগজে লেখালেখি মিটিং পথসভা আরম্ভ হয়ে গেল। হলের ওদিকে এগোয় কার সাধ্যি। পাবলিক ধরতে পাবলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ফলে খাণ্ডোলিয়া সাহেব একথা পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারলেন না যে তিনিই পুড়ে যাওয়া হলের জমিটা লিজ নিয়েছেন।

বন্ধু-বান্ধব এবং উকিলের পরামর্শে তিনি একদম চুপ করে রইলেন। তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ল ওই দুই ভাই অহিভূষণ আর ভুজঙ্গভূষণের ওপর। কিন্তু তাঁবা তখন কোথায়? অহিভূষণ পরপারে অথবা জেলের মধ্যে পাগলা গারদে। আর ভুজঙ্গভূষণ সেই সময়ে বক্স নম্বরের আড়ালে ম্যমির ব্যবসা করছেন। তাঁর পাত্তা করা অসম্ভব।

পরে অবশ্য যখন 'মারিনা' কোম্পানি করেন, সেই সময়ে ভুজঙ্গভূষণের খবর পেয়েছিলেন খাণ্ডোলিয়া কিন্তু তিনি ভুজঙ্গভূষণকে যোগাযোগ করার আগেই ভুজঙ্গবাবু সিনেমার কারবারে নেমে পড়েছেন। তখন আর ভুজঙ্গবাবুকে পায় কে, কখনও আর্ট ফিল্মের ডিরেক্টরের সঙ্গে কামস্কাটকা যাচ্ছেন, আবার ফিরে এসেই তরুণী নায়িকার সঙ্গে

চলে যাচ্ছেন হাওয়াই দ্বীপে। ভুজঙ্গভূষণ তখন হাওয়ায় উড়ছেন। ওই এক জায়গায় তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডোলিয়ার মিল, দু'জনেরই বালিকা-নাবালিকা নায়িকার ওপরে ঝোঁক।

সে যা হোক, পটললাল দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করার পর শ্রীকৃষ্ণবাবু একটু ঠাণ্ডা হলেন। তারপর জানতে চাইলেন, ভুজঙ্গবাবু কী খবর দিয়েছেন, তিনি জেলের ভিতরে বসেই কোনও নতুন কারবার ফেঁদেছেন কি না?

পটললাল তখন ভুজঙ্গভূষণের দুটি বার্তা খাণ্ডোলিয়াকে দিলেন। দুটোই খাণ্ডোলিয়ার পক্ষে আশাব্যঞ্জক।

প্রথম বার্তাটি হল থিয়েটার হলের জমির লিজের টাকা মারা যাবে না। ভুজঙ্গবাবু জেল থেকে বের হয়েই একটা প্রগতিশীল নাট্যপ্রেমী সংঘ গঠন করে খাণ্ডোলিয়া সাহেবকে সভাপতি করবেন। ওই সঙ্ঘের পক্ষ থেকেই একতলায় একটা খুপরি মতো থিয়েটার হল করে বাকি তলাগুলো বানালেই সব ক্ষয়ক্ষতি উশুল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বার্তাটি পূর্বোক্ত মম মজুমদারকে নিয়ে। ভুজঙ্গবাবুর মুখে শোনা এবং জেল থেকে বেরিয়ে যাচাই করে দেখা হালতুর মম মজুমদারের বৃত্তান্ত বেশ সরস করে বললেন পটলবাবু এবং ভুজঙ্গবাবুর হয়ে খাণ্ডোলিয়াকে অনুরোধ করলেন ভুজঙ্গবাবুর অবর্তমানে মমকে দেখাশোনা করতে।

তারপর থেকে মমকে যথেষ্টই দেখাশোনা করছেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। তবে চপলা বালিকা, আর তার অভিভাবক মামাটিও একটি জিনিস।

মামাকে রসে এবং মমকে বশে রাখার দায়িত্ব পড়েছে পটললালের ওপরে। এভাবে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে কালো পমেরেনিয়ানটি এনে খাণ্ডোলিয়া সেটারও দেখাশোনা খাওয়ানো বেড়ানোর ভার দিলেন পটললালকে। এবং এর পরেই হয়েছে গোলমাল। সেই অত্যুজ্জ্বল অস্বাভাবিক কৃষ্ণ সারমেয়টি যার কিনা ফটো মানে লোগো থাকবে শ্রীকৃষ্ণ ক্যাসেটে সেই কুকুরটি বেড়াতে নিয়ে গিয়ে একদিন হারিয়ে ফেললেন পটললাল।

কুকুর খোঁজার ব্যাপারে বিতৃষ্ণা থাকলেও পটললাল কথিত ভুজঙ্গভূষণ তথা খাণ্ডোলিয়া কাহিনী শুনে সহদেব ডাক্তার বেশ চনমনে হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আর সময় ব্যয় না করে পটললালকে জেরা করা শুরু করলেন, 'কুকুরটা আপনার কাছ থেকে হারিয়ে গেল?'

পটললাল বললেন, 'একদম ম্যাজিকের মতো ব্যাপার স্যার।'

'ম্যাজিক-ট্যাজিক থাক', সহদেব বললেন, 'ঘটনাটা ঠিকমত পরিষ্কার করে বলুন।'

পটললাল বললেন, 'খাণ্ডোলিয়া গিন্নি কুকুর পছন্দ করেন না, আর তাঁকে যমের মতো ভয় করেন খাণ্ডোলিয়া। সেই জন্যে কুকুরটাকে পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছিল। দুপুরে যখন মম মজুমদারের স্ক্রিন টেস্ট নিতেন খাণ্ডোলিয়াসাহেব, তখন মম মজুমদারের মামাকে বার-এ বসিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে পার্কস্ট্রিট ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ের পার্কটায় চলে যেতাম।

এতক্ষণ কথা বলে পটললালের হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এবার পকেটে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা সিগারেট খেতে পারি স্যার?'

সাধারণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বারে ধূমপান নিষেধ, এতে ওষুধের তেজ চলে যায়। তবে ডাক্তারবাবু সে জাতের চিকিৎসক নন। তাঁর ওষুধের তেজ অত সহজে যাওয়ার নয়।

পটললাল সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পেয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে কবুল করলেন, 'স্যার, আপনি বোধ হয় জানেন সিগারেটে সব সময় শানায় না, গাঁজা চরস না খেলে মনে ঠিক স্ফূরিয়ভাব আসে না। তা ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ের সেই পার্কে একটা বহু পুরনো গাঁজার ঠেক আছে। ওদিকের যত ড্রাইভার, দারোয়ান, পিয়ন, এমনকী কলেজের ছাত্র, অফিসের বাবুসাহেব দুপুরে ওখানে আসে। এমনকী একবার কলেজের দুটো মেয়ে এসেছিল। গাঁজার কলকিতে তাদের টান দেখে পুরনো গেঁজেলরা বরিহারি যায় আর কী। একটা মেয়ে তো এক টানে ফট করে কলকি ফাটিয়ে ফেলল। আরেক বার...'

এসব অপ্রাসঙ্গিক কথায় সহদেব ডাক্তারের গোয়েন্দা মন বিরক্ত বোধ করছিল, তিনি পটললালকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওসব থাক। আসল কথা তাড়াতাড়ি বলুন। কুকুর হারাল কী করে?'

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে পটললাল বললেন, 'সেই কথাই বলছি স্যার।'

'আমি পার্কে গিয়ে কুকুরটাকে কখনও ছেড়ে দিতাম না। এক পাশের রেলিংয়ে বেঁধে ও পাশের বকুল গাছতলায় ঠেকে গিয়ে বসতাম। এমন জায়গায় বসতাম যেখান থেকে কুকুরটার দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। ধোঁয়ায়-আমেজে দু-আড়াই ঘণ্টা চমৎকার কেটে যেত।

'সবই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বিপদ হল সেদিন। এই তো তিনদিন আগে, দুপুরবেলায় বেশ ঝলমলে রোদ ছিল। সবে কুকুরটা বেঁধে বকুলতলায় গিয়ে দু ছিলিম টেনেছি, আকাশ অন্ধকার করে এল। কিছুক্ষণ পরে তুমুল বৃষ্টি, আমার কাছে ছাতা ছিল না, কিন্তু বাকিদের কাছে তিন-চারটে ছাতা ছিল, সেই ছাতার নীচে ভাগাভাগি করে বসে ঝরঝর বৃষ্টিতে আমরা মনের সুখে গাঁজা টানতে লাগলাম। বৃষ্টির গুঁড়ো গায়ে লাগছে, ঠাণ্ডা হাওয়া। সেদিনের গাঁজাটাও খুব সরেস ছিল স্যার।'

সহদেব ডাক্তার ধমক না দিয়ে পারলেন না, বললেন, 'আসল কথা বলুন। বাজে কথা বলছেন কেন?'

পটললাল আমতা আমতা করে বললেন, 'আসল কথা খুব সংক্ষিপ্ত স্যার।'

'ভাদ্র মাসের বৃষ্টি তো, জোর দু'পশলা হয়ে একটু পরেই থেমে গেল। আমিও একটু পরে গাঁজার ঠেক ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আগে লক্ষ্য করিনি, রেলিংয়ের কাছে এসে কুকুরটাকে শিকল খুলতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ।'

সহদেব ডাক্তার বললেন, 'সর্বনাশ মানে কুকুরটা নেই? এই তো?'

'কুকুরটা নেই, তা নয় স্যার।' পটললাল বললেন, 'কালো কুকুরটা নেই, কুকুরটা বদল হয়ে গেছে, চেনে বাঁধা রয়েছে একটা সাদা কুকুর।'

'আশ্চর্য।' রীতিমত বিস্মিত ও চিন্তিত হলেন সহদেব ডাক্তার, 'তা হলে কুকুর চুরি হয়নি, কুকুর বদল হয়েছে। এরকম তো কখনও শুনিনি।'

কিছুক্ষণ কী সব ভেবে নিয়ে সহদেব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরের কুকুরটা এখনও আছে তো?'

পটললাল বললেন, 'তা আছে। ওই পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটেই আছে।'

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন সহদেববাবু। পটললালকে বললেন, 'চলুন একবার পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গিয়ে কুকুরটা দেখি।'

হাতের ঘড়িটা দেখে পটললাল বললেন, 'সাড়ে এগারোটা বাজে। এখনই যেতে চান?'

সহদেববাবু বললেন, 'কেন, এখন অসুবিধে কী?'

পটললাল বললেন, একটু ইতস্তত করেই বললেন, 'কয়েকদিন ব্যবসার কাজের চাপ থাকায় খাণ্ডোলিয়া সাহেব দুপুরে মম মজুমদারের স্ক্রিন টেস্ট নিতে পারেননি। বলেছিলেন আজ সকালে স্ক্রিন টেস্ট নেবেন। আমি মমকে খবর দিয়ে আপনার এখানে এসেছি।'

গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে দ্বিধা করলে চলে না। সহদেব ডাক্তার বললেন, 'চলুন। চলুন। এখন আর সকাল আছে নাকি মশায়। সকাল কখন চলে গেছে।'

সহদেব ডাক্তার পটললালকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলেন।

কড়েয়া থেকে পার্কস্ট্রিট পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পটললালের পকেটে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে। দোতলায় ফ্ল্যাটে উঠে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন দুজনে।

খাণ্ডোলিয়া সাহেব নেই। বাইরের ঘরের ডিভানের ওপরে আলুলায়িত কেশ, শিথিল বসন শ্রীমতী মম মজুমদার শুয়ে রয়েছেন। তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে একটা সাদা পমেরেনিয়ান কুকুর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

যতটা সন্তর্পণে সম্ভব মম মজুমদারের কোল থেকে সাদা কুকুরটা তুলে নিলেন সহদেব ডাক্তার। কুকুরটা উৎখাত করার সময় চোখ বুজেই মম তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে ওই একটু উঃ উঃ করলেন।

সেদিকে কর্ণপাত না করে সহদেব ডাক্তার পমেরেনিয়ান কুকুরটাকে সোফার ওপরে শুইয়ে দিলেন। কুকুরটা ওপর থেকে সাদা মনে হলেও পুরো সাদা নয়, পেটের কাছটা কালো।

সহদেব ডাক্তার পটললালকে কুকুরটা ওই ভাবে ধরতে বলে পাশের বাথরুম থেকে ট্যাপ খুলে এক আঁজলা জল এনে কুকুরটার পেটের কালো জায়গায় ঘষতে লাগলেন। একটু পরে পেটের কালো রং মুছে গিয়ে সাদা লোম বেরোতে লাগল।

পটললাল বুদ্ধিমান লোক, ব্যাপারটা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, বললেন, 'তা হলে কালো রঙটা কাঁচা।'

সহদেব বললেন, 'এটা সেই একই কুকুর। কালো রঙটা নকল। সিঙ্গাপুর জোচ্চোরে ভরতি। তাদেরই কেউ খাণ্ডোলিয়া সাহেবকে ঠকিয়েছে সাদা কুকুর কালো রং করে। পার্কে বৃষ্টির জলের তোড়ে কালো রং ধুয়ে গেছে, পেটের কাছে একটু আছে বৃষ্টির ছাট সরাসরি ওখানে লাগেনি বলে।'

এরপর পটললালকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দু'চার দিন পরে স্নান করাতে গেলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ত। বৃষ্টিতে ভিজে আগেই হয়ে গেল।'

ঘটনার অভিনবত্বে পটললালের মতো পোড় খাওয়া লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, একটু আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'তা হলে খাণ্ডোলিয়া সাহেবকে খবর দিই।'

সহদেব ডাক্তার বললেন, 'কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি বরং দোকানে গিয়ে এক

কৌটো কালো জুতোর কালি আর একটা ভাল দেখে বুরুশ নিয়ে আসুন।'

পটললাল বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হওয়ার পর মম মজুমদার ডিভানে উঠে বসলেন, গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন। তারপর কুকুরটাকে কোলে নিয়ে সহদেব ডাক্তারকে বললেন, 'আপনি? আপনাকে চিনলাম না তো?'

সহদেব বললেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে আপনি আমার টাকায় ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপে গিয়েছিলেন।'

কথার মধ্যেই কালি বুরুশ নিয়ে পটললাল ফিরে এলেন। সহদেব ডাক্তার মমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী রকম কুকুর পছন্দ করেন, সাদা না কালো?'

শ্রীমতী মম মজুমদার কিছু বলার আগেই পটললাল তাঁর কোল থেকে কুকুরটাকে নামিয়ে মেজেতে শুইয়ে জুতো পালিশ করার মতো করে কালো কালি লাগিয়ে জোর বুরুশ চালাতে লাগলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শ্রীমতী মম মজুমদারের চোখের সামনে সাদা কুকুরটা কালো কুকুর হয়ে গেল। সিঙ্গাপুর থেকে যেমন এসেছিল তার চেয়েও কুচকুচে কালো।

পুনশ্চ।

এই কাহিনীর নাম হওয়া উচিত ছিল, 'কুকুর ও পটললাল।'

কিন্তু যখন টালিগঞ্জে পটললাল নাম দিয়ে গল্পটা শুরু করি ভেবেছিলাম গল্পের পটভূমিকা টালিগঞ্জেই রাখব।

সামান্য কারণে সেটা সম্ভব হল না। কয়েকদিন হল টালিগঞ্জের এক আর্ট ফিল্মের পরিচালক আমার একটা রচনা নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এ অবস্থায় এ সব নিয়ে হাসাহাসি করার সাহস পাচ্ছি না।

তবে কারও যদি এক নজরেই শ্রীমতী মমকে দেখে পছন্দ হয়ে থাকে তাঁকে জানাই শ্রীমতীকে নায়িকা করে আরেকটি কাহিনীতে আমি অবিলম্বে হাত দিচ্ছি।

পটললাল ও মধুবালা

এক

মধুবালা

'কুলবালা গো কুলবালা।
রাখো তোমার কুসুমমালা।
তুমি নওগো মধুবালা।

কড়েয়া রোড, পার্ক সার্কাসের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নকুল শকুল ওরফে সহদেব শুক আজ সকাল থেকে স্মৃতিসুধারসে নিমজ্জিত হয়ে আছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ডাঃ সহদেব শুক শুধু চিকিৎসক নন, তিনি ঝানু গোয়েন্দা ও সঙ্গীতবিদ। গোয়েন্দাগিরির সময় তিনি তাঁর নাম ও পদবির ইংরেজি আদ্যক্ষর দুটি, অর্থাৎ মিঃ এস্ এস্ ব্যবহার করতে ভালবাসেন এবং ওইভাবেই পরিচিত হতে চান। যদিও অনেকেই তাঁকে সহদেব ডাক্তার বা শুধু ডাক্তার বলে সম্বোধন

করে। আগে গোয়েন্দাগিরির সময়ে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতেন, এখন মানিয়ে নিয়েছেন।

সহদেববাবু সঙ্গীতচর্চাতেও পারঙ্গম। তাঁর গানের ক্যাসেট আছে। সেই গানগুলি তিনি নিজেই রচনা করেছেন, নিজেই সুর দিয়েছেন এবং নিজেই গেয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের ক্যাসেট নিজেই পয়সা খরচ করে বার করেছেন। এদিক থেকে তিনি হাল আমলের গায়কদের পূর্বসূরী।

যা বলছিলাম, আজ সকাল থেকে সহদেববাবু স্মৃতিরসে আপ্লুত হয়ে আছেন। আজ রবিবার সকালে তিনি রোগী দেখেন না।

গত মাস থেকে সহদেব ডাক্তার কেব্‌ল টিভির কানেকশন নিয়েছেন। দূরদর্শন পর্যবেক্ষণ করার মতো তাঁর খুব যে অবসর আছে, তা নয়। টাকাও খুব কম নয়। কানেকশন নিতে পাঁচশো টাকা লাগে, তারপর মাসে একশো টাকা লাগে।

অবশ্য হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করে সহদেববাবু ভালই উপার্জন করেন। এ রকম টাকা অল্পবিস্তর খরচ করতে তাঁর গায়ে লাগে না।

সবচেয়ে বড় কথা টাকার কথাটা তেমন কিছু নয়। কেবল টিভি নেয়ার পর ডাক্তার সহদেব শুকের জন্মান্তর ঘটে গেছে।

মেদিনীপুরের এক মহকুমা শহরের পাশের এক গ্রামের নকুল শকুল নামে একটি বালক পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে শহরের ইস্কুলে পড়তে আসত।

পটললাল কাহিনীমালার একাগ্র পাঠক-পাঠিকারা হয়তো খেয়াল করবেন এই নকুল শকুলই পরবর্তীকালে নিতান্ত পেশাগত কারণে যুক্তিসঙ্গত ভাবে নাম ও পদবি অদল-বদল করে সহদেব শুক হয়েছিলেন। (পটললাল ও মিস জুলেখা দ্রষ্টব্য।)

নকুল শকুল ওরফে সহদেব শুক তখন ক্লাস এইটে পড়েন। ইস্কুলের নাম জগজ্জননী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। তাঁর তখন বয়েস বারো-তেরো। ওই বয়েসেই তিনি একজন তুখোড় গোলকিপার। শুধু ক্লাস টিমেই নয় স্কুল টিমেও তিনি গোলকিপার, যা সাধারণত নাইন টেনের ছেলেদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়।

কিন্তু এর পরেও আছে। শহরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল টিম স্বাধীন স্পোর্টিং ক্লাবেরও তিনি বাঁধা গোলকিপার। অবশ্য সে টিমে আরও একজন গোলরক্ষক আছেন, তিনি হলেন নিনি মহাপাত্র। এন পাত্র নামে কলকাতায় বহুকাল এরিয়ান্সের বি টিমে খেলেছেন।

যে সময়ের কথা বলছি তখন নিনি মহাপাত্র মহোদয়ের বয়েস চুয়াল্লিশ, নকুল শকুলের বয়েস চৌদ্দ। শকুলের ওজন একমণ, মহাপাত্রের ওজন দুমণ। শকুলের উচ্চতা সোয়া পাঁচ, মহাপাত্রের উচ্চতাও সোয়া পাঁচ।

বয়েস এবং ভারী শরীরের জন্য গোলকিপার হিসেবে এন মহাপাত্রের কিছু অসুবিধে থাকলেও নকুল শকুল যেখানে তাঁর পাতলা শরীর দিয়ে এক ফুট প্রস্থ আটকাতে পারতেন, সেখানে দু' মণি শরীরে নিনি মহাপাত্র দু ফুট এলাকা জুড়ে গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ডাঃ সহদেব শুক কখনও কখনও ফুটবল মাঠে এখনও খেলা দেখতে যান কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই নিজে আর খেলার চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে কোথাও নিনি মহাপাত্রের প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাবেই হয়তো তাঁর বর্তমান ওজন এখন

দুমন ছাড়িয়ে গেছে।

'দুই বিঘা জমি' নামক বিখ্যাত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান হইবে টানা' এরকম ভূমিলোভী এক বাবুর কথা বলেছিলেন। সহদেব শুক তত খারাপ বাবু নন, জমি লোভী নন, তবে তিনি নিজেই গায়ে গতরে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান হইবে টানা হয়ে গেছেন।

সহদেব বাবু নিজে ডাক্তার হয়েও মেদবৃদ্ধির কারণে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। নানারকম খারাপ ভাল, মল-মূত্র-রক্ত ইত্যাদি বহুবিধ পরীক্ষার পরে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, খাওয়া কমাতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে, হাঁটাহাঁটি করতে হবে।

কয়েকবছর আগে সহদেব বাবুর এক মক্কেল নৃত্যগীত পটিয়সী যাত্রানায়িকা জুলেখা অতিরিক্ত বাংলা মদ ও চোলাই এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক চাট খেয়ে প্রভূত মেদশালিনী হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত আর নাচতে না পেরে যাত্রাপার্টি ছেড়ে সার্কাসের দলে যোগদান করেন, যেখানে তিনি বুকে হাতি তোলার কাজ করতেন।

সহদেববাবুর দুরবস্থা এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি। স্থূলদেহ নিয়ে ডাক্তারির তেমন অসুবিধে নেই, সঙ্গীত রচনা বা চর্চার জন্যেও মোটা হলে বাধা নেই। অবশ্য গোয়েন্দাগিরির কাজে কিছু দৌড়ঝাঁপ প্রয়োজন পড়ে তবে সে ধরনের কাজ সাধারণত তিনি এড়িয়ে যান।

এদিকে কেবল টিভি নেয়ার পর থেকে সহদেববাবুর হাঁটাচলা অনেক কমে গেছে। আগে সকালে উঠে ময়দানে হাঁটতে যেতেন। কিন্তু ওই সময়ে কেবল টিভির একটা চ্যানেলে পুরনো দিনের হিন্দিগান হয়। কিন্তু গান শোনার নেশা ধরে গেছে তাঁর।

নেশা ধরে গেছে বললে অবশ্য ভুল বলা হয়। এই নেশা সহদেববাবুর বহুদিনের পুরনো। প্রথম যৌবনে তিনি হিন্দি সিনেমার পোকা ছিলেন। কী সব নায়িকা ছিল তখন, সুরাইয়া, নার্গিস, মধুবালা।

এর মধ্যে অবশ্য এই শেষের জনেরই প্রতি তার অধিক অনুরাগ ছিল।

সেই 'আয়েগা-আয়েগা' গান, 'মহল' ছবিতে। অশোককুমার গায়ক, নায়িকা মধুবালা, জাফরির চৌকো ফাঁক দিয়ে আলো আঁধারিতে মধুবালার ঢলঢল মুখ, সে হল সহদেব শুক যখন নকুল শুকুল ছিলেন সেই প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম।

কাঁথি শহরে কাকার বাড়িতে থেকে স্কুলে ক্লাস নাইনে। চুরি করে 'মহল' ছবি পাঁচবার দেখেছিলেন নকুল শকুল। অশোককুমার—মধুবালার ডায়ালগ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল স্কুল ছাত্র নকুলের।

(সহদেব শুক ওরফে নকুল শকুল প্রসঙ্গ বেশ জটিল। যাঁরা 'পটললাল ও মিস জুলেখা' বইটি পড়েননি বা ভুলে গেছেন, একবার দেখে নেবেন।)

সেই 'মহল' থেকে শুরু। এর পরে বহুদিন মধুবালা জ্বরে ভুগেছিলেন সহদেববাবু। অশোককুমারের সঙ্গে মধুবালার আরেকটা বই দেখেছিলেন 'হাওড়া ব্রিজ'। সেই বইয়ের শুটিং হাওড়া ব্রিজের ওপরে হয়েছিল। তখন সহদেব কলেজে পড়েন। রাতের বেলা ব্রিজে উঠে সে বইয়ের শুটিং দেখতে গিয়ে পুলিশের লাঠি খেয়েছিলেন।

তবে সহদেব সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন মধুবালার 'চলতি কা নাম গাড়ি' দেখে। সেই বইতেও অশোককুমার ছিলেন কিন্তু নায়ক ছিলেন কিশোরকুমার। অশোককুমারের সব ভাইই 'চলতি কা নাম গাড়ি' ছবিতে ছিলেন।

সেই ছবিতে কিশোরকুমারের সঙ্গে মধুবালার একটা নেচে-নেচে গান, কী যেন লাইনগুলো ছিল তার,

'হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাব কা,
কেয়া খেয়াল হ্যায় আপকা।'

সহদেববাবুকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিল।

সেই সময়ে সহদেববাবুর বিয়ের প্রস্তাব আসে। ভাল বংশ, সুন্দরী পাত্রী, লেখা পড়াও ভাল, মাধ্যমিকের ছাত্রী পদ্মবালাকে তিনি বিয়ে করেননি বরং তার বদলে পদ্মবালার নাম একটু ঘুরিয়ে গান লিখেছিলেন তিনি। নিজেই সুর দিয়েছিলেন সে গানে, নিজের মনে মনেই গাইতেন,

'কুলবালা গো, কুলবালা।
রাখো তোমার কুসুমমালা।
তুমি নওগো মধুবালা।
কুলবালা গো,...'

দুই

পটললালের প্রবেশ

'তুতু-তু তুতু তারা
ফাঁস গিয়া দিল বেচারা।'

এ কাহিনী পটললাল ও মধুবালার। সেই দিক থেকে গল্প এখনও আরম্ভ হয়নি। অথচ ভূমিকা খুব বড় হয়ে গেল। সে যা হোক গল্প এমন কিছু বড় নয়। পাঠক-পাঠিকাদের তেমন কিছু অসুবিধে হবে না।

এটা একটা গোয়েন্দা কাহিনী। গোয়েন্দা কাহিনীর নিয়ম হল গোয়েন্দার কথা সাত কাহন করে বলা।

আমরা ডাঃ সহদেব শুকের কড়েয়া রোডের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।

রবিবারের সকালবেলা। কড়েয়া রোডের বাড়ির একতলায় চেম্বারের পাশে ড্রয়িংরুমে বসে মনোযোগ দিয়ে কেবল টিভি দেখছেন। একটু আগে প্রাতরাশ সেরেছেন, কলা, ডবল ডিমের ওমলেট, জোড়া মাখন টোস্ট সহকারে। এখন ঘন দুধ-চিনি দিয়ে গরম কফি আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে পান করছেন।

বেশ আরামদায়ক পরিবেশ। সবচেয়ে আনন্দের কথা, টিভিতে ডাঃ সহদেব শুকের যৌবনের অতিপ্রিয় সেই মধুবালা অভিনীত 'চলতি কা নাম গাড়ি' বইটা হচ্ছে।

আজ বহুকাল পরে ছবিটা দেখে সহদেববাবু অভিভূত হয়ে গেছেন। ছবি দেখতে দেখতে তাঁর বারবার মনে পড়ছে, তাঁর যৌবনকালের সেই স্বরচিত গানটি, 'কুলবালা গো কুলবালা, তুমি নওগো মধুবালা।'

গানটি নিজের মনে ভাঁজতে ভাঁজতে সেই সঙ্গে মধুবালার ছবি দেখতে দেখতে সহদেব স্থির করলেন, তাঁর পরের গানের ক্যাসেটটা এই গান দিয়েই আরম্ভ করবেন। শেষের দিকের লাইনগুলো মনে পড়ছে না। সে যা হোক নতুন করে লিখে নিলেই হবে।

ছবিটা এখন মারাত্মক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। একটা মোটর গ্যারেজের মধ্যে মধুবালা আর কিশোরকুমার প্রেমের লুকোচুরি খেলা খেলছেন। নিজের গানের সুর ভাঁজা বন্ধ করে ব্যগ্র হয়ে সহদেব ছবিটা দেখতে লাগলেন।

এমন সময় মূর্তিমান রসভঙ্গ হয়ে শ্রীযুক্ত পটললালের প্রবেশ। রোগীদের চেম্বার থেকে সরাসরি ড্রয়িংরুমের মধ্যে চলে এসেছেন পটললাল।

গোয়েন্দাপ্রধান মিঃ এস্ এস্ অর্থাৎ সহদেববাবু এত মনোযোগ দিয়ে, অভিনিবেশ সহকারে এই রকম একটা পুরনো রদ্দি হিন্দি ছবি দেখছেন এটা দেখে পটললাল একটু বিস্মিত হলেন।

ইতিমধ্যে ব্রেক হয়েছে। একটি নারকেল তেলের বিজ্ঞাপনে এক ভদ্রমহিলা নারকেল তেল কিনতে এসে প্রকাশ্য বিপনিতে নিজের মাথার চুল খুলে দেখাচ্ছেন আর এটা দেখে এক ব্যক্তি তো-তো করছেন।

বিজ্ঞাপন থেকে চোখ সরিয়ে সহদেব পটললালের দিকে তাকালেন।

পটললাল সব সময়েই একটা গোলমাল বাঁধিয়ে আসেন। এবারে নিশ্চয় তাই হয়েছে।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে পটললালের?

পটললালের চেহারা সাজপোশাক ঠিক কোনওদিনই ভদ্রলোকেব মতো ছিল না। কিন্তু এ রকম ভ্যাগাবন্ড চেহারায় সহদেব তাঁকে কখনও দেখেননি।

পটললালের চোখ-মুখ বসে গেছে। মাথায় বাবরি চুল। লম্বা জুলফি, বাটার-ফ্লাই গোঁফ। পরনে সাতরঙা, ময়লা নাইলনের গেঞ্জি, কালো ফুটপ্যান্ট। গলায় মাদুলি, হাতে স্টিলের তাগা। এ ধরনের চেহারার, সাজ পোশাকের লোক দেখলেই ভয় হয়। মনে হয় এখনই ধার চাইবে, বলবে, 'দাদা, পনেরোটা টাকা হবে নাকি।'

পটললাল কিন্তু টাকা চাইলেন না। উল্টো দিকের সোফায় বসে বললেন, 'স্যার খুব গোলমাল।'

তখন ছোট পর্দায় ছবিটা আবার শুরু হয়েছে। গভীর রাতে মধুবালার বাড়িতে চুপিসারে কিশোরকুমার প্রবেশ করেছেন। হাতের ইশারায় পটললালকে থামিয়ে সহদেব বললেন, 'দাঁড়ান, আগে বইটা শেষ হোক।'

পটললালের আর তর সইছিল না। তাঁর গোলমালের আশু সমাধানটা বোধহয় খুব জরুরি।

পটললাল বসে বসে উশখুশ করতে লাগলেন। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর মিস্টার এস এসের কোনও চিত্রবৈকল্য ঘটল না। তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে 'চলতি কা নাম গাড়ি' দেখে যেতে লাগলেন।

বাধ্য হয়ে পটললাল উঠে দাঁড়ালেন, গোয়েন্দা স্যারের দৃষ্টি কোনও রকমে আকর্ষণ করে বললেন, 'স্যার, বাইরে মধুবালা একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনি যদি বলেন তো মধুকে ঘরের মধ্যে ডেকে আনি।'

পটললালের আর কোনও কথা সহদেব ডাক্তারের কানে যায়নি শুধু 'মধুবালা' শুনেছিলেন। টিভির পর্দায় এখন মধুবালার দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিভাবক হম্বিতম্বি করছেন, সে দিক থেকে চোখ না সরিয়ে সহদেব বললেন, 'মধু? মধুবালা? মধুবালা আমার বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? মিস্টার পটললাল আপনার কি মাথাখারাপ হল। উনি

তো বহুকাল গত হয়েছেন।'

ড্রয়িংরুম থেকে বেরোতে বেরোতে পটললাল বললেন, 'স্যার, এ মধুবালা সে মধুবালা নয়। এখনই ডেকে নিয়ে আসছি।'

পটললালের মধুবালাকে নিয়ে ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

সহদেব ডাক্তারের বাড়ির বাইরে ফুটপাথে যেখানে ওপরের দেওয়ালে সাইনবোর্ড টাঙানো আছে,

'আর চিন্তা নাই।
ইঁদুরের কামড়ের অমোঘ ঔষধ;
'দূর-দূর ইঁদুর'
পরীক্ষা প্রার্থনীয় :
ডাঃ সহদেব শুক।'

এই সাইনবোর্ডের মধ্যে একপাশে একটি করালদণ্ড, কুম্ভীর বদন ইঁদুরের রঙিন ছবি আঁকা আছে, সেই ইঁদুরটির অতি দীর্ঘ লেজ নীচের দিকে নেমেছে।

সেই ইঁদুরের লেজের নীচের সইসই মধুবালাকে পটল দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এ তো আর মধ্যমগ্রামের কলোনি এলাকা নয়, কলকাতা শহরের পার্ক সার্কাস অঞ্চল। পটললাল মধুবালাকে সেই ইঁদুরের লেজের নীচে দাঁড় করিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'নট নড়ন চড়ন নট ফট।'

কিন্তু পটললাল ফুটপাথে এসে দেখলেন মধুবালা সাইনবোর্ডের নীচে নেই। চিন্তিতভাবে একটু সামনের দিকে এগোতে দেখলেন কড়েয়া রোডের মোড়ে একটা ঘোড়া-নিম গাছের নীচে সিমেন্টের বাঁধানো বেদিতে বসে শ্রীমতী মধুবালা এক কানসাফাইওয়ালাকে দিয়ে কান পরিষ্কার করাচ্ছে।

পটললালের মতো সাতঘাটের জল খাওয়া, পোড় খাওয়া লোক জীবনে কোনওদিন কোনও মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় কান পরিষ্কার করতে দেখেনি।

তা ছাড়া এ কী দৃশ্য?

কামিজ হাঁটুর ওপরে তুলে, দুই পা ছড়িয়ে চোখ বুজে পরম আরামে মধুবালা কর্ণ কণ্ডুয়ন করছে।

পটললাল গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই বাবলি, এটা কলকাতার রাস্তা, কাপড়চোপড় ঠিক করে বোস।' মধুবালা তথা বাবলি তখন জীবনে প্রথমবার কর্ণকুণ্ডয়নের আবেগ অনুভব করছে, মধ্যে মধ্যে অত্যধিক আবেগে সাফাই-শিল্পীর দক্ষ হাতের মুঠি চেপে ধরে 'উঃ, আঃ' করছে।

পটললালের চেঁচামেচিতে এতক্ষণে মধুবালা চোখ খুলল। তারপর আধো আধো গলায় বলল, 'কী বিরক্ত করছ পটলদা, একটু সুখ করতে দাও।'

মধুবালার জন্যেই পটললালের সহদেব ডাক্তারের কাছে আসা, এখন মধুবালাই দেরি করছে। পটললাল খুব রেগে গেলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সে সাহসও তাঁর নেই। বাঙালির চোপাকে তিনি খুব ভয় পান। একেবারে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দেবে।

সুখ করা শেষ হতে মধুবালার সঙ্গে কান সাফাইওয়ালার তুমুল কলহ শুরু হয়ে গেল। একেবারে যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড।

জুতো পালিশওয়ালাদের, কান সাফাইওয়ালাদের ট্রেড-ট্রিক হল প্রথমে একটা সাধারণ দাম বলা, যথা দু টাকা, তারপরে পালিশ করতে গিয়ে অস্পষ্টভাবে খদ্দেরকে বলা, 'ক্রিম দিয়ে দেই,' খদ্দের অতি সচেতন না হলে চুপ করে থাকবে। কিন্তু এই ক্রিম মানেই দু টাকার পালিশ পাঁচ টাকা হয়ে গেল।

মাথা মালিশওয়ালা, জুতো পালিশওয়ালা তারাও একই কায়দা করে, প্রথমে দু টাকা তারপরে মাথা হাতে নিয়ে খদ্দেরকে বলে স্পেশাল, মানে পাঁচ টাকা। কাজ শেষ হলে যখন খদ্দের ভাবছে দু টাকা দিতে হবে সে বলে, 'পাঁচ টাকা'। পরিণামে গোলমাল অনিবার্য।

আজ কান পরিষ্কার করার লোকটিও সেই বুদ্ধিই করছিল। কিন্তু তার কোনও ধারণা ছিল না আজকেব খদ্দের বিষয়ে। বাবলি ওরফে যাত্রায় নবাগতা মধুবালা এমন ভাষায় গালাগাল শুরু কবল যে তা শুনলে মরা মানুষ উঠে বসবে। কান সাফাইয়ের লোকটির বাংলা ভাবা তেমন রপ্ত নয়, তবুও সে যা বুঝল তাতে বিনা বাক্য ব্যয়ে উচিত প্রাপ্য দু টাকা পর্যন্ত ফেলে বাক্স গুটিয়ে পিঠটান দিল।

তবুও মধুবালা তাকে ছাড়ে না। ওড়না কোমরে বেঁধে সন্ত্রস্ত লোকটির পিছু পিছু ছুটল। মধুবালার বক্তব্য, বদমাইসের মুখে কী একটা খারাপ জিনিস ঘষে না দিয়ে ছাড়বে না। পটললাল বহু কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করল।

রাস্তায় তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। সোমত্ত যুবতীর উত্তাল দেহ আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সহকারে অশ্লীল গালাগাল জনতা খুবই উপভোগ করছিল। পটললাল মধুবালাব হাত ধরে টেনে সহদেব ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে এলেন। অতি উৎসাহী দুয়েকজন পিছু নিয়েছিল, মধুবালা একবার ফোঁস করে তেড়ে যেতেই তারা উধাও হল।

কেবল টিভিতে এই মাত্র 'চলতি কা নাম গাড়ি' শেষ হয়েছে। সেই অসামান্য শেষ দৃশ্যের রেশটি, যেখানে মধুবালাসহ কিশোরকুমার, অশোককুমার, অনুপকুমার সকলেই ভাঙা গাড়িতে গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে, আবার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে সহদেব ডাক্তারের।

এমন সময় মধুবালাকে সঙ্গে করে পটললাল ফিরে এলেন। দূরদর্শনের পর্দায় তখন অতিশয় হাল আমলের নায়িকা উদয় হয়েছেন। তিনি যেটুকু কাপড় পবে আছেন, সেও নাচের তালে তালে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে মোহময়ী সুরে অর্থহীন মাদকতাভরা গান—

তুতু-তু, তুতু-তারা
ফাঁস গিয়া দিল বেচারা।

তিন

কালো টাকা

'ফর্সা ফর্সা মুখে কালো কালো চশমা,
ফর্সা ফর্সা পকেটে কালো কালো টাকা।'

পটললাল ও মধুবালা সহদেববাবুর ড্রয়িংরুমে এসে যখন বসাল তখনও মধুবালা

ফুঁসছে এবং সেই সঙ্গে হাঁফাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই সহদেববাবুও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? কী হল?'

পটললাল বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মধুবালা বলল, 'একটা বেজম্মাকে একটু কড়কে দিলাম।'

মধুবালার ভাষা ব্যবহার দেখে সহদেব ডাক্তার একটু থমকিয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে জুলেখা ও মমের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তাদের ভাষা খুব সংযত ছিল।

এ মেয়েটির চেহারা, শরীরের খাঁজখাঁজগুলো যেমন টানটান, সালোয়ার-কামিজ যেমন রবারের পোশাকের মতো আঁটসাট, মুখ চোখের মধ্যেও উগ্র যৌনতা। কথাবার্তায় সেটা আরও মালুম হল।

মধুবালাকে কিছুক্ষণ অবলোকন করে পটললালের দিকে তাকিয়ে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'কী খবর পটলবাবু? আপনার যে দেখাই নেই। আজকাল আপনি কোন লাইনে আছেন? কী করছেন?'

পটললালের মনে একটা খটকা ছিল আগের সেই কালো পমেরেরিয়ান কুকুর হারিয়ে যাওয়ার কেসে গোয়েন্দার ফি দেওয়া হয়নি হয়তো মিঃ এস এস এবার প্রথমেই তাই নিয়ে ধরবেন।

কিন্তু সহদেব ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে আর ওষুধ থেকে ভাল আয় হয়, তাঁর অন্য সত্তা গোয়েন্দা এস এস-এর আয় নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই।

আগেরবারের পাওনার কথাটা না ওঠায় পটললাল একটু আশ্বস্ত হলেন এবং সহদেব ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে খুব বিনয় সহকারে বললেন, 'আমি আর কী করবো? আমার কি কিছু করা সম্ভব?'

সহদেব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্ জুলেখা? তাঁর কী খবর?'

পটললাল বললেন, 'জুলেখা দুবাই থেকে আর ফিরছে না। সেখান থেকে এক বেদুইন নাকি তাকে কিনে নিয়ে গেছে। এখন সে মরূদ্যানে খেজুর ঝোপের মধ্যে এয়ার কন্ডিশন ঘরে থাকে। দুবেলা খেজুরের চাটনি, উটের দুধের ফিরনি আর দুম্বার মাংস খায়।'

খাদ্যের বর্ণনা শুনে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'সর্বনাশ!'

পটললাল বললেন, 'জুলেখার কথা আর বলবেন না স্যার। আপনি মধুবালার একটু হিল্লে করে দিন। তা হলে আমার হয়ে যাবে।'

সহদেব ডাক্তার চট করে মধুবালার সমস্যায় মাথা গলাতে চাইলেন না। তিনি পটললালের কাছে আবার জানতে চাইলেন, 'তা হলে এখন কিছু করছেন না। নিজের খাই খরচা চালাচ্ছেন কী করে?'

পটললালকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখেছেন সহদেব ডাক্তার, তাই স্বাভাবিক কারণেই এরকম প্রশ্ন তিনি তাঁকে করতে পারেন, যদিও সাধারণত এই জাতীয় প্রশ্ন কোনও ভদ্রলোককে করা যায় না।

তবে সেই প্রচলিত অর্থে পটললালও তেমন ভদ্রলোক নন, চিরদিনই উঞ্ছবৃত্তি করে তাঁর চলে, ভদ্র সমাজের প্রান্ত সীমানায় তাঁর আনাগোনা। মেয়েমানুষদের মধ্যে যেমন হাফ-গেরস্থ আছে, তেমনিই পুরুষ মানুষদের মধ্যে আছে হাফ-ভদ্রলোক। শ্রীযুক্ত পটললাল পাল হলেন একজন হাফ ভদ্রলোক।

পটললাল সেটা জানেন এবং এতে তার বিশেষ কিছু আসে যায় না। সহদেব ডাক্তারকে অকপটে তিনি যা বললেন, সেটাই এর প্রমাণ।

পটললাল বললেন, 'কালো টাকার কারবার করি।'

সহদেব ডাক্তার বিস্মিত হলেন, মুখে বললেন, 'কালো টাকা তো কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। আপনার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে না কোটি কোটি টাকার কারবার করছেন?'

পটললাল বললেন, 'সে ধরনের বড় বড় কালো টাকার ব্যাপার আমার নয়। আমার সামান্য দুটাকার ব্যাপার।'

মধুবালা এতক্ষণ আপনমনে নিজের কামিজের কোনা পাকিয়ে কান চুলকাচ্ছিল, এতে যে তার নাভি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল অন্যদের, সে নিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এবার পটললালের কথায় সে কামিজ নামিয়ে একটু মুখ বিকৃত করে বলল, 'ছিঁচকে।'

পটললাল এই বিশেষণে খুব বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। বরং সহদেব ডাক্তারকে বললেন, 'আমার স্টোরিটা একটু শুনুন স্যার।'

এসব ব্যাপারে সহদেব ডাক্তারের কোনও ধৈর্যের অভাব হয় না। গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্যের চাবিকাঠি হল মনোযোগ দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখা এবং শোনা। সেই রীতি মেনেই চোখ বুজে সহদেব ডাক্তার পটললালের কাহিনী শুনলেন।

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। পটললাল আবার কোনও কথা সংক্ষিপ্ত করে গুছিয়ে বলতে পারেন না। পাঠক-পাঠিকারা গোয়েন্দা নন। এই দীর্ঘ ব্যাপারে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে এই আশঙ্কায় আমি পটললালের গল্পটি ডালপালা ছেঁটে গুছিয়ে বলছি।

পটললাল এখন থাকেন নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে বাংলা থিয়েটারের এক মধ্যবয়সী অভিনেত্রীর কাছে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। ঠিক পেয়িং গেস্টও নয়। লিভ টুগেদারও বলা যায়। এ ধরনের লিভ টুগেদার আমাদের দেশে চিরকালই ছিল। জমিদার বাড়ির প্রৌঢ় প্রবাসী গোমস্তামশায় থাকতেন কালীবাড়ির হৃষ্টপুষ্টা পরিচারিকার সঙ্গে। বাজারের গুড়ের আড়তের সরকারবাবু বসবাস করতেন আগের সরকারবাবুর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। বহুকাল ধরে এসব চলে আসছে, এসব মোটেই সাহেবি কেতা নয়। সুতরাং পটললালকেও দোষ দেওয়া যায় না।

প্রতিদিন সকালে চা বিস্কুট খেয়ে পটললাল বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দুজনের সংসারের দৈনিক বাজার করার দায়িত্ব তাঁর। বাজারের পয়সাটাও তাঁকেই যে করে হোক যোগাতে হয়। সেটা বর্তমান অবস্থায় পটললালের পক্ষে খুব সোজা কাজ নয়।

পটললালের বহুদিনের অভ্যেস বাজারে ঢোকার মুখে 'নিত্যরঞ্জন টি স্টলে' বসে একটা ডাবল-হাফ চা খাওয়া। ডাবল-হাফ চা আজকাল কলকাতায় দু চারটি পুরনো দোকান বাদ দিলে, আর পাওয়াই যায় না। তাই একালের পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ডাবল-হাফ হল চায়ের লিকার কম, দুধ বেশি, চিনি বেশি। শক্তি বর্ধক পানীয় এটা। কলকাতারই আবিষ্কার ওই পানীয় বহুদশক ধরে এই শহরের ক্লান্ত নাগরিকদের উজ্জীবিত করেছে।

নিত্যরঞ্জন টি স্টলে পটললাল যে শুধু চা খেতেই যান তা নয়। ওখানে থিয়েটার-যাত্রার লাইনের অনেক তালেবর ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। কখনও কখনও কাজকর্মের কিছু গুলুক-সন্ধান পাওয়া যায়।

একদিন সকালে বহুকাল পরে নিতাইবাবুর সঙ্গে পটললালের দেখা। নিতাইবাবু কৃতকর্মা লোক। থিয়েটারের প্রম্পটার থেকে যাত্রার মালিক হয়েছিলেন। একবার এক নায়িকার আত্মহত্যার মামলায় ফেঁসে গিয়ে বছর দশেক আগে নিতাইবাবু ফেরার হয়ে যান।

তারপরে এতদিন বাদে তাঁর সঙ্গে এই দেখা। নিতাইবাবু বললেন, তিনি এখন ওড়িয়া যাত্রা করছেন। কটকে অফিস করেছেন। বাংলা যাত্রার মতো অত ঝুট-ঝামেলা নেই। পাবলিক ভাল, অভিনেতা-অভিনেত্রী গোলমেলে নয়। নায়কেরা কথা রাখে।

নিতাইবাবু পটললালের এলেম জানতেন। তিনি পটললালকে কটকে চলে আসতে বললেন। বললেন, যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পটললাল নিতাইবাবুর কাছে তাঁর ঠিকানা চাইতে হাতের কাছে কোনও কাগজ না থাকায় চায়ের দোকানের মেজে থেকে একটা পুরনো খবরের কাগজের ঠোঙা তুলে তার থেকে এক টুকরো কাগজ চৌকো করে ছিঁড়ে নিজের মানিব্যাগ থেকে একটা ছোট ভোঁতা পেনসিল বার করে কটকের ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

পটললাল ঠিকানার কাগজটা পকেটে নিয়ে বাজার করতে চলে গেলেন। বাজার করে বাড়ি ফিরে এসে পকেটে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন কাগজটা নেই।

বাজারে পড়ে গেল নাকি। এদিকে পকেটে একটা দু টাকার নোট রয়ে গেছে। এটা হওয়ার কথা নয়। পটললালের দৈনিক বাজারের বাজেট বারো টাকা। দুশো গ্রাম রুই মাছের বাচ্চা ছয় টাকা, তরকারি চার টাকা, শশা-কলা দু টাকা। দৈনিক টায়ে-টোয়ে বাজার। চা খাওয়ার জন্যে এক টাকার একটা কয়েন আলাদা করে রাখা থাকে।

আজ আবার নিতাইবাবু চায়ের দামটা দিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্যে কয়েনটা আছে। সঙ্গে একটা ময়লা, ছেঁড়া দু টাকার নোট।

আজকাল সব দু টাকার নোটেরই এই অবস্থা। এক টাকা, পাঁচ টাকাও তাই। তবে সে নোটগুলো দুর্লভ। ছোটখাট কেনাবেচা চলছে ময়লা দু টাকার নোটে। ছেঁড়া একেবারে, আশ্চর্য তবুও চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ পটললালের মনে হল নিতাইবাবুর ঠিকানা লেখা খবরের কাগজের ময়লা ছেঁড়া অংশটা দু টাকার নোট হিসাবে নিজের অজান্তে চালিয়ে দিয়েছেন।

তারপর থেকে পটলবাবুর বুদ্ধি খুলে গেছে। বাসায় খবরের কাগজ রাখা হয় না। রাস্তাঘাটে যেখানে খবরের কাগজের টুকরো, ছেঁড়া ঠোঙা কুড়িয়ে পান তুলে পকেটে করে বাসায় নিয়ে আসেন। সেগুলোকে দু টাকার নোটের মাপে কাটেন তারপরে জলে ভেজান। শুকিয়ে গেলে উনুনে ছাই মাখান। পারলে একটু কেরোসিন তেল, একটু মাছের ঝোল বা উদ্বৃত্ত ডাল ছিটিয়ে দেন, যেদিন যেমন সম্ভব। তারপর তিন ভাঁজ করে চালের হাঁড়িতে রেখে দেন। প্রতিদিন বাজারে যাওয়ার সময়ে সেই হাঁড়ি থেকে গোটা ছয়েক কাগজের টুকরো নিয়ে চলে যান, বারো টাকার বাজার ভালভাবে চলে যায়।

পটললাল কবুল করলেন, 'আমি জানি, জিনিসটা অন্যায়। কিন্তু স্যার, কখনও ওই বারো টাকার বেশি জোচ্চুরি করি না।'

পটললালের কথা শুনে সহদেব ডাক্তার তাজ্জব হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ তো সাংঘাতিক কথা। বাজারের নোট দেখে আজকাল অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ধরা পড়লে জাল টাকা চালানোর দায়ে আপনার জেল হয়ে যাবে।'

পটললাল বললেন, 'ঠিক জাল টাকা নয় স্যার, কালো টাকা বলতে পারেন। কালো টাকার জন্যে কারও জেল হয় না।'

সহদেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পটললালের কথায় মধুবালা ফিকফিক করে হেসে উঠল। তার দিকে তিনি কটমট করে তাকাতেই সে তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা কালো চশমা বের করে সেটা চোখে দিল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ সানগ্লাস চোখে দেওয়ার কী প্রয়োজন পড়ল সহদেব ডাক্তার বুঝতে পারলেন না।

এদিকে নির্বিকারভাবে চশমাটা চোখে দিয়ে হাতব্যাগ থেকে একটা ছোট গোল আয়না বের করে নিজের চশমা পরিহিতা মুখশ্রী দেখতে দেখতে মধুবালা ভুল সুরে, ভুল হিন্দি উচ্চারণে গাইতে লাগল,

গোরি গোরি মুখমে
কালি কালি চশমা।'...

তারপর মধুবালা হঠাৎ গান থামিয়ে পটললালকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'পটলদা বাজে গল্প রেখে এবার আমার কেসটা বল।

চার

মধুবালার সমস্যা

'রূপ সুহানা লাগতা হ্যায়
চাঁদ পুরানা লাগতা হ্যায়।'

মধুবালার আচরণে পটললাল রীতিমত বিরক্ত বোধ করলেন। কিন্তু সহদেব ডাক্তার এটাও বুঝতে পারলেন যে পটললালের মতো দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে মধুবালার মতো খলবলে যুবতীকে আয়ত্তে রাখা কঠিন।

পটললাল একটু সামলিয়ে নিয়ে সহদেব ডাক্তারকে বললেন, 'এবার তা হলে মধুবালার সমস্যাটার কথা বলি।'

সহদেববাবুরও তাড়াতাড়ি আছে। ছুটির দিনের সকাল হলেও এগারোটা বেজে গেছে, এর পরে স্নান খাওয়া আছে, বিশ্রাম আছে। সহদেব ডাক্তার রবিবার বিকেলে অল্প কিছুক্ষণ চেম্বারে বসেন, রোগী দেখেন। বিকেল চারটে বাজার আগে থেকেই রোগী আসতে থাকে।

তবে পটললাল মধুবালার বিষয়ে বলা আরম্ভ করার আগে সহদেব ডাক্তারের দুয়েকটা জিজ্ঞাসা ছিল, তিনি পটললালের কাছে জানতে চাইলেন, 'মিস মধুবালার নাম কি পিতৃদত্ত? বাবা-মার দেওয়া?'

পটললাল ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। না স্যার। আমাদের লাইনে সন্ন্যাসীদের মতো বাড়ির নাম চলে না। নতুন নাম দেয়া হয়।'

সহদেববাবু স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার গিন্নি তো শ্রীলেখা থেকে জুলেখা হয়েছিলেন।'

পটললাল তাড়াতাড়ি সহদেববাবুকে থামিয়ে বললেন, 'জুলেখার কথা বাদ দিন স্যার। মধুবালার কথা বলছি। ও হল বিহারের দেহাতি মেয়ে। মধুপুরের কাছে বাড়ি ছিল। আগে

নাম ছিল, বোধহয়, রাধা সিং। ডাক নাম ছিল বাবলি।' এই বলে পটললাল মধুবালার দিকে তাকাল।

মধুবালা অপাঙ্গে হেসে সম্মতি জানাল। সে সহদেব ডাক্তারের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

মধুবালা চশমাটা খুলে নিয়েছে। তার মুখের দেহাতি বন্যতা, শ্যামকায়ার নিখুঁত বাঁধন রীতিমত চিত্ত বিভ্রমকারী, মোহ সঞ্চারী। ঘনীভূত এই যৌন রসায়নের দিক থেকে সহদেব ডাক্তার তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন।

পটললাল বললেন, 'বাবলি মধুপুর থেকে এসেছে তাই নাম রাখা হয়েছে মধুবালা। যাত্রা পিতামহ দুকড়ি দত্ত মশায় নিজে এই সব নাম দেন। আজকাল পুরনো দিনের হিরোইনদের নাম চলছে। দুকড়ি দত্ত যে যে জায়গায় থেকে এসেছে জায়গার নামে তার নাম মিলিয়ে দেন। বাবলি মধুপুর থেকে এসেছে তাই নাম হয়েছে মধুবালা। নাগেরবাজার থেকে একটা মেয়ে এসেছে, তার নাম দেয়া হয়েছে নার্গিস। পুরসুরা থেকে খুকু এসেছে, সে এখন সুরাইয়া, দারুণ নাম করেছে।

আধুনিক নার্গিস, সুরাইয়া, মধুবালাদের এই নাম বৃত্তান্ত শুনে গোয়েন্দাপ্রবর চমৎকৃত হলেন। একটু থেমে থেকে তারপর বললেন, 'এইবার মধুবালার সমস্যাটা বলুন।'

দেখা গেল, মধুবালার সমস্যাটা অভাবনীয়। কারও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে সহদেব ডাক্তার কখনওই ভাবেননি।

যাত্রায় করুণ রসের খুব প্রাবল্য। মধুবালার তাতে কোনও অসুবিধে হয় না। সে ইচ্ছে করলেই কপাল চাপড়িয়ে কাঁদতে পারে। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে পারে, মুহূর্তের নোটিশে চোখে জল আনতে পারে।

বীর রস বা রৌদ্ররসেও বেশ পারঙ্গমা। সে চিৎকার করে 'খামোশ' কিংবা 'চোপরও' বললে যাত্রার আসরে ঘুমন্ত শিশুরা কঁকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জেগে ওঠে।

এসব তেমন বড় কথা নয়। পালার আসরে সব ছোটবড় অভিনেতাই এটা করে, করতে পারে।

কিন্তু মিস মধুবালার প্রধান উৎকর্ষ হল শৃঙ্গার রসে বা আদি রসে। প্রেম ও প্রণয়ের দৃশ্যে শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ শয্যা দৃশ্যে। ধর্ষণ ও বলাৎকারের দৃশ্যে। মধুবালার নাকি তুলনা হয় না। ব্যভিচারিণী, বিপথগামিনী রমণীর ভাল চরিত্র পেলে মধুবালা একেবারে ফাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু সকলের তো সব বিষয়ে যোগ্যতা থাকতে পারে না। একেকজনের একেক ব্যাপারে অসুবিধে থাকে।

মধুবালার অসুবিধে হল হাস্যরস নিয়ে। মধুবালা হাসতে পারে না।

মধুবালা বিষয়ে বক্তব্য এই পর্যায়ে আসার পর হঠাৎ পটললালের কী খেয়াল হল। সহদেব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার মধুবালার একটা বেডসিন দেখবেন? আপনি ওই বড় সোফাটার ওপরে চলে যান, গিয়ে শুয়ে পড়ুন, মধুবালা আপনার সঙ্গে বেডসিন করে দেখাবে।'

দেখা গেল মধুবালাও প্রস্তুত। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে বড় সোফার এক পাশে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

সহদেব ডাক্তার রীতিমত অপ্রস্তুত। জীবনে ছোটখাট দুচারটে সিন বা গান যে কখনও করেননি তা নয়, কিন্তু বেডসিন করার মনোবল তাঁর মোটেই নেই। তিনি শশব্যস্ত হয়ে জানালেন, 'না। না। তার দরকার নেই।'

সহদেববাবুর ব্যাপার স্যাপার দেখে খুবই নিরাশ হয়ে পড়ল মধুবালা। সে ধীরে ধীরে সোফার ওপরে শোয়া অবস্থা থেকে বসা অবস্থায় নিজেকে নিয়ে এল। এই নিয়ে আসা, রীতিমত সময় নিয়ে, নানা রকম শারীরিক কায়দা কৌশল করে। এডালট মার্কা সিনেমার নায়িকারা বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে যেমন করে, মধুবালাও তাই করল।

গোয়েন্দা বা গীতিকার কিংবা চিকিৎসক যাই হোন না সহদেববাবু রক্তমাংসের মানুষ। তিনি বুঝতে পারলেন এরপর উত্তেজনা দমন করা কঠিন হয়ে যাবে। এরপর হয়তো বেডসিন করার লোভ দেখা দিতে পারে।

তাই উত্তেজনাটা চাপা দেয়ার জন্যে সহদেববাবু পটললালকে বললেন, 'মধুবালার আসল সমস্যাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

পটললাল আর দেরি করলেন না। সরাসরি বলে ফেললেন, 'হাসলে মধুবালার হেঁচকি ওঠে, হেঁচকি ক্রমাগত উঠতেই থাকে। এমনিতে ছোটখাট চাপা হাসি, চোখের কোণে কামনা মদির হাসি, ঠোঁটে লালসাময় হাসি। এগুলোতে মধুবালার তেমন অসুবিধে হয় না। কিন্তু হো-হো করে, হা-হা করে, গলা খুলে চেঁচিয়ে হাসলেই মধুবালার হেঁচকি ওঠে।'

এ কথা শুনে সরল বালকের মতো সহদেব ডাক্তার বললেন, 'হো-হো করে, হা-হা করে চেঁচিয়ে হাসার দরকার কী? একজন মহিলার পক্ষে এভাবে হাসাটা মোটেই শালীন নয়।'

পটললাল বললেন, 'শালীন-অশালীন নিয়ে মধুবালা মাথা ঘামায় না। নিজের আনন্দে তো ও হাসে না। ও হাসে পেটের দায়ে।'

'পেটের দায়ে হাসে?' একটু অবাক হলেন যেন সহদেব ডাক্তার।

পটললাল বললেন, 'আজ্ঞে ঠিক তাই। এবার বাহাদুর অপেরায় মধুবালা সাইন করেছে। বাহাদুর অপেরার বুড়ো কর্তা তিনু পুরকায়েত মধুবালাকে বলে দিয়েছেন, 'কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, রতিকলা যা কিছু করতে চাও আমি আছি।' তিনুবাবু খুব রক্ষণশীল ব্যক্তি, তাঁর কথা হল স্টেজে ওসব বেলেল্লাগিরি চলবে না। এবার তিনি যে নতুন পালা নামাচ্ছেন তার নাম, 'রানী আসে, হাসতে হাসতে।'

রানী আসে হাসতে হাসতে বইয়ের পাতায় পাতায়, পরতে পরতে হাসি। পড়তে গিয়ে প্রম্পটার থেকে পরিচালক পর্যন্ত হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ওই নাটকেরই মুখ্য স্ত্রী চরিত্রে রানীর ভূমিকা পেয়েছে মধুবালা। রীতিমত অট্টহাসির পার্ট। এটাই মধুবালার জীবনে প্রথম বড় সুযোগ।

মধুবালা কিন্তু একবারের জন্যেও তিনুবাবুকে বলেনি বা জানতে দেয়নি যে হাসলে তাঁর হেঁচকি ওঠে। তা হলে তিনুবাবু হয়তো তাকে নায়িকার ভূমিকা থেকে কিংবা পালা থেকেই সরিয়ে দেবেন।

ওদিকে নায়িকার পার্ট করতে গিয়ে যদি প্রাণ খুলে, গলা খুলে হাসতে হয় তা হলে প্রথম দৃশ্য থেকেই মধুবালার হেঁচকি উঠতে থাকবে, দ্বিতীয়-তৃতীয় দৃশ্য নাগাদ হেঁচকি তুলতে তুলতে স্টেজে বসে পড়বে। পুরো পালা বরবাদ হয়ে যাবে।

মধুবালার সমস্যাটা সত্যিই জটিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেন পটললাল।

কিন্তু মধুবালা কি কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ দেয়। সে এমন চুলবুল করতে লাগল যে তাতে সহদেব ডাক্তারের কেন পুরাকালের মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ হয়ে যেত। এই হাঁটু মুড়ে বসছে, পরক্ষণেই মাথার ওপরে হাত তুলে দেহবল্লরী বিকশিত করে এলো খোঁপা ঠিক করছে।

অবশেষে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'আমাকে একদিন সময় দিতে হবে। আপনারা কালকে আসুন পটললাল বাবু। তবে আমাকে একটু ওই আপনাদের বুড়ো কর্তা তিনুবাবুর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাবেন।'

তিনুবাবুর ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে চলে যাওয়ার সময় পটললাল বললেন, 'তিনুকর্তার কাছে বিশেষ কিছু, সুবিধে হবে না স্যার।'

সহদেব বললেন, 'দেখি।'

মধুবালার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে পটললাল আরেকটা কথা বললেন, 'স্যার, কালকে আমার একটু অসুবিধে আছে।'

সহদেব বললেন. 'ঠিক আছে, পরশু আসুন।'

পটললাল বললেন, 'কিন্তু স্যার, মধুবালার ব্যাপারটা একটু জরুরি। দুয়েকদিনের মধ্যেই ওর পালার মহড়া শুরু হয়ে যাবে।'

একটু বিরক্ত হয়ে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

পটললাল মধুবালার সঙ্গে জনান্তিক একটু কথা সেরে নিয়ে বললেন, 'স্যার, ও যদি কাল সন্ধ্যাবেলা একলা আসে?'

সন্ধ্যায় মধুবালা একাকিনী। একটু ইতস্তত করে তারপর ভয়ের এবং দ্বিধার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'ঠিক আছে।'

পাঁচ

মধুর সমাধান

'তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত...
নেহি তুছকো কোই হোঁশ
তুছ পর যৌবনকা যোশ যোশ...'

হৃদয়ের মধ্যে একটা দেহজ আবেগ বহুদিন পরে জাগিয়ে দিয়ে মধুবালা পটললালের সঙ্গে চলে গেল। এক কালে জুলেখার সাহচর্য এরকম হয়েছিল। তখন বয়েস পাঁচ বৎসর কম ছিল।

এ বয়েসে কি আর এ সব পোষায়।

মনটাকে শান্ত রাখার জন্যে মধুবালাকে বাদ দিয়ে মধুবালার সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন সহদেব সারা দিন, সারা সন্ধ্যা ভাবলেন।

বার কয়েক চিৎপুরে তিনু পুরকায়েতকে ফোনে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লাইনে পেলেন না। তিনু কর্তা রবিবার ফোন ধরেন না, কোনও যন্ত্রপাতি স্পর্শ করেন না।

সহদেব ডাক্তার এটা বুঝেছেন তাঁর এই মামলার নিষ্পত্তির চাবি কাঠি তিনু কর্তার

হাতে রয়েছে। তিনু কর্তাকে যে কোনওভাবে হাসির পালা করা থেকে নিরস্ত করতে পারলে মধুবালাকে রক্ষা করা যায়।

চিন্তা করতে করতে সহদেব ডাক্তারের রাতের ঘুম চটে যায়। শেষ রাতের দিকে হাল্কা মতন একটু ঘুম আসে। একটা গোলমেলে স্বপ্ন দেখে সহদেব ডাক্তারের স্বপ্ন ভেঙে গেল। তিনি সমুদ্রের নীল-নীল বড়-বড় ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন, মধুবালা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তীরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

আজ বহুদিন পরে সকালবেলা সহদেব হাঁটতে বেরোলেন। ঘণ্টাখানেক খোলা বাতাসে মাথা ও শরীর ঠাণ্ডা করে বাড়ি এসে প্রথমেই ফোন করলেন তিনু পুরকায়েতকে।

তিনু কর্তা নিজেই ফোন ধরলেন। গাঁজা খাওয়া খ্যান খ্যান গলা। অনেকটা সাবেক দিনের নবদ্বীপ হালদারের মতো।

সহদেববাবু নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললেন, 'আমি সাপ্তাহিক 'এত রঙ্গ বঙ্গ দেশে' পত্রিকার সম্পাদক বলছি। আপনার নতুন পালার খবর নিচ্ছিলাম।'

তিনু কর্তা পত্রিকার লোক উপযাচক হয়ে খবর নিচ্ছে শুনে বেশ খুশি হলেন বলে মনে হল। বললেন, 'আমরা এবার মারমার কাটকাট, দম ফাটা হাসির পালা করছি। 'রানী আসে, হাসতে হাসতে'। দর্শকেরা চেয়ার থেকে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যাবে।' এমন একটি সুরসিকা নায়িকা পেয়েছি মশায়, কী বলব। দেহাতের আসল চালানি জিনিস।'

গম্ভীর হয়ে সহদেব ডাক্তার বললেন, 'যা দিনকাল পড়েছে কর্তা। হাসির পালা কি চলবে? জীবনে কোথাও তো আর হাসি নেই।'

তিনু কর্তা বললেন, 'সেই জন্যেই তো চলবে। লোকে একটু হাসুক। আর কতকাল পকেটের পয়সা খরচ করে লোকে গোমড়া মুখে বুক চাপড়ানি, 'শাঁখা ভাঙা, সিঁদুর মোছা' দেখবে।'

চুপ করে থাকাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ বুঝে নিয়ে সহদেববাবু চুপ করে থেকে তিনু কর্তার কথায় হুঁ হুঁ করে সায় দিতে লাগলেন।

তিনুবাবু বলে চললেন, 'ওই সব বস্তাপচা মাল মশাই, 'সতীনের ছেলের বড় গলা', 'সাপের সঙ্গে বাঘিনীর দেখা', 'ডাইনি আমার শাশুড়ি মা' আর চলবে না মশায়। জানেন আমার বইতে দেড়শো কমিক রিলিফ, বাহাত্তুরটা হাসির সিচুয়েশন। তা ছাড়া অন্তত একশো জোক, তারাপদ রায়ের জ্ঞানগম্যি আর শোধবোধ থেকে সাক্ষাৎ টোকা।'

সহদেববাবু বলতে যাচ্ছিলেন, 'ও বই দুটোও আগাগোড়া টোকা।' তা না বলে বিনা বাক্যব্যয়ে টেলিফোনটি নামিয়ে রাখলেন। হাস্যরসের রীতিমত অ্যাকিউট কেস, এই রোগ সারানোর সাধ্য তার নেই।

রোগ সারানোর কথাটা মাথায় আসতেই কিন্তু সহদেব ডাক্তার চলমান হয়ে উঠলেন। তিনি ভুল দিক থেকে কেসটার ব্যাপারে এগোচ্ছিলেন। গোয়েন্দা হিসেবে নয়, একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক হিসেবে পুরো ব্যাপারটা দেখতে হবে। মধুবালাকে একজন রোগিণী হিসেবে চিকিৎসা করলে, যার অসুখটা হল হাসলেই হেঁচকি ওঠে সমস্যাটা সমাধান হতে পারে।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। ইংরেজি-বাংলা মোটা মোটা চার ভলিউম মেটিরিয়া মেডিকা আছে ডাক্তার সহদেব শুকের। বহুদিন পরে ধুলো ঝেড়ে সহদেব সেগুলো খুলে বসলেন। সারাদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না হাসলে হেঁচকি

উঠলে কী চিকিৎসা করা উচিত সে বিষয়ে কোনও চিকিৎসা, ওষুধপত্রের নির্দেশ।

ক্লান্ত হয়ে বিকেলের দিকে চেম্বারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সহদেববাবু। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন অন্ধকার হয়ে গেছে। কাজের লোকটিকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বললেন আর বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় রোগী দেখব না। রোগীদের বলে দিন ডাক্তারবাবুর শরীর খারাপ করেছে।'

সন্ধ্যার একটু পরেই মধুবালা এল। একটা বন্য দেহাতি কালো জলের নদীর মতো সে প্রবেশ করল সহদেববাবুর ড্রয়িং রুমে। নীল ফুল ফুল ছাপ সুতির একটা খাটো ফ্রক পরনে, সেটাও পাতলা কাপড়ের। থই থই করছে যৌবন। সোফায় এসে বসতে হাঁটুর ওপরে উঠে গেল ফ্রকের ঝুল।

সহদেব ভয় পেয়ে গেলেন, কোনও একটা পাগলামি না করে বসি। মধুবালাকে কী বলবেন সেটাও বুঝতে পারছেন না। এমন সময় তাঁর খেয়াল হল ডাক্তার তথা গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর একবার যাচাই করে দেখা উচিত মেয়েটার হাসলে কেমন হেঁচকি ওঠে।

মধুবালাকে সহদেব বললেন, 'একটু হাসো দেখি।'

মধুবালা বলল, 'হঠাৎ হাসব কেন?'

সহদেব বললেন, 'হঠাৎ নয়, হাসলে তোমার কেমন হেঁচকি ওঠে সেটা দেখতে হবে।'

মধুবালা বলল, 'আমার তো হাসিই আসে না।'

সহদেব বললেন, 'তবু একটু চেষ্টা কর।'

মধুবালা বলল, 'পারবো না। হেঁচকি উঠবে ভয়ে আমার হাসি আসে না।'

ডাক্তার হিসেবে সহদেব ভেবে দেখলেন, যদি এর হেঁচকি ওঠাটা সারিয়ে দেয়া যায় হাসির অসুবিধেটা নিশ্চয় থাকবে না। হেঁচকির নানারকম চিকিৎসা আছে, সেটা নিয়ে সমস্যা হবে না।

কিন্তু মধুবালা কিছুতেই হাসে না। চোখের কোণে হাসির ঝিলিক ঠোঁটে চাপা হাসি কিন্তু যে হাসি তাকে পালায় হাসতে হবে, যে হাসি হাসলে তার হেঁচকি ওঠে সে হাসি সে কিছুতেই হাসে না। হাসতে গিয়ে থমকে যায়।

সহদেববাবু নানা কায়দা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তিনি মধুবালাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি সেই বোকা মেয়ের কথা শুনেছো যে সব সময়েই 'না' বলে।

মধুবালা বলল, 'না।'

সহদেববাবু বললেন, 'তুমিই সেই বোকা মেয়ে।'

এই রসিকতাতেও মধুবালা হাসল না। তবে সহদেব ডাক্তারের আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করল। সে বলল, 'আমাকে কাতুকুতু দিলে আমি হাসতে পারি।'

সহদেববাবু খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে কাতুকুতু দাও।'

মধুবালা রাগ-রাগ গলায় বলল, 'নিজেকে নিজে কাতুকুতু দিলে আমার হাসি পায় নাকি। আপনি আমাকে কাতুকুতু দিন।'

এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা সহদেব ডাক্তার একটু আগেও ভাবেননি, তা হলে এতটা এগোতেন না, কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই। এরই মধ্যে মধুবালা এগিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কী আর করবেন। সহদেব খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে মধুবালাকে কাতুকুতু দিতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে মধুবালার হাসির বেগ আসতে লাগল। শরীরের যে সমস্ত খাঁজে-ভাঁজে কাতুকুতু দিলে হাসি বেশি পায় সেই সব নিষিদ্ধ জায়গায় মধুবালা সহদেবের হাত চেপে চেপে ধরতে থাকল। তারপর প্রথমে ঝিরঝির বৃষ্টির মতো খিলখিল করে অবশেষে উদ্দাম পাহাড়ি ঝর্ণার মতো বারবার করে হাসতে লাগল।

আর সেই হাসতে হাসতেই মধুবালার হেঁচকি শুরু হল। আর সে কী হেঁচকি। একের পর গমকে গমকে, ধমকে ধমকে বিয়ারের বোতলের ফেনার মতো হেঁচকি তুলতে লাগল মধুবালা।

শেষ পর্যন্ত হেঁচকি আর সামলাতে না পেরে সহদেব ডাক্তারের গলা জড়িয়ে ধরল মধুবালা। ডাক্তারবাবু প্রৌঢ় বটে কিন্তু তিনু কর্তার চেয়ে অনেক যুবক। হেঁচকি তুলতে তুলতে সহদেব ডাক্তারের গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে গেল মধুবালা।

অতঃপর

'পুরনো মধু নতুন মধু
কোন মধুটি সেরা।'

অতঃপর আর কিছুই নয়।

আপনারা যা ভাবছেন তা মোটেই নয়। সহদেব ডাক্তার মোটেই দুর্বল চরিত্রের লোক নন।

তিনি একটু কষ্ট করে মধুবালার হাত ছাড়িয়ে চেম্বারে গিয়ে একটা কড়া ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে মধুবালাকে খাইয়ে দিলেন। অত্যন্ত তেজি ওষুধ। এক ডোজেই মধুবালার হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সে চোখ বুজে হেঁচকি তুলছিল। এবার চোখ খুলে বলল, 'বাবা, যেমন তেজ, তেমন কড়া।'

এখন থেকে মধুবালা তার হ্যান্ডব্যাগে সহদেব ডাক্তারের ওষুধ এক শিশি রেখে দেয়। রিহার্সালের আগে এক ডোজ খেয়ে নেয়। তারপর অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেসে যায়। হাসতে হাসতে লাট হয়ে যায়।

মধুবালার ইচ্ছে ছিল যে একদিন তার রিহার্সাল দেখতে সহদেব ডাক্তারকে ডাকে। কিন্তু তিনু কর্তার ভয়ে সেটা সাহস পায়নি।

পটললাল মধ্যে একদিন এসেছিলেন। তিনি কটক চলে যাচ্ছেন নিতাইবাবুর খোঁজে, সেখানে ওড়িয়া যাত্রায় ভাগ্যান্বেষণ করবেন। বলে গেলেন, 'মধুবালা রইল। আপদে বিপদে পড়লে দেখবেন।

মধুবালা অবশ্য আর আসেনি। কিন্তু তাতে জিতেন্দ্রিয় ডাক্তার সহদেব শুকের কিছু আসে যায় না। তিনি আবার কেবল টিভিতে আসল মধুবালার পুরনো ছবি দেখছেন আর গান রচনা করছেন। এই তো কাল রাতেই লিখেছেন,

নিজের মনে নিজে নিজেই
করছি আমি জেরা,
পুরনো মধু নতুন মধু
কোন মধুটি সেরা?

নীল আলো

নিলামে একটা রঙিন টিভি কিনেছিলেন প্রেমতোষ। নতুনের দামের প্রায় অর্ধেক দামে। অনেকদিনই একটা রঙিন সেটের শখ ছিল প্রেমতোষের। খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন পাঁচ অঙ্কের টাকা একটা নতুন সেটের দাম।

টাকার পরিমাণ দেখে দমে গিয়েছিলেন প্রেমতোষ। প্রেমতোষের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ তা বলা যাবে না। ফল সংরক্ষণের একটি কেন্দ্রীয় সরকারি আন্ডারটেকিংয়ে ফিনান্স অফিসারের চাকরি করেন তিনি। তাঁর কোম্পানি এখনও কোনও রকম ফল সংরক্ষণের কাজে হাত দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে কী করা হবে তারই ছক কষার জন্য শ তিনেক লোক কাজ করে।

প্রেমতোষ মাইনে যা পান তাতে এক মাসের আয়ে একটা নতুন সেট টিভি কেনা চলে। কিন্তু প্রেমতোষ মিতব্যয়ী লোক। সব কিছুতে একটু সাশ্রয় করার চেষ্টা করেন। বাজারে ছোট আলু, ছোট পটল কেনেন। কেজি প্রতি পঞ্চাশ পয়সা কম লাগে বলে।

এরকম তো অনেকেই করে। কিন্তু প্রেমতোষের সাশ্রয় করার ধরনটা একটু অন্যরকম। একটা ছোট উদাহরণ দিই।

সকালবেলায় অফিস যাওয়ার আগে স্নান করার সময় তিনি দাড়ি কামান। দাড়ি কামানোর পরে সাবানের বুরুশ কিন্তু ধুয়ে ফেলেন না। বুরুশটা ধুয়ে ফেলেন ভাত খেয়ে উঠে আচানোর সময়। এতে হাত ধোয়ার জন্যে আর আলাদা করে সাবান লাগে না, বুরুশের সাবানেই কাজটা হয়ে যায়, বুরুশটাও ধোয়া হয়ে যায়। তা ছাড়া দাড়ি কামানোর সাবানের একটা সৌরভ আছে, তাতে হাতে একটা সুগন্ধ লেগে থাকে।

রঙিন টিভি কেনার ব্যাপারে একটা মওকা পেয়ে গিয়েছিলেন প্রেমতোষ। হঠাৎই রবিবারের ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল, একটি গুজরাতি পরিবার বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাদের বাড়ির জিনিসপত্র ফার্নিচার, টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি তারা সেই রবিবার সকালেই নিলামে বেচে দেবে।

সাহেব পাড়ায় মিডলটন স্ট্রিটের ঠিকানা। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে বাস থেকে নেমে খুঁজতে খুঁজতে ঠিকানাটায় পৌঁছে ছিলেন প্রেমতোষ চৌধুরী।

টিভিটা চালু অবস্থাতেই ছিল। হাঁকাহাঁকি করে যে দাম উঠল সেটাও আয়ত্তের মধ্যে। নগদ দাম চুকিয়ে টিভিটা একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে এলেন তিনি।

বাড়িতে প্রেমতোষবাবু তাঁর এক গোলমেলে দাদার সঙ্গে থাকেন। দুই ব্যাচেলার সংসার দেখাশোনা করে একটি বোবা কাজের মেয়ে। ঠিক মেয়ে বলা চলে না, মধ্যবয়সিনী। প্রেমতোষবাবুর সুবিধে সে বোবা বলে কম মাইনে দিলেও কিছু বলতে পারে না। বোবা মেয়েটির নাম দামিনী। কিন্তু যে কানে শুনতে পায় না, তার নাম দিয়ে আর কি হবে।

দামিনী কিন্তু সেয়ানা আছে। সে ভালই জানে তার কত মাইনে হওয়া উচিত। কিন্তু সে কম মাইনে নেয় এই আশায় যে ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে যে কোনও একজন তাকে কখনও বিয়ে করবে। দামিনী সব সময়ে লজ্জানম্রা, ব্রীড়ানতা ভঙ্গিতে থাকে। মাঝে

মাঝেই জিব কাটে।

দামিনীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। তার সঙ্গে ঝগড়া করে না পেরে আগের স্বামী পালিয়ে যায়। প্রেমতোষ এখবর শোনার পর মাথা ঘামিয়ে ছিলেন কী করে বোবা বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত লোকটা, আর সেই ঝগড়ায় হেরে যেত। কিন্তু পাশের বাড়ির যে বুড়ি দাসী দামিনীকে দেয়, সে প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিল, দামিনী এমনিতে খুব ভাল, কিন্তু বড় ঝগড়াটে।

প্রেমতোষবাবুর দাদা মহীতোষবাবু চিরকাল অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তিনি একটি পাঁচতারা হোটেলের হেলথ ক্লাবের ব্যায়াম নির্দেশক। সেখানে বিভিন্ন বয়সী স্থূলদেহী পুরুষ এবং মহিলার পরিচর্যা করে করে এখন সব কিছুই বড়-বড়, মোটা-মোটা দেখেন। দানাদার দেখলে ভাবেন রাজভোগ, পাতে ছোট এক টুকরো মাছ দিলে বলেন এত বড় মাছ। অবশ্য প্রেমতোষবাবুর ধারণা অতিরিক্ত শীর্ষাসন করে তাঁর দাদার এই অবস্থা। উলটো দিক থেকে দেখে দেখে দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটিয়ে গেছে।

সে যা হোক, প্রেমতোষ তো পুরনো টিভি সেটটা কিনে বাড়ি নিয়ে এলেন। মহীতোষ জিনিসটা দেখে খুব বিরক্ত বোধ করলেন, মুখে শুধু বললেন, 'আস্ত একটা সিনেমা বাসায় নিয়ে এলি।'

মহীতোষ টিভির ঘরে একদম এলেন না। দামিনী মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে। উদ্দাম নাচের কিংবা ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্যে জিব কেটে পালিয়ে যায়।

দু-চারদিন টিভিটা মোটামুটি চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন চলতে চলতে ফুস করে নিবে গেল।

ইতিমধ্যে প্রেমতোষবাবু বুঝে ফেলেছিলেন, ওই গুজরাতি পরিবারের বিদেশ যাত্রার ব্যাপারটা পুরো ভুয়ো। ওটা একটা কায়দার বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক সপ্তাহেই ইংরেজি কাগজের নির্দিষ্ট কলমে ওই একই মিডলটন স্ট্রিটের ঠিকানা দিয়ে একইরকম জিনিসের বিজ্ঞাপন বেরোয়। কখনও লেখা থাকে গুজরাতি পরিবার আমেরিকা যাচ্ছে, কখনও থাকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দম্পতি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে।

নিতান্ত কৌতূহলবশত পরের এক রবিবার প্রেমতোষবাবু ওই নিলামের ওখানে আরেকবার গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেছিলেন, আগের বার যারা ডাকাডাকি করে নিলাম হাঁকছিল এবারেও প্রায় তারাই তিন হাজার-সাড়ে তিন-পৌনে চার হাজার-চার এই রকম ডেকে ডেকে জিনিসের দাম তুলে দিচ্ছে। তার মানে, এরাও সাজানো মাইনে করা লোক। বিজ্ঞাপন দেখে অনভিজ্ঞ দু'চারজন উটকো খদ্দের আসে, তাদের ঠকানোর কারবার।

টিভি খারাপ হয়ে যেতে প্রেমতোষ গড়িয়াহাট মোড়ের এক টিভি মিস্ত্রির খোঁজ করলেন। দোকানদার অবশ্য মিস্ত্রি কথাটা পছন্দ করলেন না, তিনি বললেন, 'মেকানিক ডাকতে গেলে একশো টাকা জমা দিয়ে নাম বুক করতে হবে। ঠিকানা দেখে মেকানিক সময় মতো চলে যাবেন। তারপর তিনি দেখে এসে রিপোর্ট করবেন।'

প্রেমতোষ বললেন, 'উনি কখন যাবেন জানতে পারলে সুবিধে হয়। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই, তা হলে আমি তখন বাসায় থাকব।' দোকানদার প্রেমতোষবাবুর ঠিকানা জানতে চাইলেন, খাতাপত্র দেখে বললেন, 'আপনাদের দিকে মিস্টার পাল রাউন্ডে যান বৃহস্পতিবার, তার মানে পরশুদিন।' দোকানদার আবার খাতা দেখে কী একটা সূক্ষ্ম

হিসেব করে বললেন, 'পরশুদিন তিনটে, সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছে যাবে।'

প্রেমতোষবাবু অনুনয় করলেন, 'শনি-রবিবার সম্ভব হবে না? ওই দু'দিন আমার ছুটি থাকে।'

দোকানদার বললেন, 'অসম্ভব। শনিবার বন্ডেল, রবিবার গোলপার্ক।'

অগত্যা প্রেমতোষবাবু বহুদিন পরে বৃহস্পতিবার একটা হাফ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে দুপুরে বাসায় ফিরে এসে বসে রইলেন।

তিনটে বা সাড়ে তিনটে নয়। মিঃ পাল এলেন পাঁচটা পার হয়ে। চোখে সানগ্লাস, গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি, হাতে ভি আই পি সুটকেশ।

মিঃ পাল কলিং বেল বাজিয়ে পরপর চারটে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। প্রথমেই জানতে চাইলেন, 'আপনিই প্রেমতোষ চৌধুরী?'

প্রেমতোষবাবু দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'টিভি খারাপ হয়েছে?'

প্রেমতোষবাবু আবার বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে কুকুর নেই তো?'

'প্রেমতোষবাবু জানালেন, 'না।'

'জুতো খুলতে হবে নাকি?'

প্রেমতোষবাবু বললেন, 'দরকার নেই।'

মিঃ পাল জুতো মশমশ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে টিভির সামনে একটি সোফায় বসে একটা কিং সাইজ সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা প্রেমতোষবাবুর দিকে এগিয়ে বললেন, 'চলবে নাকি?'

প্রেমতোষবাবু করজোড়ে সিগারেট প্রত্যাখ্যান করলেন।

সিগারেট টানতে টানতে গভীর অভিনিবেশ সহকারে মিঃ পাল টিভি সেটটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ দেখার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ মডেলের মাল কোথায় পেলেন মশায়? এ যে মিলিটারি ডিসপোজালের পুরনো চোরাই মাল।'

প্রেমতোষবাবু সংবাদটা শুনে একটু বিচলিত হলেন। তবে বুঝতে দিলেন না, বললেন, 'নিলামে কিনেছি।'

দেখা গেল মিঃ পাল বহুদর্শী লোক। অনেক কিছু খোঁজখবর রাখেন। নিলামের কথা শুনে তিনি বললেন, 'মিডলটন স্ট্রিটের নিলাম তো? গুজরাতি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, মিঃ অ্যান্ড মিসেস দেশাই, সব বেচে দিয়ে বড় মেয়ে কানাডায় ডাক্তার, তার কাছে চলে যাচ্ছেন, অই তো। ছিঃ ছিঃ! কালীঘাটের ভোলা হালদার হয়েছে মিঃ দেশাই, আর রিপন স্ট্রিটের রেহানা হয়েছে মিসেস দেশাই। ছিঃ। ছিঃ! জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চিটিং করছে!'

প্রেমতোষবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন।

মিঃ পাল সোফা থেকে উঠে ভি আই পি স্যুটকেশ খুলে যন্ত্রপাতি বার করে টিভির বাক্সটা অবলীলাক্রমে খুলে ফেললেন। পিছনের ঢাকনাটা উপুড় করে দিয়ে তার মধ্যে ভিতরের ছোট বড় নানারকম জটিল যন্ত্রাংশ খুলে খুলে রাখতে লাগলেন। তারপর হাত-পা হঠাৎ ছেড়ে গেলে লোকে যেভাবে কী পরিমাণ ক্ষত হয়েছে সেটা অনুধাবন করার চেষ্টা করে সেটের ভেতরটা একটু ঘাড় নামিয়ে দেখলেন, অবশেষে নিদান হাঁকলেন,

'একেবারে শেষ অবস্থা, টিউবটা একেবারে গেছে।'

এবার মিঃ পাল উঠলেন। নিজের স্যুটকেশটা একটু গুছিয়ে নিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, চোখের কালো চশমাটা যেটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে জামার ওপর পকেটে রেখেছিলেন সেটাকে স্যুটকেশের মধ্যে ভরে নিলেন। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রেমতোষকে বললেন, 'সোমবার একবার যাবেন, এস্টিমেট পেয়ে যাবেন।' টিভিটা যন্ত্রপাতি খোলা অবস্থায় সেই রকম পড়ে রইল।

তবে এস্টিমেটটা সোমবার পাওয়া গেল। হাজার চারেক টাকা লাগবে। পিকচার টিউব থেকে নাট-বল্টু সবই মেরামত করতে হবে কিংবা পুরোপুরি বদলাতে হবে।

এত সহজে চার হাজার টাকা খরচ করবার লোক প্রেমতোষ নন। দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এসে দামি এস্টিমেটটা ছিঁড়ে ফেলে ছিলেন। ফুটপাথের পাশের একটা কাঠের বেঞ্চিতে লুঙ্গি ও হাতকাটা কালো গেঞ্জি পরে মিঃ পাল বিড়ি সহযোগে ভাঁড়ে চা খাচ্ছিলেন, এস্টিমেটটা ছিঁড়ে ফেলতে দেখে তিনি কটমট করে তাকালেন প্রেমতোষের দিকে।

টিভির শোক সামলে উঠতে পারছিলেন না প্রেমতোষ। বাড়ি ঢুকলেই বসার ঘরে নাড়িভুঁড়ি বার করা সেটটা চোখে পড়ে। এদিকে এত খরচ করাও বিশেষ করে জোচ্চোরের গছানো রদ্দি টিভির জন্যে, প্রেমতোষবাবুর মনঃপূত নয়।

কিন্তু হঠাৎই সমস্যাটার আংশিক সুরাহা হয়ে গেল। প্রেমতোষের অফিসের একটা কারখানা বানানো হচ্ছে, কলকাতার কাছেই শহরতলীতে। ফলের রস তৈরি করার কারখানা। প্রেমতোষ গিয়েছিলেন কারখানা নির্মাণের ব্যয়ের সরেজমিন তত্ত্বাবধান করতে।

কারখানা তৈরির টেন্ডার পেয়েছিলেন রামকিষেণ সিং নামে এক পাঞ্জাবি কন্ট্রাক্টর। একটু রোগা, একটু বেঁটে, সর্দারজি হিসেবে একটু বেমানান, কিন্তু দাঁড়ি আর জবরদস্ত পাগড়ি মাথায় ভদ্রলোক একেবারে চোস্ত শিখ।

দু'চারদিন কাজের পর সর্দারজির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল প্রেমতোষবাবুর। সেই সময়ে একটা চমকপ্রদ তথ্য অবগত হলেন তিনি।

সর্দারজি মোটেই পাঞ্জাবি নন। তিনি ষোল আনা বাঙালি। তাঁর নাম রামকিষেণ সিং নয়, রামকৃষ্ণ সিংহ। হুগলি জেলার লোক। গুরুমুখী ভাষা মোটেই জানেন না, খুচখাচ হিন্দি আর ইংরেজি ও বাংলা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেন।

রামকৃষ্ণবাবুর কাছেই প্রেমতোষবাবু জানতে পারলেন এসব ব্যবসায় বাঙালিদের কদর খুব কম, এমনকী বাঙালিরাও কদর করে না, বরং পারলে শত্রুতা করে, শিখ কনট্রাক্টরের সঙ্গে সেটা সাহস পায় না। তা ছাড়া বাংলা জানা অবাঙালিদের এখন খুব রমরমা। সেই সুযোগটাই রামকৃষ্ণবাবু সদ্ব্যবহার করেছেন।

কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফেরার সময় কোনও কোনও দিন রামকৃষ্ণ প্রেমতোষকে বাড়িতে নামিয়ে দেন। ভদ্রতার খাতিরে একদিন প্রেমতোষ রামকৃষ্ণকে বললেন, 'একটু বসে এক কাপ চা খেয়ে যান।'

সদর দরজায় প্রেমতোষ বেল টিপলেন। কোনও বেল বাজার শব্দ হল না, কিন্তু দামিনী এসে দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রেমতোষের দিকে রামকৃষ্ণ তাকালে তিনি

বললেন, 'আমাদের কাজের মেয়ে। কানে শুনতে পায় না। তাই সুইচ টিপলে বেল বাজে না, আলো জ্বলে ওঠে, সেটা দেখে ও এসে দরজা খুলে দেয়।'

বাইরের ঘরের টেবিলের সঙ্গেও একটা সুইচ লাগানো আছে। সোফায় বসে প্রেমতোষ পরপর তিনবার সুইচ টিপলেন, তার মানে হল 'চা।'

রামকৃষ্ণবাবু অবাক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল অসংবৃত টিভি সেটটির ওপর, সেদিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?' প্রেমতোষ যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত করে টিভি-দুর্বিপাক আনুপূর্বিক ব্যক্ত করলেন।

বেশ মনোযোগ দিয়ে সব শুনে রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি আপনার সেটটা একটু চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

প্রেমতোষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী? আপনি টিভি সারাতে পারেন নাকি?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হুগলি কলেজ থেকে বি. এসসি ফেল করে প্রথমে টিভি সারানোর লাইনে গিয়েছিলাম। তখন তো সদ্য সাদা-কালো টিভির জমানা শুরু হয়েছে। বড় ফোর টোয়েনটি লাইন, লোক ঠকানোর ব্যবসা। ঘেন্নায় ছেড়ে দিলাম।'

প্রেমতোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

রামকৃষ্ণ সিংহ বললেন, 'তারপর থেকে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াচ্ছি। অবশেষে আপনাদের ঘাটে এসে ভিড়েছি।'

ইতিমধ্যে দামিনী চা নিয়ে এসেছে। আজ সে অধিকতরা লজ্জাশীলা, কপালে ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

চা খেয়ে রামকৃষ্ণবাবু টিভিটা দেখতে উঠলেন। একটু দেখে বললেন, 'পুরনো জিনিস। তবে খুব একটা খারাপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।' তারপর বললেন, 'এটা তো রঙিন টিভি, আমি শিখেছিলাম সাদা-কালো টিভির কাজ। তবু দেখি একটু চেষ্টা করে।'

প্রেমতোষবাবুর ব্যবহৃত একটা পুরনো ব্লেড, একটা তরকারি কাটা ছুরি, আর রান্নাঘরে সাঁড়াশি দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রামকৃষ্ণ সিংহ টিভি সেটটা প্রাণবন্ত করে তুললেন। শুধু একটা গোলমাল হল শব্দটব্দ সবই ঠিক আছে, ছবিও ঠিক আছে, কিন্তু রঙটা এল না। তবে সাদা কালো নয়, ঝলমলে নীল রঙের ছবি এল।

দূরদর্শনে তখন 'হুহুক্কা হুহুয়া, হুহু, হুয়া' এইরকম একটা মার-মার, কাট-কাট হিন্দি গান হচ্ছিল, কোনও এক বস্ত্র-কোম্পানি প্রণোদিত। ইতিপূর্বে প্রেমতোষবাবু তাঁর হিসেবি মনোভাব নিয়ে ভেবেছেন এত কম জামাকাপড় পরা পাত্র-পাত্রীদের যদি বস্ত্র ব্যবসায়ীরা উপস্থাপন করেন, তা হলে তাঁদের ব্যবসা লাটে উঠবে, এত নিজের পায়ে নিজের কুড়ুল মারা।

আজ প্রেমতোষবাবু সঙ্কোচবশত এ জাতীয় মন্তব্যের ধারে কাছে গেলেন না, বরং পুরুষ নর্তকেরা যখন গাছের আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে, 'হু-হু হুয়াহু, হুয়াহু হুয়া-হুয়া' করছিল, তিনি রামকৃষ্ণবাবুর দিকে তাকিয়ে খুবই অন্তরঙ্গভাবে বললেন, 'নীলবর্ণ শৃগাল কথা।'

রামকৃষ্ণ সিংহ হাসলেন। কিন্তু তিনি সুরসিক লোক। ঘর থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'টিভিটা এখন চলুক। এইভাবেই চলুক। আমি দু-চারদিনের মধ্যে একটা মিস্ত্রি

পাঠিয়ে দেব। সে এসে সব ঠিকঠাক করে দেবে। ততদিন মনের আনন্দে যতক্ষণ ইচ্ছে ব্লু ফিল্ম দেখুন।'

ঠিক এই সময়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আজন্ম ব্রহ্মচারী মহীতোষবাবু নেমে আসছিলেন। বিকেলের এই সময়টায় তিনি ছাদে উঠে শীর্ষাসন করেন, অস্তগামী সূর্যকে নিজের পদদ্বয় দেখান।

আজ সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক অচেনা ভদ্রলোক দেখে এবং 'ব্লু ফিল্ম' কথাটি শুনে তিনি বাইরের ঘরে উঁকি দিলেন। তখন আগের গান শেষ হয়ে নতুন জিনিস শুরু হয়েছে। এক দঙ্গল প্রায় উলঙ্গ তরুণী তাদের অঙ্গের গোলকার প্রত্যঙ্গ সমূহের বহুরকম আবর্তন করে 'দুধ বনে যাবে, মালাই বনে যাবে, মাছ বনে যাবে, কাবাব বনে যাবে,' ইত্যাদি নানা গোপন অভিপ্রায়ের কথা গানের সুরে জানাচ্ছে।

এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখে মহীতোষবাবু আঁতকিয়ে উঠে স্বগতোক্তি করলেন, 'ছিঃ! ছিঃ! এতবড় অনাচার। আমার বাড়িতে ব্লু ফিল্ম।' গজগজ করতে করতে মহীতোষবাবু বেরিয়ে গেলেন, যদিও পৈতৃক বাড়ি, তাঁর ধারণা তিনিই বড় ভাই বলে বাড়িটা তাঁরই।

মহীতোষবাবু বেরিয়ে যাওয়ার মুখে রামকৃষ্ণবাবুর দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে 'লোম্‌পট' বলে অভিহিত করে গেলেন।

রামকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে প্রেমতোষের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে, প্রেমতোষ বললেন, 'আমার দাদা।' তারপর নিজের মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোঝালেন যে মাথা খারাপ।

রামকৃষ্ণ আর দাঁড়ালেন না। তিনি পোড় খাওয়া লোক। বোবা, লজ্জাবতী পরিচারিকা, অপ্রকৃতিস্থ অগ্রজ—প্রেমতোষবাবুর বাড়িতে আর কী কী আছে সেটা জানার তাঁর আব মোটেই আগ্রহ নেই।

এরপর সারা সন্ধ্যা চুটিয়ে দূরদর্শন উপভোগ করলেন প্রেমতোষবাবু। সংবাদ শুনলেন, মানে বার দশেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাব দুয়েক মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পাওয়া গেল। অন্যান্য ভাগ্যবান মন্ত্রীদেরও দেখতে পেলেন। শুনতে পেলেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের কিছু এলোমেলো সংবাদ। তারপর লং জাম্প, হাইজাম্প সহকারে জীবনমুখী সঙ্গীত। বিশেষ বর্ণনা করে লাভ নেই, ভুক্তভোগী মাত্রেই এসব জানেন।

এদিকে রাত ন'টা বেজে গেছে। মহীতোষ এখনও বাড়ি ফেরেননি। প্রতিদিন রাত ন'টায় দুইভাই এক সঙ্গে বসে খান। আজ বাড়িতে অনাচার দেখে ব্যায়ামাচার্য ব্রহ্মচারী মহীতোষ পার্কে গিয়ে বসে আছেন।

প্রেমতোষ হাত দিয়ে নানারকম ইঙ্গিত করে দামিনীকে বুঝিয়ে তাকে পার্কে পাঠালেন দাদাকে ডেকে আনতে।

দামিনীকে দেখে উত্তেজিত হয়ে মহীতোষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্লু ফিল্ম, ওই নীল ছবি বন্ধ করেছে প্রেম?' দামিনী জিব কেটে, ঘোমটা টেনে ঠিক কী জবাব দিল সেটা বোঝা গেল না।

পার্কে মহীতোষবাবুর পাশেই কয়েকটি সমাজ সচেতন যুবক বসেছিল। তারা ব্লু ফিল্ম শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা মহীতোষবাবুদের বাড়ি চেনে। পার্ক থেকে বেরিয়ে তারা সরাসরি সেখানে এসে বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

সেই অতর্কিত মুহূর্তে প্রেমতোষবাবুর টিভির ঘন নীল আলোয় দিল্লি দূরদর্শনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচারে একটি অতি রোমান্টিক দক্ষিণী সিরিয়ালের প্রগাঢ় প্রেমের দৃশ্য প্রতিভাত হচ্ছিল। উদ্ভিন্ন যৌবনা নায়িকাকে সুনীল সাগরের সবুজ কিনারে শালপ্রাংশু মহাভুক্ত নায়ক সবলে আকর্ষণ করেছেন। নায়িকার সেকি ছটফটানি; লুঙ্গি পরিহিত, খালি গা নায়কের গোঁফের প্রান্তে বিজয়ীর হাসি।

সমাজসেবী যুবকেরা পলক মাত্র নীল দৃশ্যটি দেখে নিজেদের কর্তব্য স্থির করে ফেলল। তারা গলির পিছন দিকে ছুটল।

সেখানে গলির মোড়েই হাজরা ফাঁড়ি। সেই ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত দারোগা হাজারি হাজরা সাহেব একটু সাবেকি জমিদারি চালে চলেন। দোতলায় তাঁর কোয়ার্টার, সারাদিন সেখানেই থাকেন। খুব গোলমেলে ব্যাপার হলে ফোন ধরেন, সেও কদাচিৎ। বাসায় মাদ্রাজি সিল্কের লুঙ্গি পরে থাকেন আর রঙিন গেঞ্জি। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার পরে স্নান-টান করে, পাউডার মেখে চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি আর আলিগড়ি পাজামা পরে থানার অফিস ঘরে দর্শন দেন।

হাজারি হাজরার পূর্বাশ্রমে নাম ছিল ক্ষেত সরকার। হাজরা ফাঁড়িতে এক নাগাড়ে বহু বছর আছেন তাই পাবলিক তাঁকে মিঃ হাজরা বলে সম্বোধন করে এবং সেই সঙ্গে উনি হাজার টাকার কম নেন না বলে নাম হয়েছে হাজারি, দুইয়ে মিলে হাজারি, হাজরা।

হাজারি হাজরা নবযৌবনে নকশাল হয়েছিলেন। তারপর উনিশশো পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর সালে জরুরি অবস্থার গলিঘুঁজি দিয়ে দারোগাগিরিতে ঢুকে পড়েন। তদবধি বহাল তবিয়তে আছেন, যখন যে গাছে নৌকো বাঁধা উচিত, সেখানেই নৌকো বাঁধেন।

আজ সন্ধ্যাবেলা একটু আগেই একটা গোলমেলে খবর এসেছিল। থানার অদূরে অনিল ঘোষাল লেনে অনেকদিন ধরে একটা বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে গোলমাল চলছিল। বাড়িওয়ালা সপ্তাহ তিনেক আগে মারা গেছেন। গতকালই ভাড়াটে গজু শ্রীমানী এক গামলা লিচু আর আম, সেই সঙ্গে নগদে হাজার টাকা দিয়ে গেছে।

একটু আগে খবর এসেছে বাড়িওয়ালার বিধবা স্ত্রী ও বোনকে প্রায় উলঙ্গ করে গজু রাস্তায় প্যারেড করাচ্ছে। এইরকম সময়ে গা ঢাকা দেওয়াই রীতি।

সমাজসেবী যুবকেরা দারোগাবাবুকে উদ্ধার করল। তাদের মুখে নীল ছবির বার্তা পেয়েই, থানার ভার এক সদা অর্ধনিদ্রিত জমাদারের ওপর ছেড়ে দিয়ে, তিনি অকুস্থলে রওনা হলেন।

তখনও দামিনী মহীতোষবাবুকে নিয়ে পার্ক থেকে ফেরেনি। প্রেমতোষবাবু টিভির বিচিত্র লীলা উপভোগ করছেন, এমন সময় সদলবলে হাজারি হাজরার প্রবেশ।

স্বভাবতই প্রেমতোষবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। টিভিতে এখন তার রঙের খেলা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। নীলরঙটা গাঢ়, আরও গাঢ় হতে হতে হঠাৎ ফিকে, হাল্কা হয়ে গিয়ে চুপসে যাচ্ছিল, আবার গাঢ় হচ্ছিল।

হাজারি হাজরা নিজের হাতের রুলটা নাচিয়ে একটা ধমক দিলেন প্রেমতোষের দিকে তাকিয়ে, 'কী, এসব কী, হচ্ছেটা কী?'

প্রেমতোষ চৌধুরীও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, একটা সামান্য টিভি সেটের মধ্যে এতটা বর্ণবৈচিত্র্য তিনি আশা করেননি।

দারোগাবাবু এবার তাঁর ডানদিকে দাঁড়ানো বিহারি জমাদারকে বললেন, 'তেওয়ারি, হাত লাগাও,' আর প্রেমতোষকে বললেন, 'আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

কিন্তু প্রেমতোষবাবুকে থানায় যেতে হল না। জমাদারসাহেব টিভির নবে তাঁর লাঠির খোঁচা দিয়ে সেটা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। পরিণাম যা হল অতি ভয়াবহ। পুরো টিভির বাক্সটা থরথর করে কেঁপে শূন্যে ছয় ইঞ্চি লাফিয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে তীব্র নীল জ্যোতি এবং শতশত শঙ্খ গর্জনের শব্দ বেরতে লাগল। সপারিষদ হাজারিবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

এই সময় মহীতোষবাবু দামিনীর সঙ্গে বাসায় ফিরে এসেছেন। দামিনীর উপস্থিত বুদ্ধি অতি প্রখর। সে ছুটে সিঁড়ির নীচে গিয়ে মেইন সুইচটা অফ করে দিল।

টিভির গর্জন ও শূন্য পরিক্রমা বন্ধ হল। কিন্তু নীল আলোটা রয়ে গেল। গতিক সুবিধের নয় দেখে হাজারি হাজরা পশ্চাদপসরণ করলেন।

পরদিন সকালে টিভি সেটটাকে তুলে নিয়ে মহীতোষবাবু পাড়ার মোড়ের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত, অবৈজ্ঞানিক কারণে একটা অতি ক্ষীণ নীল আলোর রেশ এখনও রয়ে গেছে; প্রেমতোষবাবু ঘরে ঢুকলেই সেটা টের পান।

পাঁচ-পাঁচ

এবছর বর্ষার শেষে একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে দেখি ডান হাতের কব্জিটা কেমন ঝিনঝিন করছে। হাত ওঠাতে, নাড়াচাড়ায় বেশ কষ্ট হচ্ছে।

বেলা বাড়তে চলা ফেরা করার সঙ্গে সঙ্গে বেদনাটা কমে মিলিয়ে গেল, বিকেলের দিকে খেয়ালই থাকল না যে সকালের দিকে ওই রকম কষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু পরের দিন সকালে আবার সেই কষ্ট, এদিন আরও বেশি। যন্ত্রণাটা এদিন বিকেলের দিকেও কমল না। সেই সঙ্গে কব্জি ছড়িয়ে পুরো ডান হাতটায় ব্যথা ছাড়িয়ে গেছে।

দু-একদিনের মধ্যে ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ল ডান কাঁধে। তারপর বাঁ কাঁধে এল, অবশেষে তীব্রতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাঁ হাতে।

অসহ্য যন্ত্রণা। দু'হাতের একটা হাতও ভাল করে তুলতে পারি না। ডান হাত, বাঁ হাত দু'হাতই যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে ডান হাতেই বেশি কষ্ট হচ্ছে, কখনও মনে হচ্ছে বাঁ হাতটা কেটে ফেললে আরাম হবে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পর বিছানা থেকে আর উঠতে পারি না। এবার পিঠের শিড়দাঁড়া বেয়ে ব্যথাটা গলিত ধাতুর মতো জ্বালাতে জ্বালাতে পোড়াতে পোড়াতে নেমে আসছে।

ভাগ্যিস বহুকাল আগে একটা ভাল দেখে বিয়ে করেছিলাম, সতী-সাধ্বী সহধর্মিণী এসে কোমর জড়িয়ে ধরে ('যেভাবে বলনাচের সময়ে মেম ললনারা তাঁদের নৃত্য সঙ্গীদের আকর্ষণ করে থাকেন) আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুললেন। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হল না, বরং সমস্যা শুরু হল।

বাথরুমে গিয়ে টুথপেস্ট হাতে তুলতে গিয়ে মনে হল গন্ধমাদন পর্বত তুলছি। বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে পারলাম না। ছিটকিনি পর্যন্ত হাত তুলতে গিয়ে অর্ধপথে যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম।

ঘোরতর বিপদ হল। প্রাতঃকৃত্য সমূহ দুই হাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু হাত যদি অপারগ হয়? এরকম ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন অতি বড় শত্রুকেও যেন না হতে হয়। এমন কী বাড়িওলা, ওপরওলা, পাহারাওলা—কেউ যেন এমন কষ্টে না পড়েন।

এই পর্যন্ত পাঠ করে কোনও পাঠক যদি তাঁর স্ত্রী আমার প্রাণপ্রিয়া পাঠিকাঠাকুরানীকে বলেন, 'তোমার ওই তারাপদবাবু ডাক্তার দেখান না কেন? এত আদিখ্যেতার কী আছে?'

ডিয়ার মিঃ জিলাস (Dear Mr. Jealous), প্রিয় ঈর্ষাবাবু, আমি জানি, আপনারা ভাবছেন, 'তারাপদর হাত দুটো নুলো হয়ে যাক তা হলে তারাপদ আর লিখতে পারবে না, আমার বউ আর ওই বোকাসোকা, মোটাসোটা তারাপদ রায়ের লেখা পড়ে বিহ্বল হওয়ার সুযোগ পাবে না। ওই ডাক্তার না দেখানোর প্রশ্ন নিয়ে একজন পাঠিকা একদিন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমার আবাসে এসে পৌঁছলেন। তিনি আমার নট-নড়ন-চড়ন-নট-ফট ঋজু মেরুদণ্ড এবং প্রসারিত বাহুদ্বয় দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন, আমার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, 'সর্বনাশ! কোনও ডাক্তার দেখাননি?'

ডাক্তার দেখাইনি?

ডাক্তার না দেখিয়ে ভবসিন্ধু অতিক্রম করা যায়? কেউ পার হয়েছে?

এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রথমে পরোক্ষভাবে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করি। পরোক্ষ চিকিৎসার ব্যাপারটা সবাই জানেন, যে কোনও অসুখের গোড়ার দিকে আমরা সবাই এটা করি। কায়দাটা সোজা। কোনও অসুখ হলেই সেটা প্রতিবেশী আত্মীয় বা বন্ধুদের জানালে একটা না একটা প্রেসপ্রিপশন পাওয়া যাবেই। ইতিপূর্বে যাঁরা এইরকম বা অনুরূপ ব্যাধিতে ভুগেছেন তাঁদের ডাক্তারবাবু যা যা ওষুধ ও পথ্য দিয়েছিলেন তাই দিয়েই চিকিৎসা শুরু করা যায়।

আমার এক সহকর্মীর শ্যালিকা গত বছর সারা শীতকাল নাকি এই রকম ব্যথাবেদনায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বেদনাহর ট্যাবলেটের নাম জানা গেল, তবে তাঁর মোটেই মনে নেই ওষুধের মাত্রা কী রকম ছিল, দৈনিক কয়টা ট্যাবলেট খেতে হবে এবং কখন, খাওয়ার আগে না খাওয়ার পরে, খালি পেটে না রাতে শোওয়ার সময়।

একটা চালাকি করলাম। একজন বড় ডাক্তারকে টেলিফোন করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে হাতপিঠ ব্যথার জন্যে সকালবেলা 'পেইনফিনিশ' বলে যে ট্যাবলেটটা দিয়েছিলেন, সেটার প্রেসক্রিপশনটা হারিয়ে ফেলেছি। ডোজটা যদি একটু বলেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কোথাও আপনার একটু কিছু ভুল হয়েছে। আমি 'পেইন ফিনিশ' রোগীদের দিই না, ওটা সাংঘাতিক ওষুধ এক ডোজেই যেমন তেমন রোগী ফিনিশ হয়ে যায়।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম।

তবে সহকর্মীর শ্যালিকার কাছে অল্প কিছুটা ব্যবহৃত ব্যথা উপশমের অর্ধ টিউব মলম

পাওয়া গিয়েছিল। টিউবের গায়ে ময়লা জমে 'ডেট অফ এক্সপায়ারি'টা অর্থাৎ কার্যকারিতার সময়সীমা পড়া যাচ্ছিল না, সে যা হোক বিনি পয়সার মলমটা দু'দিন ব্যবহার করলাম।

এরপর একটা নুতুন উপসর্গ যোগ হল। এত দিন স্নায়ু, মজ্জা, পেশিতে যন্ত্রণা হচ্ছিল এবার সেই সঙ্গে চামড়ার ওপরে জ্বালা শুরু হল।

শরীরের জ্বালা যন্ত্রণায় এবং মনের দুঃখে মলমের টিউবটা জানলা দিয়ে উঠোনে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক এসে সেটাকে মুখে তুলে নিয়ে বোধহয় বাসা বানাতে চলে গেল।

যথারীতি এরপরে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ডাক্তার ভদ্রলোককে দেখে বেশ শ্রদ্ধা হয়েছিল, তাঁকে বেশ দায়িত্বশীল মনে হয়েছিল। তিনি এক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে পরের দিন ভোরবেলায় খালি পেটে খেয়ে নিতে বললেন।

ভদ্রলোকের বিরাট প্র্যাকটিস, গভীর রাতেও তাঁর চেম্বার গমগম করছে রোগী ও রোগীর আত্মীয়স্বজনে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল, তাঁর দেখা মিলল রাত পৌনে বারোটায়।

ডাক্তারবাবুর শুধু কান দেখে চিকিৎসা। তিনি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে আমার চার পাশে ঘোরাফেরা করে দুটো কান পর্যায়ক্রমে হাত দিয়ে নাড়াচাডা করিয়ে আমার বোগ নির্ণয় করতে লাগলেন।

এর আগে বুঝিনি তিনি কানে হাত দিতেই বুঝতে পারলাম পেশি যন্ত্রণা কানেও সঞ্চারিত হয়েছে, নিরুপায় হয়ে 'উঃ' 'আঃ' করে যেতে লাগলাম।

এর পর ডাক্তারবাবু এক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে বললেন, 'এই ওষুধটা অল্প জল দিয়ে কাল খুব সকালে খালি পেটে খেয়ে নেবেন। আর এরমধ্যে পান-দোক্তা, বিড়ি-সিগারেট, গাঁজা, ভাং, মদ, পেঁয়াজ, রসুন, বোয়াল মাছ, চিংড়ি মাছ—এসব খাবেন না।

আমি ডাক্তারবাবুর নির্দেশ শুনে বললাম, 'ডাক্তারবাবু এখন রাত প্রায় বারোটা বাজে। বাড়ি যেতে যেতে সাড়ে বারোটা—একটা হয়ে যাবে। আর আপনাব ওষুধটা খেতে হবে কাল সকাল সাড়ে পাঁচটা-ছয়টার মধ্যে। আপনি নিষেধ না করলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে, এই গভীর রাতে আপনার ওইসব নিষিদ্ধ ও মহার্ঘ জিনিস আমার পক্ষে সংগ্রহ করা মোটেও সম্ভব হত না।'

ভিজিট ও ওষুধের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে ডাক্তারবাবুকে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছি, অসহ্য হয়ে উঠেছে। আপনার ওষুধে ব্যথা উপশম হবে তো?'

ডাক্তারবাবু বললেন, বেশ চিন্তা করেই বললেন, 'যদি ব্যথা না কমে, চৌদ্দ দিন দেখবেন। তারপর আরেকবার আসবেন।'

চেম্বারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনুভব করলাম যন্ত্রণাটা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এখন শুধু হাত, ঘাড়, পিঠ নয়, কান দুটোও ভয়াবহ টনটন করছে।

এই যন্ত্রণা নিয়ে আরও চৌদ্দ দিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এই গভীর রাতেও ডাক্তারবাবুর চেম্বারের সামনে ফুটপাতে একটা ভিখারি হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল। সেই লোকটার হাত দুটো কোনও অলৌকিক যন্ত্রণায় থরথর

করে কাঁপছিল। তার হাতে পুরিয়াটা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'এই ওষুধটা কাল সকালে খালি পেটে খেয়ে নিয়ো। আর দেখো, আজ রাতে মদ খেয়ো না, চিংড়ি মাছ খেয়ো না।'

পুরিয়াটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞ ভিখারিটি আমার পিছনে পিছনে কিছু দূর এল। তারপর বলল, 'স্যার, আমি আজ সারাদিনই না খেয়ে আছি, সেই সকাল থেকে খালি পেটে রয়েছি, ওষুধ এখনই খেয়ে নিই। এই বলে সামনের একটা টিউবওয়েলের দিকে এগিয়ে গেল।

এরপরে আর বিশদ বর্ণনায় যাচ্ছি না। বাংলা ভাষায় পরশুরামের পর আর নতুন করে 'চিকিৎসা সঙ্কট' লেখার মানে হয় না। তবে জানিয়ে রাখা ভাল যে সেই গল্পের নায়কের মতো ভুলক্রমে কোনও লেডি ডাক্তারের কাছে আমি যাইনি।

এখন আমি এই কাহিনীর শেষ পর্যায়ে আসছি। নানা ঘাটের জল খেয়ে, নানা রকম টোটকা, মুষ্টি যোগ, চাল পড়া ইত্যাদি করার পর আমার অবস্থার একটুও উন্নতি হয়নি। তবে ব্যথা-বেদনা সহ্য করার একটা অভ্যাস জন্মে গেছে, সেই যে একটা প্রাচীন কথা আছে না শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়, কথাটা খুবই সত্যি।

এখন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সিঁড়ি দিয়ে নামি, পা ঘষটে ঘষটে হাঁটি, খুব প্রয়োজন না পড়লে হাত বা শরীর নাড়াচাড়া করি না। তবে ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির এক মুহুরিবাবুর কাছে কান নাচানো শিখেছিলাম, ইচ্ছে করলেই ফটাফট কান নাড়াতে পারতাম, হাতি যেমন কান নাড়ায় সেই রকম আর কী। তা মাঝে মধ্যে কান নাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখি কানে ব্যথা আছে নাকি, সঙ্গে সঙ্গে টের পাই আছে। সাংঘাতিকভাবে আছে।

সব ওষুধ, চিকিৎসা বাদ দিয়ে এখন আমি ব্যায়ামে এসে পৌঁছেছি। গাত্র ব্যথা কমানোর একমাত্র উপায় উপযুক্ত ব্যায়াম। অবশেষে সেটাই জেনেছি।

খোঁজ নিয়ে আরও জেনেছি যে এই কলকাতা শহরে অন্তত শ'খানেক বিশ্বশ্রী, যোগ সম্রাট, আয়রন ম্যান ইত্যাদি আছেন। তাঁদেরই একজনের হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি।

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বাসায় সকাল-বিকেল দু'বেলা শারীরিক যন্ত্রণা যথাসাধ্য উপেক্ষা করে উঠ-বোস করি, ঘুরপাক খাওয়ার চেষ্টা করি।

আমাদের অনেক দিনের পুরনো কাজের মেয়ে বাসনা সদা-সর্বদাই আমাদের নানাবিধ অযাচিত উপদেশ দিয়ে থাকে।

এই রকম প্রবল দেহকষ্টের মধ্যে আমার ব্যায়াম করা দেখে দ্বিতীয় দিনের মাথায় বাসনা বলল, 'তুমি যতই এক্সারসাইজ করো তুমি আর লম্বা হবে না।'

বাসনার এক্সসাইজ মানে এক্সারসাইজ অর্থাৎ ব্যায়াম। তাঁর বক্তব্য হল, আমি যতই ব্যায়াম করি না কেন আমার আর লম্বা হওয়া হবে না।

হায় কপাল!

আমার বয়েস তিনকাল পেরিয়ে এককালে পৌঁছতে চলেছে, এই বয়েসে আমি লম্বা হতে চেষ্টা করব কেন?'

কিন্তু বাসনাকে এসব কথা বুঝিয়ে লাভ নেই। সে আমাকে মহাদেবপুরে কম্বল বাবার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যিনি এক ফুঁয়ে আমার এই ব্যথা উড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা আমি যাইনি। সেই থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে আমার ব্যথাটা তেমন গুরুতর নয়।

সে যা হোক বাসনার কথায় কিন্তু আমার মনে একটু খটকা লাগল, একটু অন্যরকম খটকা।

গত চল্লিশ বছর আমি আমার উচ্চতা মাপিনি। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকই নিজের উচ্চতা মাপতে যায় না। মাপার দরকার পড়ে না। একটা বয়েসের পরে মানুষ আর লম্বা হয় না, বরং বেশি বয়সে উচ্চতা একটু কমেই যায় বলে শুনেছি।

অফিসের সার্ভিস বুকে, পাসপোর্টে আমার উচ্চতা লেখা আছে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। এতকাল ধরে সেটাই চলে আসছে। এ নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়?

বাসনার কথার পর একটা স্কেলকাঠি নিয়ে বাড়ির দরজায় দাগ এঁকে মেপে দেখলাম আমার উচ্চতা এখন আর মোটেই পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি নয়, বরং দেখা যাচ্ছে তার থেকে একটু বেশি, পাঁচ সাড়ে চার।

এ ঘটনা বেশ কয়েকদিন আগের। এখনও নিয়মিত উঠ-বোস ইত্যাদি ব্যায়াম করে যাচ্ছি। আজ সকালে নিজেকে আবার মাপলাম, আজ দেখলাম পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি ছাড়িয়ে গেছি।

জানি না আরও লম্বা হওয়া কপালে আছে কি না। এরকম বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে ঘটবে এ কথা কখনও ভাবিনি। ভাবা যায় না।

আমার এই উন্নতির কথা আমার স্ত্রীকে, আমার ভাইকে বললাম। তারা বিশ্বাস করল না। বলল, 'চোখে দেখে আমরা কোনও তারতম্য বুঝছি না।' আমি বললাম, 'স্কেলকাঠি দিয়ে মাপো।' তারা রাজি হল না, অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

অবশেষে বাসনাকে ধরলাম, 'তুমি না বলেছিলে, আমি আর লম্বা হব না। এদিকে দ্যাখো আমি এক ইঞ্চি বেড়ে গেছি।'

এর উত্তরে বাসনা যা বলল তা অতি চমৎকার। সে বলল, 'আমি জানতাম।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'মানে? তুমি না বলেছিলে আমি আর লম্বা হব না।'

বাসনা বলল, 'তারপরে যে কম্বলবাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কম্বলবাবার কাছে কেন? আমি না তোমাকে যেতে মানা করেছিলাম।'

বাসনা বলল, 'আমি গিয়েছিলাম আমার ছেলের জন্যে। ছেলেটা মাথায় বাড়ছে না। গতবছর কম্বলবাবা একটা ফুঁ দিয়ে দিয়েছিলেন, এক ধাক্কায় আড়াই ইঞ্চি বেড়েছে এক বছরে।'

'সে তো কম্বলবাবার ফুঁয়ে তোমার ছেলে বেড়েছে, আমি লম্বা হলাম কী করে?' আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বাসনা বলল, 'কম্বলবাবাকে তোমার ব্যথার কথা বলাতে কম্বলবাবা মন্ত্র পড়ে তোমাকেও এক ইঞ্চি লম্বা করে দিল।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কম্বলবাবা আমাকে লম্বা করতে গেল কেন?'

'লম্বা হলে তোমার হাড়ের জট খুলে যাবে, ব্যথা দূর হয়ে যাবে।' একটু থেমে বাসনা বলল, 'লম্বা হয়ে গেছ, এবার ব্যথাও চলে যাবে। ব্যথা চলে গেলে একটা কম্বল কিনে দিয়ো কম্বলবাবাকে দিয়ে আসব।'

সত্যি কথা স্বীকার করছি আমার ব্যথা কয়েকদিনের মধ্যেই দূর হয়েছে। এখন ভালই নড়া-চলা করতে পারি। কাল একটা কম্বল কিনব, বাসনার সঙ্গে গিয়ে কম্বলবাবাকে দিয়ে প্রণাম করে আসব।

বেগুন, মোচা এবং কাফকা

আগে বইয়ের, মানে বিলিতি বইয়ের দাম ছিল ভদ্রমত। শুধু দামে কম ছিল তা নয়, দামটা ছিল মার্কিন দেশে প্রকাশিত হলে দেড়, দুই, বড়জোর তিন ডলার। খাস ব্রিটেনের বই হলে পাউন্ডে দাম। এক পাউন্ড, দুই পাউন্ড।

তা ছাড়া তখন পাউন্ড, ডলারও এখনকার মতো এত মূল্যবান ছিল না। বেশিদিন আগের কথা নয়, মাত্র পনেরো বছর আগের কথা, সদ্য এম এ পরীক্ষা পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে অনাদি, মাসের প্রথমে প্রায় নিয়মিত দুয়েকটা বই কিনত সে। লাইটহাউসের উল্টো দিকের দোকানগুলোয় একটু ঘুরে ফিরে দাম দর করলে গোটা চল্লিশ টাকায় একটা দু-আড়াই পাউন্ডের বা পাঁচ ডলার দামের বিলিতি পেপারব্যাক বা চটি হার্ড কভার কেনা যেত।

এখন আর দু-আড়াই পাউন্ড বা পাঁচ ডলার দামে এরকম বই পাওয়া যায় না। দশ পাউন্ড বা পনেরো ডলারের কাছাকাছি দাম।

এই দামের ব্যাপারটা বেশ মজার। বড় বড় জুতো কোম্পানির দাম যেরকম হয়, একশ উনআশি টাকা নব্বই পয়সা বা দুশো উনপঞ্চাশ টাকা পঁচানব্বুই পয়সা, একেবারে ওই জাতীয় দাম। নয় পাউন্ড নব্বুই পেন্স বা চৌদ্দ ডলার নব্বুই সেন্ট।

ডলারে, পাউন্ডে টাকার অঙ্কটা কম দেখালেও এখনকার দামে চার-পাঁচশ টাকার ধাক্কা। নিজের পয়সায় এরকম দামের একটা বই কেনা খুবই দুঃসাধ্য। বিশেষ করে অনাদির মতো মাস মাইনের সীমিত আয়ের সংসারী মানুষের পক্ষে। সে যা হোক বই পড়া তো বন্ধ করা যায় না। বই পড়ার নেশা সবচেয়ে মারাত্মক। পড়াশুনো করার নেশাকে যাঁরা প্রশংসা করেন, হয় তাঁরা বেকার বড়লোক অথবা কখনও এই নেশায় না মজে এই নেশার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা মোটেই জানেন না যে বই সংগ্রহ করে, বই বেছে, বইপাড়ায় কী পরিমাণ অর্থনাশ, সময়নাশ হয়।

অবশ্য অর্থনাশের একটা সমাধান বার করেছে অনাদি। আংশিক সমাধান।

এসপ্লানেডের একটা ইংরেজি বইয়ের দোকানে টাকা জমা দিয়ে নতুন বই ভাড়া করে এনে পড়া যায়। তবে খুব সাবধানে পড়তে হয়, সেলোফেন কাগজে মলাট দিয়ে বইয়ের নতুনত্ব বজায় রেখে যত্নে পড়তে হয়। তারপর বই ফেরত দিলে বইয়ের অবস্থা দেখে দোকানদার জমা টাকা থেকে কিছু টাকা ভাড়া হিসেবে কেটে রেখে বাকি টাকা ফেরত দেয়।

এভাবেই গত সপ্তাহে অনাদি টাটকা, আনকোরা 'কাফকার গল্প সংগ্রহ' ভাড়া করে এনেছে। বইটির নতুন দাম চারশ টাকা, ভাড়া পড়বে চল্লিশ টাকা। তা লাগুক।

কাফকার এই সঙ্কলনের অধিকাংশই অবশ্য অনাদির আগে বহুবার পড়া। সে কাফকার একজন অন্ধ ভক্ত। কাফকার কিছু কিছু বই তার নিজেরও আছে।

কিন্তু বর্তমান সঙ্কলনটি অতুলনীয়। এর মধ্যে ইতিপূর্বে অগ্রন্থিত, এমনকী অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্পাংশ রয়েছে।

কাফকার রচনায় যে কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে সেই অনিবার্য ভবিতব্যের ছায়া এবং রহস্যময়তা রয়েছে যা অনাদিকে এক সময়ে আবিষ্ট করে রাখত। এখনও আবিষ্ট করে।

আজ শনিবার। সকালবেলা বাজার সেরে এসে রান্নাঘরের মেঝেতে বাজারের থলে নামিয়ে রেখে কাফকার বইটা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে অনাদি।

মধ্য শীতের হালকা মধুর রোদ বারান্দায় ছড়িয়ে আছে। সেই রোদে গা এলিয়ে একটা পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে গল্পসংগ্রহের পাতা ওলটাচ্ছে অনাদি। হাতের কাছেই আজ সকালের খবরের কাগজ পড়ে রয়েছে। এখনও সে সেটা হাতে ছোঁয়নি। এমনকী পত্রিকার শনিবাসরে গদাধর রায়ের যে অখাদ্য ধারাবাহিক লেখাটায় সে রুটিন করে চোখ বুলিয়ে নেয়, তাতেও দৃষ্টিপাত করেনি।

সে এখন লোভীর মতো কাফকার বইটার পাতা ওলটাচ্ছে, এখানে ওখানে চোখ বুলোচ্ছে তবে মোটেই পড়ছে না, সেই সুকুমার রায়ের ছড়ার মতো, 'ঠোঙা ভর্তি বাদামভাজা, ভাঙছে কিন্তু খাচ্ছে না।' আসলে অনাদি এখন বইটা পড়বে না। সামনের সপ্তাহে সে বউ, মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাবে পণ্ডিচেরিতে। সেখানে হোটেলের বারান্দায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে তারিয়ে তারিয়ে বইটা পড়বে। নতুন গল্পাংশগুলি যা রয়েছে তা তো পড়বেই, পুরনো গল্পগুলোও আবার পড়বে। কাফকার গল্প কখনও পুরনো হয় না অনাদির কাছে, কাফকার রহস্যময় জটিল জগৎ তার কাছে সব সময়েই এক গোলোকধাঁধা, যার অনুপম নির্মাণশৈলী, শব্দবন্ধন তাকে আকর্ষণ করে, চেনা ঘটনা, চেনা মানুষ আবার নতুন করে চেনায়।

লোভাতুর দৃষ্টিতে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে কখনও কখনও অসতর্কভাবেই অনাদির মন আটকিয়ে যাচ্ছিল পূর্বে অপঠিত কোনও রচনাংশে।

অনাদির কাফকাপাঠের আবেশ সহসা ভেঙে গেল একটি আর্ত চিৎকারে। চিৎকারটি এসেছে রান্নাঘর থেকে। অন্য কেউ হলে এই রকম আর্তনাদ শুনলে প্রথমেই ধরে নিত বোধহয় খুন-টুন হয়েছে।

কিন্তু অনাদি পুরনো ভুক্তভোগী, সে ভালই জানে এই আর্তনাদ মধুমিতার, মানে তার স্ত্রীর। সময়ে-অসময়ে এরকম চিৎকার করে ওঠা মধুমিতার অভ্যেস। সামান্য কারণেই সে এমন করে। আগে কদাচিৎ করত। আজকাল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

মধুমিতা অঙ্কের ভাল ছাত্র। একটি ভাল স্কুলের অঙ্কের শিক্ষিকা। আধুনিকা, বুদ্ধিমতী। সকালে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে, ছুটির দিনের সন্ধ্যায় স্বামী-কন্যার সঙ্গে চিনে হোটেলে খেতে ভালবাসে, জীবনানন্দ-সতীনাথ ভাদুড়ির ভক্ত, টিউবলাইট খারাপ হয়ে গেলে নিজে চেয়ারের ওপরে উঠে নতুন টিউব লাগায়।

কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রেই হোক, অথবা স্কুলের সহকর্মিণীদের সাহচর্যেই হোক মধুমিতা ক্রমশ একটি সংস্কারের ডিপো হয়ে পড়েছে।

বিয়ের পর পর ঘটনাটা তেমন বোঝা যায়নি। বাঁ হাতের মধ্যমায় অবশ্য একটা রুপো বাঁধানো পলার আংটি ছিল। অল্পদিন পরে, ফুলশয্যার দু-চারদিনের মধ্যে অনাদি আবিষ্কার করল যে মধুমিতার গলার হারের যে লকেট তার মধ্যে রয়েছে প্রসাদী বেলপাতা, তার ওপরে নীল কাঁচের মধ্যে রয়েছে একটি রঙিন ফটো জটিরামবাবার। শোয়ার আগে

প্রতিদিনই মধুমিতা গলার হার খুলে রাখত। সে ওই জটিরামবাবার প্রতি শ্রদ্ধাবশত।

ধীরে ধীরে অনাদি মধুমিতার কাছে জানতে পারে জটিরামবাবার বয়েস একশ এগার। তাঁর শরীরে জামা-কাপড় কিছু নেই। শুধু ওই জটা আর দাড়ি গোঁফ, এই সব দিয়েই তিনি শরীর ঢেকে রাখেন, শীতাতপ এবং লজ্জা নিবারণ করেন। শুধু মধুমিতাই নয়, তার ইস্কুলের অনেক দিদিমণি, এমনকী সেক্রেটারি, বড়বাবু সবাই জটিরামবাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। এমনকী অভিভাবক-অভিভাবিকারাও অনেকে। যে কোনও বিপদে পড়লে দম বন্ধ করে একশো এগারবার জটিবাবা, জটিবাবা মনে মনে ফটাফট জপ করলে সে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যাবে।

জটিরামবাবার যত বয়েস ততবার নামজপ করতে হয়। সামনের বছর একশো বারো বার। তারপর একশো তেরোবার। এইভাবে ক্রমশ জটিরামবাবার বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে জপসংখ্যা বেড়ে যাবে। দম বন্ধ করে যারা এতবার জটিবাবা জটিবাবা করতে পারবে না তাদের জন্যে সহজ সমাধান আছে, জপসংখ্যার সম পরিমাণ টাকা জটিরামবাবার আশ্রমে দিয়ে এলেই সেখানে বিপদমোচন যজ্ঞ অবিলম্বে করে ভক্তকে উদ্ধার করা হয়।

তবে জটিরামবাবার চেয়ে মধুমিতার অনেক বেশি সর্বনাশ করেছেন মধুমিতার পিসি সর্বজয়া।

গত বছর অনাদিকে অফিসের কাজে মাস ছয়েক দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল। তখন খালি বাড়িতে এসে মধুমিতার কাছে বিধবা সর্বজয়া থাকেন। তিনি মধুমিতার মনের কুসংস্কারের ঝোপঝাড়ে বেশ কয়েকটি বিষধর সাপ ছেড়ে দিয়েছেন।

হাঁচি-কাশি, মঘা-অশ্লেষা-ত্র্যহস্পর্শ থেকে শেয়াল বাঁ হাতি, ডান চোখ নাচা যা কিছু বিধি নিষেধ, ভয়ভীতি সম্ভব সর্বজয়া তার এক এনসাইক্লোপিডিয়া। তিনি শুধু এ সমস্ত জানেন তা নয়, রীতিমত মানেন এবং ভাইঝিকেও রপ্ত করে দিয়ে গেছেন। সর্বজয়ার ছেড়ে যাওয়া বিষধর সাপগুলি আজকাল সময় পেলেই মধুমিতাকে দংশন করে এবং মধুমিতা আর্তনাদ করে ওঠে।

ক্রমশ মধুমিতার এই আর্তনাদের ব্যাপারটা বেশ নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই তো গত রবিবার দুপুরে বাথরুম থেকে স্নান করে বেরিয়ে বারান্দায় রোদ্দুরে ভেজা হাওয়াই চটি জোড়া উল্টিয়ে শুকোতে দিয়েছিল অনাদি। ব্যাপারটা যে কতখানি অমঙ্গলজনক সে বিষয়ে অনাদির কোনও ধারণা ছিল না। প্রত্যেক রবিবারই এ কাজটা সে করে থাকে, ঠিক এ সময়টায় মধুমিতার বারান্দায় যাওয়ার দরকার পড়ে না। তাই তার চোখে পড়েনি এর আগে। কিন্তু সেদিন একটা খারাপ দিন ছিল। দু'দিন পরে পৌষমাস পড়ে যাচ্ছে, তার আগে ফুলঝাড়ু কিনতে হবে তাই ওই রবিবার বারবার সব কাজ ফেলে মধুমিতা বারান্দায় যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কোনও ফুলঝাড়ুওয়ালা যায় কি না দেখার জন্য। সেই সময়ে একবার বারান্দায় গিয়ে দেখে ওলটানো চটি, সঙ্গে সঙ্গে মধুমিতার আর্তনাদ, সর্পদংশনের আর্তনাদ।

আগে পাড়ার লোকেরা এ রকম আর্তনাদ শুনলে রুদ্ধশ্বাস ছুটে আসত। অনেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে অনাদির দিকে তাকাত। কখনও কলিক পেন, কখনও লামবাগোর টান এইসব বলে অনাদি মধুমিতার আর্তনাদের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু সবাই যে যার বোঝার বুঝে গেছে, এখন আর কেউ ছুটে আসে না।

তবু বিবাহিতা স্ত্রী বলে কথা। অনাদিকে একবার যেতেই হয়। আজও কাফকার জগৎ থেকে নিজেকে আপাতত বিচ্ছিন্ন করে অনাদি দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে রান্নাঘরের মেঝেতে বাজারের ব্যাগ নামিয়ে এসেছিল, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনও অনাচার ধরা পড়েছে।

সত্যিই তাই।

সন্ত্রস্ত পদে রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছে অনাদি দেখল মধুমিতা কপালে করাঘাত করছে মেঝেতে বসে। ব্যাগের তরকারি আলু, বেগুন, বরবটি, শিম কড়াইশুঁটি গড়াগড়ি যাচ্ছে সর্বোপরি অনেক কষ্টে, অনেক বেছে কিনে আনা একটা বড় মর্তমান কলার মোচা। একটু পরে অনেক চেষ্টা করে অনাদি মধুমিতার কাছ থেকে যা উদ্ধার করতে পারল তার মানে শনিবারে, মঙ্গলবারে কেউ মারা গেলে তার শবদেহের সঙ্গে মোচা দিতে হয়। সুতরাং শনিবারে মোচা নিয়ে আসার পরিণাম মর্মান্তিক। মাসখানেক আগে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল।

হালকা নীল রঙের এক নম্বর ফুটবলের মতো সাইজের গোল গোল বেগুন অনাদির এক বন্ধু তাদের দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল অফিসে, পুরো এক থলে। তার থেকে দুটো তাকে দিয়ে বলেছিল, 'ভেজে কিংবা পুড়িয়ে খাবি।'

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে অনাদি মধুমিতাকে বলেছিল, 'একটা বেগুন ভাজবে, অন্যটা পোড়াবে।'

সেই কথা শুনে মধুমিতা কপাল চাপড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, সেদিন তার জন্মবার, সোমবার। জন্মবারে বেগুন পোড়ানো যায় না, পোড়ানোর পরিণতি ভয়াবহ হয়।

ঠিক কোন বারে কার জন্ম সে সব অনাদি মনে রাখতে পারে না। ফলে এ বাড়িতে এখন অনেক দিন বেগুনপোড়া খাওয়া হয়নি।

আজ মোচার ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। তবু সেদিন বেগুন দুটোর যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আজ মোচার ব্যবস্থা তাই নিলে আপাতত আশুমৃত্যুর অমঙ্গল এড়ানো যায়।

অনাদিদের বাড়ির পিছনে একটি বিশাল নর্দমা-সঙ্গম আছে। দু-পাড়ার দুটি বড় নর্দমা এসে এখানে মিলিত হয়েছে। নর্দমার গন্ধে পিছনের দিকের জানলা খোলা যায় না, ছাদে ওঠা যায় না।

কিন্তু এই সব বিপদের দিনে বাড়ির ছাদটা খুব উপকারে লাগে। আগেরবার বেগুন দুটির নর্দমাপ্রাপ্তি হয়েছিল। আজ রান্নাঘরের মেজে থেকে মোচাটা তুলে নিয়ে অনাদি সিঁড়ির দরজার শিকল খুলে ছাদে উঠে গেল।

এতক্ষণ অনাদির বাঁ হাতে কাফকার বইটা ধরা ছিল। মধুমিতা ক্রন্দন জড়িত নির্দেশে অপবিত্র মোচাটা নিতে হল বাঁ হাতে, এবার কাফকার বইটা রইল ডানহাতে।

ছাদে উঠে কার্নিশের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত অনাদি বাঁহাতের মোচাটা ছুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ ডানহাতের কাফকার বইটি ছুঁড়ে দিল নর্দমার গভীরে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুলটা টের পেল অনাদি। বাঁ হাতে আস্ত মর্তমান মোচাটা ধরা রয়েছে। ডান হাত শূন্য। নীচে নর্দমার কাদার গভীরে কয়েকটা বুদবুদ তুলে কাফকা ডুবে গেল।

হৃদয় ঘটিত

রাত দুটো নাগাদ সোমনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তাঁর হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। সাড়ে দশটায় ভাত খেয়ে এগারোটার সময় শুয়েছিলেন। তখন থেকেই মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছিল, শরীরেও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে তবুও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মিনিট পনেরো হল সোমনাথবাবুর ঘুম ভেঙে গেছে।

ঘটনার শুরু অবশ্য সন্ধ্যাবেলায়। রিটায়ার্ড মানুষ সোমনাথবাবু প্রতিদিন বাড়ির পাশের পার্কটায় গিয়ে পায়চারি করেন, সকালের দিকে একবার, আর সন্ধ্যার দিকে একবার।

আজও সন্ধ্যায় তাই করেছেন। তবে তার সঙ্গে একটু অতিরিক্ত করেছেন। পার্কের বেঞ্চিতে বসে অল্প চিনেবাদাম কিনে খেয়েছেন। অল্প মানে এক টাকার চিনেবাদাম, ছোট একটা ঠোঙা, গোনাগুনতি ছোটবড় পনেরো-বিশটার বেশি বাদাম হবে না। সোমনাথবাবুদের অল্প বয়েসে, সেই পুরনো কালের এক আনায় এর দ্বিগুণ পরিমাণ বাদাম পাওয়া যেত।

তবে ডাক্তারিসম্মতভাবেই বাদামগুলো খেয়েছিলেন সোমনাথবাবু। একালের ডাক্তারেরা বলেন, বেশি আঁশযুক্ত মানে ফাইবারওলা খাবার খেতে, সেই নির্দেশ মান্য করে সোমনাথবাবু বাদামগুলো খোসাসুদ্ধ চিবিয়ে খেয়েছিলেন। খেতে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে খেয়েছিলেন।

হয়তো বাদাম না কিনলেও চলত, সেটাই ভাল হত। এই বয়েসে বাদাম খাওয়ার খুব লোভও নেই সোমনাথবাবুর। কিন্তু আজ বিকেলে এক যুবতী বাদামওয়ালিকে দেখে তিনি অভিভূত হয়ে যান। যদিও বিকেলবেলা জল খাওয়ার পরে আর রাতের খাবারের আগে এর মধ্যে সোমনাথবাবু কিছুই খান না, এই বয়েসে বাদামওয়ালির লাস্য দেখে এবং মধুর অনুরোধ শুনে তিনি ভুল করেছিলেন।

বুকের ব্যথাটা ক্রমশ ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা চাপা ঢেকুর, সঙ্গে গলাজ্বলা। সারা শরীরে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। কয়েকবার বিছানায় উঠে বসলেন সোমনাথবাবু। দু-বার বাথরুমে গেলেন। কেমন একটা বমি-বমি ভাব।

বমি হলে তবু ভাল লাগত। কিন্তু খুব চেষ্টা করেও, গলায় আঙুল দিয়েও বমি করতে পারলেন না সোমনাথ। এদিকে বুকের ব্যথাটা কমছে, বাড়ছে। হার্টঅ্যাটাক হয়েছে সুনিশ্চিত ধরে নিয়ে ফুল স্পিড পাখার তলায় বিছানার ওপরে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে দরদর করে ঘামতে লাগলেন সোমনাথ।

অবশ্য এই প্রথম নয়, সোমনাথের মাঝে মধ্যেই হার্টঅ্যাটাক হয়ে থাকে। এই তো গত বুধবারেই সোমনাথবাবুর একবার হার্টঅ্যাটাক হয়ে গেছে। সকালে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দরজার সামনে তাঁর হার্টঅ্যাটাক হল। কোনও রকমে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ফ্ল্যাটের সামনে উঠে বাজারের থলেটা সিঁড়ির মুখে ফেলে দিলেন, কলিংবেলটা আর টেপার ক্ষমতা নেই। মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে বাঁ হাতে দরজার কড়াটা নাড়বার ক্ষীণ চেষ্টা করতে লাগলেন ডান হাতে বুকটা চেপে ধরে।

এই সময় তিনতলার মিস যমুনা চক্রবর্তী সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, তিনি সোমনাথবাবুকে এই ভয়াবহ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, যমুনাদেবীর অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল, কিন্তু প্রতিবেশীসুলভ কর্তব্যবোধে তিনি সোমনাথবাবুর মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলিংবেলটা টিপে দিলেন।

এ বাড়িতে সহজে দরজা খোলে না, কলিংবেল অনেকক্ষণ ধরে টিপতে হয়। বাড়িতে সদস্য সংখ্যা মাত্র তিনজন। সোমনাথবাবু, তাঁর স্ত্রী মনোরমাদেবী এবং একমাত্র কন্যা সুজাতা। এ ছাড়া একটি ঠিকে কাজের মেয়ে আছে। আগে তার নাম ছিল পাঁচুর মা, এখন তার নাম শতাব্দী।

সুজাতা সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে গেছে মর্নিং কলেজ করতে। শতাব্দী অবশ্য সাড়ে আটটা পর্যন্ত ছিল, বাসন মেজে, ঘর ঝাড় দিয়ে, মুছে সেও সময়মত চলে গেছে।

এখন বাড়ির মধ্যে সোমনাথগৃহিণী শ্রীযুক্তা মনোরমা একা।

কিন্তু মনোরমাদেবীর খালি বাড়িতে একা থাকা উচিত নয়। তিনি হার্টের রোগী। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে তাঁর ক্যান্সার হয়। একবার এইড়স্ হয়েছিল।

অবশ্য, এইডস্ হওয়া ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। কারণ সোমনাথবাবু তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এইডস্ হওয়া ভাল নয়। ব্যাপারটা তাঁদের দুজনের পক্ষেই খুব অসম্মানজনক, তা ছাড়া পাড়ার লোকে ঘুণাক্ষরেও টের পেলে পাড়ায় বসবাস করা সম্ভব হবে না। গায়ের জোরে থেকে গেলেও একঘরে হয়ে থাকতে হবে, শুধু ধোপা-নাপিত নয়, কাজের মেয়ে থেকে অকাজের প্রতিবেশিনী এমনকী খবরের কাগজওলা, ডাকপিয়ন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বাড়ি মুখো হবে না।

সোমনাথবাবু অবশ্য আরও একটু বাড়িয়ে বলছিলেন, 'তবে খুন-ডাকাতি-রাহাজানি করতে পারলে সুবিধে আছে, থানা থেকে একটি সেপাইও ধবতে আসবে না, ফৌজদারি আদালতের কোনও পেয়াদা সমন ধরাতে আসবে না।'

এত কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মহিলা মনোরমাদেবী নন। তিনি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন, 'তা আমার এইডস্ হলে তোমার অসম্মান হবে কেন?' আমরা জানি না মনোরমাদেবীকে ব্যাপারটা কী ভাবে বুঝিয়েছিলেন সোমনাথবাবু, উত্তবযৌবন দাম্পত্য জীবনের সেই নিগূঢ় সমীক্ষায় আমার কোনও কৌতূহল নেই।

মনোরমা অবশ্য আরও জানতে চেযেছিলেন, 'আমাব যদি এইডস্ না হয়ে থাকে তবে আমার সর্দি সারে না কেন?'

মোক্ষম প্রশ্ন। এইডসের সারমর্ম কী করে যে মনোরমাদেবী জেনেছিলেন। সোমনাথবাবুও ব্যাপারটা জানেন, এইডস্ কোনও রোগ নয়, রোগের বন্ধু। এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তির কোনও অসুখ হলে সেটা সারে না, সারবে না।

বলা বাহুল্য, এই রচনা এইডস্ বিষয়ক কোনও কথোপকথননির্ভর শিক্ষামূলক মামুলি প্রবন্ধ নয়।

সুতরাং আমাদের ফিরে-যেতে হবে সেই বুধবার সকালে যখন সিঁড়ির ওপরে নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমনাথবাবু বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন।

তিনতলার ফ্ল্যাটের যমুনাদেবী কলিংবেল বাজিয়ে যখন অনেকক্ষণ পরে পায়ের শব্দ

পেলেন, মৃদু হেসে সোমনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার আবার হার্টঅ্যাটাক হল?'

এই শোচনীয় মুহূর্তে ভদ্রমহিলার এ রকম পরিহাস, কিন্তু যমুনাদেবীকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি রীতিমত ভুক্তভোগিনী।

গত ছয় মাসে অন্তত তিন চারবার মধ্য বা শেষরাতে, বাংলা বন্ধের দুপুরে যমুনাদেবীকে অন্যান্য প্রতিবেশীর সঙ্গে ছুটোছুটি করতে হয়েছে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত সোমনাথবাবুকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

গত বুধবারে অবশ্য যমুনা চক্রবর্তী বেশ সহজেই অব্যাহতি পেয়েছিলেন কিংবা বলা যায় অফিসের তাড়াতাড়ির জন্য পালিয়ে বেঁচেছিলেন। মনোরমা দরজা খোলা মাত্র তাঁর হাতে স্বামীকে গছিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন যমুনা।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে যমুনা সোমনাথের খোঁজ করেছিলেন, অফিসে নানা কাজের মধ্যে সারাদিনই মনটা খুঁতখুঁত করেছিল, কী জানি ভদ্রলোকের যদি সত্যিই হার্টঅ্যাটাক হয়ে থাকে।

বিকেলে খোঁজ নিযে দেখলেন তাঁর আশঙ্কা অমূলক। পাড়ার মোড়ে ছেলেরা ম্যারাপ বেঁধে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা করছে। সেখানে সোমনাথবাবু গেছেন আবৃত্তির বিচারক হয়ে।

আজ রাত দুটোয় বিছানার ওপর বুকে হাত দিয়ে বসে ঘামাতে-ঘামাতে গত বুধবারের অবস্থাটা মনে করছিলেন সোমনাথ। কিন্তু আজকেরটা সেদিনের মতো মিথ্যে অ্যাটাক নয়। বুকের ব্যথা, ঘাম, দমবন্ধভাব—কিছুদিন আগে একটা মেটিরিয়া মেডিকা কিনেছিলেন, সেই বইয়ের হার্টঅ্যাটাকের বর্ণনার সঙ্গে নির্ঘাত মিলে যাচ্ছে। মেটিরিয়া মেডিকাটি সহজ বাংলায় একটি অসুখ ও ওষুধ নির্ণয়ের বই, কয়েকমাস আগে সেটা কেনার পর থেকে সোমনাথবাবু আগাগোড়া পড়ে পড়ে গুলে খেয়েছেন।

অদূরেই অন্য একটা খাটে মনোরমা শুয়ে আছেন। সোমনাথবাবুব এই অবস্থায় যা কিছু করণীয় সবই মনোরমাকেই করতে হবে। কিন্তু সোমনাথ মনোরমাকে ডাকার সাহস পাচ্ছেন না।

গতকাল সকাল থেকে মনোরমাদেবীর জিভে ক্যান্সার হয়েছে। এখনও ডাক্তার দেখানো হয়নি তবে মনোরমাদেবী নিশ্চিত যে তাঁর ক্যান্সারই হয়েছে। সোমনাথ একবার বলার চেষ্টা কবেছিলেন যে মনোরমার মাড়ির যে দাঁতটা কিছুদিন আগে ভেঙে গেছে, সেই ভাঙা দাঁতের ঘষাতেই জিভটা ছড়ে ছড়ে কেটে গিয়েছে। সোমনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভাঙা দাঁতটা তুলে ফেললে এবং জিভে একটা লোশন লাগালেই এ যাত্রা কর্কট বোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এ তবুও ভাল বলা যায়। গতবছর পুজোর সময় মনোরমার যখন ব্রেনে ক্যান্সার হয়েছিল তখন সোমনাথ নিজেও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। রীতিমত পয়সা খরচ হয়েছিল, ব্রেন স্ক্যান থেকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল, তবে এরই মধ্যে এইডসে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় মনোরমাদেবীর ব্রেন ক্যান্সারটা চাপা পড়ে যায়।

আজ রাতে কিন্তু সোমনাথবাবু ভরসা পাচ্ছেন না মনোরমাকে তাঁর গুরুতর শারীরিক অবস্থার কথা জানাতে। মনোরমাদেবী পাশের খাটে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছেন, আহা

ক্যান্সারের রোগী, তাঁর আর কতটুকুই বা ক্ষমতা।

কিন্তু এদিকে যে সোমনাথবাবুর বুকের ব্যথা আবার অসহ্য হয়ে উঠেছে। অবশেষে আজ রাতে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যেতে বসেছে তাঁর।

এখন একমাত্র সুজাতা ভরসা। সে যদি ডাক্তারবাবুকে ফোন করে, পাড়া-প্রতিবেশীকে খবর দেয় হয়তো সুচিকিৎসা হলে প্রাণটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

কোনও রকমে বিছানা আঁকড়িয়ে ধরে মেজেতে নামলেন সোমনাথবাবু। পাশের ঘরেই সুজাতা থাকে। দেওয়াল ধরে ধরে সুজাতার ঘরের কাছে পৌঁছালেন তিনি।

সুজাতার ঘরে আলো জ্বলছে। বোধহয় পরীক্ষা সামনে তাই রাত জেগে পড়াশুনা করছে মেয়েটা। দরজাটা আলগা করে ভেজানো। দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবু শুনতে পেলেন ঘরের মধ্যে কী যেন সব কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বনাশ, এত রাতে আবার মেয়েটার ঘরে কে?

দরজায় ঠুকঠুক করে আওয়াজ করলেন। সুজাতা বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজা খুলল। ঘরের মধ্যে অন্য লোকজন কেউ নেই। তবে একটা টিভি চলছে। টিভিতে চ্যানেল ভি নাকি চ্যানেল পাঁচ কী একটা চলছে, জামাকাপড় প্রায় খুলে ফেলে ধুন্ধুমার নাচ, গান, বিলিতি বাজনা শব্দটা খুব কমিয়ে দিয়ে সুজাতা তাই দেখছিল।

বাবাকে দেখে চিন্তান্বিত হয়ে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আবার কী হল?'

কোনও রকম কথা বলতে পারলেন না সোমনাথ। বুকে হাত দিয়ে মেয়ের পড়ার টেবিলটায় ভর দিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন সোমনাথবাবু।

বিচক্ষণা মেয়ে, অবস্থা বুঝতে তার বিশেষ অসুবিধে হল না। অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়, সুজাতার এ বিষয়ে যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

সুজাতা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হার্টঅ্যাটাক?'

সোমনাথবাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

এবার সুজাতাকে বেশ চিন্তিত দেখাল, সে বলল, 'কিন্তু মা'রও তো হার্টঅ্যাটাক হয়েছে।'

খবরটা শুনে এই রকম শারীরিক অবস্থার মধ্যেও সোমনাথ খুব বিব্রত বোধ করলেন। একটু কষ্ট করে। দম নিয়ে ধরে ধরে বললেন, 'সে কী? কখন?'

সুজাতা এগিয়ে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল, 'রাত একটা নাগাদ হবে।' তারপর সোমনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি ছোট মামাকে ফোন করে দিয়েছি।'

সুজাতার ছোট মামা মানে সোমনাথের ছোট শ্যালক পরেশ কাছেই থাকেন মাইল দেড়েকের মধ্যে। তা ছাড়া পরেশবাবুর একটা সুবিধে এই যে তাঁর নিজের একটি গাড়ি আছে এবং হাসপাতাল-নার্সিংহোমে ভর্তি করানোয় তিনি একজন এক্সপার্ট। সুদক্ষ ব্যক্তি ছাড়া চিকিৎসালয়ে ভর্তি করানো আজকাল যার তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরেশবাবু তাঁর দিদি-জামাইবাবুর ব্যাপারটা সম্যক জানেন। কখন কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে বিষয়ে পরেশবাবুর বাস্তববোধ আছে।

ভাগিনেয়ীর ফোন পেয়ে পরেশবাবু খুব যে একটা চিন্তিত বোধ করেছেন তা নয়। কিন্তু এরকম সংবাদ পেয়ে চুপ করে বসে থাকাও যায় না। হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায়।

পরেশবাবু এসে গেলেন। একটা ঝকঝকে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির মাথায় লাল আলো ঘুরপাক খাচ্ছে, তার সামনে পথ দেখিয়ে পরেশবাবুর গাড়ি। জামাইবাবুদের ফ্ল্যাটবাড়ির উঠোনটায় নিজের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স রেখে পরেশবাবু দোতলায় উঠে এসেছেন।

ইতিমধ্যে সুজাতা গিয়ে তিনতলায় যমুনাদেবীকে বাবার খবর দিয়েছে। যমুনাদেবী বুদ্ধিমতী মহিলা, তিনি আশেপাশের ফ্ল্যাটে জানা-চেনা, মিশুক স্বভাবের যাঁরা আছেন যেটুকু সময় পেয়েছেন তার মধ্যে তাঁদের ফোন করে সোমনাথের অবস্থা জানিয়েছেন।

সুজাতা কিন্তু যমুনাদেবীকে তার মা মনোরমাদেবীর হার্টঅ্যাটাকের কথা বুদ্ধি করেই কিছু বলেনি। এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের হার্টঅ্যাটাকের সংবাদ পেয়ে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হবে এই ভেবে সুজাতা খবরটা চেপে যায়।

সুজাতাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে সিঁড়ির জানালা দিয়ে যমুনাদেবী দেখলেন উঠোনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। অ্যাম্বুলেন্স এসে যাওয়ায় যমুনাদেবী একটু আশ্বস্ত হলেন, যাক তা হলে পুরো ঝামেলাটা তাঁর কাঁধে পড়বে না।

যমুনাদেবীর মুখভাব দেখে সুজাতা নিজে থেকেই বলল, 'মামাকে ফোন করেছিলাম। মামাই বোধহয়, অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে এসেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যমুনাদেবী দেখলেন সুজাতার মামা পরেশবাবু সুজাতাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলেন, তাঁর পিছে পিছে স্ট্রেচার নিয়ে সাদা পোশাক পরা দুই ব্যক্তির সঙ্গে আরও একজন। তাঁর গলায় স্টেথস্কোপ। এরাও ঢুকল।

এদিকে পরেশবাবু যার জন্যে ওই অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন সেই মনোরমাদেবী এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। সুজাতাকে নিজের স্ট্রোকের কথাটা জানিয়েই তিনি কাতরোক্তি করতে করতে মৃত্যু আজ অনিবার্য ভেবে চোখ বুজে শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ওই অবস্থাতেই তিনি একটু পরে ঘুমিয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান।

এখন স্ট্রেচারবাহীরা পরেশবাবুর পিছে পিছে মনোরমা-সোমনাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে মনোরমাকে বিছানায় গভীর নিদ্রায় শায়িত দেখে তিনি অচৈতন্য আছেন ভেবে স্ট্রেচারে তুলতে গেল।

মনোরমার ঘুম ভেঙে গেল। ততক্ষণে অন্যান্য ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা যমুনার ডাকে সাড়া দিয়ে ওই ফ্ল্যাটে এসে গেছে। ঘরের মধ্যে গিজগিজ করছে লোক। হঠাৎ সুখনিদ্রা ভেঙে চোখ মেলে মনোরমা এই ভিড় দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। তারপর সামনে নিজের সহোদর ভাই পরেশকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে রে পরেশ?'

পরেশ তখন বলল, 'তোমার কী হয়েছে সে তুমিই বলতে পারবে।'

শুনে মনোরমা চিন্তায় পড়লেন, একটু দূরে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সুজাতা কী হয়েছে রে?'

সুজাতা বলল, 'এখনকার কথা বলতে পারবে না তবে ঘণ্টা দেড়েক আগে তোমার হার্টঅ্যাটাক হয়েছিল।'

মনোরমাদেবী এই কথা শুনে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। পাশের টেবিলে রাখা একটা প্লাস্টিকের কৌটো খুলে একটা জর্দা পান বের করে মুখে দিয়ে বললেন,

'হার্টঅ্যাটাকটা কেটে গেছে। এখন একটু ক্যালার-ক্যালার লাগছে। মুখে পানটা চিবোচ্ছি, জিবটা কেমন জ্বালা করছে।'

অনতিবিলম্বে স্ট্রেচারসহ স্ট্রেচারবাহীরা সঙ্গে সেই স্টেথস্কোপবাহী ডাক্তার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে নামার আগেই সুজাতা গিয়ে পথ আটকালো, 'আপনারা যাবেন না, পাশের ঘরে রোগী আছেন, আমার বাবার হার্টঅ্যাটাক হয়েছে।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গেল। তবে তারা কিছু বুঝবার আগেই পাশের ঘর মানে সুজাতার ঘর থেকে যমুনাদেবী বেরিয়ে এলেন। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, 'না, সোমনাথবাবুর অ্যাম্বুলেন্স লাগবে না। তিনি ভাল হয়ে গেছেন। বুকে ম্যাসেজ করে তাঁর হার্টঅ্যাটাক সারিয়ে দিয়েছি। তিনি এবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

নানা রকমের কানাঘুষা করতে করতে প্রতিবেশীরা একে একে চলে গেল নিজেদের শেষ রাতের ঘুমটুকু পুষিয়ে নিতে। স্ট্রেচারবাহীরা কটু ভাষায় গালমন্দ করতে করতে লাল আলো জ্বালিয়ে তীব্র সাইরেনের ধ্বনি তুলে গেল।

অবিচ্ছিন্ন

সেই কবেকার ডোডোতাতাই। তারা এখন আর সেই ছয়-সাত বছরে আটকিয়ে নেই, ঢের বড় হয়ে গেছে।

তাতাইবাবু এখন বিদেশবাসী। সেখানে পড়াশুনো শেষ করে এখন নিজেই পড়াচ্ছেন। আর ডোডোবাবু পুরোদস্তুর এঞ্জিনিয়ার, তাঁকেও কাজেকর্মে প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়।

প্রায় আড়াই বছর পরে এবার তাতাইবাবু কলকাতায় এসেছিলেন। সঙ্গে মেমবৌ, বিশাল বড়সড় মেমসাহেব। তাতাইয়ের কাকা বউ দেখে বলেন, এই একটা বউ একাই চারটে বউয়ের সমান, বাড়ি ভরে গেছে।

তাতাইবাবু কিন্তু একদম বদলাননি। প্রথম দিন এসেই দশ-বারোটা কাঁচা জলপাই নুন দিয়ে খেয়ে ফেললেন। জলপাইগুলো বাজার থেকে আনা হয়েছিল চাটনি করার জন্যে। তাতাইবাবুর গোগ্রাসে জলপাই খাওয়া দেখে তাতাইবাবুর মা 'হায়-হায়' করে উঠলেন। তাতাইবাবু বললেন, 'ভয় পেয়ো না। কিছু হবে না।' তাতাইবাবুর মা বললেন, 'চাটনিও হবে না।' এই শুনে তাতাইবাবুর কাকা সাইকেল নিয়ে বেরোলেন আবার জলপাই কিনে আনতে।

তাতাইবাবুর মা খুব চিন্তা করেন, 'বউয়ের সঙ্গে আমি তো ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না।'

তাতাইবাবু বলেন, 'পারবে না কেন?'

'বউয়ের উচ্চারণ তো আমি কিছুই ধরতে পারি না।' তাতাইবাবুর মা কবুল করেন।

'সে ভেবো না।' তাতাইবাবু আশ্বাস দেন, 'আমি ওকে চটপট বাংলা শিখিয়ে দিচ্ছি।'

শুরু হল মেম-বউকে বাংলা শেখান। প্রথমে লেখাপড়া নয়, কথাবার্তা বলা। তাতাইবাবুর ইচ্ছে চমকপ্রদ কিছু বাক্য শিখিয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দেওয়া।

ইতিমধ্যে কয়েক দিন বাদে তাতাইবাবুর আসার খবর পেয়ে ডোডোবাবু এলেন। ডোডোবাবু ছিলেন কুয়ালালামপুরে, সেখানে ব্রিজ বানাচ্ছেন। কাজের ছুটিতে তিনি তাতাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ডোডোবাবু কুয়ালালামপুরে কী কাজ করছেন শুনে তাতাইবাবু বললেন, 'ওখানে সাঁকো বানাচ্ছেন কেন, আমাদের দেশে কি সাঁকো বেশি হয়ে গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে ডোডোবাবু পালটা প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই-বা বাইরে কী পড়াচ্ছেন, আমাদের দেশে কি ছাত্র কম পড়ে গেছে?'

প্রায় পুরনো দিনের মতো বাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়ে যায় আর কী এমন সময় ডোডোবাবু এসেছেন শুনে বাইরের ঘরে তাতাইবাবুর মেম-বউ এলেন। তাতাইবাবুর কাছে ডোডোবাবুর কথা তিনি অনেক শুনেছেন।

ডোডোবাবু ঝাড়া পৌনে ছয় ফুট লম্বা। ডোডোবাবু দেখলেন, তাতাইবাবুর বউ বোধ হয় তাঁর চেয়েও লম্বা। বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যেতে ডোডোবাবু পকেট থেকে একটা চকোলেটের বার বের করে মেম-বউকে দিলেন।

মেম বউ হাসিমুখে সেটা হাতে নিয়ে ভাঙা বাংলায় বললেন, 'এখন খাওয়া আছে না। এখন লুচি পায়েস খেয়েছি। পেটে ছুঁচো ডন দিচ্ছে।

মেমসাহেবের কথা শুনে ডোডোবাবু অবাক হয়ে তাতাইবাবুর দিকে তাকালেন, তাতাইবাবু বললেন, 'আমি ওকে বাংলা বলা শেখাচ্ছি।'

ডোডোবাবু বললেন, 'কিন্তু এসব কী শেখাচ্ছেন? খিদে লাগলে পেটে ছুঁচোয় ডন দেয়, ভরা পেটে ছুঁচো ডন দিতে যাবে কেন?'

তাতাইবাবু কিছু বলার আগে মেমসাহেব ভুলটা অনুমান করতে পেরে বললেন, 'ওই একই কথা, যা ফিফটি থ্রি তাই ফিফটি টু।'

ডোডোবাবু এবার তাতাইবাবুকে চেপে ধরলেন, 'এসব ওঁকে কী শেখাচ্ছেন।'

তাতাইবাবুদের বাড়ির পুরনো রান্নার মহিলা তাঁকে তাতাইবাবু মাসি বলেন, মেম-বউও মাসি বলছেন। সেই মাসি এর মধ্যে ডোডোবাবু এসেছেন শুনে নালিশ জানিয়ে গেলেন, 'আজ সকালে বউ আমাকে বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি বলেছে।'

ডোডোবাবু বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। তাতাইবাবুর মা'ও বললেন পুরো অবস্থা খুব জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি এই জন্যে তাতাইবাবুকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন।

কিন্তু কী আর করা যাবে মেমসাহেব তখন গড়গড় বলে চলেছেন, রীতিমত প্রশ্নের ভঙ্গিতে, 'রাতে মাছি, দিনে মশা, এই জন্যে কলকাতায় আসা?'

কলকাতা বিষয়ে এ রকম কথা বলায় ডোডোবাবু খুব চটে গেলেন, তিনি সামাজিকতার ধার না ধরে কড়া ভাবে বললেন, 'এলেন কেন?'

মেম-বউ তখন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাতাইবাবুর দিকে তাকাতে তিনি ডোডোবাবুর মন্তব্যটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেম-বউ বললেন, 'পড়ে পাওয়া সাতাশি পয়সা।'

'তার মানে?' ডোডোবাবু অবাক হয়ে তাতাইবাবুর কাছে জানতে চাইলেন। তাতাইবাবু বললেন, 'সাতাশি পয়সা বুঝলেন না, সেই পুরনো চৌদ্দ আনা।'

একটু ভেবে নিতেই বুদ্ধিমান ডোডোবাবু ব্যাপারটা বুঝলেন, বললেন, 'তার মানে

পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা।' এবার এ কথার নিহিতার্থ ধরে ফেলতে তিনি রাগে ফুঁসতে লাগলেন। মেমসাহেবকে বললেন, 'তা হলে ব্যাপারটা হল, আপনার কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে আসা হল পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। আপনি ভাবেন কী?'

তাতাইবাবু মধ্যস্থতা করে বললেন, 'আপনার মেম বউদি বাংলা কিছু বোঝেন না। ওঁকে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।'

ডোডোবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তা হলে এই সব আপনি মুখস্থ করিয়েছেন মেমকে দিয়ে আর উনি কিছুই না বুঝে ঝরঝর করে বলে যাচ্ছেন।'

বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে হলে এতক্ষণে ডোডোবাবু আর তাতাইবাবুর মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যেত।

এ বার অবশ্য তা হল না। ডোডোবাবুর কোথায় একটা কাজ ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, বলে গেলেন দুয়েকদিনের মধ্যেই আসছেন।

বেরনোর সময় সদর দরজা চৌকাঠের ওপরে তাতাইবাবু ডোডোবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মেম-বউ ঠিক মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। তার পর দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দুজনকে বার দুয়েক ভাল করে দেখে কোনওরকম দ্বিধা না করে মেমসাহেব ডোডোবাবুকে বললেন, 'তুমি যেমন বুনো তেঁতুল আর ইনি তেমনই বাঘা ওল', বলে তাতাইবাবুকে দেখালেন।

চিকিৎসা

একটা দশহাজারি বড় গল্পের বায়না পেয়েছিলাম। চমৎকার প্লট ফেঁদে বসেছিলাম, একাধিক চনমনে রমণী, উপযুক্ত লম্পট নায়ক, হাতুড়ে ডাক্তার-কাম-গোয়েন্দা, এমনকী একজন বিনোদন দালাল সমেত বিদেশি কুকুর রীতিমত জমজমাট কাহিনী।

কিন্তু, সত্যি বলছি, একদিন রাত বারোটায় তিন হাজার শব্দের মাথায় ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেমন বেঁকে গেল, তর্জনী চিনচিন করতে লাগল। শুধু তাই নয়, হাতের তালু কনকন করতে লাগল, কবজি টনটন করতে লাগল। অবশ্য ভুল হতে পারে, কাকে কী বলে জানি না, কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, এমনও হতে পারে হাতের তালু চিনচিন করছিল, কবজি কনকন করছিল, তর্জনী টনটন করছিল।

তখন কিন্তু ফ্লো এসে গিয়েছিল, কিন্তু নিতান্ত অপারগ হয়ে আলো নিভিয়ে, খাতা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আঙুল ফুলে কলাগাছ; হাত ফুলে ঢোল। এবং অসহ্য ব্যথা। দরজার ছিটকিনি খুলতে পারছি না। কনুই-কবজি ঘুরিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে পারছি না। মাথার ওপরে হাত তুলে গেঞ্জি খুলতে গিয়ে চোখে জল আসছে। যদি হঠাৎ কোনও কারণে পুলিস, গোয়েন্দা কিংবা দুষ্কৃতী আমাকে পিস্তল দেখিয়ে 'হ্যান্ডস্ আপ' করতে বলে গুলি খেয়ে প্রাণ গেলেও হাত মাথার ওপরে তুলতে পারব না।

বাড়িতে, পাড়ায়, অফিসে সবাই খুব সহানুভূতিপ্রবণ এবং উপদেশপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আমাদের কাজের মেয়ে বাসনা বলল, 'একটা ঠিকমত সূচ নিলেই সেরে যাবে।'

সূচ মানে ইঞ্জেকশন, তবে ঠিকমত ইঞ্জেকশনটা যে কী সেটা সে জানে না। আমার স্ত্রী মিনতি দেবী বললেন, 'মোটা কমাতে হবে। ফ্যাট বেড়ে গিয়ে এরকম হয়েছে।' আমার জন্যে এই একটি সর্বরোগহর দাওয়াই তাঁর আছে। কিন্তু রাতারাতি রোগা হব কী ভাবে? ততদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করা অসম্ভব।

আমার ছোটভাই বিজন একটু মমতাপ্রবণ। সে আমার দুর্দশা দেখে বলল, 'রসুন, কালোজিরে দিয়ে সরষের তেল গরম করে একটু মালিশ করে দিলে আরাম হবে।' স্বভাবত অলস বিজন সেদিন সকালে অফিস যাওয়ার আগে চেতলায় গিয়ে কাঠের ঘানির সরষের খাঁটি তেল কিনে আনল। তার পর সেটা রসুন আর কালোজিরে দিয়ে গরম করে আমার হাত মালিশ করতে এল।

ভ্রাতৃযুদ্ধের অসামান্য বর্ণনা রামায়ণ-মহাভারতে আছে। সুন্দ-উপসুন্দ, বালি-সুগ্রীব, পাণ্ডব-কৌরবের কাহিনী সর্বজনবিদিত। সুতরাং নির্ভয়ে বলতে পারি, সেদিন বিজন তেল মালিশ শুরু করার স্পিলট সেকেন্ড অর্থাৎ ভগ্নাতিভগ্ন অনুপলের মধ্যে, গরম তেল, হাতের মালিশ ইত্যাদির আধিভৌতিক স্পর্শে আমার সংবেদনশীল দেহ, এক্ষেত্রে ডান হাত, পাগল হয়ে গেল।

আমি এক ঝাপটা দিয়ে গরম তেলের বাটি ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। তার পর বিজনকে বাঁ হাতে একটা চড় মারলাম। ছোটভাইকে চড় মারার কোনও দোষ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু দেরি হয়ে গেল। বিজনকে শেষবার চড় মেরেছিলাম উনিশশো পঞ্চাশ সালে। অঙ্ক আর ইংরেজিতে ফেল করেছিল বলে।

বিজনও সঙ্গে সঙ্গে চুয়াল্লিশ বছর আগের অত্যাচারের শোধ নিয়েছিল, ভাল ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের মতো সেই ঝাপটায় পড়ে যাওয়া গরম তেলের বাটি শূন্য থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পায়ের পাতা থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শরীরের যে সমস্ত আঢাকা জায়গা সেখানে বৃষ্টি বিন্দুর মতো ছিটোতে-ছিটোতে জ্বালাতে জ্বালাতে সেই গরম তেলের বাটি এসে পড়ল আমার খাটের পিছনে। আমার যন্ত্রণার সঙ্গে জ্বালা যুক্ত হল।

ভালমানুষ বিজন একটু পরে আত্মস্থ হয়ে আমার সেই উষ্ণ তৈল চর্চিত মুখাবয়বে শ্বেতচন্দন ঘষে এনে প্রলেপ লাগিয়ে অফিস গেল।

এই শত্রুপুরী, বসবাসের অযোগ্য এই বিবেচনায় আমিও অফিসে গেলাম গেঞ্জিহীন হাফহাতা বুকখোলা জামা পরে ফুল্লহস্ত এবং চন্দনচর্চিত বদন নিয়ে।

একই সঙ্গে মুখ পোড়া এবং হাত ফোলা লোক কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং আমার কাজের জায়গার লোকেরা আমাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, অনেকেই অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব থেকে। বোধহয় তাদের কারও কারও ধারণা হয়েছিল, আমি কামড়েটামড়ে দিতে পারি।

দুঃখের বিষয় আমার এখনকার অফিসের লোকেরা আমার সম্পর্কে সম্যক জানেন না। এখানে আমি মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছি এবং সেই জন্যেই এই রকম দৈহিক অবস্থাতেও, নিতান্ত নতুন কাজ বলে অফিসে এসেছি।

আমার পাশের ঘরেই বসেন রসরাজবাবু। মাত্র এই কয়েকদিনে ভদ্রলোককে বুঝে উঠতে পারিনি। তিনি আমার অবস্থা দেখে এবং সব শুনে পরামর্শ দিলেন আদা-চা খেতে।

এই জায়গায় আমি এসেছি মাত্র দিন দশেক আগে। মনে পড়ল গত দশদিনে একদিন আমার পেটের গোলমাল, আরেকদিন সর্দিজ্বরের মতো হয়েছিল। আসলে শরীরটা কিছুকাল জুতসই যাচ্ছে না। সে যা হোক, পেট ব্যথায় এবং জ্বরে, আগের দুবারই তিনি আদা-চা খেতে বলেছিলেন।

একটু পরেই এলেন আমাদের অফিসের কেয়ারটেকার। যৌবনে তিনি মল্লবীর ছিলেন। তাঁদের বীরের বংশ। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর জ্যাঠা নোয়াখালিশ্রী হয়েছিলেন; তাঁর মাসতুতো বোন 'বেদান গার্লস স্কুলের' বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বছর কলসমাথায় দৌড়ে প্রথম হয়েছে। তিনি নিজে সকালবেলায় এখনও খালি পেটে ছয় গেলাস জল খেতে পারেন।

এই রকম শক্তিমান লোকের নাম কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নুলোবাবু। নুলোবাবু আমার ঘরে ঢুকে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ ডান-বাঁ দুই হাত ফুল স্পিড পাখার মতো ঘোরাতে লাগলেন। তাঁর যে হাত ফোলা-ফাঁপা নয় বোধ হয় সেটাই প্রমাণ করতে চাইলেন। একটু পরে হস্ত ঘূর্ণন থেকে বিরত হয়ে তিনি জানালেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে এরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা করে যেতে পারেন।

শুনে চমৎকৃত হলাম এবং এবার তিনি বললেন, 'আপনি যদি আপনার দুটো হাত এভাবে ঘোরান, অন্তত কয়েক মিনিট তা হলে ফোলা-ব্যথা কিছুই থাকবে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো যন্ত্রণায় হাত তুলতেই পারছি না। ঘোরাব কী করে? তিনি বললেন, 'ডান হাতে যখন যন্ত্রণা ওই হাতটা আপাতত বাদ থাক। বাঁ হাত ঘোরালেও কাজ হবে। বাঁ হাতের টানে ডান হাতের ব্যথা-ফোলা উপশম হবে।'

অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, আমি বাঁ হাত ঘোরালাম। প্রথমবার পাক দিয়ে হাতটা যেই মাথার ওপরে শূন্যে তুলেছি নামানোর মুখে হঠাৎ বাঁ কাঁধে একটা খট্ করে শব্দ হল। বাঁ কাঁধ থেকে একটা তুমুল যন্ত্রণা ঘাড় বেয়ে ব্রহ্মতালুর দিকে উঠতে গিয়ে আমার নিরেট ঘিলুতে বাধা পেয়ে বিপুল বেগে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল! মাথা ঝিমঝিম করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

দণ্ডায়মান হয়ে হস্তঘূর্ণন ক্রিযায় রত হয়েছিলুম। ভাগ্য ভাল নুলোবাবু খুব কাছেই সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিলেন, চোখে অন্ধকার দেখে যখন শিকড়বিচ্ছিন্ন কলাগাছের মতো পতনোন্মুখ হয়েছিলাম তিনিই তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর আকর্ষণে আমাকে রক্ষা করলেন।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

সেই যে রহস্যময় 'খট' শব্দ হয়েছিল আমার বাঁ কাঁধে। তার পরবর্তী ব্যথা-যন্ত্রণা পূর্ণতা পেল কিছুক্ষণের মধ্যে। ডান হাতের মতোই বাঁ হাত ফুলে উঠল এবং সমপরিমাণ যন্ত্রণা হতে লাগল।

অফিসে আর বসে থাকা সম্ভব হল না। কোনও রকমে বেরিয়ে পড়লাম।

খবরের কাগজে এক বেদনাহর চিকিৎসা ব্যবস্থার সচিত্র বিজ্ঞাপন পড়েছিলাম। জায়গাটা কাছেই, কোনও চেষ্টা না করেই খুঁজে পেলাম।

পাশের একটা গলির মধ্যে খঞ্জ ও পঙ্গু ব্যক্তিদের যাতায়াত আগে লক্ষ্য করেছি। আজ অনুমানে সেই গলির মধ্যে ঢুকে দেখলাম, ঠিকই এসেছি।

চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রবেশ করে, আশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ঘণ্টা দেড়েক আমারই

মতো অষ্টাবক্র যন্ত্রণাকাতর কয়েকজন রোগী-রোগিনীর সঙ্গে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার পর অবশেষে আমার ডাক পড়ল, আমার পালা এল।

চেম্বারের মধ্যে ফিকে নীল আলো জ্বলছে। একটা ঘোরানো চেয়ারে সাদা অ্যাপ্রন পড়া মধ্যবয়সী, স্থূলোদর চিকিৎসক মহোদয় বসে রয়েছেন। তাঁর সামনে একটি সোফা, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে কোচ বা কৌচ। ডাক্তারবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে ওই সোফায় শায়িত হতে বললেন। জুতো, কোট, টাই খুলে আমি শুয়ে পড়লাম।

এবার ডাক্তারবাবু একটা ঘণ্টা বাজালেন। অন্তরাল থেকে নার্সের পোশাক পরা এক শক্তসমর্থ মহিলা একটা রবারের হাতুড়ি হাতে বেরিয়ে এলেন এবং তারপর পায়ের গোড়ালি থেকে ঘাড় পর্যন্ত নির্মমভাবে সেই মহিলা আমাকে সেই রবারের হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে লাগলেন। অবশেষে একটি মোক্ষম আঘাত মাথার চাঁদিতে করলেন। আমার মাথাটা একটু ফাঁকা, ঢিলে তবলার মতো একটা প্রায় অব্যক্ত চাপা কান্নার মতো শব্দ বেরলো, আমি আবার সংজ্ঞাহীন হলাম।

শারীরিক যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না।

কিন্তু সত্যিই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। সেই বেদনাদায়ক কাহিনী এই হালকা হাসির রচনায় টেনে আনা অনুচিত হবে। সরাসরি পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথা বলি।

অফিস যাওয়া স্থগিত রইল। বাসায় বসে পরিচিত যন্ত্রণাহর মলম লাগাতে লাগলাম দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন দেখে। কয়েকদিন ছয় ঘণ্টা অন্তর দুটো করে দারুণ ট্যাবলেট খেতে লাগলাম। এ ওষুধগুলো আসলে খাঁটি বিষ। চোখ লাল, কান ভোঁ-ভোঁ, মাথা ঝিমঝিম ইত্যাদি নতুন উপসর্গ দেখা দিল।

অতঃপর গরম জলে স্নান, হটওয়াটার ব্যাগ এই সবের আশ্রয় নিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা হল না। ব্যথা-যন্ত্রণা প্রায় একই রকম রয়ে গেল। তবে কোথাও বাঁধা-ধরা ব্যথা নয়। কখনও ডান হাতে তীব্র ব্যথা, কখনও বা বাঁ হাতে, কখনও কাঁধে, কখনও কনুইতে বা বাহুতে, সতত সঞ্চরমাণ, ভ্রাম্যমাণ ব্যথা। যথেষ্ট কষ্ট পেতে লাগলাম।

দরজার ছিটকিনি খুলতে পারি না। গেঞ্জি গায়ে দিতে পারি না। মাথা আঁচড়াতে গেলে কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত চিন্‌চিন্ করে ওঠে। বিছানায় পাশ ফিরতে পারি না।

প্রতিবেশী পরামর্শ দিলেন, খাট ত্যাগ করে, বালিশ-তোষক ছেড়ে সতরঞ্চি পেতে তক্তাপোশের ওপরে শোবেন। তা-ই করলাম।

বহুদর্শী রমেশ মামা আমার ছোট ভাইয়ের মুখে আমার অবস্থার কথা জেনে আমাকে পোস্টকার্ডে জানালেন, 'টক খাইবে না, জর্দাপান খাইবে না, ঠাণ্ডা জল খাইবে না, কোনও রকম নেশাই চলিবে না, ঠাণ্ডা জলে স্নান চলিবে না, যথাসাধ্য সম্ভব গায়ে রৌদ্র লাগাইবে।'

ভাদ্র মাসের তালপাকা রোদে কতক্ষণই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ব্যথা উপশম হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, মধ্যে থেকে আমার মুখটা রোদে পুড়ে হনুমানের মতো কালো হয়ে গেল। চেহারার মধ্যে একটু হনুমানত্ব আমার চিরকালই ছিল, এবার হনুমান হতে বাকি রইল শুধু একটি ছোট লেজ। মনে মনে ধরে নিলাম, এতই যখন হল, সেও হয়তো একদিন প্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু, তবুও যদি মহাবীর হনুমানের মতো সাবলীল

লম্ফঝম্প করতে পারতাম, তা হলে এ নিয়ে আমার মনে খুব একটা দুঃখ থাকত না। সংক্ষেপে বলি, ব্যথা-যন্ত্রণা মোটেই কমল না। যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি, ধরে নিয়েছি যে আগামী জীবন আমাকে এই অসহনীয় ভাবেই কাটাতে হবে, তখন আশার আলো দেখতে পেলাম।

আশার আলো মানে সত্যি আলো। প্রায় টেবিল ল্যাম্পের মতোই দেখতে। সুইচ জ্বাললে লাল কাচের ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত আলোর বিচ্ছুরণ হয়, ফোলা জায়গায় ওই আলো ফেললে বেশ আরাম হয়।

কিন্তু তখন আমার উর্ধ্বাঙ্গে দুই হাতের বিস্তৃত এলাকাসহ কাঁধ ডিঙিয়ে নীচে শিরদাঁড়া বেয়ে এবং ওপবে ঘাড় বেয়ে ফোলা ও বেদনা প্রসারিত হয়েছে। তদুপরি আমার এই বিপুল দেহ। এ রকম একটা-দুটো আলোয় আমার কিছুই হওয়ার নয়, যদি এই আলো-চিকিৎসায় উদ্ধার পেতেই হয়, তা হলে অন্তত পনেরো-বিশটা এ জাতীয় ল্যাম্প একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

ইতিমধ্যে অন্য একটা ব্যাপার হয়েছে। সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভাদ্র মাস শেষ হতেই বাড়ি বদলালেন, কাছাকাছি কোথাও গেলেন। তাঁর একটি মাথামোটা, গোদা পা হুলোবেড়াল ছিল। যাওয়ার দিন দেখলাম, তিনি বেড়ালটাকে ফেলে গেলেন না, গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু বেড়ালের যা স্বভাব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে এল। তারপর চেষ্টা করল আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে। এমনিতে বেড়াল এলেই আমরা দ্যাখ-মার করি, কিন্তু প্লেগের বাজারে বেড়ালটাকে আমরা দুধ-মাছ দিয়ে বরণ করে নিলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে প্লেগের আতঙ্ক দূর হল। কিন্তু বেড়ালটা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। চুরি করা শুরু করল, ডাকাতিও আরম্ভ করল। আমাদের খাওয়ার সময়ে টেবিলের নীচে এসে রাহাজানি করতে লাগল। আমাদের খাবারের থালা থেকে মাছের টুকরো না দিলে বা দিতে একটু দেরি হয়ে গেলে সে তার শক্ত-সমর্থ গোদা পায়ে আমাদের লাথি মারতে লাগল। রীতিমত অলরাউন্ডার—বাঁ পা, ডান পা সমানে চলে। দুবার মেরে তাড়ালাম, একবার বস্তায় করে ফেলে এলাম। কিন্তু সে ঠিক ফিরে এল। একদিন টেবিলে বসে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পিঠে লাল আলো দিচ্ছি, বেড়ালটা বোধহয় ভেবেছে কিছু খাচ্ছি। পায়ের গোড়ালির গিঁটে পর পর দুবার সজোরে লাথি মারল। আমার কেমন মাথা গরম হয়ে গেল। আমি ল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে বেড়ালের মুখে তীব্র লাল আলো ফেললাম।

বেড়ালটা হকচকিয়ে গেল। তারপর ল্যাজ তুলে এক লাফে জানলার ওপরে উঠে, জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। অবশেষে চোঁচা দৌড়।

বেড়ালটা আর ফেরেনি। আমার ব্যথা-ফোলাও সম্পূর্ণ দূর হয়েছে, বোধহয় গোড়ালির গিঁটে বেড়ালের লাথি খেয়ে।

কে মারা যাচ্ছে?

আজ চব্বিশ এপ্রিল।

আর হাতে তিন দিন রয়েছে, মাত্র তিন দিন। এই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে যদি জগৎহরি মারা না যান তবে কেলেঙ্কারি হবে।

এই গল্পের নায়ক জগৎহরি, শ্রীযুক্ত জগৎহরি মুখোপাধ্যায় এই কয়েকদিন আগেও মৃত্যুমুখী ছিলেন। চৈত্রমাসের প্রথমে সেই এক শনিবার বিকেলে বাড়ির কাছে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার পথে হঠাৎ অকাল বর্ষণে প্রচণ্ড ভিজে গিয়েছিলেন জগৎহরি।

সেই ঠাণ্ডা লেগে বুকে জল জমা, শ্বাস কষ্ট। বুড়ো বয়েসে এসব অসুখ মারাত্মক।

তা ছাড়া জগৎহরিবাবুর বয়েস তো আর কিছু কম হয়নি। তিরাশি পূর্ণ হয়ে চুরাশিতে পা দিয়েছেন গত পৌষ মাসে। সে তুলনায় শরীর-স্বাস্থ্য ভালই ছিল, কিন্তু এ বয়েসে আচমকা অসুখ খুব বিপজ্জনক।

জগৎহরিবাবু মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিল। গত সোমবার তো মনে হয়েছিল আজকের রাত্রিটা কাটে কি না কাটে।

সুখের কথা শুধু সেই সোমবারের রাত্রি নয় তারও পরে আরও পাঁচ-পাঁচটা রাত্রি বহাল তবিয়তে কাটিয়ে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত জগৎহরি, নামের পূর্বে 'শ্রী'র বদলে চন্দ্রবিন্দু বসানোয়, স্বর্গীয় জগৎহরি হওয়ায়, তাঁর তেমন বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখা যায়নি।

ওইখানেই হয়েছে বিপদ।

শ্রীযুক্ত জগৎহরি মুখোপাধ্যায় কোনও সামান্য লোক নন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রবাদপ্রসিদ্ধ এক মুখুজ্যে বংশের তিনি মুখোজ্জ্বলকারী উত্তরপুরুষ। পিতৃপুরুষদের বিশাল পারিবারিক ব্যবসা ছিল চেতলা হাটে। মশারি আর মাছ মারার জালের পাইকারি কারবার। সেই ব্যবসা ধীরেসুস্থে অনেকটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি চলচ্চিত্রে প্রযোজনায় মনোনিবেশ করেন।

জগৎহরি বিশ-পঁচিশ বছর আগে চিত্রজগতে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত লোক ছিলেন। নীতিশ মুখার্জির ভাইপোর বিয়েতে তিনি বরযাত্রী হয়েছিলেন, মলিনা দেবী তাঁকে ভাইফোঁটা দিতেন, এমন কী স্বয়ং উত্তমকুমার তাঁকে 'জগদা' বলতেন। বাড়িতে কড়া করে ইলিশ মাছ ভেজে, বিমান যাত্রী পেলে, জগৎবাবু গীতা দত্তকে বোম্বাইতে পাঠাতেন। কলকাতায় কালেভদ্রে রাজকাপুর এলে তিনি ঘি-গরমমশলা দেওয়া পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া পাঁঠার মাংসের ঝোল রাজকাপুরকে হোটেলে পাঠাতেন। রাজকাপুর যাওয়ার সময়ে তাঁর কলকাতার এজেন্টকে বলে যেতেন। তাঁর হোটেলের ঘরে কয়েক বোতল স্কচ হুইস্কির বোতলে সব সময়েই যথেষ্ট অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকত, কারণ তিনি নতুন বোতল না খুলে খেতেন না এবং প্রচুরই খেতেন, সেই বোতলগুলো জগৎহরিকে এজেন্ট সাহেব পাঠিয়ে দিতেন। এবং সেই প্রসাদ পেয়ে জগৎহরিবাবু ধন্য বোধ করতেন। লোকজনকে ডেকে ডেকে খাওয়াতেন, বলতেন, এটা রাজকাপুরের স্কচ।

জগৎহরি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলেন শরৎচন্দ্রের গল্পের সিনেমা করে। গল্পটা শরৎচন্দ্রের। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রচনা করে, কপিরাইট না কিনে

অন্য নামে চলচ্চিত্রায়ণ করতেন, যেমন গৃহদাহ তাঁর সুবাদে হয়েছিল মনের আগুন, চরিত্রহীন হয়েছিল পথে বিপথে। চিত্রনাট্যকারের নাম থাকত না, তাঁকে এজন্যে কিছু বেশি পয়সা দেয়া হত। বইয়ের টাইটেলে লেখা থাকত কাহিনী ও চিত্রনাট্য 'ছদ্মবেশী'।

এসব বই দুর্বল অশ্রুগ্রন্থি বাঙালি মধ্যবিত্ত দর্শক লুফে নিয়েছিল। তারাই তখনকার সিনেমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষফাল্গুনের পালা চিরদিনই বাঙালি দর্শকের অতি প্রিয়।

যথেষ্ট পয়সা করেছিলেন জগৎহরিবাবু, মশারির ব্যবসায় এর চেয়ে বেশি উপার্জন হওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া চেতলার মশারির দোকানটা ছোট করে ভালই চলছিল, দোকানটা থেকে সংসার খরচা মোটামুটি চলে যেত। সিনেমার লাইনে যেমন হয় জগৎহরিবাবুর কিন্তু চরিত্রদোষ ছিল না, সে বড় খরচার ব্যাপার।

ফলে সিনেমা করে যেটুকু লাভ হয়েছিল প্রায় পুরো টাকাটাই জগৎহরি নানাভাবে বিনিয়োগ করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পারিবারিক বিষয়বুদ্ধি এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

যোধপুর পার্কে পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিলেন, ক্যামাক স্ট্রিটে একটা বড়সড় ফ্ল্যাট। শান্তিনিকেতনে বাড়ি করলেন এক বিঘে জমির ওপরে। এ ছাড়া পোস্টাফিসে ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলেন প্রায় দু লাখ টাকার মতো, যা ডবল হয়ে হয়ে এখন আটলাখে দাঁড়িয়েছে।

তবে জগৎহরির ব্যবসায়ের পথ সবটাই যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তা নয়। একবার খ্যাতির লোভে আর্ট ফিল্ম করে বেশ কয়েক লাখ টাকা গচ্চা দিয়েছিলেন, তবে এই সুযোগে একবার লাক্সেমবার্গে ঘুরে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর প্রযোজিত বই 'ঘাম ও রক্ত' তৃতীয় বিশ্বের চিত্রমেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল। ব্যস ওই পর্যন্তই, তার পরে আর এ ব্যাপারে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রদর্শনের সময় আন্ডারগ্রাউন্ড ঘুপচি হলে দেড়শ সিটের মধ্যে মাত্র বারোটি সিট পূর্ণ ছিল, তার মধ্যে তিনটেতে ছিলেন তিনি, তাঁর পরিচালক কাবুল মল্লিক এবং শ্রীমতী কাবুল।

শ্রীমতী ও শ্রীমান কাবুল মল্লিক অত্যন্ত তুখোড় দম্পতি। 'ঘাম ও রক্ত' ছিল জোতদার-বর্গাদার সম্পর্ক নিয়ে একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিবেদন। বইটি এক পয়সাও ফেরত দেয়নি, কলকাতায় একদিনও চলেনি। তবে বড় বড় কাগজে, বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমে প্রচুর বাহ্‌বা পেয়েছিল? তবে সে সবের পিছনেও ছিল পাঁচতারা হোটেলে পার্টি, অবশ্য জগৎহরির পয়সায়।

সেই জগৎহরি এখন মরতে বসেছেন। কিংবা সঠিক করে বলা উচিত আগে মরতে বসেছিলেন, এখন বাঁচতে বসেছেন।

কিন্তু তাঁর বোধহয় বাঁচা হবে না। তাঁর বোধহয় আর বাঁচা হবে না, অন্ততপক্ষে বাঁচা উচিত হবে না।

এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কী ভাবেই বা বলা যায়? ব্যাপারটা গোলমেলে।

জগৎহরিবাবুর কোনও মেয়ে নেই, পর পর চার ছেলে। ছেলেরা এখন লায়েক হয়েছে, সিনেমা প্রযোজকের ছেলেদের যতটা বখে যাওয়া সম্ভব, তার চেয়ে কিছু কম বখে যায়নি তারা।

তাই বলে তারা যে কেউ পিতৃভক্ত নয়, তা নয়। জগৎহরির মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তারা একেকজন নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেয়।

বড় ছেলেটি প্রশান্ত, বাবার টাকায় যাত্রাদল করেছে, যাত্রা-উর্বশী আইভরি দাশের সঙ্গে আগামী দু'সপ্তাহ তার উত্তরবঙ্গ সফরের প্রোগ্রাম ছিল। বাবার জন্যে সেটা ক্যানসেল করেছে।

দ্বিতীয়টি অশান্ত। চিটফান্ড কোম্পানি করেছে। এক বছরে টাকা ডবল করে দেয়। তার বাবা, জগৎহরি, তাকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বাড়িতেই বছর বছর টাকা ডবল হওয়ার সুবিধে আছে জেনেও পোস্টাপিসে টাকা জমিয়েছিলেন ছয় বছরের মেয়াদে।

তৃতীয়টি সুশান্ত। সে পারিবারিক ব্যবসা চেতলার হাটে মশারির ব্যবসাটা দেখে। সে বেশ সব্যবস্থ দোকানের আয় থেকে সংসার খরচের জন্য দৈনিকই দুশ-আড়াইশ টাকা তার মা নিরুপমার হাতে দেয়। লোক-লৌকিকতা, পুজো, নববর্ষ ইত্যাদির মোটা টাকার দায়ও সে বহন করে।

এই তিনজনই বিবাহিত। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, শ্বশুরবাড়ি ইত্যাদি আছে। চতুর্থটির বিয়ে হয়নি, সে বোবা। সঙ্গত কারণেই তার নাম শান্ত। তার বিশেষ কোনও দোষ বা গুণ নেই। শুধু সন্ধ্যাবেলা কালীঘাট বাজারে গিয়ে দু'পাঁইট দু'নম্বর বাংলা মদ না খেলে তার রাতে ঘুম আসে না।

ভালই চলছিল সব। গোল বাধিয়েছেন জগৎহরিবাবু নিজে। তিনি কিছুতেই মারা যাচ্ছেন না।

সব রকম বিধি বন্দোবস্ত করা আছে। গঙ্গাজল, তামা, তুলসী। দৈনিক চেতলা বাজার থেকে এক টাকায় আস্ত তুলসীগাছ কিনে আনা হচ্ছে। বড়বাজার থেকে এক কেজি খাঁটি তিল এনে পুজোর ঘরে রাখা হয়েছে। এক বালতি খুচরো পয়সা জমানো হয়েছে, সেইসঙ্গে এক টিন খই। শবযাত্রার সময়ে ছিটোতে হবে।

ডাক্তাররা তো দিনক্ষণ বলেই দিয়েছিলেন। কিন্তু জগৎহরি ডাক্তারি নির্দেশ অমান্য করে বেঁচে রয়েছেন।

সবচেয়ে সমস্যা দাঁড়িয়েছে হরিমোহিনী দেবীকে নিয়ে। আগাম ১০ হাজার টাকা দিয়ে তাঁকে শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গাওয়ার জন্যে বুক করা হয়েছে। জগৎহরিবাবুর মতো কৃতবিদ্য ব্যক্তির শ্রাদ্ধবাসরে যেখানে চিত্রজগতের দিকপালেরা, নট-নটিরা অবশ্যই আসবেন সেখানে হরিমোহিনী দেবী ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কীর্তন গাওয়ানো একেবারেই ঠিক হবে না। মোটেই সম্মানজনক হবে না জগৎহরিবাবুর পুত্রদের পক্ষে।

এদিকে, হরিমোহিনী দেবী স্টেটসে চলে যাচ্ছেন সাতই মে। নিউ জার্সিতে, বস্টনে, লস এঞ্জেলেসে তাঁর কীর্তন গানের চুক্তি। টিকিট, প্রোগ্রাম সব ফাইনাল। শ্রাদ্ধ হবে মৃত্যুর পরে এগারো দিনে, বড় জোর সাতই মে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব।

অবশেষে সমস্ত সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করে এক শুভানুধ্যায়ী একটি সুপরামর্শ দিলেন। জগৎহরিবাবুকে উইল করতে বলুন। অনেক সময় দেখা যায় মুমূর্ষু ব্যক্তি উইল করার পরেই মারা যান। উইল করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচবার ইচ্ছে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা মনোমত ভাবে করে তিনি শান্তিতে দ্রুত পরলোকে গমন করেন। পরামর্শটা পেয়েছিল বড় ভাই প্রশান্ত। সে এসে অশান্ত এবং সুশান্তকে বলে। হাবেভাবে

শান্তকেও ব্যাপারটা যথাসাধ্য বোঝানো হয়। তার পরে চার ভাই দল বেঁধে মা নিরুপমাকে বোঝাতে গিয়ে দেখল তাঁরও কোনও আপত্তি নেই। তিনি আগে থেকে মন শক্ত করে বসে আছেন। তা ছাড়া তিনি হরিমোহিনী দেবীর কীর্তনের অত্যন্ত ভক্ত। হরিমোহিনী দেবীর কীর্তনই যদি না হল তা হলে তাঁর বিধবা হয়ে লাভ কি?

যথাসময়ে আলিপুর আদালতে পারিবারিক উকিল রামতনু ঘোষকে খবর দেওয়া হয়েছিল। আজ ২৪ এপ্রিল রবিবার সকালে তিনি উইল করতে এসেছেন।

জগৎহরিবাবু আগে থেকে কিছু জানেন না। তিনি রামতনুবাবুকে দেখে ভেবেছেন, পুরনো পরিচিত লোক, হয়তো তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা শুনে দেখতে এসেছেন।

সুতরাং যখন রামতনুবাবু বললেন যে, তিনি তাঁর উইল করতে এসেছেন। জগৎহরিবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। 'উইল? আমি কেন উইল করতে যাব? জগৎহরিবাবু আইন কিছু কম জানেন না, তিনি বললেন, 'আমি মারা গেলে আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি আমার স্ত্রী আর চার ছেলে সমান ভাগে পাবে। এর জন্যে আবার উইল করতে যাব কেন? রামতনুবাবু পুরনো, ঝানু উকিল। তিনি বললেন, 'উইল করা ভাল। তা হলে পরে আর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল হয় না।' কিছুটা কথাবার্তার পর জগৎহরিবাবু উইল করতে নিমরাজি হলেন। ততক্ষণে চার ছেলে এবং বিরাট ঘোমটা টেনে নিরুপমাদেবীও জগৎহরিবাবুর শয্যার পাশে এসে গেছেন।

জগৎহরিবাবুর খাটের সামনে একটা নিচু তক্তাপোষ রয়েছে, সেটায় বাড়ির সবাই বসলেন। পাশে একটা কাঠের চেয়ারে রামতনুবাবু। রামতনুবাবুর মুহুরিও সঙ্গে এসেছে, সে মেঝেতে কাগজ-কলম নিয়ে বসল। তার নাম সহদেব।

সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ইত্যাদি প্রথা ও আইন মাফিক বয়ান শেষ হওয়ার পরে জগৎহরিবাবু বললেন, 'যোধপুর পার্কে আমার পাঁচ কাঠা জমি রয়েছে, সেই জমি আমি আমার সতীসাধ্বী স্ত্রী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীকে দিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমা দেবী ঘোমটার আড়াল থেকে কাংস্য কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, 'দ্যাখো কাণ্ড! আমি বুড়ি মানুষ, বিধবা হতে যাচ্ছি, খালি জমি দিয়ে আমি কী করব?'

নিরুপমা দেবীর প্রতিবাদ শুনে একটু থমকিয়ে গেলেন জগৎহরি। মুখে বললেন, 'ঠিক আছে ওটা পরে দেখছি।' সহদেব মুহুরিও চতুর লোক, যোধপুর পার্কের জমির লাইনটা যেটা সে এইমাত্র লিখেছিল সেটার গায়ে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লাগিয়ে দিল।

এবার জগৎহরিবাবু বললেন, 'আমার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটা আমার বড় ছেলে প্রশান্তকে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন নিরুপমা দেবী, 'না। না। ও ফ্ল্যাটটা অশান্তকে দাও। ও একটু সাহেবি মেজাজের। তা ছাড়া ওর যা কাজ করবার সেটা বাঙালিপাড়ায় নিরাপদ নয়।'

ঢোক গিললেন জগৎহরিবাবু, রামতনুবাবু। মেঝেতে সহদেব মুহুরিও সদ্য সমাপ্ত পংক্তিটির পাশে আবার একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিল।

কিছুক্ষণ গুম-হয়ে থেকে জগৎহরি বললেন, 'আমার চেতলা বাজারের মশারির ব্যবসাটা তৃতীয় ছেলে সুশান্ত দেখাশোনা করে ওটা তাকেই দিয়ে যাব।'

বাক্য শেষ হওয়ার আগেই আবার নিরুপমার আপত্তি, 'এই তোমার বুদ্ধি? তুমি মরে

গেলে মশারির ব্যবসা করবে নাকি কেউও? ওটা প্রশান্তকে দাও। চেতলা বাজারে অত ভাল জায়গা, ওখানে প্রশান্ত ওর যাত্রা কোম্পানির অফিস করবে।'

আবার কিঞ্চিৎ নীরবতা এবং সহদেব মুহুরির প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হচ্ছিলেন জগৎহরি, তিনি এবারে অনেকদিন পরে খাটের ওপরে উঠে বসলেন, বললেন, 'আমি যদি শান্তিনিকেতনের নিরিবিলি বাড়িটা এই বোবা কালা ছেলে শান্তকে দিই, ওর মতো ও শান্তিতে থাকতে পারবে, তাতে নিশ্চয় তোমাদের কোনও আপত্তির কারণ নেই।'

নিরুপমা বললেন, 'নিশ্চয় আপত্তি করব। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে শান্তকে দেখবে কে। সেটা হল গানবাজনার জায়গা। কালাবোবার সেখানে কোনও ঠাঁই নেই।'

আর সহ্য করতে পারলেন না জগৎহরি। যাঁর চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে শ্মশানে যাওয়ার কথা, তিনি তড়াক করে খাট থেকে মেঝের ওপর নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সহদেব মুহুরি আর একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে যাচ্ছিল, জগৎহরিবাবুর ডান পাটা তার ডান হাতের ওপর পড়ায় সে একটু কোঁক করে উঠল।

ঘোমটা টানা নিরুপমার মুখপানে তাকিয়ে জগৎহরি গর্জে উঠলেন, 'বলি উইলটা কার? আমার, না তোমার? বলি মারা যাচ্ছে কে? আমি, না তুমি?'

বলা বাহুল্য এ গল্প এখানেই শেষ। পুরনো দিনের পাঠকেরা যাঁরা গল্পের শেষে একটা পরিণতি প্রত্যাশা করেন, তাঁদের অবগতির জন্যে তিনটি ঘটনা জানাচ্ছি।

এক, জগৎহরিবাবু উইল করেননি। দুই, জগৎহরিবাবু এখনও মারা যাননি। তিন, জগৎহরিবাবু একটা নতুন সিনেমা প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন, কাহিনীর নাম, 'যতক্ষণ শ্বাস।'

পঁয়ত্রিশ বছর

এমনিতেই এ লাইনে তখন ট্রেন চলাচল কম। তার ওপরে রবিবারের বিকেল, দেড়ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পরে এক-একটা গাড়ি।

যদিও কলকাতার খুব কাছে, পনেবো-বিশ মাইলের মধ্যে, মানে এখনকার হিসেবে পঁচিশ-ত্রিশ কিলোমিটার হবে, এদিকটায় জগন্ময় তার আগে কখনও আসেনি।

দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, তখনও কিলোমিটার কিলোগ্রামের যুগ আসেনি, সবে নয়া পয়সা চালু হয়েছে। কিলোমিটার, কিলোগ্রাম ধীরে ধীরে আসছে।

পুরনো গল্পটা মনে পড়ায় হাসি পেল জগন্ময়ের। কে যেন বাজারে গিয়ে পাঁচশ আলু চেয়েছে, তখনও দোকানদার গ্রামে, কেজিতে অভ্যস্ত হয়নি, হিসেবটাই তার কাছে বোধগম্য নয়। ক্রেতা আলুওয়ালার কাছে বাজারের ব্যাগটা রেখে মাছ কিনতে গেছে। ফিরে এসে দেখে ব্যাগ-ভর্তি আলু, দোকানদার গুনে গুনে পাঁচশো আলু তুলে ওজন করে থলেতে ভরে দিয়েছে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের একটা হালকা গল্প।

এখন আর এ গল্পে কেউ মজা পাবে না। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে জগন্ময় পিছনের দিকে তাকাল।

শুধু একটা হালকা হাসির গল্প, আর কিছু নয়? কিছুই নয়?

এই পঁয়ত্রিশ বছরে কত কী ঘটে গেল।

কত উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, পাওয়া-না-পাওয়া কত বৃষ্টি হয়ে গেছে, কত ঝড় অন্ধকার মেঘ।

ঘরোয়া হিসেবে ধরা হয় বারো বছরে একটা যুগ। সেই হিসেবে তিনটে যুগ কেটে গেছে।

সেই এক রবিবারের দুপুরে তৃপ্তি রেস্তোরাঁর বাঁধা চায়ের আড্ডা থেকে উঠতে উঠতে বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে খালি বাসায় ফিরে স্নান খাওয়া সেরে ছুটতে ছুটতে শেয়ালদা স্টেশন। সোয়া দুটোয় একটা গাড়ি আছে, পরের গাড়ি চারটের সময়। সোয়া দুটোর গাড়ি ফেল করলে চলবে না। তা হলে শ্যামবাজার গিয়ে বাস ধরে পৌঁছতে হবে। তাতেও দেরি হয়ে যেতে পারে। কারণ ইন্টারভিউয়ের সময় দেয়া আছে বিকেল চারটে।

জগন্ময়ের এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট মাস খানেক আগে বেরিয়েছে। খুব খারাপ রেজাল্ট, রীতিমত অপমানজনক। অবশ্য জগন্ময় পরীক্ষা দিয়েই বুঝেছিল, ফল ভাল হবে না; তবে এতটা খারাপ হবে ভাবেনি।

তবুও ডিগ্রিতে অনার্স ছিল তাই ভরসা করে কলকাতার আশেপাশে এদিক ওদিকে ছোটখাটো স্কুল-কলেজে মাস্টারির দরখাস্ত পাঠিয়ে যাচ্ছিল নিয়ম করে, নিয়ম করে প্রতি রবিবারে অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতা দেখে।

সেই অমৃতবাজার পত্রিকা তো মধ্যে উঠেই গিয়েছিল, এখন আবার কিছুদিন হল বেরিয়েছে। একালের ছেলেমেয়েরা কি আগের মতো ওইভাবে দরখাস্ত পাঠায়? আজকাল কি দরখাস্ত পাঠালে সাক্ষাৎকারের চিঠি আসে, চাকরি হয়?

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তিন যুগ পরের এই বিকেলে কলকাতা ফেরার গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে জগন্ময় এলোমেলো সব কথা ভাবছিল।

এখন স্টেশনে বেশ ভিড়। আগে ছুটির দিনে বিকেলে এমন সময়ে স্টেশনটা খুব ফাঁকা থাকত। দুয়েকজন যাত্রী, কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচের বাঁধানো বেদিতে ঘুমন্ত ভিখিরি ও কুকুর এবং হয়তো একজন ঝালমুড়িওয়ালা।

প্ল্যাটফর্মটা অনেক নিচু ছিল। গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়ে নামতে হত। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসে সেটা বিশেষ কোনও অসুবিধের নয়, আর মালপত্রও সঙ্গে কিছু নেই। শুধু হাতের মধ্যে একটা খামে কয়েকটা সার্টিফিকেট রয়েছে, সাক্ষাৎকারের জন্য।

পুরো ট্রেনটা থেকে মাত্র দশ-পনেরোজন লোক নামল। স্টেশনের গেটটা কোন দিকে সেটা একবার দেখে নিয়ে জগন্ময় সামনের দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় পাশের কামরার দরজা থেকে মেয়েলি কণ্ঠে জগন্ময়ের নাম ধরে কে যেন ডাকল, 'জগন্ময়, এই যে আমি এখানে, আমার হাতটা একটু ধরো না।'

জগন্ময় মাথা ঘুরিয়ে দেখে 'আমি এখানে' মানে মৃত্তিকা রোল নম্বর নাইনটিন। কাঁধে

একটা খদ্দরের ঝোলা ব্যাগ, কামরার দরজার হ্যান্ডেল ধরে, হু-হু করে বয়ে যাওয়া উত্তুরে বাতাসে আলোয়ান আর শাড়ি সামলিয়ে এতটা নামতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।

জগন্ময়ের মনে পড়ল, সেদিন খুব বাতাস ছিল। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা শীতের বাতাস। কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মেব এদিক-ওদিকে কৃষ্ণচূড়া আর মেহগনির পাতার মধ্যে শোঁ-শোঁ করে শব্দ হচ্ছিল। স্টেশনের পাশে একটা মজে যাওয়া ডোবা ছেয়ে আছে মিহি নীল কচুরিপানার ফুলের আভায়। স্টেশনমাস্টারের ঘরের সামনে একঝাঁক ভাঁটশালিক নিজেদের মধ্যে হুটোপাটি করে ঝগড়া করছে।

হাত বাড়িয়ে রেলগাড়ির দরজা থেকে নামাতে হল মৃত্তিকাকে।

সহপাঠিনী, দু'বছর একসঙ্গে পড়েছে। ক্লাসে বসে এ-কে-জির একঘেঁয়েমি ভরা পড়ানো শুনতে শুনতে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রফেসার তলাপাত্রের রসিকতা শুনে হো হো করে হেসেছে। বৃষ্টির দিনে ক্লাস ছুটির পরে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় ট্রাম না থাকায় দল বেঁধে ধর্মতলা অবধি হেঁটে গিয়েছে।

মৃত্তিকা দেখতে তেমন নয়। শ্যামলা, দোহারা, সাধারণ চেহারা। তবে সপ্রতিভ, ন্যাকা নয়। ছিমছাম সাজগোজ করে। চোখে সুরমা টানে, কপালে তারামার্কা টিপ। এম.এ. ক্লাসের মেয়ে, অনেকদিন ডবলবিনুনি বেঁধে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে।

মত্তিকাব একটা আকর্ষণ ছিল, টান ছিল। কখনও কখনও জগন্ময় যে তার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেনি তা নয়, ববং সেটাই স্বাভাবিক। অন্তত এতদিন পরে মনে হয় সেটাই সঠিক ছিল।

সেদিন কিন্তু মৃত্তিকার সঙ্গে রেলস্টেশনে দেখা হয়ে যাওয়ায় বিশেষ খুশি হয়নি জগন্ময়।

তার একটা কারণ, মৃত্তিকা মেয়েটা ফাজিল। জগন্ময় স্বভাবত একটু গম্ভীরচরিত্রের লোক। জগন্ময় জানে, দুয়েকবার পিছন থেকে নিজেই শুনেছে, মৃত্তিকা তাকে 'জগা' বলে, যদিও এখন সামনাসামনি 'জগন্ময়' বলছে।

কিন্তু এটা খুব বড় কথা নয়। আজ মৃত্তিকাকে দেখে খুশি না হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি খুব জটিল। একটা স্কুলে তো আর দুজন মাস্টার নেবে না একই বিষয়ে। নতুন হায়ার সেকেন্ডারি চালু হয়েছে, বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। ব্যয় সঙ্কুলান করতে গিয়ে মফঃস্বলের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সহশিক্ষামূলক হয়ে গেছে। রাতারাতি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন জনসাধারণ মেনে নিয়েছে।

নিশ্চয়ই মৃত্তিকাও একই স্কুলে ইন্টাবভিউ দিতে এসেছে। তা ছাড়া এই অবেলায়, এইরকম একটা স্টেশনে কী করতে আসবে। মৃত্তিকার রেজাল্ট জগন্ময়ের চেয়ে অনেক ভাল।

জগন্ময়ের গম্ভীর, চিন্তান্বিত মুখ দেখে মৃত্তিকা বোধহয় তার মনের কথাটা ধরতে পেরেছিল। স্টেশনের গেট দিয়ে বেরতে বেরতে মৃত্তিকা বলল, 'মানদাযিনী কৃষ্ণভামিনী, তাই তো?'

মৃত্তিকার কথায় জগন্ময়ের খেয়াল হল, যে স্কুলটায় ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, সেটার ওইরকম একটা যাচ্ছেতাই নাম, 'মানদায়িনী কৃষ্ণভামিনী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়'।

স্টেশনের বাইরে পানের দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার বলে দিল,

'এখান থেকে পশ্চিমে মাইল দেড়েক রাস্তা, রিক্সাভাড়া নেবে আট আনা। আট আনার বেশি দেবেন না, ওইটাই রেট। এই নকুল!'

পানওয়ালার ডাক শুনে একটা রিক্সা এসে সামনে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে দুজনে একই রিক্সায় উঠল। চেপা সিটে যতটা শরীর বাঁচিয়ে বসা যায় সেইভাবে বসে জগন্ময় প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক হল না।'

জগন্ময়ের কথার মানে বুঝতে পেরেও একটু ঠোঁট টিপে হেসে মৃত্তিকা বলল, 'কোন ব্যাপারটা?'

এবরো-খেবরো খোয়ার রাস্তায় রিক্সা চলেছে, তখনও এদিকে পিচের রাস্তা হয়নি। উঁচু-নিচু পথে রিক্সার ঝাঁকুনিতে জগন্ময় মৃত্তিকার সঙ্গে যেটুকু দূরত্ব রাখতে চাইছিল, সেটুকু রাখতে পারছিল না।

জগন্ময় এমনিতেই একটু শীতকাতুরে। গায়ে মোটা গোলগলা সোয়েটার, সেটাই দুই দেহের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সম্ভব তাই রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

মৃত্তিকার কোনও বালাই নেই। সে ভাল করে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে, আলোয়ানের মাঝখানটা ঘোমটার মতো করে মাথায় তুলে দিয়েছে কান দুটো ঢেকে।

চারটেয় ইন্টারভিউ। এখন সাড়ে তিনটে বাজে। ঠিক সময়েই পৌঁছানো যাবে। এরকম রাস্তায় যত জোরে চালানো সম্ভব ততটাই জোরে রিক্সাওয়ালা চালাচ্ছে। শীতের বিকেলের জমজমাট হাওয়ায় তার মুখে হিন্দি গানের কলি, 'জিয়া বেকারার হ্যায়।'

নীল নক্সাকাটা লাল পশমের আলোয়ানের ঘোমটার নীচে মৃত্তিকাকে কেমন নতুন বউয়ের মতো দেখাচ্ছে। একটু মাথা ঘুরিয়ে চুরি করে দেখতে গিয়ে মৃত্তিকার কাছে ধরা পড়ে গেল জগন্ময়। মৃত্তিকা চোখ পাকিয়ে তাকাল।

দোকান-পাট, বাজার-হাট, বাড়ি-ঘর তখনও এদিকে ভাল করে গড়ে ওঠেনি। চারদিকে খোলামাঠ, শীতের ফসল কাটা হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে দুয়েকটা মাঠ সরষের ফুলে হলুদ হয়ে আছে, সরষে তোলার সময় তখনও হয়নি। সরষে ফুলের গাঢ় গন্ধে থমথম করছে বাতাস।

সামনের দিকে অবেলার সূর্য এরই মধ্যে ঘোলাটে হয়ে এসেছে। কয়েকটা খয়েরি ভিনদেশি বক মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দু'চারটে ঘরবাড়ি, টিনের চালা।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকির মুখে দু'হাত দিয়ে জগন্ময়কে জড়িয়ে ধরে নকুলকে একটা ধমক দিল মৃত্তিকা, 'এই আস্তে, পড়ে যাব নাকি!'

রিক্সাটা একটু থিতু হতে জগন্ময় আবার অনুযোগ করল, 'ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না।'

এবার মৃত্তিকা আর কথা ঘোরাল না, মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি জগন্ময়ের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ব্যাপারটা? এই রিক্সায় পাশাপাশি বসে জড়াজড়ি করে যাওয়া? আমরা কি শখ করে যাচ্ছি?'

জগন্ময় চুপ করে রইল, কিন্তু মৃত্তিকা ছেড়ে দেওয়ার মেয়ে নয়, বাঁকা হেসে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার পাশে গায়ে গা লাগিয়ে রিক্সায় যেতে আমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে?'

একটু থতমত খেয়ে জগন্ময় বলল, 'সেসব কিছু বলছি না। মফঃস্বল এলাকা তো,

কে কী ভাববে, স্কুলকমিটির লোকেরা দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হবে। দুজনার কাউকেই কাজ দেবে না।'

মৃত্তিকা পালটা প্রশ্ন করল, 'স্কুলকমিটির লোকেরা আমাদের কি আগে দেখেছে? রিক্সায় দেখে চিনবে কী করে?'

জগন্ময় মাথা ঘামাল, 'কিন্তু স্কুলের সামনে যখন রিক্সা থেকে নামব?'

মৃত্তিকা বলল, 'আমরা স্কুলের সামনে নামব কে বলল? অনেক আগেই নেমে পড়ব!'

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কথায় কথায় দুজনের কেউ খেয়াল করেনি একটা ছোটমত বাজার পেরিয়ে রিক্সাটা সরাসরি স্কুল-কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে গেছে।

অতঃপর যা হওয়া সম্ভব, জগন্ময় মনে মনে যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হল। মানদায়িনী কৃষ্ণভামিনী বিদ্যালয়ের দপ্তরি থেকে স্কুলকমিটির মাননীয় সভাপতি পর্যন্ত ধরে নিলেন, এরা স্বামী-স্ত্রী।

এবং সেই ভেবে দুজনের সাক্ষাৎকার একই সঙ্গে নেওয়া হল। ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় এক ভদ্রলোক, অতুলেন্দ্রবাবু, তিনিই স্কুলকমিটির সম্পাদক, এমনিতে নিকটবর্তী মহকুমা আদালতে মোক্তারি করেন, সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের সন্তানাদি কী?'

আসলে এঁদের কৌতূহলের উৎস হল স্বার্থ। নতুন পাশকরা ছেলেমেয়েরা বেশিদিন স্কুলে থাকে না, সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়, কিংবা কলেজে অধ্যাপনা সংগ্রহ করে।

এঁরা পাকা লোক। পাড়াগাঁয়ের স্কুল চালান। অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা জানেন, জোড়ায় ধরতে পারলে সহজে জোট ভাঙে না। একজনা কিংবা অন্যজনা, একে অন্যের জন্যে আটকিয়ে যায়।

দুজনারই কাজ হয়ে গেল। দুজনারই বিষয় ইতিহাস হওয়ায় কোনও অসুবিধা হল না। কারণ জগন্ময় কিংবা মৃত্তিকা যেটা বুঝতে পারেনি—একই নাম, একই স্কুলকমিটি হলেও আসলে দুটো স্কুল—একটা ফর বয়েজ, অন্যটা ফর গার্লস।

আগে শুধু ছেলেদের স্কুল ছিল, কিন্তু গত দশ-বারো বছরে ফাঁকা মাঠ আর পতিত জমির মধ্যে এই পুরনো গ্রামের চারপাশে অনেক উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ফ্রক পরা খালি-পা ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে।

জগন্ময় আর মৃত্তিকার চাকরি হয়ে গেল। গার্লস স্কুল তৈরি হচ্ছে, সেখানে তাদের জন্য নতুন কোয়ার্টারও বানানো হবে।

ফেরার পথে সেই একই রকম রিক্সা। এবার আর খুব সঙ্কোচ নেই জগন্ময়ের। খুব সহজ ভাবেই মৃত্তিকার শরীরে শরীর লাগিয়ে রিক্সায় এল স্টেশনে।

অবশ্য এ ব্যাপারে স্নায়বিক বা মানসিক কারণ যথেষ্ট নয়। সেদিন ফেরার পথে সন্ধ্যায় হাড়-হিম-করা ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে বইছিল।

ট্রেনে উঠে প্রায় ফাঁকা কামরা। কামরার শেষপ্রান্তে জানালা নামিয়ে কুঁকরিয়ে বসে পড়ল জগন্ময়, পাশে ঘন হয়ে বসে মৃত্তিকা বলল, 'তোমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে?' তারপর নিজের গায়ের গরম চাদরটা দিয়ে যৌথভাবে জড়িয়ে নিল জগন্ময় সমেত নিজেকে।

এর পরে আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল মৃত্তিকার সঙ্গে জগন্ময়ের।

মৃত্তিকা মানদায়িনী কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরিতে এসে এক সপ্তাহ পড়ানোর পর চলে যায়, আর আসেনি। কোনও খবরও দেয়নি। জগন্ময় এসেছিল, শুধু আসেনি, গত ছত্রিশ বছর ধরে কাজ করে গেল। তবে সে এখানে থাকেনি, কলকাতার ভাঙা বাড়ি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছে। স্কুল-কর্তৃপক্ষ প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন, পরে মেনে নেন।

জগন্ময়ের পক্ষে মৃত্তিকার খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়নি। মৃত্তিকার ঠিকানা সে জানত না, তবে ইচ্ছে করলে খোঁজখবর নিয়ে বার করতে পারত। তা করেনি।

পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথায় কথায় জগন্ময় জেনেছিল, কী একটা সরকারি পরীক্ষা দিয়ে মৃত্তিকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে।

মৃত্তিকার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল পরের সালে। তিন দিন পরে পঁচিশে বৈশাখ, তারপরে পাঁচ সপ্তাহ গরমের ছুটি।

জগন্ময় এগারো ক্লাসে ভারত ইতিহাসে মৌর্যযুগ পড়াচ্ছিল, এমন সময় ক্লাসে ঢুকে পুরনো দপ্তরি রামকানাই এসে জানান দিল, 'বউদি এসেছেন।'

বউদি? শুধু রামকানাই কেন, এই স্কুলের মাস্টারমশাইরা, পরিচালকেরা সবাই এখনও জানেন মৃত্তিকা তার স্ত্রী। কোনও একটা অসুবিধের জন্যে সে এখানে কাজে আসতে পারছে না।

তাড়াতাড়ি ক্লাস সেরে টিচার্স রুমে গিয়ে জগন্ময় দেখে টিচার্স রুমের এক পাশে একটা চেয়ারে মৃত্তিকা বসে এই গরমে দরদর করে ঘামছে। তার হাতে একতাড়া শুভবিবাহ লেখা, সিঁদুর-হলুদের ফোঁটা দেওয়া নিমন্ত্রণ চিঠি।

ক্লাসের সময়, দুয়েকজন অফপিরিয়ডের মাস্টারমশায় ছাড়া, এ ঘর ফাঁকাই থাকে। এখন বুড়ো হেডপণ্ডিত মশায় মধ্যের একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন, তিনি মৃত্তিকাকে লক্ষই করেননি। তবে সে এসেছে শুনে কেউ কেউ এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে গেল।

জগন্ময় এসে মৃত্তিকার পাশের একটা চেয়ারে বসল, 'হঠাৎ এখানে কেন? তুমি না বাইরে কোথায় চাকরি করছ?'

মৃত্তিকা বলল, 'বর্ধমানে। তোমার কলকাতার বাসায় যেতাম। কিন্তু ঠিকানা জানি না, তাই এখানেই আসতে হল।'

জগন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'এত জরুরি কিসের?'

মৃত্তিকা বলল, 'আমার বিয়ে।'

কথাটা শুনে জগন্ময়ের যেন কোথায় একটু লাগল, একটু ম্লান হেসে বলল, 'কার সঙ্গে?'

মৃত্তিকা এখনও আগের মতই প্রগলভা, সে উত্তর দিল, 'তোমার সঙ্গে নয়!'

জগন্ময় বলল, 'কেন নয়?'

ততক্ষণে মৃত্তিকা একটা শুভবিবাহের পত্রে জগন্ময়ের নামঠিকানা লিখে ফেলেছে। সেটা জগন্ময়ের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, মুখে বলল, 'যেয়ো কিন্তু। আমি উঠছি, দেড়টার ট্রেনটা ধরতে হবে।'

ইস্কুলের উঠোনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, মৃত্তিকা সেটায় উঠে চলে গেল।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। গরম বাতাস বইছে।

তিন যুগ পার হয়ে গেছে।

সেদিনের শহরতলীর শান্ত, নিরিবিলি রেলস্টেশন আর তার চারপাশের জনপদ আজ লোকজনে, হাটবাজারে জমজমাট। আট-দশটা ইস্কুল, একটা কলেজ, গোটাতিনেক সিনেমা হল, আর ভিডিও পারলারের তো ছড়াছড়ি।

জায়গাটার চেহারা সম্পূর্ণ পালটিয়ে গেছে। জগন্ময়ের চোখের সামনেই বদল হয়েছে, একদিনে হয়নি।

ফেরার ট্রেনের জন্যে জগন্ময় দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। স্কুল ছুটির পর ফেয়ারওয়েল ছিল। তাই দেরি। সাধারণত স্কুল ছুটির পর জগন্ময় দেরি করে না। যত তাড়াতাড়ি পারে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে।

কিন্তু আজ শেষ দিন। পঁয়ত্রিশ বছর পরের শেষ দিন।

হাতব্যাগে মিষ্টির বাক্স, একটা রামায়ণ, সঙ্গে একটা নতুন ছাতা, ফেয়ারওয়েলের উপহার নিয়ে জগন্ময় ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এই অসময়েও স্টেশন গিজগিজ করছে।

একটু পরে ট্রেন আসবে। তার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে মৃত্তিকা বলবে না, আমার হাতটা একটু ধর! আর তার দরকারও হবে না, এখন প্ল্যাটফর্ম অনেক উঁচু হয়েছে। তা ছাড়া বিদায় উপহারে জগন্ময়ের দুই হাতই জোড়া।

ট্রেন এসে গেল। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে কামরায় উঠতে উঠতে জগন্ময়ের মনে পড়ল, মৃত্তিকার সঙ্গে কতকাল যোগাযোগ নেই, কতকাল তার কথা মনেও পড়েনি।

আজ এই শেষদিনে মনে পড়ল।

এক বগ্‌গা

একবগ্‌গা কথাটার একটা সরাসরি মানে আছে।

সেটা সবাই জানেন, একবগ্‌গা মানে হল একগুঁয়ে। কিন্তু একগুঁয়ে বা একরোখা নয়, আমাদের অল্প বয়েসে এই একবগ্‌গা শব্দটার অন্য রকম একটা হাস্যকর অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খুবই অল্প দিনের জন্যে আমাদের কাছে সেই প্রয়োগটা গ্রহণীয় হয়ে ছিল, আমাদের নিজস্ব মফস্বলী এলাকায়।

তবে এই কাহিনীর ভিতরে প্রবেশ করার আগে অন্য একটা ছোট গল্পের উল্লেখ করতে হয়।

'ছোট গল্প' বলতে সত্যিই ছোট গল্প, সে গল্প আমরা অল্প বয়েসে পড়েছিলাম, ভালবেসে পড়েছিলাম। আমাদের সেই বাল্যদিনের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে আজ বয়েস যখন প্রায় তিন কাল পার হয়ে এক কালে ঠেকতে চলেছে, স্মৃতি বিভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবু যতদূর মনে পড়ছে সেই প্রিয় লেখকের নাম ছিল কার্তিক দাশগুপ্ত আর বইয়ের নাম ছিল সম্ভবত 'এ-বেলা ও-বেলার গল্প'।

গল্পটা খুবই সাদাসিধে, সরল প্রকৃতির এক সাহেবকে নিয়ে। সাহেব বাজার থেকে বক কিনে এনেছেন, বকের মাংস খাবেন বলে। এর আগে তিনি বকের মাংস খাননি।

সাহেবের খানসামা-বাবুর্চি ইত্যাদি আছে। তিনি বাবুর্চিকে বকের মাংস রান্না করতে দিয়েছেন। বাবুর্চির হাতের রান্না ভাল, এ দিকে সে খুবই লোভী। মাংস রান্না করতে করতে লোভে পড়ে সে নিজেই বকের একটা ঠ্যাং খেয়ে ফেলল।

রাতে সাহেব খেতে বসেছেন, দেখেন যে মাংসের প্লেটে মাত্র একটা ঠ্যাং। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চির তলব, হল, 'এই বাবুর্চি বকের একটা ঠ্যাং কেন? আরেকটা ঠ্যাং কী হল?'

কী বলবে ভেবে না পেয়ে বাবুর্চি বলে বসল, 'হুজুর বকের যে একটা ঠ্যাংই হয়, বকের তো দুটো ঠ্যাং থাকে না।'

এ কথা শুনে সাহেব তো তাজ্জব, তিনি বাবুর্চিকে বললেন, 'তা কী করে সম্ভব? জীব-জন্তু, পশু-পাখি কারও কখনও এক ঠ্যাং হয় না।'

বাবুর্চি বলল, 'হয় স্যার। বকের এক ঠ্যাং হয়। আপনি আমার সঙ্গে কাল নদীর ধারে যাবেন, সেখানে বিস্তর বক আসে। আমি আপনাকে দেখাব।'

পরের দিন সকালে বাবুর্চি সাহেবকে নিয়ে নদীর ধারে গেল। সেখানে জলের ধারে বকগুলো সব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এক পায়ে মাছ ধরার জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনে এই প্রথম একপেয়ে জীব দেখে সাহেব তো অবাক, আনন্দে তিনি হাততালি দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাততালির শব্দে বকগুলো উড়ে পালাল। উড়বার সময় তাদের দু পা বেরিয়ে এল। এই দৃশ্য দেখে সাহেব বাবুর্চিকে ধরলেন, 'এই তো দেখছি এদের দু পা।'

চতুর বাবুর্চি বলল, 'হুজুর ওদের আসলে একটাই পা, শুধু হাততালি দিলে দুটো হয়ে যায়।'

এই গল্পের এর পরবর্তী অংশ খুবই হৃদয়বিদারক।

কয়েক দিনের মধ্যেই সাহেব আবার বাবুর্চিকে বক রান্না করতে আদেশ করলেন। বাবুর্চি বাজার থেকে একটা বক কিনে এনে বেশ ঝালতেল দিয়ে রান্না করল এবং আগের মতোই একটি ঠ্যাং নিজে খেয়ে নিয়ে অন্যটি মনিবকে পরিবেশন করল।

বাবুর্চি ভালই জানে আজই সাহেবের বাড়িতে তার শেষ রজনী। সে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে খাবার ঘরের পর্দার আড়াল থেকে দেখতে লাগল সাহেব কী করে। সে যা ভেবেছিল তাই দেখতে পেল, খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে সাহেব জোর হাততালি দিয়ে যাচ্ছেন।

ভূমিকা শেষ।

এবার মূল গল্পে যাই।

যাঁরা এখন বুঝতে পারেননি তাঁদের জানিয়ে দিই এটা একটা নড়বড়ে একপেয়ে গল্প।

এবং গল্পটা শুধু একপেয়েই নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাসী।

সেই কবেকার কথা। সে বছর পুরো বর্ষাকাল ঠিকমত বৃষ্টি হল না। তারপর ভাদ্র-আশ্বিন একেবারে ভাসাভাসি ব্যাপার। নাটমণ্ডপে পর্যন্ত জল উঠল। মহালয়া পর্যন্ত সে জল নামল না। দুর্গাপুজো সরিয়ে নিয়ে যেতে হল বাজার সমিতির অফিসের বারান্দায়।

এদিকে ধলেশ্বরী-যমুনায় স্টিমার বন্ধ। সারেং-খালাসিদের ধর্মঘট। কলেজের

ছেলেমেয়েরা, অফিসের বাবুরা যারা সম্বৎসরে বাড়ি ফেরে, তাদের বাড়ি ফেরা কঠিন হয়ে গেছে। ঘুরপথ দিয়ে কিংবা নৌকোয় সাগরপ্রমাণ উত্তাল নদী পার হয়ে সাহসীরা দেরি করে বাড়ি ফিরল।

ততদিনে বৃষ্টি থেমে গেছে। জল নেমে গেছে শহরের রাস্তা থেকে, গৃহস্থবাড়ি থেকে, নাটমণ্ডপের ঘর আর উঠোন থেকে। আশ্বিনের টানা রোদে কাদা শুকোচ্ছে চড়চড় করে, কান পাতলে পড়ন্ত দুপুরে সেই চড়চড় শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

জল নামল, রাস্তা শুকোল, পুজো শেষ হয়ে গেল। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ঝকঝকে কাঁসার থালার মতো চাঁদ উঠল নারকেল-সুপুরি গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা মফস্বল শহরের আকাশে।

অফিস-আদালতের ছুটি শেষ। আজ শুক্রবার, শনি-রবি বাদ দিয়ে সোমবার কোর্ট-কাছারি খুলবে। যারা অতিরিক্ত ছুটি নেয়নি, তাদের অফিস খোলার দিন পৌঁছতে হলে কাল না হোক অন্তত পরশু সকালে রওনা হতে হবে। তবে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের এখন আড়াই সপ্তাহ হাতে রয়েছে।

পাণ্ডববর্জিত অবলুপ্ত বঙ্গপ্রদেশের নদীনালা ঘেরা নিচু সমতল জগতের মধ্যস্থলের এই গঞ্জ শহরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ দু'বেলা দুটি স্টিমার, যা দুটি দূরবর্তী স্টেশনে যথাক্রমে ঢাকা ও কলকাতার ট্রেন ধরায়। আর আছে সকাল থেকে সন্ধ্যা দু'ঘণ্টা অন্তর বাস। ধুলো উড়িয়ে, বৃষ্টির দিনে কাদাজল ছিটিয়ে, পেট্রোলের অলৌকিক গন্ধ ছড়িয়ে সেই বাস জেলা সদর থেকে যাতায়াত করে।

সারেং-খালাসি ধর্মঘটে স্টিমার আসা বেশ অনেক দিন, পুজোর আগে থেকেই, বন্ধ। কলকাতায়-ঢাকায় যাতায়াত করতে হলে ওই বাসে জেলা সদরে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। ষাট মাইল রাস্তা, চারটে খেয়া পার হয়ে ঘণ্টা ছয়েক লাগে পৌঁছাতে।

লক্ষ্মীপুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুজোর ছুটি কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। সন্ধ্যা গড়াতে নারকেল-সুপুরির মাথা টপকে খোলা আকাশে চাঁদ চলে এসেছে। ঝিমঝিম জ্যোৎস্নায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট মায়াময় হয়ে উঠেছে।

গতকাল লক্ষ্মীপুজোয় যারা ঢোল আর কাঁসি বাজিয়েছিল একটু আগে তারা ঝোলা ভরে মুড়ি-মুড়কি, নারকেলের আর তিলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া নিয়ে শেষবার ঢোল-কাঁসিতে বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের হাটখোলার রাস্তা ধরে চলে গেল। ওরা তিন ক্রোশ দূরে থাকে কিন্তু এখন সেখানে যাবে না। একটু এগিয়ে বাঁদিকের চক দিয়ে এলংজানি নদীর ধারে সিঙ্গানগর গ্রাম। সেখানে পানিলক্ষ্মী বা জললক্ষ্মীর পুজো হয় কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দিন শেষ রাতে। এখন সেখানে যাচ্ছে তারা।

জললক্ষ্মী সাধারণ লক্ষ্মী নয়। জেলে আর মাঝিদের, এমনকী মুসলমান নিকারিদের, বেদেদের সব রকম জলজীবী লোকের লক্ষ্মী। বর্ষা শেষ হওয়ার পর শারদীয় শান্ত নদীতে জ্যোৎস্না থইথই শেষ রাতে নৌকোর ওপরে তার পুজো হয়। সে পুজোয় তিন রকম আঁশওয়ালা মাছ, তিন রকম আঁশহীন মাছ, কলমিলতা আর শালুক লাগে। কাছিমের মাংস, শামুকের অম্বল না হলে জললক্ষ্মী খুশি হন না।

আমাদের দালানের বাইরের বারান্দার গোল সিঁড়ির ওপরে আমরা বসে আছি।

বারান্দায় একটা দশাসই জলচৌকির ওপরে জোড়াসন হয়ে বসে প্রমথ ভট্টাচার্য জললক্ষ্মীর গল্প বলছিলেন। বাড়িশুদ্ধ সবাই তাঁকে 'ভট্টাচার্যমশায়' সম্বোধন করে, আমরাও করি। তিনি প্রতিবার পুজোর মাসখানেক আমাদের বাড়িতে থেকে যান।

জললক্ষ্মী বিষয়ে বলার পূর্ণ অধিকার ভট্টাচার্যমশায়ের আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে সিঙ্গানগরের তালুকদার ছিলেন তিনি; কয়েক বছর আগে আড়গর খালের কাছে সে তালুক বেচে দিয়ে তিনি প্রবাসী হয়েছেন, কী এক অজ্ঞাত কারণে, সেই বয়েসে সেটা আমাদের বোঝার কথা নয়। প্রবাসী জীবনে কোথায় থাকেন ভট্টাচার্যমশায়, কী করেন তা-ও আমরা জানতাম না

তিনি জললক্ষ্মীর কথা বলছিলেন, এমন সময় মফিজ মাস্টার পুকুরের পারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভট্টাচার্যমশায়ের গলা শুনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রমথ নাকি?'

আমরা প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে জানালাম, 'হ্যাঁ, প্রমথ ভট্টাচার্যমশায় এখানে বারান্দায় বসে গল্প করছেন।'

মফিজ মাস্টার একটু এগিয়ে এসে আমাদের বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে জলচৌকির ওপর ভট্টাচার্যমশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে বসে গালগল্প করছ, আর তোমাকে খুঁজে এক ভদ্রলোক হন্যে হয়ে গেল।'

নির্বিকার প্রমথ বললেন, 'কে আমাকে খুঁজে হন্যে হয়ে গেল।'

মফিজ মাস্টার বললেন, 'কী যেন নাম বলল, নকুল দত্ত না নকুড় দত্ত। তুমি নাকি পুজোর পরে তাকে এ শহরে আসতে বলেছিলে। সে তো সন্ধ্যার বাসে এসেছে।'

'নকুল দত্ত?' নামটা শুনে ভট্টাচার্যমশাই জলচৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নকুলের তো আসার কথা ছিল। আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম।'

বারান্দার পাশে ভিতরের ঘরে লণ্ঠনের আলোয় ছোটকাকা তাঁর সুটকেশ গোছগাছ করছিলেন, তাঁর অফিস কলকাতায়, সোমবার খুলবে, তার আগে একদিন ঢাকায় কী একটা কাজ আছে, কালকেই রওনা হবেন।

আপাতত সুটকেশ গোছান স্থগিত রেখে ছোটকাকা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নকুল দত্ত লোকটা কে?' আমাদের বাড়িতে যে সামান্য দুয়েকজন এই ভট্টাচার্যমশায়কে অপছন্দ করেন ছোটকাকা তাদের মধ্যে একজন।

কাকার প্রশ্ন শুনে বারান্দা দিয়ে নামতে গিয়ে একটু থেমে দাঁড়িয়ে ভট্টাচার্যমশায় বললেন, 'নকুল দত্ত কেউকেটা লোক। কোন সাধারণ মানুষ নয়। তার এমন একটা যোগ্যতা আছে যা বোধহয় কোন মানুষেরই নেই।'

ভট্টাচার্যমশায়ের এই সার্টিফিকেট শুনে আমাদের সকলের, বিশেষ করে ছোটকাকার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল সঞ্চারিত হল। ছোটকাকা ভট্টাচার্যমশায়কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নকুল দত্তমশায়ের বিশেষ যোগ্যতাটা কী জানতে পারি?'

ভট্টাচার্যমশায় বললেন, 'নকুল দত্ত এক নাগাড়ে চল্লিশ ঘণ্টা থেকে আশি ঘণ্টা বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। কলকাতার গড়ের মাঠে, চাটগাঁর জাহাজঘাটে, ঢাকার...।'

ছোটকাকা ভট্টাচার্যমশায়কে শেষ বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে দিলেন না, থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোকের নাম বোধহয় আপনি ভুল বলছেন। ওঁর নাম নকুল দত্ত নয়। নকুল

দত্ত নিশ্চয় ওঁর ছদ্মনাম, ওঁর আসল নাম হল কানাই ঘোষাল।'

ছোটকাকার ব্যাপারস্যাপার সব সময়েই বোঝা কঠিন। ভট্টাচার্যমশায়ও বুঝতে পারলেন না। তিনি বিস্মিত হয়ে পুনরুক্তি করলেন, 'কানাই ঘোষাল?'

ছোটকাকা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কানাই ঘোষাল। অবশ্যই কানাই ঘোষাল।' তারপর বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'রাজশেখরবাবু, মানে পরশুরাম তঁার 'হনুমানের স্বপ্ন' বইতে ওঁর কথা বলেছেন। ওই বইয়ে 'রাতারাতি' গল্পে দেখে নেবেন, কানাই ঘোষাল, চ্যাম্পিয়ন ওয়ান-লেগার, কলকাতার সেনেট হাউসের চাতালে নাগাড়ে পঁচাত্তর ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'কী জানি, কানাই ঘোষালটা যে কে, আর পরশুরামই বা কে কিছু বুঝতে পারছি না।' এই বলে তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে ভট্টাচার্যমশায় বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলেন নকুল দত্তকে খুঁজতে।

এ সেই চল্লিশের দশকের মধ্যকালের কথা। পরশুরামের গল্প তখন কে আর তত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। আর ভট্টাচার্যমশায়ের তো কথাই নেই, বইপত্র দূরে থাক তিনি খবরের কাগজ পর্যন্ত পারতপক্ষে ছুঁতেন না। পরশুরামের নামও নিশ্চয় শোনেননি।

ছোটকাকা কিন্তু আর সুটকেশ গোছালেন না, বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এলেন, 'বৌদি, আমি কাল যাচ্ছি না।' এর আগে বাড়িশুদ্ধ সবাই ছোটকাকাকে অনুরোধ করেছিল, ছুটি নিয়ে আরও কয়েকদিন থেকে যেতে, অন্তত এক সপ্তাহ, এখন নিজে থেকে যাওয়া পিছিয়ে দেওয়ায় বাড়ির সবাই খুব খুশি হল।

ছোটকাকা বাড়ির মধ্য থেকে বাইরের বারান্দায় ফিরে এসে বললেন, 'কানাই ঘোষালের বিদ্যেটা একবার পরখ করে যাই। এর জন্যে অফিস দুয়েকদিন কামাই করতে হলে কী আর করা যাবে।'

'চ্যাম্পিয়ন ওয়ান-লেগার' ব্যাপারটা যে ঠিক কী, আমরা নাবালকেরা কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি। ছোটকাকাই আমাদের সাহায্য করলেন, বললেন, 'এক পায়ে দাঁড়াতে পারিস?'

'তা পারব না কেন?' খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো-পিসতুতো আমরা এগার ভাই-বোন সবাই প্রায় এক সঙ্গে বারান্দায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'বাঃ! চমৎকার', ছোটকাকা বললেন, 'এ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি?'

আমি বললাম, 'পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা।'

ছোটকাকা বললেন, 'কানাই ঘোষাল পারে পঁচাত্তর ঘণ্টা।' তারপর প্রশ্ন করলেন, 'পঁচাত্তর ঘণ্টা কতক্ষণ সময় জানিস?'

পিসতুতো বোন অনুদি অঙ্কে পাকা, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তিন দিন, তিন রাত্রি, তিন ঘণ্টা।'

ছোটকাকা এই উত্তরে খুশি হয়ে আমাকে বললেন, 'তোর ছোটমাকে রান্নাঘর থেকে ডেকে আনতে পারিস।' ছোটমা মানে ছোটকাকিমা, ছোটকাকার এবং এ বাড়ির নতুন বউ, গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই বিয়ে হয়েছে। তাকে আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ।

ছোটকাকার প্রস্তাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম, বললাম, 'আমি যাচ্ছি। এক

পায়ে যাই?' ছোটকাকা বললেন, 'তা যা। কিন্তু দেখিস পড়ে যাসনে।'

রান্নাঘরে ছোটকাকিমার স্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। তবুও মা-ঠাকুমার সঙ্গে রান্নাঘরে কাজের সময় থাকত। আমি গিয়ে দেখলাম, একটা বড় কালো পাথরের বাটিতে ভেজানো কিসমিসের বোঁটা ছাড়িয়ে পাশে একটা থালায় রাখছে। বোধ হয় কাল সকালে মোহনভোগ হবে।

আমি গিয়ে ছোটমাকে বললাম, 'বারান্দায় চল, ছোটকাকা ডাকছে।' এ কথা শুনে ছোটমা বেশ অস্বস্তিবোধ করল, মা জোর করে পাঠিয়ে দিল, 'যা, কী বলছে শুনে আয়। কয়েকটা দিন যখন থেকে যাবে বলছে, কিছু কিছু বায়না সইতে হবে।'

আমি আবার এক পায়ে লাফাতে লাফাতে ছোটমাকে এসকর্ট করে বারান্দায় নিয়ে এলাম। ছোটমা আসতেই কাকা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এক পায়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পার?'

এই আশ্চর্য প্রশ্নে এবং চারপাশে আমাদের সব ভাইবোনকে এক পায়ে দেখে ছোটমা হেসে ফেলল। এই তার এক খারাপ স্বভাব। কথায় কথায়, বিশেষ করে কাকার কথায় ছোটমা হেসে ফেলত। ঠাকুমা কতবার বলেছেন, 'নতুন বউ-এর অত খিলখিল করে হাসতে নেই', কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

আজ ছোটকাকা কটমট করে তাকাতে ছোটমা হাসি থামিয়ে, 'একদম পারি না', বলে দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। ছোটকাকাও, 'ধুত্তোরি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোধহয় বাসস্ট্যান্ডের দিকেই চলে গেলেন।

অবশ্য এরই মধ্যে আমি অন্য একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার পথে ছোটকাকার দৃষ্টির আড়াল হতেই ছোটমা আমাদের মতোই এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ির মধ্যের সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নেমে রান্নাঘরে চৌকাঠ পর্যন্ত চলে গেল, তারপর রান্নাঘরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবেশ করল। মা বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল, ছোটমা আবার কিসমিসের বোঁটা ছাড়াতে বসতেই, মা ছোটমাকে প্রশ্ন করল, 'কী রে ছোট, পায়ে কী হয়েছিল?' বহু কষ্টে হাসি চেপে ছোটমা বলল, 'না, দিদি, বোধহয় ঝিঁঝি ধরেছিল।'

ঘণ্টা দেড়েক পরে, তখনও রাতের খাওয়ার আর ঘণ্টাখানেক বাকি। তিনজন অথবা চারজন লোক আমাদের বাসায় এলেন। ছোটকাকা ভট্টাচার্যমশায় এবং নকুল দত্ত অথবা কানাই ঘোষাল।

আমার ঠাকুরদা রাতের খাওয়া সকাল সকাল খেয়ে নেন। এই আটটার মধ্যেই, লঘুপথ্য-দুটো সুজির রুটি আর মাগুর মাছের হালকা আদাবাটা ঝোল খেয়ে নিয়ে বারান্দার এক পাশে ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। তন্দ্রা ঘন হয়ে এলে উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুতে যান।

আজও ঠাকুরদা ইজিচেয়ারেই শুয়ে ছিলেন, সেই সময়ে ছোটকাকা নকুল দত্ত অথবা কানাই ঘোষালকে নিয়ে বাসায় ঢুকলেন।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার আমরা যেটা লক্ষ করলাম ভট্টাচার্যমশায় যাঁকে নকুলবাবু বলছেন, ছোটকাকা তাঁকে মিস্টার ঘোষাল বলছেন। ইজিচেয়ারে শায়িত ঠাকুরদা এঁদের কথাবার্তা শুনে ধরে নিলেন নবাগত ভদ্রলোকের নাম নকুল ঘোষাল। এর পর দেখা গেল

নকুলবাবু, মিস্টার ঘোষাল এবং নকুল ঘোষাল তিন রকম সম্বোধনেই ভদ্রলোক সাড়া দিচ্ছেন।

সে যা হোক ভদ্রলোকের নকুল ঘোষাল নামটা চালু হয়ে গেল। তিনি আমাদের বাসাতেই থাকলেন। পুজোর ছুটিতে মুহুরিবাবুরা দেশে গেছেন, ফিরবেন দীপান্বিতার পরে, কাছারিঘরে তাঁদের একটা বিছানায় ভট্টাচার্যমশায় শুচ্ছেন, অন্য একটা বিছানায় নকুল ঘোষালের জায়গা হল।

পরদিন খুব ভোরবেলায় ভট্টাচার্যমশায়, ছোটকাকা আর নকুল ঘোষাল, সেই সঙ্গে আমরা অল্প বয়েসীরা যারা অতটা সকালে ঘুম থেকে উঠতে পেরেছিলাম নদীর ধারে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড, পার্ক এবং ফুটবলের মাঠে সরেজমিন করলাম। অবশেষে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডের বাঁধানো চাতাল, যেখানে ফ্ল্যাগ তোলা হয় এবং যার সামনে আরেকটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেটা ঠিক করা হল নকুল ঘোষালের কেরামতির জন্যে।

ছোটকাকা নামকরণ করলেন, 'একবগ্গা প্রদর্শনী।' টিনের চোঙা মুখে নিয়ে কাকার নিযুক্ত দুই দল ছেলে টমটম ঘোড়ার গাড়িতে করে শহর-এর শহরতলির পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ঘোষণা করতে লাগল :

'বিশ্বের বিস্ময়
নকুল ঘোষাল
চ্যাম্পিয়ন ওয়ান-লেগার
পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে
সোমবার সকাল হইতে
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত
এক নাগাড়ে এক পায়ে
দণ্ডায়মান রহিবেন।'

শহরে বিশেষ সাড়া পড়ে গেল তা বলা যায় না। তবে থানা থেকে একদিন আই বি দপ্তরের লোক এসে খোঁজ নিয়ে গেল ঠাকুরদার কাছে নকুল ঘোষাল লোকটার বিষয়ে। তাদের মনে কী সন্দেহ হয়েছিল কে জানে।

কিন্তু সে ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কিছু বলার নেই। নিতান্ত সাধারণ চেহারার মালকোচা ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরা, পায়ে ফিতেওলা নটিবয় শু; বছর চল্লিশেক বয়েসের দোহারা চেহারার নকুল ঘোষালের মাথায় বয়সোচিত কাঁচাপাকা চুল। তবে একটা জিনিস দেখা গেছে তিনি যখনই সময় পান কাছারি ঘরের পিছনে বেলতলায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করেন।

তাঁর একাগ্রতা দেখে আমাদের মধ্যেও বেশ সাড়া পড়ে গেল। আমরাও যতটা পারি এক পায়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে লাগলাম। ছোটমা তো রীতিমত এক্সপার্ট হয়ে গেল, এমনকী ভরা চায়ের পেয়ালা হাতে ভিতরের বারান্দা দিয়ে একপায়ে হেঁটে ঠাকুরদার ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়ে শাড়িতে জড়াজড়ি হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে পেয়ালা ভাঙল, নিজের কনুই মচকাল।

যথাসময়ে সোমবার সকালে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আমরা এক পায়ে প্রসেশন করে

নকুল ঘোষালকে নিয়ে গেলাম। এক পায়ে বুটজুতো পরে অন্য পায়ের জুতো খুলে নকুল ঘোষাল অম্লান বদনে চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমরা কয়েকজন ছাড়া বিশেষ লোক হয়নি। বড়জোর দশ-পনেরো জন। কিন্তু বেলা বাড়তে বাড়তে এবং একদিন যেতে না যেতে লোকমুখে এই অভূতপূর্ব ঘটনার কথা শুধু শহরের মধ্যেই নয় আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। বেশ কিছুটা অতিরঞ্জন হয়ে প্রচারটা গুজবে পরিণত হল।

মঙ্গলবার থেকে প্রচণ্ড ভিড়। বুধবার হইহই কাণ্ড। সত্যিই কম যোগ্যতার কথা নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিন রাত এক পায়ে দাড়িয়ে থাকা, এর মধ্যে দুবেলায় মাত্র মিনিট দশ-পনেরো করে প্রাতঃকৃত্য, স্নানাহার ইত্যাদির জন্যে বিরতি। কাজটা খুবই কঠিন। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই ঠায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

প্যারেড গ্রাউন্ডে রীতিমত মেলা বসে গেল। শহরের মতো চানাচুরওয়ালা, মালাইবরফওয়ালা চলে এল। নৌকোয় করে গ্রাম থেকে লোকেরা এসে নদীর ঘাটে নামতে লাগল নকুল ঘোষালের কেরামতি দেখতে। লোকের মুখে মুখে চাউর হয়ে গেল 'একবগ্‌গা', সবাই বলছে 'একবগ্‌গা' দেখতে যাচ্ছি।

ব্যাপারটা সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় ঘাটে, স্কুলে, আদালতে, বাজারে, বাড়ির মধ্যে সাধারণ থেকে মান্যগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা একবগ্‌গা ঝোঁকে পড়ে গেল। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার কসরত।

বুধবার বিকেলবেলায় বিশাল জমায়েতের সামনে নকুল ঘোষাল দুর্ভাগ্যক্রমে চোখে অন্ধকার দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন, চাতালের ওপরে। তাঁকে সবাই মিলে ধরাধরি করে হাসপাতালে দিয়ে আসা হল।

'যত সব বুজরুকি' বলে ছোটকাকা বাসায় ফিরে তখুনই সুটকেশ গুছিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় লাস্টবাস ধরে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে সবাই মিলে বোঝানোর চেষ্টা করা হল, পঁচাত্তর ঘণ্টা না হলেও পঞ্চাশ ঘণ্টা এক পায়ে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাও কম কথা নয়, কিন্তু ছোটকাকা কারও কথা শুনলেন না

ছোটকাকার বিরহে ছোটমা দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়, এমনকী রান্নাঘরে পর্যন্ত গুরুজনদের সামনেও একবগ্‌গা হয়ে দাড়িয়ে থাকতে লাগল। ঠাকুমা একদিন একটু ধমকালেন, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হল না। আমাদের কাজের মেয়ে গুরুবালা উঠোনে বসে এক গামলা কই মাছের আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'কী একবগ্‌গা মেয়ে বাবা।'

পঞ্চাশ বছর আগের কথা এসব।

মনের মধ্যে কোথায় ছিল, তাই আবার মনে পড়ল।

ছোটকাকা সকালবেলায় ফোন করেছিলেন। ছোটমা মারা গেছেন। একমাত্র খুড়তুতো ভাই সে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। খবর পেয়ে আসতে কয়েকদিন লেগে যাবে, আমাকেই মুখাগ্নি করতে হবে।

শ্মশানে মুখে আগুন দিতে গিয়ে দেখলাম, ছোটমার বাঁ পা হাঁটুর কাছে একটু ভাঁজ হয়ে রয়েছে, ভাবলাম হাত দিয়ে ঠিক করে টেনে পা-টা সোজা করে দিই।

আচমকা মনে পড়ে গেল পুলিস প্যারেড গ্রাউন্ড, চ্যাম্পিয়ন ওয়ান-লেগার নকুল

ঘোষাল। পঞ্চাশ বছর আগের তুচ্ছ কয়েকটা এলোমেলো স্মৃতি, তার মধ্যে নতুন বউ হয়ে আসা ছোটমা এক পায়ে একবগ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঁজ হয়ে থাকা পা টা আর সোজা করা হল না।

অবসরের দিনলিপি

ভালই আছি।

ভেবেছিলাম খুব ছন্নছাড়া, নিঃসঙ্গ হয়ে যাব।

এক সঙ্গে দুটো বড় ব্যাপার ঘটে গেল। আমার মতো ঘর-গৃহস্থী মানুষের পক্ষে দুটো বড় মাপের জবরদস্ত জীবন বিদারক ঘটনা।

এক নম্বর হল, চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করলাম। পঁয়ত্রিশ বছরের দশটা পাঁচটা থেকে অব্যাহতি। অবসরগ্রহণ করলাম কথাটা যদিও সঠিক নয়, কথাটা অবশ্য সম্মানজনক, যেন আমি স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করেছি, কিন্তু সত্যি কথাটা হল বয়স হয়ে যাওয়াতে অবসর নিতে বাধ্য হলাম।

দু নম্বর ব্যাপারটা হল আরও গুরুতর। পুরনো বাসস্থান ছেড়ে নতুন বাসায় চলে এলাম। সরকারি আবাস ছাড়তেই হত।

তবে এই শেষ বাসাবদল। সুতরাং এর পরে আর বাসা বদলাতে হবে না। [illegible] শুরু হয়েছিল সেই সাহেব পাড়ার [illegible] এসপ্ল্যানেডের গলিতে, তারপর দক্ষিণ দিকে হটতে হটতে বিদায় নিলাম গড়িয়াহাটার মোড় থেকে।

শেষ দিকে নিকট বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে [illegible] আড্ডা হত তা তো নয়। কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পেতাম এই ভেবে যে [illegible] কাছাকাছি আছে। একটা কেমন নিরাপত্তাবোধ ছিল এবং প্রয়োজন [illegible] দৌড়ে আসবে।

তা নয়, যে কোথায় চলে এলাম [illegible] নতুন গড়ে ওঠা এই শহরতলিতে [illegible] এসেছি।

তবুও মোটামুটি নতুন বাসায় এসে থিতু হয়ে বসেছি।

বাসা বদলের ঝামেলা [illegible] রেশন কার্ড, গ্যাস, ইলেকট্রিক মিটার, টেলিফোন, এমনকী কাগজের হকার, মুদির দোকান এই সব এক ধাক্কায় বদলানো সোজা কথা নয়। কত রকম দৌড়-ঝাঁপ, তদ্বির তদারক। এই বয়সের পক্ষে যথেষ্টই খাটুনি।

তবু মাস দুয়েকের মধ্যে প্রায় সব কিছুই সড়গড় হয়ে এসেছে। মোটামুটিভাবে বলতে পারি, ভাল আছি। ভালই আছি। একটা ভাল থাকার ভঙ্গিতে একটা নতুন রুটিনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। [illegible] ধরাবাঁধা কিছু ব্যাপার নয়, নিস্তরঙ্গ একটা জীবন।

(কিন্তু সম্পাদকমশায়, এতে মোটেই গল্প হচ্ছে না। 'জনৈক অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়ের আত্মবিলাপ' কিংবা 'বুড়ো বাবুর দিনলিপি' নামে এ রকম রচনা আপনার পত্রিকায় না হলেও ছোট-খাটো কাগজে প্রকাশিত হতে পারে।

কিন্তু সম্পাদকমশায়, আমি তো পাকা গল্প লিখিয়ে। আপনার কাগজেই এ যাবৎ

অন্তত পঞ্চাশটা গল্প লিখেছি। এমন কোনও পুজোসংখ্যা আছে যেখানে আমি প্রত্যেক বছর গল্প লিখি না।

কিন্তু সম্পাদকমশায়, আপনি আমার সুহৃদ না হতে পারেন আপনি অবশ্যই আমার শুভানুধ্যায়ী। আপনি কত কিছু নিয়ে ভাবেন। আমাকে নিয়েও একটু ভাবুন। আমার এমন অবস্থা কেন হল? সে কি শুধু চাকরি খতম, বাসা বদল বলে?

সে যা হোক, এবার ধারাবিবরণীতে ফিরে যাই। আগে সকালবেলায় প্রথম কাজ ছিল হাঁটা। ভোরবেলায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে হাঁটতে বেরোতাম। যখন যে পাড়ায় থেকেছি, সেই রকম হেঁটেছি। কখনও ফুটপাথ ধরে সকালবেলায় খালি রাস্তায় হেঁটেছি, কখনও বাড়ির কাছের পার্কে বা স্কোয়ারে। দশ-বারো বছর লেকের চারপাশে হেঁটেছি। কাছাকাছি থাকার সুবাদে বছর দশেক ময়দানেও হেঁটেছি।

মর্নিং ওয়াক কিন্তু শুধু ওয়াক নয়। এটা এক ধরনের মর্নিং ক্লাব। বহু লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, পরিচয় ঘটে। নানা রকম যোগাযোগ, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। একটু হাসি-ঠাট্টাও হয়।

এখানে এসেও, বাসা গুছিয়ে নেওয়ার পরে, দিন পনেরো বাদে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। পুরনো অভ্যাস যাবে কোথায়?

তা ছাড়া এই নতুন অঞ্চলটা হাঁটার পক্ষে অনুপম। রাস্তাঘাট ফাঁকা, মোটামুটি পরিষ্কার। আলো-বাতাস সুপ্রচুর। পরিবেশ দূষণ তুলনামূলকভাবে কম।

প্রথম দিন হাঁটতে বেরিয়েই যাঁদের সঙ্গে দেখা হল তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার পূর্ব-পরিচিত। তাঁদের সঙ্গে কখনও দেখা হবে ভাবিনি। কারও কারও সঙ্গে বা অধীনে আমি একসময় কাজ করেছি। তাঁদের কথা কবে ভুলে গিয়েছিলাম, এমনকী তাঁরা যে এখনও আছেন তা পর্যন্ত কখনও ভাবিনি।

তাঁদের অনেককে এক সঙ্গে দেখে আমি সেই আলো-আঁধারি ভোরবেলায় কেমন বিচলিত হয়েছিলাম, তাঁরাও তেমনই উল্লসিত হয়েছিলেন।

আদিত্যবাবু। এঁর সঙ্গে আমি বছর তিনেক কাজ করেছিলাম, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই তারাপদ, তুমিও তা হলে সল্ট লেকে এসে গেলে?' আমি মৌনভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করলাম।

আরেক ভদ্রলোক, ঠিক ভদ্রলোক নন একদা সাহেব ছিলেন, আমার চেয়ে তিন ধাপ ওপরে চাকরি করতেন, যখন তিনি অবসর নেন বছর কুড়ি আগে, মুখের বাঁধানো দাঁতজোড়া জিব দিয়ে ভাল করে সেট করতে করতে বললেন, 'আরে মিস্টার রায়, আপনি দেখছি ভয়ঙ্কর মোটা হয়ে গেছেন।'

এ রকম কথা সাতসকালে শুনতে আমার ভাল লাগে না। বলতে পারতাম, 'ভয়ঙ্কর মোটা হয়েছি তো বেশ করেছি। তাতে কার কী? আপনার খেয়ে-পরে তো মোটা হইনি।' তা না বলে অন্যভাবে বললাম, 'ভয়ঙ্কর মোটা হইনি। কিছুটা মোটা হয়েছি। ভয়ঙ্কর মোটা হলে কি আর এই পনেরো বছর বাদে চিনতে পারতেন?'

আমার এই বোকা রসিকতায় ওঁরা সকলেই আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক এই সময়ে আমি চিরকাল যে রকম প্রগলভ আচরণ করেছি তাই করে ফেললাম, মুখ ফসকিয়ে বলে ফেললাম, 'স্যার আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবিনি।'

স্যার বললেন, 'কেন?'

আমি বললাম, 'আমার কেমন একটা ধারণা ছিল আপনারা কেউ নেই। এমনকী কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনাদের কারও কারও মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অফিসে শোকসভা করেছি, ঘণ্টা দুয়েক আগে অফিস ছুটি দিয়েছি।'

জারুল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নবোদিত সূর্যের রশ্মি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর শালিকেরা হুটোপুটি করছে, একটু উত্তুরে হাওয়া দিয়েছে, একটু শীত-শীত ভাব। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আমার কথা শুনে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। সব নিস্তব্ধ, শুধু দূরে একটা ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, অন্য এক স্যার বললেন, 'বুড়ো হয়ে তোমার একটুও লাভ হয়নি। তুমি সেই একই রকম ফাজিল রয়ে গেলে।'

আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম, বুড়ো হয়ে সত্যি কী লাভ হল। এবং ওঁরা সবাই সত্যি জীবিত কি না।

ফল হল, আমি প্রাতভ্রমণ করা ছেড়ে দিলাম। আরও দু-চারদিন যে চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু পরিণতি একই হয়েছে। যাঁরা নেই বলে জানি, তাঁদের সঙ্গেই ক্রমাগত দেখা।

কিন্তু আমি তো অসামাজিক জীব নই। চিরকাল সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে চলতে ভালবাসি। সুতরাং নতুন পরিচয় হতে লাগল।

চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর কাছে আমি একটা নতুন হিসেব পেলাম। জীবনের এ হিসেবটা এর আগে ভাবিনি।

চিরঞ্জীববাবু থুরথুরে বুড়ো। বাইশ বছরের পেনশনার। চাকরিতে ঢুকেছিলেন অভঙ্গ বঙ্গের মুসলিম লিগ আমলে, ইংরেজের যুগে। পুলিসের দারোগা হয়ে ঢুকে ছোট সাহেব হয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

সাধারণত পুলিসের লোকেরা রিটায়ার করার পরে কখনও বলতে চান না পুলিসের চাকরি করতেন, বড় জোর বলেন, 'সরকারি কাজ করতাম।' সেই জন্যে বাড়ির নেমপ্লেটে অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার থেকে মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন সার্জন, কৃষি বিভাগের উপ অধিকর্তা লেখা থাকে কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস বা পুলিসের ডেপুটি সুপার কিংবা দারোগা—এসব দেখতে পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীববাবু অবশ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর প্রতিবেশিনী এক দুশ্চরিত্রা মহিলার উল্লেখ করে নিজের অক্ষমতার কথা বলে জানালেন, 'চাকরির প্রথম জীবনে বড়তলা থানার দারোগা ছিলাম, প্রচুর বেশ্যা পিটিয়েছি।'

তাঁর কথা শুনে আমি আঁতকিয়ে উঠলাম, বললাম, 'নতুন যুগ। ভেবেচিন্তে ভালভাবে কথা বলুন। বলুন, প্রচুর যৌনকর্মীকে নিপীড়ন করেছি।'

চিরঞ্জীববাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশায়। পুলিসে কাজ করলে কী হবে আমার স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল না। নিপীড়ন টিপীড়ন নয়, কর্ম-টর্ম করিনি, স্রেফ পিটিয়েছি।'

এই চিরঞ্জীববাবুই আমাকে বুঝিয়েছিলেন, আমি দুগ্ধ পোষ্য, নাবালক। নিতান্তই জুনিয়র, এক বছরও হয়নি রিটায়ার করেছি। রিটায়ারদের মধ্যে পর্যন্ত সিনিয়রিটি আছে। কী চাকরি ছিল, কত বড় চাকরি তা নয়। কতদিন হল রিটায়ারের পর সেটাই একমাত্র

বিবেচ্য। এর পরে প্রমোশন পরলোকে। তবে যমরাজা এই সিনিয়রিটি খুব একটা মর্যাদা দেন বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, 'যমরাজের কাছে এ বিষয়ে একটা ডেপুটেশন দিলে হয় না।' তিনি আমার এই প্রস্তাবে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না।

চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গেই একদিন এসেছিলেন বনবিহারীবাবু। সার্থক নাম রেখেছিলেন তাঁর গুরুজনেরা। তিনি বনদপ্তরে দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর কাজ করেছিলেন।

বনবিহারীবাবু চিরঞ্জীববাবুর থেকে বছর পাঁচেকের জুনিয়র। তিনি কেমন থপথপ করে হাঁটেন। এমনিতে শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভাল। লাঠি ব্যবহার করেন না, আজকাল কেই বা করে। কিন্তু বনবিহারী যখন হেঁটে আসেন, দূর থেকে মনে হয় তিন পায়ে হেঁটে আসছেন। তার একটা বড় কারণ অবশ্য তাঁর আভূমিলম্বিত দীর্ঘ কোঁচা। তিনি এখনও সামান্য সংখ্যক ধুতিপরিয়েদের দলে।

বনবিহারীবাবুর প্রধান গুণ কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা। এই বয়েসেও সব বিষয়ে, বিশেষ করে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যে সব মোটা খবর বেরোয়, সেই সব নিয়ে তাঁর নানা প্রশ্ন।

সম্প্রতি গণেশ ঠাকুরের দুধ পানের সময় এবং এর পিঠোপিঠি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বনবিহারীবাবু আমাকে খুব অত্যাচার করেছেন। দুগ্ধ পানের মহাদিনের পরের দিন সকালে বনবিহারীবাবু এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো কিছুদিন এলগিন রোডে ছিলেন?'

আমি বললাম, 'ঠিক এলগিন রোডে নয়, কাছেই গোখেল রোডে বছর দেড়েক ছিলাম এক সময়ে।'

বনবিহারীবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি শুনেছেন ওই গোখেল রোডের মোড়ের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে গণেশ ঠাকুর ফার্স্ট হয়েছে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফার্স্ট হয়েছে? মানে?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'লোকেরা বলছে ওই গণেশটাই সবচেয়ে বেশি দুধ খেয়েছে। ডানকুনি থেকে মাদার ডেয়ারি স্পেশ্যাল এক গাড়ি দুধ পাঠিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'তা কী করে হয়?'

কিন্তু সূর্যগ্রহণের সময় এত সহজে পরিত্রাণ পাইনি। গ্রহণের আগের দিন এসে বললেন, 'জানেন গ্রহণের সময় ভেড়ারা ঘাস খায় না। কাগজে বেরিয়েছে।'

আমি জানতাম না, চুপ করে রইলাম। কিন্তু বনবিহারীবাবু চুপ করে থাকার লোক নন। কিছুক্ষণ ধরে বার বার বলে যেতে লাগলেন, 'ভেড়ারা পর্যন্ত গ্রহণ চলাকালীন ঘাস মুখে দেয় না, আমাদের কি কিছু খাওয়া উচিত?'

বনবিহারীবাবুর অবশ্য একটা গুণ অস্বীকার করা অনুচিত। তিনি শুধু প্রশ্নই করেন উত্তর আশা করেন না। আমি একটি কথা না বললেও চলে যাওয়ার সময়ে বলে যান, 'আপনার সঙ্গে আলোচনা করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার সঙ্গে কথা বলেও সুখ।'

আমি বুঝতে পারছিলাম, এ সুখ আমার বেশিদিন সইবে না।

এ দিকে চিরঞ্জীববাবু বনবিহারীবাবুকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছেন। আজকাল কালেভদ্রে আসেন। সেও বনবিহারীবাবুকে দেখলে কোনও অজুহাতে কেটে

পড়েন।

সে দিন হঠাৎ দুজনে আবার এক সঙ্গে এলেন। দেখলাম দুজনেই বেশ উত্তেজিত, বিষয় যুবরানী ডায়ানা। আমার ঘরে ঢুকেই চিরঞ্জীববাবু বললেন, তাঁর যৌবন বয়সে ওই মহিলাকে বড়তলা থানা এলাকায় পেলে তিনি পিটিয়ে তক্তা করে দিতেন। বিপথগামীনী রমনীদের ওপর তাঁর খুব রাগ; তদুপরি তিনি ইংরেজ আমলের রাজভক্ত পুলিশ, রাজ পরিবারের অবমাননা তিনি দেখতে পারেন না।

দুই বৃদ্ধের মধ্যে খটাখটি শুরু হয়ে গেল। চিরঞ্জীববাবু রাজপুত্রের পক্ষে আর বনবিহারীবাবু রাজবধূর পক্ষে। উৎকট চেঁচামেচি, প্রায় হাতাহাতি। বাড়িটা যে আমার, আমি যে ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি বসে আছি, সেটা কারও হুঁশ হল না। সুদূর ব্রিটেনের রাজ পরিবারের ঘরোয়া কলহে আমার বৈঠকখানা ঘর গমগম করতে লাগল।

ঘণ্টা খানেক পরে রাগে গরগর করতে করতে, আমার টেবিলের ওপরে রাখা শ্রীযুক্তেশ্বরী ডায়ানার আবক্ষ চিত্র-সম্বলিত সেদিনের দৈনিক পত্রিকাটি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে চিরঞ্জীববাবু নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এর পরে আরও আধ ঘণ্টা বনবিহারীবাবু কোনও কথা না বলে মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। শুধু যাওয়ার আগে একবার ক্ষীণ প্রশ্ন করলেন, 'ডায়ানা কি দোষী? তিনি কি কুলটা?' আমি কিছু বললাম না। কি বলব?

যাওয়ার সময়ে বনবিহারীবাবু বলে গেলেন, 'দেখুন আপনি সমস্ত বিষয়ে এত খবর রাখেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করে এত উপকার হয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

আমি কী আলোচনা করলাম, কখন করলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আবার জীবনে উত্তেজনা ফিরে আসছে।

সকালে হাঁটা আবার শুরু করেছি। টগবগ করতে করতে বাড়ি ফিরে আসি। ফিরে এসে কিংবা পরে দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় কখনও বনবিহারীবাবু, কখনও চিরঞ্জীববাবু, কখনও বা দুজনেই একসঙ্গে আসেন। আমি কিছু বলি বা না বলি, যাওয়ার সময়ে আমার সুচিন্তিত মতামতের জন্যে তাঁরা ধন্যবাদ জানাতে ভোলেন না।

গিরগিটি

(আন্তন চেকভ অবলম্বনে)

সদর থানার ছোট দারোগাবাবু গর্জন সরকার দুপুরের রোদে বেরিয়েছেন। বাজারের মধ্যে ঘুরছেন, দোকানপাট থেকে দৈনন্দিন তোলা আদায় করছেন।

গর্জন সরকারের সঙ্গে রয়েছে তাঁর বশম্বদ সেপাই, যার দু'হাতে দুটো বড় থলে। থলে দুটো প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে তরিতরকারি ইত্যাদিতে। একটা ঝোলার ওপরের দিকে একটা বড় চাল কুমড়ো, একটা কাতলা মাছের মাথা ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। কিছু লকলকে লাউডগা অন্য একটা ঝোলার বাইরে বেরিয়ে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

দুপুর প্রায় গড়িয়ে এল। এখন বাজার ভাঙার সময়। দোকানপাট শূন্য। দোকানিরা নিজেদের হিসেব মেলাচ্ছে, আর ভয়ে ভয়ে গর্জন সরকারের চাহিদা পূরণ করছে।

হঠাৎ পাশের গলি থেকে একটা খোঁড়া কুকুরছানা তিন পায়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল। তার পিছে পিছে ছুটে এলো ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা একটা লোক।

লোকটা 'ধর ধর' বলতে বলতে কুকুরটার পিছনে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছিল। তার চিৎকারে শূন্যপ্রায় দোকানঘরগুলিতে যে সামান্য কয়েকজন খদ্দের ছিল এবং দোকানদারেরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে এসে ভিড় জমালো। হতভাগ্য খোঁড়া কুকুরটা লোকটার সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠল না। লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটার পিছনের একটা পা জাপটিয়ে ধরল। কুকুরটা 'কেঁউ কেঁউ' করে চেঁচিয়ে উঠল। সমবেত-জনতা হল্লা করে উঠল, 'কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

যে লোকটা কুকুরের পা জাপটিয়ে ধরেছে তাকে গর্জন দারোগা চেনেন, লোকটার নাম ঘোঁতন নন্দী। এই বাজারেই স্যাকরার দোকান রয়েছে। আর কুকুরটা নেহাতই দো আঁশলা জাতের এক বাচ্চা কুকুর।

ঘোঁতনের হাতে ধরা পড়ে কুকুরটা থরথর করে কাঁপছিল। এদিকে দেখা যাচ্ছে ঘোঁতনের কবজির পাশ থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে আর ঘোঁতন চেঁচাচ্ছে, 'মেরে ফেলেছে, কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে।'

চারদিকে ভিড় জমে গেছে। সবাই গর্জন দারোগাকে চেনে। এরকম অবস্থায় তাঁর পক্ষে চুপ করে থাকা মানানসই নয়। তিনি হুমকি দিয়ে সঙ্গের সেপাইকে বললেন ভিড় সামলাতে আর সেই সঙ্গে ভিড় ঠেলে নিজে ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? এত চেঁচামেচি কিসের?'

ঘোঁতন রক্তাক্ত কবজিটা দেখিয়ে বলল, 'হুজুর, বাজারের মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই কুকুরের বাচ্চাটা কোথা থেকে ছুটে এঁসে আমার হাতটায় কামড়িয়ে দিল, এখনও দরদর করে রক্ত পড়ছে। পাগলা কুকুর হলে কী সাংঘাতিক কথা বলুন, চোদ্দটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

গর্জন দারোগা গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কুকুরের বাচ্চাটা কার? নিশ্চয় বাজারেরই কেউ পুষেছে?' তারপর সেপাইকে বললেন, 'এ কুকুর খ্যাপা না হয়ে যায় না। এটাকে এখনই মেরে ফেলা দরকার। তল্লাশ লাগাও তো এ কুকুরটা কার?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'মনে হচ্ছে, এটা এস পি সাহেবের কুকুরছানা। কাল বিকেলে সাহেবের বাংলোর সামনের বাগানে খেলা করছিল।'

বাজারের রাস্তার ওপাশে একটা পার্ক। পার্কের ওপারে অফিসারদের বাংলো, তার প্রথমটাই এস পি সাহেবের।

মুহূর্তের মধ্যে গর্জন দারোগা সচেতন হলেন, তাড়াতাড়ি ঘোঁতনের হাত ছাড়িয়ে কুকুরছানাটাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'এ্যাঁ। বড় সাহেবের কুকুর। এই ঘোঁতনা, তুই বলছিস রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলি তা হলে তোর হাতে কুকুর কামড়ালো কী করে? এইটুকু একটা বাচ্চা কুকুর তোকে হঠাৎ কামড়াতে গেল কেন?' বলে গর্জন কুকুরটাকে চু-চু করে আদর করতে লাগলেন।

পিছন দিক থেকে ভিড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাজারের একজন বলল, 'কুকুরটার

কোনও দোষ নেই হুজুর। ওটা ঘোঁতনের দোকানের সামনে বসে ছিল। হঠাৎ ঘোঁতন মজা করে ওর নাকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে গিয়েছিল, তখন কুকুরটা ওকে কামড়ে দৌড় দেয়। ঘোঁতন সঙ্গে সঙ্গে একটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে মারে। তাই কুকুরটা খোঁড়াচ্ছে।'

গর্জন করে উঠলেন গর্জন সরকার, 'এইটুকু একটা ছোট্ট বাচ্চা কুকুরকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে, চেলাকাঠ ছুঁড়ে মেরেছে। এই সত্যগোপাল, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, ঘোঁতনাকে অ্যারেস্ট কর, ওটাকে আজ হাজতে ডাণ্ডাপেটা করব।'

সত্যগোপাল গর্জন দারোগার সেপাই-এর নাম। সে দুদিন আগেই বড়সাহেবের বাংলোতে ডিউটি করে এসেছে, সে বলল, 'স্যার। এ কুকুর বড় সাহেবের নয়। আমি সোমবারই বড় সাহেবের বাড়িতে ডিউটি দিয়েছি। এ তো বাচ্চা কুকুর, এরকম দোআঁশলা কুকুর বড়সাহেবের নেই। বড়সাহেবের সব বড় বড় কুকুর।'

সত্যগোপালের এই কথা শোনামাত্র গর্জন দারোগা কুকুরছানাটাকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কুকুরছানাটা রাস্তায় পড়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল, তিনি সপাটে একটা লাথি লাগালেন সেটাকে, তারপর সত্যগোপালকে নির্দেশ দিলেন সেটাকে তখনই মেরে ফেলতে।

কিন্তু এই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে আবার কে একজন বলে উঠলো, 'কিন্তু এ কুকুবটাকে কাল আমি এস পি সাহেবের বাংলোর মাঠে দেখেছি।'

অন্য একজন বলল, 'এটা এস পি সাহেবের শ্বশুরমশায়ের কুকুর। তিনি কাল সকালেই জামাইয়ের কাছে এসেছেন।'

এস পি সাহেবের শ্বশুর বজরঙ্গ চৌধুরি, জবরদস্ত লোক, এম পি। তাঁকে সবাই চেনে, সমীহ করে। তাঁর নাম শুনেই গর্জন সরকার আবার কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তু-তু করতে লাগলেন। তারপর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, সামনের ময়রার দোকানে কড়াইয়ের দুধ জ্বাল হচ্ছিল, সেখান থেকে বড় দু'হাতা দুধ নিয়ে একটা মাটির ভাঁড়ে করে কুকুরছানাটাকে খাওয়ালেন। কুকুরটা ভয়ে খেতে চাইছিল না। দোকান থেকে রসগোল্লার রস নিয়ে দুধে ভালো করে মিশিয়ে দিলেন।

ভিড় থিতিয়ে এসেছে। দুধ খাওয়ানোর পর্ব শেষ হলে বাজা' বর তোলা ভর্তি থলে দুটো ময়রার দোকানে রেখে গর্জন কুকুরছানা কোলে করে সত্যগোপালকে নিয়ে বড়সাহেবের বাংলোর দিকে রওনা হলেন বজরঙ্গ চৌধুরিকে কুকুরছানা দিয়ে আসতে।

এস পি সাহেবের বাংলোর একটু আগে রাস্তার ওপরে সাহেবের বাবুর্চির সঙ্গে দেখা। তাকে গর্জন কোলের কুকুরছানাটা দেখিয়ে বললেন, 'সাহেবের শ্বশুরমশায়ের এই কুকুরছানাটা বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাজে লোক অত্যাচার করছিল এটার ওপর। অনেক কষ্টে নিয়ে এলাম। চৌধুরিসাহেবকে দিয়ে যাই।'

বাবুর্চি বললো, 'সে কী? চৌধুরিসাহেব তো আজ সকালেই চলে গেছেন। তাঁর কুকুর তাঁর সঙ্গেই গেছে। সেটা তো একটা বিলিতি কুকুর। এরকম দোআঁশলা কুকুর তাঁর হবে কেন?'

একথা শুনে গর্জন দারোগা কুকুরছানাটাকে রাস্তার পাশে ড্রেনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের জামা ঝাড়তে লাগলেন আর সেপাই সত্যগোপালকে বললেন, 'কুকুরছানাটাকে ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেল।'

জুতো
(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

ডাক বিভাগের অনেক কাজ। সবাই তার খবর রাখে না। শুধু চিঠি বিলি করা বা খাম-পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট বিক্রি করা নয়; সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, চাকরির স্ট্যাম্প, পোস্টাল অর্ডার আজকাল অনেক কাজই পড়েছে ডাক বিভাগের ঘাড়ে।

এ সব ছাড়াও আরও দুয়েকটা গোলমেলে কাজ আছে ডাক বিভাগের। সেগুলো যার প্রয়োজন সে ছাড়া আর কেউ জানে না। ঠিক এইরকম একটি কাজ হল আইডেনটিটি কার্ড বা পরিচয়পত্র প্রদান করা।

যারা সেলসম্যানের কাজ করে, কিংবা মেডিকেল রিপ্রেজেনটিটিভ অথবা ইন্সিওবেন্স দালাল তাদের নানা জায়গায় শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়। তারা যখন আস্তানা ছেড়ে বেরোয় একেক সময় একেক জায়গায় থাকে তখন তাদের ঠিকানা হয়, কেয়ার অফ অর্থাৎ প্রযত্নে পোস্ট মাস্টার, বধর্মান, জলপাইগুড়ি বা পাটনা। এই রকম ঠিকানাতেই আসে নির্দিষ্ট ব্যক্তির চিঠিপত্র, টাকা পয়সা, ইন্সিওর মানিঅর্ডার পর্যন্ত।

ডাকঘরের দেয়া আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে নির্ধারিত কাউন্টারে গিয়ে প্রাপককে সেই পরিচয় দেখিয়ে নিজের জিনিস উদ্ধার করতে হয়।

ঘড়িমোড় শহরের বড় ডাকঘর সকাল দশটায় খোলে। আজ দশটা বাজতে না বাজতেই কৃতান্তবাবু ডাকঘরের সদর দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কৃতান্তবাবু একটা বিখ্যাত দাঁতের মাজন কোম্পানির দুঁদে সেলস অফিসার। তাঁব কোম্পানির ডবল হনুমান মার্কা কালো মাজন কে না ব্যবহার করে। খুবই নামডাক সে মাজনের, রাজা-উজির থেকে একেবারে যাকে বলে চাষাভুষো, রাস্তার লোক সবাই ডবল হনুমান মাজনের খরিদ্দার। কিন্তু আজ কিছুদিন হল তিন বিল্লি নামক এক লাল রঙেব মাজন বেরিয়েছে। সিনেমায়, টিভিতে, খবরের কাগজে নানা রঙিন বিজ্ঞাপন আব চটকদার গান দিয়ে মাৎ করে দিয়েছে তিন বিল্লি কোম্পানি।

তিন বিল্লি কোম্পানি অনেক টাকা নিয়ে বাজারে নেমেছে। ডবল হনুমান কোম্পানিরও বনেদি ব্যবসা, তাঁদেরও টাকার অভাব নেই। কিন্তু তাঁরা খুব একটা বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে না। তাঁদের ধারণা বাঁধা বাজার, মাল ছাড়লেই বিক্রি হবে।

কিন্তু কৃতান্তবাবু জানেন, তা নয়। এ বাজারে বিজ্ঞাপন ছাড়া কিছু হবার নয়। এ কথাই তিনি কয়েকদিন আগে মালিকদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। মালিকেরা থাকেন এলাহাবাদে। এতদিনে তাঁদের উত্তর আসার সময় হয়ে গেছে। কৃতান্তবাবু তাই আজ ডাকঘরে এসেছেন খোঁজ নিতে চিঠিটা এল কিনা।

আজ ঘড়িমোড় বড় ডাকঘরের কাউন্টারে এসে কৃতান্তবাবু দেখলেন তাঁর পুরনো পরিচিত সদাশিববাবু নামক কেরানির জায়গায় একজন তরুণী বসে রয়েছে। তরুণীটি সুন্দরী বটে কিন্তু তার মুখে কেমন একটা শক্ত ভাব।

কৃতান্তবাবু কাউন্টারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সদাশিববাবু কোথায়?' তরুণীটি উত্তর

দিল, 'কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'এই কাউন্টারে আগে যিনি বসতেন।'

তরুণীটি ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল, 'তিনি রিটায়ার করে গেছেন।'

কৃতান্তবাবু তখন বললেন, 'আমার নাম কৃতান্ত চক্রবর্তী, আমি ডবল হনুমান দাঁতের মাজন কোম্পানির সেলস অফিসার। একটু দয়া করে দেখবেন আমার নামে কোন চিঠিপত্র আছে কিনা।'

মেয়েটি গম্ভীরমুখে বলল, 'আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা দেখান।'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'দেখুন আইডেনটিটি কার্ডটা দেখানোয় একটু অসুবিধে আছে। সদাশিববাবু, মানে আপনার আগে যিনি এখানে বসতেন তিনি...'

কৃতান্তবাবুকে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিল না নতুন মেয়েটি, সে কাঠকাঠ গলায় বলল, 'আইডেনটিটি কার্ড না দেখালে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না।'

রীতিমত বিপাকে পড়লেন কৃতান্তবাবু। এ রকম একটা অবস্থার যে সম্মুখীন হতে হবে এ কথা তিনি ভাবেননি।

কৃতান্তবাবুর যে আইডেনটিটি কার্ড নেই তা নয়। তাঁর সঙ্গেই সেটা আছে। কিন্তু তিনি খুব সাবধীন লোক। চোর-পকেটমার যাতে কিছু করতে না পারে সেই জন্যে টাকা পয়সা, আইডেনটিটি কার্ড সব কিছু মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে সেই মোজাসুদ্ধ শক্ত করে বাঁধা ফিতেওলা জুতো পরেছেন। জুতো না খুললে সেই আইডেনটিটি কার্ড বেরোবে না।

এখন আর কোন উপায় নেই। এখানেই জুতো খুলে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করতে হবে।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন কৃতান্তবাবু। কাউন্টারের এদিকে একটাও বসার জায়গা নেই, থাকবার কথাও নয়। সুতরাং কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতো খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

সবে ডান পা তুলে ফিতের গিঁট খুলতে গেছেন, কাউন্টারের ওপারের মেয়েটির কাছ থেকে বাধা পেলেন তিনি, মেয়েটি প্রায় ধমকিয়ে বলল 'কাউন্টার ছেড়ে দাঁড়ান।'

কৃতান্তবাবু কাউন্টার ছেড়ে সরে এলেন। কিন্তু কোনও কিছুতে ঠেস দিয়ে না দাঁড়াতে পারলে শূন্যে এক পা তুলে ফিতেওলা জুতো খোলা কৃতান্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

কী আর করবেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে সামনের মেঝের ওপরে পেতে সেই রুমালে বসলেন কৃতান্তবাবু। তাঁর এই হঠাৎ বসে পড়া দেখে অন্য যাঁরা পোস্টাফিসে নানা কাজে এসেছেন, এবার এসে তাঁর চারপাশে ভিড় করলেন।

'কি হল মাথা ঘুরছে নাকি?' ভিড়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল। অন্য একজন বলল, 'হার্টের ব্যামো আছে, বোধ হয়।' তৃতীয় এক ব্যক্তি সুরসিক, সে বলল 'একে বলে হ্যাংওভার। কাল রাতে মদের মাত্রাটা খুব বেশি হয়েছিল।'

সে যা হোক কৃতান্তবাবু পাকা লোক, এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তিনি আপনমনে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন। তাই দেখে আরেকজন মন্তব্য করল, 'নিশ্চয়ই ব্লাডপ্রেসার আছে। জুতো-মোজা না খুললে আরও বাড়বে।'

আজ কপাল মন্দ কৃতান্তবাবুর। এই সব বাজে লোকের উলটোপালটা কথায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন একটু। এর মধ্যে কখন জুতোর ফিতের আলগা গিঁটটা হাত ফসকিয়ে

বিষগিঁট হয়ে গেছে। কিছুতেই আর খোলে না।

এ জুতোটা ডান পায়ের। যতদূর মনে পড়ছে সকালে মোজা পরার সময় এই পায়েই আইডেনটিটি কার্ডটা ঢুকিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কী উপায়? বিষগিঁট খোলা অসম্ভব। ফিতে কেটে ফেলা ছাড়া গতি নেই।

চার পাশে সমবেত জনতার কাছে কৃতান্তবাবু আবেদন জানালেন, 'আপনাদের কারও কাছে একটা ছুরি হবে।'

কৃতান্তবাবুর এই অনুরোধ শোনা মাত্র সমবেত জনতার মধ্যে একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কে একজন আঁতকিয়ে উঠে প্রশ্ন করল, 'দাদা কি সুইসাইড করবেন।'

কপাল চাপড়িয়ে উঠলেন কৃতান্তবাবু। বললেন, 'আপনারা অত মাথা ঘামাবেন না। সুইসাইড-টুইসাইড নয়। জুতোটা খুলবো ফিতে কেটে তাই ছুরি চাইছি।'

চারদিকের ভিড়ে এবং ফিতে নিয়ে টানাটানি করার পরিশ্রমে কৃতান্তবাবু দরদর করে ঘামছিলেন। এর মধ্যে একজন লোক কোথা থেকে এক টুকরো মরচে ধরা ভাঙা ব্লেড নিয়ে এসে কৃতান্তবাবু কিছু বুঝবার আগেই বাঁ পায়ের গিঁটটা কেটে দিল।

বাঁ পায়ের গিঁটটা আলগাই ছিল, সেটা কাটার কোনও দরকার ছিল না। কী.আর করবেন কৃতান্তবাবু, লোকটিকে দিয়ে ডান পায়ের ফিতের গিঁটটাও কাটালেন।

এর পরে শুরু হলো আসল সমস্যা।

এমন শক্ত ও আঁট হয়ে ডান পায়ে জুতোটা আটকে রয়েছে যে মোজাসুদ্ধ পাটা জুতোর বাইরে আনতে হিমসিম খেয়ে গেলেন কৃতান্তবাবু। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তাঁর, তিনি হাঁফাতে লাগলেন, তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

কৃতান্তবাবুর সাহায্যে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। তিনি এ অঞ্চলের নাম করা ব্যায়ামবীর, একাধিকবার ভারতশ্রী দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। তিনি মাটিতে উবু হয়ে বসে হাত লাগালেন কৃতান্তবাবুর জুতোয়।

এক হ্যাঁচকা টানে জুতোসুদ্ধ ডান পাটা উঠে গেল ওপরের দিকে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন কৃতান্তবাবু, তাঁর কপালটা ঠুকে গেল শক্ত সিমেন্টের মেঝেতে। তিনি 'বাপরে, মরে গেলাম' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর আর্তনাদ শুনে রণে ভঙ্গ দিলেন ব্যায়ামবীর। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থানীয় স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশায়। তিনি স্কুলে যাওয়ার পথে একটা পোস্টকার্ড কিনতে ডাকঘরে ঢুকেছিলেন, এখানে ভিড় দেখে জমে গেছেন। এগারোটা যে বাজে, এখনই যে ক্লাসের ঘণ্টা পড়বে, সে দিকে তাঁর খেয়াল নেই।

ব্যায়ামবীরের পরাজয় দেখে তিনি মুচকি হেসে এগিয়ে এলেন, মুখে বললেন, 'গায়ের জোরে সব কিছু হয় না। একটু বুদ্ধি খাটাতে হয়', এই বলে তিনি কৃতান্তবাবুর জুতোর গোড়ালি ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, এতে কিছুই হল না। ইতিমধ্যে মেজেতে কপাল ঠুকে যাওয়ার ফলে কৃতান্তবাবুর কপালের মধ্যেখানে একটা বড় মারবেলের মতো গুলি ফুলে উঠেছে।

এদিকে মাস্টারমশায়কে ব্যর্থ হতে দেখে অবশেষে ভিড়ের মধ্য থেকে প্রায় আট-দশ জন এগিয়ে এসে কৃতান্তবাবুর জুতোয় হাত লাগিয়েছে। বিহ্বল, বিমূঢ় অবস্থায় নিজেকে জনতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কৃতান্তবাবুর গত্যন্তর নেই।

কাহিনী বিলম্বিত করার মানে হয় না। অনেক টানাটানিতে সমবেত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কৃতান্তবাবুর ডানপায়ের জুতো খুলল এবং খোলার মুহূর্তে জুতো হাতে সাতজন লোক ছিটকিয়ে গিয়ে পড়ল কাউন্টারের দেয়ালে আর কৃতান্তবাবু প্রায় উড়ে গিয়ে পড়লেন ঘরের অন্যপ্রান্তে।

এখনও কিন্তু কেউ জানে না কী প্রয়োজনে কৃতান্তবাবুর জুতো খোলা হল। সবাই কৃতান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

একটু তাল সামলিয়ে নিয়ে কৃতান্তবাবু এবার পায়ের মোজায় মনোনিবেশ এবং হস্তক্ষেপ করলেন। মোজা খোলা তেমন কঠিন নয়। মোজা খুলে কৃতান্তবাবু সেটা উপুড় করে মেজেতে ঢাললেন। কয়েকটা দশ টাকার নোট, একটা পঞ্চাশ টাকার আর একটা একশো টাকার নোট, একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট মোজার মধ্য থেকে বেরল।

কিন্তু আইডেনটিটি কার্ডটা মোজার মধ্যে নেই। তা হলে তো ভুল হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই সেটা বাঁ পায়ের মোজার মধ্যে রয়েছে।

এতক্ষণে সবাই বুঝতে পেরেছে কৃতান্তবাবু কিছু খুঁজছেন। এবং কৃতান্তবাবুর মুখ দেখে এটা বোঝা গেল যে তিনি যে জিনিসটি খুঁজছেন, সেটি পাননি।

জনতার চিন্তাধারা অনুমান করে কৃতান্তবাবু ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘জিনিসটা বোধ হয় বাঁ পায়ের মোজার মধ্যে রয়েছে।’

এই কথা শোনামাত্র আবার ছয়-সাতজন লোক কৃতান্তবাবুর বাঁ পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফিতে আগেই কাটা কিন্তু জুতোটা টান দেবার আগেই পা থেকে বেরিয়ে এল। এই আকস্মিকতার জন্যে জনতা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল জুতো খোলার জন্যে। ফলে জুতোটা হাতে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসতেই তারা ধপাস করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল একে অন্যের ওপরে।

জনতার একজন ক্ষিপ্ত হয়ে কৃতান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা কী হল? দাদার কি দু-পায়ের সাইজ দু'রকম নাকি? ও পায়ের জুতো এত শক্ত আর এ পায়ের জুতো এত ঢিলে?’

কৃতান্তবাবু জবাব দিলেন, ‘পা নয়। আমার দু-পায়ের জুতো দু'রকম সাইজের।’

সমবেত কণ্ঠে কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, ‘মানে?’

কৃতান্তবাবু সংক্ষিপ্ত করে জানালেন, দোকানদার ভুল করে দিয়েছিল। একটা নয় নম্বর, একটা সাত নম্বর।’

একজন বলল, ‘পালটিয়ে নিলেন না কেন?’

কৃতান্তবাবু কোনও জবাব দিলেন না, তিনি কী করে বোঝাবেন তার সেলসের চাকরি, শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়। যে শহরে জুতো জোড়া কেনেন, টের পান সে শহরের থেকে চলে আসার পর। তখন পাঁচশো মাইল উজিয়ে জুতো পাল্টাতে যাওয়া সম্ভব নয়, লাভও নেই।

যা হোক, এবার মোজার ভেতর থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা পেয়ে গেলেন কৃতান্তবাবু। জুতো মোজা মেঝেতে ফেলে খালি পায়ে তিনি কাউন্টারের কাছে গিয়ে মেয়েটিকে আইডেনটিটি কার্ডটা এগিয়ে দিলেন।

মেয়েটি আজ প্রথম চাকরিতে ঢুকেছে। কৃতান্তবাবুর কার্যকলাপ এতক্ষণ সে অবাক

হয়ে দেখছিল। এখন আইডেনটিটি কার্ডটা নিয়ে সামনের ড্রয়ারগুলো ভালো করে দেখে সে কৃতান্তবাবুকে কার্ডটা ফেরত দিয়ে শুকনো হেসে বলল, 'সরি। আপনার নামে কোনও চিঠি নেই।'

প্রতিবেশী

(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

পতিতপাবনবাবু আমার নতুন প্রতিবেশী। অল্প কিছুদিন হল তিনি আমাদের এ পাড়ায় উঠে এসেছেন। আমাদের গলির মোড়েই একটা বাড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া করে বসবাস করছেন। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার ভালো করে পরিচয় হয়নি। ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সময় এখনও আসেনি।

এ পাড়ায় উঠে আসার পর প্রথম দিকে একদিন নিজে থেকে এসে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে বলেছিলেন, 'আমার নাম পতিতপাবন ঘোষ, মোড়ের ঐ দোতলা বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে গত মাসে ভাড়া এসেছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম।'

সেদিন কী একটা ব্যস্ততা ছিল। বোধহয় সোভিয়েত ব্যালে নাচের টিকিট কেনার জন্যে লাইন দিতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হয়নি। ভদ্রলোকের সংসারে কে কে আছে, আগে কোথায় থাকতেন, ভদ্রলোক কী করেন কিছুই জানা হয়নি।

তারপরে রাস্তাঘাটে, পাড়ার মধ্যে এখানে ওখানে পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে অল্পবিস্তর দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে দেখে অমায়িক হেসেছেন, হাতজোড় করে নমস্কাব জানিয়ে কুশল বিনিময় করেছেন।

তবে, ঐ পর্যন্তই। ঘনিষ্ঠতা এর থেকে বেশী আর এগোয়নি। দুয়েকবার ভেবেছি একদিন পতিতপাবনবাবুর বাড়িতে গিয়ে ফিরতি সামাজিকতা করে আসব কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজের ঝামেলায় সে আর সম্ভব হয়নি।

বড়দিন থেকে ইংরেজী নববর্ষ পর্যন্ত পুরো আটদিন ছুটি পাওয়া যায় চারদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে। তাই করেছিলাম, চারদিন ছুটি নিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে দীঘা গিয়েছিলাম।

এমনিই সমুদ্র তীর, সমুদ্র আমার খুব পছন্দ। সমুদ্রের জলে স্নান করতেও আমি যথেষ্ট ভালবাসি। এখনও ছুটি ছাটায় সুযোগ পেলেই সমুদ্রের কাছে চলে যাই। শীতের অলস রোদে অনেকক্ষণ রোদ পোহানোর পর সমুদ্রের জলে একটু স্নান, খানিকটা সাঁতার— শীতের দিনেই সমুদ্র আমাকে সবচেয়ে বেশী টানে।

সে যা হোক, দীঘায় পৌঁছে পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রতটে বালির ওপর বসে আছি জলে নামার অপেক্ষায়। জোর ঠাণ্ডা পড়েছিল আগের রাতে, আজ উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে বটে কিন্তু শীতের তেমন ধার নেই, রোদও উঠেছে চমৎকার।

বালির ওপরে শরীর এলিয়ে বসেছিলাম। ঝাউবনের এই দিকটা বেশ নির্জন, আমার খুব পছন্দ। চোখ বুজে রোদ পোহাচ্ছি, হঠাৎ কে যেন আমাকে ডাকল, 'এই যে আপনি?'

চোখ খুলে দেখি পতিতপাবনবাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, গায়ে গরম র‍্যাপার জড়ানো, লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না। চোখবুজে রোদ পোহাচ্ছিলাম। এইবার জলে নামবো স্নান করতে।'

পতিতপাবনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সমুদ্রের জলে স্নান করবেন? সাঁতারও কাটবেন নাকি?

আমার এই বয়েসে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে অহঙ্কার করার বা গর্বিত হওয়ার কোনও মানে হয় না কিন্তু পতিতপাবনবাবুকে না বলে পারলাম না, 'সমুদ্রে স্নান করতে, সাঁতার দিতে আমি ভালোবাসি। সুযোগ পেলেই চলে আসি কলকাতা থেকে।'

আমার পাশে এসে বসলেন পতিতপাবনবাবু। কথায় কথায় জানলাম বেশ কয়েকদিন হল তিনি দীঘায় এসেছেন কী একটা কাজে। কাজের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে কিছু বললেন না, আমিও সদ্য পরিচিত প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অধিক কৌতূহল দেখানো অসঙ্গত বোধ করলাম।

পতিতপাবনবাবু এখানে এসে উঠেছেন আমি যে হোটেলটায় উঠেছি ঠিক তার পাশের হোটেলে। আরও সপ্তাহ দুই-তিনেক থাকবেন।

কথায় কথায় বেলা বাড়তে লাগল। খিদে পেয়েছে। এখন আমার স্নান করতে হবে। সঙ্গে হাত ব্যাগে সমুদ্রে স্নান করার জন্যে কালো হাফপ্যান্ট রয়েছে আমার, একটা তোয়ালেও রয়েছে।

আমি স্নান করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। পতিতপাবনবাবুকে বললাম, 'এবার আমি স্নান করতে নামবো। আপনি সমুদ্রস্নান করবেন না? আমার কাছে হোটেলে একটা এক্সট্রা প্যান্ট আছে। চলুন দুজনে মিলে একসঙ্গে সাঁতার কাটা যাক।'

সমুদ্রে সাঁতার কাটার এই চমৎকার প্রস্তাবে পতিতপাবন রীতিমত আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'ওরে বাবা! ছোটবেলা থেকে জলকে আমি ভীষণ ভয় পাই। নদী বা পুকুর হলে তবু কথা ছিল। এ তো সমুদ্র। মহাসমুদ্র। আদি অন্ত নেই, শুধু জল আর জল! এই পর্যন্ত দ্রুত বলে জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন।'

পতিতপাবনবাবুর অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেললাম। একটু দূরে সমুদ্রের জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পতিতপাবনবাবুকে বললাম, 'ঐ তো মেয়েরা, বাচ্চারা, গিন্নিবান্নি মহিলারা পর্যন্ত শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে। আমার সঙ্গে চলুন, আপনার এত ভয় কিসের?'

আমার প্রস্তাবে পতিতপাবন তিন পা পিছু হটলেন তারপর কাতর কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমার স্বভাবই এই রকম। আমি জল দেখে সত্যিই বড় ভয় পাই।'

আমি বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। আর সাঁতার যদি নাই জানেন কিছু আসে যায় না। সমুদ্রের নোনা জল এমনিতেই ভারি, ডোবা কঠিন আর তাছাড়া সাঁতার যে কোনও বয়েসেই শেখা যায়।'

কিন্তু আমার এই ভাষণে কোনও সুবিধে হল না। পতিতপাবনবাবুর মুখ চোখের

অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম এই মুহূর্তে খুব বেশি চাপ দেওয়া ঠিক নয়। বরং একটু ঢিলে দিলাম, পতিতপাবনকে জানালাম, 'ঠিক আছে আজ থাক। কাল সকাল-সকাল আপনাকে নিয়ে আমি সমুদ্রে নামবো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনার ব্যাপারে পুরোপুরি দায়িত্ব আমার।'

পতিতপাবনবাবু আমতা আমতা করে কেটে পড়লেন। আমিও সাঁতার কাটতে জলে নামলাম। সাঁতার কাটতে কাটতে মনে হল প্রায় অপরিচিত প্রতিবেশীকে জলে নামার জন্যে অতটা জোরাজোরি করা নিশ্চয় ঠিক হয়নি। উৎসাহের আতিশয্যে আমি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

পরের দিন পতিতপাবনবাবুর পাত্তা পাওয়া গেল না। তাঁর হোটেলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলল, খুব ভোরবেলা ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়েছেন।'

বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক কোথাও শিক্ষকতা করেন। ছাত্রদের নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তারপর ভাবলাম, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছেন অথচ জল ভয় পান, সাঁতার জানেন না। যদি কোনও কোনও ছাত্র জলে নেমে তলিয়ে যায় বা ভেসে যায় উনি কী করবেন?

দুদিন পতিতপাবনবাবুকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না। বুঝলাম, আমার ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। তৃতীয় দিন সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শীতের দিনের পক্ষে অস্বাভাবিক অবস্থা। কাল রাতে রেডিয়োতে বলেছে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল হতে পারে, প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার আশঙ্কা রয়েছে।

এই রকম দুর্যোগের দিনে সমুদ্রে নামবো কি নামবো না ভাবছি এমন সময় দেখি ঠিক সামনে পতিতপাবনবাবু দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছেন।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে একেবারে ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'কী জলে নামবেন নাকি? চলুন আমার সঙ্গে।'

আমার প্রস্তাবে চমকে উঠে পতিতপাবন খুব জোরে একটা লাফ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি খপ করে ওঁকে ধরে ফেললাম। তারপর তাঁর হাত ধরে টানতে গিয়ে টের পেলাম তিনি কাঁপছেন, ফাঁসির আসামীকে যখন বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার যে অবস্থা হয় পতিতপাবনবাবুরও এই মুহূর্তে সেই অবস্থা।

পতিতপাবন ভয় পেয়েছেন বটে কিন্তু সামনেই ঘাটের কাছে বেশ কয়েকজন লোক, পুরুষ ও মহিলা ঝড়, বৃষ্টি, রেডিয়োর সতর্ক বার্তা এবং নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অল্প জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছে। একটা একটা করে দৈত্যের মতো ঢেউ তর্জন করতে করতে ছুটে আসছে আর যেন খুব মজার খেলা এইভাবে সেই দৈত্যের পাশ কাটিয়ে তারা মজা করে জলে ডুব দিচ্ছে।

মজা নিশ্চয় খুব কিন্তু এই মুহূর্তে একটা মহাবিপর্যয় ঘটল। একটা বিশাল ঢেউয়ের ঠিক পিছনে*পিছনে আরেকটা বিশালতর ঢেউ আত্মগোপন করে ছিল। স্নানার্থীদের অসতর্কতার সুযোগে সেই পিছনের ঢেউটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

চারদিকে একটা 'হায় হায়' রব উঠল। কিন্তু দেখা গেল সবাই মোটামুটি সামলে নিয়েছে ঢেউয়ের দাপট, শুধু কী করে এক ব্যক্তি হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে প্রায় বিশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকিয়ে পড়েছে। সে যত তীরের দিকে এগোতে যাচ্ছে ঢেউয়ের দোলায় হাবুডুবু

খেয়ে সে তত সমুদ্রের ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে আমার কিছু করণীয় আছে কিন্তু এই ঝোড়ো সমুদ্রে আমার পক্ষে কি করা সম্ভব। কী করব না করব সিদ্ধান্ত নেবার আগে, হঠাৎ কিছু বুঝবার আগে এক হেঁচকায় আমার হাত ছাড়িয়ে পায়ের চপ্পলটা খুলে, গায়ের র‍্যাপারটা আমার হাতে দিয়ে ধুতিটা মালকোঁচা করে বেঁধে পতিতপাবন ঝাঁপিয়ে গিয়ে সেই মারাত্মক সমুদ্রে পড়লেন।

আমি তাঁকে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ততক্ষণে তিনি তরতর করে ঢেউয়ের শিখরে উঠে নিমজ্জমান ব্যক্তিটির কাছে পৌঁছে গেছেন। দেখলাম আমি ছাড়া তীরবর্তী সমস্ত লোকই তাঁকে চেনে। তাঁকে সাঁতরে এগিয়ে যেতে দেখে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল, বলতে লাগলে, 'পি পি ঘোষ যখন জলে নেমেছে কোনও ভয় নেই।'

এবং সত্যিই তাই। সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্য থেকে নিরাপদে নিমজ্জমান ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে পনেরো মিনিটেব মধ্যে তটে ফিরে এলেন আমার নিরীহ জলচোরা প্রতিবেশী পতিতপাবনবাবু ওরফে পি পি ঘোষ।

তীরে ওঠার পরে সবাই পি পি ঘোষকে ঘিরে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পদ্মশ্রী পি পি ঘোষ, সাতবার পকপ্রণালী আর তেরোবার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন। বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব পি পি ঘোষ। দীঘায় সাঁতারের ছাত্রদের নিয়ে তিন সপ্তাহের ট্রেনিংয়ে এসেছেন।

আমি অবাক হয়ে পি পি ঘোষের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার দিকে চোখ পড়তে তিনি স্বভাবসিদ্ধ লাজুক হাসি হেসে দুই হাত একত্র করে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

একান্ত সচিব

(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

আমার নাম উষানাথ, শ্রীযুক্ত উষানাথ রায়চৌধুরি, আপনারা হয়তো আমার নাম শুনেছেন, আমি ছবি আঁকি। আমার ছবির প্রদর্শনী বেশ জনপ্রিয়, অনেক লোক যান। আপনারাও গিয়েছেন আর না গেলেও খবরের কাগজে আমার চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা পাঠ করেছেন। আমি যে গতবার পদ্মশ্রী পেয়েছি, সেও তো আপনারা জানেন।

সবাই আমাকে মোটামুটি একজন সৎ ভদ্রলোক হিসেবেই জানে। কারও পক্ষে এরকম কল্পনা করা কঠিন যে আমি কোনওরকম জোচ্চুরি করেছি বা জোচ্চুরি করতে পারি। এমনকি আমার নিজেরও এ বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না। কোনও রকম প্রতারণা বা জোচ্চুরি যে আমার দ্বারা সম্ভব একথা কখনও আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

কিন্তু আজ কিছুদিন হল একটা ঘটনায় সব কিছু বদলে গেছে। মাঝে মধ্যেই আজকাল আমি প্রতারণার আশ্রয় নিই। বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়ে নিজেই নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করি, উষানাথ তুমি কি জোচ্চর? সত্যিই জোচ্চর হলে?

বেশি রহস্য না করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলছি।

গত বছরের কথা। গত বছর শীতকালে আমার ছোট মেয়ের কানে একটা ফোঁড়া

উঠেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল মেয়েটা। সবাই বলল বিখ্যাত কর্ণ, কণ্ঠ, নাসিকা বিশারদ ডাক্তার নরহরি চক্রবর্তীকে দেখাতে।

টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে ডাক্তার চক্রবর্তীর ফোন নম্বর বের করে তাঁকে ফোন করলাম। তিনি কিন্তু নিজে ফোন ধরলেন না, ধরলেন এক ভদ্রমহিলা, বোধহয় তাঁর স্ত্রী কিংবা সহকারিণী হবেন।

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাই শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, এ মাসে তো আর কোনও ডেট নেই। সামনের মাসের প্রথমে উনি যাচ্ছেন হায়দরাবাদে কর্ণ চিকিৎসকদের বাৎসরিক সম্মেলনে, সেখান থেকে ফিরে পরের দিনই স্টেট্সে, সাতাশে জানুয়ারির আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে না।

সেটা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। সাতাশে জানুয়ারি মানে পাকা দেড় মাস। আমি হতাশ হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বন্ধু অধ্যাপক নগেন দাশ আমার ঘরে ঢুকল। আমার পুরনো বন্ধু, বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করে। মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে আসে।

নগেন এসে আমার শুকনো ও চিন্তান্বিত মুখ দেখে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে? আমি তাকে ব্যাপারটা বললাম।

সব শুনে নগেন বলল, ও এই ব্যাপার। দাঁড়াও আমি দেখছি। এই বলে সে ফোন তুলল, আমি তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। একবার তো ফোন করেছি আবার ফোন করে কী লাভ এই ভেবে, কিন্তু সে আমাকে হাত দিয়ে থামিয়ে বলল, আরে থামো দেখি, ফোন নম্বরটা বলো।

টেলিফোন ডিরেক্টরির নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খোলাই ছিল সামনে, ডাক্তার নরহরি চক্রবর্তীব ফোন নম্বরের নিচে একটু আগেই পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়েছিলাম সেখানে চোখ বুলিয়ে নগেনকে নম্বরটা বললাম। দেখা যাক কী হয়, হয়তো নরহরিবাবু নগেনের চেনা লোক।

অতঃপর যা ঘটল তা প্রায় অবিশ্বাস্য।

এবং সেই আমার অধঃপতনের প্রথম সোপান।

আমি তিনবার চেষ্টা করে পেয়েছিলাম, কিন্তু নগেনের ভাগ্য চিরকালই ভালো। একবার ডায়াল করেই সে ডাক্তার চক্রবর্তীর ফোনের লাইন পেয়ে গেল।

অতঃপর নগেন যা বললো সেটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নগেনের ভাষণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করলে ব্যাপারটা বোধগম্য হবে না—

হ্যালো। ডাক্তার নরহরি চক্রবর্তী আছেন?'...

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি বিখ্যাত চিত্রকর মিস্টার উষানাথ রায়চৌধুরির, পদ্মশ্রী উষানাথ রায়চৌধুরির স্টুডিও থেকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলছি।...

হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যালো ওঁর মেয়ের কানে একটা ফোঁড়া হয়েছে। ডাক্তার চক্রবর্তী যদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন।

না। না। ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে না। ডাক্তারবাবু নিজেই ধরেছেন। সরি আপনাকে বিরক্ত করলাম। কী বললেন, আপনি এখনই আসবেন বলছেন। বাড়িতে এলে আপনার ভিজিট? ও, কী বললেন ভিজিট-টিজিট লাগবে না। ধন্যবাদ। দাঁড়ান ঠিকানাটা বলছি

সাতের একের বাইশের সি মহিম চাকলাদার' লেন, কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেডের পেছনে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে নরহরি ডাক্তার এলেন, আমার মেয়ের সুচিকিৎসা হলো, তিনদিনের মধ্যে তার কানের ফোঁড়া ফেটে শুকিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

নগেনের এই কলাকৌশল আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। এর সপ্তাহ দুয়েক পরের কথা। আমার শ্যালক এসেছে দিল্লি থেকে এক সপ্তাহের ছুটিতে। কিন্তু রিটার্ন টিকিট কেটে আসেনি। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয় কিছুতেই আর ফিরে যাওয়ার টিকিট জোগাড় করতে পারে না, না প্লেনের না ট্রেনের।

এই অবস্থায় আমার নগেনের ফন্দিটা মনে পড়ল। তবে এবার আর ফোন নয়, আমি সশরীরে বিমান কোম্পানির সদর অফিসে গিয়ে বুকিং ম্যানেজারের ঘরে স্লিপ দিলাম।

অ আ অর্থাৎ অনিল আঢ্য, বি এ (হন), এম এ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর পদ্মশ্রী উষানাথ রায়চৌধুরির একান্ত সচিব ও ব্যক্তিগত সহায়ক।

ফলাফল যা ঘটলো সে অকল্পনীয়। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ম্যানেজার সাহেব আমাকে ঘরে ডাকলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁর নিজস্ব ভি আই পি কোটা থেকে আমার শ্যালকের জন্যে একটা দিল্লির টিকিট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এর মধ্যেই এক কাপ চা এবং তার আগে ও পরে দুটো কোল্ড ড্রিংক খেয়ে একদম হাপুস-হুপুস হয়ে গেলাম।

ক্রমশ আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। বাড়ির কাজের মেয়েটির কোনও রেশন কার্ড ছিল না। হাজার চেষ্টা করেও করাতে পারিনি। এবার আমার একান্ত সচিব অনিল আঢ্য অর্থাৎ অ আ সেটা এক দুপুরে বানিয়ে নিয়ে এল।

আমার নিজের ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্টটা পুলিসের এনকোয়ারির জন্যে সাড়ে চার মাস পড়ে ছিল। আমার একান্ত সচিব অ আ পুলিস অফিসে গিয়ে সে কাজ এক ঘণ্টায় সেরে এল।

গ্যাস সিলিন্ডার পেতে দেড় মাস-দু'মাস লাগে। আজকাল অ আ তিনদিনে নিয়ে আসে। টেলিফোন খারাপ হলে একমাসের আগে পাত্তাই দেয় না, অ আ একবেলায় ঠিক করে ফেলে।

অনিল আঢ্য, শ্রীযুক্ত অ আ মাঝে মধ্যে নিরাশও হতো। একবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায় সে ষোলটা টিকিট চেয়েছিল, পায়নি, মাত্র দুটো টিকিট পেয়েছিল।

আরেকবার উষানাথের জন্যে অ আ রাইটার্সে গিয়ে সল্ট লেকের একটা প্লট চেয়েছিল, তা পায়নি। কিন্তু পাশেই পূর্বাচলে একটা দু'কামরার ফ্ল্যাট পেয়েছিল।

এই ভাবে উষানাথ রায়চৌধুরি ওরফে অনিল আঢ্য অর্থাৎ অ আ এই যুগ্ম চরিত্রের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু আর একটা ঘটনা আছে।

খুব সামান্য ব্যাপার।

কিন্তু,

গল্প শেষ করার জন্যে ঘটনাটুকু না লিখলে চলবে না।

অধ্যাপক নগেন দাশ কোনও এক মাসের পয়লা তারিখে কলেজ থেকে মাইনে নিয়ে

বাড়ি ফিরছিলেন, পাঞ্জাবির ভিতরের পকেটে মাইনের পুরো টাকাটা ছিল। বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন পাঞ্জাবির পকেট, ভিতরের পকেট সমেত সম্পূর্ণ উধাও। সঙ্গে উধাও অন্তর্নিহিত গেঞ্জির পকেট সাইজ আয়তক্ষেত্র এবং সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছে বুকের নির্দিষ্ট চারপাশে রক্তবিন্দু চিহ্নিত আরেকটি আয়তক্ষেত্র।

খুবই সূক্ষ্ম কাজ, কোনও পাকা পকেটমারের ব্লেডের খেলা। শরীরের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে তাও টের পাওয়া যায়নি।

ফোনে নগেন আমাকে ব্যাপারটা জানাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পুলিসে জানিয়েছো? নগেন হতাশ কণ্ঠে বলল, জানিয়ে আর কি লাভ?

আর কিছু না বলে আমি বললাম, সন্ধ্যাবেলা এসো। কথা আছে।

নগেন সন্ধ্যাবেলায় এল, হাসিমুখে। এসে বলল, একটু আগেই থানা থেকে পুরো টাকাটা দিয়ে গেছে, পকেটমারও ধরা পড়েছে। তুমি নাকি ফোন করেছিলে।

আমি বললাম, না আমি ফোন করিনি। জগৎ বিখ্যাত শিল্পী পদ্মশ্রী উষানাথ রায়চৌধুরির একান্ত সচিব অ আ মানে অনিল আঢ্য পুলিস কমিশনার সাহেবকে ফোন করে ঘটনাটা জানিয়েছিল। হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে নগেনকে বললাম, তোমার ঋণ কিঞ্চিৎ শোধ করা গেল।

মুখোশ

(চেকভের গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

কাল বড়দিন।

আজ বড়দিনের আগের দিন। যাকে বলে ক্রিসমাস ইভ। আজই হল আনন্দ আর হুল্লোড়ের দিন। বড়বাবুদের ছুটির দিন। আজ সন্ধ্যা থেকে ছুটবে মদের ফোয়ারা, প্রায় রাত পোয়ানো পর্যন্ত চলবে অবিশ্রান্ত নাচ-গান পানীয়, আর সেই সঙ্গে বেলেল্লাপনা।

বড় শহরের খানদানি ক্লাবগুলোতে এইসব দিনে হৈ-হুল্লোড় একটু বেশিই হয়, ফুর্তি-তামাসা জোর চলে সারারাত ধরে।

এই রকমই একটা ক্লাবে এই রকম একটা মাতোয়ারা রজনীর গল্প এটা। ক্ষমতাবান লোকেরা এ ক্লাবে আসেন; রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, সিনেমা স্টার এবং আরও অনেকে। সকলের স্বার্থে এবং নিজের বিপদের ভয়ে নাম-ধাম সব গোপন রাখছি।

তবু গল্পের খাতিরে ধরা যাক, ক্লাবটির নাম রাইজিং স্টার। রাইজিং স্টার বেশ বড়, প্রায় দু একর মানে ছয় বিঘের মতো জমি নিয়ে বাগান, আউট হাউস, প্রাসাদোপম তিনতলা অট্টালিকা।

একতলাতে ঢুকেই বাঁদিকে সিঁড়ির পাশে রিসেপশন, ডানদিকে বার। বিরাট পানশালা, প্রায় চল্লিশটা টেবিলে দুশো লোক একসঙ্গে বসতে পারে। সামনে দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, সেখানে বিলিয়ার্ড রুম, লাইব্রেরি, রিডিং রুম ইত্যাদি।

এই রিডিং রুমেই আমাদের গল্প।

এখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। নিচের পানশালায় হৈ চৈ বেশ জমে উঠেছে। পানশালার ওপাশে বলরুম, সেখানেও নাচের বাজনা শুরু হয়েছে। সুন্দরীরা ক্রমশ উদ্দাম, উত্তাল হয়ে উঠেছে সেখানে।

কিন্তু এত কাছে মাত্র বাইশ ধাপ সিঁড়ির ওপারে এই রিডিং রুমে কিন্তু উচ্ছলতার কোনও রেশ নেই। চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক এখানে বসে মন দিয়ে পত্র-পত্রিকা, বই ঘাঁটছেন। এরা সব বুদ্ধিজীবী। নিচের পানশালা থেকে কেউ কেউ দু-এক পাত্র পান করে এসেছেন। কিন্তু কেউই সামান্যও বেসামাল নন, বরং একটু বেশি প্রকৃতিস্থ।

এঁরা সব কয়জনেই অতি নামি-দামি লোক, সমাজের মাথার মণি। যে কোনও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে, জাতীয় সমস্যায় এঁরা মতামত দেন। বাঘা-বাঘা খবরের কাগজ, পত্রিকা আর এজেন্সির রিপোর্টাররা এঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করে এবং সেসব বড় বড় অক্ষরে কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়। অবশ্য কোনও কোনও সময়ে এঁদের মতামত যদি খুব গোলমেলে হয়ে যায়, জনমত চঞ্চল বা উত্তপ্ত হলে অবস্থা বুঝে এঁরা ব্যাপারটা সামলে নেন, তখন প্রতিবাদ করে বলেন, 'না এসব কথা ঘুণাক্ষরেও বলিনি।' আবার রিপোর্টাররা জবাবে বলেন, 'বলেছেন, অবশ্যই বলেছেন।' বাদ-প্রতিবাদে খেলা খুব জমে ওঠে। পাঠকেরা সেসব খুব উপভোগ করে।

সে যা হোক, আজকে এঁরা নিজেদেব মধ্যে আলোচনা করছিলেন চীনের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে। হাতের সামনে ইকনমিস্ট, টাইম, নিউজউইক এবং দেশিবিদেশি পত্রিকার পৃষ্ঠা খোলা। এঁদের মধ্যে একজন তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ভারি লাল মলাটের চীনের ইতিহাসের পাতা ঘাঁটছেন, আরেকজনের হাতে তিয়েনানমেন স্কোয়ারের একটা ম্যাপ।

আলোচনা বেশ জমে উঠেছে, উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি চলছে অধ্যাপক সত্যগোপালের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যনারায়ণের। এমন সময় ঘটলো এক অঘটন। ব্যারিস্টার সত্যশেখর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মুখে মুখোশ লাগানো এক বিশাল দেহী ব্যক্তি টলতে টলতে একহাতে মদের বোতল অন্যহাতে এক সুন্দরী রমণীকে আকর্ষণ করতে করতে রিডিং রুমে প্রবেশ করলেন।

বড়দিনের উৎসবে এই ক্লাবে মুখোশ পরার রীতি আছে। অনেক সুখ্যাত ব্যক্তি ও রমণী মুখোশ পরে আত্মগোপন করে নাচের আসরে উচ্ছলতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিচয়টা ঢাকা পড়ে মুখোশের আড়ালে।

কিন্তু দোতলায় এই রিডিং রুমে এবং লাইব্রেরিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ।

কী করে এই মুখোশধারী সাহস পেল মদের বোতল হাতে এ ঘরে প্রবেশ করতে, তাও কিনা এক তরুণীকে কণ্ঠলগ্ন করে নিতান্ত অশালীন ভাবে।

তার চেয়েও মারাত্মক, মুখোশধারী পাঠকক্ষে প্রবেশ করেই গর্জে উঠলেন, 'আরে মশাইরা এই ফুর্তির রাতে এখানে বইয়ে মুখ গুঁজে আর অবান্তর আলোচনা করে কী সময় নষ্ট করছেন, যান নিচে যান, মদটদ খান, নাচগান করুন। একটু হৈ-হল্লা' করুন। এ ঘরটা এখন আমাকে ছেড়ে দিন, আমি নিরিবিলিতে একটু ফুর্তি করি।'

চশমার ভেতর দিয়ে আলগোছে অনুপ্রবেশকারীকে একবাব দেখে নিয়ে সত্যগোপাল বললেন, 'এটা পাঠকক্ষ, মদের বার নয়, মদ খাওয়া এখানে চলবে না।'

নিজের মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলিয়ে সত্যনারায়ণ দৃঢ় কণ্ঠে মুখোশধারীকে আদেশ করলেন, 'যান, বেরিয়ে যান।'

সঙ্গে সঙ্গে সত্যশেখর প্রতিধ্বনি করলেন, 'গেট আউট, গেট আউট।'

মুখোশধারী কিন্তু এসব তর্জন গর্জনে মোটেই বিচলিত হননি। ততক্ষণে তিনি একটি চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন এবং তাঁর কোলের ওপরে সঙ্গিনীকে বসিয়েছেন, সেই সঙ্গে পানীয়ের বোতলের ছিপি খুলে নিজের গলায় ঢকঢক করে ঢালতে লাগলেন আর মাঝে মধ্যে বোতলের মুখটা সঙ্গিনীর মুখের মধ্যে গুঁজে দিতে লাগলেন। মেয়েটিও যথেষ্ট বেহায়া, সেও পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করতে লাগল।

সত্যগোপাল আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মদ্যপ লোকটি এক ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভালো চান তো আপনারা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আজকে পড়াশোনা, পণ্ডিতি আলোচনার কোনও ব্যাপার নেই। আপনারা আর সময় পাননি। এখন কেটে পড়ুন আপনারা সবাই। না হলে গলাধাক্কা দিয়ে বার করতে হবে আপনাদের।'

এর ভাবগতিক দেখে রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন মাননীয় বুদ্ধিজীবীরা। ওদিকে মদ্যপটি তখন যতসব অপমানসূচক কথা বলে চলেছেন, 'আরে ভদ্রলোকেরা আপনাদের মদ খাওয়ার পয়সা নেই তাই বই পড়েন। এই যে চশমাপরা বাবুরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন? আলোচনা থামিয়ে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ববং আমি কয়েকটা টাকা দিচ্ছি নিচের ঘরে গিয়ে ফুর্তি করুন।'

এর পরে আর প্রতিবাদ না কবে উপায় থাকে না। সত্যনাবায়ণ গর্জে উঠলেন, 'এটা পাঠাগার, পড়ার জায়গা। এটাকে আপনি শুঁড়িখানা বানিয়েছেন। আপনাব ব্যবহাব অসভ্য। জানেন আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন, আমি প্রাচীন ইতিহাস সমিতির সভাপতি সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।'

ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন মুখোশধারী। আলিঙ্গনাবদ্ধ মহিলাটিকে কিঞ্চিৎ আদর করে, আরেক চুমুক মদ্য পান করে সত্যনারায়ণেব হাতেব ম্যাগাজিনটা এক হেঁচকায় কেড়ে নিয়ে তিনি সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'সভাপতি মশায়, ও সত্যবাবু, এবার আসুন দেখি। আমি দরজায় খিল দেবো।' সেই সঙ্গে অন্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁদেরও কেটে পড়তে বললেন।

এত অপমান কে সহ্য করতে পারে। দৌড়ে গিয়ে সত্যশেখর নিচতলা থেকে ক্লাবের দারোয়ান বেনারসিলালকে ডেকে আনলেন। বড় ক্লাবের পুরনো দারোয়ান বেনারসিলাল. বেলেল্লাপনা সে অনেক দেখেছে। কিন্তু পাঠাগারে এরকম দৃশ্য সে দেখেনি।

বেনারসিলাল এসে মুখোশধারীকে বললো, 'অনুগ্রহ করে এখান থেকে চলে যান। এটা মদ খাওয়ার ঘর নয়।'

মুখোশধারী আবার হেসে উঠলেন, 'আরে তুমি এসব কী বলছো। মদ খাওয়ার, ফুর্তি করা আবার ঘর-অঘর আছে নাকি? তাছাড়া আজকের মতো রাতে।'

বেনারসিলালকে দেখে ততক্ষণে সত্যনারায়ণ আব সত্যগোপালের সাহস বেড়ে গেছে। দুজনেই অস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এলেন, 'বেয়াদপ, বদমাশ। বেরোবি কি না বল?' একথা শুনে মুখোশধারী শূন্যে কিছুটা থুতু ছিটোলেন। এবার বেনারসিলাল উত্তেজিত হলো, তার গায়ে এক ছিঁটে থুতু লেগেছে, সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এক্ষুণি ঘর ছেড়ে চলে

যান।'

সত্যনারায়ণ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।'

সত্যশেখর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাথি মেরে বের করে দাও।'

সত্যগোপাল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কানে ধরে বের করে দাও।'

গোলমাল শুনে নিচের বলরুমে নাচ থেমে গেছে, সেখান থেকে এবং পানশালা থেকে দলে দলে পুরুষ রমণী ছুটে এসেছে দোতলায়। ক্লাবের অন্য সব দারোয়ান ছুটে এসেছে। একজন ছুটল পুলিসে ফোন করতে।

এই সময় মুখোশধারী তাঁর কোলের পানাতুরা মহিলাটিকে চেয়ারে সাবধানে বসিয়ে নিজে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের মুখোশটিকে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হতভম্ভ হয়ে গেল।

আরে এ যে মনোহর চৌধুরি। গুণ্ডা ও নেতা, মদ্যপ ও সমাজসেবী, লম্পট ও বদান্য কোটিপতি মনোহর চৌধুরি। সবাই তাঁকে চেনে তাঁর দলবাজির জন্যে, দাঙ্গাবাজির জন্যে, সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁর অনুরাগের জন্যে, সুরা ও রমণীর প্রতি তাঁর দুর্বলতার জন্যে। সর্বোপরি তাঁর উদার অর্থব্যয়ের জন্যে। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কে তাঁর অনুগৃহীত নয়?

একটিও কথা না বলে বুদ্ধিজীবীর দল গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সত্যগোপাল বললেন, 'সত্যি খুব বোকামি হয়ে গেল।' সত্যনারায়ণ বললেন, 'বড়দিনে একটু ফুর্তি করবে, তা না হয় করত।' সত্যশেখর বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য পড়ার ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কিইবা হত।'

সবাই বেরিয়ে যেতে মেয়েটিকে নিয়ে পাঠাগারের দরজা বন্ধ করলেন মনোহর চৌধুরী। আধঘণ্টা পরে দু'জনে টলতে টলতে বলরুমে এলেন। আবার নাচ শুরু হয়েছে। এক বাজিয়েকে তুলে দিয়ে তিনি টুলে বসে তার ড্রামটা বাজাতে লাগলেন এবং বাজাতে বাজাতেই ঘুমে ঢুলে পড়লেন ড্রামের ওপর।

'মনোহর চৌধুরি ঘুমিয়ে পড়েছেন, এই বাজনা থামাও। ওঁর ঘুমে ব্যাঘাত হবে।' এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

তারপর সত্যগোপাল গিয়ে মনোহরের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'স্যার উঠুন।'

সত্যশেখর বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে।'

সত্যনারায়ণ বললে, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এসবের প্রয়োজন হল না। মনোহর চৌধুরির বডি গার্ড আর ড্রাইভার এসে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল।

সত্যনারায়ণ, সত্যশেখর আর সত্যগোপাল আলোচনা করতে লাগলেন, 'মনোহর চৌধুরির এত সেন্স আর হিউমার, এটা আগে তো জানা ছিল না।' আর মনে মনে আশা করতে লাগলেন, এত মদ খেয়েছে মাতালটা, কাল সকালে নিশ্চয় আজকের কথা কিছু মনে থাকবে না।

নাক

(নিকোলাই গোগোলের গল্পের ছায়ায়)

গড়িয়াহাট রোডের ওপরে 'নিউ জগদম্বা সেলুনের' রমরমা কারবার। সেলুনের মালিক ভজনলাল শীল একটু আয়েসী লোক, ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে। চুলকাটার ব্যবসাটা সকাল থেকেই শুরু হয়। এমন অনেক লোক আছে যারা মরনিং ওয়াক সেরে ফেরার পথে চুল কাটতে বসে যায়। ফলে সকালের দিকে ভজনলালের ব্যবসাটা একটু মার খায়। দুজন কর্মচারি আছে বটে তবে মালিক না থাকলে তারা কাজে ফাঁকি দেয়। পয়সা-টয়সাও চুরি করে।

সকাল আটটা নাগাদ ভজনলাল ঘুম থেকে ওঠে। উঠে তাড়াতাড়ি স্নান-টান করে দুটি আলুসেদ্ধ ভাত মুখে গুঁজে দোকানে যায়, দোকানে যেতে যেতে প্রায় ন'টা-সাড়ে ন'টা হয়ে যায়। ভজনলালের বৌ এই নিয়ে রোজ গজগজ করে।

আজও ভজনলালের বৌ গজগজ কবছিল। 'পুরুষমানুষ এত দেরি করে কাজে গেলে চলে। এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকে নাকি?' ইত্যাদি।

ভজনলাল তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে খাচ্ছিল। প্রত্যেকদিন একই খাবার, ভাত, ডাল আর আলুসেদ্ধ। আজ আলুসেদ্ধ ছাড়াও ভাতের মধ্যে বৌ যেন আর কী একটা সেদ্ধ দিয়েছে।

এরকম সচরাচর হয় না। ভজনলাল একটু অবাক হল। আরও অবাক হল জিনিসটাকে ভাতের মধ্যে থেকে বের করে এনে।

আর এ যে একটা মানুষের নাক। আস্ত একটা কাটা নাক। ভজনলাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। বারবার চোখ কচলাতে লাগল, জিনিসটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল।

এটা যে সত্যিই একটা মানুষের নাক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তার চেয়ে কেমন যেন মনে হচ্ছে এটা কোনও চেনা মানুষের নাক।

একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল ভজনলালের মুখে, কার নাক, কোথা থেকে, কী ভাবে এল, ভীষণ দুশ্চিন্তা দেখা দিল তার। কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটা খারাপ ব্যাপার ঘটেছে। নাকটা চোখে পড়ে গেছে তার মুখরা স্ত্রীর। নাকটা দেখে কামনা, মানে তার স্ত্রী, ভয়ঙ্কর খেপে উঠল, 'শয়তান, নাপিত, ওরে কসাই, কোথায় তুই এই এই নাকটা কেটেছিস? এটা কার নাক কেটে এনেছিস? আমি এখনই পুলিসের কাছে যাচ্ছি। তোকে হাজতে পাঠিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

চেঁচাতে এবং লাফাতে লাগল কামনা, 'আমি লোকের কাছে শুনেছি তুই দাড়ি কামানোর সময় লোকের নাক ধরে টানাটানি করিস, তাদেরই কারও নাক খুলে ফেলেছিস তুই। এবার তোর জেল হবে।'

ভজনলালের তখন ভয়াবহ অবস্থা। একদিকে স্ত্রীর চেঁচামেচি, অন্যদিকে সে বুঝতে পেরেছে এবং চিনতে পেরেছে যে এ নাকটা হল গরচা থানার বড় দারোগা কাজলবাবুর। কাজলবাবু দৈনিক বিকেলে বিনে পয়সায় তার সেলুনে দাড়ি কামান, মাঝে মধ্যে চুলও কাটেন।

ভজনলাল বৌকে বুঝিয়ে বললক, 'এটা কী করে হল কিছুই ধরতে পারছি না। তুমি সেদ্ধ করলে ভাত তার মধ্যে বড়বাবুর নাকটা গেল কী করে? ঘটনাটা একদম গাঁজাখুরি মনে হচ্ছে। আমি কাটলাম বড়বাবুর দাড়ি কাল বিকেলে, তখনও নাকটা ছিল, ঠিকই ছিল। আর আজ সকালে আমার বাসায় গরম ভাতের মধ্যে সেই নাক, এ যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৌ কিন্তু ভজনলালকে ছাড়ল না, কড়া আদেশ দিল, 'যাও। তুমি তোমার বড়বাবুর নাক নিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আর এক মুহূর্তও তুমি আর তোমার ঐ বড়বাবুর নাক এ বাড়িতে নয়।'

অগত্যা ভজনলাল আধপেটা অবস্থাতেই আহার ভঙ্গ করে জামাকাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, নাকটাকে একটা রুমালে জড়িয়ে নিল। সে ঠিক করছিল রাস্তায় বেরিয়ে একটু দূর গিয়ে কোনও পাঁচিলের পেছনে বা গর্তের মধ্যে নাকটাকে ফেলে দেবে।

কিন্তু সেটা খুব সুবিধে হল না।

এত লোক যে তাকে চেনে সে কথা ভজনলাল আগে কখনও ভেবে দেখেনি। রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের মাথায় গিয়ে পড়েছে, এখানে একটা বড় ডাস্টবিন একটু আগেই, ভজনলাল ভাবল ঐ ডাস্টবিনের মধ্যে নাকটাকে ফেলে দিয়ে যাই, কিন্তু পাড়ার এক চেনা ছোকরা সেখানে দাঁড়িয়ে, তাকে এড়িয়ে আর একটু যেতেই অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কী ভজনদা, আজ দোকানে কি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন?'

ভজনলাল হনহন করে হেঁটে গড়িয়াহাট মোড়ের মাথায় এসে সন্তর্পণে নাকটাকে একটা থামের পিছনে ফেলে দিলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্রাফিক কনস্টেবল ভজনলালকে ডেকে বলল, 'দাদা, আপনার কী একটা জিনিস এখানে পড়ে গেল।'

চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ নাকটাকে কুড়িয়ে আবার রুমালে জড়িয়ে নিল ভজনলাল। সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল আর কী। নাকটাকে দেখলে সেপাই কি আর চিনতে পারত না বড় দারোগার নাক বলে। তা হলে তো ভয়াবহ কেলেঙ্কারি হত।

অনেক চিন্তা করে এবার ভজনলাল ঠিক করল গড়িয়াহাট ব্রিজের ওপরে যাবে। সেখান থেকে ছুঁড়ে নিচের রেল লাইনের ওপরে নাকটাকে ফেলে দেবে। তারপর নিঃশব্দে সরে পড়বে।

ধীরে ধীরে গড়িয়াহাট ব্রিজের একেবারে মধ্যিখানে উঠে এল ভজনলাল, তারপর অনেকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ধারে কাছে যখন বিশেষ কেউ নেই, রুমাল থেকে নাকটা বের করে ছুঁড়ে দিল নিচে রেল লাইনের ওপরে।

ভজনলাল খেয়াল করেনি ব্রিজের ওধারে দাঁড়িয়ে এই এলাকার উঠতি মাস্তান হাতকাটা ভোমা এতক্ষণ ভজনলালকে লক্ষ্য করছিল। সে অবশ্য অতদূর থেকে তাকে নাকটা ছুঁড়ে ফেলতে দেখেনি কিন্তু ভজনলালকে ওখানে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে মনে কেমন সন্দেহ হয়েছে।

নিচের রেল লাইনের পাশে একটা ছাইয়ের গাদায় কচুগাছের ঝোপ আছে। সেই ঝোপে হাতকাটা ভোমা তার পাইপগান ছাইয়ের নিচে লুকিয়ে রাখে আর ব্রিজের ওপর থেকে পুরো এলাকাটা, বিশেষ করে ছাইয়ের গাদায় নজর রাখে।

নাকটা ছুঁড়ে ফেলে যেন বুক থেকে পাথর নেমে গেছে এইরকম হালকা মনে এবার ভজনলাল তার নিউ জগদম্বা সেলুনের দিকে ফিরছিল। হঠাৎ পিছন থেকে তার ঘাড়টা কে যেন হাত দিয়ে ধরলো।

আঁতকিয়ে উঠে মাথা ঘুরিয়ে ভজনলাল দেখে হাতকাটা ভোমা তার একমাত্র হাত বাঁ হাতটা দিয়ে তার ঘাড় ধরেছে। ভোমার ডান হাতটা নেই, বোমা বানাতে গিয়ে বছর দশেক আগে উড়ে গেছে। তবে তার বাঁ হাতই চার হাতের কাজ দেয়।

ভজনলালের ঘাড়টা শক্ত করে চিপে ধরে ভোমা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এই শালা, ভজা নাপিত। এখানে কী করতে এসেছিস?'

ভজনলালের পক্ষে বলা সম্ভব নয় সে কী করতে এসেছে, সে আমতা আমতা করতে লাগল, বলল 'এই একটু বেড়াতে এসেছিলাম।' ভোমা এত সহজে ছেড়ে দেবার লোক নয়, ঘাড়ে একটা জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বল। এই রোদে ব্রিজের ওপরে বেড়াতে এসেছিস। শালা, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাস না। দেব পেটে চাকু চালিয়ে।'

নাপিতেরা খুব ধূর্ত হয়। ভোমা ভাবল, এই ভজা নাপিতটা পুলিসের স্পাইং-টাইং শুরু করেছে। তা ছাড়া ব্যাটা দেখতেও টিকটিকির মতো, রোগা, লম্বা, হাড়গিলের মতো ঘাড়, টিপেও সুখ নেই। আরও একটা ঘাড়ে ঝাঁকি দিল ভোমা।

ভজনলালের আত্মাবাম তখন প্রায় খাঁচাছাড়া হবাব জোগাড়। সেই মুহূর্তে তার চোখে যে দৃশ্য পড়ল তা দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। ব্রিজের নিচে রেল লাইনের পাশে তার সেই ছুঁড়ে দেয়া নাকটা হঠাৎ একটা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, একেবারে প্যান্ট-শার্ট, জুতো-মোজা পরা সদ্য-মানুষ।

নাকটা মানুষ হয়ে সোজা ছাইগাদার মধ্যের কচুঝোপের পাশ দিয়ে হেঁটে গড়িয়াহাট যাওয়ার রাস্তার দিকে এগোচ্ছে।

ভজনলালের দৃষ্টি অনুসরণ করে পুলের নিচের দিকে তাকাতে হাতকাটা ভোমা দেখতে পেল একটা লোক ছাইগাদার দিকে যাচ্ছে, যেখানে তার পাইপগান লুকনো আছে। মুহূর্তের মধ্যে সে ভজনলালের ঘাড় ছেড়ে, টি-শার্টের নিচ থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করে ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচের দিকে ছুটল।

কিন্তু ততক্ষণে নাক-মানুষটা কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছে ভজনলাল আর দেখতে পেল না। আর দেখতে সে চায়ও না। এখন এখান থেকে কেটে পড়াই শ্রেয়। সে লাফ দিয়ে একটা চলন্ত মিনিবাসে উঠে পড়ল।

নাকমানুষ

(গোগোলের গল্পের ছায়ায়)

নাক মানুষের বৃত্তান্ত বড় জটিল। ভোলাবাবু একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারি। একদিন খুব সকালবেলায় ঘুম ভেঙে গেল তাঁর এবং তখনই মনে পড়ল গতকাল রাতে তাঁর নাকের ওপর একটা ফুসকুড়ি উঠেছিল। এসব জিনিস ভোলাবাবুর মোটেই পছন্দ নয়। তিনি এই সাতসকালেই তাকের ওপর থেকে গোল হাত আয়নাটা নামিয়ে দেখতে গেলেন

ফুসকুড়িটা বেড়েছে না কমেছে।

কিন্তু আয়নায় ভোলাবাবু যা দেখলেন তাকে অসম্ভবই বলা চলে। তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। আয়নার ভেতরে দেখতে পেলেন যেখানে তাঁর নাক থাকার কথা সে জায়গাটা সম্পূর্ণ সমতল, নাকের কোনো অস্তিত্বই নেই।

বিস্মিত ভোলাবাবু বাথরুমে গিয়ে চোখে জল দিলেন, আবার বাথরুমের আয়নায় ভালো করে দেখলেন, কী আশ্চর্য কাণ্ড, তাঁর নাকটা কোথাও নেই, সম্পূর্ণ উবে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে!

অনেক রকম ভাবনাচিন্তা করে ভোলাবাবু ঠিক করলেন এ ব্যাপারে অন্তত পুলিশকে জানানো দরকার। পুলিশের বড়সাহেবের সঙ্গে তাঁর ভালোই পরিচয় আছে। ভোলাবাবু তাড়াতাড়ি পুলিশের সদর দপ্তরে ছুটলেন।

যেমন হয় রাস্তায় বেরিয়ে ভোলাবাবু একটাও ট্যাক্সি পেলেন না। নাকহীন মুখশ্রী নিয়ে ট্রামে বাসে উঠতে ভরসা পেলেন না তিনি, জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন।

নাকের জায়গাটা রুমাল দিয়ে এক হাতে চাপা দিলেন ভোলাবাবু, যেন খুব সর্দি হয়েছে কিংবা কোনো বদগন্ধ আসছে। রাস্তায় একটা পানের দোকানে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে সেই দোকানের আয়নায় আরেকবার দেখে নিলেন নাকের জায়গাটা, না, নাকটা সত্যিই নেই, বেমালুম গায়েব হয়েছে।

কিছুক্ষণ চলার পর পুলিস অফিসের সামনে এসে পৌঁছে গেলেন ভোলাবাবু এবং সেখানেই ঘটল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। পুলিস অফিসের গেট দিয়ে ভোলাবাবু যখন ঢুকছেন, ঠিক তখনই তাঁর পাশ দিয়ে হুস করে ঢুকে গেল একটা লাল মারুতি গাড়ি। গাড়িটা থামতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা স্যুটপরা লোক। লোকটাকে দেখে চমকে উঠলেন ভোলাবাবু। আরে কি সর্বনাশ, তিনি লোকটাকে চিনতে পারলেন তাঁর নিজের নাক বলে।

ঘটনার অবিশ্বাস্যতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন ভোলাবাবু। তিনি আর পুলিস অফিসে ঢুকলেন না, গেটের পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলেন সুটপরা নাকের অপেক্ষায়।

কয়েক মিনিট বাদে সত্যিই বেরিয়ে এল নাক এবং মুহূর্তের মধ্যে মারুতি গাড়িটাতে উঠে দ্রুত চলে গেল। ভোলাবাবু কিছু বলার আগেই নাক অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ কি তাজ্জব কাণ্ড!

ভোলাবাবু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, তাঁর নিজের নাক, ঠোঁটের ওপরে, কপালের নিচে, দুই চোখের মধ্য থেকে দুই গালের মধ্য পর্যন্ত লম্বা তাঁর নাক, এই গতকাল সন্ধ্যাতেই তাঁর মুখে বসানো ছিল, একটা ফুসকুড়ি হয়েছিল সেই নাকে—

সেই নাকটা মানুষ হয়ে গেছে, কোট প্যান্ট পরে মারুতি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!!

ভোলাবাবু লক্ষ্য করলেন মারুতি গাড়িটা বেশিদূর গেল না, সামনেই একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। আর দেরি করলেন না তিনি। নাক মানুষটা নামার আগেই ছুটে গিয়ে তার গাড়ির দরজা আগলিয়ে দাঁড়ালেন।

নাকমানুষ গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী ব্যাপাব? কী চাই আপনার?'

ভোলাবাবু বললেন, 'দ্যাখো, আমার খুব অবাক লাগছে। তোমার তো জানা উচিত যে তুমি হলে আমার নাক, আমার মুখেই তো তোমার থাকার কথা। তা নয় তো কি তুমি কোটপ্যান্ট পরে গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

নাকমানুষ বলল, 'মাফ করবেন, আপনার কথা আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভোলাবাবু বললেন, 'আমি একজন পদস্থ আমলা, তুমি হলে আমার নিজের নাক, যেখানে তোমার থাকার কথা সেখানে না থেকে...'

নাকমানুষ ভোলাবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু, আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কার নাক, কিসের নাক, আমি একটা পুরো মানুষ। আমি আবার আপনার নাক হলাম কী ভাবে?'

এভাবে বাক্যালাপ বেশিক্ষণ চলতে পারে না। নাকমানুষ ভোলাবাবুকে ফেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। কী করবেন কিছুই বুঝতে না পেরে ভোলাবাবু আবার পুলিসের সদর দপ্তরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল তাঁকে, বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হল না, তিনি এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না এই ভেবে ভোলাবাবু রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেতে সেটায় উঠে বসলেন।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, 'কাঁহা যায়ে গা?' ভোলাবাবু বললেন, 'সিধা চালাও।'

ট্যাক্সিতে চলতে চলতেই ভোলাবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপাতত একটা খবরের কাগজ অফিসে গিয়ে হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের কলমে নাক হারানো সম্পর্কে একটা বিজ্ঞাপন দেবেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করবেন নাক উদ্ধারকারীর জন্যে।

খবরের কাগজের অফিসে ব্যাপারটা কিন্তু খুব সুবিধের হল না। নাক হারানোর বিজ্ঞাপন দেওয়া খুব সোজা নয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দপ্তরের কাউন্টারে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে শব্দ আর অক্ষর গুণে বিজ্ঞাপনের খরচ হিসেব করে বিজ্ঞাপন গ্রহণ করেন তিনি ভোলাবাবুর কথা মোটেই পাত্তা দিলেন না।

ভোলাবাবু যখন বললেন যে তাঁর নাসিকা পালিয়েছে এই মর্মে তিনি বিজ্ঞাপন দিতে চান বৃদ্ধ ভদ্রলোক না বুঝে প্রশ্ন করলেন, 'নাসিকাটি কে? কে পালিয়েছে, আপনার স্ত্রী না চাকর? না অন্য কেউ?'

ভোলাবাবু বললেন, 'আরে তা নয়, নাসিকা আমার স্ত্রী বা চাকর হতে যাবে কেন? আমার নিজের নাসিকা।'

বুড়ো বললেন, 'নাসিকা! অদ্ভুত নাম বললেন মশাই। এই কাউন্টারে বসে কত রকমের নামই যে দৈনিক শুনতে হয়,' তারপর টেবিলের ওপরে নস্যির কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তা এই শ্রীমান নাকি শ্রীমতী নাসিকা কি আপনার বহু টাকা মেরে ফেরার হয়েছে।'

ফেরার কথাটা ভোলাবাবুর মনে লাগল কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোকের ধারণাটা শোধরাতে হয়, তিনি বুঝিয়ে বলতে গেলেন, 'আপনি যা চিন্তা করছেন তা কিন্তু নয়। নাসিকা মানে আমার নাক, আমার নিজের নাক, সেটা খোয়া গেছে, পালিয়ে গেছে। তাই খুঁজে বের করার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে এসেছি।'

বুড়ো বললেন, 'কিন্তু কী ভাবে নাক পালাবে। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল

আছে, কিছু বুঝতে পারছি না।' ভোলাবাবু অস্থির হয়ে বললেন, 'আমি কীভাবে আপনাকে বোঝাবো বুঝতে পারছি না। আমার নিজের নাক আমার মুখ থেকে পালিয়ে গেছে, শুধু পালিয়েছে তাই নয় কোট-প্যান্ট পরে, লাল মারুতি গাড়ি চড়ে শহরের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি একটা বিজ্ঞাপন ভালো করে সাজিয়ে দিন, লিখে দিন ওটাকে কেউ ধরে আনতে পারলে তাকে এক হাজার এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

বুড়ো বললেন, 'না এ ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের পত্রিকায় ছাপানো সম্ভব নয়।'

উত্তেজিত হয়ে গেলেন ভোলাবাবু, 'কেন? কেন?'

বুড়ো বললেন, 'এ রকম বিজ্ঞাপন ছাপালে আমাদের কাগজের সুনাম নষ্ট হবে। এমনিতে লোকে বলে কাগজে হাবিজাবি উলটো পালটা জিনিস ছাপা হয় তারপরে যদি নাক পালানোর বিজ্ঞাপন ছাপা হয় আর রক্ষা নেই।'

'আমার নাক যদি সত্যিই পালিয়ে গিয়ে থাকে তবুও আপনি সে বিজ্ঞাপন ছাপাতে পারবেন না?' অধীর হয়ে পড়লেন ভোলাবাবু।

ভোলাবাবুর অস্থিরতা দেখে বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আপনার উর্ধ্ববায়ু হয়েছে। নিন, এই একটিপ নস্যি নিন। নস্যিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখে। এক টিপ নাকে দিয়ে হালকা করে টানুন, মাথা সাফ হয়ে যাবে।' এই বলে তিনি ভোলাবাবুর দিকে নস্যির কৌটোটা এগিয়ে দিলেন।

'নাকই নেই, তা নস্যি কোথায় গুঁজবো। যত সব নির্বোধের নিকুচি করেছে।' খবরের কাগজ অফিস থেকে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ভোলাবাবু।

আর কী করবেন তিনি, নাকহীন ভোলাবাবু এবার বাড়ির দিকে রওনা হলেন, বেলাও অনেক হয়েছে। তবে যাওয়ার পথে পাড়ার মোড়ে পুলিস ফাঁড়িতে একটা ডায়েরি করে গেলেন নাক পালানোর অভিযোগ জানিয়ে।

পুলিশের যে লোকটা ডায়েরি লিখছিল এই ভরদুপুরেই লোকটা মদ খেয়ে চুরচুর মাতাল হয়ে বসেছিল। সে ভোলাবাবুর বৃত্তান্ত শুনে তাড়াতাড়ি ডায়েরি লেখা শেষ করে বললো, 'কী বললেন, আপনার নাক পালিয়েছে? নাকের এত সাহস! আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান, আমি ও ব্যাটাকে এক ঘণ্টার মধ্যে ধরে নিয়ে আসছি।' বলে মাতাল সেপাইটা রুল উঁচিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

এবং সত্যি সত্যিই লোকটা কথা রাখল। এক ঘণ্টার মধ্যে কোটপ্যান্ট পরা নাকমানুষ মানে ভোলাবাবুর নাকটাকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে সে ভোলাবাবুর বাড়িতে এনে হাজির করল।

দেখুন স্যার এই ব্যাটাই আপনার নাক কি না? শালা বারে বসে মদ খাচ্ছিল। ঠিক ধরে এনেছি। মাতাল সেপাইটা ভোলাবাবুকে বলল।

ভোলাবাবু দেখলেন, সত্যিই এটা তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া নাক। এখন কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পরায় অধোবদন হয়ে আছে অথচ সকালে কি শয়তানিটাই না করেছে। কিন্তু নিজের নাকের হেনস্থা আর কতটা সহ্য করা যায়। ভোলাবাবু সর্বপ্রথমে সেপাইটাকে এক বোতল বাংলা মদের দাম দিয়ে বিদায় করলেন। সেপাইটা যাওয়ার সময় বলে গেল, 'সব সময়ে চোখে চোখে রাখবেন। এ খুব হারামি আছে।'

নাক যদিও চোখের পাশেই, কিন্তু নিজের নাক চোখে চোখে রাখা যে কত কঠিন, মাতাল সেপাই সেটা কি বুঝবে। ভোলাবাবু মনে মনে ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে নাকমানুষের হাতকড়া আর কোমরের দড়ি খুলে দিলেন। নিজের নাকের হেনস্থা আর কতটা সহ্য করা যায়।

অতঃপর সেই সুটপরা নাকমানুষকে কী ভাবে ভোলাবাবু নিজের মুখের মধ্যে আবার ফিট করিয়েছিলেন সে আরেক জটিলতর কাহিনী। এই সরস গল্পে অত জটিলতা টেনে আনা উচিত হবে না।

এসকেলেটর

(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

কালুবাবুর মূল নাম কালিদাস না কালীপদ নাকি কালীচরণ সে আমি বলতে পারব না, সবাই তাঁকে কালুবাবু অথবা ঘনিষ্ঠার্থে কালু বলে সম্বোধন করে। আমরাও এই কাহিনীতে তাঁকে কালুবাবু বলেই সম্বোধন করব। কালুবাবুর বিশদ নাম জানা না থাকলেও গল্পের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

কালুবাবু কেন্দ্রীয় সরকারে অন্তঃশুল্ক দপ্তরে কাজ করেন। বয়েস বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ। আগে ভুবনেশ্বরের অফিসে ছিলেন। সম্প্রতি বিস্তর ধরাধরি করে, কাঠ-খড় পুড়িয়ে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি প্রবাসী বাঙালি পরিবারের সন্তান, কলকাতায় আগে বিশেষ কখনও থাকেননি। তবে এখন এসে ভালোই লাগছে। লোডশেডিং, রাস্তাঘাট ভাঙা, যানবাহনে গাদাগাদি ভিড় এ তো এখন প্রায় সব জায়গাতেই রয়েছে, শুধু শুধু কলকাতাকে আলাদা করে দোষ দিতে চান না কালুবাবু। অব্যবস্থা সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে।

মাত্র তিন-চারদিন হল কলকাতায় এসেছেন কালুবাবু। আজ রোববার, কাল সোমবার নতুন অফিসে জয়েন করবেন। আশা করছেন কিছুদিন পরে কোনও একটা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কোয়ার্টারে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাবেন। আপাতত একটা ছোট হোটেলে আছেন।

আজ বিকেলে পাতাল রেল চড়তে কালুবাবু চৌরঙ্গিতে এসেছেন। এর আগে কালুবাবু পাতাল রেলে চড়েননি। অবশ্য আজ সকালে একবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রোববার সকালে পাতাল রেল বন্ধ থাকে। তাই সকালে এসে ফিরে গেছেন। তারপর এখন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করে পাতাল রেলে উঠতে এসেছেন।

রোববারের বিকেলের ফাঁকা চৌরঙ্গি কেমন শুনশান্। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেড় টাকা দিয়ে টিকিট কিনে এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি টালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে গেলেন। মনের আহ্লাদে উল্টো ট্রেনে চেপে তখনই আবার এসপ্ল্যানেডে ফিরে এলেন তিনি।

কালুবাবু সাধারণত প্যান্ট-শার্ট পরেন। কিন্তু আজ ছুটির দিনের বিকেল বলে ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। নামার সময় দেখেননি, এখন এসপ্ল্যানেডে

এসকেলেটর দেখে এবং তাতে অনেকে উঠে যাচ্ছে দেখে কালুবাবুও তাই করলেন। রোববারের এই সদ্য বিকেলের মেট্রো রেলে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। এসকেলেটরে উঠতে একটু ভয় ভয় করছিল কালুবাবুর, অবশেষে যখন সাহস করে উঠলেন তখন প্রায় সব যাত্রীই উঠে গেছে শুধু তাঁর থেকে মাত্র দু'ধাপ ওপরে একটি মেয়ে।

মেয়েটির বয়েস বোঝা কঠিন, তবে সুশ্রী। ফিকে হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে। সাবলীলভাবে এসকেলেটরের দু'ধাপ ওপরে ঝলমল করে উঠে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে দেখেই ভরসা পেয়েছিলেন কালুবাবু। তারই পিছু পিছু উঠে যাচ্ছিলেন কিন্তু বিপত্তি হল নামার সময়।

এসকেলেটর যখন সর্বোচ্চ ধাপে মেঝের মধ্যে ঢুকে যায় তখন একটু তৎপর হতে হয় না হলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালুবাবুর এই প্রথম এসকেলেটরে চাপা, তার ওপরে সম্মুখবর্তিনী সুন্দরীকে দেখে তিনি কিঞ্চিৎ বিহ্বল ছিলেন। ফলে এসকেলেটরের শেষ সীমায় পৌঁছে হঠাৎ পাজামার ঝুলে টান পড়তে তিনি আচমকা একটা লাফ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিটকিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়লেন সামনের মেয়েটির ওপরে।

মেয়েটি সপ্রতিভা। কোনও রকম বিড়ম্বনা বোধ না করে কালুবাবুকে জাপটিয়ে সোজা করে দাঁড় করাল।

একটু স্থির হয়ে দম নিয়ে কালুবাবু লজ্জিত মুখে বললেন, 'ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা করে এরকম করিনি।'

মেয়েটি একটু বেশি চপলা, মুচকি হেসে কালুবাবুর এই স্বীকারোক্তির সে যা জবাব দিলো তা যে কোনও মেয়ে চট করে বলতে পারে না।

কালুবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে সে বলল, 'তা আমি বুঝতে পেরেছি। ...কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছে করেই আমার গায়ে পড়তেন, সেটাও আমার খুব খারাপ লাগত না।

একটি অপরিচিতা মেয়ের মুখে এমন তাজ্জব কথা শুনে সরল প্রকৃতির কালুবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন, তিনি বিমোহিত হয়ে আচ্ছন্নের মতো 'ময়েটির পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন।

একেই কি প্রথম দর্শনে প্রেম বলে? কী জানি, কালুবাবু নিতান্তই নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিছুই না বলে চুপচাপ মেয়েটির পাশাপাশি যেতে লাগলেন। তারপর কী ভেবে থমকিয়ে দাঁড়ালেন।

মেয়েটি একটু দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল নয়নে কালুবাবুর আপাদমস্তক একবার সরেজমিন দর্শন করে কালুবাবুকে বলল, 'কী হল? আপনার মৃগীর ব্যারাম নেই তো। আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন নাকি?'

মেট্রো রেলের এই প্রবেশ ও প্রস্থানপথ কলকাতার পক্ষে একটু বেশী রমণীয়। সুন্দর দেয়াল, ঝলমলে আলো, সঙ্গীত লহরী, ভিখিরিহীন, ফেরিওলাহীন এই পাতাল রেলের চত্বরে একটা অমল আবহ আছে।

কালুবাবুর মুগ্ধতার মধ্যে এই মেয়েটিও মিশে গেছে, একটু আমতা আমতা করে তিনি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়েটিই আবার কথা বলল। কালুবাবুর পায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনার পাজামাটা কিন্তু ছিঁড়ে গেছে। এসকেলেটরে আগে চড়েননি?

কালুবাবু বিনীতভাবে জানালেন, 'শুধু এসকেলেটরে নয়, পাতাল রেলেও এর আগে চড়িনি।'

মেয়েটি চোখ নাচিয়ে বলল, 'ও, একেবারে কাঠবাঙাল। আপনি বাংলাদেশি নাকি। আপনার উচ্চারণ তো তেমন নয়।'

কালুবাবু তাঁর বৃত্তান্ত জানালেন। বললেন কানপুরে জন্মেছেন, লেখাপড়া সেখানে। তারপর চাকরি নিয়ে ছিলেন ভুবনেশ্বর। এখন কয়েকদিন হল বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন।

কথায় কথায় কালুবাবু তাঁর নিজের কথা এবং অফিসের কথা জানালেন। নাম ধাম অবশ্য জানালেন না।

কালুবাবুর কথা শুনে মেয়েটি যেন কি ভাবল, কী নিয়ে যেন মাথা ঘামাল, তারপর গেটের দিকে এগোতে এগোতে একটু থেমে সে হঠাৎ কালুবাবুকে প্রশ্ন করল, 'আপনি তাহলে মিঃ কে কে চক্রবর্তী নন তো? ভুবনেশ্বর থেকে আসছেন বলছেন? আপনার তো গত সোমবার অফিসে জয়েন করার কথা।'

এরকম সচরাচর ঘটে না। মেয়েটি নিশ্চয়ই জ্যোতিষী নয়। যা হোক কালুবাবু জানালেন যে গত সোমবার নয় আগামীকাল সোমবার তাঁর জয়েন করার কথা। এই সাতদিন তিনি জয়েনিং টাইম নিয়েছেন।

'ও তাই নাকি। ঠিক আছে দেখা হবে।' বলে মেয়েটি তরতর করে বেরিয়ে যে কোনদিকে চলে গেল, হতভম্ব কালুবাবু বাইরে এসে তার আর কোনও পাত্তা পেলেন না।

একটু এদিক-ওদিক ঘুরে কালুবাবু তাঁর হোটেলের দিকে রওনা হলেন। তাঁর মনে নানারকম চিন্তা ও খটকা দেখা দিল। প্রথমত মেয়েটি তাঁর নাম, চাকরিতে জয়েন করার কথা এসব জানল কী করে। তাঁর তো তেমন কোনও আত্মীয় বন্ধু কলকাতায় নেই—কে দিতে পারে তাঁর এই খবর অন্য কাউকে, বিশেষ করে এমন একটি সুন্দরী, সাবলীলা যুবতীকে।

সারা সন্ধ্যা এবং রাত এই প্রহেলিকা কালুবাবুকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ভালো করে ঘুম হল না তাঁর। শেষ বাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল, তবে হোটেলটি একেবারে বড় রাস্তার ওপরে, শেয়ালদার সামনে বাজার ঘেঁষে—হৈ হল্লায় চিৎকার চেঁচামেচিতে পাঁচটার আগেই ঘুম ভেঙে গেল।

ঠিক ঘুম ভাঙার মুহূর্তে মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখলেন কালুবাবু, যেতে যেতে হাত তুলে বলছে, 'ঠিক আছে, দেখা হবে।'

স্বপ্নভঙ্গের পর কালুবাবুর মনে পড়লো সত্যিই তো মেয়েটি বলেছিল, 'দেখা হবে।'

কিন্তু কোথায় কবে দেখা হবে। এই মহাশহরে তাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? কোথায় মিশে গেছে সে এই জনারণ্যে। তার নাম ধাম ঠিকানা কিছুই তো কালুবাবুর জানা নেই।

এক কাপ চা খেয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কালুবাবু বারবার মেয়েটিকে নিয়েই ভাবছিলেন এবং ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আবার মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখলেন।

নিদ্রা ও স্বপ্ন যখন ভাঙল তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। ঘুম থেকে ধড়ফড়

করে জেগে উঠে স্নান-খাওয়া না করেই চোখে মুখে একটু জল দিয়ে, মাথাটা তাড়াতাড়ি আঁচড়িয়ে কালুবাবু দ্রুতশ্বাস অফিসের দিকে ছুটলেন।

সর্বনাশ! প্রথম দিনেই লেট! উপরোলা কী বলবে!

এদিকে কলকাতার অফিস টাইমের যানবাহনের সমস্যা সম্পূর্ণ অবহিত নন কালুবাবু। অনেক হাঁফাহাঁফি, দৌড়াদৌড়ি করে যখন অফিসে গিয়ে পৌঁছলেন কালুবাবু শুনলেন হাজিরা খাতা বড় সাহেবের ঘরে গেছে সেখানে গিয়ে জয়েন করে হাজিরা খাতায় নাম তোলাতে হবে।

একজন বেয়ারা বড়সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরের হাফডোর খুলে 'আসতে পারি' বলে কালুবাবু সে ঘরে ঢুকে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই দেখতে পেলেন কালকের সেই মেট্রো রেলের এসকেলেটরের মেয়েটি সাহেবের চেয়ারে আসীনা।

কালুবাবুকে কিছু বলতে হল না। তার আগেই মেয়েটি বলল, 'কী হল, আজকেও এসকেলেটরে আটকিয়ে গিয়েছিলেন নাকি?'

এ গল্প এখানে শেষ নয়। এ গল্প এখানে শুরু।

কলকাতার এক কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের সপ্রতিভা বড়সাহেবাকে যে তাঁর অফিসে সদ্য আগত প্রধান সহায়কের সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে চৌরঙ্গীর আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায় তার কারণ আর কিছুই নয় তিনি তাঁকে রাস্তাঘাটে যাতায়াত শেখাচ্ছেন, এসকেলেটর থেকে নামাওঠা শেখাচ্ছেন।

এ নিয়ে যা কিছু গুজব রটেছে, যেটুকু গুঞ্জন উঠেছে সে সব বিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। সে সব সত্যি নয়।

ইলেকট্রিক কেটলি

(রাশিয়ান গল্পের ছায়াবলম্বনে)

তামারা সেখোনভ কাগজের প্যাকেটটি খুলে উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ যে একটা ইলেকট্রিক কেটলি।'

ইয়াকভ বরিসোভিচ একবার সদ্য কেনা জিনিসটার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ সবাই এটাকে কেটলি বলে বটে কিন্তু আসলে এটার নাম হওয়া উচিত উষ্ণীযন্ত্র। আমি মনে করি এ যন্ত্রটা সভ্যতার, অগ্রগতির প্রতীক, সংস্কৃতির ধারক ও গ্রাহক। আমাদের সুরুচির পরিচায়ক।'

তামারা এবং ইয়াকভ স্বামী-স্ত্রী। অনেকক্ষণ ধরে তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইলেকট্রিক কেটলিটা দেখল। কী সুন্দর, কালো রঙের হাতল, ঝকঝকে নিখুঁত উজ্জ্বল তাম্রপাত্রটি দেখে তারা অভিভূত। কেটলিটির গায়ে নির্দেশাবলী লেখা আছে, তাতে বলা আছে,

'দশ মিনিটে জল ফোটে।

বিদ্যুৎ ব্যয় হয় এক ইউনিট তিরিশ মিনিটে।

সতর্কীকরণ

সাবধান

জল ফুটিয়া যাওয়ার পর অবশ্য অবশ্য সুইচ অফ করিতে ভুলিবেন না।'

মুগ্ধ হয়ে দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, তারপর হঠাৎ ইয়াকভ বরিসোভিচ কেটলিটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাইরের দরজার দিকে বেরিয়ে গেল, যেতে যেতে বলল, 'আমি এখনই এটাকে জল ভরে ফুটিয়ে প্রতিবেশীদের সবাইকে দেখাচ্ছি। সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার এবং নতুন রুচির প্রতীক এই ইলেকট্রিক কেটলিটা সকলেরই দেখা উচিত, এর ব্যবস্থা, সকলেরই জানা উচিত।'

কিন্তু তামারা বাধা দিল। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার মনে একটা খটকা লেগেছে, সে স্বামীকে বলল, 'দেখো, আমি বলি কি তোমার এই সুরুচির বাহক যন্ত্রটিকে কাউকে দেখাতে যেয়ো না। আমার কেমন গোলমাল হবে মনে হচ্ছে।'

'কিসের গোলমাল?' ইয়াকভ রুখে দাঁড়াল, তারপর তামারার কথাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে দরজার বাইরেই লাউঞ্জে বেরিয়ে গেল। লাউঞ্জের পাশে যৌথ রান্নাঘর সেখানে তখন বেশ হৈচৈ করে সবাই রান্না করতে করতে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু ইয়াকভ ইলেকট্রিক কেটলি হাতে প্রবেশ করতেই হঠাৎ সবাই কেমন নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল।

ইয়াকভ ধরতে পারল কিছু গোলমাল হয়েছে। কিন্তু গোলমালটা যে কোথায় সে ভালোভাবে বুঝতে পারল না। একটু থমকে থেকে তারপর সে বলল, 'আপনারা কেউ এর আগে ইলেকট্রিক কেটলি দেখেছেন?'

সবাই অবাক হয়ে ইয়াকভের কথা শুনতে লাগল তবে তার প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না।

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে ইয়াকভ হাতের কেটলিটা উঁচু করে সবাইকে দেখাতে লাগল এবং বলল, 'দেখেছেন আপনারা কী সুন্দর জিনিসটা। এটা একটা বৈদ্যুতিক কেটলি। কোনও ধোঁয়া নেই, কালি নেই, আগুন নেই, দশ মিনিটে এক কেটলি জল ফুটে ওঠে। এ হল আধুনিক বিজ্ঞানের নবতম অবদান। এর মধ্যে সুরুচির যেমন পরিচয় রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যবহার করার সুবিধে।'

এতক্ষণ সবাই চুপ করে ছিল, হঠাৎ রান্নাঘরে এক প্রৌঢ়া স্যুপ ফোটাচ্ছিলেন, তিনি বলে বসলেন, 'কিন্তু ইলেকট্রিকের খরচা কত বেড়ে যাবে। সে খরচা কে দেবে?'

ইয়াকভ বোঝাতে যাচ্ছিল খরচা খুব বাড়বে না। কিন্তু তার কথা কে শোনে, রান্নাঘর ভর্তি মহিলা-পুরুষ ইলেকট্রিক বিলের খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া এবং অবুঝ লোকদের সঙ্গে কমন ইলেকট্রিক মিটারে একই যৌথ আবাসে থাকা কতটা বিপজ্জনক তাই নিয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল।

কিছু বোঝাতে না পেরে ইয়াকভ বিফল মনোরথ হয়ে কেটলি হাতে ঘরে ফিরে এল।

দরজার ফাঁক দিয়ে এতক্ষণ তামারা সবকিছু দেখেছে, ইয়াকভ ফিরে আসতে সে বলল, 'কেমন, বলেছিলাম না। তোমার সুরুচির বাহক উষ্ণী যন্ত্রটাকে প্রতিবেশীরা কেমন পছন্দ করল?'

ঠিক এই সময়ে উলটো দিকের ফ্ল্যাটের এক বৃদ্ধা মহিলা, যিনি পুরো ব্যাপারটা দেখেছিলেন এবং যিনি স্বভাবত একটু দয়ালু প্রকৃতির, ইয়াকভদের ফ্ল্যাটে এলেন।

বৃদ্ধা এসে বললেন, 'বাবা, তোমার কিন্তু সবাইকে ঐ কেটলি দেখানো উচিত হয়নি।'

ইয়াকভ বলল, 'কিন্তু কেন? এমন সুন্দর একটা নতুন ধরনের জিনিস লোককে দেখাব না!'

বৃদ্ধা বললেন, 'কী দেখবে তারা? এ জিনিস ওদের প্রত্যেকের আছে। তা ছাড়া ইলেকট্রিক সসপ্যান, ইলেকট্রিক ইস্তিরি প্রত্যেকেরই একটা দুটো করে আছে।'

ইয়াকভ বিস্মিত হওয়ায় বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু কেউ কাউকে দেখায় না তা হলে সবাই বলবে এর জন্যেই ইলেকট্রিকের বিল বেশি উঠেছে আর যে দেখাবে কিংবা যারটা জানাজানি হয়ে যাবে তার কাঁধেই বাড়তি বিলটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।'

সত্যি তাই হল। মাসের শেষে দেখা গেল ইলেকট্রিক বিল আগের মাসের থেকে সাড়ে চারশো টাকা বেশি হয়েছে। আবাসনের হাউস কমিটি ইয়াকভকেই এই জন্যে দায়ী করল এবং তার ঘাড়ে বিলের বর্ধিত অংশটি চাপিয়ে দিল।

ইয়াকভ প্রতিবাদ করল, কেটলিটা সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন, লেখা আছে আধঘণ্টায় এক ইউনিট বিদ্যুৎ লাগে। আমরা যদি এ দিয়ে দু'বেলাই চা করে থাকি তাহলে সারা মাসে বড় জোর কুড়ি ইউনিট ব্যয় হয়েছে। কুড়ি ইউনিটের জন্যে সাড়ে চারশো টাকা দিতে হবে কেন?'

তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল কিন্তু আবাসন কমিটি বাড়তি বিলের পয়সা ইয়াকভকেই দিতে হবে বলে রায় দিল।

ইয়াকভ ঠিক করল এভাবে হবে না, সে আর তামারা একত্রে দু'জনে এক-এক করে প্রত্যেক ফ্ল্যাটে গিয়ে ব্যাপারটা সবাইকে বোঝাবে।

বিকেলে নিজেদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তারা দু'জনে পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে সেখানেই ঢুকল। সেখানে ঢুকে দেখে আজ সকালে ইলেকট্রিক বিল নিয়ে যে মহিলা সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছিলেন তিনি একটা পেল্লায় ইলেকট্রিক ইস্তিরি দিয়ে গাদা গাদা কাপড় ইস্তিরি করছেন। মহিলা পিছন দিকে ঘুরে ইস্তিরি করছিলেন তাই ইয়াকভ আর তামারাকে দেখতে পাননি।

ভদ্রমহিলা যাতে লজ্জা না পান সেইভাবে ইয়াকভ তামারা সে ঘর থেকে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বের হয়ে এল।

এরপরের ফ্ল্যাটে দরজা বন্ধ দেখে, পাশে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তামারা উঁকি দিয়ে গৃহকর্ত্রীকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে মহিলা একটা বিরাট ইলেকট্রি-‑ উনুনে রান্না করছেন। সেখান থেকেও তারা সরে এল। এবং একটু ঘুরাঘুরি করার পরে ধরতে পারল এ বাড়ির সকলেই ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র যথেচ্ছ ব্যবহার করছে।

ব্যাপারটা সবাই গোপনে করছে। ইয়াকভ-তামারা বুঝতে পারল এদের প্রত্যেকের বাড়তি বিদ্যুতের ব্যয় এখন থেকে তাদের ঘাড়ে চাপবে।

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে পরের দিন সকালে ইয়াকভ রান্নাঘরে গিয়ে সকলের সামনে তার শখের ইলেকট্রিক কেটলিটা ফেলার ঝুড়িতে ঢেলে কাউকে কিছু না বলে ফ্ল্যাটে ফিরে এল, এসে তামারাকে বলল, 'এবার দেখি কী করে বাড়তি বিল আমাদের ঘাড়ে চাপায়।'

কিন্তু এতে সমস্যার কোনও সমাধান হল না। বরং ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল। বিকেলের মধ্যে সারা ফ্ল্যাট বাড়িতে রটে গেল যে ইয়াকভের শাশুড়িঠাকরুন তাঁর মেয়ে জামাইকে একটা ইলেকট্রিকের রান্নার সেট উপহার দিয়েছেন ওভেন সমেত তাই ইয়াকভ তার ইলেকট্রিক কেটলি আর দরকার নেই বলে ফেলে দিয়েছে।

লেখকবৃন্দ
(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

এই কলকাতা শহরে কত রকম আড্ডার জায়গা আছে। গলির মোড়ের রক থেকে ফুটপাতে চায়ের দোকানের বেঞ্চি, সুতৃপ্তি-বসন্ত কেবিন, কফি-হাউস-খালাসি টোলা-বারদুয়ারি। কেউ কেউ বঙ্গলক্ষ্মী হোটেলে অথবা নিত্যানন্দ ভোজনালয়ে ভাত-ডাল-তরকারি বা মাছের ঝোল খেতে খেতে আড্ডা দেয়।

এ সমস্তই বারোয়ারি জায়গা। যে কেউ গিয়ে বসতে পারে, তবে আড্ডা দিতে গেলে এলেম চাই, পরিচিতি চাই।

কিন্তু এসবের বাইরে রয়েছে নাক উঁচু, অভিজাত, খানদানি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল কিছু প্রতিষ্ঠান যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই, যে সব জায়গায় সভ্য হতে পারলে এমনকি নিমন্ত্রণ পেলে আমাদের মতো সামান্য লোক ধন্য হয়, জনে জনে বলে বেড়ায়।

এই সব প্রতিষ্ঠানের একদিকে রয়েছে যেমন রবিচক্র, শনিবাসর, শুক্রসন্ধ্যা, মঙ্গলদ্বীপ ইত্যাদি বারচিহ্নিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তেমনই রয়েছে ইন্ডিয়া ক্লাব, ক্লাইভ ইনস্টিটিউট, রয়াল জিমখানা ইত্যাদি বক্সওয়ালা কলোনিকাতর অল্পের-জন্যে-সাহেব-না-হওয়া মানুষদের সান্ধ্য মিলন সমিতি।

ঠিক এই সবের একপাশে রয়েছে 'লেখকবৃন্দ' নামে এক সংস্থা, যারা জানে শুধু তারাই জানে, এর চেয়ে নাক উঁচু সঙ্ঘ বা ক্লাব এই শহরে এখন আর একটিও নেই।

* * *

'লেখকবৃন্দ' নামক অভিজাত, নাক উঁচু প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয় হলো ল্যান্সডাউন রোডের একটি বড় বাড়ির দোতলায় একটি ফ্ল্যাটে। বেশ বড়সড় ফ্ল্যাট, ঘরে ঘরে চেয়ার-টেবিল, টেবিলে দিশি বিদিশি হাজার রকম পত্র-পত্রিকা, ইজিচেয়ার, ডিভান, র‍্যাক ভর্তি সুগ্রন্থিত, সুদৃশ্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী—কোনও কিছুর অভাব নেই।

তাসের আসর রয়েছে। সুসজ্জিত বেয়ারারা রয়েছে পানীয় ও খাদ্য সরবরাহের জন্যে, শোনা যাচ্ছে শিগগিরই সুন্দরী তরুণীদের মহিলা বেয়ারা বা হসটেস হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।

এ সব বিস্তারিত বর্ণনা এখন থাক। আজকের সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা বলি। এক বিখ্যাত, বিতর্কিত নাট্যকারের সঙ্গী ও অতিথিরূপে আজ আমি 'লেখকবৃন্দে' এসেছি। এর আগেও দুয়েকবার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে আমার। এঁরা কেউ কেউ আমাকে অল্পসল্প চেনেন।

ঢুকেই দেখি আজ জোর আড্ডা জমেছে। দিকপাল লেখক ও ক্ষণজন্মা কবিরা কী একটা বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত। এখনকার এক নম্বর ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত অনাথ ভট্টাচার্যের হাতে এ মাসের সাহিত্য পত্রিকা 'রত্নাবলী'। 'রত্নাবলী' খুবই চিন্তাশীল, উচ্চমার্গের কাগজ।

'রত্নাবলী'র একটি পৃষ্ঠা খুলে অনাথ ভট্টাচার্য জোরে জোরে পড়ে কিছুটা অংশ

সবাইকে শোনালেন। বিগত যুগের জনপ্রিয় গল্পকার মহাদেব সান্যালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রত্নাবলীতে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সে প্রবন্ধে যথারীতি মহাদেববাবুর উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। মহাদেববাবু আজ প্রায় চল্লিশ বছর বিগত হয়েছেন, তিনি নিন্দা-প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে এখন। কিন্তু এই প্রবন্ধটি পাঠ করে অনাথ ভট্টাচার্য খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

প্রবন্ধের নির্দিষ্ট অংশটি পাঠ করার পর টেবিলে একটা জোর ঘুঁষি মেরে অনাথবাবু বললেন, 'যত সব রাবিশ। মহাদেব সান্যাল আবার লেখক ছিল নাকি? যতসব ছিচকাঁদুনে, মেয়ে ভোলানো অসম্ভব, অবাস্তব গল্প।'

কবি ভবনাথ মাইতি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আবার অনাথবাবু বললেন, 'মহাদেব সান্যালের সেই বেস্টসেলার 'ভোলামামা' উপন্যাসের কথা মনে আছে?'

প্রায় সকলেই ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল আছে। তখন অনাথবাবু বললেন, 'ঐ ভোলামামার চরিত্রটাই ধরুন। মানুষ অতটা আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার চেয়েও বড় কথা এককালের সহপাঠী রাঘবচন্দ্র যখন ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে তখন ভোলা সামান্য সুবিধের জন্য সেই রাঘবের কত রকম স্তুতি-তোষামোদ করছে। কোনও মানুষ কি তাই করে, কোনও ভদ্রলোক কি তাই করতে পারে?'

অনাথবাবুর প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না বলে তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে গেলেন, প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে আমাদের এই 'লেখকবৃন্দ' এখানে তো কম লোক নেই। আপনারা কেউ বলতে পারবেন আমাদের মধ্যে এমন একজনও আছে যে মহাদেব সান্যালের ঐ ভোলামামার মতো নির্লজ্জ তোষামোদকারী হতে পারবে?'

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর গগনচন্দ্র দাস, রানাঘাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি উপাচার্য, তাঁকেই টার্গেট করলেন অনাথবাবু, তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো, তুমিই বলো। তুমিই প্রশ্নটার জবাব দাও। তুমিও তো 'লেখকবৃন্দের' একজন।'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে গগন দাস বললেন, 'লেখকবৃন্দ এবার আমাকে ছাড়তে হচ্ছে। আমি তো দিল্লি চলে যাচ্ছি।'

'দিল্লি'? অনাথবাবু সমেত প্রায় সবাই সমবেতভাবে প্রশ্ন করলেন। সঙ্গে অনাথবাবু যোগ করলেন, 'কেন তোমার রানাঘাট দোষ করলে কি?'

ডক্টর গগন দাস একটু থেমে বিনীতভাবে বললেন, দিল্লিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে উপদেষ্টা পদে আমি মনোনয়ন পেয়েছি। এই সোমবারই কাজে যোগদান করতে যাচ্ছি।'

গগন দাসের এই খবর শুনে সবাই কেমন একটু যেন হকচকিয়ে গেল। তিনি সবাইকে করজোড়ে নমস্কার করে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গগন দাসকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি গগন। এত বড় দায়িত্ব তুমি পেলে।'

গগনবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'চাকরি তো চাকরিই। এক চাকরি থেকে আরেক চাকরিতে যাচ্ছি এই যা।'

অনাথবাবু বললেন, 'আরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টার কাজ বিরাট ব্যাপার। কত ক্ষমতা, কত দায়িত্ব। তুমি যে জীবনে উন্নতি করবে সে আমি জানতাম।'

গগনবাবু বললেন, 'অনাথদা আপনি আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না।'

অনাথবাবু বললেন, 'লজ্জার কথা কি বলছো? এ আমাদের কত বড় গৌরবের কথা। শুধু গৌরব নয়, তুমি আমাদের কত বড় ভরসা কত বড় সহায়।'

গগনবাবু আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গগনবাবুর পিছনে অনাথবাবুও বেরোলেন। মিনিট দশেক পরে ও ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যখন পাশের ঘরে যাচ্ছি দেখি সিঁড়ির মুখে বাইরের দরজার পাশে গগনবাবুকে আগলিয়ে অনাথবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিশ্চুপ গগনবাবুকে অনাথবাবু বলে যাচ্ছেন, 'দ্যাখো গগন আমি যদি তোমার কোনও কাজে লাগি ধন্য বোধ করব। আমার পুরো সেট বই তোমাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের ঐ সাহিত্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা বোধহয় আমার বইগুলো ভালো করে পড়েননি। তুমি যদি বলো আমি নিজে দিল্লি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমার ব্যাপারটা তুমি একটু দেখো। আমি জানি এতদিন আমার প্রতি যে অবিচার হয়েছে, তোমার আমলে তার সুরাহা হবে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। বারবার মহাদেব সান্যালের সেই ভোলামামা চরিত্রের কথা মনে পড়তে লাগল।

জনৈক বক্তার কাহিনী

(বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর শীতকালের শেষাশেষি। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ সেটা, উত্তরবঙ্গের এই মফস্বল শহর হঠাৎই জমজমাট হয়ে উঠেছিল একটা মেলাকে ঘিরে।

মেলাটা আর কিছুই নয়, একটা বাৎসরিক সরকারি অনুষ্ঠান, প্রত্যেক বছরে ঘুরে ঘুরে একেক রাজ্যের একেক শহরে হয়। এর গালভরা নাম 'পূর্বাঞ্চল কৃষি ও গ্রামীণ প্রদর্শনী।' এতে চার-পাঁচটি এতদঞ্চলের রাজ্য যোগদান করে।

মেলা অর্থাৎ প্রদর্শনীটি খুব অভিনব বা অসাধারণ না হলেও যে শহরে হচ্ছে সে শহরে এ জাতীয় মেলা আর কখনও হয়নি। ফলে শহর এবং আশপাশের দশবিশ মাইলের মধ্যে যত গ্রামগঞ্জ আছে সেখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভেঙে পড়েছে এই মেলায়।

কেউ আট হাত লম্বা ছ'ইঞ্চি ব্যাস কাটোয়ার ডাঁটা দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, কেউ বা ত্রিপুরার আড়াই মণি মানকচুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেখে যারপরনাই স্তম্ভিত। এ ছাড়া আছে সম্বলপুরের রামছাগল যার উচ্চতা ও আয়তন মোষের মতো। আর আছে ভাগলপুর কৃষি বিদ্যালয়ের আঙুর-আলু। ছোট-ছোট আঙুরের মতো সাইজের গুচ্ছগুচ্ছ আলু শিকড়ে ঝুলে রয়েছে, দূর থেকে মনে হয় সত্যিই বুঝি আঙুরগুচ্ছ।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ হল একটি কাজু বাদামের গাছের। অনেকটা জায়গা মাটি খুঁড়ে, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বালি বিছিয়ে সেখানে আস্ত কাজু গাছটা লাগানো হয়েছে।

এ অঞ্চলের মানুষ ডাঁটা, মানকচু কিংবা আলু যথেষ্টই দেখেছে, সেগুলো কি ভাবে

উৎপন্ন হয় সেও তারা মোটামুটি জানে। কিন্তু কাজু গাছ সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণা নেই।

তাছাড়া যারাই কাজু বৃক্ষ প্রদর্শনীতে আসছে (এক গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে বেরোতে হয়) কক্ষের প্রস্থান পথে নিখিল ভারত কাজু বিক্রয়, বিপণন, উন্নয়ন, প্রচার এবং সম্প্রসারণ পর্ষদ তাদের হাতে এক টুকরো কাজু বাদাম উপহার দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের মফস্বল শহরের গরিব মানুষ, কাজু বাদামের স্বাদ তারা কেউই এর আগে পায়নি এবং এবার পেয়ে বিহুল হয়ে গেছে। ফলে প্রস্থান পথ দিয়ে বেরিয়ে আবার প্রবেশ পথ দিয়ে তারা ঢুকছে আরেকবার কাজু বাদামের স্বাদ গ্রহণ করতে এবং সে জন্যেই কাজু প্রদর্শনীতে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে আর বাড়ছে।

কাজু প্রদর্শনীর আরও একটি খুব বড় আকর্ষণ রয়েছে। সেটা হল রূপালী পালের বক্তৃতা।

বক্তৃতা বিষয়ে বলার আগে বক্তার বিষয়ে একটু বলে নেওয়া অনুচিত হবে না। শ্রীমতী রূপালী পাল হলেন কাজু পর্ষদের জনসংযোগ অধিকারিক, বলা বাহুল্য তিনি সুন্দরী ও সুবেশা এবং তাঁর চেহারায় যৌবনের অনিবার্য চটক রয়েছে।

শ্রীমতী রূপালী সুমধুর হেসে একটা ঝকঝকে বড় স্টেনলেস স্টিলের নিষ্কলঙ্ক গামলা থেকে প্রত্যেক দর্শককে একটি করে কাজু বাদাম তুলে দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে কাজু গাছটিকে দেখিয়ে বলছেন, এই সব কাজুবাদাম এইটুকু একটা গাছে হয়েছে। এ গাছের যিনি দেখাশোনা করেন, এ রকম বহু কাজু গাছের যিনি চাষ করেন মেদিনীপুরের রামনগর থেকে সেই বিশ্বম্ভর জানা দুয়েকদিনের মধ্যে এই মেলায় আসবেন। তিনি এ বছরে সর্বোত্তম চাষী নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে কৃষি প্রদর্শনীর তরফ থেকে।

উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অতিরিক্ত কৌতূহলী কেউ কেউ কাজু গাছটির ডালে পাতায় হাত বোলাচ্ছেন, রূপালী পাল সে রকম কিছু নজরে এলে সস্নেহে বাধা দিচ্ছেন, আর বলছেন, ‘গাছ ঘাঁটবেন না, গাছের ক্ষতি হবে। একজিবিশনের শেষে গাছটাকে মেদিনীপুরে বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।’

এই রকম ভালোই চলছিল।

সেদিন কৃষিমেলার শেষ দিন। স্বভাবতই ভিড় উপচে পড়েছে। কাজু প্রদর্শনীতে ভিড় সবচেয়ে বেশি।

আজ শ্রীমতী রূপালী পাল বিশেষ সেজে এসেছেন। শেষ শীতের উত্তুরে হাওয়ায় তাঁর শ্যাম্পুলালিত বব চুল উড়ছে। রঙিন লাল কালো চেক-চেক সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ম্যাচ করা কালো পাড় গাঢ়লাল আলোয়ান।

ঝলমল করছেন রূপালী পাল। তাঁর হাসি আজ আরও উচ্ছল। তাঁর মুখে কথার তুবড়ি ফুটছে। সবাই কাজু বাদামদায়িনী রূপালীকে সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখছে।

আজ প্রদর্শনীর শেষ দিনেও মেদিনীপুরের সেই বিশ্বম্ভরবাবু, এই কাজুগাছের মালিক যিনি সর্বোত্তম চাষীর গোল্ড মেডেল পেয়েছেন তিনি কিন্তু এসে পৌঁছোননি।

বিশ্বম্ভরবাবু এলে রূপালী তাঁকে প্রদর্শনীসভার মঞ্চে নিয়ে যাবেন। সেখানেই পুরস্কার প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যার পর।

বিকেলের দিকে রূপালী পালের মনে হল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরা তাও মোটা কাপড়ের, ভদ্রলোকের মাথার চুল কাঁচাপাকা, দু একটা দাঁত নেই সামনের দিকে, অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাবার্তা কাজুপ্রদান এবং তৎসহ বক্তৃতা পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করছেন।

রূপালী ভাবলেন ভদ্রলোক বোধহয় সঙ্কোচ বশত তাঁর কাছে আসছেন না, কাজুবাদাম গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছেন। রূপালী তাঁর সুরঞ্জিত তর্জনী তুলে ভদ্রলোককে ডাকলেন, 'নিন, আপনি একটু কাজু নিন। খেয়ে দেখুন চমৎকার, জীবনে স্বাদ ভুলতে পারবেন না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কাজুগুলো কি মিইয়ে গেছে?'

রূপালী বললেন, 'মিইয়ে যাবে কেন? চমৎকার মুচমুচে রয়েছে। নিন একটা খেয়ে দেখুন।'

সুন্দরী রমণীর অনুরোধ কিন্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রত্যাখান করলেন, তাঁর যুক্তি অবশ্য পরিষ্কার 'অর্ধেক দাঁত নেই, বাকিগুলো নড়বড়ে। মুচমুচে বাদাম চেবানোর ক্ষমতা নেই। মিয়োনো হলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

ইতিমধ্যে রূপালী আবার অন্যদের কাজুচাষ এবং কাজুবাদাম সম্পর্কে অনর্গল বলে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়ে। আবার তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তে রূপালী তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম বিশ্বম্ভর জানা। আমি মেদিনীপুরের রামনগর থেকে এসেছি।'

রূপালী বললেন, 'আরে আপনার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি। আপনি ওই কাজু গাছটার পাশে দাঁড়ান। আমি আমার কাজটা আর কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে আসছি। আপনাকে মঞ্চে নিয়ে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক সেই কাজুগাছের পাশে এসে দাঁড়ালেন, সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিত কাজুগাছটি খুব কৌতূহল ভরে দেখলেন, তারপর রূপালী আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কী গাছ?'

রূপালীর ভ্রূকুঞ্চিত হল, উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকি? আপনিই তো মিস্টার বিশ্বম্ভর জানা?'

ভদ্রলোক বললেন 'হ্যাঁ।'

রূপালী বললেন, 'এটা কাজুগাছ। এটা তো আপনারই কাজুগাছ। আপনি কাজুচাষী, কাজুগাছ চিনতে পারছেন না।'

ভদ্রলোক অপলক দৃষ্টিতে গাছটার দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন। গাছটার গায়ে বড় বড় বাংলা হরফে প্ল্যাকার্ডে লেখা রয়েছে 'কাজু বাদামের গাছ।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ঘাড় নেড়ে রূপালীকে বললেন, 'দেখুন দিদি কোথাও কোনও ভুল হয়েছে, কিছু গোলমাল হয়েছে। কাজুগাছ আমি জানি, খুব ভালো চিনি। এটা আর যাই হোক কাজুগাছ নয়। আশশ্যাওড়া হতে পারে, মহানিম হতে পারে, এমনকি জবাগাছ কিংবা খেজুর গাছ বললেও আমি আপত্তি করব না কিন্তু এটা কাজুগাছ নয়, আমার তো নয়ই, কারও কাজুগাছ নয় এটা, কাজুগাছ এরকম হয় না। কোনও দিন হয়নি।'

রূপালী তাঁর এতদিন বর্ণিত কাজুগাছ এবং সর্বোত্তম কাজুচাষী বিশ্বম্ভর জানাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন।

ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়
(নাট্যগল্প, বিদেশি গল্পের ছায়ায়)

প্রথম দৃশ্য

[একটি ছোট রেলওয়ে স্টেশন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কোনও লোকজন নেই। লাইনে কোনও গাড়িও নেই। একটু দূরে টিকিট কাউন্টারে আর স্টেশন মাস্টারের ঘরে আলো জ্বলছে। সেখানে দু-একজন রেল কর্মচারির অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় ইনা নামে একটি অল্প বয়সী যুবতী মেয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। তার কেমন একটা সচকিত, উদভ্রান্ত ভাব। তার হাতে একটা টাইম টেবিল।

ইনা প্ল্যাটফর্মের ক্ষীণ আলোয় টাইম টেবিলের পাতা খুলে সময় মেলাল। তারপর একা একাই বলতে লাগল...]

ইনা : হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়েছে বিকেল পাঁচটায়। এখন হল সন্ধে সাড়ে ছ'টা। আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে ঝড়ের মতো ছুটে যাবে রাজধানী এক্সপ্রেস। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব তার চাকার নিচে।

কোনও কষ্ট নেই। কোনও যন্ত্রণা নেই। মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আমার শরীর। প্যাসেঞ্জার গাড়ি কি মালগাড়ির নিচে ঝাঁপালে মরতে সময় লাগবে, কষ্ট হবে। তাই এই রাজধানী এক্সপ্রেসের চাকার তলাই আমার সবচেয়ে পছন্দ।

আর তারপর, যখন আমার আত্মহত্যার খবর পেয়ে জংশন থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে আসবে আর আসবে বিশ্বাসঘাতক অনুপম যে আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে, যে আমার এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী—সবাই বোকা বনে যাবে, অনুপমও বোকা বনে যাবে, একদম জব্দ হয়ে যাবে।

[রেল প্ল্যাটফর্মে ইনা দ্রুত পদচারণা করতে থাকে।]

ইনা : (একটু পরে অস্থির হয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এদিকে যে পৌনে সাতটা বাজতে চলল, রাজধানী এক্সপ্রেসটা এত দেরি করছে। ওঃ, আমি আর পারছি না। কখন যে ট্রেনটা আসবে? আমি ক্লান্ত, এই জীবনের ভার আমি আর বইতে পারছি না।

[প্লাটফর্মে জনৈক রেল কর্মচারির প্রবেশ]

ইনা : (কর্মচারিটির উদ্দেশে) আচ্ছা মশায়, বলতে পারেন রাজধানী এক্সপ্রেস কখন আসবে?

রেল কর্মচারি : আপনি কোথায় যাবেন? রাজধানী এক্সপ্রেস তো এই ছোট স্টেশনে দাঁড়াবে না।

ইনা : (উত্তেজিতভাবে) আমি কোথাও যাব না। আমি শুধু জানতে চাইছি রাজধানী এক্সপ্রেস ঠিক সময়ে চলছে কি না?

রেল কর্মচারি : ঠিক সময়েই চলছে তবে ব্যাপার হয়েছে কি একটা মালগাড়ি লাইনে রয়েছে সেটাকে আগে পাস করাতে গিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস পেছনে আটকিয়ে গিয়েছে।

ইনা : কেন মালগাড়িটা পাস করাতে গেলেন? রাজধানী এক্সপ্রেস দাঁড় করিয়ে রেখে

মালগাড়ি পার করাবেন?

(ইনার হাবভাব দেখে রেল কর্মচারিটি তাড়াতাড়ি স্টেশন মাস্টারের ঘরে ছুটে গেলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্টেশন মাস্টারের ঘর। কয়েকটা কাঠের টেবিল-চেয়ার। একটা খুব পুরনো লোহার আলমারি। ঘরে স্টেশন মাস্টার একা বসে রয়েছেন, এমন সময় রেল কর্মচারি ভদ্রলোক রীতিমত ব্যস্ত হয়ে ঢুকলেন।)

স্টেশন মাস্টার : কী হল হরিদাস?

হরিদাস : মাস্টার মশায় সর্বনাশ হয়েছে বোধহয়।

স্টেশন মাস্টার : (বিস্মিত হয়ে) কী সর্বনাশ হল?

হরিদাস : সেই যে মেমসাহেব, জংশনের অফিসে নতুন মেয়ে অফিসার এসেছেন যিনি গতমাসে আগের স্টেশনের হারানবাবুকে ডিসমিস করেছেন তিনি বোধহয় আজ আমাদের স্টেশনে এসেছেন।

স্টেশন মাস্টার : তুমি তো তাঁকে আগে দেখোনি। কী করে চিনলে তাঁকে?

হরিদাস : আরে আমাকে যে তিনি প্রশ্ন করলেন রাজধানী এক্সপ্রেস লেট করাচ্ছি কেন? মালগাড়ি আগে পাস করাচ্ছি কেন?

স্টেশন মাস্টার : সর্বনাশ! তিনি কোথায়?

হরিদাস : (দরজা দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ঐ যে হাতে টাইম টেবিল, প্ল্যাটফর্মে জোরে জোরে হাঁটছেন।

স্টেশন মাস্টার : জয় দুর্গা, জয় দুর্গা। চলো মেমসাহেবের কাছে যাই। বুঝে দেখি ব্যাপারটা ঠিক কী?

[দুজনের ঘর থেকে প্ল্যাটফর্মের দিকে দ্রুত প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

আবার সেই প্ল্যাটফর্ম, ইনা দ্রুত পায়চারি করছে। হঠাৎ তার নজরে এল সন্ত্রস্তভাবে স্টেশন মাস্টার ও আগের রেল কর্মচারিটি অর্থাৎ হরিদাস তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ইনা : (স্টেশন মাস্টারের সামনে গিয়ে) আপনিই এই স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। কী নাম আপনার?

স্টেশন মাস্টার : আজ্ঞে আমার নাম ভবনাথ পাল। আর ইনি হলেন আমার সহকারি, হরিদাস দাস।

ইনা : ঠিক আছে। আপনাদের নাম জানা গেল। এবার বলুন রাজধানী এক্সপ্রেস আটকিয়ে রেখেছেন কেন?

ভবনাথ : আজ্ঞে, ঠিক আটকিয়ে রাখিনি।

ইনা : (ধমক দিয়ে) আটকিয়ে রাখেননি। এ স্টেশন দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস কখন যাবার কথা?

ভবনাথ : (আমতা আমতা করে) আজ্ঞে, ছ'টা চল্লিশ নাগাদ।

ইনা : এখন ক'টা বাজে?

ভবনাথ : (অধিকতর ইতস্তত করে, পকেট থেকে পুরনো কালের গোল ঘড়ি বার করে ভালো করে দেখে) আজ্ঞে প্রায় সোয়া সাতটা।

ইনা : তবে? জানেন এই পঁয়ত্রিশ মিনিটে একটা লোকের জীবন কত দুর্বিষহ হতে পারে? তার কত ক্ষতি হতে পারে?

ভবনাথ : সেটা ঠিক। কিন্তু আমি শুনেছিলাম মালগাড়িটা বন্যা এলাকার জন্যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে তাই একটু তাড়াতাড়ি পাস করাচ্ছিলাম। আর রাজধানী সময়টা ঠিকই মেক-আপ করে নিতে পারবে। প্রথম থামবে সেই ধানবাদে, এর মধ্যে গাড়িটা নিশ্চয়ই সময়টুকু মেক-আপ...

[ভবনাথ কথা বলতে বলতে এবং ইনা কিছু বোঝার আগেই বিদ্যুৎগতিতে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস চলে গেল।]

ভবনাথ : ঐ তো রাজধানী চলে গেল। দারুণ স্পিড তুলেছে।

ইনা : রাজধানী এক্সপ্রেস চলে গেল। (যেন বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেছে এমনভাবে স্বচ্ছ, নিশ্চিত গলায় বলল) তা হলে?

[ইনার কণ্ঠস্বরে নমনীয় পরিবর্তন দেখে এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে ভবনাথ হরিদাসের দিকে কিঞ্চিৎ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে তারপর বললেন।]

ভবনাখ : মেমসাহেব, এরকম গাফিলতি আর কখনও হবে না।

ইনা : সে তো বুঝলাম। কিন্তু এরপরে জংশন যাওয়ার ট্রেন কখন।

হরিদাস : আজ্ঞে, সে রাত সাড়ে এগারোটায়।

ইনা : সাড়ে এগারোটা, সে তো অনেক দেরি।

হরিদাস : মেমসাহেব, একটা কথা বলব?

ইনা : কী কথা?

হরিদাস : আজ আর আমাদের স্টেশনের মাঠে একটা খুব ভালো যাত্রা হচ্ছে 'ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়'।

ইনা : ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়?

[হরিদাস কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিলেন ভবনাথ।]

ভবনাথ : দারুণ বই, যাত্রা সরস্বতী মাধুরী দীক্ষিত হিরোইন। লাস্ট সিনে মাধুরী ঝাঁপিয়ে পড়বে চলন্ত রেলগাড়ির সামনে, মাইকে বাজবে ধনঞ্জয়ের গান 'রাধে ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়'।

(ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায় বলতে বলতে একটু বিমনা হয়ে গেলেন প্রৌঢ় ভবনাথ। সেই সুযোগে হরিদাস মুখ খুলল।)

হরিদাস : মেমসাহেব, সাড়ে দশটার মধ্যে পালা শেষ হয়ে যাবে। তারপর গাড়িতে আপনাকে তুলে দেব। চলন্ত ট্রেনের সামনে মাধুরীর ঝাঁপিয়ে পড়া, সে যে কি দৃশ্য মেমসাহেব, আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

ইনা : (কিঞ্চিৎ বিব্রত) কিন্তু এভাবে রেলে কাটা পড়ে লাভ কি?

হরিদাস : লাভ-লোকসানের কথা নয়। এরকম পালা হয় না মেমসাহেব।

ভবনাথ : মেমসাহেব একবার দেখলে বুঝতে পারবেন।

ইনা : বলছেন যখন, চলুন দেখে আসি। তবে এসব আত্মহত্যার সিন আমার মোটে ভালো লাগে না।

অধ্যাপকের জবানবন্দী
(চেকভের গল্পের ছায়ায়)

কলকাতা শহরে হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক আছেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত একজন অধ্যাপক, পদ্মভূষণ। এক সময় রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর দিশি ও বিদিশি খেতাব ও উপাধির সংখ্যা এত বেশি যে সে সব কোনও লেটার হেডে দিতে গেলে সে পাতায় আর চিঠি লিখবার জায়গা থাকবে না।

শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশের সবচেয়ে উঁচু ও অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত যাতায়াত। তাঁর বন্ধুত্বের দীর্ঘ তালিকা সম্ভ্রম ও সমীহ উৎপাদক। জ্ঞানপীঠ বিজয়ী লেখক নোবেল পেলেও-পেতে-পারেন অর্থনীতিবিদ, কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রী—কে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাইস চ্যান্সেলার এবং সরকারি শিক্ষাসচিব ও অধিকর্তারা তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন।

তিনি এটা, তিনি সেটা। যে কোনও সভা সভাপতি হিসেবে তাঁকে পেলে ধন্য হয়ে যায়। রাজনীতির ঘোলা জল তাঁর পাশ কাটিয়ে যায়, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তিনি উর্ধ্বে—তিনি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত কথা, তিনি সব।

* * *

আমি অধ্যাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়। এই হল আমার পরিচয়। যে কোনও সংবাদে বা আলোচনায় আমার নামের আগে মাননীয় বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়। আমার সম্পর্কে কোনও কটূক্তি বা অপমানকর মন্তব্য কখনও যদি কেউ করে তবে সেটা কুরুচির পরিচয় বলে গণ্য হয়।

আমার অবশ্য কয়েকটা গুণ আছে। আমি অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারি, সাধারণ মানুষের পক্ষে যেটা অকল্পনীয়।

এবং আমি প্রতিভাবান। আমার মতে, পরিশ্রমী লোকের ক্ষেত্রে সে গুণটাও খুবই মূল্যবান। লোকে যদি বলে আমি একজন সদ্বংশজাত, সৎ ভদ্রলোক, সেটাও ভুল বলা হবে না। আমি কোনও বাজে লোকের সঙ্গে বা বাজে বিষয়ে কখনও তর্কে জড়িয়ে পড়ি না, সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করি না, শোকসভায় বক্তৃতা দিতে যাই না, দূরদর্শনে চেহারা দেখাই না।

আমার বয়েস এখন বাষট্টি। দাঁত প্রায় সবই পড়ে গেছে, মাথায় মস্ত টাক। আমি মোটেই সুদর্শন নই। অধ্যাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় যতই নামজাদা লোক হোন না কেন তিনি দেখতে খুব কুৎসিত।

তার ওপরে বয়েস বাড়ছে। আমার শরীর রুগ্ন হয়ে পড়ছে। আমার বুক ফাঁপা। কথা বলতে গেলে আমার মুখটা ঝুলে পড়ে আজকাল, হাসার সময় মুখের ত্বকে বার্ধক্যের কুঞ্চন রেখা ফুটে ওঠে। আবার কখনও কখনও এমনি এমনিই আমার মুখের পেশীগুলো একা একা লাফাতে থাকে। আমি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, এতে আমার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যা দেখে লোকে ভাবে, 'ভদ্রলোক আর বেশিদিন নেই।'

তবে এখনও আমি গুছিয়ে বক্তৃতা করতে পারি। দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও লোকে

আমার বক্তৃতা মন দিয়ে শোনে। আমার আন্তরিকতা, আমার উৎসাহ, আমার ভাষা, আমার চিন্তার স্বচ্ছতা, আমার বক্তব্যের সরসতা এবং সেই সঙ্গে সরলতা এখনও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

আমার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও একঘেয়ে। কখনও কখনও আমার গলা মেঠো রাজনৈতিক নেতার মতো ফ্যাঁশফেঁসে ও মাধুর্যহীন, কিন্তু লোকে আমার বক্তৃতা শোনার সময় সে সব খেয়াল করে না। তারা আমার বক্তৃতায় মজে যায়।

আমি অবশ্য গুছিয়ে লিখতে পারি না, একেবারেই না। যেভাবে সাজিয়ে লিখতে পারলে পাঠকের কাছে লেখা প্রাঞ্জল হয় আমার লেখার মধ্যে তার অভাব রয়েছে। কিন্তু আমার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, আমার নিরহঙ্কার সরলতা আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা আমাকে এমন একটা উঁচু জায়গায় ধরে রেখেছে যে আমার খারাপ চেহারা কিংবা কিছু না লেখা এসব জনসাধারণ ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। তাদের কাছে অধ্যাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় এ সব তুচ্ছ জিনিসের ঢের ঊর্ধ্বের এক অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা।

কিন্তু আমি তো তা নই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যে মাইনে পাই আমার তাতে চলে না। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চালচলন, জীবনধারণের মান খুব উঁচুতে রাখতে হয়েছে। আমাকে যাঁরা নিমন্ত্রণ করেন তাঁরা সবাই গণ্যমান্য অবস্থাপন্ন লোক। তাঁদের সে নিমন্ত্রণে যাই আর না যাই, পরে সামাজিক শিষ্টতা অনুযায়ী আমাকেও একদিন নিমন্ত্রণ করতে হয় তাঁদের। এটাই রীতি।

আমাব এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি বাইরে পড়ে। ইচ্ছে করলে এখানে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারত, আমার কিছু সুরাহা হত। কিন্তু তা হয়নি এবং সেই আমার কাছে মাঝে মধ্যে টাকা চেয়ে পাঠায়। নিয়মিত খরচও পাঠাতে হয়।

আমার মেয়েটি নাচের ইস্কুলে যায়। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। তার সাজপোশাকের জন্য একটু খরচ বেশি। তার মা, আমার স্ত্রী, প্রায়ই অনুযোগ করেন, 'সবাই জানে এত বড় অধ্যাপকের মেয়ে কিন্তু মেয়ের পোশাক-আশাকে আমরা তেমন খবচ করতে পারি না। অথচ ওর বন্ধুরা কেমন দামি দামি ঝলমলে পোশাক পরে। এই তো সেদিন ওর এক বন্ধু ললিতা, স্টিল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের মেয়ে একটা বালুচরী শাড়ি পরে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করায় বলল, সাড়ে চার হাজার টাকা দাম।'

এদিকে বাড়ির কাজের মেয়েটার পাঁচ মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেছে। মাসে দুশো টাকা করে মাইনে, মানে পাঁচ মাসে হাজার টাকা। সে অনেক টাকা।

ছেলেকে মাসে হাজার টাকা করে পাঠাই। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন তাকে আটশো টাকা পাঠিয়ে বাকি দুশো টাকা মাসে মাসে কাজের মেয়েটাকে দিয়ে দিলেই হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে, আপনারা তো জানেন, একটা পানের দোকানদারের আয় তার তিনগুণ। আর আমার যতই নামডাক থাক না কেন কেউ তো আমার জন্যে আলাদা বেতনহার দেবে না।

অথচ আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার জন্যে এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছেন যার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আগে আমি ট্রামে-বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম। এখন ট্যাক্সি ছাড়া আমার বাইরে

বেরনো নিষেধ। এমনকি এ কথাও ভাবা হচ্ছে যে, একটা পুরনো গাড়ি কেনা যায় কি না। হয়তো ধার দেনা করে প্রতিভেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে একটা গাড়ি কিনে ফেলা যায়, কিন্তু তার মাস-মাস খরচ, ড্রাইভারের মাইনে, তেল এসব আমার আয় থেকে সম্ভব হবে না।

আগে চমৎকার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পড়াতে বেরোতাম। এখন আর তা সম্ভব নয়, আমার স্ত্রী জোর করে কাঁধে একটা চাদর কিংবা গায়ে একটা গলাবন্ধ কোট চাপিয়ে দেন। এই গরমে গলদঘর্ম হয়ে মারা যাই আর কি।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও খুব অসুবিধে হয়েছে। চিরকাল আমার প্রিয় প্রাতরাশ ছিল বাতাসা-মুড়ি। কিন্তু বাসায় তো লোক আসার বিরাম নেই। আমার ছাত্রেরা আসে, সহকর্মীরা আসে, বাইরের মানুষ, সরকারি লোকজন এমনকি কখনও কখনও বিদেশিরাও আসেন। তাঁদের সামনে আমি অধ্যাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়—এত বড় একজন নামজাদা লোক সেই আমি মুড়ি-বাতাসা চিবোতে পারি না। আমাকে দেয়া হয় বীট-গাজর সিম সেদ্ধ, স্বাদহীন গন্ধহীন পাতলা স্যুপ এবং আরও অখাদ্য কুখাদ্য যা দেখলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

কয়েকদিন হল আমার জন্যে একটা ড্রেসিং গাউন কিনে আনা হয়েছে। আগে বাড়িতে খালি গায়ে থাকতুম, এখন দিনরাত সেই ড্রেসিং গাউনটা পরে থাকতে হয়। কখন কে আসে তার তো ঠিক নেই।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রায় সবাই গত হয়েছে। এখন যারাই আসছে সমীহ সহকারে আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। নামজাদা অধ্যাপকরা এখনও আমাকে দেখলে সিগারেট লুকিয়ে ফেলেন। মেয়েরা শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা ঢাকে।

এ সবই আমি উপভোগ করি। আমার খ্যাতি, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার বিপুল সামাজিক মর্যাদা।

কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা, ঐ তো বললাম। আমার কাজের লোকের আমি মাইনে ঠিকমত দিতে পারি না। আমার খ্যাতি আমাকে এক পয়সাও সাহায্য করেনি বরং আমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে বয়স বাড়ছে। আমার স্বাস্থ্যও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক থেকে খবর আসে আমাকে নাকি জাতীয় অধ্যাপক করা হবে। তা হলে হয়তো অর্থচিন্তা তখন থাকবে না। কিন্তু আমি কি আর বেশিদিন বাঁচব?

* * *

অনেকেই ধরে নিয়েছে আমি আর বেশিদিন নেই। আমার মতো নামডাকওয়ালা লোক, একই শহরে আপনাদের সঙ্গে থাকি। আপনাদের নিশ্চয় স্বচক্ষে আমাকে দেখার, আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হয়। আর কিছু না হোক, আমার মৃত্যুর পরে লোকদের বলতে পারবেন অধ্যাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

একদিন চলে আসবেন। অবারিত দ্বার আমার বাড়িতে। বাইরের ঘরটাই বসার ঘর, স্টাডি, ড্রইং রুম আবার ওরই একপাশে খাওয়ার টেবিল।

ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে শুকনো মুখে গাজর সেদ্ধ খেতে খেতে যে লোকটা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে সে কিন্তু আমি নই।

আমার সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে না। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে যে লোকটা বাতাসা মুড়ি খেত সে লোকটার সঙ্গে আপনাদের আর কখনও দেখা হবে না।

ওগো বধূ সুন্দরী

অল্প বয়সে সর্বাণীর চেহারায় একটা আলগা চটক ছিল। যেটা দেখে সর্বানন্দ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে সর্বাণীর সেই চটকটা এখন আর তেমন কার্যকরী নেই, যদিও মোটের ওপর দেখতে সর্বাণী খারাপ নন।

রঙ শামলা হলেও যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রীতিমত ফরসা ঘেঁষা। সেই উজ্জ্বল শ্যামলিমার সঙ্গে মানিয়ে গেছে একটু চাপা নাক, পাতলা ঠোঁট, শালিক পাখির মত উড়ু উড়ু চোখ।

নবযৌবনের ভালবাসার চোখে সর্বাণীকে সর্বানন্দের একদা যেমন অতুলনীয়া মনে হয়েছিল, এখন আর তেমন হয় না। এটা অবশ্য পুরোপুরি সর্বানন্দের দোষ নয়, সেই মায়া অঞ্জন এখন আর তার চোখে মাখানো নেই।

তাই বলে, একথা বলা উচিত হবে না যে এখন সর্বানন্দ সর্বাণীকে পছন্দ করেন না, কিংবা কুৎসিত মনে করেন।

দাম্পত্যজীবনে যেমন হয়, ধীরে ধীরে মোহ কেটে যায়। কিন্তু তাতে কোন সর্বনাশ হয় না। ধীরে ধীরে মানিয়েও যায়। দাম্পত্য জীবন মানিয়ে নিয়েই চলে। সর্বানন্দ এবং সর্বাণী, এই দত্ত দম্পত্তির জীবনযাত্রাও মানিয়ে নিয়েই চলছে। একটু আধটু ঝগড়া বা খুনসুটি, অল্পবিস্তর মনোমালিন্য সে তো থাকবেই, তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে কিছু নয়।

সে যা হোক, এবার আমরা এবারকার ঘটনার মধ্যে যাই। ঘটনাটি সামান্য হলেও গোলমেলে।

সর্বাণী কোনদিন সর্বানন্দের অফিসে আসেননি। আসার প্রয়োজন পড়েনি। সর্বানন্দ নিজের মত অফিসে চলে আসেন, সর্বাণী বাসায় থাকেন।

সর্বানন্দের অফিসের দু-চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব যাঁরা সর্বানন্দের বাড়িতে আসেন, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন তাঁদের কারও কারও সঙ্গে অবশ্য সর্বাণীর ভালই পরিচয় আছে। তবুও সর্বানন্দের অফিসে এসে গল্পগুজব, আড্ডার কথা সর্বাণী কখনও ভাবেননি। বরং বলা চলে এ ব্যাপারে তাঁর একটু সঙ্কোচই আছে।

কিন্তু আজ সর্বাণীকে বাধ্য হয়েই তাঁর স্বামীর অফিসে আসতে হয়েছে। সর্বাণীর এক দিদি-জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন। তাঁদের দুয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় আসার কথা। কিন্তু আজ দুপুরেই বাসায় ফোন এসেছে, দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে, তাঁরা এই বিকেলেই কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছেন। এর আগে এ খবর জানিয়ে লন্ডন থেকে তাঁরা একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটাও আজ দুপুরেই এসেছে। এবং দুটোই সর্বানন্দ অফিসে বেরিয়ে আসার পর।

এর পরে যেমন হয়ে থাকে তাই হয়েছে। প্রথমে বাড়ি থেকে, তারপর পাশের বাড়ি

থেকে, তারপর পাড়ার ফোন বুথ থেকে হাজার চেষ্টা করেও সর্বাণী সর্বানন্দের অফিসের লাইন পাননি। অবশেষে মরিয়া হয়ে তাঁকে স্বামীর অফিসে ছুটে আসতে হয়েছে। খবরটা দিতে হবে যাতে সর্বানন্দ সময়মত এয়ারপোর্টে যেতে পারেন, না হলে বাচ্চাকাচ্চা, মালপত্র নিয়ে দিদি-জামাইবাবু খুবই বেকায়দায় পড়বেন, তা ছাড়া এটা খুব অভদ্রতাও হবে।

অফিসে এসে কিন্তু সর্বানন্দের সঙ্গে সর্বাণীর দেখা হল না। সর্বানন্দ কোথায় বেরিয়েছেন, একটু পরেই আসবেন।

সর্বানন্দের যে সহকর্মী এই খবরটা দিলেন, তিনি অবশ্য সর্বাণীকে বসতে বলেছিলেন, কিন্তু সর্বাণী বসেননি। ভাগ্য ভাল চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি, সর্বাণী অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই সর্বানন্দকে দেখা গেল রাস্তা পেরিয়ে আসছেন। সর্বাণীকে দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তারপর সর্বাণীর কাছে সব শুনে তাঁকে বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। আমি এয়ারপোর্ট হয়ে দিদি জামাইবাবুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

অফিসে ফিরে আসতে তাঁর সেই সহকর্মী বন্ধু জানালেন, 'আপনার কাছে এক সুন্দরী মহিলা এসেছিলেন।

সর্বানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ দেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সুন্দরী এ কথা আপনাকে কে বলল। আপনার সৌন্দর্যবোধকে বলিহারি যাই মশাই।'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম উনি বোধহয় আপনার স্ত্রী, তাই বলছিলাম।'.

সর্বানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আপনার অনুমান ভুল নয়। উনিই আমার স্ত্রী।'

তুলনা

সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে কোন তুলনা করা উচিত নয। ওরকম তুলনা হয় না, চলে না।

বিয়ের আসরে আগেকার দিনে, পিঁড়ি সমেত কনেকে বরের মাথার ওপরে তুলে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করা হত, 'কে বড়। বর বড় না কনে বড়।'

এসব প্রশ্নের ঠিক কোন উত্তর হয় না। যেমন গঙ্গা নদী বড় না নায়গ্রা জলপ্রপাত বড়, এরকম প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। তুলনা চলে না সাহারা মরুভূমির সঙ্গে হিমালয় পর্বতের।

তবু এতসব গল্পগুজবের পরে এবং বিশেষ করে এই মুহূর্তে হাতের কাছে এই দম্পতিকে নিয়ে লেখার মত কোন ঘটনা নেই তাই এদের দু'জনের একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

সরাসরি আরম্ভ করছি। সর্বানন্দ এবং সর্বাণীর উচ্চতা প্রায় সমান সমান। দুজনেই সোয়া পাঁচ ফুট। কিন্তু উচ্চতা সমান হলেও সর্বানন্দকে বেঁটেই বলা যায়। এবং সর্বাণী রীতিমত লম্বা। এর একমাত্র কারণ সর্বানন্দ পুরুষ মানুষ, সর্বাণী স্ত্রীলোক।

সর্বানন্দ সর্বাণী দুজনেরই ওজন প্রায় ষাট কেজি। এর ফলে সর্বানন্দকে দোহারা চেহারার লোক বলা চলে কিন্তু সর্বাণী বেশ মোটা।

সর্বানন্দ সর্বাণী দু'জনার গায়ের রঙও প্রায় একরকম। একটু কালোর দিকেই বলা চলে, মা বাবারা যাকে স্নেহভরে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলেন। জনসাধারণ কিন্তু সর্বাণীকে কালো বলে, এবং সর্বানন্দকে মোটামুটি ফর্সা।

এতসব দৈহিক বর্ণনার পরে এবার দত্ত দম্পতির আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে তুলনা করছি। সর্বানন্দ ধীরস্থির এবং সর্বাণী চটপটে। তবে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সর্বানন্দ সম্পর্কে বলেন, পুরুষ মানুষের ওরকম গয়ংগচ্ছ ভাব কেন? আবার সর্বাণী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য মেয়েছেলে এমন চঞ্চল হলে চলে।

এদিকে সর্বানন্দ একটা অফিসে বেশ দায়িত্বসম্পন্ন কাজ করেন। তাকে দৌড় ঝাঁপ করে অফিস করতে হয়। তিনি সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত হইচই করে আড্ডা দেন। কিন্তু লোকে তাঁকে গেঁতো বলে, কারণ তিনি সকালবেলা একটু বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকেন।

সর্বাণী কোন কাজকর্ম করেন না। সংসার দেখেন রান্নাবান্না, বাজারহাট নিজের হাতে করেন। সবাই বলে, সর্বাণী খুব কাজের মেয়ে। অথচ পরিশ্রমী সর্বানন্দের অলস বলে খ্যাতি।

আগে সর্বানন্দ চায়ে দু চামচ করে চিনি খেতেন, সর্বাণী খেতেন এক চামচ। এখন দুজনে গড়ে দেড় চামচ করে চিনি নেন প্রতি কাপ চায়ে। সর্বাণী আচার খেতে ভালবাসেন, সর্বানন্দ পাঁপর। সর্বাণী ইলিশ মাছ, সর্বানন্দও ইলিশ মাছ। সর্বাণী মাংস ভালবাসেন না, সর্বানন্দ মাটন বলতে অজ্ঞান। দুজনেই বোঁদে ভালবাসেন এবং চানাচুর।

সর্বাণীর ইচ্ছে মধ্যশহরে প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় থাকেন। সর্বানন্দের ইচ্ছে গ্রামের দিকে একটা ছোট বাড়ি করেন, অল্প একটু বাগান, জুঁই ফুল।

এইরকম অজস্র মিল আর তারতম্যে ভরা দত্ত দম্পত্তির যুগ্ম জীবন। যাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কম বেশি ধারণা আছে, তাঁরা বুঝতে পারছেন সর্বাণী সর্বানন্দ বেশ মিলমিশ সুখী জীবন কাটাচ্ছেন।

শুধু একটা জায়গায় একটু গোলমাল রয়েছে। সেটা ওই বয়েসের জায়গাটা।

বিয়ের সময় দুজনের বয়েসের ব্যবধান ছিল পাঁচবছর। সর্বাণীর পঁচিশ আর সর্বানন্দের তিরিশ। গত দশবছরে সর্বানন্দের বেড়ে চল্লিশ হয়েছে। তবে সর্বাণীর বয়েস অতটা বাড়েনি। গত দশবছরে বয়স বেড়ে তাঁর এখন হয়েছে তিরিশ। এখন সে সর্বানন্দের চেয়ে দশ বছরের ছোট।

নেশা

গতকাল গভীর রাতে সর্বানন্দবাবু নেশায় চুরচুর হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর অফিসের এক সহকর্মীর প্রমোশন হয়েছে, সেই খাওয়ালো। সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু ছিল। পান ভোজনের আয়োজন প্রচুর পরিমাণ ছিল। সেই সঙ্গে বিস্তর আড্ডা, হাসি তামাশা।

সর্বানন্দ দত্ত সুরসিক ভদ্রলোক। মাঝে মধ্যে সঙ্গদোষে পান করেন। একা একা মদ খাওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বসলে মাত্রা থাকে না।

কাল রাতে তাই হল। আড্ডা শেষ হতে রাত সাড়ে বারোটা, সর্বানন্দ বাড়ি ফিরলেন একটা নাগাদ।

দত্ত গৃহিণী, সর্বানন্দ বাবুর স্ত্রী পতিদেবতার এই সব সাময়িক বৈকল্য নিয়ে বিচলিত নন। তাঁর মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও সন্তানাদি হয়নি। মাসে দু চারদিন রাতে দেরি করে বাড়ি এলেও, শেষ পর্যন্ত যে স্বামী দেবতা বাড়ি ফিরে আসেন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি জানেন সর্বানন্দবাবুর অন্য কোন দোষ নেই। এবং এই কারণেই তিনি বাড়াবাড়ি করতে চান না।

সর্বানন্দ দত্ত গতকাল রাতে বাড়িতে ঢুকেই জামা শুদ্ধ বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়েছেন। শোবার আগে শুধু এক গেলাস জল খেয়েছিলেন।

শোয়ামাত্র সর্বানন্দবাবু বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য তার মধ্যে ঘুম ঠিক কতটা এবং মদের ঘোর কতটা সেটা বলা কঠিন।

ওই অবস্থাতেই সর্বাণীদেবী স্বামীর জুতো মোজা জামা খুলে বিছানার বালিশে মাথাটা ঠিক করে দিয়ে দিয়েছিলেন। পাশে একটা বড় কোলবালিশও রেখেছিলেন যাতে নেশার ঘোরে খাট থেকে সর্বানন্দ বাবু পড়ে না যান। আগে দুয়েকবার এরকম হয়েছিল, তাই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই সতর্কতা।

আজ সকালবেলায় সর্বানন্দবাবু ঘুম থেকে উঠলেন বেলা দশটা নাগাদ। সাধারণত সকালের দিকে সর্বানন্দবাবুর অনেক কাজ। সাতটা নাগাদ মোড়ের দুধের ডিপোয় সর্বানন্দবাবু দুধ আনতে যান। দুধ রেখে চা খেয়ে বাজার করতে ছোটেন। বাজার নিয়ে এসে আরেক কাপ চা এবং খবরের কাগজ। তারপর দাড়ি কামানো, সাড়ে নটার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে অফিসে বেরিয়ে যান।

কিন্তু আজ ঘুম ভাঙতেই দশটা বেজে গেছে। দুধ, বাজার সবই সর্বাণীকে সামলাতে হয়েছে।

সে যা হোক, এখন অফিস যাওয়ার সময় আর নেই। সর্বানন্দ দত্তের অবস্থাও অফিস যাওয়ার মত নয়। যেমন হয়, সাংঘাতিক মাথাধরা, এদিকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ, তিন গেলাস জল খেয়েও তৃষ্ণা মিটলো না। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন পা টলছে।

এদিকে মনে পড়ছে, আজ অফিসে জরুরি কাজ আছে। সাড়ে দশটায় বড় সাহেবের ঘরে মিটিং আছে। এর পরের প্রমোশনটা তাঁরই প্রাপ্য। এ সময় অফিস কামাই ভাল নয়।

কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

বিছানার পাশ থেকে কোলবালিশটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন, সর্বানন্দ। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল সর্বাণীর ওপর। সর্বাণীকে সামনে দেখে সর্বানন্দ বললেন, আজ তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।

সর্বাণী অবাক, মেঝে থেকে কোলবালিশটা তুলে বললেন, 'আমি আবার কি দোষ করলাম। গাণ্ডে পিণ্ডে মদ খেয়ে এলে, এখন মজা বোঝ'।

সর্বানন্দ বললেন, 'মদ খাওয়ার জন্যে আমার এই অবস্থা হয়নি। আমি তো সুস্থ দেহে

সুস্থ শরীরে, প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরলাম। তারপর ঘুমিয়েই শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। এরপর থেকে আমি মদ খেয়ে এসে শুয়ে পড়লে তুমি আর আমার পাশে কোলবালিশ দেবে না।

সর্বাণী বলল, 'তা হলে তো আধঘন্টার মধ্যে গড়িয়ে ধপাস করে বিছানা থেকে পড়ে যাবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'আমি তাই চাই। বিছানা থেকে পড়লে আমার ঘুম হত না। ঘুম না হলেই এখন কালকে রাতের মত ফুরফুরে থাকতাম। এত কষ্ট হত না। অফিস যাওয়াও হত।'

পুজোয় ভ্রমণ

সারা বছর রবিবারের খবরের কাগজে ভিতরের পাতায় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে টেক্কা দেয় পাত্র-পাত্রী। কোন কোন কাগজ সেই বিজ্ঞাপন ছাপতে গিয়ে রবিবারের পাতা থেকে গল্প প্রবন্ধ সব তুলে দিয়েছে।

এদিকে সেই পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পুজোর বাজারে পাল্লা দেয় ভ্রমণ। শুধু ভ্রমণ নয়, তীর্থযাত্রা ও প্রমোদভ্রমণ।

রবিবারের সকালে হাতের কাজ একটু ফুরোলে সর্বাণী বুকের নিচে বালিশ দিয়ে সটান উপুড় হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভ্রমণের কলম পড়েন। সদ্য কেনা, মোটা শারদীয় সংখ্যা বিছানার একপাশে অনাদরে পাখার হাওয়ায় এলোমেলো উড়তে থাকে। পৃষ্ঠার আন্দোলনে তারাপদ রায়ের হাসির গল্প থেকে হো হো শব্দ ধ্বনিত হয়। কিন্তু সর্বাণী নির্বিকার। সেদিকে তাকানোর তাঁর অবসর নেই।

সর্বাণী তখন দেখে চলেছেন একের পর এক লোভনীয় বিজ্ঞাপন। গোয়া বম্বে, কাটমুণ্ডু পোখরা, কুলু মানালি। নিদেনপক্ষে পুরী ভুবনেশ্বর চিলকা, কোনারক।

আর কি সব সস্তা আর আকর্ষণীয় সব প্রস্তাব। মাথাপ্রতি মাত্র চৌদ্দশ নিরানব্বুই টাকা, স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে এক ঘরে থাকলে। (স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে না থাকলে, যদি কেউ পরস্ত্রী বা পরস্বামীর সঙ্গে থাকেন, তাহলে খরচ বেশি লাগবে না কম লাগবে, সে কথা অবশ্য ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত হয়নি)।

সঙ্গে শিশু থাকলে তার জন্যে মাত্র এগারোশো বাইশ টাকা এক্সট্রা লাগবে আর তার জন্যে যদি আলাদা বেবি কট নেয়া যায় তাহলে প্রতি রাতে আরও সাড়ে পাঁচশো টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

সর্বাণী এই জায়গায় একটু থেমে যান, মনে মনে ভাবার চেষ্টা করেন একটা নতুন বেবি কটের দাম কত? হয়তো হাজার টাকার বেশি নয়। তারই দৈনিক ভাড়া সাড়ে পাঁচশো টাকা।

কিন্তু ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে হিসেব মেলানো উচিত নয়। তাছাড়া সর্বাণী সর্বানন্দের এখন পর্যন্ত শিশু নেই। তাই এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালেন না সর্বাণী।

বরং ঠিক এর পরের পর দুটো বিজ্ঞাপনে রয়েছে সমুদ্রযাত্রার প্রলোভন।

কলকাতা থেকে আন্দামান, আর বম্বে থেকে গোয়া, তরঙ্গ সঙ্কুল, উত্তাল, উদ্দাম

বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগর। প্রথমে খুবই রোমাঞ্চকর মনে হলেও, একটু পরে কেমন ভয় ভয় করতে লাগে আজন্ম ডাঙায়, নগর কলকাতায় লালিতা সর্বাণীর। না বাবা সমুদ্রপথে নয়। দীঘায় বা পুরীতে তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুনলেই বা কম মজা কি।

তবে এবার মোটেই দীঘা বা পুরী নয়। সর্বানন্দ যতই কায়দা করুন ও রকম দায়সারা ভাবে ভ্রমণ এবার সর্বাণী মেনে নেবেন না।

শুধু বোম্বে মাদ্রাজ, হিল্লি দিল্লি নয়, হায়দ্রাবাদ বাঙ্গালোর আছে, তিরুপতি তিরুবনন্তপুরম আছে। রেলগাড়ি ঝমাঝম দুরাত তিনরাত মোটেই পরোয়া নেই, রিজার্ভেশন আর স্লিপিং বার্থ জুটলেই হল।

সর্বাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়েন, পছন্দসই ভ্রমণসূচী পেন্সিল দিয়ে মার্কা করেন। আড়াল আবডাল থেকে আড়চোখে দেখেন সর্বানন্দ, ঘটনার গতির দিকে লক্ষ রাখেন।

সর্বানন্দের বুক ধুকপুক করে। একটা লম্বা পাল্লার যাত্রা হলে, থাকা খাওয়া যাতায়াতে অন্তত দশহাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে। টাকাটা এভাবে খরচ করার ইচ্ছে নেই সর্বানন্দের, বোনাস কিঞ্চিৎ পাওয়া গেছে বটে কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটা স্কুটার কেনা। সংসাবের সাশ্রয় হবে, অফিস যাতায়াতের সুবিধে হবে, তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম ভ্রমণেরও বন্দোবস্ত হবে।

কিন্তু সর্বাণী এসব যুক্তি শোনার মহিলা নন। দূরভ্রমণে এবার যেতেই হবে।

সুতরাং সর্বানন্দকে ফন্দি করতে হচ্ছে। ফন্দিটা খুব সোজা এবং মোক্ষম। শুধু আজকের রবিবারটা সর্বাণীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই হল।

বহুরকম বিচার-বিবেচনার পর শয্যা ত্যাগ করে সর্বাণী ঘোষণা করলেন, চির বসন্তের দেশ বাঙ্গালোরে যাব। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন সর্বানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হায়দ্রাবাদ অনেক ভাল'।

সর্বাণীর বড়দিরা গত বছর হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলেন, তার আগের বছর বাঙ্গালোর। সর্বাণীর একগুঁয়েমি নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দুয়েকদিনের মধ্যে বড়দির সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপারটা চূড়ান্ত করবেন। সর্বানন্দ একথা জেনে খুব খুশি হলেন।

পরের শনিবার বিকেলে বড়দির বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন সর্বাণী। রাতে সর্বানন্দকে ধরলেন, জানালেন, বড়দি বলল, হায়দ্রাবাদ বাঙ্গালোর দু জায়গাতেই এক সঙ্গে যাওয়া যায়, দুই শহরের মধ্যে চমৎকার নাইট বাস আছে।

সর্বানন্দ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পুজোর ছুটির আর মাত্র তেইশ দিন আছে, বিপদসীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। সর্বানন্দ বললেন, কিন্তু বাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদ যাব কি করে? সর্বাণী বললেন, 'কেন ট্রেনে?' সর্বানন্দ বললেন, 'অসম্ভব। একমাস আগে রিজার্ভ টিকিট দেয়, সে তো সাতদিন হল সব ফুল হয়ে গেছে।'

সর্বাণী বললেন, 'তবে?' সর্বানন্দ বললেন, 'সামনের বার পুজোর ঠিক একমাস আগে খেয়াল করতে হবে।'

সর্বানন্দের রসিকতা

সর্বাণীর জোকবুকগুলি অবসরমত নিজেও পড়ে ফেলেছেন সর্বানন্দ। সেই রসিকতার বইগুলি পড়ে এবং সেই সঙ্গে সর্বাণীর মুখে রসিকতাগুলো শুনে শুনে সর্বানন্দও বেশ সুরসিক হয়ে উঠেছেন।

সর্বানন্দ কখনওই খুব মুখচোরা নন, আবার বাকপটুও নন। তবে আজকাল রসিকতার ঝোঁক এসেছে কথাবার্তায়, বাকচাপল্য একটু বেড়েছে।

সংসারে খুব বলিয়ে কইয়ে সুরসিক লোক যেমন আছেন, যাঁর দুর্দান্ত উদাহরণ অরবিন্দ গুহ বা ইন্দ্র মিত্র, তেমনিই স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির চূড়ান্ত রসিক লোকেরও সাক্ষাৎ মেলে, যেমন ছিলেন রাজশেখর বসু বা পরশুরাম। কদাচিৎ একটি দুটি টিপ্পনি, একটু বঙ্কিম হাসা, বড়জোর একটি অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য, এই ছিল আলাপচারিতায় তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের সর্বানন্দ দত্তকে অবশ্য এই মহাজনদের সঙ্গে তুলনায় টেনে আনা সমীচীন হবে না। কিন্তু তিনি সম্প্রতি একটু প্রগলভ হয়ে পড়েছেন, এবং সেটা রসিকতার কারণেই সেটা স্বীকার করতে হবে।

সর্বাণীর অবশ্য ধারণা তাঁর সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে, তাঁরই কিনে আনা বইগুলি মুখস্থ করে সর্বানন্দের এই পরিণতি হয়েছে, তিনি ক্রমশ যেন খেলো হয়ে যাচ্ছেন। রসিকতা তো সকলের ধর্ম নয়, সকলের পক্ষে রসিকতা করা সাজে না। ময়দানের সভায় রামলাল যে রসিকতা করলেন সেটা শুনে হাজার হাজার লোক হাসল। বক্তৃতাসভায় সেই রসিকতা শুনে পাড়ায় গিয়ে শ্যামলাল যখন সবাইকে শোনাল, সবাই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, ভাবতে লাগল শ্যামলালের কি মাথার দোষ দেখা দিল নাকি, এসব আবোল তাবোল কি বকছে।

সে যা হোক, রামলাল শ্যামলাল করে লাভ নেই, সরসী কথামালার নায়ক সর্বানন্দের কথায় আসি। যে কোন দিন ধরে নেওয়া যাক সেটা একটা ছুটির দিন, ওই দিনের সকাল থেকে শুরু করি।

সকাল সাতটা

টেলিফোন এসেছে, ক্রিং ক্রিং করে বাজছে। সর্বাণী ও সর্বানন্দ বিছানায় শুয়ে আছে। সর্বানন্দ উঠে টেলিফোনটা ধরলেন। ওদিকে থেকে বন্ধুবান্ধব কারও প্রশ্ন 'এত সকালে ছুটির দিনে উঠে পড়েছ? কি করছ? সর্বানন্দ উত্তর দিলেন, 'আমি উঠিনি, শুয়ে আছি। তবে সর্বাণী উঠেছে। এখন সর্বাণী আর কেটলিতে চায়ের জল টগবগ করে ফুটছে।'

(কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। সর্বাণী এখনও ঘুমিয়ে, চায়ের জল কে বসাবে? শুধু রসিকতার জন্যে সর্বানন্দের এই উত্তর।)

বেলা সাড়ে দশটা

সর্বাণী ও সর্বানন্দ মুখোমুখি বসে ব্রেকফাস্ট করছেন। হাতেগড়া রুটি আর আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি। রুটি চিবোতে চিবোতে সর্বানন্দ বললেন, 'রুটি চচ্চড়ি খেতে খেতে দীঘার সমুদ্রের কথা মনে পড়ছে।'

সর্বাণী প্রমাদ শুনলেন, 'জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?

সর্বানন্দ বললেন. 'রুটি তেমনি বালিভর্তি আর চচ্চড়িটা লবণাক্ত।

(সর্বৈব মিথ্যা। চমৎকার রুটি চচ্চড়ি করেছেন সর্বাণী। শুধু ইয়ার্কি করার জন্য এরকম কথা।)

বিকেল পাঁচটা

এই মাত্র সর্বাণী ও সর্বানন্দ তাঁদের দিবানিদ্রা শেষ করে বারান্দায় চা খেতে বসেছেন। চা খেতে খেতে সর্বানন্দ সর্বাণীকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

সর্বাণী বললেন, 'আর একটা বাজে রসিকতা করবে এই তো!

সর্বানন্দ সর্বাণীর কটূক্তিতে পাত্তা দিলেন না। গল্পটা বললেন, 'কাল দুপুরে অফিস ক্যান্টিনে একটা গজা খেতে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক শক্ত, চিবোতে পারছি না। বেয়ারাকে বললাম, ম্যানেজারকে ডেকে আনো। গজা খাওয়া যাচ্ছে না। বেয়ারা বলল, তা আর কি করা যাবে। ম্যানেজারবাবুও এ গজা খেতে পারবেন না।

(সর্বৈব মিথ্যা গল্প। সর্বানন্দের ক্যান্টিনে কখনও গজা হয় না।)

রাত আটটা

একটা ফোন এল। ক্লাবে সবাই বসে সর্বানন্দের জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে আসতে বলছেন সবাই। সর্বানন্দ এখন বসিকতার বইয়ে মশগুল, পীড়াপীড়িতে সর্বানন্দ কথা দিলেন, হ্যাঁ আসছি। হ্যাঁ কথা থাকবে। যাই না যাই কথা থাকবে।

ভোট

দু জায়গায় ভোটার তালিকায় সর্বাণীর নাম আছে। তিনি ইচ্ছা করলে দু জায়গাতেই ভোট দিতে পারেন। এমনিতেও কোনও অসুবিধা নেই। দু জায়গাতে ভোট হচ্ছে দুটো আলাদা দিনে।

বিয়ের আগে বারাসতে বাপের বাড়িতে সর্বাণীর ভোটার লিস্টে নাম ছিল। সে নাম নাকি এখনও কাটা যায়নি। এই গত সপ্তাহেই ছোট ভাই এসে তাঁকে বলে গেছে, দিদি, তুই কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদের ওখানে ভোট দিতে যেতে পারিস।

সর্বাণী অবশ্য তা যাননি। গেলে কোনও অসুবিধে ছিল না অবশ্য। তাই বলেছিল, 'আমাদের ওখানে ভোট বিষ্যুদবার। আর তোদের এখানে ভোট পরের মঙ্গলবার। তুই ইচ্ছে করলেই দু জায়গায় ভোট দিতে পারিস।

সর্বাণীর এত ইচ্ছে নেই। তাছাড়া কাজটা যে বেআইনি হবে সে বিষয়ে তাঁর ধারণা আছে। তাছাড়া এখানকার ভোটটা বাড়ির খুব কাছেই একটা বুথে। এই গরমে সকাল সকাল গিয়ে ভোট দিয়ে এলেই হবে।

এখানে সর্বানন্দ ও সর্বাণীর ভোটের জন্যে ফটো তোলা হয়েছিল। পরিচয়পত্রও তাঁরা পেয়ে গেছেন। নির্দিষ্ট যথাস্থানে গিয়ে সর্বানন্দ তাঁর নিজের এবং স্ত্রীর পরিচয় পত্র দুটো নিয়ে এসেছেন। তারপর সে দুটো এখানে খামে ভরে বাড়িতে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন।

তখন সর্বাণী ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেননি পরিচয়পত্র। এখন ভোট এসে গেছে। ড্রয়ার

হাতড়িয়ে খুঁজে পেতে পরিচয়পত্রের খামটা খুঁজে বার করলেন সর্বাণী।

সর্বানন্দের ছবিটা খারাপ ওঠেনি কিন্তু তাঁর নিজের ছবিটা ঝাপসা ঝাপসা উঠেছে। বিকেলে অফিস থেকে সর্বানন্দ ফিরতে সর্বাণী তাঁকে বললেন, আমার ভোটের ছবিটা তুমি দেখে নিতে পারোনি। কি রকম কুচ্ছিত বাঁকা মুখ তাও আবার আবছায়া ছবি উঠেছে আমার।

সর্বানন্দ কি আর বলবেন, সাফাই গাইলেন, 'দেখে নিলেই বা কি লাভ হত? তখন তো আর নতুন করে ছবি তোলা যেত না। ঐ ছবি পালটিয়ে অন্য কারও কিংবা অন্য কোনও নতুন ভালো ছবি লাগানোও সম্ভব নয়।

এই বলে নিজের আর সর্বাণীর পরিচয়পত্র দুটো দেখতে দেখতে সর্বানন্দ বললেন, 'ছবি চুলোয় যাক। এইখানে কি হয়েছে দেখেছো? পরিচয়পত্রের একটা জায়গায় সর্বানন্দ আঙুল দিয়ে দেখালেন।

সর্বাণী প্রথমে কিছু ধরতে পারলেন না। তারপর একটু লক্ষ করে দেখে বুঝতে পারলেন গোলমালটা কোথায়। বয়সের জায়গায় তাঁর বয়েস লেখা হয়েছে ৪৮ (আটচল্লিশ)।

স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে সর্বাণী অন্য পরিচয়পত্রটি নিয়ে সেখানেও বয়সটা দেখলেন। সর্বানন্দের বয়স কিন্তু ঠিকই ছাপা হয়েছে, ৩৪ (চৌত্রিশ)।

সর্বাণী এবার ফুঁসে উঠলেন। ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এরকম কি করে হল?'

সর্বানন্দ বললেন, আমি এর কি বলব? বোধহয় আঠাশ লিখতে ভুল কবে আটচল্লিশ লিখেছে।'

সর্বাণী বললেন, 'তুমি তাই মেনে নিলে? কিছু না বলে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে চলে এলে। আমাকেও কিছু বললে না। আমি আগে জানতে পারলে অফিসে গিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড কবতাম।

সর্বানন্দ আর কিছু বললেন না। সর্বাণীও গুম হয়ে রইলেন।

অনেকটা পরে সর্বাণী বললেন, আমি এখানে ভোট দেব না। আগে জানতে পারলে বারাসতে গিয়ে ভোট দিয়ে আসতাম। সেখানে আইডেনটিটি কার্ড না থাক, ভোটার লিস্টে বয়েসটা অন্তত ঠিক উঠেছে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'এরকম অনেক হয়েছে। খবরের কাগজে দেখছো না। ছবিটা যখন ছাপানো উঠেছে তোমার কোনও অসুবিধে নেই। ভোটের দিনে চুলে একটু পাউডার দিয়ে যেয়ো। চুলটা একটু পাকা পাকা দেখাবে, বয়স নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না।'

ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর

আর দশজন সরকারি কর্মচারীর মত সর্বানন্দকেও ইলেকশন ডিউটি করতে হয়েছিল। ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে সে একটি নির্বাচনী বুথে প্রিসাইডিং অফিসার হয়েছিল। যাঁরা জানেন না, এই বহু বিখ্যাত ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর, যার কথা সবাই আজন্ম শুনে আসছেন, সেই জায়গাটা কোথায়, তাঁদের জানাই জায়গাটা খুব দূরেও নয়, আবার খুব কাছেও নয়।

রাত আটটা নাগাদ সঙ্গী-সাথী, ব্যালট বাক্স, জিনিসপত্র শুদ্ধ সরকারের রিকুইজিশন করা মিনিবাস যেখানে সর্বানন্দকে নামিয়ে দিল সেখান থেকে হাঁটা পথ আড়াই কিলোমিটার। রাস্তায় তিনটে বাঁশের সাঁকো, দুটো সাঁকো ও জলহীন নালা, কর্দমাক্ত, কচুরিপানালাঞ্ছিত।

এমনিতে মনোরম পরিবেশ। শহুরে গরমের পর এই গ্রীষ্মসন্ধ্যায় হু-হু করে হাওয়া বইছে খোলা মাঠে। বিরাট একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে, অকুতোভয় শেয়ালেরা খালের পাড়ে বসে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। খালের ওপারে গ্রাম্য কুকুরেরা এই স্বাগতভাষণের বিরোধিতা করছে। তবে রীতিমত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, দু'পক্ষই শালীন ও নিরাপদ দূরত্ব থেকে পরস্পরের জবাব দিচ্ছে। কেউ কারোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না।

সর্বানন্দ মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, মানুষ কবে শেয়াল কুকুরের মতো সভ্য হবে। এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি দল চলেছে, আশেপাশের গ্রামে সব বুথ। সেই সব বুথের এলাকায় এসে যেতে একটি একটি করে দল কমে যাচ্ছে।

বাসরাস্তার মোড় থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক চৌকিদার পোলিং পার্টিগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল। এতক্ষণে একটা বড় তেঁতুলগাছের নিচে এসে চৌকিদার বলল, 'আপনারা এসে গেছেন। ওই সামনে ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর গ্রাম। এবার আমি যাই। আমাকে উল্টোদিকে অনেকদূর যেতে হবে।' এই বলে চৌকিদার চলে গেল।

তখন আর মাত্র দুটি দল অবশিষ্ট রয়েছে। সর্বানন্দ অ্যান্ড কোম্পানি। এবং আরেকটি দল।

সর্বানন্দ দ্বিতীয় দলের অধিপতিকে বললেন, 'দাদা, আপনাদের কোন গ্রামে বুথ্?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের বুথ ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে।

সর্বানন্দ একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'সে কি! আমাদেরও তো ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে।'

ভদ্রলোক বললেন, তাতে কি হয়েছে! চলুন একটু এগিয়ে দেখা যাক। হয়তো বড় গ্রাম। দুটো বুথ থাকতেই পারে। তারপর যোগ করলেন, 'দাদা বড় গ্রাম হলেই ভাল।'

সর্বানন্দ বললেন, 'কেন?

ভদ্রলোক অভিজ্ঞ লোক, তিনি সর্বানন্দকে বুঝিয়ে বললেন, 'বড় গ্রাম হলে পাকা ইস্কুল ঘরটর থাকবে। রাতে শোয়ার সুবিধে হবে। কালকে সারাদিন রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচা যাবে। তাছাড়া খাবার দাবারও হয়তো মিলবে। টিউবওয়েলের জল মিলবে।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে সর্বানন্দ আশ্বস্ত বোধ করল। তবে চৌকিদার লোকটি ঠিক কথা বলেনি। সে বলেছিল যে সামনেই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর গ্রাম, কিন্তু কতটা সামনে সে কথা বলেনি। সেই তেঁতুলতলা থেকে সর্বানন্দেরা প্রায় দু কিলোমিটার এগিয়ে এসেছেন। এখনও গ্রামের দেখা নেই। ফলবাগান আর ধানক্ষেতের মধ্যে এবড়ো খেবড়ো কাঁচা রাস্তা চলেছে তো চলেইছে।

যা হোক শেষ একটা গ্রামের সীমানায় এসে সর্বানন্দেরা পৌঁছালেন। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা মুদিখানা কাম চায়ের দোকান। মুদিমশায় তখন দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাড়ি রওনা হচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'দাদা, আমরা কি ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে কি

এসে গেছি?'

মুদি বললেন, 'আপনারা ঠিক কোথায় যাবেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে আমাদের ইলেকশন ডিউটি।'

মুদি বললেন, 'দেখুন এই ভুল দেখছি সবাই করে। আসলে ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর বলে কোনও জায়গা নেই। ধ্যাড়ধ্যাড়ে একটা গ্রাম যেটা আপনাদের পেছনে ফেলে এসেছেন। গোবিন্দপুর অন্য একটা গ্রাম যেটা সামনে রয়েছে।'

মুদিমশায় চলে গেলেন। শেষপর্যন্ত ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে ভোট হয়েছিল বৈকি, কিন্তু সে অন্য গল্প।

নির্বাচনোত্তর

ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে নির্বাচনী ডিউটি করতে গিয়ে যতটা ঝামেলার আশঙ্কা করেছিলেন সর্বানন্দ দত্ত, তা কিন্তু হয়নি।

যেমন হয়ে থাকে, ছোটখাট, টুকটাক গোলমাল তা হয়েছিল কিন্তু কখনই সেটা বিপজ্জনক রূপে দাঁড়ায়নি।

দুটো স্বতন্ত্র গ্রাম ধ্যাড়ধ্যাড়ে এবং গোবিন্দপুর, এদের দুটো বুথের ব্যাপারটাও খুব জটিল ছিল না। আসলে এক সময় ভোটার সংখ্যা অনুসারে দুটো গ্রামের মিলে একটাই বুথ ছিল। এখন ভোটার বেড়ে যাওয়ায় দুটো বুথ হয়েছে, একটা বুথের আগের নম্বরই রয়েছে ১০৩, অন্যটায় নম্বর দেওয়া হয়েছে ১০৩ক। দুটো বুথই পাশাপাশি, একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় দু'পাশে।

সে যা হোক, নির্বাচন তো সন্ধে নাগাদ মোটামুটি মিটল, বিকেল চারটার পর ভোটাভুটি আর বিশেষ হয়নি। তবে বাক্স প্যাঁটরা, কাগজপত্র সব গুছিয়ে সই সাবুদ সেরে, সিল টিল লাগিয়ে বেরোতে রাত আটটা হয়ে গেল।

ঘন্টাখানেক আগেই বেরোতে পারতেন সর্বানন্দ কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল কলমটা হারিয়ে।

কলমটা মানে কোনও সাধারণ কলম নয়। সর্বানন্দের পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশায়ের, সর্বাণীর পরলোকগত পিতৃদেবের ব্যবহৃত বিলিতি কলম, পার্কার ফিফটি ওয়ান।

এই কলমটা খুব 'লাকি'। সর্বানন্দ সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখেন, অনেকটা তাবিজ বা মাদুলির মত। কতবার কতরকম বিপদ আপদ থেকে যে এই কলমটা সর্বানন্দকে রক্ষা করেছে। এই কলমটা কাছে থাকলে সর্বানন্দ কখনই কোনও গোলমালে পড়েনি।

আজ এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে ডিউটি করতে এসে সর্বানন্দ কলমটা খোয়ালেন। পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকুরানি নিজের হাতে সর্বানন্দকে কলমটা তুলে দিয়েছিলেন। সেই থেকে সঙ্গে সঙ্গে আছে।

এখানে না নিয়ে এলেই ঠিক হত। কিন্তু তাহলে কি এত ভালোয় ভালোয় এই ঝামেলা কাটত। সর্বানন্দের গভীর বিশ্বাস ওই কলমের পয়াতেই তাঁর অমঙ্গল ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু আজ কলমটা নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করা হল। অন্যেরা কাজ শেষ হওয়ার পরে এখন বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। আর

দেরি করা যায় না।

সর্বানন্দ অনেক ভাবলেন। ভোটাররা সবাই খুব সুবিধের লোক নয়, কিন্তু তারা কেউ কলমটা নেয়নি। ভোট শেষ হওয়ার পর ফর্ম পূরণ করা, নানা জায়গায় সই করা সর্বানন্দ ওই কলম দিয়েই করেছেন। তারপর কলমটা হাওয়া হয়ে গেল। ঘরে তাঁরা সহকর্মীরা রয়েছে, তাদের সন্দেহ করা অনুচিত হবে। রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা উলটো দিকের বেঞ্চে ছিল, তখনও দুয়েকজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদেরও সন্দেহ করা যায় না।

কলম হারিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সর্বানন্দ দলবল সহ বাস মোড়ে এসে সেখান থেকে মূল কেন্দ্রে ফিরে এলেন। এখানে কাগজপত্র, ব্যালটবাক্স সব জমা দিতে হবে।

তখন রাত প্রায় এগারটা। মূল কেন্দ্রে গভীর উত্তেজনা চলেছে। একটু আগে কয়েকজন বাইরের লোক পোলিংয়ের কর্মচারীদের ভিড়ে ভিতরে ঢুকে সাংঘাতিক হম্বিতম্বি করে গেছে!

প্রবেশপথে খুব কড়াকড়ি। জিনিসপত্র নিয়ে সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে, পিছনে সর্বানন্দ আসছেন। হঠাৎ দুই বিহারী শাস্ত্রীর সর্বানন্দকে কেমন সন্দেহ হল। কলম হারানোয় শোকগ্রস্ত তাঁর মুখ দেখে কিংবা তাঁর হাতে সরকারি কোনও জিনিস না থাকায় উদ্রেক সন্দেহের। দ্বাররক্ষীদ্বয় সর্বানন্দকে আটকিয়ে দিতে সর্বানন্দ বলল, 'অন ডিউটি'! কিন্তু তারা ছাড়ল না। যা বলল তার মানে হল, 'তোমার দেহ-তল্লাশি করা হবে। তোমার পেটে ওটা কি উঁচু হয়ে রয়েছে।'

সর্বানন্দ খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন, তবু তাঁর রসবোধ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি, তিনি বললেন, 'ওটা আমার ভুঁড়ি।' সেপাইরা সে কথা শুনল না, সর্বানন্দ তখন রেগে সর্বসমক্ষে নিজের জামা গেঞ্জি খুলে ফেললেন।

এবং কি আশ্চর্য! সেই মুহূর্তে গেঞ্জির নিচ থেকে দণ্ডায়মান পার্কার কলমটি ভূপতিত হল। সর্বানন্দের মনে পড়ল, কাজের শেষে এক সাবধানী মুহূর্তে, পকেট থেকে হারিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় কলমটাকে তিনি গেঞ্জির ভিতরে ফেলে দিয়েছিলেন।

রোগমুক্তি

সেই যে একটা গল্প আছে না রামবাবুকে নিয়ে। রামবাবু একবার খুব বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন। যাকে বলে ডাহা বিপদ। থানা, পুলিশ, উকিল, মামলা, আদালত সব মিলে ভয়াবহ ব্যাপার।

সে সময় রামবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু শ্যামবাবু রামবাবুকে বলেছিলেন, দ্যাখো রাম তোমার তো কোনওদিন কোনও শত্রু আছে বলে জানি না, তুমি এত গোলমালে জড়িয়ে পড়লে কি করে, তোমার এত বিপদ হল কি করে?

রামবাবু শুকনো হাসি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ভাই, তোমাদের মত বন্ধু থাকতে, আমার আর শত্রুর দরকার কি?

আমাদের সর্বানন্দ দত্তের অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রায় ওই রামবাবুর মত।

সর্বানন্দ কাহিনী যাঁরা পাঠ করছেন তাঁরা জানেন, বুঝতে পারেন সর্বানন্দের মত লোকের কোনও শত্রু নেই। জ্ঞানত, ধর্মত এ ধরনের লোকের কোনও শত্রু থাকতে পারে না।

কিন্তু সর্বানন্দের যে বন্ধুর অভাব নেই। এবং তাঁরা যা করেন তার চেয়ে সরাসরি শত্রুতা করা ভাল।

এই কালকের কথাই ধরা যাক না। ছুটির দিন শনিবার, সন্ধ্যার পর সর্বানন্দ মনস্থির করে বাসায় বসে আছেন। সর্বাণীর গুরুতর শরীর খারাপ। মাছের কাঁটা দিয়ে ওল চচ্চড়ি খেয়ে আজ দুদিন হল তিনি ঘোরতর অসুস্থ। বেড়ালকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তৈরি একথালা ওলের চচ্চড়ি, মাছের কাঁটা দিয়ে রান্না করা হয়েছিল। বেড়ালের পক্ষে উপাদেয় এবং লোভনীয় করার জন্যে—সেই চচ্চড়ি টেস্ট করতে গিয়ে সর্বাণী বেড়ালের জন্যে একটুও না রেখে পুরোটা খেয়ে ফেলেছিলেন। পরিণামে সর্বাণীর অবস্থা কাহিল। গলা বসে যায়নি, ভেঙে যায়নি কিন্তু পাকস্থলী সমেত সর্বাণীর দেহস্থ সব রকম হজমযন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

বেড়ালকে ওল চচ্চড়ি খাওয়ানোর বুদ্ধিটা ছিল সর্বানন্দের। তিনি বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে আজ শনিবাবের সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরোননি।

সন্ধ্যাটা মোটামুটি উতরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাত আটটা নাগাদ, সর্বানন্দকে পানশালায় অনুপস্থিত দেখে, জনা চারেক বন্ধু গুটি গুটি তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত।

পথে থাকার সময় তাঁরা দু পাঁইট মদ কিনে এনেছেন, সে দুটো তাঁদের প্যান্টের পকেটে, ইচ্ছেটা এই যে আজ আড্ডাটা সর্বানন্দের এখানেই বসা যাক।

কিন্তু এখানে এসে সর্বাণীর কাহিল চেহারা দেখে সে ইচ্ছে দমন কবতে হল। একটা ছল করে সর্বানন্দকে বলা হল, 'বৌদির এই অবস্থা। ডাক্তার না দেখিয়ে বাসায় বসে আছিস। চল, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।'

বন্ধু তিনজনার সঙ্গে সর্বানন্দ বেরিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য বলে গেলেন, 'ডাক্তার নিয়ে এই আসছি।' সর্বাণী চোখ মুদে বিছানায় পড়ে রইলেন। যাওয়ার সময় দায়িত্ববান সর্বানন্দ পাশের ফ্ল্যাটের বৌদিকে বলে গেলেন, 'বৌদি সর্বাণীর শরীরটা খারাপ। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। আপনি সর্বাণীর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

সর্বানন্দ টলতে টলতে ফিরলেন রাত এগারোটার পরে, একা। অত রাতে কোন ডাক্তার আসবে?

এসে যা দেখলেন তাতে সন্দেহ হল নেশায় ভুল দেখছি না তো। সর্বাণী সম্পূর্ণ সুস্থ, স্টোভে ডিমের ঝোল রান্না করছেন।

সর্বানন্দকে দেখে সর্বাণী বললেন, 'পাশের বাড়ির বৌদির জন্যে ভাল হয়ে গেলাম।

সর্বানন্দ বললেন, 'মানে।'

সর্বাণী বললেন, 'বৌদি আমার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আমি সব বললাম। শুনে বৌদি বললেন, বেড়ালের খাবার খেয়ে নিয়েছো, বেড়ালের পায়ে না ধরলে কষ্ট যাবে না। ক্রন্দসী বেড়াল তখন জানলায় বসে কেঁদে যাচ্ছে। আমি আচমকা গিয়ে ওর সামনের পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি একদম ফিট! তবে খুব পাজি

বেড়াল, আমার হাতটা আঁচড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্যাখো।' সর্বাণী হাত উলটিয়ে দেখাল, তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ত্বকে দুটি লাল সরলরেখা ঝলমল করছে।

পুরনো কাগজ

এই কলকাতা শহরে বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা পুরনো কাগজ কেনাবেচা। ভোর হতে না হতে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে দলে দলে লোক কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একেক জনের গলার সুর এবং স্বর একেক রকম। কেউ গৃহস্থের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সিংহের মত গরজায়, কেউ জানলার নিচে বেড়ালের মত মিঁউ মিঁউ করে। কেউ বলে, পুরনো কাগজ, খাতা, ম্যাগাজিন, কেউ বা আত্মঘোষণা করে বিক্রিওলা। ব্যতিক্রমী কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের বলে শিশি বোতলওয়ালা কিন্তু শিশি বোতল গৌণ, মুখ্য কারবার পুরনো খবরের কাগজ কেনা।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ সর্বানন্দ কাজে বেরিয়ে যান। তারপর হাতের কাজ এবং সেই সঙ্গে স্নান টান সেরে সর্বাণী তাঁদের দোতলার বারান্দায় একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসেন। বারান্দাটা দক্ষিণমুখী, দুপুর নাগাদ যতক্ষণ পর্যন্ত না রোদ আসে এই গরমেব সকালে জায়গাটা খুব আরামের।

এই দু'ঘণ্টা সময়ে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ জন ফেরিওলা আসে। বেশ কিছু ফেরিওয়ালা পুরনো পরিত্যক্ত জিনিসের খোঁজে গৃহস্থবাড়িতে হানা দেয়। গ্রামোফোন, রেডিও সাইকেল থেকে পুরনো বেনারসী শাড়ির পাড় ও আঁচল, গিলটি করা গয়না ইত্যাদি কিনতে চায়। এসব জিনিস কারা যে এদের কাছে বেচে, কাদের বাড়িতে কটাই বা থাকে সে বিষয়ে সর্বাণীর মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সে যা হোক এই কেনাওয়ালারাও নিজেদের বিক্রিওয়ালা বলে। তবে আসল বিক্রিওয়ালা হল ওই যারা পুরনো কাগজ, বইপত্র কেনে। সর্বাণী গুনে দেখছেন অর্ধেক ফেরিওয়ালাই হল এই বিক্রিওয়ালারা।

তার মানে অবশ্যই এই যে এই কাগজ কেনার ব্যবসাতে লাভ যথেষ্ট। লাভটা যে কিভাবে হয় সেটা সর্বাণী সম্প্রতি আবিষ্কার কবেছেন।

অবশ্য কোন এক ভাবে হয় তা বলা যাবে না, লাভটা হয় নানাভাবে। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন সর্বাণী। তবে সবটা যে ধরতে পেরেছেন তা হয়ত নয়।

বাজারে ঢোকার মুখে এক বড় দোকান আছে সেখানে পাহাড় প্রমাণ পুরনো খবরের কাগজ থরে থরে সাজানো আছে। সর্বাণী দেখেছেন পাড়ার বিক্রিওয়ালারা প্রায় সকলেই তাদের কেনা কাগজ বেচতে আসে। এই দোকানে লেখা আছে কাগজ প্রতি কেজি সাড়ে পাঁচ টাকা।

সর্বাণী ওই দোকানে জিজ্ঞেস করে জেনেছেন, ইংরেজি বাংলা সব কাগজই এক দাম ওই সাড়ে পাঁচ টাকা।

এখানেই বিক্রিওয়ালাদের প্রথম প্যাঁচ। তারা ইংরেজি বাংলা আলাদা কিনবে। একটা সাড়ে পাঁচ, অন্যটা ছয়। তার মানে বাজার থেকে পঞ্চাশ পয়সা বেশিই দেবে।

ব্যাপারটা গোলমেলে। বিক্রিওয়ালারা ঠিক এই কায়দাটা কেন করেন সেটা সর্বাণী ধরতে পারেননি। কিন্তু আসল জিনিসটা তিনি মোটামুটি টের পেয়েছেন।

আসল জিনিসটা হল ওজনের কারসাজি।

সর্বাণী বাসায় দুটো দৈনিক কাগজ রাখেন, একটা ইংরেজি, একটা বাংলা। সেই সঙ্গে একটা সাপ্তাহিক এবং একটা পাক্ষিক। আড়াইমাস তিনমাস পরে যখন সর্বাণী কাগজ বেচেন কিছুতেই ইংরেজি, বাংলা দুটো কাগজ আলাদা আলাদাভাবে দেড় কেজির বেশি ওজন হত না। কাগজের ওজন সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনও ধারণা থাকা কারও পক্ষে কঠিন, সর্বাণীরও ছিল না। তিনি বিক্রিওয়ালার ওজনটাই মেনে নিতেন।

কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপারে তাঁর খটকা। এই বিক্রিওয়ালাদের সকলেরই পাঁচশো গ্রামের পাথর, এক কেজি, দু কেজির পাথর নেই। ওজন করা আরম্ভ করার সময় খবরের কাগজ চাপিয়ে পাঁচশো গ্রামকে হাজার গ্রাম করা হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় হাতের খেলা।

এই বিক্রিওয়ালারা প্রত্যেকে দক্ষ ম্যাজিসিয়ান। সবাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে আসে, সেখানে খুব সম্ভব এদের ট্রেনিং স্কুল আছে। চার কেজি কাগজকে এরা অনায়াসে দেড় কেজি বানিয়ে দিতে পারে, দাঁড়িপাল্লার ভেতরের সুতো টেনে কিংবা হাত দিয়ে কাঁটায় কারসাজি করে। পাঁচশো গ্রামের পাথরটা একদিন সর্বাণী হাত দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, সেটাও যেন বেশি ভারি।

আজকাল বিক্রিওয়ালারা সতৃষ্ণ নয়নে সর্বাণীদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সর্বাণী আর তাদের কাছে কাগজ বেচেন না। রিকশা করে বাজারের দোকানে নিয়ে যান। রিকশা ভাড়া যাতায়াত পাঁচ পাঁচ দশ টাকা লাগে কিন্তু তাতেও পাঁচ টাকা লাভ থাকে। তা ছাড়া কেউ ঠকিয়েছে এরকম দুঃখ মনে পুষতে হয় না।

স্বাস্থ্যচর্চা

আজ কিছুদিন হল সর্বানন্দের দেহে একটা নেয়াপাতি ভুঁড়ির উদ্ভব হয়েছে। এ বয়েসে নাকি এরকম হয়।

বেশ চমৎকার রোগা পাতলা, ছিমছাম চেহারা ছিল সর্বানন্দের। কিন্তু সম্প্রতি, প্রায় বছরখানেক হল, মেদ জমতে আরম্ভ করেছে। মেদ জমা খুব গোলমেলে ব্যাপার। একবার শরীরে মেদ জমতে শুরু করলে তার আর কোনও শেষ নেই।

তাছাড়া মোটা মানুষের শরীর হাজার অসুখের ডিপো। লোকে সর্বানন্দকে নানারকম ভয় দেখায়। হাঁফ ধরবে, রক্তচাপ বাড়বে, রক্তে চিনি বাড়বে, হার্ট তো খারাপ হবেই।

কিছু একটা করা উচিত সেটা সর্বানন্দ ভাবছিলেন। এতদিন সর্বানন্দ ওজন বাড়ার ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্ব দেননি, এখন স্বামী এটা নিয়ে ভাবিত দেখে সর্বাণী কিছুটা খুশিই হলেন।

পাড়ার মোড়ের ওষুধের দোকানে কুড়ি টাকা ভিজিটের যে ডাক্তারবাবু বসেন তাঁর ওখানে সর্বানন্দকে নিয়ে এক রোববার সকালে সর্বাণী গেলেন।

ডাক্তারবাবু প্রবীণ ও বিচক্ষণ মানুষ। তিনি নাড়ী টিপে, বুক দেখে, চোখের পাতা

উলটিয়ে ভাল করে, বিবেচনা করে বুঝলেন সর্বানন্দের তেমন কিছু হয়নি। সমস্যা একটাই ভদ্রলোক একটু ফুলে-ফেঁপে যাচ্ছেন। এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করে কিংবা খাওয়া কমিয়ে মোটা হয়ে যাওয়া ঠেকানো যায়।

ডাক্তারবাবু সেই রকমই সর্বানন্দকে বললেন, পরামর্শ দিলেন, 'সকালে ঘণ্টাখানেক করে হাঁটুন।'

সর্বানন্দ বললেন, 'মরনিং ওয়াক। সে আমার দ্বারা হবে না ডাক্তারবাবু।' সর্বাণী যোগ করলেন, বেলা সাড়ে আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'অভ্যেস বদলাতে হবে।'

কিন্তু এ অভ্যেস বদলানো সর্বানন্দের পক্ষে অসম্ভব। নৈশ আড্ডা, নিশিকালে নেশার আড্ডা তাঁর পক্ষে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। তার থেকে মৃত্যু ভাল।

এবারে ডাক্তারবাবু বাধ্য হয়ে বললেন, ''তাহলে খাওয়া-দাওয়ার কড়াকড়ি করতে হয়। মিষ্টি, ভাজাভুজি ছাড়তে হবে। তেল কম, ঘি বাদ...'

বিরাট ফিরিস্তি দিলেন ডাক্তারবাবু। সব শুনে কুড়ি টাকা ভিজিট দিয়ে সর্বানন্দ ও সর্বাণী ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটু হেঁটে যেতেই সর্বাণীর খেয়াল হল সর্বানন্দের নিয়মিত মদ্যপানের ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুকে বলা হয়নি। ব্যাপারটা সর্বানন্দকে বলতে তিনি প্রথমে বললেন, 'সেটা আর কি দরকার?' তবু স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তিনি আবাব ডাক্তারের কাছে ফিরে গেলেন।

ডাক্তারবাবুকে গিয়ে নিয়মিত মদ্যপানের কথা জানাতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমিও ভাবছিলাম কি একটা অ্যাডভাইস বাদ পড়ে গেছে। সে যাক, আপনি দৈনিক কতটা ড্রিঙ্ক করেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'তিন-চার পেগ।' ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, 'সঙ্গে আর কিছু?'

সর্বানন্দ বললেন, 'চাট একটু থাকে তো বটেই। এই চানাচুর, বাদাম বা ডালের বড়া। কখনও সসেজ বা শিককাবাবও থাকে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নে বিরিয়ানি, ফিশফ্রাই, আইসক্রিম, মিষ্টি ভরপেট খেলে যা হবে, এই সব চাট দিয়ে অতটা মদ খেলে তার চেয়ে বেশি হবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'ডাক্তারবাবু তাহলে কি হবে? ক্রমাগত আরও মোটা হয়ে যাব?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তা কেন? আপনি সন্ধ্যার দিকে, এই রাত নটার পরে একবার আমার চেম্বারে আসবেন তো।'

পরের দিন রাত নটায় সর্বানন্দ ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গেলেন। চেম্বার খালি, ডাক্তারবাবু একা বসে আছেন। টেবিলে এক প্লেট আলুকাবলি আর শশা কুচি। সেই সঙ্গে একটা রামের পাঁইট।

সর্বানন্দকে দেখে ড্রয়ার থেকে দুটো গেলাস বার করে দুজনের জন্যে রাম ঢাললেন ডাক্তারবাবু। বললেন, 'নিন। আর ওসব ভাজাভুজি খাবেন না। স্রেফ ছোলা, শশা এই সব।'

আজকাল সর্বানন্দ ডাক্তারবাবুর চেম্বারেই নিয়মিত পান করেন। মদের পাঁইটটা তিনিই কিনে নিয়ে যান। 'ডাক্তারবাবু শশা ছোলার জোগাড় রাখেন।

সর্বাণীর সাহিত্যচর্চা

সর্বানন্দ দশটা নাগাদ অফিস চলে যায়। তারপর হাতের কাজ সেরে সামনের বারান্দায় বসে সকালের খবরের কাগজটা কিছুক্ষণ পড়া, রাস্তার লোকজন, ফেরিওয়ালাদের পর্যবেক্ষণ করা—এভাবে ঘণ্টাদুয়েক কাটে সর্বাণীর।

সর্বাণী অবশ্য খুব মনোযোগ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করেন। খোঁড়া ফলওয়ালাটা আজ তিনদিন আসছে না। আগের ইস্ত্রিওলা বোধহয় দেশে গেছে, আজ কয়েকদিন হল নতুন ইস্ত্রিওলা দেখা যাচ্ছে। সামনের বাড়ির ভদ্রলোকের বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে কাল থেকে অফিস যাচ্ছেন না। মোড়ের সাদা বাড়িটায় মেয়ে-জামাই এসেছে, গত মাঘমাসে ওদের বিয়ে হয়েছিল। পাড়ার নেড়ি কুকুরটার নাদুস নুদুস বাচ্চা হয়েচে, সেগুলো হাঁটাচলা শিখেছে, এবার গাড়ি চাপা পড়ে মারা পড়বে।

সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন সর্বাণী। তারপর বারোটা নাগাদ উঠে স্নান খাওয়া করে বিছানায় শুয়ে পড়েন। অল্প একটু ঘুম হয়। কিন্তু দিন আর কাটে না।

খুব একঘেয়ে লাগে সর্বাণীর।

মধ্যে কিছুদিন আশেপাশে পাড়ার বাচ্চাদের ইস্কুলগুলোতে হাঁটাহাঁটি করেছেন সর্বাণী। মাইনে যাই হোক, যদি কোথাও একটা কোনও কাজ জোটে। তা জোটেনি। এসব স্কুলটুল যারা চালায়, তারা খুব পাকা লোক, চট করে উটকো কাউকে তারা কাজ দেবে না।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সর্বাণী একবার একটা সেলসের কাজ জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ভরদুপুরে, নিশুতি পাড়ায় রোদ বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে অচেনা লোকের বাড়িতে কড়া নাড়া কিংবা কলিং বেল বাজানো—তিনদিনের মাথায় সর্বাণী সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সর্বাণীর এই একঘেয়েমির সমস্যাটা সর্বানন্দ জানেন। কিন্তু তাঁর হাতে কোনও রেডিমেড সমাধান নেই। তিনি তো আর অফিস কামাই করে কিংবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে বসে থাকতে পারবেন না।

তবে সর্বানন্দ একটি সুপরামর্শ দিলেন সর্বাণীকে। বললেন, 'দুপুরের দিকে একটা প্রেমিক জোগাড় করতে পারো।' সর্বাণী ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

তখন সর্বানন্দ বললেন, 'সে তুমি পারবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটা কাজ করতে পারো, তুমি সাহিত্যচর্চা শুরু করো।'

সর্বাণী বললেন, 'কত আর গল্পের বই পড়ব। এত বই দিনের পর দিন পাবই বা কোথায়?'

সর্বানন্দ বললেন, 'না। না। তোমাকে আমি গল্পের বই পড়তে বলছি না। সে তুমি পড়তে চাও পড়ো। আমি তোমাকে গল্প লিখতে বলছি।'

সর্বাণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমি লিখব গল্প?'

সর্বানন্দ বললেন, 'কেন পারবে না? তুমি সব জিনিস এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পাও। সেই সব নিয়ে লেখো।'

সর্বাণী চুপ করে রইলেন। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে সদর দরজা দিয়ে অফিসের

দিকে বেরোতে বেরোতে সর্বানন্দ বললেন, 'আজ দুপুর থেকেই শুরু করে দাও।'

কথাটা সর্বাণীরও মনে ধরেছে। তবে সেদিন দুপুর থেকেই তিনি লেখা শুরু করলেন না।

সর্বানন্দের একটা বিলিতি ডট পেন আছে। এক বন্ধু উপহার দিয়েছিলেন। তার রিফিল অনেকদিন শুকিয়ে গেছে। বিকেলে বেরিয়ে বাজারের রাস্তায় বড় স্টেশনারি দোকান থেকে একটা ভাল সবুজ রিফিল আনলেন। সেই সঙ্গে একটা আকাশী রঙের রুলটানা প্যাড।

এত সৌখিন কাগজ কলম দেখে সন্ধ্যাবেলা সর্বানন্দ একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'জানো, বড় বড় লেখকরা খসখসে নিউজপ্রিন্টের কাগজে ভোঁতা ডট পেনে তাঁদের মহামূল্য লেখাগুলি রচনা করেন।'

সে তাঁরা করুন। আগামী সাল থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন লেখিকার আবির্ভাব হচ্ছে, শ্রীমতী সর্বাণী দত্ত। নীল কাগজে, সবুজ কালিতে তিনি এমন লেখা লিখবেন যা আর কেউ কখনও লেখেনি। পুরোদমে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন সর্বাণী। তাঁর এখন কোনও ফুরসত নেই। আট-দশ দিনে একটা করে গল্প শেষ করছেন, সেও ছোটখাট গল্প নয়, অন্তত পাঁচ-সাত হাজার শব্দের গল্প।

দুঃখের বিষয় গল্প লিখে সর্বাণী তেমন সুবিধে করতে পারছেন না। মোটেই সাফল্য পাচ্ছেন না। লেখক-লেখিকার সাফল্য নির্ভর করে রচনা প্রকাশিত হওয়ার পরে পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগার ওপরে। কিন্তু সর্বাণীর একটি গল্পও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

গল্প লেখা শেষ হলে সেগুলো যত্ন করে খামে ভরে নিজে ডাকঘরে গিয়ে নিজের হাতে টিকিট লাগিয়ে বিভিন্ন কাগজের দপ্তরে সর্বাণী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারপরে আর কোনও খবর আসে না। নিজে থেকে যেচে গিয়ে খোঁজখবর নিতে সর্বাণীর সঙ্কোচ হয়। এ দিকে ফোন করলেও কেউ কিছু বলতে চায় না, শুধু বলে, 'ছাপা হলে জানতে পারবেন।'

লজ্জায় সর্বানন্দকে তিনি কিছু বলেননি। তবে সর্বানন্দ কি করে টের পেয়েছিলেন, একদিন সকালবেলা চা খেতে-খেতে সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যে এত গল্প লিখছ, সেগুলো কি করছ?'

সর্বাণী জানালেন, 'ডাকে পত্রিকা অফিসে পাঠাই। কিন্তু তারপরে আর কোনও খোঁজ পাই না।'

সর্বানন্দ বললেন, 'তুমি গল্পগুলোর সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো ঠিকানা লেখা খাম দিয়ে দেবে আর গল্পের ওপরে লিখে দেবে, 'অপছন্দ হইলে দয়া করিয়া সঙ্গে প্রেরিত খামে ফেরত পাঠাইবেন।' তা হলে ছাপা না হলেও গল্পটা ফেরত পাবে।'

সর্বাণীর ডাক খরচা একটু বাড়ল কিন্তু অতঃপর গল্পগুলো অমনোনীত হয়ে ফেরত আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে সর্বাণীও কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমতী হয়েছেন। তিনি এক পত্রিকা থেকে ফেরত আসা গল্প সঙ্গে সঙ্গে অন্য পত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সর্বানন্দ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন সর্বাণী মুখ ভার করে বসে আছে। আজ কয়েকদিন ধরেই তাঁর মনখারাপ সেটা সর্বানন্দ লক্ষ করেছেন কিন্তু

এখন রীতিমত বর্ষণোদ্যত অবস্থা। কারণ জানতে চাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সর্বাণীর সামনেই টেবিলের ওপরে মোড়ক-ছেঁড়া খাম, তার মধ্যে সর্বাণীর অমনোনীত গল্প।

সান্ত্বনার খাতিরে সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুখভার কেন? কি হয়েছে?'

সর্বাণী বললেন, 'সব সম্পাদক একজোট হয়ে আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে।

সর্বানন্দ বললেন, 'কি রকম?'

সর্বাণী বললেন, 'তা না হলে পরপর পাঁচজন সম্পাদক আমার একই গল্প ফেরত দেয়।' তারপর ফোঁস করে উঠে বললেন, 'ঠিক আছে আমিও ওদের জব্দ না করে ছাড়ব না।'

কি ভাবে সর্বাণী সম্পাদকদের জব্দ করবেন, সর্বানন্দ সেটা বুঝতে পারলেন না, বোঝার বা জানার চেষ্টাও করলেন না।

এর পরের ঘটনাবলী অতি মারাত্মক।

সর্বাণী খুব কসরত করে ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ না কেটে সোজা করে খুলে একটা গল্প লিখলেন, তারপর ভাঁজ করে দিতেই এমন হল যে ভাঁজ না কাটলে গল্পটা পড়া যাবে না। এই গল্পটা এবার সবচেয়ে নামি সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন।

যথারীতি এ গল্পটাও ফেরত এল। এবং খাম খুলে বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ সত্যি। গল্পটাব ভাঁজ কাটা হয়নি, গল্পটা খুলে কেউ পড়েনি। এরপর খুবই শ্লেষাত্মক ভাষায় সর্বাণী সম্পাদককে একটা চিঠি দিলেন।

সেই চিঠির আজ উত্তর এসেছে। সম্পাদক স্বয়ং লিখেছেন।

মাননীয়াসু,

মাছ যে পচা সেটা বুঝবার জন্যে পুরো মাছটা খাওয়ার দরকার পড়ে না। একটু মুখে দিলেই টের পাওয়া যায়। ইতি—

ভবদীয়

বাক্স গোছাও

অঘ্রান মাস এসে গেল। কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের বিরাম নেই।

কি বৃষ্টিটা হল এ বছর। সেই বৈশাখ মাসের শেষে শুরু হয়েছিল, তারপর প্রায় ধরাবাঁধা বৃষ্টি। দু-চার দিন হয়তো বাদ গেছে, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার নয়।

চৌঠা অঘ্রান। সারাদিন চমৎকার ছিল। সাদা মেঘ, নীল আকাশ, মৃদুমন্দ বাতাস। যেমন যেমন হওয়া উচিত, সবই ঠিকঠাক ছিল।

কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ সন্ধ্যা হতে না হতেই বৃষ্টি বাদল, ঝোড়ো হাওয়া। শুধু তাই নয়, সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ঝলকানি এবং বজ্রগর্জন।

সর্বানন্দ বাল্যকালে পিতামহীর কাছে জেনেছিলেন ওই বজ্রগর্জন হল মহাদেবের হম্বিতম্বি, কারণ দুর্গা আবার বাপের বাড়ি যেতে চাইছেন, ওই বিদ্যুতের ঝলকানি হল দেবাদিদেবের অগ্নিচক্ষু। আর বৃষ্টিপাত হল দুর্গার চোখের জল। বাপের বাড়ি না যাওয়ার দুঃখে পার্বতী কাঁদছেন।

সর্বানন্দের বাড়িতেও আজ প্রায় একই দৃশ্য। যদিও সর্বাণী ঠিক কাঁদছেন না কিন্তু তাঁর চোখমুখ ঝড়বৃষ্টির আগের আকাশের মত থমথমে। আর সর্বানন্দ, তিনি কিছুক্ষণ আগেও গর্জন করেছেন, এখন রাগী মুখে বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে মেঘ-বাতাসের লীলা দেখছেন।

এই সময়ে তাঁর ছেলেবেলার ঠাকুমার কথাটা মনে পড়ল।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে, সর্বাণীর খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে। একেবারে পিঠোপিঠি ভাই। বিয়ে হবে কাকার রেল কোয়ার্টারে খড়্গাপুরে। বিয়ে আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ থেকে একেবারে দ্বিরাগমন পর্যন্ত পাকা দু-সপ্তাহ চুটিয়ে বিয়ের মজা উপভোগ করতে চান সর্বাণী।

সর্বানন্দের এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। বরং সর্বাণী দু-চারদিন না থাকলে তাঁর আনন্দফুর্তির কিঞ্চিৎ সুবিধে হবে।

কিন্তু সর্বাণীর বুদ্ধি অন্যরকম। তিনি সর্বানন্দকে ছাড়বেন না। সর্বানন্দকে তাঁর সঙ্গে খড়্গাপুরে যেতে হবে, সেখানে বিরাট কোয়ার্টার, এলাহি কারবার। সর্বানন্দের নাকি কোনও অসুবিধা হবে না।

প্রথম দিকে সর্বানন্দ ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিলেন, 'সেটা কী করে সম্ভব? আমার অফিস? এতদিন অফিস কামাই করব খুড়তুতো শালার বিয়ের জন্যে?

সর্বাণী বোকা নন। এ প্রশ্ন যে উঠবে এই বুদ্ধিমতী যুবতী আগেই অনুমান কবেছিলেন। তাঁর কথা হল একমাসের জন্যে সর্বানন্দ একটা রেলের মান্থলি করে নেবেন। একমাস থাকতে হবে না, তবুও চৌদ্দ দিনেই খরচা উশুল হয়ে যাবে।

এবার সর্বানন্দ চটে গেলেন, 'খড়্গাপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করব?'

সর্বাণী বললেন, 'দেড়-দু-ঘণ্টার পথ। হাজার হাজার লোক দৈনিক যায় আসে। এম এ পড়ার সময় আমি কতবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এঁসেছি।'

এবার সর্বানন্দ খেপে গেলেন, নিজমূর্তি ধারণ করলেন, 'পাগল হয়েছি নাকি? খুড়তুতো শালার বিয়েতে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে গিয়ে চৌদ্দ দিনের জন্য উঠব?'

সর্বাণী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজের মনে বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই সময়ে সর্বানন্দ কঠিন প্রশ্নটি করলেন, 'তোমার কাকা আমাকে মদ খেতে দেবেন? তুমি সোজা কথা জেনে রাখো আমি যাচ্ছি না।'

দাম্পত্য কলহ এই রকম জায়গায় এসে পৌঁছানোর পর যখন দুজনেরই মেজাজ থমথমে সেই সময়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি এল।

বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে সর্বানন্দ ঘরে এসে দেখল বিয়ের ট্রাঙ্ক থেকে সদ্য গোছানো জামাকাপড় সর্বাণী বার করে ফেলেছে এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য হল দু-বোতল আনকোরা রামের বোতল ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে সর্বানন্দ এসে সর্বাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'এ তুমি কোথায় পেলে?'

সর্বাণী বললেন, 'আমাব হাত খরচের পযসা জমিয়ে কিনেছি। এখন দোকানে ফেরত নেবে কি না কে জানে?'

সর্বানন্দ বললেন, 'ফেরত দিতে হবে কেন? বাক্স গোছাও।'

বিবাহ-বিচ্ছেদ

না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সর্বাণী ও সর্বানন্দের বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে না। তেমন কোন মারাত্মক কারণও নেই।

এবারের নামকরণে একটু গোলমাল হয়ে গেল। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এই সরসী কাহিনীমালাও ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তা আমি হতে দিচ্ছি না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন কলহ হয়, হয়ে থাকে, সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে দাম্পত্য কলহ সেরকম অবশ্যই হয় এবং যথা নিয়মে যথা কালে সে বিসম্বাদ মিটমাটও হয়ে যায়।

কিন্তু এবার একটু গোলমাল হয়েছে, এবার কিছুদিন হল এদের দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া কিছুতেই মিটছে না, দিনের পর দিন গড়াচ্ছে।

শাস্ত্রে বলেছে ভেড়ার লড়াইয়ে ঋষি শ্রাদ্ধে, দাম্পত্য কলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। অর্থাৎ প্রথমে যেমন বিপুল মনে হয় পরিণতি তেমন হয় না।

কিন্তু সর্বাণী-সর্বানন্দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বিপরীত হয়েছে। ঘটনাটা হালকাভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের এক আড্ডায়, সেখানে সর্বাণীও উপস্থিত ছিলেন, সর্বানন্দ রসিকতার চালে বলেছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কারও ভাল বিয়ে হয়নি, এক সর্বাণী ছাড়া।' কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে সবাই খুব হেসেছিল, সর্বাণীও একটু হেসেছিলেন।

আড্ডা ভেঙে যাওয়ার পরে গম্ভীর মুখে সর্বাণী সর্বানন্দকে ধরেছিলেন, 'তোমার তাহলে ভাল বিয়ে হয়নি?'

সর্বানন্দ আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, 'বা রে! তা হবে না কেন?' সর্বাণী তখন বললেন, 'তা হলে তখন অত লোকের সামনে ওকথা বললে কেন?'

সর্বানন্দ আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠাট্টা বোঝো না। ঠাট্টা করেছিলাম, স্রেফ রসিকতা।' এবাব সর্বাণীর মাথায় রক্ত উঠে গেল, 'কি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা?'

সেদিন থেকে সর্বাণী খিটখিট করেই চলেছেন। সর্বানন্দ প্রথম প্রথম চুপ করে ছিলেন, তারপর তিনিও জবাব দিতে লাগলেন। নির্মম ও নিষ্ঠুর বাক্যবাণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিদ্ধ হতে লাগলেন।

ব্যাপারটা অবশেষে শোচনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কাল রাতের কথা বলি। প্রচুর কথা কাটাকাটির পর সর্বানন্দ বললেন, 'আর সহ্য হচ্ছে না। এবার আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

সর্বাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কোথায়, কোন চুলোয় যাবে শুনি?'

সর্বানন্দ দুম করে বলে ফেললেন, 'আমি আবার বিয়ে করব। নতুন করে সুখের সংসার পাতব।'

সর্বাণীর কিছুটা আইন জ্ঞান আছে। তিনি বললেন, 'কি করে আবার বিয়ে করবে শুনি? আমি তোমাকে কখনই ডিভোর্স দেব না।'

সর্বানন্দ বললেন, 'তাতে কিছু আসে যায় না। আমার ইচ্ছে আমি আবার বিয়ে করব। সে তুমি ডিভোর্স দাও না দাও।'

পরের দিন, মানে আজ সকালে, সর্বানন্দের বাসায় সর্বাণীর পিসতুতো ভাই এসেছেন। তিনি অবশ্য এসব ঝগড়াঝাঁটি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। জানার কথাও নয়। ভদ্রলোক, বিভাসবাবু, উকিল মানুষ, সুরসিক জমাটি লোক। আজ রবিবার ছুটির দিনের সকালে বোনের বাড়িতে এসেছেন।

চা-টা দিয়ে তারপর সর্বাণী সর্বানন্দের সামনেই কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বিভাসদা, এক স্ত্রী থাকতে লোকে যদি আবার বিয়ে করে তাহলে কি সাজা হয়?'

বিভাসদা হাসতে হাসতে বললেন, 'কি আর সাজা হবে? দুই সংসার, দুই শাশুড়ি। অসংখ্য শ্যালক-শ্যালিকা, এর চেয়ে বেশি সাজা আর কি হতে পারে।'

বিভাসদার জবাবে সর্বাণী খুশি হননি। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁদের ঝগড়া মোটামুটি মিটে গেছে। সর্বানন্দকে আর দুই শাশুড়ির ঝামেলায় যেতে হয়নি।

অভিজ্ঞতা

যে দু-চারজন এই সর্বানন্দ কাহিনী অর্থাৎ সরসী পাঠ করছেন তাঁরা সবাই এতক্ষণে জেনে গেছেন যে সর্বানন্দ মদ খান, মদ খেতে ভালোবাসেন।

সেটা অবশ্য আজকাল খুব দোষের কিছু বলে গণ্য হয় না; আশেপাশে কত চেনাশোনা লোকই তো মদ্যপান করেন। কিন্তু গোলমালটা অন্য জায়গায়। মদ খাওয়ার ব্যাপারে সর্বানন্দ বহু সময়েই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন।

বেশ কয়েকবার এই বাড়াবাড়ির পরিণতি খারাপ হয়েছে। এই 'সরসী'তে ইতিমধ্যে আমি দুয়েকটা ঘটনার কথা লিখেছি, পাঠক-পাঠিকারা কেউ কেউ হয়তো পড়েছেন।

সে যা হোক, আজ কিছুদিন হল কিছুটা বিবেকের তাড়নায়, কিছুটা সর্বাণীর গালমন্দে সর্বানন্দ একটু সংযত হয়েছেন। আজকাল আর খুব বেশি রাত করেন না বাড়ি ফিরতে, মারামারি-হাতাহাতিও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যে পানশালায় মদ খেতে যান সর্বানন্দ সেখানে এক নতুন আপদ জুটেছে।

কলকাতা শহরে বারের অভাব নেই, বিশেষ করে মধ্য কলকাতায়। ইচ্ছে করলেই অন্য যে কোনও দোকানে পান করতে যেতে পারেন সর্বানন্দ। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়।

মাতালরা তাঁদের মদের আড্ডাকে বলেন *ঠেক*। নানা কারণে পাকা মাতালই সহজে তাঁর *ঠেক* বদল করতে চান না। পুরনো জায়গা, পুরনো লোকজন, চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব কোথাও একটু প্রাণের টান তৈরি হয়ে যায়।

ড্রিমল্যান্ড বার কাম রেস্তোরাঁর ওপরে একটা প্রাণের টান বোধ করেন সর্বানন্দ। সন্ধ্যায় একবার না এলে দিনটা বিফলে গেল বলে মনে করেন তিনি।

কিন্তু আজকাল ড্রিমল্যান্ডের সন্ধ্যাবেলা বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে এক ছিঁচকাঁদুনে মাতালের অত্যাচারে।

দিন পনেরো হল একটি অচেনা ব্যক্তি কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে সারা সন্ধ্যা বারের মধ্যখানের গোলটেবিলটার এক পাশে বসে চুক-চুক করে মদ খায় আর ফ্যাঁচ

ফ্যাঁচ করে কাঁদে।

নতুন মাতালটির বিশাল চেহারা। রীতিমত কেতাদুরস্ত পোশাক, কোর্ট-প্যান্ট-টাই, আপাতদৃষ্টিতে বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কিন্তু সে কেন কাঁদে? আর সে কি কান্না? একেক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বোধহয় বেয়ারাকে বলা আছে, খুব গুঙিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলে বেয়ারা এসে আরেক পেগ পানীয় রেখে যায়। তখন ক্রন্দন কিছুটা প্রশমিত হয়। তারপর আবার ফ্যাঁচফ্যাঁচ থেকে শুরু।

সর্বানন্দ কোনও কারণে এই নতুন খদ্দেরটির বিশেষ বাঞ্ছিত টার্গেট। এই তো গত পরশু দিনই সর্বানন্দ চমৎকার একটা ফুরফুরে নেশা করে রাত দশটা নাগাদ বার থেকে বেরোচ্ছিলেন। আচমকা এই লোকটা তাঁকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন।

এর আগে এ রকম একাধিকবার হয়েছে। সর্বানন্দ বেয়ারার কাছে জানতে চেয়েছেন, 'এই লোকটা কে?' বেয়ারাজনোচিত মুখভঙ্গি জবাব দিয়েছে, 'মালুম নেহি'।

এই জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি সর্বানন্দ একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু বারের বন্ধুবান্ধব অন্যান্য খদ্দেররা তাঁকে বুঝিয়েছেন, এতে রাগ করা উচিত নয়। মানুষ কত দুঃখে কাঁদে, কাউকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা চায়—এতে লোকটার ওপরে মায়া হওয়া উচিত।

লোকটির ভয়ে সর্বানন্দ ড্রিমল্যান্ড বারে যাতায়াত কমিয়ে দিলেন। অবশেষে ঠিক করলেন লোকটার রহস্যটা কি জানতে হবে।

একদিন বিকেল-বিকেল সর্বানন্দ বারে গিয়ে বসে রইলেন, লোকটিকে ধরার জন্যে। বেশি পান করার আগেই কথাবার্তা বলতে হবে।

কথাবার্তা যা হল তা মর্মান্তিক। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মদ খেয়ে এত কাঁদেন কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানেন আমি মদ খাই কেন?'

সর্বানন্দের জানার কথা নয়, তাই তিনি চুপ করে রইলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মদ খাই একজনকে ভুলবার জন্যে।'

'সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে?'

এই প্রশ্নে পুরো আধবোতল মদ গলায় ঢেলে ভদ্রলোক ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন, 'সেইজন্যেই তো কাঁদি। তিনি যে কে? তাঁর কি যে নাম? কিছুই মনে পড়ে না। সব ভুলে গেছি।'

সর্বানন্দকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নার রেশ দেখে বেয়ারা আরেক গেলাস মদ নিয়ে এল।

বিপদ

শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ দত্ত ঘোরতর বিপদে পড়েছেন। সর্বাণীদেবী বারবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। রাজ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর সমস্বরে মানা করেছিল, খালি চোখে গ্রহণ দেখার পরিণাম কি হতে পারে সে বিষয়ে যথাবিহিত ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু একগুঁয়ে সর্বানন্দ কারও কথা শোনেননি।

সরাসরি পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে তরল, সরল সর্বানন্দের চরিত্রের একটা বড় দোষ যে তিনি খুবই একগুঁয়ে। কোনও ব্যাপারে একবার গোঁ ধরলে তিনি ছাড়তে চান না।

সর্বানন্দের মনে আছে উনিশশো আশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই শেষবার যে কলকাতায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেবার এত হইচই হয়নি তবে লোকজন খুব বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, গ্রহণের সময় রাস্তায় যানবাহন চলেছিল, লোকজন ছিল না, দোকানপাট বন্ধ ছিল, এমনকি আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু এ বারের ব্যাপার আলাদা। সর্বানন্দ ভেবে পাননি এই পনেরো বছরে সূর্যরশ্মির এমন কি তারতম্য ঘটে গেছে।

সন্ধ্যায় পানীয়ের আড্ডায় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নবতোষ চক্রবর্তীকে সর্বানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'সূর্যের বেগুনি রশ্মিতে কি কোনও দূষণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে?'

অধ্যাপক নবতোষ একটু ভালমানুষ গোছের লোক, ব্যাপারটা কিছুটা বুঝে নিয়ে সর্বানন্দকে বললেন, 'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ, গতবার খালিচোখে দেখলাম কিছু হল না এবার সূর্যরশ্মি এত বিপজ্জনক কেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ আমি ঠিক তাই ভাবছি।'

নবতোষ এবার একটা বাজে রসিকতা করলেন, 'জানো না, একজন শতায়ু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দীর্ঘ জীবনের রহস্য কি। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন, বোধহয় আপনাদের ঐ সব জীবাণু, বীজাণু, ভাইরাস, জার্ম এসব আবিষ্কার হওয়ার ঢের আগে আমি জন্মেছিলাম তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

সর্বানন্দ এ শুনে বলেছিলেন, 'মানে?'

নবতোষ বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছো না। তোমার চোখ আর আকাশের সূর্য ঠিকই আছে কিন্তু এই পনেরো বছরে ডাক্তার আর বিজ্ঞানীরা অনেক গোলমেলে ব্যাপার সব আবিষ্কার করে ফেলেছেন।'

এই আলোচনার পর সর্বানন্দ খালি চোখে এবারও পূর্ণগ্রহণ দেখার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু খবরের কাগজে নানারকম বিপজ্জনক বিবৃত পাঠ করে সর্বাণী তাঁকে যথাসাধ্য নিরস্ত করার চেষ্টা করেন।

সর্বাণী নানারকম বিকল্প ব্যবস্থাও করেছিলেন।

পুরনো কাঠের আলমারি খুলে একটা কালো পাথরের থালা বার করে তার মধ্যে জল ভরে ছাদে রেখে দিয়েছিলেন। তার আগে সাড়ে চারঘণ্টা টানা রোদ্দুরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে দুজোড়া বিশুদ্ধ গ্রহণ চশমা কিনে এনেছিলেন। একটা পুরনো এক্স-রে প্লেট পর্যন্ত যোগাড় করেছেন, পাশের বাড়িতে টিবি রোগী আছে, সেই বাড়িতে মাসে মাসে এক্স-রে তোলা হয়, সেখান থেকে চেয়ে এনেছেন।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সর্বানন্দ খালি চোখে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যগ্রহণ দর্শন করলেন। আগের বারের মতই চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। ভাবলেন এবারের নিশ্চয় কিছু হয়নি। তেমন কিছু টেরও পেলেন না।

কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে সর্বানন্দ ঘাবড়িয়ে গেলেন।

বলে কি? এখন নয়, পাঁচ বছর পরে টের পাওয়া যাবে। পূর্ণগ্রহণ দর্শনে নির্ঘাত পূর্ণ অন্ধত্ব। যদিও পাঁচ বছর পরের ব্যাপার সর্বানন্দ এখনই ঘামতে থাকলেন। তাঁর মনে হতে লাগল চোখে অন্ধকার দেখছেন।

বিকেলে পানীয়ের আসরে আবার নবতোষের সঙ্গে দেখা। নবতোষ কিন্তু একটা আশ্বাসের বাণী শোনালেন 'বিষে বিষক্ষয়'। এর পরের বার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তুমি খালি চোখে দেখো। এবারের দোষ কেটে যাবে।'

সর্বানন্দ অপেক্ষা করছেন পরের বারের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের জন্যে।

সর্বানন্দের বাল্য কাহিনী

শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ দত্তের গল্প এত বলছি, এত সব কাহিনী, কিন্তু এর সবই তাঁর বর্তমান জীবনের, তাঁর যৌবন কালের। এইসব গল্প পাঠ করার পর কোনও কোনও পাঠক-পাঠিকার মনে এই মহাপুরুষের বাল্যজীবন সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উত্তরপাড়া থেকে শ্রীমতী ঝর্না গোলদার লিখেছেন তাঁর কেমন যেন সর্বানন্দকে চেনা-চেনা মনে হয়। তাঁর সঙ্গে কিন্ডারগার্টেনে মহানন্দ দত্ত বলে একটি গোলমেলে ছেলে পড়ত, সেই মহানন্দই কি এই সর্বানন্দ।

না, ঝর্নাদেবী, আপনার অনুমান ঠিক নয়, তবে অনেকটা ধরতে পেরেছেন। সর্বানন্দ হলেন মহানন্দের ছোট ভাইদের একজন, মহানন্দ হলেন সর্বানন্দের মেজদা।

সর্বানন্দের অবশ্য মেজদা, সেজদা, ফুলদা, রাঙাদা, নোয়াদা ইত্যাদি দাদার অভাব ছিল না। বাল্যকালে তাঁরা ছিলেন আট ভাই। এখন অবশ্য ছয় ভাইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে যা হোক, আপাতত সর্বানন্দ দত্তের বাল্য জীবনের একটা গল্প বলি সেও এই দাদা জড়িত।

(ঝর্নাদেবী, এই গল্প সর্বানন্দের কিন্ডারগার্টেন নিয়ে। হয়ত আপনি শিশুকালে যেখানে পড়তে গিয়েছিলেন, সেই কিন্ডারগার্টেনেই।)

যদিও আজকালের মত এত অসম্ভব নয়, সর্বানন্দের বাল্যকালেই স্কুলে ভর্তি হওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ভাল নার্সারি বা তথাকথিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলে।

সর্বানন্দ শিশুকালে এখনকার মত ঠিক এত চৌকোশ ছিলেন না বরং বলা চলে, সর্বানন্দ দত্তের ঠাকুমার ভাষায়, তিনি একটু মাঠো ছিলেন।

স্বভাবতই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযে ভর্তি হওয়া সর্বানন্দের পক্ষে সহজ ছিল না। তবে এখনকার মতই তখনও ধরাধরি, নেপোটিসম, পিছনের দরজা এসব ছিল।

সর্বানন্দের বড়দাদা গজানন্দ দত্ত সর্বানন্দের চেয়ে রীতিমত বিশ বছরের বড়। সর্বানন্দ যখন নার্সারিতে ভর্তি হচ্ছেন তখন তিনি শুধু সাব্যস্ত, সাবালক নন, চাকরির পরীক্ষা পাশ করে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সর্বানন্দকে যে কিন্ডারগার্টেনে ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছিল একদা শৈশবকালে গজানন্দও সেই শিশু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সেই ছাত্র এখন হোমরাচোমরা সরকারি অফিসার। সেই গজানন্দের সুবাদেই অবশেষে সর্বানন্দ এই কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয়েছিলেন।

সাধারণত এই সব স্কুলগুলোর নিজেদের কয়েকটা গায়জুরি নিয়ম থাকে তার মধ্যে একটা হল কোনও প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মীয়কে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটা এক ধরনের নেপোটিসম এবং সব সময়ে এই সুবিধে দেওয়া হয় তাও নয়, এ সবই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার সুবিধাবাদী রকমফের।

সে যা হোক, এসব নৈতিকতার কোনও আলোচনায় গিয়ে লাভ নেই তাতে গল্পটা মারা পড়বে। সুতরাং গল্পটাই বলি।

গজানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্বানন্দ ইস্কুলে ভর্তি হতে এলেন। কিন্ডারগার্টেনের বড় দিদিমণি গোমেস-আন্টি প্রবীণা শিক্ষিকা। তাঁর কাছে গজানন্দও যথাকালে পড়েছেন।

তিনি তো খুব আদর যত্ন করে শ্রীমান সর্বানন্দকে স্কুলে নেওয়ার আয়োজন করলেন। লোক দেখানো একটু প্রশ্নোত্তরও ব্যবস্থা হল।

সেই প্রশ্নোত্তরের একটু নমুনা পেশ করার জন্যেই এবারের সরসী :

গোমেস আন্টি : তুমি গজানন্দের ভাই?

সর্বানন্দ : হ্যাঁ। (তারপর একটু ইতস্তত ভাব।)

গোমেস আন্টি : (কেমন সন্দেহপ্রবণ কণ্ঠে) তুমি ওর কেমন ভাই হও।

সর্বানন্দ : দূর সম্পর্কের।

গোমেস আন্টি : তুমি গজানন্দের আপন ভাই নও, মায়ের পেটের ভাই নও?

সর্বানন্দ : হ্যাঁ, মায়ের পেটের ভাই।

গোমেস আন্টি : তাহলে দূর সম্পর্ক বলছ কেন?

সর্বানন্দ : আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে না। বড়দা আর আমার মধ্যে আরও ছয় ভাই রয়েছে, তাই বলছিলাম দূর সম্পর্কের ভাই।

আয় আয় চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা। এবারের গল্পের নামকরণে একটা গোঁজামিল হয়ে গেলো। বাংলা টিপ নয়, হবে ইংরেজি টিপস্।

রেস্তোরাঁয় বেয়ারাদের টিপস্ দিলে তারা খুশি হয়। আজকাল কাগজে কাগজে টিপস্, কথায় কথায় টিপস্ পাঠকদের জন্যে।

খবরের কাগজ টিপস্ পড়ার নেশা ধরে গেছে সর্বানন্দের। সব কাগজে সব দিন টিপস বেরোয় না। কোনও কোনও কাগজে কোনও দিনই বেরোয় না। সে সব পত্রিকা মোটেই পছন্দ নয় সর্বানন্দের।

সপ্তাহের যে বারে যে কাগজে টিপস্ বেরোয় সেই কাগজ সেইবারে রাখেন সর্বানন্দ দত্ত। প্রথম পাতার হেড লাইন নয়, মধ্যের পাতার সম্পাদকীয় নয়, দুইয়ের তিনের পাতার বাজার দর, শ্লীলতাহানি, বলাৎকার নয়, এমনকি শেষের পৃষ্ঠায় খেলাধুলা নয়

কাগজের আনাচে-কানাচের টিপ্‌সের কলম খুঁজে বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন সর্বানন্দ। পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যান তিনি। কতসব জটিল সমস্যার কত সহজ সমাধান রয়েছে, ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কতরকম সুপরামর্শ রয়েছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে সর্বানন্দ তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে একটি কাঠের হাতবাক্স পেয়েছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার মধ্যে কাগজ, টাকা-পয়সা নিজের টুকিটাকি জিনিস রাখতেন। এতদিন সেটা তাকের একপাশে পড়ে ছিলো। এখন সর্বানন্দ সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে ব্যবহার করেন।

ব্যবহার করেন মানে যত কাগজে যতরকম টিপ্‌স বেরোয়, সেই কাটিংগুলো এই বাক্সে জমিয়ে রাখেন। কতরকম দরকারি পরামর্শ আছে। কত ভাল ভাল টোটকা।

সর্বানন্দের স্ত্রী সর্বাণীর আজ কিছুদিন হল দুই-একটা করে চুল পাকা শুরু হয়েছে। তাই নিয়ে তাঁর চিন্তা, সময় পেলেই আয়নার সামনে মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন কোথায় কতগুলো চুল পাকল, নাগালের মধ্যে পেলে দুই-একটা তুলেও ফেলেন।

সর্বানন্দ 'সাপ্তাহিক মহিলামহল' পত্রিকায় পাকাচুল কালো করার একটা সহজ টোটকা পেয়েছিলেন। বিশেষ কিছু নয়, আমের আঁটির সাদা শাঁস রোদে শুকিয়ে তার সঙ্গে শুকনো আমলকি আর হরিতকি একসঙ্গে বেটে লোহার পাত্রে জল মিশিয়ে সাতদিন রাখতে হবে। তার পরে সেই নির্যাস মাথায় মাখলে শুধু পাকা চুল কালো হয়ে যাবে তা নয়, নিয়মিত ব্যবহার করলে আর কখনই চুল পাকবে না।

কিন্তু সর্বাণী টোটকা ব্যবহারে সম্মত নন। তার অবশ্য একাধিক কারণ আছে।

মাসখানেক আগে একদিন সকালে কাগজের টিপ্‌স দেখে তিনি সর্বাণীকে বলেছিলেন, শোয়ার ঘরে খাটের নিচে একটা বাটিতে সরষের তেল দিয়ে তার মধ্যে রসুন আর কাঁচা লঙ্কা রেখে দিতে হবে। তা হলে রাতে আর মশা কামড়াবে না।

এর পরিণাম অবশ্য সুখকর হয়নি। রাতে মশারি না খাটিয়েই সর্বানন্দ আর সর্বাণী শুয়ে পড়েছিলেন। গরমের দিন, সরাসরি ফ্যানের বাতাসে বেশ আরাম হয়েছিল। দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল আধঘণ্টার মাথায়। মশা ছেঁকে ধরেছে দুজনকে, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে অন্তত পঁচিশটি করে মশা। এবার মশারি টাঙিয়ে শোয়া হল, কিন্তু মশার কামড়ের জ্বলুনিতে দু'জনের সারা রাত ঘুম হল না।

পরের দিন থেকে অন্য এক সমস্যা। যে দেখে সেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কি হাম হয়েছে?' কেউ কেউ জলবসন্ত হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। সর্বাণীকে বাড়ি থেকে বিশেষ বেরতে হয় না, সর্বানন্দকে প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে সাতদিন বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে হল। মশার কামড়ের দাগ তার আগে মিলাল না।

অন্য একটি টিপ্‌সে সর্বানন্দ বিলক্ষণ জব্দ হয়েছিলেন। নাকাশিপাড়া থেকে জনৈকা অভিজ্ঞা গৃহবধূ 'দৈনিক গঙ্গা' কাগজে জানিয়েছিলেন যে মুথোঘাস কিনে তার রস লাগালে জামাকাপড় থেকে যে কোন দাগ উঠে যায়। সর্বাণীর একটি সিল্কের শাড়িতে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে চাকার কালি লেগে গিয়েছিল। সে দাগ আর উঠতে চায় না।

যেদিন কাগজে নাকাশিপাড়ার অভিজ্ঞা গৃহবধূর টিপস্‌টি বেরোয় সেদিন সর্বাণী গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে। খবরের কাগজে টিপস্‌টি পড়েই একটা থলে নিয়ে ময়দানে

চলে গিয়েছিলেন সর্বানন্দ। রৌদ্র গলদঘর্ম হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের কঠোর পরিশ্রমের পর এক থলে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে আসেন তিনি। কেউ কেউ তাঁর ঘাস ছেঁড়া দেখে বিস্মিত হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, 'বাড়িতে খরগোস আছে।' এই কথা শুনে আবার একজন বলেছিলেন, 'তা হলে দুর্বাঘাস নিলে পারতেন, খরগোশ কি মুথোঘাস খাবে?'

সে যা হোক, বাসায় ফিরে সেই ঘাস শিলনোড়ায় বেটে রস বার করে শাড়ির দাগ লাগা অংশে লাগালেন সর্বানন্দ। প্রথমে মনে হয়েছিল কালো দাগটা সত্যি বুঝি উঠে গেল। কিন্তু ঘাসের রস শুকোতে দেখা গেল কালো দাগ তো ওঠেইনি বরং আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। এরপর সেই ঘাসের রস ভেজা অংশটা ক্রমশ বিস্তারিত হয়ে কালো দাগ আরও ছড়িয়ে পড়ল।

বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর প্রিয় শাড়ির এই পরিণতি দেখে সর্বাণী যাচ্ছেতাই কাণ্ড করলেন।

এরপর থেকে সর্বানন্দ একটু সাবধান হয়েছেন। টিপ্‌সের নির্দেশ মত চুল কাঁচা হওয়ার নির্যাসটা আমের আঁটি, আমলকি, হরিতকি দিয়ে তৈরি করলেন বটে কিন্তু সর্বাণীকে বললেন, 'এটা ঘাড়ের পিঠব্যথার ওষুধ, অফিসের এক সহকর্মীর পিঠব্যথা কিছুতেই কমছে না, তার জন্যে বানালাম।'

এক্ষেত্রে একটা অঘটন ঘটল। সেদিনই দুপুরে ভাতঘুম দিয়ে উঠে সর্বাণী দেখেন ঘাড় সোজা করতে পারছেন না। প্রচণ্ড ব্যথা। হঠাৎ তাঁর স্বামীর তৈরি ওষুধটার কথা মনে পড়ায় তিনি সেই চুল কাঁচা করার নির্যাসটা ঘাড়ে লাগালেন এবং কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ পিঠব্যথা দূর হয়ে গেল। এই সঙ্গে আরও একটা ব্যপার ঘটেছে। ঘাড়ের কাছের চুলগুলোয় যেখানে ওই টোটকা লেগে গিয়েছিল, সেগুলো এক রাতের মধ্যে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে, তবে সান্ত্বনা এই যে মাথার পিছন দিকে থাকায় সর্বাণীর এখনও তা চোখে পড়েনি।

দাম-দর

আপনারা তো জানেন কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ দত্ত সস্ত্রীক পুরী গিয়েছিলেন।

পুরীতে সর্বানন্দেব একটা বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অন্যসব কথা লিখতে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতার ঘটনাটা লেখা হয়নি। কিন্তু লেখা উচিত।

পুরীর জগন্নাথধাম, সমুদ্রতীর সবই খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা এসব কারণে তো বটেই এ ছাড়াও পুরী যান কেনাকাটা করতে।

এবং সেই কেনাকাটা শুধু কটকী শাড়ি কিংবা ঝিনুক-শামুক-শঙ্খ বা 'পুরীর স্মৃতি' লেখা পেতলের থালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আরও বহু বিচিত্র মনোহারী দ্রব্য পাওয়া যায় পুরীধামে, বিশেষত সমুদ্র তীরের এবং জগন্নাথ মন্দিরের সামনের বাজারে।

দশাবতার তাস, কাঁসার ঘণ্টা, পিপলির পর্দা, আদিরসাত্মক ছবি, কড়ির ঝাঁপি বিচিত্র সব দ্রব্যাদি পাওয়া যায় সেই প্রাচীন বাজারে। এগুলো কেনাকাটার মধ্যে, সংগ্রহ করার ব্যাপারে অনেকে যথেষ্ট আনন্দ পান, কলকাতায় ফিরে এসে আত্মীয়বন্ধু, নিকটজনকে সেসব উপহার দিয়ে নিশ্চয় তৃপ্তি পান তাঁরা। কিন্তু এসব কেনাকাটায় যে ম্যারাথন

দামাদামি জড়িত থাকে তার উত্তেজনাও কম নয়।

বাংলায় সেই একটা কথা আছে না, 'চোখের চামড়া নেই', সর্বানন্দজায়া সর্বাণীও দাম-দরের ব্যাপারে ঠিক তাই।

সর্বানন্দ অবাক হয়ে যান কত অনায়াসে এবং অম্লানবদনে সর্বাণী একটা জিনিসের অবিশ্বাস্য কম দাম বলতে পারেন। একটা শঙ্খের দাম হয়তো দোকানদার বলল, 'পঁচাশি টঙ্কা।' চোখের পাতা না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে সর্বাণী বললেন, 'বাইশ টাকা।' এরকম অবস্থায় বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝে সর্বানন্দ এক লাফে সর্বাণীর পাশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকেন, যেন তিনি সর্বাণীর সঙ্গে আসেননি। তবে কৌতূহলভরে তিনি এদিকেও লক্ষ রাখেন, এই দাম-দরের পরিণতি কি হয়।

পরিণতি কিন্তু খারাপ হয় না। পঁচাশি টাকার শাঁখ সাড়ে বত্রিশ টাকায় কিনে, কখনও দেড়শো টাকার রঙিন কাপড়ের ঝালর সাতান্ন টাকায় কিনে সগৌরবে সর্বাণী দোকান থেকে আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে আসেন। সর্বানন্দ স্তম্ভিত হয়ে যান।

কিন্তু দাম-দরের ব্যাপারে স্তম্ভিত হওয়া নিয়ে আসল অভিজ্ঞতা তখন সর্বানন্দের বাকি ছিল।

বাজারে, সমুদ্রের ধারে, এমনকি হোটেলে সবাই দাম-দর করছে। পঁচিশ-সাত, চল্লিশ-সাড়ে তেরো, একশো দশ-বেয়াল্লিশ : বিভিন্ন জিনিসের দাম একদিকে নামছে একদিকে উঠছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের থার্মোমিটারের মত। সর্বানন্দ অবাক হয়ে দেখেন। সেই সঙ্গে কিছু বোকাকেও তিনি দেখেন, যাঁরা একশো টাকার দামের জিনিস আশি টাকায় কিনে খুশি হয়ে চলে যান, জানেন না এর দাম চল্লিশ টাকাও নয়।

তবু এসব কিছুই নয়। প্রকৃত দাম-দরের বিপর্যয় দত্ত দম্পতি, সর্বানন্দ-সর্বাণী, প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুরী থেকে ফিরে আসার দিন অপরাহ্ণে সমুদ্রের তটে হাঁটতে গিয়ে। বিষয়টি গুরুতর।

অত গুরুভাবে আমি লিখতে পারি না। সর্বানন্দের অনুমতি নিয়ে নিজের মত করে লিখছি।

বলা বাহুল্য, তাঁর কাছে যা শুনেছি, তেমনই লেখার চেষ্টা করছি।

'সেদিনই ফিরে যাব। তাই সন্ধ্যার একটু আগে শেষবার সমুদ্রের ধারে আমি আর সর্বাণী ঘুরতে গেছি, একেবারে জলের কিনারা ঘেঁষে ভেজা বালির ওপর দিয়ে খালি পায়ে চটি হাতে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি একটু দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটা লোক ঢেউয়ের ওপরে মাথা তুলেই সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল। সঙ্গে সঙ্গে একজন নুলিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটিকে ঠেলে তার মাথা জলের ওপরে তুলল। এবার নুলিয়া যেন লোকটিকে কি বলল। খাবি খাওয়া লোকটিও কি একটা জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে নুলিয়া লোকটিকে ছেড়ে দিল। লোকটি হাবুডুবু খেতে লাগল। নুলিয়া আবার তাকে তুলল, আবার কি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হল। নুলিয়া লোকটিকে আবার ডুবিয়ে দিল। তারপর আবার তুলল। আবার কথাবার্তা। আবার ডোবাল। আবার তুলল। এইরকম বারবার।...'

'আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু সর্বাণী বলল, ওরা নির্ঘাৎ দাম-দর করছে। পরে জেনেছিলাম জীবনের দাম-দর চলছে। নুলিয়া বলছে জল থেকে বাঁচাব, একশো টাকা দিতে হবে। লোকটি বলছে পঁচিশ টাকার বেশি দেব না। এইভাবে নব্বই-তিরিশ,

আশি-চল্লিশ অবশেষে ষাটে রফা হয়। ততক্ষণে অবশ্য নিমজ্জমান ব্যক্তিটির দফাও প্রায় রফা।...

রং নাম্বার

টেলিফোন থাকলেই রং নাম্বার আসবেই, না এসে উপায় নেই। রং নাম্বারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেরই এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে টেলিফোন তুলেই জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদা, এটা কি রং নাম্বার?'

সর্বানন্দের বাড়ির টেলিফোনেও রং নাম্বার আসে। খুব বেশি নয়। তবে দুয়েকটা বিপজ্জনক ফোন আসে।

কাছাকাছি কোথাও একটা উন্মাদ আশ্রম আছে, তার সঙ্গে মাত্র একটি সংখ্যার তফাত সর্বানন্দের ফোন নম্বরের। সুতরাং আশ্রমস্থ পাগলদের আত্মীয়স্বজন মাঝেমধ্যেই সর্বানন্দ বা সর্বাণীর কাছে তাদের কুশলবার্তা জানতে চান।

একটা জুতো তৈরির কারখানার ফোনও আসে। একজন মহিলা উকিলের খোঁজেও ফোন আসে। সেটা একটু গোলমেলে। কারণ সে মহিলাও মিসেস দত্ত। প্রথম প্রথম ও রকম ফোন এলে সর্বাণী ঘুলিয়ে ফেলতেন, 'আজকে জামিন হওয়ার আশা আছে কি না?' এই জাতীয় প্রশ্নে হকচকিয়ে যেতেন।

কিন্তু এসব কিছুই নয়, পরশু শেষরাতে যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

রাত পৌনে তিনটে নাগাদ টেলিফোনের অনবরত ক্রিং ক্রিং শব্দে সর্বানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হল। কোনও দুসংবাদ নাকি, এমন অসময়ে ফোন। ঘুম জড়ানো চোখে তাড়াতাড়ি গিয়ে সর্বানন্দ ফোন ধরলেন।

ফোন করেছেন রাস্তার ওপাশের মোড়ের দিকের গাড়ির তিনতলার সদাশিববাবু। সদাশিববাবু লোকটি খুব বাজে ধরনের। এ পাড়ায় আসা ইস্তক ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সর্বানন্দ তাঁকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন।

এখন ফোন ধরতে লাইনের ওপার থেকে সদাশিববাবুর রাগী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কি ব্যাপার সদাশিববাবু?' যথা সম্ভব নিচু গলায় সর্বানন্দ জানতে চাইলেন।

ওদিক থেকে সদাশিববাবু চেঁচালেন, 'এখনই বন্ধ করুন। না হলে পুলিশে ফোন করব।'

সর্বানন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বন্ধ করব? পুলিশে ফোন করবেন কেন? কি হয়েছে?'

সদাশিববাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। 'কি বন্ধ করব, ন্যাকামি হচ্ছে। এত রাতে, এত জোরে কেউ টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে গান শোনে। আপনার অত্যাচারে পাড়ার লোকের ঘুমের বারোটা বেজে গেছে।'

ঘুম ভাঙার পরে সর্বানন্দও টের পেয়েছিলেন কাছাকাছি কোথাও, হয়তো পেছনের বস্তিতে কেউ খুব উচ্চস্বরগ্রামে রেকর্ড প্লেয়ার বা ক্যাসেট বাজাচ্ছে। কিন্তু সর্বানন্দের বাড়িতে এ সব যন্ত্র নেই। আর রাত জেগে গান শোনার উৎসাহ সর্বানন্দ বা সর্বাণীর কারও নেই।

যে যা হোক, এখন আর কোনও কথা না বাড়িয়ে সর্বানন্দ নিঃশব্দে ফোনটি রেখে দিলেন। শেষ রাতের সুখনিদ্রা কেঁচিয়ে দিয়েছে, আর ঘুম এল না। সারাদিন শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করল। সর্বানন্দ ঠিক করলেন। তিনি এর প্রতিশোধ নেবেনই।

রাতে শোয়ার সময় এলার্ট ঘড়িতে দম দিয়ে ঠিক আড়াইটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেন।

রাত আড়াইটায় অ্যালার্ম ঘড়ির আওয়াজ হতে সর্বানন্দ উঠে গিয়ে ফোনে সদাশিববাবুকে ধরলেন; 'হ্যালো, সদাশিববাবু, আপনাকে বলা হয়নি কাল, কাল রাতে আমাদের বাড়িতে কিন্তু কোনও গান বাজানো হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে কি আমাদের বাসায় টেপরেকর্ডার বা ক্যাসেট প্লেয়ার কিছুই নেই। আপনি কালকে ভুল করেছিলেন। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।'

সদাশিববাবুর জবাবের অপেক্ষা না করে সর্বানন্দ ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

মিউ মিউ

এ বাড়িতে এই উৎপাত আগে ছিল না। সর্বাণী ও সর্বানন্দ, বেশ কয়েক বছর হল এই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছেন। এ যাবৎ বেড়ালের অত্যাচার ভোগ করেননি।

কিন্তু ভাগ্য চিরদিন মানুষের ওপর সদয় থাকে না। কারা যেন কোথা থেকে একটা বেড়ালছানা এনে সর্বানন্দদের বাড়ির সদর দরজায় ছেড়ে দিয়ে গেছে।

সাধারণ কোনও বেড়ালছানা হলে তবু মেনে ও মানিয়ে নেওয়া হয়তো যেত। কিন্তু এ কোনও সামান্য বেড়ালছানা নয়। এ রকম গোলমেলে বেড়ালের বাচ্চা ভূ-সংসারে আর কখনও দেখা গেছে কি না, দেখা যাবে কি না এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী দত্ত।

প্রাণের দায়ে এই গবেষণা। বেড়াল শাবকটি তাঁদের দুজনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বাচ্চাটি যে দেখতে খারাপ তা মোটেই বলা চলে না। সাদা, কালো হলুদে বেশ একটা রাজকীয় ডোরাকাটা ভাব। চোখের চারপাশ ঘিরে এক[illegible] কৃষ্ণ বৃত্তাভাস। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখে চশমা। একটু হাসিই পায়।

কিন্তু হাসির ব্যাপার নয়। এই মার্জার শিশুটি শুধু দত্ত দম্পতির নয় অন্যান্য প্রতিবেশীদের জীবনও অসহ্য করে তুলেছে।

ও আর তেমন কিছু নয়, বেড়াল বাচ্চাটির অবিরাম আর্ত মিউ মিউ। সর্বানন্দ এর নাম দিয়েছেন ক্রন্দসী।

এখানে মিউ মিউ শব্দটা ঠিক ব্যবহার চলে না। সর্বানন্দও ক্রন্দসী নামটা অভিধান-সম্মতভাবে দেননি।

শেষ রাতে প্রথম কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তারও আগে জানলার গ্রিলের ওপারে বসে ক্রন্দসী তার ক্রন্দন জুড়ে দে[illegible]।

আর সে কি ক্রন্দন। মিউ মিউ নয়, ম্যাও ম্যাও নয়, মুঁ মুঁ নয়, গরর গরর নয়—এক টানা হোয়াং-হো হোয়াং-হো করে কেঁদে যায়। কোনও বেড়াল যে এমন ভাবে ডাকতে পারে সেটা স্বকর্ণে না শুনলে কারও পক্ষে ভাবা কঠিন।

সর্বানন্দ এবং সর্বাণী, সেই সঙ্গে আশেপাশের বাড়ির লোকেরা গভীর ধৈর্যের সঙ্গে অনুধাবন করে দেখেছেন, ওই এক পৌনঃপুনিক, একঘেয়ে কণ্ঠে 'হোয়াং-হো' করা ছাড়া ক্রন্দসী মার্জারজনোচিত মিউ মিউ ইত্যাদি কিছুই করে না।

সর্বাণীর ধারণা চিনের ভুগোল বিখ্যাত সেই দুঃখের নদী হোয়াং-হো বেড়াল জন্ম নিয়ে তাঁদের ঘাড়ে চেপেছে। এ ছাড়া ক্রন্দসীর এই অনুনাসিক আচরণের কোনও ব্যাখ্যাই নেই।

নানা রকম চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। লাঠি নিয়ে তাড়া করে যাওয়া হয়েছে। ক্রন্দসী পরমুহূর্তেই ফিরে এসে আবার কান্না জুড়ে দিয়েছে। সর্বাণী দুবার 'দু'বোতল ফ্রিজের কনকনে ঠাণ্ডা জল ক্রন্দসীর মাথায় ঢেলে দিয়েছিলেন। কিছুই হয়নি। গা ঝাড়া দিয়ে সে আবার কান্না জুড়ে দিয়েছে। খাবাব দিয়ে দেখা গেছে, কোনও লাভ নেই, খেতে খেতে ক্রন্দসী কাঁদে।

এক ভয়াবহ বিরক্তির অবস্থা। সর্বানন্দ স্থির করেছিলেন ঝোলায় ভরে ময়দানে বা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসবেন। কিন্তু ধরা কঠিন। অত্যন্ত চালাক বেড়াল, ঘরের মধ্যে আসে না। কাছে গেলেই পালিয়ে যায়। অবশেষে সর্বানন্দ এক জবর বুদ্ধি বার করেছেন। বেড়ালের বাচ্চার গলা বসিয়ে দিতে হবে, মানুষের যেমন গলা বসে যায় ঠিক সেই ভাবে।

আজ সকালে বাজারে গিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক চেহারার তবকারিওয়ালার কাছে একটা জঘন্য দর্শন বাঁকাচোরা ওল দুশো গ্রাম কিনলেন। এই ওল খেলে গলা না ধরে যায় না। বাড়িতে এসে সর্বাণীকে বললেন, 'মাছের কাঁটা দিয়ে এই ওলেব চচ্চড়ি কর। দেখি এটা খাওয়ার পরে বেড়ালের ডাক কমে কি না।'

এই গল্পের সামান্য একটু উপসংহার আছে। চচ্চড়ি হযে যাওয়ার পর সেটা বেড়ালের গলার পক্ষে যথেষ্ট মারাত্মক কি না সেটা চেখে দেখেছিলেন সর্বাণী। এমন উপাদেয় হয়েছিল চচ্চড়িটা তিনি একটুও ক্রন্দসীকে না দিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলেন সবটুকু।

শেষ সংবাদ।

সর্বাণীর গলার কোনও ক্ষতি, বসে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া, কিছুই হয়নি। ক্রন্দসীও বহাল তবিয়তে কেঁদে যাচ্ছে। অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষতম সংবাদ।

সর্বাণীর পেটে ভীষণ ব্যথা।

কুকুর

পয়লা বৈশাখ সকাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ স্নান করে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নববর্ষ করতে বেরোলেন সর্বানন্দ। যাওয়ার সময় সর্বাণীকে বলে গেলেন, একটা-দেড়টার মধ্যে ফিরে আসব। দুজনে এক সঙ্গে খাব।'

সর্বানন্দের এ ধরনের কথায় অবশ্য সর্বাণীর মোটেই ভরসা নেই। সর্বানন্দ যখন দুটো পর্যন্ত এলেন না তিনি একাই খেযে নিলেন।

রোদে ভাজা-পোড়া হয়ে চোখ লাল করে সর্বানন্দ ফিরলেন চারটে নাগাদ। সেই দিন

রাতেই সর্বানন্দের জ্বর এল, বেশ জ্বর। পাশের ফ্ল্যাট থেকে থার্মোমিটার চেয়ে এনে সর্বাণী দেখলেন পরের দিনও যখন জ্বর ছাড়ল না, সর্বাণী পাড়ার ডিসপেনসারির ডাক্তারবাবুকে কল দিলেন। ডাক্তারবাবু আসতে আসতে রাত প্রায় নটা হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বেল দিতে সর্বাণী গিয়ে দরজা খুলে দিতে দেখলেন ডাক্তারবাবু একা আসেননি। তাঁর সঙ্গে বিরাট একটা কুকুর।

কুকুর দেখে সর্বাণী অবাক হয়ে গেলেন। অতবড় একটা কুকুর নিয়ে কোনও ডাক্তার রোগী দেখতে আসতে পারেন এটা ভাবা যায় না।

এ বিষয়ে অবশ্য সর্বাণীর আরও একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা আছে। সর্বাণীর দিদি-জামাইবাবু থাকেন হাওড়ার সালকিয়ায়। মাস কয়েক আগে দিদির শরীর খারাপের খবর পেয়ে সর্বাণী সেখানে গিয়ে দিন তিনেক ছিলেন। ওই অঞ্চলের ডাকসাইটে ধন্বন্তরি ডাক্তার রামলালবাবু। সর্বাণী দিদির বাড়িতে গিয়ে শুনতে পেলেন রামলালবাবুকে কল দেওয়া হয়েছে।

তবে রামলালবাবু গভীর রাতের আগে আসতে পারবেন না। সারা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর চেম্বার রোগীতে গিজগিজ করে। চেম্বারের শেষ রোগী দেখে রাত এগারোটা নাগাদ সামান্য খাদ্য ও প্রচুর পানীয় খেয়ে টলমল করতে করতে রোগী দেখতে বের হন রামলালবাবু।

সেদিন রাতে বারোটা নাগাদ সর্বাণীর দিদিকে তিনি দেখতে গেলেন। সর্বাণীই গিয়ে দরজা খুলেছিলেন। দরজা খুলে সর্বাণী ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন, সর্বনাশ বাড়িতে ডাকাত পড়ল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একাধিক লোক। ডাক্তারি ব্যাগ হাতে একজন কমপাউন্ডার, লণ্ঠন হাতে এক ব্যক্তি। যদি লোডশেডিং হয়, বাড়ির প্যাসেজে বা সিঁড়িতে আলো না থাকে। মাতাল বেসামাল ডাক্তারের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক। আরেকজন লোক মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, হাতে তেল পাকানো বাঁশের লাঠি—রাত্রিবেলা পথে ঘাটে নিরাপত্তার জন্যে। আরও দু-চারজন লোক। অন্য রোগীদের আত্মীয়। তারা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘুরছে তাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সে এক মিছিল।

সে যা হোক, আজকের এই কুকুরের ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ অভাবিত, কল্পনা করা যায় না। ডাক্তারবাবু প্রবেশ করার আগেই কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকে চারদিক শুঁকতে লাগল।

ডাক্তারবাবু সর্বানন্দকে দেখতে ভিতরের ঘরে গেলেন। কুকুরও গেল। জ্বরাতুর সর্বানন্দের অতবড় কুকুর দেখে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, তিনি ভাবলেন বিকারের ঘোরে ভুল দেখছেন।

রোগী দেখে, প্রেসক্রিপশন দিয়ে ভিজিট নিয়ে ডাক্তারবাবু বেরোলেন। কুকুরটাও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বাইরের ঘরের সোফায় এক পা তুলে একটু মূত্রত্যাগ করে গেল।

কুকুরটা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতে ডাক্তারবাবু সর্বাণীকে বললেন, 'আপনাদের কুকুরটা কিন্তু আবার বেরিয়ে গেল।'

সর্বাণী অবাক হয়ে বললেন, 'সেকি ও তো আমাদের কুকুর নয়। আমাদের তো

কোনও কুকুর নেই। আমি ভেবেছি বুঝি আপনার কুকুর।'

অধিকতর অবাক হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার কুকুর, বলেন কি? আমি ভেবেছি আপনাদের কুকুর। কুকুর নিয়ে কোনও ডাক্তার কি রোগী দেখতে আসে? তারপর একটু থেমে ঘাড় চুলকিয়ে বললেন, 'বোধহয় আগের পেশেন্টের বাড়ির কুকুর। আমার পিছে পিছে চলে এসেছে।'

টেলিফোন

সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে কলহ-বিবাদ, বাদ-বিসম্বাদ কয়েকদিন হল প্রায় শতকরা নব্বুই ভাগ মিটে গেছে। অর্থাৎ শাস্ত্রে যাকে বলে দাম্পত্য কলহ, সেটা দত্তবাড়িতে এখন আর নেই বললেই চলে।

এসব জেনে যাঁরা বিস্মিত বোধ করছেন তাঁদের ঘটনাটা খুলে বলি। এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে সর্বানন্দের ঘর আলো করে একটি টেলিফোন এসেছে। লাল রঙের ঝলমলে টেলিফোন। সেলুলার, কর্ডলেস এসব কিছু নয়। নিতান্তই সাধারণ একটি টেলিফোন। কিন্তু সেই যথেষ্ট।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এখন টেলিফোন-অন্ত প্রাণ, দুজনে কলহ করার অবকাশই পাচ্ছেন না। সর্বাণী রাতদিন টেলিফোনটা পরিষ্কার সাদা কাপড় দিয়ে মুছছেন। পাশে দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ ডিরেকশন দিয়ে যাচ্ছেন।

এক ফাঁকে সর্বাণীদেবী নিউ মার্কেটে গিয়ে দুটো ভাল লেসের ঢাকনা কিনে এনেছেন ফোন ঢেকে রাখার জন্য। সেটা দিয়ে ফোনটা যত্নে ঢেকে রাখা হয়। অবশ্য সর্বানন্দ বলেছেন, এভাবে ফোনটাকে চাদর মুড়ি দিয়ে রাখলে ফোনটা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ফোন এলে বাজবে না।

সর্বাণী জানেন। এটা সর্বানন্দের রসিকতা। কারণ লেসের রুমাল ঢাকা ফোনটা যথারীতি ক্রিং ক্রিং করে বাজে। তবে ফোন না এলে বাজবে কি করে।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের প্রত্যেককে তিন-চারবার করে ফোন করা হয়ে গেছে। সেই তুলনায় ফোন কম এসেছে, সে তো হবেই, কে আর বিনা প্রয়োজনে পয়সা খরচ করে ফোন করতে যায়।

সর্বানন্দ সর্বাণীকেও যখন তখন যাকে তাকে ফোন করতে নিষেধ করেছেন। ফোনের বিল উঠবে সেই জন্য তো বটেই, তা ছাড়াও অন্যেরা অপ্রয়োজনীয় ফোন পেয়ে বিরক্ত হবে, ভাববে হাভাতে, নতুন ফোন নিয়ে আমাদের বার বার ফোন করে যাচ্ছে।

কিন্তু ফোন কিছুক্ষণ না বাজলেই সর্বাণীর মনে সন্দেহ হয়, খারাপ হয়ে যায়নি তো। রিসিভার তুলে দেখেন ডায়ালটোন আছে কি না কিন্তু তাতেও মন শান্ত হয় না, প্রতিবেশিনী বৌদিকে ফোন করে বলেন, 'বৌদি, আমাদের ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে কি না বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে একবার ফোন করুন।' বৌদি বলেন, 'ফোন খারাপ হয়ে থাকলে তুমি ফোনে কথা বলছ কি করে।'

সর্বাণীর এসব দুশ্চিন্তার দিন অবশ্য শেষ হয়েছে। গতকাল থেকে কি হয়েছে কে জানে, টেলিফোন বাজছে তো বাজছেই। দু' মিনিট পর পর ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বেজে

উঠছে।

প্রথমে কিছুটা উল্লসিত হলেও অনতিবিলম্বে, সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়ার পরে পর পর দুবার ফোনটা ধরার পর সর্বাণী ব্যাপারটার ভয়াবহতা টের পেলেন।

'হ্যালো হাজরা থানা? সর্বাণী হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই, ওদিক থেকে প্রশ্ন, 'কাল রাতে বসুশ্রী সিনেমার পাশ থেকে মিস্টার হেবো মান্নাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনি কি এখনও লক-আপে আছেন?'

তাড়াতাড়ি রং নম্বর বলে সর্বাণী টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার বেজে উঠল, 'হ্যালো আপনি কি বড়বাবুর ওয়াইফ বলছেন, বড়বাবু বোধহয় মালটাল টেনে এ-বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছেন, ওঁর কাছ থেকে একটু জেনে দিন তো কালীঘাট খালে লাশটা কার। ওটা কি জনদরদী, সমাজসেবক মিস্টার হেবো মান্নার লাশ?'

সর্বাণী ফোন নামিয়ে রেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্রিং ক্রিং আবার ক্রিং ক্রিং। এবার সর্বাণীকে অব্যাহতি দিয়ে সর্বানন্দ এসে ফোনটা ধরলেন। এবার নতুন কেস, ভারি মিষ্টি আর মোলায়েম গলা, 'বল তো আমি কে বলছি?' শালা বলে সর্বানন্দ ফোন রেখে দিলেন। তবে রিসিভারের ওপরে বসালেন না, পাশে বসিয়ে দিলেন। যাতে কোন ফোন আর না আসতে পারে।

সেভাবেই ফোনটা আপাতত কয়েকদিন থাকবে।

ইন্টারভিউ

সর্বানন্দের প্রায় পনেরো বছর চাকরি হয়ে গেল অফিসে। এর মধ্যে তিনি একটা ছোট এবং একটা বড় প্রমোশন পেয়েছেন। কোনও কোনও বিশেষ কাজের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে এবার তাঁর ওপরে একটা গোলমেলে কাজের ভার পড়েছে, ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

এ খবরের কাগজের সাক্ষাৎকার নয় যে যিনি সাক্ষাৎকাব দিলেন তিনি যা ইচ্ছে বললেন, যিনি সাক্ষাৎকার নিলেন তিনি যা ইচ্ছে লিখলেন। তারপর শুরু হল খেয়োখেয়ি। ইনি বলেন আমি বলিনি, উনি বলেন আমি শুনেছি। আরম্ভ হয়ে গেল উতোর-চাপান, চাপান-উতোরের পালা।

কিন্তু সর্বানন্দের কাজটা এত সোজা নয়। তাঁকে চাকরির ইন্টারভিউ নিতে হবে। সেই সাক্ষাৎকারে রাগারাগি, বলেছি-বলিনি, উতোর-চাপানের সুযোগ নেই।

চোখা-চোখা প্রশ্ন তার ঠিকঠাক উত্তর। লাগসই জবাব মিলে গেলে চাকরিও মিলে যেতে পারে।

সর্বানন্দের অফিসের বড়কর্তার একান্ত সচিব পলিতকেশ, স্থূলাঙ্গিনী মিসেস পারেখ সম্প্রতি কর্মরত অবস্থায় সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। এ অফিসে কেউ কখনও ভাবেনি যে তিনি অবসর নেবেন। মহাকবি কালিদাস গৃহিণী, সখী ও সচিবের কথা বলেছিলেন, মিসেস পারেখ বড় কর্তার গৃহিণী ছিলেন না তবে সখী ও সচিব ছিলেন।

যে যা হোক, মিসেস পারেখের মৃত্যুব পর তাঁর স্থলে একজনকে নিতে হবে। খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, যেমন লেখা থাকে টাইপ, শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কথা জানিয়ে। বিজ্ঞাপনটা পত্রিকায় যাওয়ার আগে বড়কর্তা স্বয়ং দুটো জিনিস যোগ করেছিলেন, বয়েস পঁচিশের নিচে আর পুরুষ মানুষ চলবে না।

বড়সাহেব অবশ্য মুখে বলেছিলেন, এসব বিজ্ঞাপনে থাকলে গাদাগাদা দরখাস্তে হাবুডুবু খেতে হবে। তবে সর্বানন্দের তখনই সন্দেহ হয়েছিল মিসেস পারেখের বয়সটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ওটা বড়কর্তার।

বড়কর্তার ঘরে ইন্টারভিউ। বড়কর্তাই তাঁর একান্ত সচিব ঠিক করবেন। সর্বানন্দ এ ব্যাপারে বড়কর্তাকে সাহায্য করবেন।

বড়কর্তা সর্বানন্দকে বললেন, 'পুরো কাজটা আপনাকেই করতে হবে। আপনারা একালের যুবক, আপনারাই ভাল বুঝবেন কাকে দিয়ে কাজ হবে, না হবে। ওই যে আজকাল হয়েছে না ব্যক্তিত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, সেইভাবে যাচাই করবেন।'

অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি মেয়েকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। বড়কর্তা আফসোস করছিলেন ফটো চাওয়া হয়নি, তা হলে ব্যক্তিত্বটা দেখে নেওয়া যেত।

নির্দিষ্ট দিনে পাঁচটি মেয়েই সাক্ষাৎকার দিতে এল। অনেক ভেবেচিন্তে সর্বানন্দ কয়েকটি মামুলি প্রশ্নের সঙ্গে একটা বুদ্ধির প্রশ্ন রেখেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে খুবই সরল প্রশ্ন—দুয়ে দুয়ে কত হয়?'

সাক্ষাৎকারিণীদের একজন সরাসরি বললেন, 'দুয়ে-দুয়ে চার হয়।'

আরেকজন সাবধানী বললেন, 'যোগ আর গুণ করলে চার হয। বিযোগ কবলে শূন্য হয়, ভাগ করলে এক হয়।'

অন্যজন, তিনি আবার বিজ্ঞানের স্নাতকী, তিনি ব্যাপারটা জটিল করে ফেললেন, জবাব দিলেন, 'দুয়ের পিঠে দুই, দুয়ে দুয়ে বাইশ হবে।'

অবশ্য এর পরের জন খুব সরস করে ফেললেন, তাঁর উত্তরটাকে, তিনি বললেন, 'দুয়ে দুয়ে যেমন চার হতে পারে, তেমনি দুয়ে দুয়ে দুধও হয়।'

সর্বানন্দ অনুমান করলেন, ও মেয়েটি নিশ্চয় শিবরাম চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্যা।

সাক্ষাৎকার শেষ হল। এবার সর্বানন্দ বড়কর্তাকে বোঝাতে বসলেন, কার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, কার ব্যক্তিত্ব কেমন, দুয়ে দুয়ে কত হয় প্রশ্নে কার মানসিকতার কি প্রতিফলন হল, এই সব।

শুনতে শুনতে বড়কর্তা একটা লম্বা হাই তুললেন। তারপর হাত তুলে সর্বানন্দকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক থাক মিস্টার দত্ত, আর বলতে হবে না। আপনার এই হিসেবপত্র ফাইলে রেখে দিন।'

সর্বানন্দ বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করলেন, 'কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেব না?'

'তা দেবেন না কেন?' বড়কর্তা বললেন, 'ওই যে কচি কলাপাতা রঙের সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটি, যাঁর ঠোঁটের কোনায় তিল, চুলটা একটু বাঁকা করে সিঁথি—বুঝতে পারলেন তো। ওই মেয়েটাকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিন।'

কেনাকাটা : জুতো

বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে যে সব লোক মনে করে যে তাদের বুদ্ধি দোকানদারের থেকে কিছু কম নয়, তারা আর যাই হোক বুদ্ধিমান লোক মোটেই নয়।

আমাদের সর্বানন্দ দত্ত ও খুব একটা বুদ্ধিমান লোক নন এবং সে কারণেই তিনি যে বাজারে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খাবেন, তাতে আর সন্দেহ কি।

সর্বানন্দের গত দু'বছরের জুতো কেনার অভিজ্ঞতার কথা বলি।

জুতো কেনা বছর কয়েক হল ভারি ঝকমারি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজোর মরশুমে কোনও কোনও জুতোর দোকানে এত বড় লাইন হয় যে চাল, চিনি, কেরোসিনের জন্যও অতবড় কিউ দেখা যায় না। একমাত্র ফুটবলের ফাইনাল বা ক্রিকেটের ওয়ান ডে ম্যাচের লাইনের সঙ্গে তার তুলনা হয়।

সর্বানন্দের সকালের বাজার আছে। দুপুরের অফিস আছে, সন্ধ্যাবেলার আড্ডা আছে। লাইন দেওয়ার সময় তাঁর নেই। সেই জন্যে রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও এবং পাড়ার দোকানে কেরোসিন তেল এলেও লাইন বাঁচানোর জন্যে তিনি ব্ল্যাকে ভাল দামে কেরোসিন কেনেন। অবশ্য সর্বাণীকে সেটা বুঝতে দেন না, তা হলে গোলমাল হবে।

সুতরাং লাইন দিয়ে জুতো কেনার কথা সর্বানন্দ ভাবতেও পারেন না। কলকাতার সার্বেকি চিনেপাড়ার জুতোর দোকানে কিন্তু ভিড় তেমন নেই। পুজোর সময় বলে দু'চারজন ক্রেতা অবশ্য আছে, কিন্তু গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি নেই।

ভিড় এড়ানোর জন্যে, গতবছর পুজোতেই, এক বন্ধুর পরামর্শে সর্বানন্দ চিনেবাজারে জুতো কিনতে যান। সেখানে প্রথমেই তাঁর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সর্বানন্দ জানতেন না চিনে দোকানের ঐতিহ্য, সেখানে কেনাকাটা মানেই দামদর এবং সে এক অবাস্তব ব্যাপার। পাঁচশো টাকা দাম চাওয়া জিনিসের কথা কাটাকাটি করে সেটার দাম দেড়শো টাকায় নামিয়ে আনা খুব কঠিন নয়।

সর্বানন্দ যখন দোকানে বসেছিলেন, তাঁর পাশের ভদ্রলোক একজোড়া নিউ-কাট পছন্দ করে, জুতোর দাম জানতে চাইলেন।

প্রৌঢ় চৈনিক চর্মকার স্থূলদেহী, গায়ে কালো হাতকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি, অধমাঙ্গে গোলাপ ফুলের ছাপ দেওয়া চিত্রবিচিত্র হাফপ্যান্ট, কুতকুতে চোখে এবং নির্বিকার মুখে বললো, 'এইত হান তেলেত লুপিক।

দামের বহর দেখে সর্বানন্দ তখনই দোকান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে শুনতে পেলেন, বিচক্ষণ ক্রেতা বলছেন, 'ওয়ান হান্ড্রেড টেন রুপিস।'

ঘটনার গতিক দেখে সর্বানন্দ রঙ্গস্থল থেকে পলায়ন করলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। এর পরেই তাঁর পালা।

সর্বানন্দকে নতুন লোক দেখে হাসিমুখে অভিনন্দন জানিয়ে চিনে দোকানদার নাইন হানতেলেত থেকে শুরু করলো, হঠাৎ সর্বানন্দ কেমন মরিয়া হয়ে উঠলেন, সর্বানন্দ বললেন, থ্রি হানড্রেড। চিনেটি একটু দাম নামাল বলল, ছিক হানতেলেত। সর্বানন্দ সঙ্গে সঙ্গে নিজের দাম কমিয়ে দিয়ে বললেন, টু হানড্রেড।'

খদ্দের আগের দাম থেকে নেমে যাওয়ার চিনেটা চমকিয়ে গেল, এরকম সে আগে

দেখেনি। সে আরেকটু কমিয়ে পাঁচশো টাকায় নামল এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বানন্দ দাম কমিয়ে বললেন, 'ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স রূপিস সিক্সটি সিক্স পয়সা।' আসলে সর্বানন্দ মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন যে চিনেটা যা বলবে আমি তার এক তৃতীয়াংশ বলব। চিনেটা হতবাক হয়ে আত্মসমর্পণ করল। আর বিশেষ দামদরের মধ্যে না গিয়ে তিনশো টাকায় জুতো জোড়া রফা করল।

জুতো জোড়ার হয়তো দাম খুব বেশি লাগল না কিন্তু এই জুতোজোড়া সর্বানন্দের পক্ষে খুব সুখকর হয়নি। তাঁর লাগে আট নম্বর জুতো, কিন্তু ধড়িবাজ চিনেটা আট নম্বরের অভাবে একটা ছোটা সাইজের সাত নম্বর জুতো গছিয়ে দিল। বলল, নরম চামড়ার জুতো পায়ে দিতে দিতে ছেড়ে যাবে।

সেই এক সাইজ কম জুতো পায়ে দিয়ে পুরো এক বছর সর্বানন্দ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছেন। তাই এবার সর্বানন্দ প্রতিজ্ঞা করেছেন ছোট সাইজের জুতো কিনবেন না, বাকচাতুরিতে প্রতারিত হবেন না।

সেই একই দোকান, একই দোকানদার। দোকানদারের অবশ্য গত বছরের কথা মনে আছে, তাই আর দামদরের মধ্যে না গিয়ে তিনশো টাকাতেই জুতোর দাম রফা হল কিন্তু এবারও আট নম্বর নেই। চিনেটা এবার একটা নয় নম্বর জুতো গছাবে।

এ জুতোজোড়া টাইট হয়নি বটে কিন্তু ভীষণ ঢলঢলে হয়েছে। সেদিন সকালে তাড়াতাড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন চেঁচালেন, 'দাদা আপনার জুতোজোড়া এখানে রয়ে গেল। কখন পা থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে গেছে টেরও পাননি।

রাতে ক্ষতিটা হল, নতুন জুতোজোড়া গচ্চা গেল। পানশালা থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন পায়ে জুতো নেই, কোথায় পড়ে গেছে কে জানে!

ভেজা চপ্পল

এই বর্ষায় সর্বানন্দ খুব সর্দি-কাশিতে ভুগলেন। একটু জ্বর-জ্বরও হয়েছিল। মুঠো মুঠো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে বোতলের পর বোতল ব্রান্ডি গরম জল দিয়ে পান করে কোনও উপশম হল না।

কথায় বলে সর্দি চিকিৎসা করলে, ওষুধ খেলে সাতদিনে সারে। চিকিৎসা না করলে, ওষুধ বিষুধ না খেলে সারাতে এক সপ্তাহ লাগে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এক সপ্তাহে বা সাতদিনে সর্বানন্দের সর্দি কাশি, ঘুষঘুষ জ্বর ছাড়ল না।

সর্বাণী একটু খুশিই হয়েছেন। কারণ সর্বানন্দের নৈশ অভিযান বন্ধ হয়েছে, তবে সে বাসায় বসেই দেদার ব্রান্ডি পান করছে। তাতে অবশ্য সর্বাণীর আপত্তি নেই।

কিন্তু কদিন আর অকর্মার মত বিছানায় শুয়ে থাকা যায়? এক সপ্তাহ ছুটি নেওয়ার পর সর্বানন্দ অফিস যাতায়াত করছেন। বৃষ্টি এখনও কম বেশি হয়ে যাচ্ছে, সর্বানন্দ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাতে একটা ছাতা রাখছে মাথা বাঁচানোর জন্যে।

কিন্তু শুধু মাথা বাঁচানোই যথেষ্ট নয়। বৃষ্টি এলে পায়ের জুতোজোড়াও ভিজে যায়।

সর্দিজ্বরে রোগীর পক্ষে ভেজা জুতো মারাত্মক। সর্বানন্দ চেষ্টা করে পায়ের জুতো না ভেজাতে। কিন্তু সব সময় সম্ভব নয়।

সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে মিনি বাসের জন্যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ধুমসিয়ে বৃষ্টি এল। সে কি জলের তোড়, একেবারে যাকে বলে ছাতাভাঙা বৃষ্টি।

অফিসের কাছের এই বাসস্টপটার অসুবিধে হল এর ধারে পাশে কোথাও মাথা গোঁজার জায়গা নেই। ফুটপাত ধরে অন্তত একশো মিটার বড় কম্পাউন্ডওয়ালা পাঁচিল ঘেরা সাহেব কোম্পানির বাড়ি। তার পরেও কিছুটা ছুটে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়। সেখানে দোকান টোকান, গাড়ি বারান্দা, ঢাকা জায়গা আছে।

জোর বৃষ্টি আসতে সর্বানন্দ মোড়ের দিকে ছুটল। একটু ছুটতেই হাওয়ার ঝাপটায় শৌখিন ছাতাটা উল্টে গেল। সেই অবস্থাতেই দৌড়ে মোড়ে পৌঁছিয়ে সর্বানন্দ একটা গাড়ি বারান্দার নিচে আশ্রয় পেল।

তখন জামাকাপড় ভিজে সপসপে। মাথার চুল দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্গীণ অবস্থা হয়েছে পায়ের জুতোজোড়ার। মোজাশুদ্ধ মোকাসিন জোড়া চিপলে অন্তত এক লিটার জল বেরোবে।

সর্বানন্দ বর্ষার ঝোড়ো, ঠাণ্ডা বাতাসে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে আশঙ্কা করতে লাগলেন এখনই অধিকতর কম্প সহকারে জ্বর আসবে। এই সময়েই গাড়ি বারান্দায় পিছন ফিরে তাঁর নজর গেল। এই ভিড়-ভাট্টার মধ্যে সেখানে চোখে গোল কাচের চশমা চোখে এক বুড়ো মুচি খুব মনোযোগ দিয়ে চপ্পল বানাচ্ছে। তার পিছনের দেয়ালেও পেরেকের সঙ্গে কয়েক জোড়া নতুন চপ্পল ঝুলছে।

পকেটের মানিব্যাগ বের করে সর্বানন্দ দেখলেন শ'দেড়েক টাকা আছে। তারপর চর্মকারের কাছ থেকে অনেক দামদর করে এক জোড়া চপ্পল কিনে ফেললেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়।

চপ্পল কিনে পায়ের ভিজে জুতো-মোজাগুলো খুলে ফেললেন সর্বানন্দ, বাস এলে তাতে লাফিয়ে উঠলেন। শুকনো পায়ে, নতুন চপ্পল পরে বেশ আরাম লাগছিল।

কিন্তু বিপত্তি হল বাস থেকে নামার সময়। আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। এখানেও বাসস্টপ থেকে নামার পর তাঁর বাড়ি প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালেন সর্বানন্দ।

একটু পরে খেয়াল হল পায়ে নতুন চপ্পল জোড়া রয়েছে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। সামনে একটা বকুল গাছ আছে। সেই গাছের নিচে বৃষ্টির ঝাপটা কম, সেখানে দাঁড়িয়ে চপ্পল দুটো খুলে হাতে নিতে গেলেন সর্বানন্দ। এরপর এটুকু পথ খালি পায়েই হেঁটে যাবেন।

কিন্তু পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে পারলেন না সর্বানন্দ। আঠার মত আটকিয়ে গেছে চপ্পল জোড়া। ওপর দিকে পায়ের পাতা, নিচের দিকে পায়ের তলা সব আটিকিয়ে গেছে চপ্পলের সঙ্গে।

বাড়িতে গিয়েও সুবিধে হল না। কিছুতেই চটি জোড়া পা থেকে খুলতে পারলেন না। তিনি আর সর্বাণী মিলে টানাটানি করলেন। তারপর সর্বাণীর বুদ্ধিমত গরম জলের গামলায় পা দুটো চোবালেন তাতে বোধহয় ক্ষতিই হল, চপ্পল জোড়া আরও এঁটে

আটকিয়ে গেল। তখন বিপরীত চিকিৎসা, ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে দু'পায়ের পাতায় ঘষা হল, বরফ জলে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আধঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা হল।

কিছু হল না। এক শিশি গ্লিসারিন, এক কৌটো নারকেল তেল পদসেবায় ব্যয় হল। কিছু হল না।

অবশেষে রাতে চপ্পল শুদ্ধ পায়ে সর্বানন্দ বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এবং কি আশ্চর্য। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সর্বানন্দ দেখলেন সাপের খোলসের মত চটি জোড়া পায়ের কাছে পড়ে আছে। সেগুলোকে অবশ্য পাদুকা বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে চামড়ার খেলনা নৌকো।

জয় বাবা শান্তিনাথ

সর্বানন্দের অফিসে তাঁর সঙ্গেই কাজ করেন শান্তিবাবু, শান্তিলাল চৌধুরী। বছর দুয়েক আগে পাটনা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

শান্তিবাবু বাংলা ভালভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণে কেমন একটা দেহাতি, হিন্দি ঘেঁষা টান। শান্তিবাবু অবশ্য বলেন তিনি বিহারী নন, তবে কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা পাটনার বাসিন্দা।

সর্বানন্দ এবং শান্তিবাবু একই বিভাগে কাজ করেন। প্রায় কাছাকাছিই দুজনে বসেন। অফিসের কাজকর্ম করতে করতে টুকটাক কথাবার্তা হয়, গল্পগুজব হয়। কখনও দুজনে টিফিন একসঙ্গে ভাগ করে খান। এই দু বছরে দু জনের মধ্যে একটা হালকা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

শান্তিলালের একটা বড় গুণ এই যে তিনি মদ খান না। মদের প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে চলেন। সর্বানন্দ কখনও সখনও শান্তিবাবুকে তাঁর সঙ্গে নৈশ বিহারে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু শান্তিবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি এবং সরাসরি বলেছেন, আমি ড্রিঙ্ক করা হেট করি।

ফলে আজকাল সর্বানন্দ শান্তিলালের কাছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। এই অফিসে আরও সাঙ্গপাঙ্গ আছেন, তাঁরাই তার সঙ্গী হন।

সে যা হোক, এর মধ্যে একদিন শান্তিবাবু সর্বানন্দকে বললেন, আজ আমার বাড়িতে সন্ধেবেলা চলুন। এমন জিনিস খাওয়াব, মদের নেশা ভুলে যাবেন।

সর্বানন্দ অবাক। এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে গোছের মনের অবস্থা হল তাঁর। শান্তিবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার? আপনার বাড়িতে কি পার্টি টার্টি আছে না কি আজকে?

শান্তিলাল বললেন, 'ও সব জিনিস আমাদের ঘরে চলে না। আজ আমাদের বাড়িতে শান্তিনাথের পূজো। চলুন বহুত মজা পাবেন।'

'শান্তিনাথের পূজো?' নিজের মনেই প্রশ্নটা করে ফেললেন সর্বানন্দ, 'আপনার নামে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকি নিজের বাড়িতে? আমি গিয়ে কি করব? ওসব পুজোটুজো আমার সয় না।'

শান্তিবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমার নাম তো শান্তিলাল আছে, আমাদের ঠাকুরের

নাম আছে শান্তিনাথ। দেবাদিদেব মহাদেব আছেন উনি। চলুন, মজা পাবেন।'

সর্বানন্দকে শান্তিলালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে শান্তিনাথের পুজোয় যেতে হল। গিয়ে দেখলেন, পুজোর ছলে সেটা একটা গাঁজার আখড়া। শান্তিলালের বাড়ির লোকজন পাটনায়, তিনি জোড়াবাগানের একটা গলিতে একটা ঘরে একাই থাকেন। সেই ঘরে আরও পাঁচ সাতজন দেশোয়ালি ভাই একত্র হয়েছে। তার মধ্যে একজন, কাঁধে পৈতে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, ব্যোম ব্যোম করে পুজো করছেন, মাঝে মধ্যে জয় বাবা শান্তিনাথ' বলে হাঁক ছাড়ছেন, বাকিরা সবাই তখন তাঁর সঙ্গে কোরাসে ধুয়ো ধরছেন।

হাতে হাতে গাঁজার ছোট ছোট কলকে ঘুরছে। একজনের টান দেওয়া হয়ে গেলে সে পাশের লোকের হাতে ছিলিম এগিয়ে দিচ্ছে। গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর পরিপূর্ণ। কটু ও মাদক গন্ধ থই থই করছে।

ধাপে ধাপে একটা ছিলিম সর্বানন্দের হাতেও এসে গেল। ভদ্রতার খাতিরে সর্বানন্দকে টান দিতে হল। প্রথমে একটু ঝাঁঝ লেগেছিল, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একটা ধাক্কা। ক্রমে সয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন, এঁরা শুধু গাঁজাই টানছেন না, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন।

সেই গল্পগুজব সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন গঞ্জিকা সেবনের মাহাত্ম্য। মদ খেয়ে চুরচুর হয়েও ও ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয়।

সর্বানন্দের বাঁ পাশের কালোয়ার ভদ্রলোক বললেন, 'কি সাংঘাতিক গরম পড়েছে এবার।'

ডানপাশের হিন্দি হাই স্কুলের মাস্টারমশাই বললেন, 'এ আর কি গরম। বাহাত্তর সালের গর্মিতে আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে হাঁসগুলো পেট থেকে সেদ্ধ ডিম পাড়ত।'

এই কথা শুনে সামনের দশাসই ভদ্রলোক বজরঙ্গবলী ব্যায়ামাগারের কুস্তির শিক্ষক হো-হো করে হেসে উঠলেন বললেন, আরে মুঙ্গেরে আমার মামার বাড়িতে গরমের দিনে গরুর বাঁটে একা একাই দুধ জ্বাল হয়ে ঘন হয়ে যায়, গরুর বাঁট ধরে দুইলে ঘন ক্ষীর বেরিয়ে আসে।'

ঝিম মেরে বসে ছিলেন শান্তিলাল, তিনি চোখ বোজা অবস্থাতেই বললেন, আমি তো আজকাল আর চায়ের জল গরম করি না। কলের জলে চা পাতা ছেড়ে দিই, তাতেই চা হয়ে যায়।'

সর্বানন্দ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর নয়। কেউ খেয়াল করছে না। এবার কাটতে হবে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ধোঁয়া ভর্তি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে তিনি শান্তিলালকে বললেন, 'এই গরমে আমি ধোঁয়া হয়ে গেছি।' এই বলে ধোঁয়া কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

প্রবাসে দৈবের বশে

সর্বাণীকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।

বহু কষ্টে অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি সংগ্রহ করেছেন সর্বানন্দ। তাঁর প্রাণের ইচ্ছে এই এক সপ্তাহ কলকাতায় শুয়ে-বসে চুটিয়ে আড্ডা দেন, পান ভোজন করেন।

কিন্তু বাদ সেধেছেন সর্বাণী। তিনি ছুটির মধ্যে কলকাতায় থাকবেন না। একদিনের জন্যেও না।

অনেক দাম্পত্য কলহ, ধ্বস্তাধ্বস্তি, রীতিমিত দর কষাকষির পর রফা হল যে ছুটির প্রথম ভাগ কলকাতায় এবং শেষ কয়েকটা দিন বাইরে কাটানো যাবে।

বাইরে মানে খুব একটা বাইরে নয়। চির নবীন, পরম পবিত্র পুরী। মন্দির, সমুদ্র, বাজার নিয়ে পুরীর আকর্ষণ আলাদা।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এখন স্বর্গে ধান ভানার খুব ধুম। কারণ পৃথিবীর সব ঢেঁকিই স্বর্গে চলে গেছে।

সে যা হোক, অবান্তর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সোজা কথা, সর্বানন্দ পুরী গিয়েও প্রাণের আনন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন তবে সর্বাণীর পক্ষে এখানে একটা স্বস্তি এই যে সর্বানন্দের মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সমস্যা নেই। যে হোটেলে তাঁরা আছেন তারই নিচতলায় বার কাম হোটেল।

দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভোজনের ঘণ্টাখানেক আগে সর্বানন্দ নিচে নেমে যান। তাঁরা পাঁচতলায় সমুদ্রের দিকে একটা ঘর পেয়েছেন। লিফটে করে নেমে গিয়ে সর্বানন্দ পান শুরু করেন। এই অবসরে সর্বাণী সাজগোজ, গোছগাছ করেন। জানালায় দাঁড়িয়ে লবণাম্বুরাশি পর্যবেক্ষণ করেন, মধ্য সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খাওয়া নৌকোর দিকে তাকিয়ে রজনীকান্তের গান গুন গুন করেন, 'শাল কাঠের সেই অক্ষয় বজরা যাবে আপন বলে।' তারপর ধীরে সুস্থে নিচে নেমে যান।

ততক্ষণে সর্বানন্দের রঙের ওপর রঙ চড়েছে। সর্বাণী এসে যাওয়ার পরে আরও এক পাত্র পানীয় নিয়ে খাবারের অর্ডার দেন তিনি। অনেকদিন খাওয়া শেষ হওয়ার বাদে সর্বাণী চলে যাওয়ার পরেও সর্বানন্দ একাই টেবিলে বসে আরও একটু পান করেন।

এই বারেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই পরিচয় হল। সর্বাণী চলে যাওয়ার পরে পাশের টেবিল থেকে নিজের গেলাস নিয়ে উঠে এসে পরিচয় করেন। নিজের নাম বললেন, হৃদয় নাগ।

হৃদয়বাবুকে সর্বানন্দের ভালই লাগল। হৃদয়বাবু লোক খারাপ নয়, তদুপরি সুরসিক এবং পানরসিক। প্রথম দিনেই নৈশ ভোজনের শেষে দুজনে মুখোমুখি বসে প্রায় ঘণ্টাখানেক আকণ্ঠ পান করলেন। তারপর টলতে টলতে লিফটে উঠে যে যাঁর ঘরে ফিরলেন টইটম্বুর অবস্থায়।

হৃদয়বাবুও সস্ত্রীক এই একই হোটেলে উঠেছেন। সর্বানন্দের তলাতেই আশেপাশে তাঁর ঘর। তবে হৃদয়বাবুর হৃদয়েশ্বরী ঘোরতর মদ্যপান বিরোধী। তিনি সর্বাণীরও এক কাঠি ওপরে। তিনি বারে মাতালদের সঙ্গে খাবার খেতে রাজি নন। তাঁর খাবার ঘরে নিয়ে যায় বেয়ারা। তবে হৃদয়েশ্বরীর একটা গুণ আছে, তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, হৃদয়বাবুর পান করা নিয়ে মাথা ঘামান না।

হৃদয়বাবুর মুখে তাঁর হৃদয়েশ্বরীর কথা শুনে সর্বানন্দের খুব কৌতূহল হল। পরের দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় এই কৌতূহল আরও বেড়ে গেল যখন হৃদয়বাবু বললেন, 'ও মশায়, আমার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। আপনাদেরই চেতলার মেয়ে। বলল, আপনি নাকি একবার চোর ভেবে একটা সাদা পোশাকের পুলিশকে বেধড়ক

পিটিয়ে ছয়মাস পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন।'

'দশ-বারো বছর আগের কথা, কিন্তু কথাটা পুরো সত্যি। আপনার স্ত্রীর নামটা বলবেন?'

বিকেলে ব্যাপারটা আরও জটিল হল। ইতিমধ্যে সর্বাণীর সঙ্গে হৃদয়েশ্বরীর আলাপ পরিচয় হয়েছে। সর্বাণী জানালেন, 'ওগো তোমার নতুন বন্ধুর স্ত্রী তো তোমার গুণমুগ্ধ ফ্যান। তোমার সেই ধ্যাড়ধেড়ে চেতলার বাল্য সখী।' সর্বানন্দ বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, 'নামটা কি?' সর্বাণী বললে, 'নাম? বিয়েওলা মেয়ের আবার নাম আছে নাকি? মিসেস নাগই যথেষ্ট। দেখো আবার নতুন করে লটঘট করে বোসো না।'

সেদিনই নৈশভোজের পরে পান করতে করতে প্রায় অন্যরূপ ইঙ্গিত দিলেন হৃদয় নাগ, 'আমার স্ত্রী খুব উতলা হয়ে পড়েছেন আপনার জন্যে, আপনিও কি তাই?' কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না সর্বানন্দবাবু, তিনি কে, তাঁর কি নাম কিছুই জানা নেই, কি বলবেন।

আসল মজাটা হল গভীর রাতে। প্রচুর পরিমাণ পান করার পরেও হৃদয় মদ খেয়ে যাচ্ছেন, কোনও উপায় না দেখে সর্বানন্দ 'গুড নাইট' বলে বিদায় নিলেন। কিন্তু লিফটে উঠে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় নেমে গুলিয়ে ফেললেন কোনটা তাঁর ঘর। কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি চেষ্টা করার পর তিনি বারান্দার একমাথা থেকে প্রত্যেক ঘরের দরজায় হোটেলের চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন, যেটা খুলবে সেটাই তাঁর ঘর।

এই সময় অঘটন ঘটল। একটা ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পিঠে একটা চাপড় খেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, টলটলায়মান হৃদয়বাবু দাঁড়িয়ে।

একটু ঢোঁক গিলে, চিবিয়ে চিবিয়ে হৃদয়বাবু সর্বানন্দকে বললেন, 'আপনার এই চাবি যদি এই দরজায় লাগে তাহলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'কি কেলেঙ্কারি?'

হৃদয়বাবু বললেন, 'এটা আমার ঘর। আপনার চাবি দিয়ে যদি আমার ঘর খোলে তবে আমার স্ত্রী এবং আপনাকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনার স্ত্রী আর আমার কাছে।'

মারামারি

সর্বানন্দ লোক খারাপ নন। হিংস্র বা গুণ্ডা স্বভাবের লোকও নন। কিন্তু তিনি মারামারি করতে ভালবাসেন।

একান্নবর্তী পরিবারে, সেই পুরনো দিনের না ভাঙা বাংলাদেশের নড়াইল শহরের দত্তবাড়িতে জন্মেছিলেন, বড় হয়েছিলেন সর্বানন্দ।

সেই দত্তবাড়িতে সবারই নামের শেষভাগ ছিল আনন্দ। কর্মানন্দ, সর্বানন্দ, ক্ষমানন্দ গজানন্দ, ধর্মানন্দ ইত্যাদি। এর মধ্যে গজানন্দ ছিল সাংঘাতিক মারকুটে। বালক সর্বানন্দের প্রায়শ লড়াই লাগত এই গজানন্দের সঙ্গে।

কিন্তু সর্বানন্দ কখনওই পারতেন না গজানন্দের সঙ্গে। তবুও আত্মসম্মানের খাতিরে

লড়ে যেতেন। অবশ্য যথাসময় বড় ভাইয়েরা এসে ছড়িয়ে দিতেন।

এর মধ্যে ক্ষমানন্দ ছিলেন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। যখন মারামারি প্রায় থেমে এসেছে তখন এসে তিনি দুজনকে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, তিনি মারামারি, হাতাহাতি দেখতে ভালবাসতেন। তাই কলহ থেমে যাওয়ার উপক্রম হলে দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতেন যাতে কেটে না পড়ে।

এদিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর রাগ চড়তে থাকত। ক্রমশ দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে গজরাতে গজরাতে তারা ক্ষমানন্দের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আবার শুরু হয়ে যেত গজ কচ্ছপের লড়াই।

অবশ্য সর্বানন্দ চিরকালই বেশ চালাক। যখন তাঁর মেজদা ক্ষমা তাঁকে গজানন্দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি মুখে চেঁচাতেন, 'একবার ছেড়ে দে সেজদা। আজ গজাকে শেষ করে দিই।'

কিন্তু সর্বানন্দ মনে মনে জানতেন গজার সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না। তাই চেঁচানির ফাঁকে ফাঁকে নিচু গলায় বিড় বিড় করে ক্ষমানন্দকে বলতেন, 'এই সেজদা, আমাকে ছাড়িস না কিন্তু। তাহলে গজা আমাকে মেরেই ফেলবে।'

সে যা হোক, এসব অনেককাল আগের কথা। তবে সর্বানন্দের মারামারি হাতাহাতি আজও চলছে। এটা ঘটে সাধারণত গভীর যামে নিরবধি মদ্যপানের পরে পানসঙ্গীর সঙ্গে।

কলার ছেঁড়া জামা, ঘুষিতে ফোলা চোখ, থ্যাঁতলানো নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, এই রকম চেহারা নিয়ে সর্বানন্দ বাড়ি ফেরেন। সর্বাণীর অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু স্ত্রীর দায়িত্ব হিসেবে তিনি সর্বানন্দের সংশোধন করার চেষ্টা করেন।

একদিন গভীর রাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সর্বানন্দ বাড়ি ফিরে এলে সর্বাণী তাঁকে দিয়ে সেই অবস্থায় মা কালীর ফটো ছুঁয়ে কবুল করিয়ে নিলেন, 'কিছুতেই আর কখনও চট করে মাথা গরম করব না। মাথায় রক্ত উঠে গেলেও, মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনব।'

সর্বাণীর ধারণা ছিল মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনলেই সর্বানন্দের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মারামারির ইচ্ছে থাকবে না।

কিন্তু তা হয়নি। তখন সর্বানন্দ এক থেকে একশো দ্রুতগতিতে গোনায় অসম্ভব দক্ষতা অর্জন করেছে। পাঁচ সাত সেকেন্ডের মধ্যে গোনা শেষ হয়ে যায়। তারপরেই আস্তিন গুটিয়ে হাতাহাতি, মারামারি।

আজ রাতেও তাই হয়েছে। বারের পাশের টেবিলে বাংলা সিনেমার এক ভিলেন বসে মদ্যপান করছিলেন। ভিলেনদের যেমন হয় গুণ্ডা গুণ্ডা, ষণ্ডামার্কা চেহারা। এমনিতে রূপালিপর্দায় লোকটাকে দেখলেই সর্বানন্দের রাগ হয়। আজ একেবারে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে সামনাসামনি।

বারের শেষ ঘণ্টা বেজে আলো নিভে যাওয়ার পর একেবারে বেরনোর সময় সত্যি সত্যি পা বাধিয়ে গোলমাল বাধালেন সর্বানন্দ।

ভিলেনটি কিন্তু ভদ্রলোক। তিনি কিছুই না করে, বিনীতভাবে বললেন, সরি।

এখন সর্বানন্দের মাথায় মারামারির ভূত চেপেছে। তিনি ভিলেনকে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম নট সরি।'

কয়েক মিনিট এরকম চলার পর ভিলেনটি একটি হালকা ঘুষি মারলেন সর্বানন্দকে। এবার সর্বানন্দ রুখে দাঁড়ালেন, শালা আস্তে ঘুষি মারলি। সাহস থাকে ত একবার জোরে ঘুষি মার দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে ভিলেনটি সজোরে একটি ঘুষি মারলেন সর্বানন্দের চোয়ালে। সর্বানন্দ চোখে সর্ষেফুল দেখলেন। তারপর সম্বিত ফিরে আসতে দেখলেন ভিলেন তখনও সামনে দাঁড়িয়ে। এবার সর্বানন্দ তাঁকে আহ্বান জানালেন, 'শালা। বুকের পাটা থাকে তো আমাকে লাথি মার দেখি।' এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর পেলেন একটি শক্তিশালী লাথির মাধ্যমে। বারের মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন সর্বানন্দ।

মেঝে থেকে ওঠার সময় একটা টেবিল থেকে খালি প্লেটে পড়ে থাকা ছুরি তুলে নিলেন সর্বানন্দ। সেই ছুরিটি ভিলেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাপের ব্যাটা হোস তো আমাকে ছুরি মার দেখি।'

ভিলেন নির্বোধ নন। ঘুষি, লাথি এক জিনিস। ছুরি অন্য জিনিস। রক্তারক্তি কাণ্ড হলে থানা-পুলিশ হয়ে যাবে। তিনি পিছু হটলেন।

কিছুক্ষণ তাঁর পিছে পিছে গিয়ে হাততালি দিয়ে সর্বানন্দ বলে গেলেন, 'শালা হেরে গেলি। হেরে গেলি। তারপর বিজয়ীর গৌরবে সর্বানন্দ বাড়ি ফিরে গেলেন।

ন্যায্য কথা

কি যে ন্যায্য আর কি যে অন্যায্য, তাঁর সেই সামান্য জীবনে সর্বানন্দ দত্ত বুঝে উঠতে পারলেন না।

অবশ্য এ ব্যাপারে সর্বানন্দবাবুকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না। তাবড় তাবড় মহাপুরুষেরা, কালজয়ী মুনি ঋষিরা পর্যন্ত ন্যায্য অন্যায্যের তারতম্য ধরতে পারেন না।

আজ যা ন্যায্য, কাল তাই অন্যায্য হতে পারে। এক জায়গায় যা ন্যায্য অন্য জায়গায় তাই অন্যায্য হওয়া অসম্ভব নয়। আমার ন্যায্য কথা আপনা'ব পক্ষে অন্যায্য কথা।

এসব তত্ত্বকথায় গিয়ে লাভ নেই। সর্বানন্দের বিপদের কথাটা বলি। এই বর্ষায় সর্বানন্দের ফ্ল্যাটের ছাদ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

বাড়ির একতলায় থাকেন বাড়িওয়ালা চক্রবর্তীবাবু। তিনি সর্বানন্দের অফিসের এক সহকর্মীর ভায়রাভাই। সেই সূত্রেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া পাওয়া গিয়েছিল বছর দুয়েক আগে। প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি। তা ছাড়া গত বছর বর্ষা খুব ছিল না।

কিন্তু এ বছরের ঘন ঘন প্রবল বর্ষণে ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদটা ছেঁড়া ছাতার মত আচরণ করছে। জামাকাপড়, বিছানাপত্র জলে ভিজে একেবারে বেহাল অবস্থা। বাড়িওয়ালা চক্রবর্তীবাবুর ছাদ সারাবার তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

তবে সর্বানন্দ নিশ্চিত যে ছাদ যে ফাটা সেটা চক্রবর্তীবাবু আগে থেকে ভাল করেই

জানতেন। না হলে বাড়িওয়ালা নিজে একতলায় থেকে দোতলা কখনও ভাড়া দেয়। বাড়িওয়ালারই দোতলায় থাকার কথা। জল পড়ে বলে নিচে নেমে এসে ওপরে ভাড়াটে বসিয়েছেন।

এর আগে চক্রবর্তীবাবুকে সর্বানন্দ ও সর্বাণী দুজনেই ছাদ দিয়ে জল পড়ার কথা বলেছেন। কোনও কাজ হয়নি। প্রথমে তিনি তেমন কান দেননি কথাটায়, ওরকম হয়েই থাকে গোছের মনোভাব। পরে চাপ দিতে তিনি বলেছেন, 'এই বর্ষাটা থাক, এত বৃষ্টিবাদলের মধ্যে ছাদ সারাই হবে কি করে।

চক্রবর্তীবাবুর কথার মধ্যে কিছুটা যুক্তি আছে, সর্বানন্দ সর্বাণীকে এসে চক্রবর্তীবাবুর বক্তব্য জানাতেই, সর্বাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এসব কথার কথা। দায় এড়িয়ে যাওয়া। আগে সারায়নি কেন? আমরা কি সারা বর্ষা জলে ভিজে নিমোনিয়া হয়ে মারা যাব?

সর্বানন্দ সর্বাণীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি কবে যেন অন্য এক ভাড়াটে বাড়িওয়ালার গল্প শুনেছিলেন। সেই গল্পের ভাড়াটিয়া তাঁর মতই বাড়িওয়ালার কাছে ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগের উত্তরে বাড়িওয়ালা নাকি বলেছিলেন, 'ছাদ দিয়ে জল পড়বে না কোকোকোলা পড়বে নাকি মশায়?'

অনুরূপ ঘটনা সর্বানন্দের ক্ষেত্রেও সম্প্রতি ঘটেছে। কথাটা সর্বাণীকে তিনি বলেননি, সর্বাণী শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন।

অফিসের সেই সহকর্মী, চক্রবর্তীবাবুর ভায়রাভাই, যিনি এই ফ্ল্যাটটার খোঁজ সর্বানন্দবাবুকে দিয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোককে সর্বানন্দবাবু ছাদ দিয়ে জল পড়ার নালিশ করেছিলেন।

ভদ্রলোক তখন কিছুই বলেননি। নিঃশব্দে সর্বানন্দবাবুর অভিযোগ হজম করেছিলেন। কিন্তু সেদিন গভীর রাতে চায়ের টেবিলে চার পাঁচ পেগ হুইস্কি খাওয়ার পরে, সেই ভদ্রলোক সর্বানন্দবাবুকে খেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ দুপুরে অফিসে আপনি আমাকে আমার ভাঁয়রাভাইয়ের ফ্ল্যাট দিয়ে জল পড়ার কথা বলছিলেন না, মশায়?'

হঠাৎ এক গেলাসের বন্ধুর এই মারমুখী জিজ্ঞাসায় সর্বানন্দ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'ছাদ ফেটে হুড়হুড় করে জল পড়ছে।'

অধিকতর খেঁকিয়ে সহকর্মীটি দন্ত বিকশিত করে বললেন, 'ন্যায্য কথা বলছি মশায়, যা মনে করেন করবেন। বেহালায় আঠারোশ টাকায় দুরুমের ফ্ল্যাটে ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো হুইস্কি পড়বে নাকি মশায়। ন্যায্য কথা বলছি মশায়, ন্যায্য ভাড়া দিন, ন্যায্য জিনিস পাবেন।'

তখন সর্বানন্দেরও নেশা জমে উঠেছে। তিনি ধরতে পারছিলেন না ন্যায্য জিনিসটা কী। হুইস্কি নাকি। কিন্তু ছাদ দিয়ে জল কিংবা হুইস্কি কোনওটাই পড়ুক সেটাই তিনি চান না। ন্যায্য ভাড়া দিয়েও তিনি চান না। ছাদ দিয়ে কিছুই না পড়ুক সেটাই চান তিনি।

সহকর্মীর এই ন্যায্য উপদেশটির কথা সর্বাণীকে বলেননি সর্বানন্দ। শুনলে তিনি হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন, হয়তো নিজেই বাড়িওয়ালার ঘরে ছুটে গিয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিতেন।

অবশ্য এখনও সর্বাণী যথেষ্ট চেঁচাচ্ছেন। আজ সকালের জোর এক পসলা বৃষ্টিতে ঘরের মেঝেতে দু ইঞ্চি পরিমাণ জল জমে গেছে। সর্বাণী ঝাঁটা দিয়ে জল ঘরের চৌকাঠ

ডিঙিয়ে বাড়িওয়ালার উঠোনে ফেলতে লাগলেন। সেখানে বৃষ্টির ক্ষণিক বিরতির সুযোগে বাড়িওয়ালা তোলা উনুনে ধোঁয়া দিয়েছেন।

জলের তোড়ে উনুন উল্টে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বাড়িওয়ালা ওপরে উঠে আসছেন। সর্বাণী সর্বানন্দকে বললেন, 'মোটেই ভয় পেয়ো না, কয়েকটা ন্যায্য কথা শুনিয়ে দাও।'

ন্যায্য কথা শোনানোর জন্যে সর্বানন্দ প্রস্তুত হলেন।

চার উকিলের গল্প

উকিল নিয়ে আমাব রসিকতা করা মোটেই উচিত নয়। যদিও আমি নিজে ওকালতি ব্যবসায় যাইনি। আমি নিজে পুরুষানুক্রমে ব্যবহারজীবী বংশের সন্তান।

আজ কিন্তু হাতের কাছে আর কোনও ঘটনা না পেয়ে সর্বানন্দবাবুর সূত্রে উকিলের গল্প আমাকে বাধ্য হয়ে লিখতে হচ্ছে।

মদ্যপান করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে, বিশেষ করে ব্যাপারটা ঘনঘন হলে, কেন দেরি হ-া এ ব্যাপারে সর্বাণীকে উল্টোপাল্টা কিছু বোঝাতে হয়। অনেকদিন রাতের বেলা ব্যাখ্যা দেওয়ার মত অবস্থা থাকে না। সর্বাণীও এসব ব্যাপারে জোর করেন না।

পরের দিন সকালে সর্বানন্দই হয়তো একটা কোনও রকম ব্যাখ্যা দেন। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যাটি ভরা থাকে প্রায় আগাগোড়া মিথ্যে কথায়। সর্বাণী সমস্তই টের পান, কিন্তু সর্বানন্দের মুখে মিথ্যে গল্প শুনতে তাঁর বেশ ভালই লাগে।

সর্বানন্দের অধিকাংশ বানানো গল্পই যথেষ্ট লোমহর্ষক। যেমন তাঁর এক বন্ধুর ছেলে বরফের কিউব গিলে ফেলেছিল। সর্বানন্দ দত্ত সেই সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে মদ খাচ্ছিলেন। সেই সময়ে এই ব্যাপারটা ঘটে। শিশুটি বরফের ট্রে থেকে একটা টুকরো তুলে গিলে ফেলে। তারপর গলায় ঢোক গিলে, হেঁচকি তুলে দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি? বুদ্ধি করে সর্বানন্দবাবু শিশুটির গলদেশে হট ওয়াটা- ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিতে বরফের কিউবটা গলার মধ্যে গলে যায়, ছেলেটা প্রাণে রক্ষা পায়।

সকালের চা করতে করতে সর্বাণী স্বামীর আজগুবি গল্প শোনেন আর মৃদু মৃদু হাসেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর হাসির পর্যায়ে নেই।

বাসায় সর্বাণীকে মিথ্যে গল্প বলে বলে মিথ্যে কথাটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিনা চেষ্টাতেই হরবখত মিথ্যে কথা বলতে পারেন সর্বানন্দ দত্ত।

আজ সকালের ব্যাপারটা বলা যাক। সেটাই এবারকাব চার উকিলের গল্প।

যথারীতি গত রাতে দেরি কবে বাড়ি ফিরেছেন সর্বানন্দ। গত রাত ছিল উইক এন্ড, শনিবারের সন্ধ্যা। বেশ হই-হুল্লোড় হয়েছিল। বাড়ি ফিরে অজ্ঞানের মত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সর্বানন্দ। সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল অসহ্য মাথাব্যথা নিয়ে। পরপর দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে মাথা ধরা কমল না। ভয়ঙ্কর হ্যাংওভার।

এদিকে আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। কাক ডাকছে। পায়রাগুলো দৈনন্দিন প্রভাতী কলহ আরম্ভ করার পূর্বে পাঁয়তারা কষছে।

কপালের দুপাশের রগদুটো বাঁ হাত দিয়ে শক্ত করে টিপে সর্বানন্দ সর্বাণীর ঘুম না ভাঙিয়ে আলতো করে দরজা খুলে ঘরের সামনে ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সর্বানন্দের ফ্ল্যাটের সামনের এই ঝুল বারান্দাটার পুব দিক খোলা। বারান্দায় আসতেই সর্বানন্দের তপ্ত শরীরটা নবীন বর্ষার শেষ রাতের ঠাণ্ডা ঝিরঝিরি বাতাসে জুড়িয়ে গেল। সর্বানন্দ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বারান্দায় বসলেন, এবং একটু পরে স্থির করলেন, 'এই মাথা ধরা নিয়ে ঘুম যখন আর সম্ভব নয়, বরং একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি।'

নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ সর্বানন্দ কখনও করেননি। মাঝে মধ্যে, কালে ভদ্রে হয়তো হাঁটতে বেরিয়েছেন।

পাজামার ওপরে একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে, পায়ে একটা চপ্পল দিয়ে, বাইরের দরজার চাবিটা পকেটে নিয়ে সর্বানন্দ হাঁটতে বেরোলেন। ভোরবেলায় খোলা হাওয়ায় হাঁটতে বেশ লাগছিল। মাথা ধরাটাও কম লাগছিল।

বাড়ির অদূরে একটা পার্ক আছে। এই সকালবেলাতেও সেখানে বেশ ভিড়। সর্বানন্দ পার্কে ঢুকে খুঁজেপেতে একটা বেঞ্চের একপাশে একটু জায়গা পেলেন। বেঞ্চটা একটা ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে। তাতে আগের থেকেই তিনজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন।

সর্বানন্দ খেয়াল করেননি। বৃদ্ধরাও কেউ আন্দাজ করতে পারেননি। আচমকা তেড়ে বৃষ্টি এল। আষাঢ় মাসের বৃষ্টির এটাই স্বভাব। এ ব্যাপারে আগাম কিছু অনুমান করা কঠিন।

ভাগ্যিস মাথার ওপরে পাতাভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটা রয়েছে। না হলে বৃষ্টিতে ভিজে নাকাল হতে হত। অবশ্য দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পাতার ভিতর দিয়ে এসে মাথায় বা শরীরে পড়ছে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়।

ঘন বৃষ্টি একটা আলাপের আবহ তৈরি করে। তাছাড়া এখন পার্ক থেকে বেরোনোও যাবে না। তিন বৃদ্ধ পরস্পর গল্প শুরু করলেন। সর্বানন্দ ভেবেছিলেন এঁরা পুরনো বন্ধু, কিন্তু দেখা গেল তা নয়, কেউ কাউকে বিশেষ চেনেন না।

কথাপ্রসঙ্গে প্রথম বৃদ্ধ নিজের সম্পর্কে যা বললেন, তার সংক্ষিপ্তসার হল, 'আমি একজন উকিল। বিয়ে করেছি প্রায় চল্লিশ বছর। একটি মাত্র ছেলে, আর একটি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি। বর কর্পোরেশনে কাজ করে। আমার ছেলেটি আবগারির দারোগা। বেশ উপরি উপার্জন আছে। পার্কের ওপাশে দশতলা বাড়িতে ফ্ল্যাট কিনেছে তার মায়ের নামে। সেখানেই এখন থাকি।'

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন, 'আমিও ওকালতি করি। আমার দুটি মেয়ে। স্ত্রী মারা গেছেন। দুটি মেয়েই টি ভি সিরিয়ালে কাজ করে। ছোটটিও নাম বললে চিনবেন। ইমলি পাল। দূরদর্শনে এইড্স বিরোধী একটা প্রোগ্রামে যৌনকর্মীর পার্ট করে নাম করেছে।'

এরপর দেখা গেল তৃতীয় ব্যক্তিও উকিল, বিবাহিত। তাঁর একটিই ছেলে, চিটফান্ডের ব্যবসা করতো, সম্প্রতি জেলে আছে।

সর্বানন্দ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে বৃদ্ধদের কথা শুনছিলেন। বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। মাথা ধরাও ছেড়ে গেছে। বাড়ি ফিরে চা খেতে হবে। সর্বানন্দ উঠে দাঁড়ালেন।

আজ সকালের কোটার মিথ্যে কথা এখনও বলা হয়নি। বেরোনোর সময় তো সর্বাণী ঘুমিয়ে ছিল। সর্বানন্দ ঠিক করলেন, আজ আর সর্বাণীকে কোনও মিথ্যা কথা বলতে যাবেন না। মিথ্যে কথা বলার কাজটা এখানেই সেরে যাবেন।

সর্বানন্দ অযাচিতভাবে বৃদ্ধদের আত্মপরিচয় দিলেন, বললেন, 'আপনাদের কথা এতক্ষণ শুনে খুব আনন্দ পেলাম। এবাব আমার কথাটা বলে উঠি। আমি একজন স্মাগলার। গণ্ডারের খড়্গা স্মাগল করি। আমি বিয়ে করিনি। কিন্তু আমার একটি ছেলে আছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমার ছেলেটি উকিল হয়েছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। সর্বানন্দ পার্ক থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনজন বৃদ্ধ উকিল তখনও হতভম্ব হয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে।

প্রবেশ

সর্বানন্দের এত মদ খাওয়া উচিত নয়। লিভার পচে যাবে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে। মদের সঙ্গে বেশি চাট বা ভাজাভুজি খেলে হু হু করে মোটা হয়ে যাবে।

এসব ক্ষতি আমার নিজের জীবনে হয়েছে, সর্বানন্দ আমার স্নেহাস্পদ, তাঁর স্ত্রী সর্বাণী আমাকে খোকনদা বলে—সর্বানন্দের কোনও ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না।

সুতরাং আমি তাকে মদ খাওয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। তাঁকে নিয়ে আসছি দাম্পত্য প্রেমের মধুর পৃথিবীতে।।

সবাই স্বীকার করেন যে সর্বানন্দ-সর্বাণীর মত আদর্শ জুটি হয় না। নিচে উদ্ধৃত একটি টেলিফোন কথোপকথনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সময় বিকেল চারটে।

সর্বানন্দ অফিস থেকে বাড়িতে ফোন করছে।

হ্যালো সর্বাণী।

বলো।

আমি সর্বানন্দ বলছি।

বলো।

আজ যদি সন্ধ্যাবেলা তিন-চারজন বন্ধুকে নিয়ে বাসায় আসি, কোনও অসুবিধে হবে?

না।

ওরা কিন্তু সবাই রাত্রে আমাদের ওখানে খাবেন।

খাবে।

তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ।

তিন-চারজন বন্ধু রাতে আমাদের বাসায় খাবে।

হ্যাঁ। খাবে।

সরি। রং নম্বর। কি ইয়ারকি করছেন। আপনি মোটেই সর্বাণী নন।

এই কথোপকথন পাঠ করে পাঠক-পাঠিকা কেউ যদি মনে মনে সর্বাণী সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা গঠন করেন, সেই জন্যে, সর্বাণীকে সত্যি কবে চেনার জন্যে এবার অন্য একটা ঘটনা বলি।

বিয়ের পরে হানিমুন অর্থাৎ মধুচন্দ্রিমা করতে আর দশটা নবদম্পতির মত সর্বানন্দ এবং সর্বাণী পুরী গিয়েছিলেন দিন তিনেকের জন্যে।

পুরী থেকে ফিরে আসার দুয়েকদিন পরে এক ঘনিষ্ঠ রাতে কথায় কথায় সর্বাণী সর্বানন্দকে বললেন, 'জানো তোমাকে দেখলেই আমার কেমন যেন সমুদ্রের কথা মনে পড়ে?'

এরকম একটি প্রশংসা বাক্য স্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে পেলে সব স্বামীই খুশি হয়। সর্বানন্দ একেবারে গদগদ হয়ে গেলেন। সর্বানন্দ সর্বাণীর কথার খেই ধরে বললেন, 'চমৎকার উপমা দিয়েছ তুমি। সত্যিই আমি সমুদ্রের মত উদ্দাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উত্তাল আর সেই রকমই রোমান্টিক।'

সর্বানন্দের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে সর্বাণী তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না। তুমি ভুল করছ। ওসব কিছু নয়। আসলে সমুদ্রের কাছে গেলেই গা গুলিয়ে ওঠে, বমি বমি ভাব হয়, সে জন্যেই সমুদ্রের কথাটা বলেছিলাম।' কথাটা সর্বানন্দ হজম করেছিলেন। বরং অন্য এক বারের কথা বলি, সে বার সর্বানন্দ একটু সুবিধে করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনাও বিয়ের অল্প দিন পরেই কয়েক মাসের মধ্যেই।

সর্বাণী দিন সাতেকের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। নববিবাহের পরে এই প্রথম বিরহ।

রওনা হওয়ার একটু আগে সর্বাণী সর্বানন্দকে বললেন, ঠিকঠাক থেকো। মাত্র সাতদিন তো। দেখো খুব বেশি এদিক-ওদিক করতে যেয়ো না।

সর্বানন্দ বললেন, তুমি কি আমাকে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারো না।

সর্বাণী বললেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

সর্বানন্দ বললেন, একেক সময় আমার সন্দেহ হয়, তুমি আমাকে ভালবাসো কি না। একেক সময় আমার বিশ্বাস হয় না তুমি আমাকে ভালোবাসো।

সর্বাণী বললেন, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

সর্বানন্দ বললেন, 'আগে তুমিই আমাকে পরীক্ষা করে দেখো।' এবং এই কথাটি বলেই ঘোরতর বিপদে পড়লেন সর্বানন্দ।

মাসের শেষ। সর্বানন্দের মানিব্যাগে মাত্র দেড়শো টাকা সম্বল। তার থেকে দুটো দশ টাকার নোট দিয়েছেন সর্বাণীকে। পিত্রালয়ে হাত খরচের জন্য। কিন্তু কুড়ি টাকায় কি হয়?

সর্বাণী সর্বানন্দকে বললেন, আমার পরীক্ষাটা খুব সোজা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাসো তবে তোমার মানিব্যাগের মধ্যে একটা একশো টাকার নোট আছে, সেটা আমাকে দিতে পারবে?

বেকায়দায় পড়ে সর্বানন্দ বললেন, কেন পারব না। অবশ্যই দিতে পারবো। কিন্তু একটা কথা, তুমি যখন আমাকে এত ভালোবাসো, পরীক্ষার ডেটটা একটু পিছিয়ে দিতে পারো না?

পুনশ্চ :

সর্বানন্দ দত্ত নাকি কবে বলেছিলেন যে, তাঁদের পরিবারে কারও আজ পর্যন্ত ভাল বিয়ে হয়নি একমাত্র তাঁর স্ত্রীর ছাড়া।

কথাটা কিন্তু আমরা আগেও শুনেছি। সন্দেহ হয় সর্বানন্দ ঠিক কথা বলেননি।

বাজিমাৎ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সর্বাণী রাস্তায় কিঞ্চিৎ কোলাহল শুনে তাঁদের দোতলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে তাঁদের বাড়ির সামনে আট-দশ জন লোকের একটা ছোটখাটো জটলা।

সর্বাণী প্রথমে ভাবলেন যে কাল রাতে ইডেনে শ্রীলঙ্কার কাছে ভারত যে গোহারা হেরেছে তার হ্যাংওভার এদের এখনও কাটেনি। এদের কথায় বার্তায়ও টুকরো টুকরো করে আজহার, জয়সূর্য, ক্রিকেট ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ শোনা যাচ্ছে।

কাল সর্বাণীদের বাড়িতেও হুল্লোড়ের অবধি ছিল না। অবশ্য ভারত বোকার মত হেরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাই মাটি হয়ে গিয়েছিল।

কাল সকালবেলা বাজারে গিয়ে সর্বানন্দ এই দুর্মূল্যের দিনে একশো দশ টাকা কেজি দরে এক কেজি খাসির মাংস কিনে এনেছে। সেই সঙ্গে পাঁচ-সাত জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানাতেও ভোলেনি। দুজন বন্ধু নিজেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সেরে দেড়টা নাগাদ এসে গিয়েছিলেন। আরও তিন-চারজন অফিস পালিয়ে দুটোর মধ্যে চলে এলেন।

এদের মধ্যে দুজনের হাত ব্যাগে পানীয়ের বোতল। একজন এনেছেন চানাচুরের ঠোঙা। সর্বানন্দ অবশ্য সর্বাণীকে শুনিয়ে মুখে বললেন, 'আরে এসব কি করেছো? একটু সাদা চোখে সাত্ত্বিক মতে আজ খেলাটা দেখা দরকার।' তবে সর্বাণী বোকা নন, তাঁর সন্দেহ হল আগেই আলোচনাক্রমে এসব ঠিক করা ছিল।

সবশেষে প্রায় সোয়া দুটো নাগাদ যখন টিভি খুলে সবাই জমিয়ে বসেছেন, শেষ বন্ধুটি এলেন। তাঁর বাড়ি বালি। তাঁর হাতে বিশাল এক ঝোলা। বাজির কারখানার জন্যে বালি বিখ্যাত। সেখান থেকে পাইকারি দরে তিনি রাশি পরিমাণ বাজি, বোমা, পটকা ইত্যাদি কিনে এনেছেন।

ভারত তো জিতবেই। কবে সত্যেন দত্ত লিখে গেছেন 'হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়।' যেমন যেমন ভারত জয়ের পথে এগোবে তেমন তেমন বাজি পোড়ানো হবে। তবে বেশির ভাগ রেখে দেওয়া হবে খেলার শেষে রাস্তায় নেমে উৎসব করার জন্যে।

ভালই এগোচ্ছিল ব্যাপারটা

প্রথমেই শ্রীলঙ্কার একাধিক সেনাপতির ধরাশায়ী হওয়ার আনন্দে বাজি বেশ কিছুটা পুড়িয়ে ফেললেন বালির বন্ধু। কিন্তু তারপর খুব একটা উচ্ছ্বাসের সুযোগ পাওয়া গেল না। তবু শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হওয়ার পরে বিরতির সুযোগে 'ভারত জিতবেই' এই রকম মনোভাবে সর্বানন্দের বন্ধুরা রাস্তায় গিয়ে বাজি পোড়ালেন। পাড়ার লোকেরাও সে আনন্দে সামিল হল।

এরপর ভারতের ইনিংস আরম্ভ হওয়ার মুখে একটু ধাক্কা খেলেন সর্বানন্দ এবং তাঁর বন্ধুরা। সুধা পান করতে করতে দূরদর্শনের সিধু বিদায়ের দৃশ্য দেখে তাঁরা কেমন ভেঙে পড়লেন। পানীয় বা মাংস মুখে কিছুই রোচে না। বাজি পোড়ানো বা বোমা ফাটানোরও সুযোগ আসে না। তবু একবার শচীন তেণ্ডুলকর পঞ্চাশ রান করার পরে বালির বন্ধু আবার রাস্তায় নেমে কয়েকটা বাজি ফোটালেন। কিন্তু খুব বেশি উৎসাহদাতা পেলেন না।

ইতিমধ্যে পথেঘাটে, বেতারে দূরদর্শনে হায় হায় রব উঠেছে। রাগে, বিরক্তিতে, হতাশায় নিজেদের মধ্যে প্রচুর ঝগড়া এবং অল্পবিস্তর হাতাহাতি করে বন্ধুরা বিদায় নিলেন। পানীয়, খাদ্য সবই অর্ধেকের বেশি পড়ে রইল। বাজির ঝোলাও প্রায় ভর্তিই পড়ে রইল।

বন্ধুবান্ধবের হই হুল্লোর এবং আতিথেয়তার ক্লান্তিতে সর্বাণী সর্বানন্দের আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

আজ সকালে উঠে বাড়ির সামনে ভিড় দেখে সর্বাণী প্রথমে বুঝতে পারেননি কেন এই বিলম্বিত জটলা। সবাই তাঁদের বারান্দার রেলিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সর্বাণী দেখলেন সেখানে একটা প্ল্যাকার্ড টাঙানো রয়েছে। পিচ বোর্ডের ওপরে সর্বানন্দের গোদা গোদা অক্ষরে সেই প্ল্যাকার্ডে লেখা :

'এখানে সস্তায় বাজি বোমা পটকা বিক্রয় হয়।'

সময়ের হিসেব

সর্বাণী সর্বানন্দদের ফ্ল্যাটটা তেমন বড় নয়। এই যে রকমটা হয় আর কি। একটা মোটামুটি শোবার ঘর। এক চিলতে বাইরের ঘর। একটু খাওয়ার জায়গা। কোনও এক্সট্রা ঘর বা গেস্ট রুম বলে কিছু নেই। অতিথি অভ্যাগত এলে একটু অসুবিধে হয়ে থাকে বৈকি।

তাই বলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আসবে না তা তো হতে পারে না। যারা বাইরের থেকে আসবে, কলকাতায় থেকে গেলে তাদের রাতের শোবার জায়গাও দিতে হবে।

গতকাল সন্ধ্যাবেলা শ্যামানন্দ দত্ত পাটনা থেকে এসেছেন। কলকাতায় এসে সর্বানন্দের ফ্ল্যাটে উঠেছেন। শ্যামানান্দ দত্ত সর্বানন্দের কাকা, সেই সূত্রে সর্বাণীর খুড়শ্বশুর।

শ্যামানন্দ সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। সরকারি কাজ করতেন। পাটনা সেক্রেটারিয়েটে পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করেছেন। বড়বাবু পর্যন্ত হয়েছিলেন।

শ্যামানন্দ রাশভারি, ধর্মপ্রাণ লোক। তদুপরি চিরকুমার। রিটায়ার করার পর চারিদিকে তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন। কোনও অসুবিধে নেই। ঝাড়া হাত পা। যেখানে যে আত্মীয় আছেন চিঠি লিখে দিচ্ছেন অমুক তারিখে যাচ্ছি। আদর আপ্যায়ন তেমন না হলে সোজা হোটেলে চলে যাচ্ছেন।

শ্যামানন্দ কলকাতায় ভাইপো সর্বানন্দের বাড়িতে এসে উঠেছেন কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে কালীপ্রণাম করতে যাবেন বলে। এ বাড়িতে অবশ্য তাঁর আপ্যায়নে ত্রুটি হবে না। সর্বানন্দ সর্বাণী তেমন দম্পতি নয়। তাছাড়া ওয়ারিশহীন স্বচ্ছল কাকাকে কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ করার মত নির্বোধ সর্বানন্দ নন।

এমন কি এ ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত সতর্কতাও গ্রহণ করেছেন সর্বানন্দ। স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন, কাকা প্রবীণ মানুষ, উনি যে দু-এক দিন থাকবেন তোমার ওই চুড়িদার শালোয়ার কামিজ এ সব না পরে শাড়ি পরেই থেকো। সর্বাণী এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেননি।

ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে সোফা কাম বেডে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে শ্যামানন্দের, সেখানেই আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পদ্মাসনে জপ করছেন। অসমতল সোফা

কাম বেড পদ্মাসনের পক্ষে অনুকূল জায়গা নয়। কিন্তু শ্যামানন্দের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

সর্বাণীকে এর আগে শ্যামানন্দ মাত্র একবার দেখেছেন, সেও সেই বিয়ের সময়। এখানে আসার আগে একটু খটকা ছিল, নতুন যুগের আধুনিকা মেয়ে, কি জানি কেমন ব্যবহার হবে।

শ্যামানন্দ ধার্মিক ব্যক্তি হলেও, আহারে বিহারে তাঁর অরুচি বা সংস্কার নেই। মাছ মাংস ডিম সবই খান। কাল সন্ধ্যাতেই এখানে পৌঁছে সর্বাণীকে তিনি সে কথা বলে দিয়েছেন।

কাল রাতে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছেন। আজ সকালে একটু আগে সর্বাণী এসে জেনে গিয়েছেন তিনি সকালে সাধারণত চা আর ডিম সেদ্ধ এবং টোস্ট খান। সর্বাণী জেনে নিয়েছেন, হাফ বয়েল ডিমই তাঁর পছন্দ, কারণ বেশি সেদ্ধ হলে তাঁর হজমে কষ্ট হয়।

এখন বাইরের ঘরে পদ্মাসনে বসে শ্যামানন্দ, রান্নাঘর থেকে টুকটাক শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল মিঠে গানের সুর। সর্বাণীর গানের গলাটা ভাল। তিনি গুন গুন করে ভজন গাইছেন,

ম্যায় নে চাকর রাখো,
চাকর রাখো, চাকর রাখো জি।'

শ্যামানন্দের মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল। বৌমার গুণ আছে, কেমন চমৎকার ধর্মের গান গাইছে। হঠাৎ গানটা মাঝপথে থেমে গেল। শ্যামানন্দ একটু অবাক হলেন, 'বৌমা, বৌমা' করে সর্বাণীকে ডাকলেন।

একটু পরেই সর্বাণী আসতে তাকে শ্যামানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'চমৎকার গাইছিলে, গানটা বন্ধ করলে কেন?'

সর্বাণী বললেন, আজ্ঞে, হাফ বয়েলে ওই পর্যন্তই গাই। এর চেয়ে বেশি হলে ডিম বেশি সিদ্ধ হয়ে যায়।

এই উত্তরে বিভ্রান্ত শ্যামানন্দকে এসে উদ্ধার করলেন সর্বানন্দ। সর্বানন্দ কাকাকে বুঝিয়ে বললেন, 'সর্বাণী গান গেয়ে রান্নার সময়ের হিসেব রাখে। এই ভজনটা পুরো গাইলে সেই সময়ে ডিম সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে যায়। ভাত সেদ্ধ হতে 'আগুনের পরশমণি' দুবার গাইতে হয়, ডাল সেদ্ধ করার সময় 'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।'

একটু পরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে সর্বাণী এলেন। শ্যামানন্দ ডিম খেয়ে দেখলেন হাফ ভজনে হাফ বয়েল চমৎকার হয়েছে।

রূপচর্চা

আজ কয়েকদিন হল সর্বাণী খুব মধুর ব্যবহার করছেন সর্বানন্দের সঙ্গে। সর্বানন্দ প্রথমে খেয়াল করেনি। কিন্তু স্ত্রীর ভাল ব্যবহার বুঝতে স্বামীদের দেরি হয় না, সর্বানন্দের মত আলাভোলা মানুষেরও না।

ফলে কৌতূহল দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এবং কৌতূহল নিরসনের জন্যে সর্বানন্দ সর্বাণীর কাছে জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার?'

সর্বাণী বললেন, 'দেখছো না তোমাকে এতটা তোষামোদ করছি, অতিথির মত আদর যত্ন করছি, বুঝতে পারছো না কেন?

সর্বানন্দ সত্যিই বুঝতে পারেননি। সেটুকু কবুল করে বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না তো।'

সর্বাণী আর রাখ ঢাক না করে বললেন, 'আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। আর ও খরচটা আমি আমার জন্যে করলেও আসলে খরচটা হবে তোমার জন্যে, তোমাকে খুশি করার জন্যে।'

ব্যাপারটা যথেষ্ট হেঁয়ালি হয়ে গেল। সর্বানন্দের পক্ষে তো বটেই। তিনি ড্যাব ড্যাব করে সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাতে বা রক্ষা কি। সর্বাণী খিল ধল করে হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বললেন 'ওগো অমন ভাবে তাকিয়ো না। f াহিতা স্ত্রীর দিকে অমন ভাবে তাকাতে নেই। এমন কি নিজের বিবাহিতা স্ত্রী হলেও।'

সর্বানন্দ এবার একটু চটে ে লেন, হাত জোড় করে বললেন, 'মাফ কর। আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।'

শ্রীমতী সর্বাণী বললেন, 'সবটুকু না বুঝলেও চলবে। পাঁচ হাজার টাকা দাও, তা হলেই চুপচাপ হয়ে যাব।'

পাঁচ হাজার টাকা? বিস্ময় এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন মিলিয়ে সর্বানন্দ বললেন, 'এত টাকা দিয়ে কি হবে? সর্বাণী বললেন, 'আমি সুন্দরী হবো।'

এর আগের ঘটনা এবার একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন।

সরাসরি বলি, সর্বাণীর হাঁ মুখটা একটু বড়। হাঁ মুখ জানেন তো, অভিধানে শব্দটি খুঁজে পাবেন না, হাঁ মুখের মানে হল দুই ঠোঁটের প্রান্তিক সন্ধিস্থলের অন্তর্গত অংশ। হাঁ মুখ বড় হলে কথা বললে, হাসলে মুখব্যাদান বড় দেখায়—যেমন ছিল কাবেরী বসুর। আবার হাঁ মুখ ছোট্ট হলে ঠোঁট টেপা হাসিই সম্বল হয়ে পড়ে। এর ভাল উদাহরণ মুনমুন সেন।

সে যা হোক, সর্বানন্দের অগোচরে শ্রীমতী সর্বাণী তাঁর হাঁ মুখের ব্যাপারে একজন উদীয়মান কসমেটিক সার্জনের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সার্জন সাহেব সর্বাণীর ঠোঁটের সৌন্দর্য নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন, কিন্তু সর্বাণী তাঁকে এ ব্যাপারে মোটেই পাত্তা দেননি তবে তিনি মোদ্দা কথা যেটা বলেছিলেন তা হল, সর্বাণীর হাঁ মুখ ছোট বড় কোন ব্যাপারই নয়, সামান্য সেলাই ফোঁড়াই, কাট ছাঁটের ব্যাপার। মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে, তার বিনিময়ে সর্বাণী পাবেন অভাবনীয় ওষ্ঠ সৌন্দর্য।

সার্জন সাহেবের প্রস্তাবে সর্বাণী রাজি হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর তো টাকা নেই, দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক করে তো আর পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা যায় না। তাই আদর আহ্লাদ তোষামোদ করে সর্বানন্দের কাছেই টাকাটা চাইতে হচ্ছে।

সর্বানন্দ যখন জানতে চাইলেন এত টাকা দিয়ে কি হবে? পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে সর্বাণী বললেন, 'সার্জন বলেছেন হাঁ মুখটা অর্ধেক সেলাই করে দিলে আমি পরমাসুন্দরী হয়ে উঠব।'

সর্বানন্দ আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, 'পাঁচ হাজার নয় আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি। অর্ধেক নয়, পুরো মুখটা সেলাই করে ফেলো। তোমার সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ হোক, আমিও তোমার বাক্যবাণ থেকে নিষ্কৃতি পাই।'

নাম বদল

সর্বাণীর নিজের নামটা মোটেই পছন্দ নয়। কেমন সেকেলে। আর সেকেলে হবেই বা না কেন? সর্বাণীর বড় ঠাকুমার নাম ছিল ভবানী। বড় ঠাকুমা মানে বাবার জেঠি। সর্বাণী যখন জন্মায় তখন তিনিই ছিলেন বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। সেই ডাকসাইটে মহিলা নিজের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাতনির নাম রেখেছিলেন সর্বাণী।

একবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করবার সময়, সেই বালিকা বয়েসে, সর্বাণী নিজের নাম বদলের একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের বড় দিদিমণি ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে এবং কড়া প্রকৃতির। সর্বাণী নিজের নাম বদলিয়ে রেখা হতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে রেখা নাম্নী এক চিত্রাভিনেত্রীর খুব রমরমা। বড়দিমণি বলেছিলেন, 'নাম বদলাতে গেলে তোমার বাবাকে নিয়ে আসতে হবে।' সেদিনই ছিল ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। সুতরাং সর্বাণী তখন তাঁর নাম বদলের বাসনা পূর্ণ করতে পারেননি।

তবু চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ফ্যাসাদ হল সর্বাণীর বিয়ের পর। সর্বাণীর বরের নাম সর্বানন্দ। স্বামী-স্ত্রীর নামের এরকম রাজযোটক কদাচিৎ দেখা যায়। ব্যাপার এমন যে যাঁদের সঙ্গে সর্বানন্দের স্ত্রী হিসেবে সর্বাণীর পরিচয় হয়, তারা অনেকেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেন, এটা কি আপনার আসল নাম? নাকি সর্বানন্দ থেকে সর্বাণী।

এদিকে আশেপাশের চেনাশোনা মহিলাদের কেমন সব সুন্দর সুন্দর আধুনিক নাম। নাম শুনলেই মনে হয়, শাণিত তরবারি, রূপসী ঝকঝকে।

পাশের বাড়ির নন্দী বৌদির নাম জয়জয়ন্তী বৌদি। জয়জয়ন্তী যে ধূম কালো আর বেঢপ মোটা এবং বেঁটে নাম শুনে বোঝা যায় না। এদিকে সর্বানন্দের অফিসে কাজ করেন আইভিলতা ত্রিবেদী। তিনি অবশ্য রোগা ও ফর্সা।

নিজের নাম নিয়ে মনের ক্ষোভের কথা একদিন সর্বাণী সর্বানন্দকে জানালেন। সর্বানন্দ স্ত্রীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এই বয়েসে নিজের নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? তাছাড়া সর্বাণী নামটাই বা এমন খারাপ কী?

তবে সর্বানন্দ উদার প্রকৃতির নতুন যুগের স্বামী। তিনি দু শব কথা আলোচনার পর যখন বুঝতে পারলেন সর্বাণীর এটা একটা পুরনো ক্ষোভ, তিনি আর বাধা দিলেন না। বরং সুপরামর্শ দিলেন।

সর্বানন্দ সর্বাণীকে বললেন, নাম বদলানো এখন আর কোনও ব্যাপার নয়। যে কোনও খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুললেই দেখতে পাবে দলে দলে লোক এফিডেবিট করে নাম পালটিয়ে ফেলছে। খোকন পাল হচ্ছে সিদ্ধার্থ রায়। বুঁচকি দাসী হচ্ছে লাবণি সরকার। যে যার পছন্দসই নাম বেছে নিচ্ছে।

সর্বাণী সুগৃহিণী, তিনি হিসেবের দিকটাও ভাবেন, তিনি বললেন, কিন্তু খরচা তো আছে?

সর্বানন্দ বললেন, উকিল এফিডেবিট সব মিলিয়ে আদালতে বড় জোর একশো টাকা খরচ হবে। সে টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

অভয় পেয়ে শুভদিনে শুভক্ষণে সর্বাণী আদালতে গেলেন নাম বদল করতে। সেখানে উকিলের মুহুরি সর্বাণীর শাঁখা সিঁদুর দেখে বললেন, 'শুধু নিজের নামই পালটাবেন না স্বামীর নামও এই সঙ্গে পালটিয়ে ফেলবেন। এক খরচাতেই হয়ে যাবে।'

সর্বাণী অবাক, আমার স্বামীর নাম আমি পালটিয়ে দেব কি করে? সে কি হয় নাকি?

মুহুরিবাবু বললেন, 'লোকে মৃত বাবার নাম পর্যন্ত পালটিয়ে দিচ্ছে। এই দেখুন আমি শ্রী তপা দত্ত পিতা মৃত গজা দত্ত অদ্য হইতে এফিডেবিট বলে তাপস দত্ত পিতা মৃত গজেন্দ্র দত্ত হইলাম।'

সর্বাণী অবশ্যই নিজের নামই পালটাতে এসেছেন। মুহুরিবাবুর কথা মত একটা স্লিপে নিজের নাম, ইপ্সিত নাম, স্বামীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখে একটা এফিডেবিটের কাগজে সই করে রেখে এলেন। তাঁর নতুন নাম হবে আনন্দী। সর্বানন্দকে পুরোপুরি ছাড়লেন না।

মুহুরিবাবু বলেছিলেন, পরের দিন সকালে এসে এফিডেবিটের কাগজটা নিয়ে যেতে। সর্বাণী তথা আনন্দী সেটা আজ সংগ্রহ করে আদালতের বাইরে জামতলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু টাইপ করা আদালতী কাগজটায় চোখ বোলাতেই তিনি চমকে উঠলেন। সর্বনাশ, এ যে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। টাইপ করতে অন্য কোনটার সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছে এফিডেবিটটা, সেখানেই উকিল এবং হাকিম সই করেছেন। আজ থেকে সর্বাণীর নতুন নাম বকুলকুমারী।

ফেরিওয়ালা

ফেরিওয়ালার অত্যাচারে সর্বাণী অস্থির হয়ে উঠেছেন। রাস্তার ধারে দোতলার ওপরে ফ্ল্যাট। অনেকে রাস্তা থেকেই হাঁকাহাঁকি করে। সাহসী এবং সাহসিনীরা দোতলা পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দরজায় কড়া নাড়ে, কলিং বেল টেপে।

উৎপাতটা আরম্ভ হয়ে যায় সেই শেষ রাত থেকে। সকালবেলার ঝক্কি সর্বাণীর সঙ্গে সর্বানন্দও কিছুটা সামলান। কিন্তু সর্বানন্দ সাড়ে নয়টা-দশটা নাগাদ অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরিওয়ালার ঝক্কি সর্বাণীকে একাই সামলাতে হয়।

সেই প্রথম যখন দত্ত সম্পত্তি এ ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এক ব্যক্তির চেঁচামেচিতে প্রতিদিন ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙত। আধো-অন্ধকারে সামনের ফুটপাথে একটা ঝোলা হাতে দাঁড়িয়ে লোকটা ভীম, ভীম বলে কাকে যেন ডাকত। অন্তত সেরকমই ভ্রম হয়েছিল সর্বানন্দ এবং সর্বাণীর। দু-তিন দিন এ রকম অত্যাচার চলার পর সর্বানন্দ একদিন দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে নিদ্রাজড়িত চোখে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, 'ভীম, ভীম বলে কাকে ডাকছেন? এ বাড়িতে ভীম বলে কেউ থাকে না।'

রাস্তার লোকটি সর্বানন্দের কথা শুনে মর্মাহত হয়ে বলল, 'না স্যার আমি ভীম বলে কাউকে ডাকছি না। আমি ডিম বেচতে এসেছি। আপনি ডিম শুনতে ভীম শুনেছেন।'

সর্বানন্দের তখন নিদ্রাজড়িত জড়তা কিছুটা কেটে গেছে। সর্বাণীও বিছানা ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ পাড়ায় এসে হাজার রকম ফেরিওয়ালার ডাকাডাকি শুনে সর্বাণীর ধারণা হয়েছিল শেষ রাতের লোকটি ভীম নামের কোনও লোককে খোঁজে না, সে বাসন মাজার ভিম সাবান বেচে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই লোকটি ডিম্ব ব্যবসায়ী। কাছাকাছি কোথায় এক হাঁসমুরগির খোঁয়াড় আছে, সেখান থেকে সে সদ্য-পাড়া, টাটকা ডিম নিয়ে আসে।

আরও জানা গেল, এ বাড়ির প্রাক্তন অধিবাসীরা এই ডিমওয়ালার কাছ থেকে প্রত্যেকদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে চারটি করে ডিম নিতেন।

আপদ ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে, সর্বানন্দ একটি মিথ্যে কথা বললেন, 'আমাদের ডিম লাগবে না, আমরা ডিম খাই না।' সর্বাণী অবশ্য এত টাটকা প্রায় হাতে-গরম বলা চলে এমন ডিমের প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছিলেন না, কিন্তু ইশারায় তাঁকে নিবৃত্ত করে ঝামেলাটা বিদায় করলেন সর্বানন্দ।

কিন্তু দুপুরে তো সর্বানন্দ থাকেন না। তাছাড়া দুপুরের দিকে যাঁরা আসেন তাঁরা প্রায় সবাই মহিলা। তাঁদের জিনিসপত্রও রকমারি। সুঁচ থেকে সেলাই মেশিন, ডালের বড়ি থেকে তন্দুরি চিকেনের মশলা। হয়তো নিরাপত্তার কারণে কিংবা কাজের প্রয়োজনে মেয়েরা অধিকাংশই জোড়ায় জোড়ায় আসেন, দুজন মহিলা এক সঙ্গে।

অনেক সময় একই রকম সামগ্রী বিক্রয় অভিলাষী দু জোড়া একসঙ্গে এসে যায়। একটু আধটু গোলমাল হয়। কিছু কিনুন না কিনুন সর্বাণীকেই মধ্যস্থতা করে সে গোলমাল থামাতে হয়। নিজের স্বার্থেই সেটা করেন, ভরদুপুরে নিজের বাড়ির দরজায় চেঁচামেচি কেই বা পছন্দ করে?

মেয়েরা যেমন ঘরকন্না, প্রসাধন সামগ্রী এসব নিয়ে ছেলেরা আসে যন্ত্রপাতি নিয়ে। তাদের সাদা শার্ট, গলায় টাই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তাদের খুব ঝোঁক। কারোর কাছে জল পরিষ্কার করার মেশিন। আবার কারও মেশিন ধুলো-বালি জঞ্জাল সাফ করার।

কিন্তু সর্বাণী আর পারছেন না। প্রথম দিকে তবুও যা হয় একটু কৌতূহল ছিল। একই লোকেরা দিনের পর দিন একই জিনিস বেচতে আসে। রাস্তার হাঁক শুনে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে বলতে হয়, 'লাগবে না।' ঘুমজড়ানো চোখে কলিংবেল বা কড়ানাড়া শুনে দরজা খুলতে হয়।

অবশেষে সর্বানন্দ একটা সমাধান বার করেছেন। খুব অল্প বয়েসে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে একবার শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখেছিলেন এভাবে আত্মরক্ষা করতে।

ব্যাপারটা খুব সোজা। সর্বানন্দ অফিস যাওয়ার সময় সদর দরজায় একটা বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সদর রাস্তা থেকে চাবিটা ছুঁড়ে দোতলার বারান্দায় সর্বাণীকে দিয়ে দেন। তারপর সারাদিন ওই তালাবন্ধ বাড়ির ভিতরের ঘরে অতি নিঃশব্দে সর্বাণী আত্মগোপন করে থাকেন।

ফেরিওয়ালারা তালা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

আবার জোকবুক

শ্রীমতী সর্বাণী দত্তের জোকবুকের খপ্পর থেকে শুধু সর্বানন্দ নন, আমরাও সহজে রেহাই পাব না। কাহিনীর নায়িকাই যদি তরলমতি হন আমরা আর কি করতে পারি।

আশেপাশের বাড়িতেও কিন্তু সমানে অত্যাচার চলছে। পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় সরল প্রকৃতির সাদাসিধে মহিলা। তাঁর একটু সর্দি হয়েছিল। সর্বাণী তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন।

একটু আগে ডাক্তারবাবু এসে দেখে গিয়েছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণী বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন ভয়ের কিছু নেই, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

এই কথার মধ্যে সর্বাণী কি একটা খেই পেয়ে গেলেন, আজকাল তিনি এ জাতীয় খেই ক্রমাগতই পাচ্ছেন যাকে বলে অতিরিক্ত জোকবুক পড়ার কুফল।

আজ মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লু হয়েছে শুনে সর্বাণী তাঁকে বললেন, দিদি জানেন তো ফ্লু ডাক্তার দেখালে সাতদিনে সারে আর ডাক্তার না দেখালে এক সপ্তাহে সারে।

এ কথাটা ভদ্রমহিলা এর আগেও শুনেছেন, তাই সর্বাণীর কথায় একটু মৃদু হাসলেন।

এবার সর্বাণী একটি মারাত্মক কাজ করলেন। প্রশ্ন করে বসলেন, 'দিদি সত্যি আপনার ফ্লু হয়েছে তো?'

প্রশ্নের রকমসকমে বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি একটু চমকিত হলেন, বললেন, 'তা হলে কি হয়েছে?'

সর্বাণী বললেন, দিদি তাহলে আপনাকে গল্পটা বলি—

এক ভদ্রলোকের খুব অসুখ হয়েছিল। ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। যেমন হয়, ভদ্রলোক একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তারবাবু আমাব কি হয়েছে?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার টাইফয়েড হয়েছে, টাইফয়েডের চিকিৎসা করছি।'

রোগী ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার কেমন ভয় ভয় করছে।'

ডাক্তারবাবু অভয় দিয়ে বললেন 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।'

রোগী বললেন, 'ডাক্তাববাবু জানেন, আমার বন্ধু মহিমেরও টাইফয়েডের চিকিৎসা হয়েছিল। কিন্তু মহিমের ডাক্তারবাবু ভুল করেছিলেন। মহিমের হয়েছিল নিমুনিয়া। শেষে মহিম ওই নিমুনিয়াতেই মারা গেল।'

ডাক্তারবাবু এই শুনে বললেন, 'দেখুন মশায়, ও ধরনের ভুল আমার দ্বারা হবে না। আমি যদি টাইফয়েডের চিকিৎসা করি, আপনি ওই টাইফয়েডেই মারা যাবেন। আর নিমুনিয়ার চিকিৎসা করলে অবশ্যই নিমুনিয়ায় মারা যাবেন।'

সর্বাণীর গল্প শুনে বন্দ্যোপাধ্যায় দিদির চোখ কপালে উঠল। ঘরের মধ্যে অন্য এক প্রতিবেশিনী ছিলেন, তিনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, সর্বাণীকে বললেন, 'তোমাব শাড়ির রংটা খুঁব সুন্দর।'

কিন্তু সর্বাণী এই প্রশংসাকে কোনও রকম পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'এত ডাক্তার ফাক্তার, ওষুধ বিষুধ কোনও দরকার পড়ে না। আপনারা কি জানেন যে দৈনিক একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।'

বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ এই রকম একটা কথা মনে পড়ছে বটে,

ইস্কুলে পড়ার সময় পড়েছিলাম।'

সর্বাণী এবার জোর পেয়ে গেলেন। বললেন, 'জানেন দিদি, এক ডাক্তারের বৌ দৈনিক আপেল খেতেন বলে ডাক্তার তাঁকে ডিভোর্স করেছিলেন।'

প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলাও সুরসিকা, অবশ্য কোনও জোকবুক না পড়েই, তিনি এবার সর্বাণীকে বললেন, তুমি কি এ কথাটা জানো না যেমন দৈনিক একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকে, তেমনই দৈনিক একটা করে কাঁচা রসুন খেলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-অচেনা সবাই দূরে থাকে।'

এ রসিকতাটি এখনও কোন জোকবুকে সর্বাণী পাননি।

আজ রাতে

আজকাল একটু ঘন ঘন হয়ে যাচ্ছে। আজ রাতে সর্বানন্দবাবু আবার মদ্যপান করে এসেছেন।

গভীর রাত। রাস্তাঘাট ফাঁকা, নিঝুম। একজন বন্ধু সর্বানন্দবাবুকে তাঁর বাড়ির গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। সর্বানন্দবাবু টলতে টলতে বাড়ির দরজায় এসে গেছেন।

মাঝেমধ্যে রাত হয়ে যাচ্ছে বলে স্ত্রী সর্বাণীকে যাতে বিরক্ত না করতে হয় সে জন্যে সর্বানন্দবাবু বাড়ির সদর দরজায় একটা তালা লাগিয়েছেন। এসব তালা ভেতর থেকে এমনিতেই খোলা যায়, বাইরে থেকে খুলতে গেলে চাবি লাগে।

একটা ডুপ্লিকেট চাবি সর্বানন্দবাবু পকেটে রাখেন। বাড়িতে ফেরার সময় নিজেই বাইরে থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। সর্বাণীকে কিংবা কাজের মেয়েকে বিরক্ত করতে হয় না।

আজ সর্বানন্দ টলতে টলতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কম্পিত হস্তে পকেট থেকে চাবিটা বার করলেন। কিন্তু দরজায় আর চাবিটা লাগাতে পারেন না, যতবার চাবিটা সটকিয়ে যায় তালার মধ্যে আর ঢোকাতে পারেন না।

বাড়ির ফুটপাতে একটা কুকুর থাকে। তাকে কখনও সখনও জানালা দিয়ে এক টুকরো বিস্কুট বা রুটি সর্বানন্দবাবু ছুঁড়ে দেন। সেও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সর্বানন্দবাবুকে দেখলে লেজ নাড়ে।

আজকে কুকুরটা গভীর অভিনিবেশ সহকারে সর্বানন্দবাবুর তালা খোলা পর্যবেক্ষণ করছিল লেজ নাড়তে নাড়তে। কিন্তু তিনি আর তালা খুলতে পারেন না। তালা কি খুলবেন, তালার মধ্যে চাবিই দিতে পারছেন না। কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে লেজ নাড়া বন্ধ করে দুবার হাই তুলে তারপর ঘুমোতে চলে গেল।

গলির মোড়ে একটা পানের দোকান আছে। সর্বানন্দবাবু সেই পানওয়ালার পুরনো খদ্দের। পানওয়ালা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন বাড়ি ফিরছিল। সে তালা খোলায় সচেষ্ট সর্বানন্দবাবুর অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সর্বানন্দবাবুর অক্ষমতা দেখে বলল, দিন দত্তবাবু, চাবিটা আমাকে দিন আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।'

পানওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর সর্বানন্দ বললেন, তালা আমি

খুলতে পারব। দৈনিকই নিজের হাতে খুলি। কিন্তু আজ বাড়িটা বড় দুলছে। একেবারে একেকদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে। তুমি বাড়িটা একটু শক্ত করে ধরে রাখো। আমি তারপর তালা খুলছি।

অবশ্য পানওয়ালাকে বাড়িটা শক্ত করে ধরতে হল না, তার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে সর্বাণী স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দিয়েছেন।

দরজা খুলে যেতে সর্বানন্দবাবু পানওয়ালাকে বললেন, দেখলে তো তালাটা আগেই খুলে ফেলেছিলাম। বাড়িটা কাত হয়ে ছিল বলে দরজাটা খুলছিল না। তুমি শক্ত করে ধরতেই দরজাটা খুলে গেল।

সর্বানন্দের কথা শুনে একটু হেসে পানওয়ালা সর্বাণীকে সামনে দেখে বলল, বৌদি দাদাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যান। মাতাল বিষয়ে পানওয়ালাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা, সে জানে অনেক মাতাল বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে আর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চায় না।

কিন্তু সর্বানন্দ সে জাতের মাতাল নয়। সর্বাণীর সঙ্গে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। সদর দরজা বন্ধ করে সর্বাণী বললেন, 'তোমার কিন্তু আজকাল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত রাত করলে?'

সর্বানন্দ স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে দু পা দিয়ে কোনও রকমে সামনের সোফাটায় বসলেন। তারপর হাত পা এগিয়ে দিয়ে বললেন, সেই সল্টলেক থেকে আসছি। সল্টলেক থেকে এই কালীঘাট, অন্তত তিরিশ মাইল রাস্তা।'

সর্বাণী বললেন, 'বাজে কথা। আমাদের এই হাজরা মোড়ের এখান থেকে সল্টলেকের শেষ মাথা জোর পনের মাইল হবে।'

সর্বানন্দ ঘাড় কাত করে স্বীকার করলেন তা হবে। কিন্তু সল্টলেক থেকে হাজরার মোড় কতটা হবে? সে তো তিরিশ মাইলের কম হবে না।

সর্বাণী হেসে ফেললেন। আজকাল নেশা করে এসে সর্বানন্দ এই রকম কিছু কিছু ঘোলাটে কথাবার্তা বলেন। সর্বাণী তবু প্রতিবাদ করে বলেন, 'তা হবে কেন? হাজরা থেকে সল্টলেক যতটা সল্টলেক থেকে হাজরাও পনের মাইল হবে।'

সর্বাণীর কথা শুনে সর্বানন্দ কথা ঘোরালেন। প্রশ্ন করলেন, আজ কি বার? সর্বাণী বললেন, শুক্রবার। তবে রাত বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। এখন শনিবার হয়ে গেছে।

সর্বানন্দ বললেন, সে যা হোক শুক্রবার থেকে সোমবার কয় দিন? মাতালের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সর্বাণী বললেন, তিন দিন।' সর্বানন্দ বললেন, সোমবার থেকে শুক্রবার কয়দিন? তারপর বিজ্ঞের মত হেসে স্ত্রীকে বললেন, এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক সব সময়ে ঠিক হয় না।

হায় মশা

হায় মশা, সোনালী ডানার মশা
তুমি আর কেঁদে কেঁদে উড়ো নাকো
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো
নাইলন মশারির পাশে।'

সর্বানন্দ দত্তের বদ্ধমূল ধারণা এই অনুপম এবং মৌলিক পংক্তিগুলি তাঁর স্বরচিত এবং তিনি সহধর্মিণী সর্বাণী দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন এই কাব্যমালার গীতরূপ দিতে।

বহুকাল মশারির নীচে শোয়ার অভ্যাস নেই সর্বানন্দ ও সর্বাণীর। তাঁদের বিয়েতে যথারীতি কন্যাপক্ষ থেকে অর্থাৎ সর্বাণীর পিত্রালয় থেকে অন্যান্য বিছানা-পত্রের মধ্যে একটি নেটের মশারিও দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সেই মশারি মোটেই ব্যবহার করা হয়নি। বিয়ের পর এই কয়েকবছর পুরনো কলকাতার ঘনবসতি পাড়ায় তেমন মশার উপদ্রব হয়নি। একেবারে যে মশা ছিল না তা বলা যাবে না। কিন্তু ঘিঞ্জি বসতি, চাপা-চাপা বাড়ি, মানুষজন অনেক। মোট কথা লোক সংখ্যার অনুপাতে মশার পরিমাণ কম ছিল।

ভরা শীতে নব বসন্তে দু চারটে মশা যে কামড়ায়নি তাঁদের সে অবশ্য নয়, তবে সে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। মশারি টাঙানোর প্রয়োজন পড়েনি।

ফলে আনকোরা এবং একেবারেই ব্যবহার না করা দামি নেটের মশারিটি সর্বাণীদেবীর বিবেচনায় বাহুল্য বলে পরিগণিত হয়।

সর্বাণীদেবীর জামাকাপড়ের কাঠের আলমারিতে জায়গাও কম। সুতরাং এ ধরনের যাবতীয় দ্রব্যের যা পরিণতি হয় মশারিটির তাই হল। পুরনো জামাকাপড়ওলাকে, এখনকার বাজার মূল্যে অন্তত এক হাজার টাকা দাম, নেটের মশারিটি দিয়ে তাঁর বিনিময়ে সর্বাণী দেবী অ্যালুমিনিয়মের একটি সস্‌প্যান এবং একটি হাতা সংগ্রহ করেছেন।

সেও প্রায় বছর দেড়েক আগের কথা। এদিকে এ বছর মশা উৎপাত খুব বেড়েছে, সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার ভয়। তদুপরি একা রামে রক্ষা নাই লক্ষ্মণ দোসর।' ম্যালেরিয়ার কাঁধে চড়ে এসেছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, একেবারে সাক্ষাৎ কালান্তক যম।

সুতরাং অন্যান্যদের মতই ভীত দত্ত দম্পতি মশারি খাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মশারি কোথায়, মশারি তো সস্‌প্যান এবং হাতার বদলে বিনিময় হয়ে গেছে।

এ সংবাদ অবশ্য সর্বানন্দ জানতেন না। তবে এ নিয়ে বিশেষ ঝামেলা করলেন না। এর আগে তাঁর গরদের পাঞ্জাবি, গরম কোট বাহুল্য বোধে সর্বাণীদেবী পুরনো কাপড়ওলাকে দিয়ে স্টিলের চামচ সংগ্রহ করেছেন। তিনি ভুক্তভোগী, তাই বেশি কথায় না গিয়ে শুধু মুখে বললেন, 'এখন বোঝো ঠেলা, সস্‌প্যান আর হাতা দিয়ে তো মশা ঠেকানো যাবে না।'

তাই মশা ঠেকানোর জন্যে একটু কম দামে দায়সারা গোছের একটি নাইলনের মশারি কিনে এনেছেন সর্বানন্দ। কিন্তু মশারি নিয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই সর্বানন্দের, প্রচুর নেশা করেও বিছানায় শুয়ে মশারির নিচে কেমন দমবন্ধ লাগে। তা ছাড়া রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণার্ত বুভুক্ষু মশাদের মশারির বাইরে আর্তসংগীত। সর্বানন্দ অস্থির হয়ে

উঠলেন।

এই অস্থির অবস্থাতেই সর্বানন্দ ওই সোনালি ডানার মশা কবিতাটি তৈরি করলেন। পরে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে কবিতাটি শোনাতে তাঁরা বললেন, মশারির নিচে শুয়ে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি মশার ধূপ লাগাও। মশারি টাঙাতে হবে না।'

সর্বানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, দরজা-জানালা বন্ধ করে মশার ধূপ জ্বালিয়ে ঘুমুলে শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না? জানা গেল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এ সব ধূপে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না।

সেদিন রাতেই মশারি খুলে ধূপ জ্বেলে দত্ত দম্পতি শয্যাশায়ী হলেন। এবং এর পরিণাম হল ভয়াবহ। মশা কামড়িয়ে দত্ত দম্পতিকে চায়ের ছাঁকনির মত শতধা ছিদ্র করে ফেলল।

পরদিন থেকে আবার মশারি। কিন্তু তার আগে মশার ধূপের সেই ডিলার বন্ধুকে সর্বানন্দ জানিয়ে এলেন, ভাই তোমার ধূপে মানুষের হয়তো কোনও ক্ষতি হয় না। তবে মশারও কোনও ক্ষতি হয় না।

মিক্সি

শুদ্ধ কথাটা মিক্সি না মিক্সার সেটা সর্বাণী জানেন না। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তিনি একটি ওই যন্ত্র কিনেছেন। তবে নগদ দামে নয়, এই ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক মশলাপতি গুঁড়ো করার যন্ত্রটি মাত্র এগারশো আটাশ টাকা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, এখন আর বারো মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে দুশো দশ টাকা করে দিলেই হবে।

কিস্তির দোকানের বিক্রয়বালিকাটি এই নয়নশোভন ঝকমকে যন্ত্রটির নাম বলেছিল মিক্সি। সর্বাণীও তাই বলে যাচ্ছেন।

সর্বাণী এই জাতীয় সওদা দুপুরের দিকে করে থাকেন যখন সর্বানন্দ অফিসে থাকেন। এ ধরনের কেনাকাটার টাকা সর্বানন্দের কাছ থেকে অবশ্যই পাওয়া যায় না। সর্বাণী স্বোপার্জিত অর্থে এই সব খরচার ব্যয়নির্বাহ করেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কারও কারও হয়তো খেয়াল আছে শ্রীমতী সর্বাণী দত্ত কোনও চাকরি করেন না, তিনি নিতান্তই গৃহলক্ষ্মী। তাঁদের কারও কারও মনে কৌতূহল জাগতে পারে সর্বাণী দত্তের স্বোপার্জিত অর্থ কোথা থেকে আসে, কারও কারও মনে অশ্লীল সন্দেহও জাগতে পারে।

কারও মনে যাতে সর্বাণী দত্তের মত সোনার টুকরো মেয়ের বিষয়ে কোনও সংশয় না থাকে তাই জানিয়ে দিতে চাই শ্রীমতী সর্বাণী কোনও অসামাজিক উপায়ে নয় অত্যন্ত সৎভাবে চুরি করে এই টাকা উপার্জন করেন। তিনি সময় ও সুযোগ মত সর্বানন্দ দত্তের পকেট ও মানিব্যাগ থেকে অল্প-বিস্তার টাকা পয়সা নিয়মিত সরিয়ে থাকেন। এবং তাই দিয়েই তাঁর সাধের কেনাকাটা সারেন।

খবরের কাগজে এবং দূরদর্শনে রঙিন বিজ্ঞাপন বারবার দেখে সর্বাণীর মনে ধারণা জন্মেছিল একটা মিক্সি না হলে মানবীজনম বৃথা, ঘর-সংসার করার মানেই হয় না।

বেলা তিনটেয় মিক্সিটা নিয়ে তিনি বাড়ি এসেছেন, তারপর থেকে ক্রমাগত মশলা গুঁড়ো করে যাচ্ছেন। বাড়ি ফেরার পথে মুদির দোকানের থেকে প্রচুর পরিমাণ গোটা মশলা কিনে এনেছেন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সব মশলা গুঁড়ো করা হয়ে গেল। যে পরিমাণ মশলা গুঁড়ো করা হল তাতে দত্ত পরিবারের দু'বছর চলে যাওয়া উচিত।

কিন্তু সর্বাণী দেবীর তখন মিক্সির নেশায় ধরে গেছে। তিনি মুদির দোকানে ছুটলেন আরেক দফা মশলাপাতি কিনে আনার জন্যে।

সন্ধ্যাবেলা সর্বানন্দ যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখনও সর্বাণী মশলা গুঁড়ো করে যাচ্ছেন, সেই সময়টা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করছিলেন।

কপালে ও চুলে হলুদগুঁড়ো লেগে রয়েছে, গালে-ঠোঁটে জিরে গুঁড়া আর শাড়ির আঁচলে লঙ্কাগুঁড়ো। সর্বাঙ্গ মশলাগন্ধী সর্বাণী বাইরের দরজা খুলে দিতেই মশলাগুঁড়োর প্রভাবে সর্বানন্দ ভয়ানকভাবে হাঁচতে ও কাশতে লাগলেন তারপর দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে সোফার ওপরে বসে হেঁচকি তুলতে লাগলেন।

এই অবস্থাতেও আহ্লাদের খবরটা সর্বাণী চেপে রাখতে পারলেন না, সর্বানন্দকে বললেন 'জানো আমি একটা মিক্সি কিনেছি।'

হেঁচকি তুলতে তুলতে সর্বানন্দ শুনলেন 'ম্যাক্সি কিনেছি।' তিনি বিরক্তভাবে কোনও রকমে হেঁচকি দমন করে বললেন, 'এ আর বেশি কথা কি? আমাদের অফিসের গদাধরবাবু পুজোর সময় ছয় জোড়া করে নানা সাইজের ম্যাক্সি কেনেন, বাড়ির সকলের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, এমনকি বৃদ্ধ বাবা আর কাজের লোকের সারা বছরের বাসায় পরার পোশাক হয়ে যায়। লুঙ্গি গেঞ্জি, শাড়ি-ব্লাউজ কিছুই আর দরকার পড়ে না।'

সর্বাণী বললেন, 'ওগো, ম্যাক্সি নয়, আমি একটা মিক্সি কিনেছি।'

সর্বানন্দ বললেন, 'মিক্সি আবার কি জিনিস?'

অহঙ্কার মানে ফাট

ঢাকার লৌকিক কথায় 'ফাট' বলে একটুকু কথা আছে, কথার মানেটা কিন্তু একটুকু নয়। অহঙ্কার মানে ফাট, কিংবা তার চেয়েও বেশি ফাটের অর্থ। দম্ভ আর দর্প দুইয়ে মিলে একযোগে ফাট। কারও খুব পায়া ভারি হলে ঢাকার লোকে বলে, 'ফাট হইছে খুব ফাট হইছে।'

ফাট জিনিসটা অবশ্য বাঙালদের বা ঢাকাইয়াদেরই একচেটিয়া নয়, বাঙালি মাত্রেই ফাট করতে ভালবাসে। কত তুচ্ছ-তুচ্ছ ব্যাপারে যে ফাট করা যায় সেটা ভাবতে গেলে হাসি পায়।

আমাদের সর্বানন্দ দত্ত কোনও ব্যতিক্রম নন। তিনি একজন এক নম্বরের ফাটবাজ। প্রায় এমন কোনও বিষয় নেই যে বিষয়ে তাঁর কোনও অহঙ্কার নেই।

দুয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সর্বাণীর বাবা মানে সর্বানন্দের শ্বশুরের মত ইংরেজি কেউ নাকি লিখতে পারে না। তাঁর বড় শ্যালিকার মত গায়ের রং শুধু মেমসাহেবদেরই হয়, বাঙালির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

বিয়ের পরে প্রথম প্রথম সর্বানন্দ তাঁর বন্ধুদের কাছে এই সব ব্যাখ্যান করতেন। বন্ধুবর্গ ধরে নিয়েছিলেন এগুলো সর্বানন্দের বিবাহোত্তর সাময়িক দুর্বলতা। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল এ দুর্বলতা সহজে কাটার নয়।

এমন নয় যে সর্বানন্দের বন্ধুদের মধ্যে কারও কোনও ফাট নেই। তারাও মানুষ, তারাও বাঙালি। কেউ কেউ বংশ সূত্রে বাঙাল।

সর্বানন্দের পুরনো বন্ধু শুচিশঙ্কর নিজে বালিগঞ্জে জন্মালেও কাঠ বাঙাল বাড়ির ছেলে। তার কিন্তু বিলিতি ফাট সাহেবিয়ানার অহঙ্কার।

শুচিশঙ্করের ঠাকুরদা রামপ্রসন্ন ছিলেন সুবে বাংলার ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গার্ড। ঢাকা-জগন্নাথগঞ্জ সেকশনে বুড়িগঙ্গা থেকে ব্রহ্মপুত্র। এই দীর্ঘ এলাকায় ঢাকা মেলের দায়িত্বে ছিলেন।

পাটের তখন খুব কদর। পাটের সাহেবরা ঢাকা ময়মনসিংহে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঢাকা মেলের গার্ডসাহেব পিতামহ রামপ্রসন্নকে তাঁরা রামপাঞ্চ বলে ডাকতেন। সাহেবসুবোর সঙ্গে তাঁর ছিল গলায় গলায় ভাব।

উত্তরাধিকার সূত্রেই শুচিশঙ্কর সাহেবি ফাট পেয়েছেন। তাঁর ধারণা তাঁর মত এটিকেট কারও জানা নেই। কি ভাবে কাঁটা চামচে ধরতে হয়, কি রকম করে অঙ্গুলি হেলনে টাই বাঁধতে হয়, কিভাবে মহিলাদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়, এ সবই শুচিশঙ্করের এলাকা।

শুচিশঙ্কর অবশ্য গৌরব বোধ করে এই বলে যে তার মত বিয়ার কেউ ঢালতে পারে না। এক ফোঁটা ফেনা গেলাসের বাইরে গড়িয়ে পড়বে না।

শুধু শুচিশঙ্করই নয়, সর্বানন্দের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের ফাটও কিছু কম নয়। গৌরনাথের ধারণা তাঁর মত সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং কেউ বানাতে পারে না। আড্ডায় বসলেই তিনি আপনমনে একনাগাড়ে সিগারেটের পর সিগারেট ধরিয়ে শয়ে শয়ে ধোঁয়ার রিং রচনা করে যান। তাঁর বক্তব্য এই যে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং রচনা করার যদি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থাকত তাহলে তিনি এক নম্বর হয়ে সোনার মেডেল পেতেন।

এসব তবু বোঝা যায়। এ সমস্তই ব্যক্তিগত ফাটের ব্যাপার। কিন্তু সর্বানন্দের ব্যাপারটা বন্ধুরা বুঝে উঠতে পারেন না।

বিয়ের পর অনেকে দুচার মাস শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আদিখ্যেতা করে। কিন্তু সর্বানন্দের বিয়ের পরে তো প্রায় পাঁচ ছয় বছর কেটে গেছে কিন্তু সর্বানন্দ এখনও এসে শ্বশুরবাড়ি বিষয়ে হাস্যকর সব অহঙ্কার করে, ফাট নেয়।

আগে শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকার মধ্যেই ফাট সীমিত ছিল। এখন শালাজ, ভায়রাভাই, মাসিশাশুড়ি অবধি গড়িয়েছে।

অনায়াসেই সর্বানন্দ আড্ডায় এসে বলেন, আজ দুপুরে মাসশ্বশুরের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। আমার মাঁসীশাশুড়ির মত রান্না কেউ করতে পারবে না, কুমড়ো ছেঁচকি নারকেল দিয়ে যা করেছিলেন, তাজবেঙ্গলে সার্ভ করা যায়।'

আরেক সন্ধ্যায় সর্বানন্দ এসে বললেন, 'আমার শালাজের যা সেন্স অফ হিউমার না, তারাপদ রায়, নবনীতা দেবসেন ফেল মেরে যাবে। কাল সন্ধ্যাবেলা যা একটা জোক করেছিল না মাইরি, হাসতে হাসতে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।'

এরপরে অনিবার্য প্রশ্ন 'জোকটা শুনি।' প্রভূত চিন্তা করে, প্রচুর মাথা চুলকিয়ে সর্বানন্দ বললেন, 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

ইতিমধ্যে সর্বানন্দের শ্বশুর মারা গেছেন। সে নিয়েও সর্বানন্দের ফাট। মৃত্যুর সময় নাকি শ্বশুরমশায় তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।

শুচিশঙ্কর সাহেবি মেজাজের লোক, এসব একদম সহ্য করতে পারেন না। তিনি সর্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শ্বশুরমশায় কিসে মারা গেলেন?

সর্বানন্দ বললেন, 'নিউমোনিয়ায়'। শুচিশঙ্করের প্রশ্ন, 'নিউমোনিয়া বানান?' সর্বানন্দ চুপ। শুচিশঙ্কর বললেন, 'বুঝেছি আপনি পারবেন না। আপনার শ্বশুরমশায় বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারতেন।'

অসহায়ের মত সর্বানন্দ বললেন, 'আমার শ্বশুরমশায় মারা গেছেন, তাঁকে জড়াচ্ছেন কেন?'

শুচিশঙ্কর বললেন, 'আপনার শ্বশুরমশায় ওই নিউমোনিয়া বানান করতে গিয়েই মারা গিয়েছেন।'

লীলাখেলা

এবার সর্বাণীর কথা বলি। তাঁর স্বামী অর্থাৎ যাঁকে ভদ্রমহিলারা হাজব্যান্ড বলেন, সেই সর্বানন্দ দত্ত বিষয়ে এ যাবৎ অনেক কথা বলেছি। আমার অসতর্ক রচনায় শ্রীমতী সর্বাণী প্রায় 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হয়ে গেছেন।

এইভাবে এই লেখাটা আরম্ভ করার পরে, রচনার নামের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল মহাপুরুষদের লীলাখেলা হয়, কিন্তু মানবীদের মহামানবীদের কি লীলা হয়?

আমাদের সর্বাণী শ্রীমতী সর্বাণী দত্ত, মহামানবী না হতে পারেন, কিন্তু মানবী তো বটেন এবং একটা কথা অতি গোপনে বলি, তিনি শুধু মানবী বা নারী নন, মনেপ্রাণে একজন নারীবাদী। শুদ্ধভাষায় নারীবাদিনী। তাঁব লীলাখেলা আমাদের সাধারণ লেখকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আজকের ঘটনাটাই ধরা যাক। গতকাল রাত থেকে শুরু করি।

গতকাল রাতে সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে তুলকালাম ঝগড়া হয়েছে। সেটা অবশ্য কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু কলহ তো হবেই। তা ছাড়া ঝগড়ার সময় সদ্য বার-প্রত্যাগত সর্বানন্দ বেশ টলমল অবস্থায় ছিলেন।

সর্বানন্দ কি বলতে কি বলে ফেলেছিলেন, সে আমি বলতে পারব না। ঝগড়া কলহ যাই হোক, মধ্যরজনীতে নিভৃত কালে দম্পতির কে কি বলেছিলেন, সেটা কোনও রকম কল্পনা করাও আমার পক্ষে এই বয়েসে অনুচিত হবে।

সর্বানন্দ নিজেও মনে করতে পারছেন না, বাক্যালাপ শেষ পর্যন্ত কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল কিন্তু এখন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর আবিষ্কার করলেন সর্বাণীর সঙ্গে বাক্য বিনিময় আর সম্ভব নয়। আলাপ বন্ধ। একটি কথারও কোনও জবাব দিচ্ছেন না সর্বাণী।

সর্বানন্দের আবছা মনে পড়ছে কাল রাতে শেষ পর্যন্ত কলহটা নারীবাদ পর্যন্ত

পৌঁছেছিল। সর্বাণী বোধ হয় বলেছিলেন, এই রাত করে একা একা বাইরে থেকে মদ খেয়ে ফুর্তি করে আসাটা পুরুষেরা একচেটিয়া করে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

ব্যাপারটা নারীর অধিকার এবং পুরুষদের অত্যাচার হয়ে নারীবাদে গড়ায়। এরপরে আর কিছু মনে পড়ছে না সর্বানন্দের, তবে সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে দেখছেন সর্বাণী পাশের ঘরে সোফার উপরে বালিশ নিয়ে শুয়ে আছে।

সুতবাং গুরুতর কিছু ঘটে ছিল। অগত্যা মান-ভঞ্জনের পালা। আজ এই পালার জন্য নতুন একটা গান মনে মনে বেঁধে ফেললেন সর্বানন্দ। তারপর একটু ইতস্তত করে সর্বানন্দ ফ্ল্যাট মাতিয়ে গাইতে লাগলেন হেঁড়ে গলায় :—

তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল।
নারীবাদিনীর শতদলতলে
করিতেছে টলমল...।

এর পরে আর রাগ করে থাকা যায় না। তাছাড়া সর্বাণীর স্বভাবটা একটু নরম ধরনের। গান শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

অনুতপ্ত পতিদেবতা বিছানা থেকে উঠে সোফায় তার মাথার পাশে এসে বসলেন।

সর্বাণী বললেন, 'ওগো আমরা ঝগড়াঝাঁটি না করে এমনি তো মিলেমিশে থাকতে পারি।'

সর্বানন্দ বললেন, 'চেষ্টা করা যাক।'

সর্বাণী বললেন, 'দেখ হুলো বেড়াল, মেনি বেড়াল, রাস্তার কুকুরেরা এমনকি ষাঁড় গরু ছাগল পাঁঠা এরা সবাই ঝগড়াঝাঁটি না করে মিলেমিশে কেমন সুখে থাকে। আমবা কি সেরকম পারি না?'

সর্বানন্দ গম্ভীর হয়ে বলে ফেললেন, 'বোধ হয় পারি না।

সর্বাণী বললেন, 'কেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'আমাদের যে বিয়ে হয়েছে।'

সর্বাণী বললেন, 'মানে?'

সর্বানন্দ বললেন, 'ষাঁড়-গরু, হুলোবেড়াল, মেনিবেড়াল সব আলাদা আলাদা মিলেমিশে আছে কিন্তু ওদের ল্যাজে ল্যাজে গিঁট দিয়ে বেঁধে দাও, দেখবে কাকে বলে হুলস্থুল কাণ্ড।

খুব বেশি অপেক্ষা করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাণী নিজেই এ কথা শুনে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন, সর্বানন্দ যার নাম দিয়েছেন।

পরিবর্তন

আজ কিছুদিন হল সর্বানন্দের একটা পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা সহজে আসেনি। অনেক ধাক্কা খেয়ে, সর্বাণীর অনেক গালাগাল খেয়ে সর্বানন্দ তাঁর নৈশ স্বভাবে একটু রদবদল করেছেন।

আগে অফিস ছুটির পর সর্বানন্দ বাড়ি ফিরতেন না। ক্লাবে কিংবা বার হয়ে, নেশায়

চুরচুর হয়ে তিনি বাড়ি ফিরতেন শেষ মিনিবাসে বা মহার্ঘ ট্যাক্সি চড়ে প্রায় মধ্যযাম নাগাদ।

সম্প্রতি এই রুটিনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। অফিস ছুটির পর যত্রতত্র না গিয়ে সর্বানন্দ সরাসরি বাসায় ফেরেন। তারপর বিশ্রাম করে, জলখাবার খেয়ে তিনি তাঁর নৈশ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে বেরিয়ে যান।

বলা বাহুল্য পারিবারিক ডাক্তারের পরামর্শেই সর্বানন্দ বাধ্য হয়ে এই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর শরীরটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করত, মাঝে মধ্যে হাঁফ ধরে যেত। সর্বাণী জোর করে এক ছুটির সকালে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার বিস্তর খরচ করে পরীক্ষা করিয়ে তিন সপ্তাহ পরে রায় দেন, প্রেশার বেশি, হার্টে একটু ইসকেমিয়ার ঝোঁক আছে, রক্তে শ্যাওলা, চিনি বেশি-বেশি। তবে ডাক্তারবাবু এ কথাও বলেছেন, মারাত্মক কিছু নয় সামান্য একটু খাবার দাবার, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে সবই।

সেই থেকে সর্বানন্দ ছুটির পর বাড়ি ফিরে এসে বিশ্রাম করে তারপরে পানশালার আড্ডায় বেরোচ্ছেন। এতে তাঁর মদ্যপান অনেকটাই কমে গেছে। তাছাড়া বিকেলের এই বিশ্রামটাও তাঁর ভাল লাগছে।

কিন্তু সর্বাণী আরও একটু বুদ্ধি করেছেন। তাঁর ইচ্ছে এই যে এই ভাবে যদি বাসায় আটকিয়ে ধীরে ধীরে সর্বানন্দের মদ খাওয়ার নেশাটা ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে সেটা খুব সহজ কাজ নয়, সেটা সর্বাণী ভালই বোঝেন।

বাসায় ফিরে আসার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ সর্বানন্দ আনচান করতে থাকেন, একবার বেরোবার জন্য। বেরোবার মুখে বলে যান, এই যাব আর আসব। কিন্তু সেটা মোটেই হয় না। ফিরতে ফিরতে সেই এগারোটা-সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়। বাসায় একা বসে বিরক্ত বোধ করতে করতে সর্বাণী অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ সর্বাণী ঠিক করেছেন, সর্বানন্দকে বেরোতে দেবেন না। আটকাবেন।

সর্বানন্দ উঠে জামাকাপড় পরতে যাচ্ছিলেন। সর্বাণী বললেন, আমাদের ডাক্তারবাবু তো অত পরিশ্রম করেন। সারাদিন অত রোগী দেখেন, কিন্তু সন্ধ্যার পরে তো তিনি কোনও ক্লাবে বারে যান না। বাসায়ই থাকেন।

শার্ট মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে সর্বানন্দ বললেন, 'তাই নাকি?'

সর্বাণী বললেন, এই দ্যাখো ডাক্তারবাবুকে ফোন করছি। ডায়াল করতে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ফোন ধরলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, কি আর করব, আমরা দুজনে বসে চা খাচ্ছি।

এই কথা সর্বানন্দকে জানিয়ে সর্বাণী বললেন, আমরাও তো বাসায় বসে চা খেতে পারি। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখার জন্যে সর্বানন্দ বললেন, তা পারি।

সর্বাণী তাড়াতাড়ি দু কাপ চা করে নিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে উঠে গিয়ে এবার সর্বানন্দ ফোন করতে ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ, চা খাওয়া প্রায় শেষ।'

সর্বানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, 'চা খেতে খেতে আপনারা কি করছেন?'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'এই গল্পগুজব করছি?'

সর্বানন্দ বললেন, 'কি গল্পগুজব করছেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সর্বানন্দবাবু আপনার শরীর ভাল আছে তো? এসব কি প্রশ্ন করছেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'আমার স্ত্রী বললেন আপনার মত জীবন যাপন করতে। তাই আর কি।' ফোনটা নামিয়ে রেখে, এক চুমুকে চা-টুকু খেয়ে সর্বানন্দ আজকেও বেরিয়ে গেলেন।

দার্জিলিং ভ্রমণ

সর্বানন্দের এক কাকা কাজ করতেন সেলস ট্যাক্স দপ্তরে। সারা জীবন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় চাকরি করে বেড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক, মহানন্দ দত্ত একবার এক নাগাড়ে প্রায় সাত-আট বছর ছিলেন দার্জিলিং জেলায়। কখনও কারশিয়াং-এ কখনও কালিম্পঙে আবার কখনও বা জেলা সদর শৈলসুন্দরী দার্জিলিং শহরে।

খুল্লতাতের সৌজন্যে কিশোর বয়েসে সর্বানন্দ বহুবার দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে এসেছেন, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের গরমের আর পুজোর ছুটিতে।

সেই থেকে শৈলসুন্দরীর প্রতি দুর্বলতা সর্বানন্দের। তা ছাড়া তিনি জানেন পুজোর পরে পরে এই নভেম্বর মাসে দার্জিলিং সবচেয়ে সুন্দর। হাড় হিম করা ঠাণ্ডা বাতাস নেই, ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি নেই। ঝরঝরে দিন, ঝকঝকে আকাশ। চমৎকার ঠাণ্ডা।

সুতরাং এবার পুজোর ছুটিতে যখন কোথাও যাওয়া হয়নি তাই সর্বাণীকে খুশি করার জন্যে সর্বানন্দ ঠিক করলেন একটু পাহাড়ে ঘুরে আসা যাক। বারবারই সমুদ্রে এবং সমতলভূমিতে যাওয়া হচ্ছে, এবার দার্জিলিং। শৈশবের স্মৃতি তাঁকে ডাকছে।

কলকাতা থেকেই টেলিফোনে কার্শিয়াং, দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে তিনটে মোটামুটি কম পয়সার হোটেলে ঘর বুক করা হল। আজকাল এই এক সমস্যা হয়েছে। ভদ্রস্থ, কম খরচের জায়গা পাওয়া কঠিন। হয় খুব দামি জায়গা আছে, তিনতারা, পাঁচতারা, একেবারে তারায় খচিত অথবা অবাসযোগ্য ডর্মিটরি, ইঁদুর-আরশোলার সঙ্গে সহাবস্থান তথা নর্মদার পাশে পাইস হোটেল।

এ দুটোর মাঝামাঝি প্রায় কিছু নেই। সুতরাং বেশ কষ্ট করে, অনেকের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে তিন জায়গায় তিনটে মোটামুটি হোটেলে ঘর বুক করা হল, স্বামী-স্ত্রীর জন্যে যেমন হয় ডবল বেডের ঘর।

ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শেয়ার অ্যামবাসাডার গাড়িতে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে সর্বানন্দ সর্বাণী কার্শিয়াং এসে নামলেন।

সর্বাণীর এই প্রথম পাহাড় ভ্রমণ। পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা পাইন গাছের পাতা ঝিরঝির করে দুলছে নভেম্বরের ঠাণ্ডা বাতাস মাখা রোদে। সর্বাণী কার্শিয়াং বাস স্ট্যান্ডে নেমে অভিভূত হয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বললেন, এখনও তো দার্জিলিং রয়েছে, তারও পরে কালিম্পং। এখনই কি দেখলে।

সে যা হোক, পায়ে হেঁটে কিছু দূরে নির্দিষ্ট হোটেল। সেখানে গিয়ে সর্বানন্দ সর্বাণী দেখলেন ঘর ঠিকই বুক আছে কিন্তু একটা ঘর নয়, দুটো ঘর বুক হয়েছে মিঃ অ্যান্ড

মিসেস এস দত্ত নামে।

কোথাও ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে সর্বানন্দ একটা ঘর ক্যানসেল করে দিলেন।

দুদিন পরে দার্জিলিং পৌঁছে সেই একই ব্যাপার। হোটেলে দুটো ঘর মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এস দত্তের নামে বুক করা। সিজনের সময়, ঘরের জন্যে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে, সুতরাং হোটেলওয়ালা বুকিং ক্যানসেল করতে মোটেই আপত্তি কংলেন না।

আসল বিপত্তি হল কালিম্পঙে গিয়ে। সেখানেও হোটেলে ওই একই ব্যাপার। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এস দত্তের নামে দুটো ঘর বুক হয়ে আছে।

সর্বানন্দ দ্বিতীয় ঘরটি ক্যানসেল করতে যাচ্ছেন, এমন সময় অন্য একটি দম্পতি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে হোটেলের কাউন্টারে সর্বানন্দ-সর্বাণীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এস দত্ত?'

সর্বানন্দ অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ?'

নবাগত দম্পতি জানালেন, 'দেখুন আমরাও মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এস দত্ত। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আমাদের ঘরটা ক্যানসেল করে দিচ্ছেন।'

সর্বানন্দ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

মুখবদল

খিটিমিটিটা সাতসকালেই শুরু হয়ে যায়। সাতসকালের মানেটা কি, ঠিক কতটা সকাল তা অবশ্য জানি না। হাতের কাছে অভিধানেও শব্দটা পেলাম না। লিখতে বসে এ সব নিয়ে ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়।

আমাদের এই গল্পে সাতসকাল হল সকাল সাতটা, সেই সময়েই চায়ের টেবিলে বসে দুজনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে যায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে।

দামিনী একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। একটু রাত করে ঘুমনো একটু বেলা করে ওঠা বহুদিনের পুরনো অভ্যেস তাঁর।

ততক্ষণে ধর্মদাস লেকের ধার দিয়ে এক চক্কর দিয়ে আসেন। সকালে না হাঁটলে তাঁর রক্তে অক্সিজেন খেলে না, সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে'

আগে বাইরের দরজা ভেজিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে যেতেন। ভিতরের ঘরে দামিনী ঘুমোতেন। কিন্তু ব্যবস্থাটা নিরাপদ নয়। একটা ইয়েল তালা দবজায় লাগালে সমস্যাটা ঘুচে যায়, বাইরে থেকে টেনে দিলেই হবে। পরে ফেরার সময় বাইরে থেকেই চাবি দিয়ে খোলা যাবে। কিন্তু এসব তালা এদিকে কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায় না। ওদিকে বা কোন দিকে পাওয়া যায়, ধর্মদাসের সে বিষয়ে কোনও ধাবণা নেই।

আজ কিছুদিন হল ধর্মদাস তাঁর বইয়ের আলমারিব তালাটা খুলে বেরোনোর সময়ে বাইরের দরজায় লাগিয়ে যান। কিন্তু এখন সে ' সম্ভব নয়। কাল সকালেই দামিনীর সত্তর বছরের দাদা এসেছিলেন, দামিনী জানতেনই না যে দরজা বাইরে থেকে ধর্মদাস তালা বন্ধ করে যান। যখন এটা সদ্য নিদ্রোত্থিতা দামিনী বুঝতে পারলেন, তিনি রাগে গজরাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। দরজার ওপার থেকেই দাদার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত

প্রভাতী আলাপ সারতে হল। যাওয়ার সময়ে মোক্ষম কথাটি বলে গেলেন তিনি, ধর্মদাস কি আজকাল তোকে তালা দিয়ে রাখে নাকি? বুড়ো বয়েসে এসব বাতিক খুব খারাপ।

সেদিন মুড়োঝাঁটা কিংবা চেলা কাঠ পিঠে ভাঙা ছাড়া আর সবই করেছিলেন দামিনী। ধর্মদাসের কোনও দোষই ছিল না। নিত্যন্ত প্রাতঃভ্রমণের মত একটি নিরামিষ অথচ প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে ধর্মদাস নিগৃহীত হলেন।

আমরা সকালবেলার ওই নাজিরটি উপস্থাপন করলাম শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্যে যে ধর্মদাসবাবুর সারা দিন কেমন কাটে।

বাড়ির বাজার ধর্মদাস নিজেই করেন। বেগুনের পোকা বেগুন ছাড়া আর কোথায় থাকবে, বাজারের বেগুনে পোকা বেরুল। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাঁচশো গ্রাম বেগুন কিনেছিলেন ধর্মদাস।

ছোট-ছোট বেগুন। প্রায় পনেরো-বিশটা উঠেছিল ওই আধ কেজিতে। দাম একটু কম বলে ধর্মদাস কিনেছিলেন। কিন্তু দামিনী তরকারি কুটতে গিয়ে দেখলেন প্রত্যেকটি বেগুনে বিজবিজ করছে পোকা। পাঁচশো গ্রাম বেগুনে প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম পোকা।

খেপে গিয়ে দামিনী সেই বেগুনের পোকাগুলো ভেজে বেগুনভাজার বদলে ধর্মদাসকে দিলেন।

এ রকম প্রায়ই হয়। অনেক সময় দামিনী পচা মাছ ছুঁড়ে মারে ধর্মদাসকে, খারাপ ময়দা মাথায় ঢেলে দেন।

ধর্মদাস কি আর করবেন, হাঁটেন। সকালে আর বেরোনোর সাহস পান না। একটু বেলা করে, দামিনী ঘুম থেকে উঠলে তারপর হাঁটতে বেরোন। রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে হাঁটেন।

আবার হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যান, ডাকঘরে যান, পেনশন আনতে যান। বিকেলেব দিকে ফের লেকে গিয়ে পায়চারি করেন।

সকালের ভ্রমণকারীরা বিকেলের দিকে কেউ কেউ আসেন। তাঁরা ধর্মদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, সকালে আর আসেন না কেন? ধর্মদাস চুপ করে থাকেন।

একদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নির্যাতিত হওয়ার পরে ধর্মদাস দামিনীর হাতে হেনস্তা হওয়ার কথাটা কবুল করে ফেললেন ভ্রমণসঙ্গীদের কাছে।

ধর্মদাসের পুরনো ভ্রমণসঙ্গী রমেশবাবু। দুজনে এক সময়ে একই অফিসে কাজ করতেন। তিনি ধর্মদাসকে বলেন, 'আপনার স্ত্রীকে এত ভয় করেন আপনি? আপনি কি মশায় ইঁদুর নাকি।'

ধর্মদাস বললেন, 'ইঁদুর হলে তো ভালই ছিল?'

রমেশবাবু বললেন, 'সেকি! কেন?'

ধর্মদাস বললেন, আমার স্ত্রী ইঁদুরকে খুব ভয় পান কি না?'

একদিন অবশ্য ধর্মদাস একটা আশার কথা শোনালেন, বললেন, 'বুঝলেন রমেশবাবু আমার স্ত্রীকে আজ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছিল।'

রমেশবাবু শিহরিত। জানতে চাইলেন, 'কেন আপনি কি করেছিলেন?'

ধর্মদাস বললেন, 'কিছুই করিনি। শুধু খাটের নিচে লুকিয়ে ছিলাম।'

পুনশ্চ :

সর্বানন্দ-সর্বাণী কাহিনী একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। তাই একটু মুখবদল করলাম।

তবে উল্লেখযোগ্য এই যে ধর্মদাস-দামিনী আমাদের সর্বাণীর বাবা-মা, সর্বানন্দের শ্বশুর শাশুড়ি। এবং আমি হলফ করে বলে দিতে পারি যে একদিন সর্বানন্দ সর্বাণীরও একই পরিণতি হবে। সে দিকেই তারা এগোচ্ছে।

তিন পুলিশের গল্প

মাননীয়া সম্পাদিকা মহোদয়া আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পুজোয় বড় করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখতে হবে, নাহলে নাকি পুজো সংখ্যার পক্ষে মানানসই হবে না।

কিন্তু কোনও কিছু বড় করে লিখতে গেলে আমার কলমে কালি শুকিয়ে যায়, ডান হাতে কবজিতে ব্যথা হয়, বুড়ো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়।

সুতরাং প্রাণের দায়ে রচনাটি তেমন বড় না করে দুই থেকে তিনে যাচ্ছি। তবে এবারের বিষয় খুব জবরদস্ত। রীতিমত পুলিশ নিয়ে এবারের এই রচনামালা, এই মারাত্মক বিষয় নিয়ে রসিকতা করতে রীতিমত ভয়-ভয় করছে। কিন্তু এই পুজোর বাজারে এর কমে আর কি করা যেতে পারে।

গল্পগুলোর প্রথমে একটা দুঃখের কাহিনী বলে নিই। বছর কয়েক আগে, আমি তখন হুগলিতে, সেখানে এক দারোগাবাবু আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, 'দেখুন, লোকে আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না।'

আমি বলেছিলাম, 'সে কি? তা কেন হবে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আজকে সকালবেলার কথাটাই তা হলে বলি আপনাকে। এক পাড়ায় একটা ছোটখাট গোলমালের এনকোয়ারি করতে গেছি। সেই সূত্রে পাড়ারই এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতে হল। সঙ্গে ওখানকারই আরও দুজন ভদ্রলোক। সেই বাসায় গিয়ে বাইরের দরজায় বেল দিয়েছি। সেই বাড়ির কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে আমাদের দেখে সেই দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে খবর দিতে গেল। ভিতরের ঘরেই বাড়ির কর্তা ছিলেন, শুনলাম তাঁকে কাজের মেয়েটি বলছে, বাইরে দুজন ভদ্রলোক আর একজন পুলিশ এসেছে।'

অতঃপর দুঃখের গল্পের পরে হাসির গল্প।

পুলিশের জমাদার এক ব্যক্তিকে ধরেছেন। লোকটি রাস্তায় মাতলামি করছিল।

জমাদারজি তাকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার?'

লোকটি একে মাতাল তার ওপরে তোতলা এবং দেহাতি কি যে অংবং নাম বলল জমাদার সাহেব মোটেই বুঝতে পারলেন না।

জমাদারজি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'লেখাপড়া জানো? পড়াশুনো করেছো?'

অনেক তোতলামি করে লোকটি যা বললো তার মানে দাঁড়াল, সে লেখাপড়া জানে না কিন্তু নাম সই করা শিখেছে।

জমাদারজির এতেই কাজ হবে। নামটা জানতে পারলেই লোকটিকে চালান করে

দেওয়া যাবে। তিনি এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল লোকটিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে এখানে তোমার নাম লেখো।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে পেনসিলটা ধরল তারপর পুরা পাতা জুড়ে লম্বা, হিজিবিজি কয়েকটি টান দিল।

জমাদারজি অনেক চেষ্টা করেও সেই লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না, কোনও একটি অক্ষরও স্পষ্ট নয়। এ কি নাম সইরে বাবা।

অনেক চেষ্টা করার পর ক্লান্ত জমাদারজি লোকটিকে বললেন, 'এখানে কি লিখেছ, পড়ে দাও দেখি।'

এবার লোকটি বোকার মত হেসে ফেলল, তারপর বলল, 'পড়ব কি করে? আপনাকে যে আগেই বললাম আমি মোটেই লিখতে পড়তে জানি না।'

এরপর সেই বেনামা আসামীকে নিয়ে জমাদার সাহেব কতটা নাজেহাল হয়েছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে এটা জানি যে সাধারণত আসামীর নাম নিয়ে পুলিশ খুব একটা মাথা ঘামায় না। সব সময় আসামীরা সত্যি নাম বলেও না। আর নাম না মিললে আসল নাম জানার পরে আগের নামটা ওরফে করে দিলেই হবে।

তাছাড়া অনেক কাল আগে একটা গল্প শুনেছিলাম, সে গল্পটাও সম্ভবত খুব বানানো নয়।

সাতকড়ি নামে এক ব্যক্তির নামে একটি ওয়ারেন্ট বেরোয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে খুঁজে পায় নি। কিন্তু পুলিশ সেটা পুষিয়ে নেয় সেই এলাকারই পাঁচকড়ি এবং দুকড়ি নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পাঁচ এবং দুই মিলে সাত, সাতকড়ির ওয়ারেন্টে এই দুজনেকে চালান দেওয়া হয়।

এরই পাশাপাশি একটু আধুনিক গল্পের কথা মনে পড়ছে। আজকাল পলাতক অপরাধীর ফটো, হাতে আঁকা ছবি মিলিয়ে পলাতক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হয়।

বহু নিরপরাধ লোক এর জন্যে যথেষ্ট বিপদে পড়ে। শুধু ফটো বা ছবির চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে অনেককে থানায় বা লক-আপে যেতে হয়। হয়তো শেষে সে ছাড়া পায়, কিন্তু হয়রানি কিছু কম হয় না।

যে যা হোক, বাঘে ছুঁলে যে আঠারো ঘা সে সবাই জানে। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বরং ফটো মিলিয়ে আসামী ধরার প্রচলিত গল্পটা বলি।

যখন কোনও পলাতক আসামীর ফটো প্রচার করা হয় তখন চেনার সুবিধের জন্যে সম্ভব হলে মুখের বাঁ এবং ডান দিকের প্রোফাইল এবং সামনাসামনি ছবি দেওয়া হয়, এতে পুরোটা মিলিয়ে লোকটিকে সনাক্তকরণের সুবিধে হয়।

দুদিকের প্রোফাইল এবং সামনাসামনি এই তিনটি ফটো এক বাঘা দারোগার হাতে পৌঁছায়। হেড কোয়ার্টারের ধারণা ঐ দারোগা সাহেবের থানার এলাকাতেই আসামী লুকিয়ে আছে।

পরের দিনই তিন ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে দারোগা সাহেব হেড কোয়ার্টারে এসে বড় সাহেবকে সেলাম দিয়ে জানালেন, 'স্যার তিন ব্যাটাকেই ধরেছি।'

তিন পুলিশের গল্পের কথা বলেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই তিনের অধিক গল্প হয়ে গেল, লেখা কিন্তু বড় হল না। তাই আমাকে আরেকটু লিখতে হচ্ছে।

আমার এই শেষ গল্পের ঘটনাটি মাত্র দুদিন আগে ঘটেছে।

মধ্য ভাদ্রের গনগনে দুপুর। পরপর দুদিন দুরাত্রি মেঘবৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার পরে একেবারে যাকে রাঢ়ভূমিতে বাবা-খাই, মা-খাই রোদ্দুর বলে সেই চাঁদিফাটা রোদ উঠেছে কলকাতায়।

আগস্টের চতুর্থ সপ্তাহের দুপুর দুটো। বাৎসরিক গ্রাফে এটাই কলকাতায় মিটিং-প্রশেসন মিছিলের মাহেন্দ্রক্ষণ। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে প্রায় দশ মিনিট একটি মাঝারি মাপের মিছিলের ধাক্কায় ট্রাফিক আটকিয়ে রয়েছে।

সাধারণত মোটর সাইকেলের আরোহীরা এর মধ্যেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু আজকের মিছিলের প্রহরা খুব কড়া। মিছিল অতিক্রম করে একটি মাছি পর্যন্ত গলতে পারছে না।

যেমন হয়, মিছিলে অবরুদ্ধ ট্রাফিকের ঠিক প্রথম ভাগেই রয়েছে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদির ফাঁক দিয়ে নাক বাড়িয়ে কয়েকটি স্কুটার, মোটর সাইকেল, টু হুইলার।

এরই মধ্যে একটি ভারি, প্রাচীন, পাকাপোক্ত মোটর সাইকেলে বসে আছেন রমারঞ্জন। তিনি একজন পাকা মোটর সাইক্লিস্ট, বয়েস বাড়বার আগে মাথার চুলগুলো পেকে ধবধবে হয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে, বিবাহ-বিচ্ছেদ জনিত খোরপোষের মামলায় আংশিক জয়লাভ করে, গভীর উত্তেজনা সহকারে বর্তমান বান্ধবী শ্রীমতী জয়প্রভাকে তাঁর রবীন্দ্র সরণির পোদ্দার কোর্টের অফিসে রমারঞ্জন খবরটা দিতে যাচ্ছিলেন।

পথে আটকিয়ে গেলেন। এরকম আটকিয়ে যাওয়া রমারঞ্জনবাবুর এই প্রথম নয়। তাঁর প্রথম যৌবনের এবং মধ্য যৌবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে মোটর সাইকেলের সিটের ওপর বসে। আজও তিনি ধৈর্য ধরে সিটের ওপরে স্থির হয়ে বসেছিলেন যতক্ষণ না মিছিলটা পার হয়ে যায়।

সব প্রতীক্ষারই অবসান আছে। মিছিলও এক সময় এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গাড়িগুলো অস্থির হয়ে উঠল। ড্রাইভাররা এক সঙ্গে সমবেত ভাবে অধৈর্য হয়ে উচ্চনিনাদে তাদের গাড়িতে হর্ন বাজাতে লাগল।

কিন্তু চৌরাস্তার দুদিকের, মানে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের পথ তো এক সঙ্গে খুলে দেওয়া যায় না। রমারঞ্জনের দুর্ভাগ্য, ট্রাফিক পুলিশ তাদের দিকটা আগে না ছেড়ে পার্ক স্ট্রিট মেয়ো রোডের ট্র্যাফিক আগে ছেড়ে দিল।

এই অবিচারে এদিকের দুই পাশের গাড়িগুলো উদ্দাম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। শুধু গাড়ির হর্ন বাজানো নয় তারা চেঁচামেচি, গালাগাল শুরু করে দিল। বলা বাহুল্য সবই পথে কর্তব্যরত ট্র্যাফিকের পুলিশ এবং হোমগার্ডের বিরুদ্ধে।

তালপাকা গরমে এতক্ষণ তীব্র রোদে রাস্তায় আটকিয়ে থেকে চালকদের মাথা গরম হয়ে গেছে। অন্য দিকে রাস্তায় ঘামতে ঘামতে, রোদে পুড়তে পুড়তে ডিউটিতে ব্যস্ত পুলিশদেরও মাথা গরমে গনগন করে জ্বলছে।

এই সময়ে কি একটা খারাপ গালাগাল শুনে আর সহ্য করতে না পেরে ঠিক সামনের

ট্র্যাফিক সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল।

রমারঞ্জন কিন্তু গালাগাল দেননি, অত নিম্নমানের, নিচু রুচিব মানুষ তিনি নন। কিন্তু কেন যেন সেই ভোজপুরি সেপাইয়ের সন্দেহ হল যে সমস্ত খিস্তির উৎস হলেন রমারঞ্জন।

ইতিমধ্যে রমারঞ্জনের একটা গাফিলতিও সেপাই পেয়ে গেছে। রমারঞ্জনের মাথায় হেলমেট নেই। মোটর সাইকেল আরোহীদের শক্ত, গোল টুপি মাথায় দেওয়া আবশ্যিক, অন্যথায় এটি একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

সুতরাং সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল, লোকটাকে এই অজুহাতে শিক্ষা দেওয়া যাক।

কিন্তু হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরনোর মত বোকা রমারঞ্জন মোটেই নন। এই গরমে মাথার হেলমেট রোদে তেতে গেছে। তাই তিনি সেটা খুলে দুই হাঁটুর মধ্যে রেখেছেন।

সেপাই এসে রমারঞ্জনকে ধরল ; 'আপনার মাথায় কিছু নেই কেন?' তাঁর শূন্য মস্তকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল সে।

রমারঞ্জন নির্বিকার ভাবে কোমরের সামনে রাখা হেলমেটটা দেখালেন।

না, তা চলবে না। আইনে বলা আছে মাথায় হেলমেট রাখতে হবে।

রমারঞ্জন বললেন, 'আধঘণ্টা আটকিয়ে আছি। গাড়ি চালানোর সময় মাথায় টুপি পরে নেব।'

সেপাই বলল, 'তা হবে না। আইন ভঙ্গ হয়েছে, জরিমানা দিতে হবে।'

রমারঞ্জন চুপ করে রইলেন।

এবার ট্র্যাফিক পুলিশের মোক্ষম অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ হল, 'দেখি আপনার লাইসেন্স।'

রমারঞ্জন লাইসেন্স দেখালেন না। বরং উলটে আইন রক্ষককে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মাথায় কি আছে?'

সেপাইটি আরও রেগে গেল।

রমারঞ্জন বললেন, 'আপনার মাথায় কিছু নেই। একদম ফাঁকা।'

অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে রমারঞ্জন এই কথা বলায় সেপাইটি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'এই তো টুপি রয়েছে।'

'না কিছু নেই। একদম ফাঁকা।' এই বলে রমারঞ্জন মোটর সাইকেলটা হুস করে ছেড়ে দিলেন। এদিকের ট্র্যাফিক এই মাত্র খুলে গেছে।

মাতালের গল্প

সেই সব বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকারা, যাঁরা আমার 'দুই মাতালের গল্প' নামক গোল্লমেলে বইটি পড়েছেন তাঁরা অনায়াসেই আশঙ্কা করতে পারেন, 'এই রে, আবার পুরনো গল্প বলতে যাচ্ছে লোকটা।'

আমি প্রথমেই আশ্বস্ত করতে চাই যে এটি একটি আনকোরা গল্প। আসলে একটি নয় আড়াইখানা গল্প, একই ব্যক্তিকে নিয়ে। দুই মাতালের গল্প ছিল দুজন মদ্যপের, আর এটি হল একই মাতালকে নিয়ে দুটি গল্প, সঙ্গে আধখানা ফাউ।

গল্পের নায়কের নাম নিরানন্দ, পদবী নিষ্প্রয়োজন।

নিরানন্দ একজন খারাপ জাতের মাতাল। সময়-অসময়ে তিনি মদ্যপান করেন এবং প্রায় সদাসর্বদা টইটম্বুর হয়ে থাকেন।

শ্রীযুক্তা নিরানন্দা দেবী, যে কোনও মদ্যপের সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতোই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন স্বামীকে মদ্যপান থেকে বিরত করতে, বলা বাহুল্য পারেননি।

গালাগালি, অনশন, শয়নকক্ষে ছিটকিনি দিয়ে স্বামীর মাথায় জল ঢালা এমন কি তাঁকে ঝাঁটাপেটা করা ইত্যাদি যতরকম প্রচলিত অস্ত্র আছে অতিপরায়ণা স্ত্রীদের হাতে, সবই নিরানন্দা দেবী প্রয়োগ করে দেখেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হয়নি।

অবশেষে খবরের কাগজে 'মদ খাওয়া ছাড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি' নামক বিজ্ঞাপন দেখে নিরানন্দা দেবী দাড়িওয়ালা রামবাবুর এক ডোজ ওষুধ বহুমূল্যে কিনে আনেন।

রামবাবার ওষুধ সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেতে হয়। এদিকে নেশা করে বেশি রাতে বাড়ি ফিরে নিরানন্দের ঘুম থেকে উঠতে সাড়ে আটটা হয়ে যায়।

একদিন বহুকষ্টে ভোরবেলা নিরানন্দকে ঘুম থেকে তুলে, কিছু বোঝার আগে জোর করে হাঁ করিয়ে নিরানন্দা দেবী সেই মন্ত্রপূতঃ ওষুধ বড় এক চামচে খাওয়ালেন। কিছু অনুমান করে নিরানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার?'

সত্যের খাতিরে এবং খাওয়ানো যখন হয়েই গেছে এই ভেবে নিরানন্দা দেবী রামবাবার কথাটা বললেন। নিরানন্দের তখনও আগের রাতের খোয়ারি ভাঙেনি। তিনি বললেন, 'আমি খাই হুইস্কি, রামবাবার ওষুধে আমার কি হবে। হুইস্কি বাবা কেউ থাকলে তার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এস।'

কথা শেষ করার আগেই কিন্তু নিরানন্দবাবু কপালে চোখ তুলে গোঁ গোঁ করতে করতে বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলেন আর স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো, একটা কাগজে লিখে নিয়ে এস, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়,' আমি তার নিচে সই করে দিচ্ছি, না হলে তুমি কিন্তু ঘোর বিপদে পড়বে।'

সে এক কেলেঙ্কারি!

নিরানন্দা দেবী ওরকম বিপদে আর কখনও পড়েননি। সেই সাত সকালে পাড়ার লোক দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে আনতে হল।

ইতিমধ্যে নিরানন্দবাবু অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছেন। তাতে ছটফটানিটা কমেছে কিন্তু স্ত্রীর দুশ্চিন্তা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ডাক্তার এসে দেখলেন নিরানন্দ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কপালে হাত দিয়ে, নাড়ি পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওঁর কিছু হয়নি। উনি পরম আরামে ঘুমোচ্ছেন। আমাকে ডাকতে গেলেন কেন? মর্নিং ওয়াক করা হল না।' গজগজ করতে করতে চল্লিশ টাকা ফিজ নিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

নিরানন্দা দেবীর মনে এখনও সন্দেহ আছে যে সেদিন সকালে তাঁর স্বামী পুরোটা অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু নিরানন্দবাবুর একটা উপকার হয়েছে। নিরানন্দা দেবী তাঁর স্বামীর মদ খাওয়া ছাড়ানোর আর চেষ্টা করেননি।

অতঃপর দ্বিতীয় অথচ অদ্বিতীয় গল্পটি বলা যায়। অবশ্য একে গল্প না বলে একটি শোকগাথা বলা যেতে পারে। অন্য এক নিরানন্দবাবুর কাহিনী।

গল্পটি সরাসরি বলি, একদম ভনিতা না করে।

ভরদুপুরে শ্রীযুক্ত নিরানন্দবাবু সাতিশয় নিরানন্দ বদনে একটি বারে প্রবেশ করেছেন। বারটি তাঁর বহু পরিচিত, এখানকার গেটম্যান থেকে বেয়ারা, বেয়ারা থেকে ম্যানেজার এমনকি স্থায়ী মাতালেরা তাঁকে ভালো চেনে।

কিন্তু আজ এই মধ্য সপ্তাহের দুপুরবেলায় বার প্রায় খালি। বড় বড় শ্বেত পাথরের গোল টেবিলে আক্ষরিক অর্থে মাছি ঘুরছে। চর্বিত এবং নিক্ষিপ্ত চাটের অভাবে বিড়ালকুল মেজে ছেড়ে উঠে বারের জানলায় 'মিউ মিউ' করছে।

বারের শেষ প্রান্তে একটি ফাঁকা টেবিলে গিয়ে নিরানন্দবাবু বসলেন। কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা এল। এসে যথারীতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেব স্যার।'

নিরানন্দবাবু শুকনো মুখে বললেন, 'তুমিই বল।'

বেয়ারা একটু ভেবেচিন্তে বলল, 'যা গরম পড়েছে। লম্বা, ঠাণ্ডা, গলা পর্যন্ত ভদকাভোর্তি'...

বেয়ারা কথা শেষ করার আগেই নিরানন্দবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! তুমি কি আমার মিসেসের কথা বলছ? তিনিও এসেছেন নাকি?'

বেয়ারা কি বুঝল কে জানে? সে গিয়ে এক বোতল বিয়ার নিয়ে এল।

নিরানন্দবাবু বারের চারদিকে ইতিউতি তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বিয়ার পান করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, এ গল্পের এখানেই শেষ করা ছাড়া কোনও গতি নেই।

কারণ এসব গল্পের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। পুনশ্চ :

সন্ধ্যাবেলা নিরানন্দবাবুর বাড়িতে একদল সমাজসেবী এসেছেন। নিরানন্দবাবু বাড়ি নেই। নিরানন্দবাবুর স্ত্রী ভদ্রলোকদের বাইরের ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি জন্যে এসেছেন?'

সমাজসেবীদের মুখপতি বললেন, 'মাতালদের পুনর্বাসনের জন্যে আমরা একটা আশ্রম করেছি। যদি কিছু সাহায্য করতেন।'

শ্রীযুক্ত নিরানন্দা দেবী বললেন, 'একটু বেশি রাতের দিকে আসুন। নিরানন্দ ফিরলে তাকে নিয়ে যাবেন।'

এক প্রশাসকের গল্প

পঞ্চাশ বছর আগেকার গল্প এটা।

মফঃস্বলের একটা শহরের সরকারি অফিসে আগুন লেগেছিল। স্থানীয় আধিকারিক পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী জেলা সদরে সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে এই দুঃখসংবাদটি জানান এবং সরকারি রীতি অনুযায়ী জেলা শাসনের নির্দেশ এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সেকালে আজকের মত টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, সেলুলার ইত্যাদি ছিল না।

জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রেরণের একমাত্র উপায় ছিল টেলিগ্রাম বা তার।

সে সময় এমন কি এই সেদিন পর্যন্ত টেলিগ্রামকে রীতিমত গুরুত্ব দেওয়া হত। মাঝপথে সেটা বেপাত্তা হয়ে যেত না। জীবন-মৃত্যু, দুর্ঘটনার, আনন্দের সংবাদ বহন করে আনত টেলিগ্রাম, অতি দ্রুত যথাস্থানে পৌঁছে যেত।

এ ক্ষেত্রেও আগুন লাগার খবর বহনকারী তারটি যথাসময়ে জেলা সদরে পৌঁছেছিল। কিন্তু সরকারি অফিসে যেমন হয়, তাদের কাগজটি ফাইল চাপা পড়ে যায় এবং তারপরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সে যা হোক, মাসছয়েক পরে সংশ্লিষ্ট বড়বাবু একদিন নথি গোছাতে গোছাতে তারটি হঠাৎ খুঁজে পেলেন। আজকালকার দিন হলে বড়বাবু নির্বিকার চিত্তে ছ'মাসের বাসি এই টেলিগ্রামটি ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক ছিলেন সাবেকি মানুষ। তিনি টেলিগ্রামটি নথিভুক্ত করে তাঁর ওপরওলা, মানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিন্তু এতদিন তারটা কোথায় ছিল, কি করে এত দেরি হল সে সব কিছুই প্রশ্ন করলেন না, শুধু সংক্ষিপ্ত আদেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করুন।'

আরেকটি প্রশাসনিক কাহিনী লিখছি, এটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

এক কালেক্টরেটের নাজির বর্ষার প্রাক্কালে নতুন কালেক্টর সাহেবের কাছে একটি পুরনো ছাতা সারানোর জন্যে নোট দিলেন। কালেক্টর সাহেব ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে এবং সতর্ক। তিনি পুরনো ছাতা সারানোর নথিতে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন : (১) ছাতাটি কবে কেনা হয়েছিল? (২) কত দাম পড়েছিল? (৩) একটি ছাতা সাধারণত কতদিন টেঁকে? (৪) এই ছাতাটি আগে কখন সারানো হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে কবে এবং সে বাবদ কত খরচ হয়েছিল? (৫) একটি নতুন ছাতার দাম কত? পুরনো ছাতা সারানোর চেয়ে নতুন ছাতা কেনা কি যুক্তিসঙ্গত হবে না?

নথিটি এই সব প্রশ্ন নিয়ে ফিরে আসার পর নাজির সাহেব এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেটা নিয়ে গিয়ে বলেন, 'স্যার, উত্তরগুলো একটু তৈরি করে দিন। আপনি যা জানতে চান আমি বলছি।'

ডেপুটি সাহেব পুরনো লোক, নাজিরকে বেশ বহুদিন দেখছেন, তিনি অবাক হয়ে নাজিরকে বললেন, 'সেকি এর উত্তর তো আপনিই লিখে দিতে পারেন।'

নাজির সাহেব বললেন, 'পারি, স্যার। কিন্তু জানেন তো আমার ইংরেজিটা তেমন সুবিধের নয়। সেই ইংরেজি জবাব পড়ে নতুন কালেক্টর সাহেব হয়ত আবার জানতে চাইবেন, আমার লেখাপড়া কদ্দুর, আমি কোথায় কোন স্কুলে পড়াশুনো করেছি; সেখানে কারা ইংরেজি পড়াতো, আমি কি কি পরীক্ষা পাশ করেছি; সে পরীক্ষা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড নিয়েছে?

এতগুলি কাল্পনিক প্রশ্ন পরপর উত্থাপন করার পরে নাজির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'উনি হয়ত আরও জানতে চাইবেন, আমি কবে, কিভাবে সরকারি চাকরি পেয়েছি। কে বা কারা আমাকে নির্বাচন করেছিলেন?'

সম্পাদকের গল্প

দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা। দু'টি পত্রিকাই যথেষ্ট শ্লেষাত্মক এবং ব্যঙ্গধর্মী। এক ধরনের পাঠক-পাঠিকার কাছে দু'টি কাগজেরই খুব চাহিদা।

একটি কাগজের নাম বাঁশ ও বাঁশি। অন্যটির নাম ঢাকঢোল।

ঢাকঢোল এবং বাঁশ ও বাঁশি, এই দু'টি কাগজের প্রধান কাজই হল একে অন্যকে আক্রমণ করা। সেই আক্রমণের ভাষা তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর হতে হতে অবশেষে অত্যন্ত মোটাদাগের স্থূল পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

শেষমেশ শুরু হল দুই সম্পাদকের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র নিয়ে কেচ্ছাকাহিনী ছাপা। সে সব কাহিনী কোনও ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় না। তাতে এতই নোংরামি, তার মধ্যে এতই দুর্গন্ধ। এ ওকে চোর, জুয়াচোর, মদ্যপ, লম্পট বলেই শুধু ক্ষান্ত হয় তা নয়, রীতিমত রগবগে বর্ণনা দিয়ে দুই সম্পাদকের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয় মানহানির মামলা, খেসারত দাবি ইত্যাদি, তা কিন্তু দুজনেই কেউই করে না। দু'জনের মনের যেটুকু ঝাল তা তারা মেটায় পরস্পরকে অপাঠ্য, অশালীন গালাগাল করে।

যে শহর থেকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা দু'টি প্রকাশিত হয় সেই শহরেই যাবেন শ্রীযুক্ত নীতিকান্ত ভট্টশালী। ভট্টশালী মহোদয় প্রবীণ, সজ্জন ব্যক্তি। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুনীতির প্রয়োজন, এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। এবং শুধু তাই নয়, তিনি নিজে সুনীতির একজন বড় প্রবক্তা।

বাঁশ ও বাঁশি এবং ঢাকঢোলের এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি প্রতিযোগিতার কথা নীতিকান্তবাবুর কাছেও পৌঁছেছে। তিনি পরপর কয়েকটা সংখ্যা দু'টি পত্রিকাই কিনে পড়ে দেখলেন, ভয়াবহ ব্যাপার। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এই ধারাবাহিক নোংরামি চলেছে। এ জিনিস শালীনতা ও ভদ্রতার খাতিরে সহ্য করা যায় না, যেভাবেই হোক এটা বন্ধ করতে হবে, অবিলম্বে এর একটা সুরাহা চাই—নীতিকান্তবাবু মনে মনে ঠিক করলেন।

নীতিকান্তবাবু দু'টি পত্রিকারই ঠিকানা দেখে দু'জন সম্পাদককেই চিঠি দিলেন। বাঁশ ও বাঁশি পত্রিকার সম্পাদক হলেন ডমরুলাল চক্রবর্তী আর ঢাকঢোল পত্রিকার সম্পাদক প্রভঞ্জন পাকড়াশি।

ডমরুলাল এবং প্রভঞ্জন দু'জনকেই এক রবিবার নিজের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ জানালেন নীতিকান্তবাবু।

নীতিকান্তবাবুর উদ্দেশ্য খুব মহৎ। দুই শত্রুভাবাপন্ন সম্পাদককে মুখোমুখি খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে তাঁদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বমূলক বোঝাপড়ার ভাব এনে দিতে চান তিনি, যাতে ভবিষ্যতে অন্তত চক্ষুলজ্জাতেও এঁরা পরস্পরকে গালিগালাজ না করেন, উভয়ে উভয়ের প্রতি নোংরা বা অশালীন ভাষা ব্যবহার না করেন।

নীতিকান্তবাবু দুশ্চিন্তায় ছিলেন, এঁরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন তো। তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত বোধ করলেন যখন দু'জন সম্পাদকই চিঠি দিয়ে জানালেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট দিনে

যথাসময়ে তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে উপস্থিত থাকবেন।

পরের রবিবার দিন দুপুরবেলা নীতিকান্তবাবুর বাড়িতে এক গোবেচারা ধরনের ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন। তিনি এসে বললেন, 'আপনার মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে এলাম।'

নীতিকান্ত বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে। আরও একজন থাকবেন, তাঁর জন্যে একটু অপেক্ষা করি।' তারপর কৌতূহলবশত প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনি ডমরুবাবু না প্রভঞ্জনবাবু?'

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, 'এই দু'জনকেই শুধু নিমন্ত্রণ করেছেন?' নীতিকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ, শুধু আপনাদের দু'জনকে।'

আগন্তুক বললেন, 'আর কেউ আসছে না।' দু'জন নয়। আমরা একজন। আমিই প্রভঞ্জন, আমিই ডমরু।

নীতিকান্ত অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডমরু ওরফে প্রভঞ্জন বললেন, 'কাগজ বেচা আজকালকার দিনে যে কি কঠিন। আপনাকে আর কি বলব দাদা।'

দুই শ্রাদ্ধের গল্প

সব ধর্মেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠান।

শ্রাদ্ধ শব্দটি এসেছে শ্রদ্ধা থেকে। যদিও লোকে কথায় কথায় অন্যের মুণ্ডপাত করে, শ্রাদ্ধ করে, শ্রাদ্ধ একটা প্রাচীন ও পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠান। হেলাফেলায় ইয়ারকি-ঠাট্টার বিষয় নয়।

আমরাও অন্তত এবার রঙ্গতামাশায় যাব না। দুটি শিক্ষামূলক গল্প বলব।

প্রথম গল্পটি বহুকালের পুরনো, একদা স্বয়ং বিদ্যাসাগর, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র এই গল্পটি বলেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ঝুলিতে গ্রাম্য ধর্মকর্ম, পুরুত-পণ্ডিত অনেক উপাখ্যান ছিল, এই গল্পটি তার মধ্যে আমার মতে সরসতম।

সেই জন্যেই এই গল্পটির জন্যে আমার খুব দুর্বলতা। না হলে, একই গল্প দুবার লিখি।

একদা পৌনঃপুনিক রসিকতার প্রসঙ্গে একটি প্রবাদের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমি ভাবছিলাম, যেমন একই নদীর জলে দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনই একই ঠোঁটে দুবার চুমু খাওয়া যায় না, একই রসিকতা দুবার করা যায় না।

বিদ্যাসাগর মশায়ের ভাষায় দ্বিতীয়বার একই গল্প বলার মতো দুঃসাহসী আমি নই। আমি নিজেও এর আগে কি ভাবে লিখেছিলাম, সে আমার মনে নেই। আমার সহস্রাধিক রম্য রচনার মধ্যে সেই বিশিষ্ট রচনাটি খুঁজে ''র করতে পারব এমন ভরসাও আমার নেই।

সুতরাং সেই শ্রাদ্ধের গল্পটা এবার আমি নিজের মতো করে বলি।

গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থ পরলোক গমন করেছেন। তিনি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী

পরিবারের কর্তা ছিলেন। খুব ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ হচ্ছে ভদ্রলোকের। বহু দূর দূর থেকে আত্মীয় বান্ধব সব এসেছেন। উঠোনে বড় বড় গর্ত করে উনুন কাটা হয়েছে। ভিয়েন বসেছে। থরে থরে পাহাড় বানিয়ে তরিতরকারি ফেলা হয়েছে। লোকজনে বাড়ি গিজ গিজ করছে।

শুধু শ্রাদ্ধের ভোজের আয়োজন নয়। শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটাও খুব নিষ্ঠাভরে, আন্তরিকতা সহকারে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও হেঁজিপেঁজি সাধারণ গ্রাম্য পুরুত নয়, অনেক দূরে ভট্টপল্লী থেকে দিকপাল পুরোহিত আনা হয়েছে। প্রবীণ পুরোহিতেরা এই রকম বড় কাজের সময়ে দু'চারজন শিষ্য সঙ্গে করে আসেন। শিষ্যেরা সহকারীর কাজ করে, ওরই মধ্যে যারা একটু লেখাপড়া জানে, একটু পাকাপোক্ত তারা এই রকম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুরুতগিরির যোগ্য হয়ে ওঠে।

এবার প্রবীণ পুরোহিত মহোদয়ের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে একটি বয়স্ক শিষ্যও এসেছেন। শিষ্যটির মনে খুব দুঃখ। তিনি অনেকদিন গুরুদেবের সঙ্গে আছেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁকে কাজেকর্মে কোথাও নিয়ে যান না। পুরুতগিরির তিনি কিছুই শিখতে পারছেন না।

একদিন গুরুদেবের কাছে মনের দুঃখ ব্যক্ত করায় গুরুদেব ঠিক করলেন এবার এই শিষ্যকে সঙ্গে নেবেন। কিন্তু সঙ্গত কারণই তিনি শিষ্যকে বাদ রাখতেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ওপর খুব আস্থা নেই গুরুদেবের।

যা হোক এবার গুরুদেব এই শিষ্যটিকে প্রধান সহকাবী করেছেন, তাঁকে বলেছেন, 'আমি কখন কি করি, কিভাবে করি, ভালোভাবে লক্ষ্য বাখবে। এই ভাবে দেখতে দেখতে পুজো-আর্চার কাজ শিখে যাবে।'

শিষ্য খুব মনোযোগ দিয়ে গুরুদেবেব পাশে পাশে থেকে তাঁকে সব কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। কাজের বাড়ি হইচই হট্টগোল চলছে। উঠোনে সামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নিচে গুরুদেব শ্রাদ্ধের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। প্রথমে যজ্ঞ করতে হবে। তার আগে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করতে বসেছেন।

এদিকে হয়েছে কি যেমন বড় বাড়ি, অনেক মানুষজন তেমনই এক গাদা কুকুর-বেড়াল রয়েছে। আজ বাড়িতে ভিড় দেখে সেগুলো একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। উঠোনের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গুরুদেবের আদেশে একজন শিষ্য একটা বাখারির লাঠি নিয়ে কুকুরগুলোকে তাড়িয়েছে। কিন্তু বেড়াল নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেড়ালগুলো সহজে বাগ মানার নয়। একটা বেড়াল তো সামিয়ানার নিচে এসে পুরুতমশায়ের আসনের কোষাকুষি উলটিয়ে দিয়ে চলে গেল। অন্য একটা বেড়াল শিকার ধরার ভঙ্গিতে গুটিগুটি শালগ্রাম শিলার দিকে এগোচ্ছিল। গুরুদেব দুটো বেড়ালকেই ধরে ফেললেন। তারপর এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন সে দুটোকে উঠোনের এক কোণে একটি খুঁটিতে বাঁধতে বললেন। এদিক ওদিক আরও কয়েকটা বেড়াল ছিল, সবগুলোকে ধরে মোটমাট, সাতটা বেড়াল খুঁটিতে বাঁধা হল।

গুরুদেবের প্রধান সহকারী তখন কলাপাতা কাটতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন উঠোনের এক পাশে সাতটা বেড়াল বাঁধা হয়েছে।

যা হোক, সেদিন শ্রাদ্ধকর্ম মোটামুটি ভালোভাবেই মিটল। ফেরার পথে গুরুদেব প্রধান সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজকর্ম সব ভালো ভাবে বুঝে নিয়েছ তো?' শিষ্যটি বললেন, 'হ্যাঁ, সব বুঝে নিয়েছি।'

সাতদিনের মাথায় পুরুতমশায়ের আবার ডাক এল। একদিনে দুটো কাজ। এক গ্রামে অন্নপ্রাশন, অন্য গ্রামে শ্রাদ্ধ। দু ক্ষেত্রেই তেমন ঘটা করে কিছু হচ্ছে না, যজমানদের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

গুরুদেব প্রধান সহকারীকে নিয়ে ধর্মেকর্মে বেরোলেন। তিনি ঠিক করলেন নিজে আগে অন্নপ্রাশনের বাড়িতে যাবেন। সহকারী যাবে শ্রাদ্ধের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে উদ্যোগ, আয়োজন করবে। তিনি তাড়াতাড়ি অন্নপ্রাশন সেরে শ্রাদ্ধের বাড়িতে চলে যাবেন।

অন্নপ্রাশন সেরে গুরুদেব শ্রাদ্ধের বাড়িতে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখেন অব্যবস্থার চূড়ান্ত। সহকারীকে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পেলেন না। এদিকে জোগাড় যন্ত্র প্রায় কিছুই হয়নি। উঠোনের একপাশে দেখলেন চারটে বেড়াল খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে।

এমন সময় প্রধান সহকারী, সেই শিষ্যটি বাড়ির পিছনের বাঁশবনের ভেতর থেকে এলেন। তাঁর দুই হাত রক্তাক্ত। গুরুদেব কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি? বাঁশবনের মধ্যে কি করছিলে? তোমার হাতে রক্ত কিসের?'

রক্তাক্ত হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শিষ্যটি বললেন, 'ভয়ঙ্কর পাজি বেড়াল। কিছুতেই ধরতে পারলাম না। উলটে আঁচড়িয়ে ছালাফালা করে দিল।'

গুরুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেড়াল ধরতে গিয়েছিলে কেন?'

শিষ্য বললেন, 'আগের শ্রাদ্ধে আপনিই তো সাতটা বেড়াল খুঁটিতে বাঁধলেন। কিন্তু এখানে সাতটা বেড়াল জোগাড় করা অসম্ভব। এ বাড়ির দুটো পাশের বাড়ির দুটো চারটেকে বেঁধেছি। আর তিনটে ধরতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেলাম।

অতঃপর এই বুদ্ধিদিগ্‌গজ সহকারীকে নিয়ে আর কখনও অন্য কোনও ক্রিয়াকর্মে গিয়েছিলেন কি না ঐ গুরুদেব সে কথা বিদ্যাসাগর মশায় অবশ্য কিছু বলেন নি।

এবার একটা আধুনিক শ্রাদ্ধের গল্প বলি। কলকাতা শহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। তাঁর উপযুক্ত ছেলে খুব ধুমধাম করে বাবার শ্রাদ্ধ করছে।

পারিবারিক গুরুদেব এসেছেন। এসব তাঁর খুব মওকার সময়। লম্বা লিস্ট ধরিয়েছেন যজমান পুত্রের হাতে। সেই তালিকায় ধান-দূর্বা থেকে, সোনা-হীরক, খাট-পালঙ্ক, ধুতি-ছাতা এমনকি পাদুকা-গামছা পর্যন্ত রয়েছে।

এদিকে গুরুঠাকুরেরা যেমন হয়ে থাকেন, ইনিও খুব লোভী ব্যক্তি। এ লোভ জিভের লোভ, জিনিসপত্রের পরেও খাদ্যদ্রব্যের লোভ। তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, সত্যিসত্যিই মাছ-মাংস খান না, ডিম ছোঁন না। তাঁর লোভের বস্তু হল দই, রাবড়ি, কাঁচাগোল্লা ইত্যাদি মহার্ঘ জিনিস।

সুতরাং গুরুঠাকুর পরমানন্দে মনে মনে জিব চেটে যজমানপুত্রকে বললেন, 'তোমার বাবা, কর্তাঠাকুর, বড় সাত্ত্বিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা যা খেতে ভালোবাসতেন, সে সবের একটা বন্দোবস্ত রাখবে। শ্রাদ্ধের দিন সায়াহ্নে কর্তাঠাকুরের আত্মার শান্তির জন্যে

আমাকেই সেটা খেতে হবে।'

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব যজমানপুত্রের কাছে এলেন।

যজমান বিনীতভাবে গুরুদেবকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক বোতল স্কচ হুইস্কি, একটা তন্দুরি চিকেন আর এক প্লেট বিফ-স্টেক দিয়ে, তারপরে শুয়োরের মাংসের সেলামি আর সসেজ পরিবেশন করে বললেন, 'বাবা, এইসব বড় ভালোবাসতেন। আপনি না খেলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। আপনি না খেলে আমি আপনাকে ছাড়ছি না।'

দুই বাঘের গল্প

কেউ জানেন না।

জানার কথাও নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে এক জোড়া বাঘ, চিতা বাঘ বা বনবেড়াল নয়, একেবারে আসল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার উধাও হয়েছিল, এই মাত্র মাস দেড়েক আগে।

চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার পাহারাদারের শৈথিল্য ও অনবধানতাবশত ব্যাপারটা ঘটেছিল। সে অনেক সময়েই খাঁচার দরজা ভেজিয়ে রাখত। তালা না দিয়ে। অবশ্য কোনওদিন কোনও বাঘ দরজা দিয়ে বাইরে পেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি, তারা বীরদর্পে নিজেদের খাঁচার মধ্যে পায়চারি করেছে। ইচ্ছে হলে নিরীহ দর্শক সাধারণকে ভয় দেখানোর জন্যে, শিশুদের আমোদ দেওয়ার জন্যে হালুম হালুম করেছে।

কিন্তু এই বাঘ দুটো ঠিক সে জাতের নয়। এরা দুজনে এক খাঁচায় ছিল। এক সঙ্গে সাঁট করেছিল, চিড়িয়াখানা থেকে পালাতে হবে।

গল্পের সুবিধের জন্য আমাদের আলোচ্য বাঘ দুটির নাম বলে দেওয়া ভালো। দুটিই প্রায় একই রকম দেখতে। পুরুষ বাঘ। শুধু একজনের নাকের ওপরে একটা কাটা দাগ; শিশুকালে কুমিরে আঁচড়ে দিয়েছিল। এই বাঘটার নাম আচরণ। অন্য বাঘটার কোনও 'ভিজিবল ডিস্টিংগুইশিং মার্ক' নেই, সে দেখতে অন্যান্য আর দশটা বাঘের মতো। তার নাম বিলক্ষণ।

একদিন কেলেঙ্কারি হল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও, দর্শকরা চিড়িয়াখানা থেকে চলে যাওয়ার পরেও বাঘের খাঁচার দরজায় তালা লাগানো হল না। খাঁচার পাহারাদারের সেটা খেয়ালই ছিল না, সে তখন চিড়িয়াখানার মাঠে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচেয় বসে 'বিনোদন বিচিত্রা' পত্রিকা পড়ছিল।

চিড়িয়াখানায় বড় বড় প্রাগৈতিহাসিক গাছপালার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসার পর বিলক্ষণ খুব সাবধানে তার ডান পায়ের থাবা দিয়ে খাঁচার দরজাটা ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে হাঁ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খাঁচার ভিতরে বসে চারদিক লক্ষ করে তারপর একে একে বিলক্ষণ ও আচরণ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল।

বাঘ দুটোকে দেখে এবং তাদের গন্ধ পেয়ে হরিণেরা ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। পাখিরা চেঁচামেচি আরম্ভ করল। চিড়িয়াখানায় রাতের দিকে হঠাৎ হঠাৎ এরকম

ছুটোছুটি চেঁচামেচি হয়—ব্যাপারটা কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

আজকেও তাই হল। কেউ কিছু খেয়াল করল না। আচরণ আর বিলক্ষণ চুপিসারে দেওয়াল আর কাঁটা মনসার ঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। রাত গভীর হলে, যখন ওপাশের খিদিরপুরের খালধারে রাস্তায় গাড়িঘোড়া, মানুষজনের শব্দ একেবারে থেমে এল, বাঘ দুজনে এক লাফে পাঁচিল পেরিয়ে চিড়িয়াখানার বাইরে চলে এল। সেখান থেকে আচরণ রওনা হল দক্ষিণমুখী, সরাসরি সুন্দরবনের দিকে। আর বিলক্ষণ রওনা হল উত্তরমুখী গড়ের মাঠের ময়দান ধরে, ওদিকে যদি কোনও জঙ্গল থাকে এই আশায়।

দেড়মাস পরে গত কালকেই আচরণ আর বিলক্ষণ ধরা পড়েছে। আজ তাদের আবার সেই পুরনো খাঁচায় পোরা হয়েছে।

এই দেড়মাসে বিলক্ষণ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, তার গায়ে গত্তি লেগেছে। কিন্তু আচরণের অবস্থা অতি শোচনীয়। হাড় জিরজিরে চেহারা হয়েছে তার, সে খুব রুগ্ন, কথায় কথায় হাঁফাচ্ছে।

আচরণের অবস্থা দেখে বিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করলো, 'একি তোমার এ রকম হাল হল কি করে?'

আচরণ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভাই, তুমি তো জানো সুন্দরবন যাব বলে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু পথের মধ্যে পড়লাম ঘোর বিপদে।'

বিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি বিপদ?'

আচরণ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম খরার মরসুম, খটখটে বোশেখ মাস। খাল-বিল-নালা লাফিয়ে লাফিয়ে একরাতে সুন্দরবনে চলে যাব। কিন্তু তোমার কি মনে আছে আমরা যেদিন পালালাম সেদিন রাতে কি ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি এল। তারপর এক নাগাড়ে অকাল বর্ষা, দিনের পর দিন।'

বিলক্ষণ বলল 'ঝড় বাদলায় আমিও খুব বেকায়দায় পড়েছিলাম।'

আচরণ বলল, 'তোমার কথা পরে শুনব। আগে আমার কথা শেষ করি।'

বিলক্ষণ দেখল এই দেড় মাসে আচরণের প্রকৃতি একটু খিট'খটে হয়েছে, সে আর বাধা না দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। বল।'

আচরণ আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বলল, 'কি বিপদে যে পড়েছিলাম, বৃষ্টিতে নদীর বাঁধ ভেঙে গেল। গ্রামকে গ্রাম পথঘাট জলে ডুবে একাকার। একটা উঁচু ঢিবি মতন জায়গা দেখে সেখানে একটা তালগাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ পরের দিন সকালে মানুষের চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি চারপাশ থেকে দলে দলে মানুষেরা মাথায় বোঁচকা নিয়ে জলে সাঁতরিয়ে সেই ঢিবির দিকে আসছে। আমি এক লাফে তালগাছের মাথায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে পাক্কা পনেরো দিন' এর মধ্যে প্রথম কয়েকদিন বাবুইয়ের বাসা থেকে দুচারটে ক:' ডিম খেয়েছি। তারপরে সেও ফুরিয়ে গেল। পনেরো দিনের মাথায় মাথা ঘুরে নিচে পড়ে গেলাম।'

বিলক্ষণ অবাক হয়ে বন্ধুর কথা শুনছিল, এবার বলল, 'তারপর।'

আচরণ বলল, 'তারপর আবার কি?' বোধহয় তালগাছ থেকে নিচে পড়ার পরে,

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, ঘুমপাড়ানি গুলিটুলি মেরেছিল। এতদিন পরে দেখছি এই খাঁচার মধ্যে ফিরে এসেছি। সে যাক, এবার তোমার খবর বল।'

বিলক্ষণ বলল, 'আমার খবর তো ভালোই ছিল গত পরশু পর্যন্ত। খেয়ে দেয়ে ভালই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজের দোষে মারা পড়লাম।

আচরণ বলল, 'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

বিলক্ষণ বলল, 'বলছি। সংক্ষেপ করে বলছি। সেই ঝড়ের রাতে চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আমি যে উত্তর দিকে রওনা হলাম। তুমুল ঝড় বাদলে আটকে গেলাম ময়দানে। এদিকে ভোর হয়ে এল। তাড়াতাড়ি লাট সাহেবের বাড়ির মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে তারপর লালদিঘি পেরিয়ে রাইটার্স বিলডিংসে ঢুকে গেলাম। পুরনো বিশাল বাড়ি, পেল্লায় কাঠের সিঁড়ি। তারই একটার পিছনে লুকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যাবেলায় যখন লোকজন কাজ করে ফিরে যাচ্ছে একেবারে শেষের লোকটাকে ধরে খেলাম। কেউ কিছু টের পেল না। এত হাজার হাজার লোক, কেউ কিছু টের পেল না। এই ভাবে মাস দেড়েক ভালই চলছিল। নির্বিবাদে একটা একটা করে লোক খেয়ে যাচ্ছিলাম। ভুলটা করলাম পরশু দিন। ভুল করে যে লোকটা চা দেয় তাকে খেয়ে ফেলি। সকালবেলায় বাবুরা এসে চা খান। যখন চায়ের লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা খেপে গেলেন। খোঁজ শুরু হয়ে গেল। সিঁড়ির পিছন থেকে আমাকে ধরে ফেলল। তারপর চালান হয়ে আবার এখানে ফিরে এলাম।'

বিলক্ষণ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আচবণ বলল, 'সত্যি, বড় দুঃখের কথা।'

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥